

স[রো]বর থেকে শাঁখা সুদ্ধ হাত দু'খানি......

বিশাল দীঘি, স্বচ্ছ গভীর জল। সান-বাঁধান ঘাট। তীরে অতি পুরাতন মন্দির। দেবী প্রতিষ্ঠাতা, পূজারী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, বড় ভক্তিমান। মাঝে মাঝে দেখেন, কে যেন তাঁর শয্যা রচনা করে রেখেছে। এক একদিন রান্নার মধ্যে অন্যের হাতের পরিচয় পান, এই স্বাদ তো তাঁর রচনা করবার সাধ্য নেই। ব্রাহ্মণ ভেবে ভেবে কিছু দিশে পান না।

দেবী কন্যারূপে বৃদ্ধ পূজারীকে নানা-ভাবে সেবা করেন। কিন্তু দেখা দেন না। মাঝে মাঝে বাঁধাঘাটে দীঘির জলে আলতা পরা চরণ দুখানি ডুবিয়ে মেয়েটি হয়ে দেবী বসে থাকেন। সুন্দরী মেয়ে, লীলার অন্ত নেই।

একদিন এক শাঁখারী শাঁখা হেঁকে যাচ্ছে "শাঁখা পরবি মা?" দেবীর ইচ্ছা হোলো শাঁখা পরতে। শাঁখারীকে ডাকলেন, শাঁখা পরতে চাইলেন। ভাগ্যবান শাঁখারী, এই অপূর্বলীলা সে চোখে দেখলো! কোন্ জন্মের কি পুণ্য-ফলে, কে জানে?

কী রূপ! কী দুখানি রাঙা চরণ! কী দুখানি অরুণ পাণি! শাঁখারীর দুনয়ন জলে ভরে এল। শাঁখা পরাতে পরাতে সে যেন দিব্য ভাবে ভরে উঠলো। কৃতার্থ শাঁখারী তখন বড় সঙ্কোচে বল্লে, "মা, তোর হাতে শাঁখা পরিয়ে আমি তো ধন্য হলাম। কিন্তু মা, আমি যে বড় গরীব। শাঁখা বেচে খাই। দাম না পেলে আজ খাবে কি?"

দেবী বল্লেন, "ভয় নেই, ঐ মন্দিরের পূজারীর আমি মেয়ে। বাবাকে বোলো মেয়ের শাঁখার দাম যেন তিনি দেন। টাকা যদি তাঁর কাছে না থাকে তবে বোলো দেবীর ঝাঁপিতে দুটি টাকা আছে।"

শাঁখারী গিয়ে দাম চাইলে পূজারী বিস্মিত হয়ে বল্লেন, "আমার মেয়ে! আমার মেয়ে কৈ বাবা!" তবু ঝাঁপি খুলে দেখেন দুটি টাকা তো আছে। এই টাকা তো ছিল না! শাঁখারী বল্লে, "বিশ্বেস না হয় ঠাকুর ঘাটে গিয়ে মেয়েকে সুধিয়ে দেখ।" গিয়ে দেখেন কন্যা নেই। সঙ্কুচিত শাঁখারী কাতরে বল্লে, "কোথায় গেলে মা আমার? তোমার হাতের শাঁখা তোমার বাবাকে একটি বার দেখাও না মা দয়া করে? তিনি যে পেত্যয় করেন না।" শুনে সরোবর থেকে শাঁখা সুদ্ধ হাত দুখানি দেবী একবার তুলে দেখালেন।

তখন পূজারী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কেঁদে বল্লেন, "মাগো, এত কাল এত পূজা করে তোর দেখা পেলাম না। আর কি পুণ্য-ফলে এই শাঁখারী তোকে দেখলো, তোর কথা শুনলো, তোর হাতে শাঁখা পরাল। আজ কিন্তু তারই কৃপায় আমি মাত্র একটি বার তোর শাঁখাপরা হাত দুখানি একটুখানি হাত দুখানি দেবী একবার তুলে দেখালেন। দেখতে পেলাম!"

তাই বলি বাংলা দেশ এই আদ্যাশক্তি পরা প্রকৃতিকে নানাভাবে পেয়ে ধন্য হয়েছে। তাঁকে মা বলে পূজা করেছে, কন্যা বলে স্নেহ করেছে, পত্নী বলে প্রীতি করেছে। এই

...স্মৃতা সা পুনর্ভবা... জননী হি সা ॥
(বেদান্ততত্ত্ব উপনিষৎ ৪)

যুগে যুগে এই সাধনায় সিদ্ধি দেখিয়ে বাংলা দেশ ধন্য হয়েছে।

সেই বাংলা দেশের আজ এই দুর্গতি কেন? সর্বৈশ্বর্যময়ী অন্নপূর্ণা কিরূপে অপ্রসন্ন? শারদা আজ গেলেন কোথায়? পৃথিবীতে আজ তাঁর বঙ্গীয় সন্তানেরাই কেন সব চেয়ে অন্নহীন শক্তিহীন ও দুর্গত? তাঁর লক্ষ লক্ষ সন্তান অন্নাভাবে প্রাণ দিয়েছে আর বাকি লক্ষ লক্ষ সন্তান আজি রোগে দুঃখে দুর্দশায় ম্রিয়মাণ। এর হেতু কি? তারা তো বছর পর বছর দেবীর পূজা করে, বাদ্যভাণ্ড অনুষ্ঠান সবই করে। তবে কেন তারা আদ্যা-শক্তির শক্তি হতে ভ্রষ্ট, অন্নপূর্ণার অন্ন হতে বঞ্চিত, মনুষ্যত্বের সর্বধর্ম হতে বিচ্যুত?

আজ তবে কি তাদের সাধনা সত্য হতে ভ্রষ্ট হয়েছে? বাঙালীকে আজ কি নূতন দিক দিয়ে সত্য ভাবে দেবীর সাধনা করতে হবে? যদি তাই হয় তবে হে আদ্যাশক্তি, বঙ্গের সন্তানকে সেই দীক্ষাই আজ তুমি দাও।

আদ্যাশক্তিই পরা প্রকৃতি। আজ শক্তির সাধনায় বিশ্বপ্রকৃতিকে আবাহন করতে হবে। প্রকৃতির মধ্যেই যে সব শক্তি নিহিত। তাই বাংলাদেশকে বিজ্ঞানশালায় বসে প্রকৃতির রহস্য আয়ত্ত করতে হবে। শক্তি পূজার সেই দিককে উপেক্ষা করলে চলবে না। প্রথমে সেইখানে বসেই আদ্যাশক্তিকে আবাহন করতে হবে। তিনি মহাবিদ্যা, তাই সবার সব অজ্ঞানতা দূর করবার চেষ্টা করতে হবে। তিনি চিন্ময়ী, তাই জীবন হতে চিত্ত হতে সব মিথ্যা, সব ভয় সব স্বার্থ দ্বেষ কলুষ দূর করতে হবে। তিনি জগজ্জননী, তাই সমাজে কাউকে ঘৃণা বঞ্চনা বা উৎপীড়ন করলে চলবে না।

আপন জীবনের, সমাজের, জ্ঞানবিজ্ঞান-মন্দির, সর্ববিধ পূজামন্দিরে বসে দেবীর আবাহনে আজ সত্য করে বলতে হবে—

হে, বরদে দেবী তুমি এসো, **আয়াতু বরদা দেবী** (তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ১০,২৬. ১)।

অন্তরের টানে হৃদয়ের প্রেমে সব মাধুর্য ও প্রীতি নিয়ে তুমি এসো, দীক্ষা দাও।

আয়াহি মনসা সহ। আয়া শিবস্বা ... (ঋগ্বেদ, ১০, ১৭২, ১—২) হে মহাশক্তি সর্বশক্তি নিয়ে এসো, সর্বশক্তির দীক্ষা দাও তোমার যোগ্য সাধক আমাদের কর।

আয়াহি শতবাজয়া (ঋগ্বেদ, ৮, ৯২, ১০) শতবিধ শক্তি ও ঐশ্বর্য নিয়ে তুমি এসো। আমাদের জীবনের সর্ব সঙ্কীর্ণতা অজ্ঞান দৈন্য ক্লৈব্য দূর হোক। সমাজের সর্ব স্বার্থ মিথ্যা ও গ্লানি দূর হোক। জগতে শান্তি পবিত্রতা ও প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হোক।

পথ

শ্রী সজনীকান্ত দাস

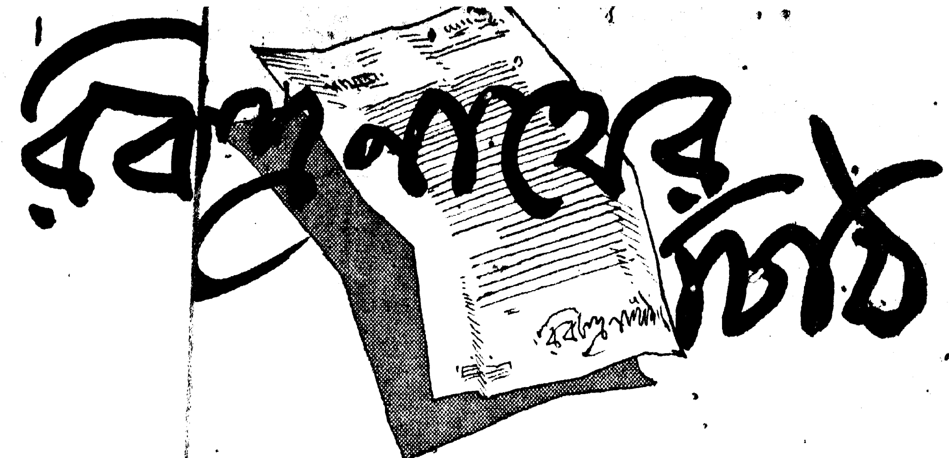
দুর্গম পথের পান্থ, তোমাদের করি নমস্কার,
স্থির লক্ষ্যে চলিয়াছ, কে করিবে পথের বিচার!
যারা রাখে নিজ ঘর
তারা এক-পথচর;
তাদের পথের 'পর
নামেনি বন্ধন-অন্ধকার।
তোমরা তাহারা নও যেথা শৃঙ্খলিত রও
সে দেশ স্বদেশ বটে, আসলে তা নিত্য-কারাগার।

নতি করি তোমাদের মুক্তচিত্ত তোমরা কজন,
স্বীকার করনি কভু প্রলুব্ধের পীড়ন-বন্ধন।
শঙ্কিত সহস্র প্রাণী
যেই দুঃশাসনে মানি
তোমরা উদ্ধত-পাণি
তাহারেই করিতে শাসন।
ত্যজিয়াছ সর্বভয় হইতেছ মৃত্যুঞ্জয়
বার বার পরাজয়ে ব্যর্থ যত হয় আয়োজন।

অন্ধকার কারাগারে কে জানে কোথায় সত্য পথ,
বাহির হতেই হবে লঙ্ঘিয়া এ বাধার পর্বত।
রাখিতে জাতির মান
দিবে আত্মবলিদান।
বিনিময়ে লক্ষ প্রাণ
ফিরে পেতে দাসত্বের খত—
যাহারা সক্ষম দিতে, দিতে পারে পারে নিমেষে
তাহাদের মন্ত্র কভু নহে এক ওম্ তৎসৎ।

অমূল্য জীবনপাতে ঘুচাইতে মায়ের বন্ধন
বিদেশের মৃত্তিকায় মাতৃমুক্তি-যজ্ঞ-আয়োজন
ক'রে থাকো কেহ যদি,
তামস-মহিষে বাঁধি
দাসত্বের কালো নদী
ক'রে থাকো কেহ উত্তরণ—
মোর নমস্কার লহ, ম'রে থাকো, বেঁচে রহ,
বিফল হবে না জেনো অসমাপ্ত হলেও তর্পণ।

মন্দিরে মন্দিরা বাজে, বাজে শঙ্খ, বাজে করতাল,
পথহীন সাধকের সিদ্ধি প্রতীক্ষিছে মহাকাল।
আমরা বিস্ময়ে ভয়ে
দিনগত পাপক্ষয়ে
তোমাদের নাম লয়ে
ছিঁড়িতে চাহি এ মায়াজাল।
তোমরা যেখানে থাকো লক্ষ্য শুধু স্থির রাখো,
কোথা পথ? ভেঙে ফেলো দুর্ভেদ্য এ পাষাণ-জাঙ্গাল।



রবীন্দ্রনাথের চিঠি

[প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত ও শ্রীপ্রমোদনাথ সেনের সৌজন্যে মুদ্রিত]





(১)

প্রিয়বাবু,

কাল সমস্ত দুপুরে বেলা আমার সময় [illegible]—যখন ইচ্ছা হয় আসিবেন। [illegible] Italian বইগুলি ও Rosetti's of [Swin]burne's Poems and Ballads [illegible] রেখে দেব। তা ছাড়া আপনাকে একটি [illegible] শুনাইবার আছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

ওঁ

[illegible]বু,

[আ]মি কিছুদিন থেকে সারস্বত সমাজের'(১) হ্যাঙ্গামা নিয়ে ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম—এখনো অল্প অল্প চলচে—তাই আর আপনাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ প্রভৃতি হয়ে ওঠে নি। আপনার চিঠি যখন এখানে এসেছিল, আমি তখন মেজদাদাদের ওখেনে ছিলুম; কাল সন্ধের সময় এসে পেলুম।

নগেনবাবুর কবিতা পেলুম, খুব ভাল হয়েছে, দেখা হলে এ বিষয়ে কথা কওয়া যাবে। ভারতী বেরিয়েছে। এবারকার কবিতাটি তেমন ভাল লাগবে না। একখানা ভারতী আপনাকে পাঠাই।

কালমৃগয়া(২) এখনো ছাপা হয় নি। প্রেসে দেওয়া হয়েছে বটে।

একখানা য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র(৩) আপনাকে পাঠাই।

শ্রীশবাবুর(৪) স্ত্রীর clairvoyance ব্যাপারটা আমার দেখবার খুবই ইচ্ছে আছে—আপনাদের সুবিধে অনুসারে একদিন নিয়ে গেলে বড় ভাল হয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

ওঁ

প্রিয়বাবু,

আমি কিছুদিন বাড়িতে না থাকাতে আপনার চিঠির উত্তর দিতে পারি নি। আপনার বই দু'খানি পেয়েছি।

Forman's Shelley আপনাকে পাঠাই; ভারতী বোধ হয় পেয়েছেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

ওঁ

ভাই,

আবার, তোমার ঠিকানা জানি নে বলে চিঠি লেখা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু দায়ে পড়ে কোন উপায়ে চিঠি লিখতে হল। আমাকে এখেনে সেই পঞ্চাশ টাকাটা যদি কোনমতে পাঠিয়ে দিতে পারত বড় ভাল হয়। তোমাকে বার বার টাকার জন্যে বিরক্ত করচি কিন্তু মনে কোরো না—কিন্তু আমার টাকার নিতান্ত দরকার হয়েছিল বলেই বই বেচতে বাধ্য হয়েছিলুম। একটু শীঘ্র পাঠিয়ে দিতে পারবে? আমি এখন বান্দোরায় সমুদ্র তীরে বাবা মশায়ের সঙ্গে আছি। নির্জ্জনে আমি ভাল আছি আপনার উন্নতির চেষ্টা করচি। একলা বসে আপনাকে সংযত করচি। কখন কখন দুয়েকটা কবিতা লিখ্‌চি নিতান্ত চুপচাপ করে আছি। সংক্ষেপে এই আমার সমস্ত খবর। সংক্ষেপ কেন—এর চেয়ে বিস্তারিত আর কি করা যেতে পারে? বাবা মশায় এখন অনেকটা ভাল আছেন—তাঁর শরীরের জন্য যে রকম আশঙ্কা করা গিয়েছিল এখেনে এসে সে আশঙ্কা অনেক কমে গেছে। তোমার এবং তোমাদের ওদিককার খবর সমস্ত আমাকে

---

(১) ১২৮৯ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের [উদ্]যোগে প্রতিষ্ঠিত পরিষৎ। [ই]হার সম্পাদক [রবী]ন্দ্রনাথ। দ্রষ্টব্য বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্ত্তিক, ১৩৫০, "রবীন্দ্রনাথ ও সারস্বত সমাজ," [নি]র্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(২) প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১২৮৯।

(৩) গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ১৮৮১।

(৪) সুহৃৎ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

পাঠিয়ে দিয়ো। ডাকের সময় নিতান্ত নিকটবর্ত্তী। আজ আর বেশী কিছু লিখলেম না।

তোমার রবি

আমার ঠিকানা—

Rabindra Nath Tagore,
C/o Babu Debendra Nath Tagore
Bandra
Bombay.

৫

ওঁ

শিলাইদহ

ভাই

তোমার ছেলের কঠিন পীড়া শুনে চিন্তিত হলুম। অস্ত্রাঘাতের কথা শুনলে ভয় হয়। তুমি তাহলে এখন অশান্তি ভোগ করচ। পুরোণো বই বিক্রী করা বিষম হাঙ্গামা আমি জানি। থাক্—ও বইগুলো আর বিক্রী করে কাজ নেই—আমি অন্য কোন উপায়ে অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা দেখ্‌বে। ও বইগুলো তোমাকেই আমি উপহার দিলুম—ওর মধ্যে কেবল গোটাকতক বই আমি নেব (সেগুলো যদি বিক্রী না হয়ে থাকে)। বলা বাহুল্য, নাসিকে এই মাঠের মধ্যে আমি আছি ভাল। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্চে মাঝে মাঝে রৌদ্র হচ্চে—আমি আমাদের একটা দীর্ঘ ঢাকা বারান্দায় বাসা বেঁধেছি—সেখেন থেকে মাঠের পরপারবর্ত্তী দূরের নীল পাহাড়গুলো এবং তার উপরকার শাদা মেঘগুলো স্পষ্ট দেখা যায়—আমাদের এই বাড়ির পাশের ক্ষেত্রে সমস্ত নিস্তব্ধ দুপুরবেলা চাষারা চাষ করতে করতে এদেশের এক প্রকার অদ্ভুত মেঠো সুরে গান করচে। আমার পিতা এখন চুঁচ্‌ড়োয় ফিরে গিয়েচেন—আমি তাঁর কাছে দিনকতক থেকে অত্যন্ত হৃদয়ের শান্তিলাভ করেছি—আমরা সমুদ্রতীরে থাকতুম এবং তাঁকে সেই সমুদ্রতীরের অস্তোন্মুখ সূর্য্যের মত বোধ হত—আমি কিছুদিন তাঁর বৃহৎ জীবনের তীরে থেকে কতকটা যেন মহত্ত্ব সঞ্চয় করতে পেরেছি। তিনি তাঁর নিজের জীবন সম্বন্ধে যে বই লিখেচেন (৫) সেটা পড়ে আশ্চর্য হতে হয়। সে বইখানি একটি পরিণত মহৎ জীবনে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। সেটা পড়লে আমার হৃদয়ে একপ্রকার অনির্দ্দেশ্য আশার সঞ্চার হয়। বাঙ্গলা ভাষায় এই একটি রীতিমত বই লেখা হল। আজ আমি বিদায় হই বিকেল হয়ে এল। তোমার ছেলে কেমন থাকে আমাকে লিখো।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

ওঁ

সোলাপুর

ভাই,

...ইতিমধ্যে আমার একখানা নাটক শেষ (৬) হয়ে গেছে। এখনো নামকরণ করে উঠতে পারি নি। আমার নিজের ভাল লাগচে—মনে হচ্ছে একটা কাজ করেছি—কিন্তু জানোই ত

আপরিতোষাদ্বিদুষাং ইত্যাদি—

তোমাদের কাছ থেকে বাহবা পেলে তবে বোঝা যাবে। এ-নাটকের গল্পটা তোমাদের কাছে কখনো করেছি কি না মনে নেই—যা হোক, গোপনে রাখলুম নইলে কৌতূহল অনেকটা চলে যাবার সম্ভাবনা। যদি ইতিমধ্যে কোন বিশেষ ব্যাঘাত না ঘটে তা হলে জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ব্বে এখেন থেকে ছাড়া হচ্চে না। এ জায়গাটা যে খুব মনোরম তা নয়—জমিতে ঘাস নেই গাছে পাতা নেই—জলাশয়ে জল নেই—লোকালয়েও অধিক লোক নেই—চারিদিক মরুভূমির মত ধূ ধূ করচে। আমার এই লেখবার ঘরের জানলার ভিতর দিয়ে কেবল প্রখর রৌদ্র ও তপ্ত বাতাস আসে, কোন সুন্দর বা বিচিত্র দৃশ্য দেখা যায় না। দেখতে দেখতে দোয়াতের কালী শুকিয়ে জমে আসে—শরীরের ঘর্ম্ম সজলাবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব্বেই শুকিয়ে যায় বোধ করি শোকের সময় অশ্রুজল একান্ত দুর্লভ হয়ে ওঠে। রচনা করবার সময় আমার কাব্যরস শুকিয়ে আসে কি না জানিনে কিন্তু আমার কালী শুকিয়ে বাস্তবিক লেখবার বড়ই ব্যাঘাত করে। সম্প্রতি একদা সন্ধেবেলায় এখানকার ইংরেজমণ্ডলীর সঙ্গে খেলবার সময় পড়ে গিয়ে পা ভেঙ্গে বসে আছি। আজকালের মধ্যে শীঘ্রই পুনশ্চ উত্থান করবার সংকল্প করচি।

রাজধানীর সংবাদ কি? দিনকতক কলকাতায় এক বেলুনবাহনের পূজো চলচিল —এখন কি রকম অবস্থা? সাহিত্য আকাশে কি কোন বায়ুবিহারী ওড়বার চেষ্টা করচে? তোমার পুঁথি-দুর্গের নতুন খবর কিছু আছে কি? এমন আরো সহস্র প্রশ্ন তোমাকে করা যায় কিন্তু জানি এর উত্তর পাবার সম্ভাবনা বিরল—অতএব ক্ষান্ত থাকা গেল।...

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

ওঁ

শিলাইদহ,

কুমারখালি

ভাই,—

কুষ্টিয়ায় প্রধানতঃ সুতো এবং কাপড়ের খুব কাটতি। কিন্তু হাতে হাতে দাম পাওয়া এখানকার কোন কারবারের প্রথাই নহে। কতকটা পরিমাণ সর্ব্বদাই পড়িয়াই থাকে এবং প্রতারণার জন্য কিঞ্চিৎ মার্জিন রাখিতেই হয়। পাইকড় সকলেই আমাদের প্রজা ও পরিচিত নহে—তবে কেহ কেহ প্রজা থাকাই সম্ভব—যাহারা আমাদের এলাকার মধ্যে বিক্রয় করে তাহাদের উপর আমাদের দৃষ্টি থাকিতে পারে, কিন্তু পাইকড় বহু দূর দূরান্তর হইতে আসে এবং নানা হাটে বাজারে বিক্রয় করে। এখানে দুর্গাচরণ সাহারা গ্র্যাহামের নিকট হইতে কেরোসিন্ লইয়া বিক্রয় করে—মাসে দুতিন গাড়ী কেরোসিন্ বিক্রয় হওয়া শক্ত নহে—কিন্তু নগদ মূল্য পায় না ও নগদ টাকা হাতে নাই বলিয়া তাহারা মাসে এক গাড়ীর বেশি আনিতেই পারে না—এবং পাইকড়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাবনা পর্য্যন্ত তাহাদের লোক গিয়া টা আদায় করিয়া তবে দ্বিতীয় গাড়ী আনিতে পারে। কলিকাতাতেও এরূপভাবে হইয়া থাকে বোধ করি। সন্ধান লইলে জানিতে পারিবে। এখানে একটি কাজ ভাল হইতে পারে। এখানকার জোলাদিগকে সূতা দাদন দিয়া তোয়ালে, ন্যাপকিন্, বিছানার চাদর, কোটের কাপড়, টেবিল ক্লথ্ প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যবহার্য দ্রব্য সস্তায় প্রস্তুত করাইয়া কলিকাতায় বিক্রয় করান যাইতে পারে। কুষ্টিয়া এই সকল কাপড় ঢাকা, গোয়ালন্দ প্রভৃতি নানা স্থানে প্রভূত পরিমাণে বিক্রয় হয়। এখানে কি কাপড় কি মূল্যে বিক্রয় হয় এবং কলকাতায় তাহার কিরূপ কাটতি হইতে পারে যদি এখানে আসিয়া যদি কোন অভিজ্ঞ লোক সন্ধান লইয়া যায় তাহা হইলে ভাল হয়। তাঁতি ও জোলাদিগকে সুতা দাদন দিবার সুবিধা এই যে, প্রথমতঃ সূতার দরের উপর যে লাভ তাহা পাওয়া যায়, তাহার পরে কাপড়ের উপর লাভটাও পাওনা হয়—এবং দাদন পাইয়া জোলা সম্ভবতঃ কাপড়ের ও দরেও [illegible] বিশেষ লাভ দিয়া থাকে। এই কাজটা যদি অবলম্বনপূর্ব্বক অল্পে অল্পে আরম্ভ করিয়া ক্রমে বিস্তৃত করিলে লাভজনক হইতে পারে এইরূপ আমার বিশ্বাস। কুষ্টিয়ার সুতা ব্যাপারীতের সময় অজস্র পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে—সেই মার্কেট, দাদন প্রভৃতি সমস্ত নিজে হস্তগত করিলে মস্ত কারবার হইতে পারে।

চিঠিটা অত্যন্ত কাজের হইল—বাজে কথা একটিও নাই। ৪ঠা আষাঢ়।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন [illegible]

৮

ওঁ

শিলাইদহ

কুমারখালি

E. B. S. R.

ভাই

সকল কাজেরই মুস্কিল এই যে, কাজে হাত না দিয়া তাহার সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ সম্পূর্ণরূপে আদায় করা যায় না—যেমন আগে সাঁতার শিখিয়া জলে নামা অসাধ্য। আমাদের কাজ সম্বন্ধে প্রথমে যাহা সন্ধান লইয়াছি এখন তার বিস্তর বিপরীত দেখা যায়। তোমাকেও এই পদ্ধতির মধ্য দিয়া যাইতে হইবে তা ছাড়া উপায় নাই। পাইকড়দের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ, কাজের কিরূপ প্রণালী, আদায়ের কিরূপ সুবিধা, লাভের কিরূপ সম্ভাবনা স্বভাবতই কিছুদিন কাজ করা ব্যতীত সম্পূর্ণ সত্যরূপে জানা অসম্ভব। সেই জন্যে প্রথমটা সাবধানে ও অল্প পরিমাণে কাজ আরম্ভ করা উচিত তাহার পর অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে কাজ ফলাও করিলে পরিতাপের বিষয় কিছুই থাকে না। মফঃস্বলে যাহা কিছু অবশ্য ব্যবহার্য সামগ্রী তাহার কারবার ধীরভাবে করিলে লোকসান হইবে না ইহা common sense [illegible]

(৫) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিত।

(৬) 'রাজা ও রাণী'। গ্রন্থাকারে প্রকাশ ২৫ শ্রাবণ ১২৯৬।

(৭) ক্রমক্রমে লিখিত। পরবর্তী পত্র দ্রষ্টব্য

লে—কিন্তু সেই ধীরতা সেই বিবেচনা কর্ম্মচারীদের সেই সততা দুর্লভ বলিয়াই অনেক সময় ঠকিতে হয়। আমি বারবার বলিয়াছি এবং এখনো বলিতেছি—লাভ লোক-সান লোকের উপরেই নির্ভর করিবে—সৎ অথচ কর্ম্মকুশল লোক সংসারে বিরল—যদি জোটাইতে পার তাহা হইলে তোমার ভাবনার কারণ নাই—এবং আমাদের দ্বারা যে কিছু সাহায্য সম্ভব তাহা পাইবে। আমাদের সরকারে যে কিছু কাগজপত্র কেরোসিন ইত্যাদি খরিদ হইয়া থাকে তাহার অর্ডর পাইতে পারিবে এবং আমাদের অধীনস্থ পাইকড়দের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে পারিব।

আমরা যে পক্ষ হইতে সাহায্য প্রত্যাশা করিতেছি তাঁহাদের সেই বিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন হইবার আর বিলম্ব কত? সে সম্বন্ধে কোনও নির্দ্দিষ্ট খবর পাওয়া গেছে কি? যেরূপ গোলমালের মধ্যে আছি তাহাতে স্বাক্ষরের স্থলে তোমার নাম লিখিয়া (৮) ঠিকানায় যে আমার নাম লিখি নাই ইহাই আমি সৌভাগ্য জ্ঞান করি।

ক্ষুব্ধ আত্মীয়দের পত্রে সংবাদ পাইলাম যে সাহিত্যের কোন গল্পে (৯) আমাকে অত্যন্ত কুৎসিত আক্রমণ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যদি তোমার কোন বন্ধুকৃত্য করিবার থাকে ত করিবে। ইতি ৭ই আষাঢ় ১৩০৬।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯

ওঁ

ভাই

আজ তোমার দুখানি চিঠি এক সঙ্গে পেলুম। আমি পরশুদিন আমাদের কালিগ্রাম পরগণার পুণ্যাহ উপলক্ষ্যে এখান থেকে রওনা হয়ে সেই দেশে যাত্রা করব। তারপর ২৬।২৭শে নাগাদ কলকাতা অঞ্চলে দুই একদিনের জন্য পদার্পণ করবার সঙ্কল্প আছে তুমি সেই সময়ে সেজেগুজে প্রস্তুত হয়ে থেকো—আমি তোমাকে অকস্মাৎ অপহরণ করে রেল গাড়িতে চাপিয়ে এই পদ্মাতীরে এনে ফেলব. কোন প্রকার বিলাপ পরিতাপ ওজর-আপত্তিতে কর্ণপাত করব না। তোমার সঙ্গে যদি আর কোন......(১০) তুমি নিয়ে এস. সেই সান্ত্বনা এবং আশ্রয়টুকু থেকে তোমাকে আমি বঞ্চিত করতে চাইনে। যদি এই উপলক্ষ্যে কুষ্টিয়া মোকামে কাজকর্ম্মের কোন সূত্রপাত করে যেতে চাও তাহলে তোমার চেয়ে আর একটি বিচক্ষণ ব্যবসায়জ্ঞ লোক এলেই ভালো হয়। তাতে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না। যাই হোক্ এই ক'টা দিন মুলতবি হল বলে তোমার এখানে আসা যেন কেঁচে না যায়। সঙ্গসুখ সম্বন্ধে কোন প্রকার লোভনীয় কথা আমি বলতে চাইনে—কিন্তু স্থানটি যে লোভনীয় হবে সে সম্বন্ধে আমি আমার সমস্ত খাতা-পত্র ও গ্রন্থাবলী সুদ্ধ জামিন থাকতে প্রস্তুত আছি।......

মানসী সমালোচনার(১১) কথাটা মনে পড়ল। প্রদীপের(১১ক) কোন হিতৈষী প্রদীপের জন্য সংগ্রহ করবার উদ্যোগে ছিলেন। আমাকে যদি না জানিয়ে ওটা ছাপিয়ে ফেল্‌তেন তা হলে বিপদেই পড়তেন।

তুমি যখন আস্‌বে এখানকার নদীর কূল-গ্রাসিনী চণ্ডীমূর্ত্তি দেখ্‌তে পাবে। এবারে জল অত্যন্ত বেড়েছে—তীরের সঙ্গে এরই মধ্যে প্রায় সমান হয়ে এসেছে। দুইদিকের উপকূলে স্রোতের বেগ আর সামলাতে পারচে না—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়চে। ইতি(১২).........শে আষাঢ় ১৩০৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

ভাই

বলুর (১৩) মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতায় থাকা আমার পক্ষে কষ্টকর হইয়াছে। বিশেষতঃ আমার স্ত্রী শিলাইদহে অত্যন্ত শোক অনুভব করিতেছেন, বলুর প্রতি তাঁহার একান্ত স্নেহ ছিল। ওদিকে বেলার অসুখের খবর পাইয়াছি।

এখন বিষয়জালের কর্ম্মফাঁসটি আমার কণ্ঠ হইতে সত্বর নামিলে আমি একবার সহর হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে বাহির হইতে চাই। এ সম্বন্ধে একবার দেখা করিবে? যদি না পার ত পত্রে ভাল মন্দ যাহা হয় লিখিয়া পাঠাইয়ো—সংবাদের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

ওঁ

ভাই

এতদিনে আমার পূর্ব্বপত্র নিশ্চয় পাইয়াছ। বিল এবং বই যাহার প্রাপ্য তাহারই নিকট পাঠাইয়া দিবে। তোমাকে আর একটি কাজ করিতে হইবে। Thacker অথবা Newmanএর ওখানে যদি Mrs. Meynellএর Colour of Life এবং Children নামক দুইখানা বই থাকে তবে আমাকে পাঠাইয়া দিতে বলিয়া দিবে? যদি না থাকে ত Order দিতে হইবে। প্রকাশক John Lane. The Bodley Head....

খবরাদি পূর্ব্ববৎ—কেবল আকাশ পূর্ব্বের চেয়ে পরিষ্কার এবং রৌদ্রের বর্ণে সোনার আভা। আমন ধানের শীষ দেখা দিয়াছে এবং চাষারা শর্ষে বুনিবার উদ্যোগ করিতেছে। ইতি ৬ই আশ্বিন শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১২

ওঁ

ভাই

সাধুঃ সাধুঃ তুমি যে অন্যের বুদ্ধির উপর নির্ভর না করে নিজের বুদ্ধি চালনা করেছ সে জন্য তোমাকে ধন্য!

এখন, তার পর?

এমন সুন্দর দিন হয়েছে যে, সে আর বর্ণনা করবার যো নেই। আশঙ্কা হচ্ছে পুনর্ব্বার বর্ষণ আরম্ভ না হলে তুমি এখানে পদকর্দ্দম দেবে না।

কবি দেবেন্দ্র সেন আমার আতিথ্য নিতে আস্‌চেন—আশা করি শিলাইদহ তাঁকে পর মনে করে মেঘের ঘোমটা টেনে বস্‌বে না।

কিন্তু দিন যতই সুন্দর হোক্ আজ—আজ অন্য কথা কিছু লিখব না।

এইবার কথাটাকে তার শুভ পরিণামের দিকে সত্বর অগ্রসর করিয়ে দাও। এজন্য আমার কি কলকাতায় যাওয়া আবশ্যক হবে?

শরৎ(১৪) কবে কলকাতায় আসবেন জান কি?

কিন্তু কি সুন্দর আলো, কি সুন্দর সবুজ, কি সুন্দর হাওয়া, কি অপর্য্যাপ্ত নিষ্কলতা এবং উজ্জ্বলতা, জলস্থল আকাশের কি শুচি-স্নাত পরিপূর্ণ শ্রী! সমস্তই উদার অজস্র অপরিমেয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩

ওঁ

ভাই,

তোমার আজকের চিঠি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল। আমি ক'দিন চিন্তায় ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলুম। এবার তুমি যাহোক্ একটা সঙ্গতি করে দিয়ো যাতে ভবিষ্যতে হঠাৎ নাড়া খেয়ে নাড়ী চমকে না ওঠে। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে গেলে পাছে সেটা শুষ্ক লৌকিকতার শূন্যগর্ভ কথার মত শোনায় সেই জন্যে নীরব আছি—কিন্তু এটুকু বলতে দোষ নেই যে তুমি আমার আয়ুবৃদ্ধি করে দিয়েছ—কিছুকাল থেকে অহরহ চিন্তার জ্বলুনিতে আমার তেল ফুরিয়ে আসছিল। জরুরির আহ্বানে আমাকে ডিসেম্বরের প্রারম্ভে কলকাতায় ছুটতে হবে সেই সময়ে তোমাকে এখানকার আবশ্যক এবং অনাবশ্যক সমস্ত খবর দিতে পারব। শৈলেশ কয়েকদিন এখানে যাপন করচে—কাল সে চলে যাবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪

ওঁ

ভাই—

তাই ত! অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আমার কোন অভিমান কোন কালে নেই, কিন্তু চোদ্দটা লাইনের মধ্যে যেটুকু গণিতশাস্ত্র

---

(৮) পূর্ব্বপত্রের স্বাক্ষর দ্রষ্টব্য
(৯) সাহিত্য, বৈশাখ ১৩০৬
(১০) এই স্থলে পত্র কীটদষ্ট

(১১) প্রিয়নাথ সেন লিখিত। দ্রষ্টব্য 'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি,' প্রিয়নাথ সেন
(১১ক) অধুনালুপ্ত মাসিকপত্র
(১২) পত্র কীটদষ্ট
(১৩) বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০—১৮৯৯)

(১৪) জ্যেষ্ঠ জামাতা শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। বিবাহ, ১৯০০ সালে। এই সময় বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

আছে, তাতেও যে আমার স্খলন হবে এ আমি কল্পনা করিনি। সনেট্‌টিতে অজ্ঞাতসারে একটি লাইন ফাঁকি দিয়েছিলেম। সেটুকু অদ্য এইমাত্র পরিশোধ করতে বসে আগাগোড়া কতক কতক বদলে গেল। আর কিছু না, একটা লাইন লিখে শেষকালে লেখবার নেশা জেগে উঠল—খুন চড়ে যাওয়ার মত একেবারে কলম হাতে ভীষণবেগে ran amuck। যদি ভাল লাগেত এই পাঠান্তর রেখো নইলে নূতন লাইনটুকু যোগ করে পুরানো পাঠ চালিয়ে দিতে পার। যথাভিরুচি।(১৫) ক্ষণিকার জন্য তাড়া লাগিয়ে হয়রাণ হলুম—নেপথ্য বিধানেই বসন্তের রাত্রি কেটে গেল—আমার নটী যখন রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করবেন, তখন বাদলের দৌরাত্ম্যে তার বাসন্তী রঙের অতি ফুর্‌ফুরে উত্তরীটির বাহার থাকে কি না থাকে! দক্ষিণে বাতাসের মধ্যে ওঁকে না বের করতে পারলে অন্যায় হবে। ইতি ২৯শে বৈশাখ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রত্যুপহার।

অচির বসন্ত হায় এল, গেল চলে,
এবার কিছু কি কবি করিলে সঞ্চয়?
ভরিলে কি কল্পনারে কোমল কৌশলে
বাসন্তী সোনার বর্ণ নবীন বলয়,
রচিয়া [illegible] ছন্দে চম্পকের দলে,
লুণ্ঠিয়া ফাল্গুন রাতে নিকুঞ্জ-নিলয়?
আঁকিলে অলক্তরাগ পাদপদ্মতলে
তুলি লয়ে কিংশুকের রক্ত কিশলয়?

এ বসন্তে প্রিয়া তব পূর্ণিমা-নিশীথে
নব-মল্লিকার মালা জড়াইয়া কেশে
তোমার আকাঙ্ক্ষা-দীপ্ত অতৃপ্ত আঁখিতে
যে দৃষ্টি হানিয়াছিল একটি নিমেষে
সে কি রাখ নাই গেঁথে অক্ষয় সঙ্গীতে?
সে কি গেছে চ্যুতপুষ্প-সৌরভের দেশে?

১৫

ওঁ

ভাই,

চিঠি লেখা হয়েছে? কোন খবর আছে? আজ কি আসচ? আমার কাল সকালে যাওয়াই স্থির। ক্ষণিকা(১৫ক) শেষ করলে? সুরেশ-বাবুকে(১৫খ) ও নগেন্দ্রবাবুকে(১৫গ) দিয়েছ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬

ওঁ

ভাই,

...কাগজ সম্বন্ধে সমাজওয়ালারা কেন চন্দ্র ব্রাদার্সের ওখানে যায় নি প্রশ্ন করে সেই 'উদ্যোগ' ব্রাহ্মণটিকে পত্র লিখেছি—আগামী-কল্য নাগাদ উত্তর পেলে সমস্ত অবস্থা অবগত হওয়া যাবে।

এখানে কৃষ্ণপক্ষের সঙ্গে সঙ্গে ঝড়বৃষ্টির সমাগম হয়েছে—পূর্ণচন্দ্রাননা গৌরী হঠাৎ একদিনেই নীলনীরদবরণী শ্যামামূর্তি ধারণ করেচেন। তোমাকে যে দেবী কোন্ মূর্ত্তিতে দর্শন দেবেন কিছুই বলা যায় না।

কিন্তু ক্ষণিকা সমালোচনার জন্যে তুমি চিন্তা করচ কেন? লোককে বোঝাবার চেষ্টা মাত্র কোরো না—ভাল লাগা আবার বোঝাবে কি? কেবল যেখানটা তোমার ভাল লাগ্‌চ সেই জায়গাটাতে গলা ছেড়ে বলে উঠো—বাঃ বেশ লাগচে! অমনি পাঠকেরাও বলবে—বেশ লাগচে। আগুনটা একবার ধরিয়ে দিলেই কাঠ খড় অঙ্গার—সমস্ত আপনি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে. নইলে তর্কশাস্ত্রের সহস্র লগুড়াঘাতে তাদের চিরান্ধকার ঘোচে না। তুমি আমার কথা একেবারে বিস্মৃত হয়ে চক্ষু বুজে লিখে যেয়ো।

লোকেন(১৫ঘ) আমাকে দিনকতকের জন্যে খুলনায় যেতে পীড়াপীড়ি লাগিয়েছে—সে যেরকম কড়া হাকিম, হয়ত না নিয়ে গিয়ে ছাড়বে না।

কপিরাইট? শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭

ভাই

তবে বৃহস্পতিবার নাগাদ দর্শন পাবার আশা আছে। কিন্তু অনেক ঠেকে ঠেকে আজকাল আমি মনকে এমনি সায়েস্তা করে নিয়েছি যে, আশার কারণ থাক্‌লেও তাকে আশা করতে দিইনে—যদি বৃহস্পতিবারের মধ্যে তুমি না এস তা হলে আমি প্রাজ্ঞজনোচিত সুগম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলব—সংসারের এই রকমই নিয়ম—যা অভিলষিত তা সকল সময়ে সুলভ নয় বলে দ্বিগুণ অভিলষিত—যা অত্যন্ত সম্ভবপর তারও স্থিরনিশ্চয়তা না থাকাতে সংসার চিরদিন বিচিত্র হয়ে আছে এবং অধিকাংশ জিনিষ আমাদের প্ল্যান্ অনুসারে ঘটে না বলেই যা ঘটে তা আমাদের চিত্তের ঔৎসুক্যকে অহরহ জাগ্রত করে রেখেছে' কিন্তু তাই বলে বৃহস্পতিবারের মধ্যে তোমার না আস্‌বার কোনও ওজর আমি সহজে গ্রাহ্য করব না তাও বলে রাখ্‌চি।

আমার কাপি রাইট বিক্রি করার কথাটা চিন্তা কোরো এবং পার ত চেষ্টাও কোরো। গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিসর্জ্জন ও রাজা ও রাণী স্বতন্ত্র আকারে বাজারে আছে এবং বর্তমান সংস্করণ গুরুদাসকে বিক্রয় করেছি—তেমনি কণিকা থেকে ক্ষণিকা পর্যন্ত পাঁচখানি সম্পূর্ণ নূতন বই আমার হাতেই আছে এবং ব্যবস্থা করে বিক্রি করতে পারলে পূজার কাছাকাছি কিছু ঘরে আসবার সম্ভব। In fact গুরুদাস এ বইগুলি জন্যে বারম্বার দূত প্রেরণ করে কিন্তু লোভ সম্বরণ করে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি।

তোমার দ্বিতীয় পাত্রটির সংবাদ আমার মন্দ লাগচে না। তার খবরটা বোধ হয় কাল পর্শু পাওয়া যাবে। কি বল?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ প্রদীপ কি নির্ব্বাপিত প্রভাতের(১৫ঙ) জন্যে কাল একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছি—নাম "চুম্বকশৈল।"

১৮

ওঁ

ভাই,

তোমার বই দুটির সঙ্গে সাধুবাদ প্রেরণ করচি। W. Harlandএর বইখানিতে যৌবন এবং বসন্ত টগ্‌বগ্ করচে—H. Spencerএর গ্রন্থে বার্দ্ধক্য পরিপক্ব পরিণত। দুটোই যে আমি একসঙ্গে পড়তে পারলুম তার থেকে প্রমাণ হচ্চে আমি এমন একটি বয়সে এসে পৌঁছেছি—যার এক সীমানায় যৌবনের রেখা ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসচে এবং আর এক সীমানায় বার্ধক্য ক্রমে শুভ্র রেখায় স্ফুটতর হয়ে উঠচে।

দীনেশবাবু(১৬) এসেছিলেন তাঁরি হাতে বই দুটি দিলুম।

আমি সন্তোষের ওখানে নিমন্ত্রিত বটে কিন্তু যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। এখানে আমি কর্ম এবং বিশ্রাম উভয়ের দ্বারাই বদ্ধ। যাবার ইচ্ছা ছিল, কেবল নিমন্ত্রণের প্রলোভনে নয়—তোমার কাছ থেকে পাঠ্য বই দুই একখানা উদ্ধার করে আনবার জন্যে। যা হোক বিলম্বে বা অবিলম্বে কোন না কো

(১৫) প্রিয়নাথ সেন লিখিত নিম্নমুদ্রিত কবিতা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি লেখেন। দুইটি কবিতাই ১৩০৭ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'প্রদীপ' পত্রে পাশাপাশি ছাপা হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির প্রদীপে মুদ্রিত পাঠ (রবীন্দ্র-রচনাবলী দশম খণ্ডে 'উৎসর্গ' গ্রন্থের সংযোজন দ্রষ্টব্য), এই চিঠিতে মুদ্রিত পাঠ হইতে স্বতন্ত্র।

বসন্ত অন্তে

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রিয়বরেষু

অচির বসন্ত হায় এল—গেল চলে—
নিবে গেল কোকিলের দীপক-পঞ্চম,
ভঙ্গুর কুসুম-শোভা ভেঙে পড়ে ঢলে,
প্রভঞ্জনে পরিণত—উৎপাত বিষম—
অলস—পরশ-মধু মলয়ার বায়!
যায় যদি যাক চলে ক্ষণিকের স্নেহ।
অফুরাণ ফুলবীথি কোথা তাহা হায়!
এ যে শুধু ছলনার মরীচিকা গেহ।
যে মদিরা পান তরে প্রাণ তৃষাতুর
কোথা তাহা?—কোথা জ্বলন্ত যৌবনা তব
শোভনা প্রতিভা কবি? বিশাল চিকুর
আবরে প্রকাশে যার তনুর বিভব—
নগ্ন দেহ কম্প্র বক্ষ—মদির নয়ন—
ঢালুক অশেষ নেশা—পুলক-দহন।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

(১৫ক) গ্রন্থকারে প্রকাশ, জুলাই ১৯০০

(১৫খ) "সাহিত্য"-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি?

(১৫গ) "প্রদীপ"-সম্পাদক ও ঔপন্যাসিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত?

(১৫ঘ) সুহৃৎ লোকেন্দ্রনাথ পালিত

(১৫ঙ) নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত পত্রিকা

(১৬) দীনেশচন্দ্র সেন

কর্মদায়ে কলকাতায় যেতেই হবে তখন দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করবার অবসর হবে।

এখন এখানে—

ভরা বাদর, মাহ ভাদর।

তোমার
রবি

১৯

ওঁ

ভাই

শিলাইদহ,
১লা ভাদ্র

ভাই

অনেককাল পরে চিঠি পেলুম। আমি আশংকা করেছিলেম, হয় তুমি, নয় তোমার পুত্রকলত্রের কেউ পীড়িত। আজ সেই সংবাদটা নেবার জন্যে দোয়াত কলম গুছিয়ে বসেছিলুম এমন সময় ডাক এসে উপস্থিত।

শরতের আশা তুমি এখনো ছাড়নি? আমি ত মেয়ে অনেকদিন উৎপাটিত করে ফেলেছি। হৃদয়ের মধ্যেও একটা ইকনমির দরকার—অনেক জিনিষকে সেখানে সযত্নে পোষণ করতে হয়—বাজে জিনিষকে খোরাক যোগাবার মত এমন অপরিমিত রক্তভাণ্ডার কোথায়? অল্প বয়সে যখন রক্ত বেশি থাকে এবং ভিড় কম থাকে তখন বাজে খরচ পোষায়; কিন্তু আজকার বয়োধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে একটু বিশেষ সাবধানী হতে হয়েছে—এখন আশা আত্মীয়তাচিন্তা চেষ্টা সমস্ত বেছে বুঝে ছেঁটে ছুঁটে নিজের সাধ্য এবং সহ্যের মধ্যে আনা দরকার। যেমন পাকা ব্যবসায়ী(১৬ক) মাল গোড়াতেই বেচে ফেলে দেয় আমি তেমনি নিষ্ফলতার আশংকামাত্র থাকলে আশাকে হৃদয় থেকে দূর করতে চেষ্টা করি কিন্তু সকল সময়ে যে কৃতকার্য্য হই এমন গর্ব্ব করতে পারি নে।

সুরেন(১৬গ) বোধ হয় আসচে সোমবার এখানে উপস্থিত হবে। তার আগে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করবে লিখেছে।

সমস্ত আধিব্যাধিজাল থেকে তুমি কবে মুক্ত হবে? তোমাকে উদ্ধার করবার শক্তি যদি আমার হাতে থাকে তবে তার উপরে তুমি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পার। কিন্তু হায়, নিজের ক্ষমতার কথা যখন আলোচনা করে দেখি তখন অন্যকে আশ্বাস দেবার ভরসা থাকে না। কেবল এইটুকুমাত্র আশা করি যে, কোন এক সময়ে বন্ধুকৃত্য করবার উপযোগী সামর্থ্য হতেও পারে।

যদি বন্ধন থেকে খালাস পেয়ে বুধবারে আসতে পার তাহলে আর দ্বিধামাত্র কোরো না।

পণ্ডিত মহাশয় তোমার সঙ্গে আলাপ করে অত্যন্ত আপ্যায়িত হয়েছেন—তিনি তোমার গভীর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সরলতা, চরিত্রমাধুরী, সদাশয়তা, রসজ্ঞতা ইত্যাদি অনেক প্রকার গুণের মিশ্রণ দেখে তোমার সঙ্গসুখের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে পড়েছেন।

কাল প্রমথবাবুর(১৭) একখানি পত্র পাওয়া গেল। তিনি তোমার সঙ্গে শীঘ্র সাক্ষাৎ করতে যাবেন লিখেছেন। তোমার নিজের নানা প্রকার দুশ্চিন্তা ও কাজের ভিড়ের মধ্যেও তুমি বিচিত্র লোককে কেমন করে আকর্ষণ করে আনতে পার আমি ত বুঝতে পারি নে। চিত্তকে নীরস করে শুষে ফেলবার পক্ষে বৈষয়িক ঝঞ্ঝাটের মত এমন জিনিষ আর কিছু নেই।

Moliere রচিত L'Avare নামক একটি নাটক Fasnach দ্বারা Edited বেলার পড়ার জন্যে চাই—Thackerএর ওখান থেকে আমার হয়ে অর্ডার দিয়ে দেবে? ভাল nursingএর বই যদি না পাও ত আপাতত না হলেও চলে।

বেলা অনেক হল। এখন নাইতে খেতে যাওয়া যাক্—নইলে নির্দোষী নিরপরাধী তুমি সুদ্ধ গৃহিণীর বিদ্বেষের ভাগী হবে। তুমি এতক্ষণে আপিসের বর্মচর্ম পরে আদালতের রণাঙ্গণে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০

৪ঠা ফাল্গুন
শিলাইদহ

ওঁ

ভাই,

আমার পক্ষে এখন যাওয়া অসম্ভব—কারণ পরিজনবর্গকে পদ্মায় ভাসিয়ে দিয়ে আমার কোথাও নড়া অসম্ভব। তোমার গৃহিণীকে বোলো ঝড়ঝাপটের বিরুদ্ধে আমি তোমার জামীন হতে রাজী আছি। যেখানে এবার আড্ডা নিয়েছি এখানে ঝড়ের প্রবেশাধিকার Strictly prohibited। স্থানটি দেখলে রবিনসন ক্রুসোর প্রতি আর তোমার কখনো ঈর্ষ্যার উদয় হবে না। ইতস্ততঃ করে আসতে বিলম্ব কোরো না। এই চিঠির উত্তরেই দিন-স্থির করে লিখো—কারণ আমাকে কুষ্টিয়ায় গিয়ে তোমাকে বহন করে আনতে হবে। নিশ্চয়, বিলম্ব কোরো না।

তোমার চিঠিতে অন্য সুখ সমাচারের আভাস পেয়ে মনটা পুলকিত আছে—তার বিস্তারিত বিবরণ তুমি একেবারে দেবে না বলেই বোধ হচ্চে—কৃপণের মত এক এক কড়ি করে বের করবে! যদি এলাকার মধ্যে তোমাকে হাতে পাই, তাহলে দস্যুবৃত্তি করে একদমে আদায় করে নেব।

আমি এখন আর শীঘ্র পদ্মার কোল ছাড়চি নে। অন্ততঃ বর্ষা পর্যন্ত এখানে কাটাব বলে মন স্থির করে নোঙর ফেলে শিকল বেঁধে ঘরকন্না ফেঁদে বসেছি। অতএব—

এস এস বঁধু এস, অর্ধেক চরে বস,
নৌকা ভরিয়া তোমায় রাখি।

সঙ্গিনী পড়েছি—খাঁটি সোনা নয়, বিস্তর খাদ আছে—দেখা হলে আলোচনা হবে।

প্র......বাবু এখন বৈদ্যনাথের নিকটবর্তী সপ্তম স্বর্গে আছেন—তাঁহার শ্যালিকাপতি গদভটা কোন মাঠে ঘাস খাইয়া চোখ বুজিয়া জাওর কাটচে (গাধা বুঝি জাওর কাটে না—ভুল হল) আমি তাই ভাবি! সে লোকটার উপরে আমার উত্তরোত্তর অশ্রদ্ধা হচ্চে। আমি আজ প্র......বাবুর সুখালসগদ্গদ একখানি চিঠি পেয়েছি।

এখান থেকে পোষ্টাপিস্ দূরে পরপারে—অতএব শীঘ্র শেষ করি। তুমি অবিলম্বে আসবার ব্যবস্থা কোরো।

বিবাহের দিন কবে?

তোমার শ্রীর

২১

ওঁ

ভাই

কাল রাত্রে তোমাকে একটা চিঠি লিখেছি আজ তার একটা পরিশিষ্ট দিচ্ছি দুটোই এক সঙ্গে পাবে।...

কাল আমরা পদ্মার আর এক কোলে যাব। ঝড়ের তাড়নায় পদ্মার এক কোল থেকে অন্য কোলে আশ্রয় নিতে হচ্চে—দেনার বিপ্লবে এক মহাজনের হাত থেকে অন্য মহাজনের হাতে যাওয়ার মত। আশা করচি নৌকাডুবি হবে না।

conquering heroর মত তুমি এখানে চলে এস—অন্য কোন বাধার প্রতি দৃক্পাত মাত্র কোরো না। ইতি ১লা চৈত্র।

তোমার
রবীন্দ্র

২২

ওঁ

ভাই,

পদ্মার এ প্রান্ত থেকেও তাড়ালে! মধ্যাহ্নে উত্তপ্ত বালু উড়ে আচ্ছন্ন করে দিচ্চে এবং এখানকার স্রোতহীন বদ্ধ [জল] ক্রমে দূষিত ও অস্বাস্থ্যকর হবার উপক্রম করচে। আমি তোমাকে আহারান্তে লিখতে বসেছি—ধূলি-ধ্বজা উড়িয়ে অগ্নিশ্বাস বাতাস গর্জন করে ছুটে আসচে—জল চঞ্চল হয়ে উঠেছে। প্রজারা পদ্মা থেকে তীরে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্যে আজ প্রাতে বহুল অনুনয় করে গেছে। উঠতে হল। চৈত্রের মাঝামাঝি হয়ে এল—এখন আর এই বালুতটে বাস সহ্য হবে না। তুমি কেবল দেরি করে করে পদ্মার আতিথ্য থেকে বঞ্চিত হলে—অন্ততঃ আর পনেরো দিন আগে তোমার আসা উচিত ছিল। যতদিন সম্ভব ততদিন টেনে-টুনে আমরা পদ্মার আশ্রয় ছাড়িনি—এখন নিতান্তই বিদায়ের সময় এসেছে। সেজন্যে তুমি রাগ করে এখানে আসবার সংকল্প পরিত্যাগ করে বোসো না। শিলাইদহে বসন্ত শুক্লরজনীর শোভাটা একবার দেখে যেয়ো।

তোমারই শ্রী..

(১৬ক) পত্রকীটদষ্ট
(১৬গ) ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৭) কবি শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী

২৩

ওঁ

ভাই,

...আমি স্বভাবতঃ তোমার চেয়ে কিছুমাত্র কম অধীর নই—কিন্তু আজকাল অনিবার্য বাধা বা অকৃতার্থতার কাছে ধৈর্য্যাবলম্বন করে থাকতে চেষ্টা করি—কখন কখন কতক কতক সফল হয়ে থাকি—অকারণ দাহ সৃষ্টি করে জীবনের তেল অনাবশ্যক পুড়িয়ে ফেলতে আর প্রবৃত্তি হয় না—তেল অনেকটা নেবে এসেছে, পলতেও অনেকটা পুড়ে এসেছে—এখন তেলের সঙ্গে অনেকটা পরিমাণে জল মিশিয়ে ঠাণ্ডা না রাখলে আর বাঁচাও নেই।

আজ শৈলেশ(১৮) আসবার কথা আছে—তাকে সবিনয়ে বঙ্গদর্শন থেকে বিরত করবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছি—হতভাগ্য দেশে 'প্লেগ' বাড়চে। এর উপর কাগজ বাড়তে দেওয়া গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং। এখন দুর্ভিক্ষ এবং মারীর হাত থেকে প্রাণ বাঁচাবার কাল—এখন কে বসে বসে মাথামুণ্ডু রচনা করবে—আর কেইবা বসে বসে মাথামুণ্ডু পড়বে?

তোমার আসবার আশা ছেড়ে বসে আছি। বসন্তশুক্লরজনী উত্তরোত্তর পূর্ণতা প্রাপ্ত হচ্চে। ইতি—ক'য়ই চৈত্র?

তোমার রবি

২৪

ভাই

কাল দের হয়ে গেছে—আজ আর ঝগড়া করচি নে। তুমি নিশ্চয় এসো কিন্তু রবিবারে এসো না; কারণ ষ্টীমার নেই, মাঝে মাঝে বৃষ্টি বাদলাও হচ্চে এ সময়ে তোমাকে নৌকায় করে শিলাইদহে আনার প্রস্তাব করতে চাইনে। শনিবারে এলেই ভাল করতে কিন্তু এখন সে নিয়ে আক্ষেপ করা মিথ্যা। সোমবারে এসে মঙ্গলবারে যেতে পার। সব চেয়ে ভাল হয়, যদি রবিবার রাত্রের গাড়িতে গোয়ালন্দ মেলে আসতে পার—তাহলে সোমবারে সকালে ষ্টীমার সময় এখানে পৌঁছবে—সমস্ত দিন আলোচনার অবকাশ পাওয়া যাবে। নইলে সোমবারে ছাড়লে এখানে আসতে সেই বেলা ৪টে পাঁচটা হয়ে যাবে। সোমবার ভোরে কুষ্টিয়া পৌঁছবে তখন আমার শ্যালক দলবল সহ তোমাকে অভ্যর্থনা করে ষ্টীমারে তুলে শিলাইদহে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে যাবে—কোন চিন্তার কারণ থাকবে না। তুমি যদি দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাত্রা কর—রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত হবে না—তোমাকে ষ্টেশনে নগেন্দ্র(১৯) জাগিয়ে টেনে বের করবে। আমার পত্র পেয়েই যদি উত্তর দাও রবিবারে পাব, সোমবারে তোমার জন্যে বন্দোবস্ত করা সহজ হবে। (১৯ক)—সম্বন্ধে মোকাবিলায় সমস্ত পরামর্শ করব। শ্যালকের সঙ্গে কারবার সম্বন্ধে পরামর্শও হতে পারবে। কি বল? ইতি

তোমার রবি

২৫

ওঁ

ভাই,

তুমি ত আমাকে কলকাতায় যাবার জন্যে লিখেছ। আমিও অনেকদিন থেকে যাব যাব করচি, কিন্তু প্লেগের ভয়ে গৃহিণী যেতে দিচ্চেন না। আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতেই দুজন মেথরের প্লেগ হয়েছে এ অবস্থায় কোন জরুরী কাজের ওজর দেখিয়ে যে আমি ছুটি পাব এমন আশামাত্র নেই। চেষ্টা করে অবশেষে ক্ষান্ত হয়েছি। পত্র দ্বারা যতদূর হতে পারে সেই উদ্যোগেই আছি। বোধ হয় কাল অথবা পরশু একটা উত্তর পাব। সর্ম্ময় খুব খারাপ যাচ্চে।

প্লেগটাকে কোনমতে ঘরে ঢুকতে দিয়ো না—তোমার সভায় বেগার কাজের উমেদার আনাগোনা করে—সেই সঙ্গে ইনিও যেন গিয়ে উপস্থিত না হন। জোড়াসাঁকোর মত সুরক্ষিত জায়গায় যদি এর গতিবিধি ঘটে তাহলে তোমার বাড়ীর জন্য বিশেষরূপ আশংকার কারণ মনে উদয় হয়।

আজ তবে স্নান করতে যাই। বেলা হয়ে যাচ্চে।

তোমার রবি

২৬

ওঁ

ভাই

আজ শনিবার। তুমি যদি সোমবার নিশ্চয় এস তাহলে আশা করি আগামীকাল খবর পাবই। কারণ, তোমাকে কুষ্টিয়ায় ভোজন করিয়ে সেখান থেকে আনাতে চাই।

সেই পুরাতন শিলাইদহের ঘরে বসে চিঠি লিখ্‌চি। আজ সকালে চলে এসেছি। সেখানে সকলের শরীর মন পীড়িত হতে আরম্ভ করেছিল। গরমটাও ক্রমে হঠাৎ বেড়ে উঠতে লাগল—ঝড়ের আশংকাও আকাশের এ কোণে ও কোণে দেখা দিতে লাগল—আমলাবৃন্দ এবং প্রজাবর্গও অনুনয় আরম্ভ করে দিলে—দস্যুভয়েরও অল্পস্বল্প সূচনা হল—অতএব আর অপেক্ষা করতে পারলেম না।

শুক্লপক্ষ অবসান হবার পূর্বেই শিলাইদহে তোমার অভ্যুদয় হবে এই রকম আশা করা যাচ্চে।...

আমাদের যোড়াসাঁকোর গলিতেই দুজন লোক প্লেগে মারা গেছে এবং দুজন মুমূর্ষু—সে জন্যে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। তোমাদের পাড়ার কি রকম অবস্থা?

...চিরকুমার সভাটা(২০) মনে করচি, আজই লিখে একেবারে ইতি করে দেব। তা হলে একটা বড় ভূত আমার কাঁধ থেকে নেবে যাবে। চৈত্রের ভারতী পেয়েছ বোধ হয়।

শ্রীশবাবু পালামৌ থেকে বঙ্গদর্শনের তাগিদ লাগিয়েছেন—আমি কোথায় পালামু? দুই ভাইয়ে মিলে নিকটে এবং দূরে থেকে আক্রমণ করবে—এবারে বোধহয় মরণং ধ্রুবং।

তোমার রবি

২৭

ওঁ

ভাই,

তুমি যে সময় এখানে এসে কিছুকাল নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পার সেই সময়েই এসো। পূজার পরে এখানে সময়টাও বোধ হয় ভাল। তখন নদীচরে কাশস্তবক এবং ক্ষেতের মধ্যে শালীমঞ্জরী দেখা দেবে—আকাশ নির্মল এবং বাতাস সুখসেব্য হয়ে উঠবে।

তোমার জন্য আমার যে ব্যয় ও আয়োজন ব্যর্থ হয়েছে তা এত গুরুতর নয় যে সেটা বন্ধুর সঙ্গে বিবাদের উপলক্ষ্যস্বরূপে গণ্য হতে পারে।

বিনোদিনীর(২১) সঙ্গে আমার দীর্ঘ বিচ্ছেদ চলচে। ছোটখাট নানা ব্যাপারে ব্যস্ত আছি। এখানকার খবর সমস্ত ভাল।

এখানে তুমি যখন আসবে রাত্রের গোয়ালন্দ মেলযোগেই এসো—তাহলে ষ্টীমার পাবে—নইলে বড় অসুবিধা। নৌকায় এত দীর্ঘকাল লাগে যে, তার চেয়ে ট্রেণে রাত্রিজাগরণের দুঃখ অনেক সংক্ষিপ্ত।

"প্রদীপ" লিখেছে যে তুমি সমস্ত প্রুফ সংশোধন করে দিয়েছ। ইতি—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮

ওঁ

ভাই

বিনোদিনীকে লইয়াই ত পড়িয়াছি। তাহার একটা সদ্গতি না করিতে পারিলে আমার ত নিস্কৃতি নাই। এই অপরিণত অবস্থায় ঐ গল্পটাকে কোন কাগজে দিতে আমার একেবারে ইচ্ছা নয়। গ্রন্থ আকারে সম্পূর্ণভাবে বাহির হইলেই আমার মনঃপূত হয়। কিন্তু একদিকে শৈলেশের তাড়না অপর দিকে অর্থাভাবেরও তাড়া আছে—তাই অপেক্ষা করা কঠিন হইয়াছে। গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া গোটা সাতেক পরিচ্ছেদ শেষ করিয়াছি—বিনোদিনী সবে রঙ্গভূমিতে পদার্পণ করিতেছে মাত্র। এটা যদি শৈলেশকে দিতে হয় তবে সেই সঙ্গে আরেকটা গল্প(২১ক) ভারতীকে দিতেই হইবে—সে আমার একটা উদ্বেগের কারণ রহিয়াছে। গল্পের প্লট অনেকগুলাই মাথায় আছে। তাহার মধ্যে দুই একটা ফুটিয়া বাহির হইয়া আসিবার জন্য ক্ষণে ক্ষণে

(১৮) শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সহকারী সম্পাদক

(১৯) শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, শ্যালক

(১৯ক) পত্র কীটদষ্ট

(২০) প্রকাশ, ভারতী ১৩০৭—১৩০৮

(২১) 'চোখের বালি' উপন্যাসের চরিত্র—সম্ভবত ঐ উপন্যাসের পূর্বকল্পিত নাম। চোখের বালি ১৩০৮—৯ সালে নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়।

(২১ক) ভারতী ১৩০৮ বৈশাখ-অগ্রহায়ণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' প্রকাশিত হয়।

মাথার খুলির মধ্যে ঠোকর মারিতেছে—কিন্তু সময় নাই—মনের শান্তি নাই। লোকেনের চিঠি পাই নাই—সে যে কলকাতার মায়া কাটাইয়া এখানে আসিবে এমন আশা হয় না—তবে যদি দুদিনের মত উঁকি দিয়া যাইতে পারে। তোমার গুড় সংগ্রহ হইয়াছে, এখানকার নায়েব বোধ হয় কাল কলিকাতায় যাইবে—তাহার হাত দিয়াই পাঠাইয়া দিব।

আজকাল তোমাদের সংবাদটা ঘনঘনই প্রার্থনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

তোমার রঃ

২৯

ওঁ

ভ্রাতঃ

আমাকে তুমি আদর্শচরিত্র কল্পনা করিয়াছিলে—এরূপ অসংগত কল্পনা আঘাত পাইতে বাধ্য। আমি বিনয়ের আড়ম্বর করিতে ইচ্ছা করি না কিন্তু আমার চরিত্রে নানা ছিদ্র আছে তাহা কোন কালে আমি অস্বীকার করিতে পারি না। উন্নত আদর্শের প্রতি হৃদয়ের যতটা আকর্ষণ আছে ততটা বল নাই একথা আমাকে যে জানে সেই বুঝিতে পারে। ঈশ্বরের মধ্যে আমি সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি এইটুকু মাত্র বলিতে পারি কিন্তু নিজেকে ভুল বুঝিতে ও অন্যকে ভুল বুঝাইতে চাই না। এখন আমি নিজেকে নিভৃতে রাখিতে ইচ্ছা করি। যদি যথাস্থানে হৃদয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া বল লাভ করিতে পারি তবে সংসার কোলাহলের মাঝখানে নিজের চরিত্রের দ্বারা এবং ঈশ্বরের আদর্শ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া শান্তি প্রীতি ও মঙ্গলের মধ্যে সহজে বাস করিতে পারিব। এখন আমি আত্মরক্ষা এবং আত্মস্থিতিসাধনে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিয়াছি। এখন আমি যত্ন করিয়া সাংসারিক সমস্ত ক্ষোভ মনের চতুঃসীমা হইতে দূর করিতে বসিয়াছি। এখন তোমাদের সঙ্গে আমার যেটুকু বিচ্ছেদ তাহা বিরোধাত্মক বিচ্ছেদ নহে—মনুষ্য চরিত্রে ইকনমির আবশ্যকতা আছে, সময় বিশেষে নিজেকে যথাসম্ভব নানা দিক হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া এক দিকে সংহত করিতে হয়—লেখাপড়া শিল্পচর্চায়ও এই নিয়ম পালন না করিলে চলে না—জীবনের গভীরতর সাধনাতেও এই নিয়মের প্রয়োজন আছে। যাহা কিছু আমার এখনকার প্রয়োজনের পক্ষে অনুকূল আমি কেবল তাহাই চতুর্দিকে আকর্ষণ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করি—আর সকলকে ইহাদের জন্য জায়গা ছাড়িয়া দিতেই হয়—তুমি আমাকে বড় মনে করিয়ো না—ছোট মনে করিয়ো না—আমাকে যাহা বলিয়া মনে হইতেছে, যদি বা ঠিক তাহা নাই হই, তবু আমি সেই রকমেরই একটা কিছু। ভুলও করি, অবিচারও করি অভিমানও করি—তোমার হৃদয়কে মার্জ্জনা করিয়া তাহা হইতে প্রেম লাভেরও চেষ্টা করিয়া থাকি।

তোমার রবি

৩০

ভাই

তোমার এবং সুরেনের কারো কোনো পত্র পাইনি। ক'দিন ধরে আমার শরীরও অসুস্থ যাচ্চে—মাথা ঘোরার একটা উপসর্গ জুটে সকল কাজেই ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। এখানে থেকে থেকে খুব ঝড় দেখা দিচ্ছে—আজ বিপরীত গুমট করে রয়েছে—লাফ দেবার পূর্ব্বে ব্যাঘ্রী যে রকম গুটি মেরে থাকে প্রকৃতিকে ঠিক সেই রকম দেখাচ্চে। আজ একটা রীতিমত ঝড় হবে বলে আশংকা করচি। আজ সন্ধ্যাবেলায় এখানে দুই একটি অতিথি আসবেন—যদি ঝড়ের মধ্যে পড়েন সেই ভয় করচি তুমি কবে আসচ?

পশ্চিমের আকাশ প্রান্তে ধুলো উড়চে দেখতে পাচ্চি—ঝড়ের নৃত্য বোধ হয় নেপথ্যেই সুরু হয়েছে—এখনি তার ধূসর আঁচল উড়িয়ে সম্মুখে উপস্থিত হবে। এখানে মেঘ ঝড় বৃষ্টির কোন আব্রু নেই—উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে তার আনাগোনা সমস্তই প্রকাশ হয়ে পড়ে। বিশে ডাকাত যেমন আগে থাকতে খবর দিয়ে ডাকাতী করতে আসতো এখানকার ঝড়ও সেই রকম আসবার অনেক পূর্ব্বে দিগন্তে তার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করে। ইতি ১৪ই বৈঃ ১৩০৯

তোমার রবি

৩১

ওঁ

ভাই

আমি যে তিন চারদিন কলকাতায় ছিলুম এক মুহূর্ত্ত অবসর পাইনি সেই...টাকার বন্দোবস্ত করতে আমাকে ক্রমাগতই যোড়াসাঁকো থেকে বালিগঞ্জে আনাগোনা করতে হয়েছে। তোমার ওখানে যাব বলে নিশ্চয় স্থির করেছিলুম কিন্তু কিছুতেই হয়ে ওঠেনি। শরীরটা অত্যন্ত ভেঙে পড়াতে কিছুদিন বিশ্রাম করবার জন্যে শিলাইদহে এসেছি কিন্তু এখানে এসেও শরীরটা শুধরে উঠবার লক্ষণ দেখচি নে। তার উপরে এখানকার জমিদারী কাজেও জড়িয়ে পড়েছি।

যাই হোক্, সেই টাকাটার একটা গতি করতে পেরে আপাততঃ ওরকম নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে। দেখা যাক্ সংকট আবার কখন আর কোন্ মূর্ত্তিতে দেখা দেয়।

এই সমস্ত উপদ্রবের মধ্যে বঙ্গদর্শন এক মুহূর্ত্ত স্কন্ধ ছাড়ে নি। এই অল্পদিন হল চোখের বালি সমস্তটা শেষ করে শৈলেশের হাতে দিয়েছি। কিন্তু রক্তবীজকে বধ করাই সম্পাদকের কাজ—একটা চুকিয়ে আর একটাতে আক্রমণ করতে হয়—ফের আর একটা গল্প লিখতে হবে। যাই হোক্ আপাততঃ আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত চোখের বালিই আসর অধিকার করে থাকবে।

এখানে প্রত্যহই বৃষ্টি চলচে। এই বৃষ্টিধৌত শ্যামলতার মধ্যে দুপুরবেলাকার রৌদ্র কিরণটি বেশ মধুর লাগে।

তোমার রবি

শিলাইদহ

৩২

ওঁ

কুমারখালি

ভাই

কলিকাতায় পা দিলেই এমনি একটা গোলমালের মধ্যে পড়িতে হয় যে, মনে যা থাকে তা কিছু করিয়া উঠিতে পাই না। শেষকালে সময় ফুরাইয়া যায়। কিছুদিন অজ্ঞাতবাসের জন্য মনটা উৎসুক আছে—তাই সমস্ত কর্ম্মের জাল কাটিয়া পদ্মায় ভাসিয়া পড়িয়াছি। কিছুকালের মত ডাকঘরের হাত এড়াইয়া একেবারে নিরুদ্দেশ হইবার ইচ্ছা আছে। সেইজন্য আজ পত্রযোগে বিদায় লইলাম। ৭ই পৌষে শান্তিনিকেতনের উৎসবে যোগ দিতে পিতৃদেব আদেশ করিয়াছেন অতএব সেই সময়টাতে একবার ফিরিব। হয়ত ৫ই কিম্বা ৬ই প্রাতে কলিকাতায় যাইতে হইবে। সেই অবকাশে যদি একবার দেখা হয় ত চেষ্টা করিব। তুমি নানারূপে পীড়িত আছ শুনিয়া ক্ষোভ পাইলাম—ঈশ্বর তোমাদের কল্যাণ করুন এই প্রার্থনা করিলাম। ইতি ২১শে অগ্রহায়ণ ১৩১০

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৩

ওঁ

ভাই

এখানে আসিয়া ভাল আছি। তাহার একটা কারণ কুর্ডেমি—আর একটা সক্ষম আয়ুর্ব্বেদ। ...

বেলা এবং ছেলেরা ভালই আছে। গরম পড়িয়াছে—তা পড়ুক। আম লিচুর প্রত্যাশায় আছি—এখনো বিলম্ব আছে। যথাসময়ে এখনো বৃষ্টি না হওয়ায় লিচুর সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়াছে, দরিদ্রের মনোরথের মত তাহারা প্রত্যহই ধূলাতেই লীয়ন্তে।

তোমাদের খবর সব ভাল ত? ইতি ১৬ই বৈঃ ১৩১১

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৪

ওঁ

ভাই,

একবার একটা কাজকর্ম্মের ঘূর্ণাবর্ত্তের টানে পড়িয়া অল্পদিনের মধ্যে বোলপুর হইতে কলিকাতা, কলিকাতা হইতে বোলপুর এবং বোলপুর হইতে মজঃফরপুরে(২২) ঘুরিয়া আসিয়াছি। এই ঘূরপাকের মধ্যে তোমাদের খবর দেওয়া হয় নাই। কলিকাতায় গিয়া এমন ভিড় এবং অস্থিরতার মধ্যে থাকিতে হয় যে, সত্যই তোমাদের ডাকিবার সময় করিয়া উঠিতে পারি

(২২) মজফরপুর, জ্যেষ্ঠা কন্যার শ্বশুরালয়।

া। এখানে আসিয়া একটু স্থির হইয়া শ্রাবণ ংখ্যার (২৩) নৌকাডুবির কাল লিখিয়া ফেলিতে পারিয়াছি। সমস্ত গোলমালের ভিতরে যেখানেই থাকি ঐ গল্পটির জের টানিয়া বেড়াইতে হয়। কতদিনে নিষ্কৃতি পাইব এখনো নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছি না।

আমি খুব সম্ভব আষাঢ়ের শেষাশেষি কলিকাতায় যাইব—সেই সময় তোমার কাছ হইতে Literary History of Persia বইখানি আদায় করিয়া লইব।

রথী কেদারনাথ তীর্থ ঘুরিয়া কাল এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তুমি বোধহয় জান কেদারনাথ হিমালয়ের একটি দুর্গমতম তীর্থ। সেখানে রথী সন্ন্যাসীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর মত গিয়া সমস্ত কষ্ট সহ্য করিয়া সিদ্ধকাম হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। এখন আর সে কোথাও ভ্রমণ করিতে ভয় করিবে না। ইতি ১৪ই আষাঢ়, ১৩১১

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৫
ওঁ

ভাই

...রেণুকার (২৪) অসুখ নিয়ে আমি আজকাল ব্যস্ত হয়ে আছি। দীর্ঘকাল থেকে তার জ্বর কিছুতেই উপশম হচ্চে না—সঙ্গে কাশিও আছে। বোলপুরে তার কোন উপকার হল না—এখন কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় বায়ু পরিবর্ত্তনের উপযোগী একটা বাড়ির সন্ধানে আছি। আজকাল পশ্চিমে প্লেগের দৌরাত্ম্য—সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্যে বাড়ী খুঁজছি—এখনো পাইনি—যাই হোক্ শীঘ্রই কোথাও যেতেই হবে।

এ ছাড়া বিদ্যালয় ত আছেই। তাতেও আমার অনেক সময় ও চিন্তা দিতে হয়—এই সকলেরই মধ্যেই সমাহিত হয়ে আছি। তোমার কাছ থেকে বই সংগ্রহ করে আনবার বিশেষ লোভ ছিল, কিন্তু রেণুকার অসুখ নিয়ে তোমার ওখানে যাবার সুবিধা করে উঠতে পারিনি।

রথী পরীক্ষা দিতে কলকাতায় গেছে। রেণুকাকে কোথাও নিয়ে যাবার উপলক্ষ্যে আমাকেও বোধহয় এর মধ্যে যেতে হবে। তখন দেখা হবে। ইতি বুধবার—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৬
ওঁ

ভাই,

...Pharmaco-Dynamics বইখানা রাধারমণবাবুর হাত দিয়ে শৈলেশকে পাঠাব—শৈলেশ তোমাকে দেবেন—রাধারমণবাবু বোধ হয় কালই কলকাতায় যাচ্চেন। বইখানা তুমি ফেরৎ দেবার জন্য তাড়াতাড়ি কোরো না—আপাতত এটা আমার কোনো দরকারে লাগবে না এবং ভবিষ্যতে একটা Enlarged নতুন Edition কিনে নেওয়া যাবে। তাও বোধ হয় অনাবশ্যক হবে—কারণ আমার কাছে Materia Medica দুতিনখানা আছে—তাতেই আমার রোগ ও ঔষধ নির্ণয়ের কাজ চলচে। অতএব এটা তোমার ছেলেকে খুব কসে দাগ দিয়ে note করে পড়ে হজম করে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলতে দিয়ো।

হাজারিবাগ যাবার পূর্ব্বে খবর পাবে।...

রবি

(২৩) নৌকাডুবি প্রথম প্রকাশ, বঙ্গদর্শন, ১৩১০ বৈশাখ—১৩১২ আষাঢ়।

(২৪) মধ্যমা কন্যা

৩৭
ওঁ

ভাই,

সুরেনের সঙ্গে কথাবার্তা কি রকম স্থির হল আমাকে জানাবে।

ইতিমধ্যে একজন দরিদ্র ব্যক্তি (২৫) আমার বিদ্যালয়ে হাজার টাকা দান করিয়াছেন—ইহাতে আমার কি উপকার হইয়াছে বলিয়া শেষ করিতে পারি না। এই একটিমাত্র ঘটনায় ঈশ্বরকে আমি আরো যেন নিকটে পাইয়াছি। বুঝিয়াছি তাঁহার কার্য আপন গৌরবের সফলতা আকর্ষণ করিয়া আনে—আমরা নিতান্ত সামান্য উপলক্ষ্য মাত্র। ঈশ্বর আমার হৃদয় জানিতেছেন আমি আর অধিক কি বলিব? যিনি দান করিয়াছেন তিনি বারম্বার তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন—তাই তাঁর নাম আমার হৃদয়েই অঙ্কিত হইয়া রহিল।

বোধ হয় বৃহস্পতিবার হাজারিবাগ যাইব। রেণুকা ভালই ছিল—আজ আবার হঠাৎ তাহার জ্বর বাড়িয়াছে।

তোমার রবি

৩৮
ওঁ

Thomson House, Almora.

ভাই,

সংসারের তরণীটি নানাপ্রকার তুফানের উপর ভাসিয়ে দিয়ে চলেছি—কবে একটা বন্দরে টেনে এনে নোঙর ফেলতে পারব জানিনে। ছেলেদের মধ্যে কেউ একদিকে কেউ আর একদিকে আমার বিদ্যালয় একদিকে এবং আমি আধিব্যাধি নিয়ে অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে চলেছি। বিচ্ছিন্ন সংসারটাকে এক জায়গায় জমাট করে নিয়ে বসবার জন্যে মন ব্যকুল হয়েছে। সেদিন প্ল্যাঞ্চেটে হাত দেবামাত্র লেখা বেরল, "বাবামশায়ের অসুখ।" জিজ্ঞাসা করলুম আলমোড়া থেকে আমাকে কোথায় গিয়ে স্থিতি করতে হবে—বল্লে কলকাতায়। বোলপুরে গিয়ে থাকতে পারব না শুনে বিস্মিত হলুম। তুমি চিঠিতে যে কথা লিখেছ তাতে বোঝা যাচ্ছে কলকাতায় গিয়ে থাকবার কারণ কি হতে পারে। উপরি উপরি আমার এই রকম ঘাতপ্রতিঘাত কতদিন আর চলবে আমাকে বলতে পার? আমার কোষ্ঠীতে কি বলে? বিঘ্ন-বিপত্তি যদি এতই উত্তাল হয়ে উঠবে তাহলে ভাগ্য এতগুলো কাজ এই সময়ে আমার ঘাড়ে চাপালে কেন? বোধ হয় ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে নিজেকে স্থির রাখবার জন্যেই এই সমস্ত অবলম্বন। এই শিকলগুলো না থাকলে নৌকাডুবি হতে পারত।

রেণুকার শরীর এখানে কি রকম থাকবে এখনও বলা যায় না। ব্যামো কখনো বাড়ে কখনো কমে—কমবার সময় আশা জন্মে বাড়বার সময় আশঙ্কা। স্থানের গুণ এখনো সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি। প্রতীক্ষা করে রয়েছি।

তোমার "চোখের বালি" ছাপা সম্বন্ধে যে দুর্যোগ উপস্থিত হয়েছে...কে আমি সেজন্যে নিরপরাধ গণ্য করতে পারিনে। প্রত্যেক ফর্মাটি ছাপা হলে তার দেখে নেওয়া উচিত ছিল। যাই হোক ছাপাখানাই এজন্যই দণ্ডনীয়। ...যে তাদের তাগিদ করে এখনো কেন ছাপিয়ে নিচ্চে না বুঝতে পারচিনে। ...কাজের লোক না এটা বেশ বুঝেছি।

আমার ঝড়-তুফানের মধ্যে তোমার বইখানি মারা গেছে। যখন রেণুকা ও দলবল নিয়ে হাজারিবাগের পথে চলেছিলুম তখনই বোধ হচ্চে মধুপুর ষ্টেশনের ভোজনাগারে বা স্নানাগারে কিম্বা আর কোথাও সেখানি হারিয়েছে। পথক্লেশ নিবারণের জন্য সেই একখানি মাত্র বই আমার সম্বল ছিল। বালক-বালিকা দাস-দাসী সিন্দুক বাক্স পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে নানা পথ দিয়ে বিচিত্র যানবাহনযোগে যাওয়ার যে কি দুঃখ এবার তা পেট ভরে বুঝে নিয়েছি। সামনে অন্তত আর একবার সেই বিপত্তি আছে বলে উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। তাই ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করচি "কোথা এই যাত্রা হবে শেষ?" ইতি—শনিবার।

রবি
30 MAY, 1905

(২৫) মোহিতচন্দ্র সেন। দ্রষ্টব্য 'বন্ধুস্মৃতি', বিচিত্র প্রবন্ধ, প্রথম সংস্করণ।

৩৯
ওঁ

ভাই,

আমার উপর কারো তোমাদের দয়া নেই। সৌভাগ্যের জাঁতায় আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে ঘোরাচ্চে সেই জন্যেই আমি বন্ধুকৃত্য করে উঠতে পারিনে—আমার দিনগুলো নানা ঝঞ্চাটে চাপা পড়ে গেছে। তার উপরে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রাম ও শান্তির দরকার বেড়ে গিয়েছে তাই একটুখানি সময় পেলে এবং কোথাও একটু পিঠ ঠেসান দিয়ে বসবার জায়গা পেলেই চুপ চাপ করে পড়ে থাকি।

আর কৃপণতার কথা যা বলেছ সেটা সত্য। ওটা ভিতরে আছে। তার একটু কারণও বেড়েছে। অল্প বয়সে নিজের প্রয়োজন ছাড়া আর প্রয়োজনই ছিল না—এইজন্যে বই কিনেছি আর টাকা ছড়িয়েছি। তার ফলে কিছু হাতে থাকত না আর থাকবার দরকারই ছিল না। এখন আমার উপর দুশো ছেলের ভার পড়েছে—তাদের কথা ভাবে এমন সহায় প্রায় কাউকে

রবীন্দ্রনাথের চিঠি :

পাইনি। পাবার দাবীও সংগত নয়—কারণ আমার যা আছে তাতে চলে যায়—আজ চোদ্দ বছর চলে গেছে—কত বই বেচেছি, কত ধার করেছি, এখনো তা শোধ হয়নি—কিন্তু সেও বেশি কথা নয় কারণ ধার করবার সংগতি আমার আছে। কিন্তু থ্যাকারের দোকানের সংঘাত যতদূর সম্ভব বাঁচিয়ে চলতে হয় এবং খয়রাতের কথা উঠলেই রথার উপর বরাৎ দিই—এক এক সময় ভয় হয় তার রথ বুঝি অসম্ভব রকমে ভারি হয়ে উঠেছে। কারণ তার হিসাব আমি দেখিনে, সুতরাং তার তহবিলের অবস্থা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানিনে। তবু তার কাছে দশটা টাকা চাইলে যে পাওয়া যাবে না তা নয় এবং বোঝার উপর শাকের আঁটিও সইবে। কিন্তু নিতান্তই গোলেমালে ভুলে বসেছিলুম। এবার কলকাতায় গেলে স্মরণ করিয়ে দিয়ো বোধহয় এবারে তোমাকে বিড়ম্বিত হতে হবে না।

গানের কবিত্ব সম্বন্ধে যা লিখেছ সবই মানি। কেবল একটা কথা ঠিক নয়। মাথায় কবিতা সম্বন্ধে কোনো থিওরিই নেই। গান লিখি, তাতে সুর বসিয়ে গান গাই—ঐটুকুই আমার আশু দরকার—আমার আর কবিত্বের দিন নেই। পূর্বেই বলেছি ফুল চিরদিন ফোটে না—যদি ফুটত ত ফুটতই, তাগিদের কোনো দরকার হত না। এখন যা গান লিখি তা ভাল কি মন্দ সে কথা ভাববার সময়ই নেই। যদি বল তবে ছাপাই কেন, তার কারণ হচ্ছে ওগুলি আমার একান্তই অন্তরের কথা—অতএব কারো না কারো অন্তরের কোনো প্রয়োজন ওতে মিটতে পারে—ও গান যার গাওয়ার দরকার সে একদিন গেয়ে ফেলে দিলেও ক্ষতি নেই কেননা আমার যা দরকার তা হয়েছে। যিনি গোপনে অপূর্ণ প্রয়াসের পূর্ণতা সাধন করে দেন তাঁরই পাদপীঠের তলায় এগুলি যদি বিছিয়ে দিতে পারি এ জন্মের মত তা হলেই আমার বকশিস্ মিলে গেল; এর বেশি এখন আমার আর শক্তি নেই। এখন মূল্য আদায় করব এমন আয়োজন করব কি দিয়ে, এখন প্রসাদ পাব সেই প্রত্যাশায় বসে আছি। তোমরা সেই আশীর্বাদই আমাকে কোরো—হাটের ব্যাপারী এখন দ্বারের ভিখারী হয়ে যেন দিন কাটাতে পারে।

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রিয়নাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথ

"জন্মকাল থেকে আমাকে একখানা নির্জন নিঃসংগতার মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।"—এই নিঃসংগতা লোকোত্তর প্রতিভারই নিঃসংগতা, যে বিশেষ কবিপ্রকৃতি যে তপস্যা রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করিয়াছিল, এই একাকিত্ব তাহারই পরমমূল্য।—"তীরে দেখতে পাচ্ছি লোকালয়ের আলো, জনতার কোলাহল, ক্ষণে ক্ষণে ঘাটেও নামতে হয়েছে, কিন্তু কোনোখানে জমিয়ে বসতে পারি নি।"—তাপন প্রতিভার স্বরূপ জানিয়াও রবীন্দ্রনাথ অপরিহার্য এই আত্মিক একাকিত্বের জন্য নিরন্তর বেদনাবোধ করিয়াছেন, কল্পনা করিয়াছেন, 'আমি প্রশংসা পেয়েছি প্রীতি পাই নি,' বিশ্বাস করিয়াছেন, তাহার ভাগ্যে বহুস্থানে আছে দুগ্রহ।

এই সংখ্যায় মুদ্রিত চিঠিগুলিতেই, তাঁহার কথা সম্পূর্ণ স্বীকার না করিবার কারণ আছে। 'খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে যে প্লানি এসে পড়ে আমার ভাগ্যে অন্যদের চেয়ে তা অনেক বেশি আবিল হয়ে উঠেছিল। এমন অনবরত, এমন অকুণ্ঠিত, এমন অকরুণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা আর কোনো সাহিত্যিকেরই সইতে হয় নি।"—একথাও যেমন সত্য, তেমনি সত্য যে, যখন তিনি "চূড়ার উপর ওঠেন নি, কীর্তিসূর্য আপন সহস্র কিরণ দিয়ে তাঁর সফলতাকে দীপ্যমান করে তোলেনি, তখন অনেক বাধা অনেক সংশয়", সেই তাঁহার যৌবন-কাল হইতেই, দূরকালে প্রতিভার পূর্ণবিকাশে দৃঢ়প্রত্যয়ী এমন বন্ধুসমাজও অন্য কোনো সাহিত্যিকের ভাগ্যে সুলভ হয় নাই; লোকেন্দ্রনাথ পালিত, জগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির সৌহার্দ্য রবীন্দ্র-জীবনের মূলে কম প্রাণ-রস সঞ্চার করে নাই।

প্রিয়নাথ সেন (১৮৫৪—১৯১৬) এই আদি-বন্ধুগোষ্ঠীর অন্যতম। তাঁহার রসজ্ঞতা সে যুগে রবীন্দ্রপ্রতিভার কিরূপ সহায়স্বরূপ হইয়াছিল, তাহা তিনি নিজেই জীবনস্মৃতিতে অকুণ্ঠচিত্তে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—

"এই সন্ধ্যাসংগীত১ রচনার দ্বারাই আমি এমন একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম, যাঁহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মতো আমার কাব্যরচনার বিকাশচেষ্টায় প্রাণসঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। তিনি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন। তৎপূর্বে ভগ্নহৃদয়২ পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাসংগীতে তাহার মন জিতিয়া লইলাম। তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাহারা জানেন, সাহিত্যের সাতসমুদ্রের নাবিক তিনি। দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল ভাষার সকল সাহিত্যের বড়োরাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদা-সর্বদা আনাগোনা। তাঁহার কাছে বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক দূরদিগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা আমার পক্ষে ভারি কাজে লাগিয়াছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে পুরা সাহসের সঙ্গে তিনি আলোচনা করিতে পারিতেন—তাঁহার ভালোলাগা মন্দলাগা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচির কথা নহে। একদিকে বিশ্বসাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রবেশ ও অন্যদিকে নিজের শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস—এই দুই বিষয়েই তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভকালেই যে কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ-আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত তাহা বলা শক্ত।"

সম্প্রতি প্রকাশপ্রাপ্ত রবীন্দনাথের কোনো কোনো পুরাতন চিঠিতে প্রিয়নাথ সেনের যে উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গ কিভাবে একদা যুবক রবীন্দ্রনাথকে প্রো[illegible] করিয়াছে।—

"কলকাতা। ৬ই এপ্রিল [১৮৯৩]।......এই হতভাগ্য জনশূন্য দেশে মনটা যেন নিরাশাদন উপবাসী হয়ে আছে—কেবল ভিতর থেকে আপনাকে আপনি আহার করচে। কে বা জীবনধারণ করে, কে বা ভাবে, কে বা কথা কয়—কেই বা উৎসাহ দেয়, কেই বা তোমার কথা শোনে, কেই বা তোমার ভাব বোঝে—কেই বা অন্তরের মধ্যে তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করে। কেউ বা আমোদ করচে, কেউ বা আলস্য করচে, কেউ বা আপিসে যাচ্চে, মানুষের মন বলে যে একটি প্রাণী আছে সেটা যে শুকিয়ে আধ-মরা হয়ে যাচ্চে তার জন্যে কারো কানাকড়ির মাথা ব্যথা নেই। আমি আজ সকাল প্রি—বাবুর ওখানে গিয়েছিলুম, অনেকটা যেন আহার পান করে আসা গেল।"

"কলকাতা। ২রা আগষ্ট। [১৮৯৪]।

প্রি—বাবুর সঙ্গে দেখা করে এলে আমার একটা মহৎ উপকার এই হয়, যে, সাহিত্যটাকে পৃথিবীর মানবইতিহাসের একটা মস্ত জিনিষ বলে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই তার সঙ্গে এই ক্ষুদ্র [illegible] ক্ষুদ্র জীবনের যে অনেকখানি যোগ আছে তা অনুভব করতে পারি। তখন আপনার জীবনটাকে রক্ষা করবার এবং আপনার কাজগুলো সম্পন্ন করবার যোগ্য বলে মনে হয়—তখন আমি কল্পনায় আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা অপূর্ব ছবি দেখতে পাই—দেখি যেন আমার দৈনিক জীবনের সমস্ত ঘটনা সমস্ত শোকদুঃখের মধ্যস্থলে একটি অত্যন্ত নির্জন নিস্তব্ধ জায়গা আছে সেখানে আমি নিমগ্নভাবে বসে সমস্ত বিস্মৃত হয়ে আপনার সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত আছি—সুখে আছি। সমস্ত বড় চিন্তার মধ্যেই একটি উদার বৈরাগ্য আছে। যখন অ্যাষ্ট্রনমি পড়ে নক্ষত্রজগতের সৃষ্টির রহস্য-শালার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ান যায়, তখন জীবনের ছোট ছোট ভারগুলো কতই লঘু হয়ে যায়! তেমনি আপনাকে যদি একটা বৃহৎ ত্যাগস্বীকার কিম্বা পৃথিবীর একটা বৃহৎ ব্যাপারের সঙ্গে আবদ্ধ করে দেওয়া যায়, তাহলে তৎক্ষণাৎ আপনার অস্তিত্বভার অনায়াসে বহনযোগ্য বলে মনে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও ভাবের সমীরণ চতুর্দিকে সঞ্চারিত সমীরিত নয়, জীবনের সঙ্গে ভাবের সংশ্রব নিতান্তই অল্প, সাহিত্য যে মানবলোকে একটা প্রধান শক্তি তা আমাদের দেশের লোকের সংসর্গে কিছুতেই অনুভব করা যায় না নিজের মনের আদর্শ অন্য লোকের মধ্যে উপলব্ধি করবার একটা ক্ষুধা চিরদিন থেকে যায়।"

সৌহার্দ্যের সূচনায় (১৮৮১?) "প্রিয়বাবু" সম্ভাষণের সময় হইতে ১৯১৬ সালে প্রিয়নাথ সেনের জীবনান্ত পর্যন্ত দীর্ঘকাল ধরিয়া রবীন্দ্র-নাথ তাঁহাকে যে বহুসংখ্যক চিঠি লিখিয়াছেন, তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত প্রমোদনাথ সেন তাহার অনেক-গুলি সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন। ইহার কতকগুলি প্রিয়নাথ সেনের রচনাসংগ্রহ 'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি'র পরিশেষে স্থান পাইয়াছে, কতকগুলি বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০, শনিবারের চিঠি আশ্বিন ১৩৪৮ ও পূর্ণিমা আশ্বিন ১৩৫০ সংখ্যায় স্থান পাইয়াছে। অবশিষ্ট চিঠিগুলি হইতে কতকগুলি শ্রীযুক্ত প্রমোদনাথ সেনের সৌজন্যে এখন প্রকাশিত হইতেছে। এই চিঠিগুলি একত্র পড়িলেই, প্রিয়নাথ সেন এক যুগে রবীন্দ্র-জীবনে কি ঘনিষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় সুপরিস্ফুট হইবে। দেখিতে পাই, প্রিয়নাথ সেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-

১।। ১২৮৮ (ইং ১৮৮২) সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। "ইহার অধিকাংশ কবিতাই গত দুই বৎসরের মধ্যে রচিত।"—প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

২।। ১৮৮১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রিয়নাথ সেন প্রসংগে লিখিয়াছেন—"It was in deference to his unfavourable opinion that Rabindranath Tagore withdrew one of his early works from circulation and it has never been reprinted." সম্ভবতঃ এ গ্রন্থখানি "ভগ্নহৃদয়"

চর্চার প্রোৎসাহক শুধু ছিলেন না, ক্রমশ তিনি বৈষয়িক ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরামর্শ-দাতা হইয়া উঠিয়াছেন; জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের যোগযোগ সাধন করিতেছেন; সাহিত্য দ্বন্দ্বে তাঁহার সমস্ত মনীষা লইয়া তিনি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অবতীর্ণ হইতেছেন; অপর পক্ষে, রচনার মধ্যে স্বীয় প্রতিভার প্রকাশ রাখিয়া যাইতে তাঁহার ঔদাসীন্য দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বারংবার অনুযোগ করিতেছেন; ব্যক্তিগত সকল সৌভাগ্যের দিনে তাঁহার সান্নিধ্য প্রার্থনা করিতেছেন দুঃখের দিনে তাঁহারই সান্ত্বনা রবীন্দ্রনাথকে বল দিতেছে। সে-সব চিঠি এখানে উদ্ধৃত করিবার অবসর নাই। কেবল একটি মাত্র চিঠি অংশত উদ্ধৃত হইল,—এই, চিঠিখানিতে প্রিয়নাথ সেনের সহিত রবীন্দ্র-নাথের আত্মিক পরম যোগের কথা কবির নিজের কথায় গভীরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।—

“......চিঠি এতদিন না লেখবার আরেকটা কারণ আছে—তোমাকে চিঠি না লিখলে কোন রকম হিসেবের দায়ে পড়তে হবে না এটা আমি নিশ্চয় জানি। তুমি আমার অবস্থা ঠিক বুঝতে পারবে—আর তুমি যদি আমার এ চিঠির উত্তর দিতে দেরী কর কিম্বা না দাও—আমিও তোমার অবস্থা ঠিক অনুভব করতে পারব। দরকার কি? আমাদের মধ্যে একটা মস্ত চিঠি লেখা আছে—তাতে সমস্ত বোঝাপড়া হয়ে আছে—তোমার আমার উত্তর-প্রত্যুত্তর তার মধ্যেই সমস্ত ধরাবাঁধা আছে। আমরা দুজনেই মুখচোরা সশঙ্কিত লোক—আঁচাআঁচির চেয়ে বেশি দূরে যাই নে; কিন্তু মনে মনে কি একটা বোঝাপড়া হয় নি? আমার বোধহয় আমাদের একরকম গভীর চেনাশোনা হয়ে গেছে তাই জন্যে আমাদের বেশি কথাবার্তার দরকার হয় না। আমরা বোধহয় এখন দুজনে একঘরে চুপ ক'রে বসে থাকতে পারি। জানি নে আমাকে তুমি কি রকম মনে কর—কিন্তু আমি তোমার কথা বেশ বুঝতে পারি—তোমাকে অত্যন্ত প্রতিবেশী বলে বোধহয়—দুজনের এক ভাষা। আমার মনে হয় আমি ছাড়া তোমার অনেক কথা আর কেউ ঠিক অক্ষরে অক্ষরে বুঝতে পারে না। তর্ক সকলেরই সঙ্গে করা যায়—কিন্তু সকলের সঙ্গে কল্পনা করা যায় না। তাই সংসারের মধ্যে সকলে কল্পনার উপরে অবিশ্বাস জন্মিয়ে দেয়—কল্পনাকে কেবল নিতান্ত আমারই খেয়াল বলে মনে হয়—তারপর তোমার সঙ্গে যখন কল্পনার মিলন হয়, তখন তাকে আবার সত্য বলে বিশ্বাস হয়—তার পক্ষে একটা প্রমাণ পাওয়া যায়।

“তোমার সেই রাস্তার ধারের ঘরের position টি কিছু নিতান্ত Poetical নয় কিন্তু অনেক সময়ে সেই ঘরে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যেন বাগানে গিয়েচি। তোমার ওখেনে সমুদ্রপারের মাঠ থেকে বনফুল-দোলান বাতাস বয় আমার মনে হয়, যেন তোমার ওঘরের সঙ্গে কলকাতার Municipalityর কোন সংস্রব নেই। আমি যেন কলকাতা থেকে তোমার ওখেনে যাই, তোমার ওখেন থেকে কলকাতায় ফিরি। তোমার ওখেনে খানিক-ক্ষণ থাকলে আমার একরকম বিষাদ জন্মায়, আমার মনে হয়, আমি যেন একটা কিছু করতে পারি, কিন্তু করতে পারচি নে। আমি যা' কিছু লিখেছি যা'কিছু গেয়েছি মনে হয় সেগুলো আগাগোড়া অসম্পূর্ণ। বসন্তের বাতাস চললে আমার সহসা যেন চৈতন্য হয় যে, আমার গান বন্ধ হয়ে গেছে।...

“আমার রচনাই যাদের কাছে ঢের তাদের মধ্যে আমি একরকম থাকি ভাল—একরকম ভুলে থাকি—কিন্তু তোমার কাছে গেলে আমার মনে হয় এখেনে জারিজুরি খাটবে না তুমি জহর চেন—আমার নিজেকে নিজের অনুপযুক্ত বলে বোধ হয়।...”

বঙ্গসাহিত্যসমাজে প্রিয়নাথ সেন একদিন একজন সম্মানিত প্রধান ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি একরূপ বিস্মৃত—অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সুগভীর রসবোধ লইয়াও তিনি অধিকসংখ্যক রচনা রাখিয়া যাইতে পারেন নাই; যে-কয়টি আছে, তাহার অধি-কাংশই রবীন্দ্র-প্রতিভার আলোচনা, যথা, দ্বিজেন্দ্র-লাল ‘চিত্রাঙ্গদা’ কাব্যকে অশ্লীল প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলে, তাহার প্রতিবাদে লিখিত “চিত্রাঙ্গদা” প্রবন্ধ। সম্ভবতঃ রস গ্রহণের ও বিচারের প্রতিভাই তাঁহার আত্মপ্রকাশের পথে বাধা হইয়াছিল। তাঁহার যে কয়টি গদ্য রচনা রক্ষা পাইয়াছে ‘প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি’তে তাহা গ্রথিত হইয়াছে, ঐ গ্রন্থেরই পরিশেষে, তাঁহার সমসাময়িক সাহিত্যকগণের শ্রদ্ধাঞ্জলিও সংকলিত হইয়াছে। কবিতাও তিনি কিছু রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার রসবেদনার যথোচিত পরিচয় সেগুলিতে লিপিবদ্ধ না হইলেও, তাহার একটি এই সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্র-পত্রা-বলীর পাদটীকায় যুক্ত হইয়াছে, প্রসঙ্গ-সমাপ্তিতে অন্য একটি উদ্ধৃত হইতেছে।—

শ্মশান

গ্রামের সুদূর প্রান্তে—ভগ্ন দেবালয়
তাহার চরণে লগ্ন—বিস্তীর্ণ শ্মশান
নীরব নির্জন,—যেন আপনারে লয়
করিয়াছে প্রেতভূমি সমর্পিয়া প্রাণ
শিয়রের দেবী-পদে—ধ্যান নিমগনা
ঊর্দ্ধে দেখে শুধু সেই এক নভঃ—আর
মন্দিরের মহাভয়—লেলিহ রসনা—
মরণের ক্ষুদ্র ভয়ে করিছে সংহার।
আমার জীবন হোক শ্মশান প্রখর
দাঁড়াও পাবনী তাহে একা—একেশ্বরী
পুড়ুক নিয়ত তাহে যা কিছু নশ্বর
পাপ যাহা—মৃত্যু যাহা—যাহা মৃত্যুকরী
তোমাতে নিমগ্ন—লুপ্ত—তুমি প্রাণময়
বিশ্বের সে চিরচিতা ধরিবে হৃদয়।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

নন্দলালের সাধনার জগৎ

— শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

এক রকমের ছবির মধ্য দিয়ে আমরা আর্টিস্ট-এর মনের বিশেষ স্তর-এ পৌঁছই। চিন্তা, বিশ্বাস, আদর্শ সবকিছু নিয়ে সবকিছু সম্মিলিতভাবে প্রকাশ পায়। যে ছবিতে বা রচনায় এই গুণ প্রধান তাকেই শিল্পীর প্রধান কাজ বা তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে। নন্দলালের পৌরাণিক ছবি বা তাঁর অন্যান্য অনেক ছবি এই শ্রেণীর। আর এক রকমের ছবি তৈরী হয় আর্টিস্টের মনের ওপর বিশেষ সময়ের বিশেষ কোন জিনিষের প্রতিক্রিয়া. ইংরেজীতে অব্‌জেকটিভ্‌ আর্ট বা বস্তুতন্ত্র শিল্প বলতে বোধ হয় এই শ্রেণীর ছবিকেই বোঝায়। নন্দলালের শিল্পীজীবনের অনেকগুলি মুহূর্তের চিহ্ন থেকে গেছে তাঁর এক শ্রেণীর ছবিতে। টেকনিকের দিক দিয়ে এগুলিকে রেখাচিত্র নাম দেওয়া যায়. কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে টেকনিকটা প্রধান নয়, বস্তুটা প্রধান, তাই কেবল রেখাচিত্র বললে, তার ছবিগুলির পরিচয় সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়। এগুলি জগৎ-এর প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছবি যদি বলি. তবে এগুলিকে স্কেচ্‌ বলে ধরা যেতে পারে কারণ ইংরেজি স্কেচ শব্দে সেই শ্রেণীর ছবি বোঝায়. যে শ্রেণীর ছবিতে আর্টিস্ট বস্তুর একটা কোন গুণকেই প্রধান করে দেখিয়েছে।

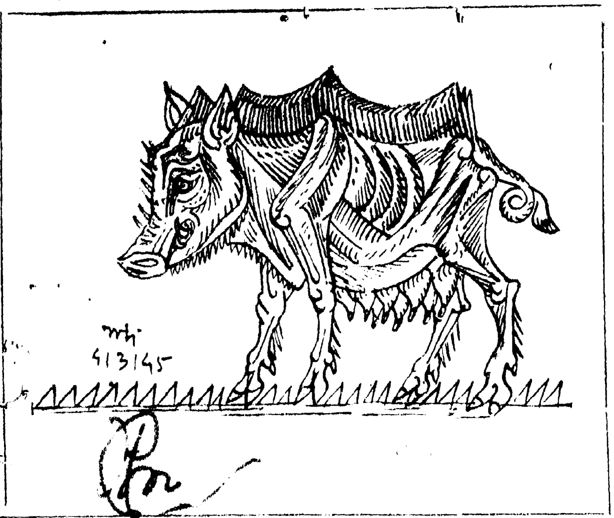
বিলেতি আর্টিস্টের চোখে প্রকৃতি উপভোগের বস্তু, প্রকৃতি সুন্দর। সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করা বিলেতি আর্টিস্টদের সাধনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। প্রকৃতিতে নিত্যই পরিবর্তন চলেছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলে চলতে চেয়েছে আর তারই মুহূর্তগুলিকে এক এক ক'রে বেঁধে রাখতে চেয়েছে বিলিতি আর্টিস্ট।

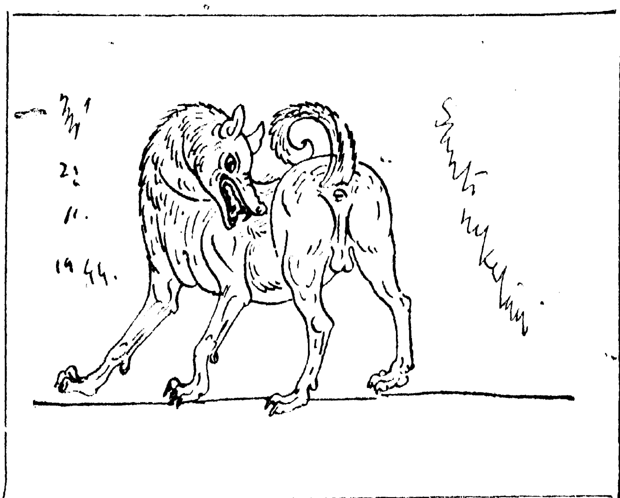
এইরকম ক'রে আর্টিস্টের নজরে যখন যেটুকু ধরা দিয়েছে, সেটুকুকে নিয়েই সে খুসী, তার বাইরের সবকিছুই সে মুহূর্তের জন্য সে ভুলেছে। নন্দলালের অনেক ছবি এই ধরণের। কিন্তু Impression তো নানা রকমের হতে পারে। বস্তু তো নানা দিক দিয়ে আর্টিস্টকে আকৃষ্ট করতে পারে—নন্দলালের স্কেচ্‌ বা ইম্‌প্রেশন-মূলক ছবি দেখলে দেখব কত দিক থেকে বস্তুর প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এবং কত রকমের ছাপ তাঁর মনে পড়েছে।

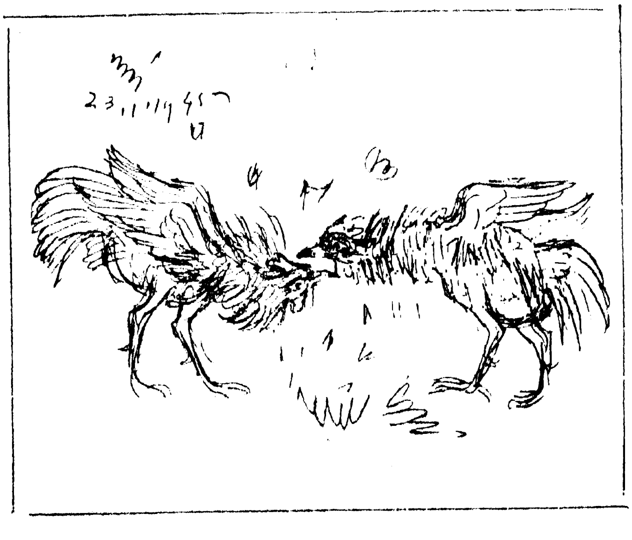
এক রকমের ছবি, যেখানে শিল্পী নন্দলালের দৃষ্টি নতুন, অভিনব ও আকস্মিক বস্তুতে আকৃষ্ট হয়েছে, বস্তুর বৈশিষ্ট্যকে জানবার কৌতূহল এগুলিতে প্রধান। এ ছবিগুলিই অধিকাংশ তাঁর স্টাডি শ্রেণীতে পড়বে।

প্রকৃতির সঙ্গে নন্দলালের সাক্ষাৎ কত রকমে হয়েছে তার পরিচয় যে ছবিগুলিতে রয়েছে সেগুলিকে যদি এমনি বিষয়ের দিক থেকে ভাগ করা যায়, তবে তার বৈচিত্র্যে বিস্মিত হতে হবে। কারণ সহজে যা চোখে পড়েনি খুঁজে তাকে তিনি দেখেছেন, খুঁজে যা

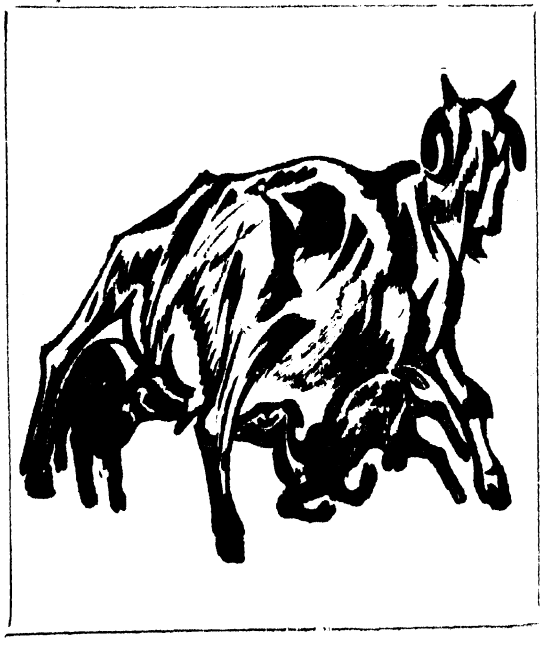
















দেখেছেন বিশ্লেষণ করে তা বুঝেছেন। এমনি করে দেখা, জানা বোঝার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির বিচিত্রতাকে তিনি ধরেছেন। তাঁর এই বহু বিচিত্র ছবিগুলিকে আর এক আলোয় দেখা যাক —এই নতুন আলোয় প্রথমেই আমরা দেখব বিষয়ের বৈচিত্র্যের সঙ্গে করবার কায়দার রকমফের বা ষ্টাইল। তুলি বা পেন্সিলে আঁকা ছবি, ইংরেজিমতে এগুলিকে বলা যায় স্টাডি। এখানে তাঁর দৃষ্টি সজাগ, হাতের মুঠোয় তিনি কিভাবে রূপকে আয়ত্ত করেছেন সেই দিকটা আমরা দেখি। আর এক শ্রেণীর ছবিতে দেখি রেখার ইঙ্গিত বা আলোছায়ার ছন্দে গড়া জগৎ-এর ইঙ্গিত, দিন দিন আর্টিষ্ট যা দেখেছেন যা তাঁর ভাল লেগেছে তারই পরিচয়। এগুলিকে প্রকৃতির পর্যবেক্ষণ বলব না, প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গতার স্মারক এগুলি। এগুলির মধ্যে আমরা পাই মানুষের চলাফেরায় কাজকর্মে ওঠাবসায় কত বিচিত্র ভঙ্গী, সেই সঙ্গে পাই নানা ভঙ্গীর ছন্দোমাধুর্য। কারণ, নন্দলালের চোখে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের চলাফেরায় নিজের অজ্ঞাতে যে বিচিত্র রসের অভিনয় করে চলেছে, সেইটাই বারে বারে তাঁকে আকৃষ্ট করেছে, তারি ফাঁকে তিনি দেখেন প্রকৃতির শোভা। এটা লক্ষ্য করবার জিনিষ যে চোখের সামনে দিয়ে মানুষের নিত্যকার যাওয়াআসা যত সহজে যত শীঘ্র ধরা পড়েছে তাঁর পেন্‌সিলে তুলিতে কলমে তার চেয়ে অনেক কম চোখে পড়েছে তাঁর প্রকৃতি। তারপর দেখি নিছক জীবজন্তু, এখানেও বিচিত্র কত ভঙ্গী। দেখি এখানেও, জীবজন্তুর চলাফেরার দিকে আর্টিষ্টের দৃষ্টি অতি সজাগ। তারপর দেখি ছোটখাট জিনিব পাখী, ফুল, মাছ পোকা-মাকড়। এদিক দিয়ে তাঁর উপকরণ প্রায় নির্দিষ্ট, পেন্সিল বা তুলি প্রধান, তারপর কলম। এখানে আসল জিনিষ হলো, দেখবার বস্তু নয়, দেখবার ভঙ্গী। দেখবার ভঙ্গীর ক'একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে। একদিক, বস্তুর থেকে তিনি গড়ন-এর ইঙ্গিত পেয়েছেন বা গড়ন দেখেছেন। অন্যত্র, গতির ছন্দকে নিয়েছেন, অর্থাৎ Plastic ছন্দ ও রেখার ছন্দ দুটী তার দৃষ্টিভঙ্গী বা বিষয়বিচিত্র প্রকৃতি থেকে কখন তিনি দু'এর একটি ছন্দ নিয়েছেন বা বলা চলে দু'এর একটি কোন ছন্দ যেখানে পেয়েছেন সেইখানেই তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন। এক রকমের ছবিতে আর্টিষ্টকে আমরা পাই, আর্টিষ্টের মনোজগতের পরিচয়। আর এক রকমের ছবি, আর্টিষ্টের একটা মুহূর্তের মনের অবস্থাকে।

নন্দলালের যে ছবিগুলির উদাহরণ আমরা এখানে দিয়েছি এগুলি স্কেচ হলেও পুরোপুরি বিলিতি স্কেচ নয়, অর্থাৎ, বস্তুর থেকে প্রেরণা এসেছে এই অর্থে বাস্তব হলেও বস্তুতেই সীমাবদ্ধ বা বস্তুর ভারে অচল নয়—অনেকটাই আবার সাবজেক্‌টিভ, স্ব-তন্ত্র; আর্টিষ্টের মন মেজাজ ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর মুদ্রাঙ্কিত।



যেমন ভাব তেমনি লাভ

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁধা গরু ছাড়া পেলে একবার সে প্রাণখুলে মনের আনন্দে চারিদিকে ছুটে বেড়ায়, যেন নতুন কিছু পেয়েছে, যা হতে সে বঞ্চিত ছিল। চাকুরী হতে রিটায়ার করে কাশী এসে আমারো সেই অবস্থা দাঁড়ায়,—বাঁধা সময়ের উর্দ্ধে যেন পৌঁছে দিয়েছিল। আর ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে হয় না, টাইমপিসটার সামনের দিকটা দেয়াল-মুখো করে রেখেছি। তার তাড়া আর সইতে হয় না। কি আরাম !

বাসাটা ছিল মহল্লা রামাপুরোয় রাস্তার উপর। সকালে চাপানান্তে নিজের ইচ্ছা-মত বেড়াতে বেরুই। সুবিধামত দেবদেবী দর্শন করে বাসায় ফিরি। পথে পরিচিতদের সঙ্গে দেখা হলে অভ্যাসমত নানা কথা হয় সময় কাটাবার সেটা যেন চলতি আড্ডা। সবি অপ্রয়োজনীয়, কিন্তু সবি তো চাই। অভ্যাস যায় না মলে।

বৈকালে কোথায় যাব ভাবতে হয় না, পা-দুটো মনের মুখ না চেয়ে আপনিই দশাশ্বমেধের পথ ধরে। কাশীর দশাশ্বমেধ, ছেলে বুড়ো, পণ্ডিত মূর্খ, মেয়ে পুরুষ সকলকেই টানে। সেখানে চিত্তবিনোদনের সকল বস্তুই হাজির। বায়ু সেবন, গঙ্গাদর্শন, সাধুসঙ্গ, জপতপ, ভজন-পূজন, লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়, বক্তৃতা শ্রবণ, ধর্মকথা, বিষয়ের কথা, আড্ডা-বিলাস, যিনি যা চান সবই সুলভ।

সকালে কিছুদিন ধর্মকর্মের একটু আঁট থাকে, ক্রমে মন্দা পড়ে আসে, অর্থাৎ কাজ সারায় দাঁড়ায়। এইটাই বোধ করি সাধারণ নিয়ম। তখন সকালের প্রোগ্রামটা সহজেই এলো-মেলো হয়ে আসে, কেবল একটি আইটেম রেহাই দেয় না—বাজারটা করতেই হয়। তাতে অবসরপ্রাপ্ত জজ মুনসেফও বাদ যান না। দেখলুম হাকিম থেকে অল্প আয়ের লোক, সকলের জন্যই ও রাজপথটি এক,—বুঝলুম বাজার ও যমেরবাড়ী সকলকেই যেতে হয়। তাই সকলে চা খেতে খেতে কি করি কি করি ভ.বটা আসে, শেষে বাজারেই যাই।

সেদিন সকালে ঐ ভাব নিয়ে নেমে বাসার বাইরে চৌতারাটায় এসে দাঁড়িয়েছি, ব্রাহ্মণীর একটা মেওয়ার ফরমাজ কানে এলো—"কাল লাউ এনেছ, চিংড়ি মাছ দেখতে পেলেই এনো।" শুনে একটু হাসির আমেজ এলো—ইনসলভেন্ট অবস্থার ব্যবস্থা বটে ! দেখি অদূরেই একটি কৃষ্ণবর্ণের ভদ্রলোক আমার পানে চেয়ে আসছেন যেন কিছু জিজ্ঞাসা করবেন। বয়স বোধ করি ষাট পেরিয়েছে,—চুল তেমন পাকেনি, শির-দাঁড়া স্ট্রেট করেই চলেন। নবাগতই হবেন। গায়ে খাকি সার্ট, দুটি বুক পকেট, সোনার কি পিতলের বোতাম বন্ধ।

এসেই বেশ স্পষ্ট সুরে প্রশ্ন করলেন—"আপনার বুঝি এই বাড়ি"?

"আজ্ঞে বাড়ি নয়, এই বাসাতেই থাকি।"

"কেনো—কি করা হয়?"

"কাশীবাস ছাড়া আর কি বলব ! পরে মালিকের ইচ্ছা"—

আমার আপাদমস্তক একবার কটাক্ষ বুলিয়ে নিয়ে—

"আপনার তো কাশীবাসের বয়স নয়, তাড়াতাড়ি কি ছিল?"

তাঁর এ কথাটার মধ্যে বিশেষ অন্যায় ছিল না, কারণ তাঁর চেয়ে বয়সে আমি প্রায় বছর পনের ছোটই হব। আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই—

"চাকরি করতেন কি?"

"বাঙালী আর কি করে !"

"হ্যাঁ তাই বলছি। ক্যাসের চাষে ছিলেন বুঝি? সময়ে বড় সাহায্য করে—আমরাও তো চাকরিই করেছি আজ ছেলের ভাত, কাল মেয়ের বিয়ে, পরে তীর্থবাস, কার কাছে হাত পাততে যাব ! সম্ভ্রম রক্ষার সম্পত্তি,—হাত পাতলেই সুদ গোণো, মাথা নীচু করো,—কি বলেন, নয় কি?"

আমার চিত্ত ক্রমেই তিক্ত। কি আর বলব, বললেই বেসুরো হতে পারে। অপরিচিত ভদ্র-লোক, বাঁকা কথাই বোধ হয় ওঁর প্রকৃতি-সুলভ, নিজের সে লক্ষ্য নাই। অথচ বেশ সপ্রতিভ। বললুম—"বাজারে বেরিয়েছি, দেখা হয় তো অন্য সময় কথা হবে, মাপ করবেন, এখন তাড়া রয়েছে"......

"ওঃ তাড়া দেবার লোক আছে,—সস্ত্রীক বুঝি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁকে আর কোথায় ফেলব।" একটু হতাশ ভাবেই বললেন, "তাইত, আমি নতুন এসেছি, এখানকার কিছু কিছু জানবার ছিল, জানা দরকারও। বোকার মত থাকতে পারব না, তাই"......

"তা হলে আপনি কিন্তু ঠিক লোক ধরেন নি, আমার বিশেষ কিছু অভিজ্ঞতা নেই, বাজার, দশাশ্বমেধ আর নিকটস্থ দু'চারটি প্রসিদ্ধ দেবমন্দির ছাড়া। লোকজনের মধ্যে ধোপা, নাপিত, গয়লা আর কয়েকটি পরিচিত আলাপী মাত্র"......

"ওটা বুদ্ধিমানের কথা হল না। আচ্ছা সে আমি বুঝে নেব। যেখানে থাকতে হবে তার নাড়ীর খবর রাখতে হয়, আনাড়ীর মত থাকব কেনো ?"

"আপনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু বুদ্ধির দাবী আমার কিছুমাত্র নেই যে। শুনেছি লোক ওসব বিষয়ের দুর্ভাবনা ঘুচিয়ে কাশীতে মৃত্যুর আশাতেই আসেন—I mean মুক্তির।"

"বাজে কথা—rot, আপনার সব গেছে নাকি ?"

"এতবড় অহংকারের কথা মুখে কি মনেও আনতে পারি না মশাই, এখন অনুমতি চাই, আমি বাজারে চললুম"......

"আচ্ছা যান, আবার হবে, আমি এই লাইনেই ৬।৭ খানা বাড়ি পরেই বাসা নিয়েছি, ওই বিপিনবাবুর অট্টালিকার পাশেই"—

আমি নমস্কার করেই বেরিয়ে পড়লুম,—যেন কাটগড়া থেকে বেরুলুম।

কাশী এসে আবার জেরার জবরদস্তি কেনো! একি অস্বস্তি। তেষ্টা পেয়ে গেছে। সুরেনবাবুর দোকানে চা খেতে হবে। তা যেন হল, কিন্তু মনটা বিগড়ে দিয়ে গেছেন। যখন এত নিকটে বাসা, দেখছি যখন তখন আসবেন। লোকটি কে, কোথায় কাজ করতেন, ঠিক বুঝতে পারলুম না। এ বয়সে খাকির ওপর ব্রাসোঘসা ঝক্‌ঝকানি, বুক চিতোনো চাল, কথাবার্তাও মিষ্টতা বর্জিত,......। দূর হকগে, সাড়া না দিলেই হবে। না তাও কি হয়, কাশীতে মিথ্যার আশ্রয়! যাক্ যা হয় হবে। চিংড়ি মাছ না উঠে যায়,—দ্রুত চললুম।

কি পাপ ! আবার ঘুরে ফিরে মনে আসে ! দুর্বল নার্ভাস লোকের রোগই ওই। উনি সহজ ভাবেই কথা কয়ে থাকবেন, আমারি বোঝবার ভুল, তাই ভাল লাগেনি। কথাবার্তা, চালচলন মানুষ মাত্রেরই স্বতন্ত্র,—এক ছাঁচেগড়া পুতুল তো আর নয়।

সুরেনবাবুর দোকানে এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে বাজারে ঢুকলুম। দু'পয়সার চিংড়ি মাছ আর এটাওটা যথা আলু, বেগুন, পুঁইশাক নিয়ে এসে দোকানে বসে নিশ্চিন্তে চায়ে চুমুক দিয়ে বাঁচলুম। তারপর প্রত্যা-বর্তন। সওদা দেখে ব্রাহ্মণী খুব খুশি "আহা মুলো ছিল না, কাল দেখো।"

(২)

সকালে উঠে পর্যন্ত কি যেন একটা তাড়া সঙ্গ নিয়েছে, সব কাজ সত্বর সারাচ্ছে। পেনসন নেবার পর এমনটা ছিল না—সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ব্রাহ্মণীও সেটা লক্ষ্য করেছেন—"ব্যাপার কি, কাজ আছে নাকি "?

"কৈ-না,—চায়ের জলটা একটু বেশী নিও।" শুনে বোধ হয় একটু হাসি টানলেন।

সার্টটা গায়ে দিচ্ছি, বাইরে কালকের সেই পরিচিত কণ্ঠে—"বাবু বাড়ি আছেন কি"?

বললুম—"দাঁড়ান যাচ্ছি"। নীচে নেবে গেলুম।

"উঃ এই আটটা বেলাতেই প্রচণ্ড রোদ্দুর"......

"ও তো নেননি কেনো ?"

"ওটা অভ্যাস নেই—চাকরিতে ঢুকে পর্যন্ত ছিল না।"

"ওঃ ইঞ্জিনিয়ার"......

"না, তাঁরা ইচ্ছা করলে নিতে পারেন।"

যাক্ ও কথা, নীচে তো ঘর রয়েছে দেখছি।

"তা না থাকলে গ্রীষ্মকালে এখানে দিন কাটানো বড়ই কঠিন।"

"তবে আর কি, বৈঠকখানা তো রয়েছে, ও না থাকলে কি ভদ্রলোকের চলে"......

"ঠিক কথাই বলেছেন, নিষিদ্ধ না হলেও কাশীবাসীর ওটা শোভনও নয়—অনিষ্টকর। ওর সময় গেছে, করাও হয়েছে অতিরিক্ত আর কেনো। ও সব সাধ মিটিয়ে কাশী আসাই ভালো নয় কি?"

শুনে কয়েক সেকেণ্ড আমার দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে "বুঝেছি, অনেককে চা খাওয়াতে হয়, না? ঝঞ্ঝাট বটে। উপায় ভেবেছেন মন্দ নয়। তা বাড়ীতে স্ত্রী-ই হোন যিনিই হোন, একজন আছেন তো—আপনাকে তো আর সে ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে না!"

বড় তিক্ত লাগলেও প্রথম পরিচয়, অনিচ্ছার হাসি হেসে বললুম—"অবস্থা ত সকলের সমান নয়, চাকর বাকরও নেই। এখনি বাজারেও ছুটতে হবে। রোদ্দুর লেগেছে একটু বসুন।' ঘরের তলাটা খুলে বললুম—"এই মাদুরই আমার সম্বল, কষ্ট করে এইতেই বসতে হবে।' বেশ সম্প্রীতভ ভাব—"তা বসছি, ঘর তো মন্দ নয়, ৬।৭ খানা চেয়ার রাখলেই হয়—তাতে কোমরটাও সোজা থাকে।"

হাসতে হাসতেই বললুম—"কোনোদিন মনে পড়েনি মশাই যে কোমর সোজা করতে কাশী এসেছি। মনটাকেই সোজা করতে পারলুম না!"

তিনি তখন এক মনে ঘরের ভেতরটা ভাল করে দেখছিলেন। —"এই যে ছবিও রাখেন,—রবি ঠাকুর না? কই অরবিন্দ কই?"

"Inspiratonএ সাহায্য করে বলেই বলছি" বলে হাসলেন।

"আমার ঐ একটির মধ্যেই সব।"

"তা বটে, universal genious, দেশের কথাও বলেন, ধর্মের কথাও বলেন, I mean লেখেন—অনেকেই গুরু বলেন—না?"

"তবে আর কি, সবি তো জানেন; আসছি।"—ওপরে গিয়ে দু'কাপ চা হাতে করে এলুম। একটু চা খান, আমিও খাই।

"তাই তো, দিলেন যে!" চুমুক দিয়ে—'বাঃ trained hand দেখছি। কতদিন আস্বাদ করছেন? ভাগ্যে মেলে"......

এরূপ নীচ স্বভাবের কথাবার্তা নীরবে হজম করা কঠিন হলেও কথা বাড়ালুম না। ভাবলুম ভদ্র সঙ্গ পাননি, কুলি মজুরের নহরতে তাদের অভ্যাসই স্বভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। বাকি চাটুকু এক চুমুকেই শেষ করে কাপটা নাবিয়ে রাখলুম।

তিনি যেন ইচ্ছা করেই বিলম্বিত sip আরম্ভ করেছিলেন, বললেন—"ওকি, হয়ে গেল নাকি? Partyতে ওটা এটিকেট বিরুদ্ধ হয়, জানেন বোধ হয়।"

"এক সময় হোতো, কাশীতে আর হয় না, নিতান্ত বাজে ভদ্রতা বলেই মনে হয়। অভ্যাস দোষে না খেলে মাথা ধরে বলেই খাই। ভালটা সহজেই ছাড়া যায়, মন্দটার প্রভাব কচ্ছবের কামড়ের মত। এখন বাজারের দিকে মন পড়ে রয়েছে"—

"বাজার তো এখানে সারাদিন খোলা।"

কথা কইতে আর ইচ্ছা হচ্ছিল না, তবু কইতে হল—"বলছিলেন না—আটটা বেলাতেই প্রচণ্ড রোদ্দুর। আমার চাকর নেই—নিজেকেই সব করতে হয়, তাই ব্যস্ত হচ্ছি"——

"চা-টা খেতে দিন"—

"খান না।"

"ওটা আরাম করে খাবার জিনিস, তায় আপনার উনি বানিয়েছেন ভালো"—

"বাজারের থলিটে আনি" বলে উঠে গেলুম,—"ডাকলে আসব। এঁকে দেখছি স্পষ্ট বলাই ভালো"

৫।৭ মিনিট পরে ডাক পড়লো। থলি হাতে করে নেবে এসে দেখি, বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছেন। ২।৪খানা বই ছিল, খুঁজে বার করেছেন, "নৈবেদ্যখানা" হাতে।—

"বড় ভাল লাগছে, এখানা আমি নিয়ে যাচ্ছি—যাব?"

হাসতে হাসতেই বললুম—"আপনার দেখছি বড়লোকের লক্ষণ সবি বর্তমান, লোক নির্বাচনে ভুল করা তো আপনার যোগ্য হয়নি। আমি নিম্ন স্তরের অবস্থাহীন মধ্যবিত্ত, আপনার সঙ্গে তাল রেখে চলা আমার পক্ষে সঙ্গতও নয়, সম্ভবও নয়, আপনি সুখ পাবেন না, ক্ষুণ্ণই হবেন। পদে পদে আমার অভদ্রতাই পাবেন।"

"কেনো, কেনো, আমাতে বড়র লক্ষণ কিসে পেলেন?"

"আমাকে নিজে সব করতে হয়, আপনি সেটা বুঝতে পারছেন না।"

"বাজার করা তো? আমার চাকর তা করে দিতে পারবে"......

"মাপ করবেন—ঐটাই আপনার বড়লোকের লক্ষণ। আপনার ও দয়ার কথাটা গরিবদের যে কোথায় গিয়ে কতটা লাগে, সেটা আপনি বুঝতে পারবেন না। অনুগ্রহ জিনিসটা দাতার পক্ষে এক ভাবের জিনিস, গ্রহিতার পক্ষে ঠিক তা নয় যে।"

"আচ্ছা ও কথা পরে হবে। আপনি আমার suggestionটা অন্যভাবে নিচ্ছেন কেনো, আমি আপন ভাবেই বলেছি। আমার ওতে অসুবিধা হত না, আপনার কাজটাও হয়ে যেত, তাই বলেছি।"

"শুনে সত্যই সুখী হলুম, কিছু মনে করবেন না। ওটা অজ্ঞানের স্বাভাবিক অভিমান। আমি বড়দের লক্ষণটা লক্ষ্য করেই বলে ফেলেছি, আপনি শুনতে চাইলেন কিনা। আমার অল্প পয়সায় সামান্য বাজার, তাতে আমি অভ্যস্তও, দরকার হবে না, ক্ষমা করবেন।"

"বেশ এখন বইখানা নিয়ে যাচ্ছি" বলে ঘর থেকে বেরুলেন,—"কি বলেন"? বলব আর কি! আমিও বললুম—"বেশ"।

বলবার ইচ্ছা ছিল—"ওটাও বড়দের সহজ ভাষা একেবারে "নিয়ে যাচ্ছি" বলবার পর আর কোন্ কথা চলে? থাক একটা লক্ষণ বলেই মনে মনে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি। যেতে যেতে "তাইত, আমার যে জানবার বিষয় অনেক, সেটা যে হচ্ছে না।"

আপনার সময় ও সুবিধা কখন সেটা শুনলে যে আমিই যেতে চেষ্টা পাই। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, আমি বিশেষ কিছু জানিনা, গয়লা, ধোপা, বাজার এদের সঙ্গেই সংস্রব, এদের কথাই একটু আধটু জানি মাত্র। হেসে বললেন—"ও আমি অনেক শুনেছি। তারপর তিন পুরুষের কথা বেরিয়ে এসেছে, খিড়কি দোর দে কাদের যাওয়া আসা তাও। আমার সময় এই বেলা চারটার পর সাড়ে পাঁচটা ছটা পর্যন্ত, তখন কিন্তু বড় গরম, তা আমার টানা পাখা আছে। আপনার কষ্ট হবে না"—লক্ষণগুলো বাড়ছে। "কষ্ট হবে না কিন্তু অভ্যাস নষ্ট হবে যে, তা হোক নিত্য তো আর নয়। কিন্তু আপনার কাজ হবে কতটুকুই বা!" বলে হাসলুম।

"হাসলেন যে?"

"অনেক দিনের একটা কথা মনে পড়ে গেল, সে বলবার সময় এখন নেই, দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

"সংক্ষেপেই বলুন না, আমি ইসারায় বুঝতে পারি।" চমকে গেলুম! বললুম,—"যৌবনে একবার বিশেষ দরকারে প্রাচীন কবিদের সঙ্গীত সংগ্রহের জন্যে পাগলের মত ঘুরে বেড়াই, শান্তি ছিল না। কোথায় পাব, কার কাছে পাব, এই চিন্তাই দিন রাত। শুনলুম বালী গ্রামের ভগবতী বাঁড়ুয্যের কাছে গেলেই উদ্দেশ্য সফল হবে। তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ, সখের কবির দলের একজন প্রধান গায়ক ছিলেন। কাছে গিয়ে তাঁর অনুগ্রহ-প্রার্থী হলুম। শুনে তাঁর সে কি আনন্দ। সস্নেহে বসিয়ে কবিদের কথা আরম্ভ করলেন, কোথায় কোন আসরে কোন গান হয়েছিল, কারা উপস্থিত ছিল, ঈশ্বর গুপ্ত কি চাপান দিলেন, নীলু সেকরা কি উতোর (উত্তর) দিলে, ১৭খানা ঢোল বেজে উঠলো। সাবাজারের রাজবাটীর বৌমার হাতের বালা আসরে এসে পড়লো ইত্যাদি—উন্মত্তের মত অনর্গল বলে যেতে লাগলেন। বৃদ্ধের সে কি উৎসাহ—যেন সেই অতীতের যৌবন উপস্থিত। বললেন, কত চাও, সব পাবে, সব দেব। বললুম—"আমার রবিবারটি মাত্র সময়, আমাকে বলে দিলে বা খাতাখানি দিলে, আমি এইখানে বসেই লিখে নেব।" খুব খুশি, বোধ হয় কিছু না খাইয়ে ছাড়েন নি। আমিও পরিপূর্ণ আশা ও আনন্দ নিয়ে ফিরি।

দ্বিতীয় রবিবার ছাতুবাবুর বাড়ির কবির লড়াই, পূর্ব ন' পাড়ায় তাণ্ডব নৃত্য, কলকেতা তোলপাড় ইত্যাদি মাস দেড়েক ভরপুর শোনা

লে। এইভাবে দেড়মাস আমার রবিবারগুলি কাটে—মল্লিক বাড়ি, বোসেদের বাড়িই চলে। হাতে কলমে করতে হয়নি। হতাশ হয়ে শেষ ভগবতী বাবুকে প্রণাম করে বিদায় লই। তিনি —সে সব দিনের কথা নিয়ে উন্মাদনা ও উচ্ছ্বাসেই মগ্ন থাকতেন, আমার অবস্থা—আমি যে কেন তাঁর দ্বারস্থ সেটা ভুলে যেতেন।—

এখন বুঝতে পারি সেটা ছিল তাঁর প্রেমের বস্তুর পূজা।

বাসায় পেঁছে গেলেন। হেসে বললেন—"বুঝেছি, সে ভয় পাবেন না, আমি আপনাকে সে কষ্ট দেব না।"

"আপনি কর্তা নন"—বলে বাজারে চলে গেলুম। —তাইত, কি করি! এ যেন নিজস্ব খুইয়ে অন্যের মানুষ হয়ে থাকা। ভাল লাগছে না।

(৩)

বেলা চারটে বেজে গেল, উঠে পড়লুম। মুখ হাত ধুয়ে জামাটা গায়ে দিচ্ছি, ব্রাহ্মণী বললেন—"একি! এই রোদ্দুরে কোথাও বেরুবে নাকি? কেনো, কি এমন কাজ?"

"আছে একটু—সেটা না সেরে ফেললে স্বস্তি নেই।"

"বলেছিলে না, কাশী গেলে নিশ্চিন্ত!"

"হাসি টেনে বললুম—ওটা গেলে নয়—পেলে!" বিরক্ত ভাবে বললেন—"থাক আমি শুনতে চাই না। চা-টা করে দি খেয়ে যাও।"

"না, যেখানে যাচ্ছি সেইখানেই খাব, তুমি দোরটা দিয়ে নাও" বেরিয়ে পড়লুম।

আমার আওয়াজ পেয়ে—"এই যে এসেছেন, দোর খোলাই আছে।" ঢুকে দেখি আর একজন উপস্থিত—পুঁথি গুটুতে গুটুতে বলছেন—"সর্বাগ্রে কাশী খণ্ডটা শুনে নিতে হয়, তাতে কাশী মাহাত্ম্যে শ্রদ্ধা দৃঢ় হয়ে যায়", ইত্যাদি।

"আচ্ছা আজ থাক, বাবুর সঙ্গে আমার কাজ আছে"। পণ্ডিত আমার দিকে চাইলেন, আমি নমস্কার করলুম।

এই যে কেদারবাবু—বাঃ একেই বলে সম্মিলন। রমণীবাবু মহাধর্মপ্রাণ, কাশী এসেই ধর্মালোচনায় মন দিয়েছেন—

"আপনি এখন যেতে পারেন" বলে তাড়া দেওয়ায় আমার দিকে চেয়ে "সব কুশল তো" বলতে বলতে তিনি চলে গেলেন।

তিনি যাবার পর বললুম—বামাচরণ স্মৃতিরত্ন (?) আমার পরিচিত। জব্বলপুরে দুর্গোৎসবের সময় ওঁকেই নিয়ে যাওয়া হত। বেশ লোক—

ফস্ করে বেশ বললেন, ও শাস্ত্র আপনার জানা আছে নাকি, বড় কঠিন।

ও আবার জানাজানি কি। শিক্ষিত শাস্ত্রজ্ঞানী; মন্দ হতে যাবেন কেনো?

"বটে,—ওই নজিরে? যদি বুদ্ধি থাকে, তাতে শিক্ষার রসান পড়লে, আর কি রক্ষা আছে, তাকেই বেশী ভয়।"

"আপনিও তো শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোক"—

"ও দুটোই স্বীকার করি"—

"যাক্, মিটে গেল", বলে হাসলুম।

"আজ তবে একটু শুনতে হবে, সব কথা হাসির কথা নয়—কেদারবাবু"—

তাঁর পরিচয় পাবার জন্যে সত্যই উৎসুক ছিলুম। সেই আগ্রহই আমাকে যেন টেনে বসালে। বললুম—"বলুন—শুনছি।"

তাঁর ওই—"সব কথা হাসির কথা নয় কেদারবাবু।" আর আমার "আগ্রহের টান"—দুটিই স্মরণ রাখবার কথা। তাঁর কথাটি যেমন সত্য, আমারটির "গ্রহ" সংযোগে ততোধিক ছিল। যাক্।

রমণীবাবু তাকিয়া বা 'গিদ্দে' ঠেশ দিয়েই ছিলেন,—সোজা হয়ে বসলেন ও আরম্ভ করলেন। —"আমি গরীবের ঘরের ছেলে,—আজ 'বড়' বলতে পারেন। কোনো প্রকারে preparatory এন্ট্রেনস্ পর্যন্ত পড়ে fees অভাবে শেষ পরীক্ষা দিতে পারিনি। পাস্ করা আমার পক্ষে কঠিন ছিল না,—বড় লাগলো। মনে মনে সঙ্কল্প করলুম—টাকা রোজগার করতেই হবে। ছেলেদের messএ (মেসে) পাচকগিরি স্বীকার করলুম—খাওয়াপরা আর ১২, টাকা মাইনে। পড়ার ঝোঁক কিন্তু প্রবল—ছেলেরা বেশী রাত পর্যন্ত পড়তো, আমি একাগ্রে শুনতুম। সকলেই প্রায় আমার সমবয়সী, ঠাট্টাও করত—"রান্না ভুলে গেলে চলবে না, বরং ওই 'পাকপ্রণালীখানা দ্যাখ' ইত্যাদি।" চুপ করে থাকতুম। রাত একটার আগে শুতুম না, তাদের বই নিয়ে দেখতুম, কঠিন বোধ হত না—ভালই লাগতো। তারা out booksও আনতো, বিশেষ করে—রেয়েনল্ডস্, গেবোরিও প্রভৃতি বিখ্যাত, নামী লেখকদের Detective Novels (গোয়েন্দা কাহিনী)। তার একখানা পড়েই মেতে গেলুম, ভারি interesting লাগতো। রাতকে রাত কোথাদে কেটে যেত। শেষ তারাই আমার সর্বক্ষণের চিন্তার বিষয় হয়। বিশ্বাস করবেন কি না জানি না,—তাঁরা যে পথে কঠিন সমস্যা problem solve করে, মীমাংসা করে, সকলকে অবাক করে দিয়েছেন ও নাম কিনেছেন, তার চেয়ে সহজ পথ আমার মাথায় স্বতই আসতে লাগলো! ভাবতুম—"আমি হলে এই করতুম, তাতে অনায়াসেই খুনে দুর্বৃত্তেরা ধরা পড়তো।" এইসব আমাকে পেয়ে বসল! আনন্দে, উৎসাহে আহার নিদ্রা গেল, যেমন করে হোক আমাকে 'পুলিশ' বিভাগে ঢুকতেই হবে।

আমি স্থির হয়ে শুনছিলুম, চমকে তাঁর দিকে চাইলুম। তাঁর লক্ষ্য এড়াতে পারিনি! হাসি টেনে বললেন, "আগে সবটা শুনুন, আমি সংক্ষেপেই বলছি। মনে রাখবেন—পুলিশ না থাকলে রাজ্য চলে না, দেশটা বদমাইসের বাসা হয়।"

"বলুন।"

বললেন—"গোড়ায় বুদ্ধি থাকলে ও ইচ্ছা প্রবল হলে সিদ্ধি এগিয়ে আসে। অনেক চেষ্টা করেও হাতে পায়ে ধরেও কাজ হল না! কিন্তু হতাশ হলে আমার চলবে না—জীবনটা বৃথা হয়ে যাবে। মনে পড়ল—আমার এক পূর্ব সহপাঠি সতীশের বাপ পুলিশের পদস্থ লোক। সতীশকে আমার ইচ্ছা ও দুঃখ জানালুম। তার পিতা সব শুনে, অনেক জেরার পর, ধর্ম সম্বন্ধে কথা পাড়লেন, আমার ধারণা শুনতে চাইলেন। আমার religious tendency, পরদুঃখ কাতরতা, সহানুভূতিশীলতা খুঁটিয়ে ও ঘাঁটিয়ে শুনে নিলেন। শেষ বললেন—এ বিভাগ দুর্বৃত্ত দমনের জন্যে, ওসবগুলি এখানে গুণ নয়। এখানে ভাবুকতার sentiment-এর কোনো মূল্য নেই, ওসব দুর্বলতা weakness মাত্র। নানা রোগের মত—ধর্ম একটা বড় রোগ, ওসব আনুমানিক ব্যাধি, সব চেয়ে বড় ফাঁকি। তাতে অপরকে ঠকানো চলে। আর দেখো প্রয়োজন মতো হয়কে নয়, নয়কে হয় করা—যার তার কাজ নয়, বিশেষ বুদ্ধির দরকার। অক্ষমদের কাছেই ওটা নিন্দার কথা। ওপরয়লার মন বুঝে কর্তব্য পালনই একমাত্র ধর্ম, আর তাতেই উন্নতি।" ইত্যাদি অনেক কথাই বললেন।

তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললুম—"আপনার প্রত্যেক কথাটি আমার হৃদয়ে সার সত্য হয়ে প্রবেশ করেছে, ধারণায় গুরু বাক্যের মত গাঁথা হয়ে রইল। আমার কোথাও সন্দেহ ঠ্যাকেনি। আপনি পুত্র ভেবে আমাকে দয়া করুন—পরীক্ষা নিন।"

তিনি খুশি হয়ে আমাকে Literate Constable করে দেন, এখন যাকে writer Hd. Constable বলে—Asstt. S. I.-ও বলে। বলে দিলেন—"অবকাশ পেলেই পুরাতন নথিপত্র দেখো, 'পিনাল কোড' দেখো।"

"আমার বড় ভালো লাগে—interesting লাগে বলে পিনাল কোডখানা মুখস্থ করে ফেলেছি।" আমার দিকে চাইলেন, তার দু'চারটে কথা জিজ্ঞাসাও করলেন। খুশি হয়ে বললেন—"তবে আর কি! দেখো 'ডায়ারি' লেখা বা ডায়ারি প্রস্তুত একটি বড় বিদ্যা, তাতেই জয় পরাজয়। ওর মধ্যেই বুদ্ধির পরিচয়। একটু চেষ্টাতেই তুমি পারবে বলে মনে হয়।"

"আশীর্বাদ করুন" বলে পায়ের ধুলো নিলুম। যাক্—

দু'বছরের ডায়ারি দশ দিনে দেখে গেলুম। গোলমেলে 'কেস'গুলির সাজাবার পদ্ধতি কি interesting! সাজানো তো নয়, তাদের প্রাণটি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া। তারপর তারা নিজেরাই কথা কয়, নিজেদের 'কেস' নিজেরাই চালায়। দর্পনারায়ণ মিত্তিরের মত দক্ষ লোক দেখলুম না। তিনি যাওয়ায় আলিপুরে অন্ধকার, তেমন হয়কে নয় আর কে করবে। যাক্, সরকারের উকীলকে (Public Prosecutor) তুষ্ট করতে আমার বিলম্ব হয়নি,—ক্রমে consult পর্যন্ত করতেন। একদিন একটি সঙ্গীন 'কেসে' কুল পাচ্ছিলেন না। ডেকে বিমর্ষ মুখে বললেন—"এ মামলা হারতেই হবে দেখছি রমণী! তাতে মালিকদেরও বদনাম। "পত্রিকা" মুকিয়ে রয়েছে,—ছাড়বে না। কমিশনার সাহেব আমার পিতৃতুল্য, তাঁর ইচ্ছা—যেমন করে হোক, এ মামলা জেতাই চাই। কিন্তু

উপায় দেখছি না। ডায়ারি তুমিই লিখেছিলে, আমি আর ভাল করে দেখিনি—নিশ্চিন্ত ছিলুম। এখন দেখছি—লেখা ঠিকই ছিল, কিন্তু আমাদের যেটি এখন দরকার পড়েছে, তার পথ...বুঝলে? আবার ও পক্ষে দুঁদে উকীল শশীবাবু রয়েছেন কি না, কথার প্যাঁচ কাজ দেবে না।" বলে, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

শুনে বড় লাগলো। আমি একেবারে Lower grade-এর লোক, জোর করে কিছু বলতে যাওয়াও গুস্তাকি। কিন্তু বয়স শুনলে না, অবশ্য, সবিনয়ে বলে ফেললুম—"হুজুর মাপ করবেন, ভালবাসেন সেই সাহসে বলছি,—এই লাইনটা কি কোনো কাজই দেবে না? তখন ভেবেছিলুম—বাজে কথার আচ্ছাদনে মৃত্যু-বাণটা চাপা থাক্ না,—এর পর যদি দরকার হয় কোনো কাজে লাগে। না হয় আনাড়ির লেখা ধোঁকা হয়েই থাক না। এই ছিল উদ্দেশ্য।"

"লাইনটায় আমার আঙুল দেওয়াই ছিল। তিনি, অর্থাৎ P. P.—পাবলিক প্রসিকিউটার, দেখবার সঙ্গে সঙ্গে আমার পশ্চাৎ হতে কমিশনার সাহেবের মাথাও ঝুঁকে দেখা দিলে। কখন যে এসে দাঁড়িয়েছিলেন জানি না। কেস্‌টার উপর পুলিসের দায়িত্ব নির্ভর করছিল, সকলেই চিন্তাকুল ছিলেন। দেখেই তিনি পি-পিকে সোৎসাহে বললেন—"Well?" পি পি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন—"Sir, the boy has saved us all,—our name and honour—Entire credit is his"—সাহেব আমার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে—"Name?—Service? জিজ্ঞাসা করে নিয়ে, শেষে পি-পিকে বললেন—"—Now, your line is clear—go on, am off"—তিনবার আমার পিঠ চাপড়ে, "Good day Mr. Sen, বলেই শিস্ দিতে দিতে চলে গেলেন।"

"তারপর—মামলা জয় ও আমার সৌভাগ্যের উদয়। এক বৎসর S. I. (সব্ ইনস্‌পেক্টর) ছিলুম, তারপর ইনস্‌পেক্টর, ক্রমে D. S. P. —পাঁচ বছরের মধ্যেই। যেটা বড় বিরল। আমাকে এক্‌টিং S. P. করে দিয়ে কমিসনার সাহেব বিলেত চলে যান। যা লিখে গিয়েছিলেন—একদিন দেখাব। দেখে অবাক হবেন।

ঘরের দ্যালে Lambert সাহেবের ফোটোর নীচে একখানা হ্যাংয়ার ঝুলছিল, দেখিনি, আমার তা অভ্যাসও নয়। তিনি উৎসাহে তড়াক্ করে উঠে সেখানি এনে আমাকে বললেন—Lambert সাহেবের নিজের হাতে present করা। তাতে মাথা ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন। "আমার নাম লেখা ও তাঁর দস্তখৎ করা আছে,—দেখুন—"

বললুম—"আপনার হাতেই থাক, আমি দেখতে পাচ্ছি। আমার হাতে দিয়ে ওর অপমান করবেন না। আমার দৌড় ছেলেবেলায় আঁব ছাড়ানো ছুরি, পরে পেন্সিল কাটা চাকু পর্যন্ত।"

"আমাদের ছিল risky service, অনেক ক্ষেত্রে ও আমার জীবনদাতা। সে সব বলব।"

"থাক, ছটা বাজে, আমি উঠলুম।"

"সে কি চা খেয়ে যেতে হবে। তবে চাকরের তয়েরি। আপনার মত পাব কোথা। সকলে তো সমান শিল্পী নয়।" হাসলেন।

একথাল লুচি, তরকারী, বাদাম, কিসমিস, পেস্তা ভাজা, Strawberry jam এসে গেল—রূপোর ট্রেতে চা।

বললুম—"মাপ করবেন, আমি অনভ্যস্ত। সন্ধ্যাও আসন্ন—"

"না না খেতেই হবে, এতো কিছুই নয়, খান।"

"আপনি আমাদের কথা বুঝতে পারবেন না, সে কথা পূর্বেই বলেছিলুম। এক মুঠো মুড়ি পেলে আমি তৃপ্ত হতুম।"

রেহাই পাবার আশা নেই। দুখানা লুচি তুলে নিলুম।

"ভাজাটা একবার খেয়ে দেখুন, ভুলতে পারবেন না।"

কিছু খেতেই হ'ল। শেষ চা খেয়ে ছুটি।

"কাল আসছেন তো? আসতে তো হবেই, সব কথাই বাকি রয়েছে—"

"কর্তা আমি নই, কাশীতে promise চলে না।" বলে হাসলুম।

"আমি ছাড়া আবার কর্তা কে? কোন্ রামা শ্যামা!"

যাক্, সেদিনের মত রেহাই পেলুম।

আমাদের এই ভাব বৎসরাধিক চলে। তাঁর উৎসাহ উত্তেজনা (rather উৎপাত) যতই বাড়ে, আমি ততই অতিষ্ঠ ও নিরুৎসাহ হতে থাকি।

শ্রোতা ভালো বলে বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আমার সুনাম বা বদনাম কম ছিল না। আমি সেটা বুঝেও—"আমিই" ছিলুম। বুদ্ধির বড়াই ছিল না, তার ব্যবহারের চেষ্টাও পাইনি।

তাঁর রূপ নিতাই বদলাতো। ধর্মশাস্ত্রাদি দেখা বা শোনার আগ্রহ মুখে প্রকাশ করলেও, পণ্ডিতদের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর দ্রুতই কমতে থাকে। বলতেন—"আমি এতো মুক্ষু নই যে, বুঝতে পারি না, স্বার্থ ছাড়া বেটাদের কথাই নাই,—কি বলেন?"

বলি—"ওসব কঠিন বিষয় বুঝি না—আমার মাথায়ও ঢোকে না মশাই।"

"কি ঢোকে?"

এই যেমন সাধারণ বাক্যালাপ।—দুজনে দেখা হ'লে যা আপনিই আসে। ধর্মকথা কি ভগবানের কথা আর কবে হয়।"

"ভগবানকে দেখেছেন না কি?" আছেন—তাই-বা কি করে জানলেন যে, তাঁর কথা কবেন?"

"আজ্ঞে না—দেখিনি। তাঁর দুনিয়াটাই যতটুকু পারি দেখবার চেষ্টা পাই,—সেই যা বলে দেয়।

—সেসব বোধ হয় নিজের নিজের ভাবের উপর নির্ভর করে। সবার ভাব তো এক রকম নয়। ভাবান্তরে ঢোকবার মত সামর্থ্য বা সাহস নেই। দরকারও দেখি না—একটা মন; কতো বিরোধ বইবে?

"সে কি! কালচার চাই না? তবে সত্যে পৌঁছুবেন কি করে?"

"তারও তো লোক রয়েছে। তর্কপটু, ন্যায়ে সিদ্ধ পণ্ডিতেরা সেটা তো নিয়ে আছেন। প্রয়োজনে তাঁরাই বলে দেবেন।"

"আর আপনি তাই বিশ্বাস করবেন?"

হাসতে হাসতে বললুম—"তবে আর কাকে বিশ্বাস করব—করতে যে আমি বাধ্য। স্কুলে মাষ্টার মশাইর কথা বিশ্বাস করতেই হয়, করেননি কি?—সূর্য কত বড়, কত দূরে, এক সেকেণ্ডে তাঁর আলো—কতটা ছোটে, পৃথিবী ঘোরে না সূর্য ঘুরে দিনরাত দেখায়, এসব কথা কে বলে দিয়েছে। বোধ হয় আপনিও মেনে নিয়েছেন। জগতে শিক্ষকের অভাব নেই তো! আপনি লোক বাছায়ে ভুল করে বৃথা কষ্ট পাচ্ছেন কেন। বলেছি তো—ভগবান সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই, তর্কও নেই। আপনি আমার অন্তরায় হবেন না—ক্ষমা করুন। আমি জীবনের প্রান্তে উপস্থিত।"

"কিন্তু ভ্রান্ত।"

"সকলেই কি সব জিনিসের অধিকারী হয়। আবার 'আয়েনস্টাইনের' 4th ডাইমেনসন বেরিয়েছে। আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন। ওসব বড় কথা বোঝবার সামর্থ্যও নেই, সময়ও নেই।"

"শুনতে ক্ষতি কি?"

"আমার দরকার নেই বলেই বলছি—আর ঘুলিয়ে দেবেন না। একটা সত্য ঘটনা বলি, কানপুরে আমার এক আমারি মত বুদ্ধিহীন বন্ধু পেয়েছিলুম। সেটা দুর্গোৎসবের সময়, বোধ হয় পঞ্চমী—দুর্ভাগ্যে আমিই ম্যানেজার।"

"ওসব মানেন বুঝি?"

"আমার বাবাও মানতেন। 'পূজা' বলিনি, উৎসবে আপনার আপত্তি না থাকতে পারে তাই উৎসব বলেছি। যাক্, সেই সময় 'পুরী' হতে এক বিখ্যাত ভাগবত-সিদ্ধ 'গিরি' কানপুরে এসে পড়েন। তাঁর ভাগবত ব্যাখ্যা শোনবার জন্যে আয়োজন হয়েছে, দলে দলে লোক শুনতে চলেছে। আমার নড়বার উপায় নেই। এমন সময় সেই বন্ধুটির সঙ্গে দেখা। তাঁকেও যাবার জন্যে অনুরোধ করলুম। তিনি হাত-জোড় করে মাপ চাইলেন। আমি আবার! সে কি! এমন সুযোগ" —বললেন—"আপনাকে সত্যই শ্রদ্ধা করি, কিন্তু যাব না, ক্ষমা করবেন। আমি মুক্ষুসুক্ষু লোক, বয়সও শেষের দিকে ঢলে পড়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ 'কথামৃত' খানি নাড়াচাড়া করে এতটা দিন কাটিয়েছি, আনন্দও পেয়েছি। সেটা একটু বুঝতে পারি—তাই নিয়েই থাকি। আর কয়দিনই বাঁচবো। মূর্খের বিচার-বুদ্ধি থাকে না, পণ্ডিতদের ঘেঁষে সহজেই চঞ্চল হয়—বদলায়। এই শেষ সময়ে মহাপণ্ডিত আবার কি বড় কথা শুনিয়ে, জলের মত বুঝিয়ে দেবেন, মুগ্ধ হয়ে যাব—কেঁচে আবার নতুন কিছু ধরে বসব,—যার ফল হবে—ইতঃ ভ্রষ্ট

ততো নষ্ট! আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে মশাই, মূর্খকে আর বিপদে ফেলবেন না।" ইত্যাদি তাঁর সকল কথাগুলি আমার বড়ই ভালো লেগেছিল। মনে মনে তাঁকে নমস্কার করলুম—যেতেও নিষেধ করলুম।"

রমণীবাবু বললেন—"সকল জীব-জন্তুরই চেষ্টা বলে একটা নিজের জিনিস আছে,—সাফল্য তার সাহায্যেরই অপেক্ষা করে থাকে! আপনি তাঁকে উৎসাহ না দিয়ে ফস্ করে নিষেধ করলেন! চাই কি তিনি ঠিক পথ পেতেন, তাঁর ভালো হত। চেষ্টা থেকেই এত বড় জগৎটা দিন দিন গড়ে উঠছে, সেটা ভেবে দেখেছেন কি কখনো। আর এই যে আপনার সামনে (নিজের বুক ঠুকে দেখিয়ে বললেন) এত বড় একটা জীবন্ত উদাহরণ বসে রয়েছে, সেটা কি মিথ্যা নাকি? বলেছি তো চেষ্টায় কি না হয়; বার টাকার রাঁধুনী থেকে আরম্ভ করি—শেষ S. P.-তে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টে সমাপ্তি। গল্প কথা নয়। মোটর হাঁকিয়েছি, কমিশনার স্বহস্তে এই কোমরে হেঙার ঝুলিয়ে দিয়েছেন। চেষ্টা ছিল বলেই হয়েছিল, চেষ্টার অসাধ্য কিছু নাই। আর আপনি কি না বন্ধুকে উৎসাহ না দিয়ে বাধা দিলেন। আবার সেই কথা আমাকে শোনাচ্ছেন?"

বললুম—"অপরাধ হয়ে থাকে—ক্ষমা করবেন। আপনার অধ্যবসায়ের প্রশংসা করছি। সকলের বুদ্ধি, সকলের ইচ্ছা এক পথ ধরে চলে না, তাহলে জগতে বৈচিত্র্য থাকত না। ভগবানের সৃষ্টিতে একজাতেরই দুটো জিনিস রূপে গুণে, ওজনে, মাপে, এক পেয়েছি বলে তো মনে হয় না—না মানুষে না একটা গাছের কোটি কোটি পাতায়। থাক্—আমি চললুম মশাই,—ধোপা আসবে, কাপড় দিতে হবে।"

"তা কি হয়! আসল কথাটা যে বলা বাকি রয়েছে।"

"তবে সংক্ষেপে বলুন—আপনি কাশী এলেন কেন, সেই কথাটাই বলুন।"

"ব্যস্ত হবেন না,—সেই কথাটাই বলা বাকি। শুনুন।"

"Gladly—সেইটে শোনাই আমার ইচ্ছা, বলুন।"

বললেন—"যখন যা ইচ্ছে করেছি, নিজের শক্তি ও চেষ্টায় সবই করেছি। সেটা স্বীকার না করে পারেন না, কেমন? বেশ, পরে রিটায়ার করে (অবসর নিয়ে) ভাবলুম, এইবার দেশের ও দশের কিছু কাজ করব—করা আমার কর্তব্য। কারণ, বুদ্ধি, brain ও শক্তি কোনটাই আমার কিছুমাত্র কমে নি—বরং প্রেরণাই দেয়। দেশশুদ্ধ লোক—"ভগবান ভগবান" করে, সেটা কি দেখতে হবে। আমার দেখা মানে—হাতে পাওয়া, ঠগেদের মুখে শুনে নয়, কেতাব (যাকে শাস্ত্র বলেন) পড়েও নয়। সরেজমিনে প্রমাণসুদ্ধ চাই। বড় বড় চোর, ডাকাত, খুনে, অনেক বার করে দিয়েছি—ফাঁকি দিয়ে বড় হইনি। ভগবান নামধারী লোকটা দেখছি—তাদের ওপর। আমার কাছে সে কতদিন লুকিয়ে বাঁচবে। দেশের, জগতেরও বটে, এই শেষ উপকারটা করে যাব। কাশী নাকি তার বড় আড্ডা। দেখা যাক, কি হয়, তাই কাশী আসা।"

প্রলাপ আর শুনতে পারছিলুম না। তবু বললুম—"আপনার কাশী আসার উদ্দেশ্যটা শোনবারই আমার ইচ্ছা ছিল। মহৎ ইচ্ছা বটে। আপনি দয়া করে তা শুনিয়ে দিয়েছেন। এখন—"

"না না, আর একটু আছে। কাপড় কাচতে দেবার জন্যে এতো তাড়া কেন—সেটা তো বহির্বাস! আগে মনটাকে কেচে নিয়ে যান।"

"কি পাপ!"

"শুনুন—কোনটা পেতেই আমার বেশী সময় নেয়নি, not even S. P. হতে। ভগবান সে তুলনায় তো আমার কাছে—কিছুই নয়। তাকে পেতে বা ধরতে—দু মাস নিক, চার মাস নিক, না হয় ছ' মাসই দেবো। Enough—"

বললুম—"এসেছেন দু' বছর না?"

"সময়টা নষ্ট করেছি আপনাদের বিশ্বাস করে—যা কখনো বাপকেও করিনি। দেশটার যে প্রধান দোষ—সত্য গোপন করে—নিজেরা বড় হয়ে—গুরু হয়ে থাকা। তাতে দেশের যে কত বড় ক্ষতি করেছেন ও করছেন—সেটা কেউ ভেবে দেখেন না। সেগুলোকে মন্ত্র বলে, নিজেদের লোক ঠকাবার যন্ত্র করে, রোজ-গারের ও প্রতিপত্তির পথ করে রেখেছেন।। বলেন, "গুরুর আজ্ঞা নেই; বললে ফলে না! ধরুন যেমন সাপে কাটার ওষুধ। অনেকে জানে, বলে না, ওই গুরুর নিষেধ। লক্ষ লক্ষ লোক মরে গেল—তা যাক্!" আপনারা সেই দেশের লোক, ও আমার বিলম্বের কারণ।"

বললুম—"আপনার এ কথাটি হাজারবার মানি—নিজেরাও দুঃখ করে বলি। কিন্তু ওর সঙ্গে ভগবানকে জড়াচ্ছেন কেন? তাঁকে পাবার আর ওষুধ পাবার একই পথ নাকি? শেষ এই বুঝেছেন বুঝি?"

"আবার কি? সেও ওই ঢাকাঢাকির একটা। যতক্ষণ গোপন—ততক্ষণই মস্ত। কাজটা যখন হাতে নিলুম, আর বিলম্ব হবে না—সকলেই দেখতে পাবেন। কাটগড়ায় হাজির করে' দেখিয়ে দেব। এই পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট না থাকলে তান্তিয়া ভীলও আপনাদের কাছে ভগবান হয়ে থাকতো।"

"আমি আর শুনতে পারছিলুম না, উঠে দাঁড়ালুম। তিনিও তাড়াতাড়ি উঠে হাত ধরে বাধা দিলেন। বললেন—"আমরা ধারে কাজ করি না, দেনাপাওনা হাতে হাতে মেটাই। আপনার পাওনাটা নিয়ে খুশী হয়ে যান। তখন মানুষটিকে খাঁটি বলে চিনবেন।"

বললুম—"দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন। পাওনা-টাওনা আমার কারো কাছে নেই, দরকারও নেই।"

"শুনুন, শুনুন, দরকার আছে বইকি 'মহতের' নাই, বললুম—ভাল লোকের সঙ্গে আলাপে লাভ বই লোকসান নেই।"

"সেটা আমি স্বীকার করছি।"

"স্বীকারে তো কারো পাওনা শেষ হয় না? আমি যে ঋণী থাকতে পারব না। আপনার পাওনাটা যে আমারই কাছে। আপনি আসামী চেনবার ও ধরবার পথ পরিষ্কার করে দিয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন—তাকে এগিয়ে দিয়েছেন। এখন সে আমার দয়ার পাত্র।"

"কি বকছেন? আমি আপনাকে সাহায্য করেছি, আসামীকে এগিয়ে দিয়েছি? তার মানে—

তিনি হো হো করে একটা অভদ্র হাসি হেসে উঠলেন। বললেন—"যদি আমার ট্রিক বুঝতেই পারবেন, তবে আর আমাদের বিদ্যা ও বাহাদুরি রইল কোথায়? সব জেনে শুনে একজন আলাপী লোককে এত কষ্ট দেওয়াটা কি ভদ্রোচিত হয়েছে?"

"যা তা বকবেন না, বলবার মত কিছু থাকে তো বলুন।"

"বেশ, আমরা বাজে কথা বকি না। দক্ষতার কৌশলে উত্তেজনা সৃষ্টি করে, এক দুর্বল মুহূর্তে—আমার দরকারী কথাটি, বার করে নিয়েছি।" আবার সেই হি হি হাসি!

বললুম "দেখুন, আপনাকে ভগবান লাভ সম্বন্ধে সাহায্য করতে পারলে আমি নিজেই সুখী হতুম—একটা বড় কাজ হতো। দুর্ভাগ্যে আমার নিজেরই তা জানা নেই। পূর্বেই বলেছি—আমি বিশ্বাসী, তাই দরকারও হয়নি—চেষ্টার আবশ্যকও হয়নি। যদি অজ্ঞাতে আপনার বিদ্যার জোরে এমন কিছু বেরিয়ে পড়ে থাকে—যাতে আপনার কাজ হয়, সেটা তো উত্তম কথা। কিন্তু বিশ্বাস করুন আর না করুন, এখনো বলছি আমি তা বুঝিনি। সুতরাং আমার পাওনাও কিছু নেই।"

আবার সেই কুশ্রী হাসি! —"আপনি যদি বুঝবেনই" ইত্যাদি, বার বার সেই একই কথা। বললুম—"আমি আমার অক্ষমতা স্বীকার করছি। দয়া করে ছেড়ে দিন মশাই। আমি একা মানুষ, আপনি অন্যের সুবিধা-অসুবিধা বুঝছেন না কেন? রিটায়ার করেও রোগ পোষেণ কেন?"

"এখন যা করি বা করবো, তা দেশের ও দশের উপকারার্থে, দয়াময় সরকার কিন্তু জানতে পারলেই অযাচিত পুরস্কার দেন। যোগ্য লোক মরে গেলেও তাকে ভোলেন না; তখনো Knight (Sir) করে দেন।"

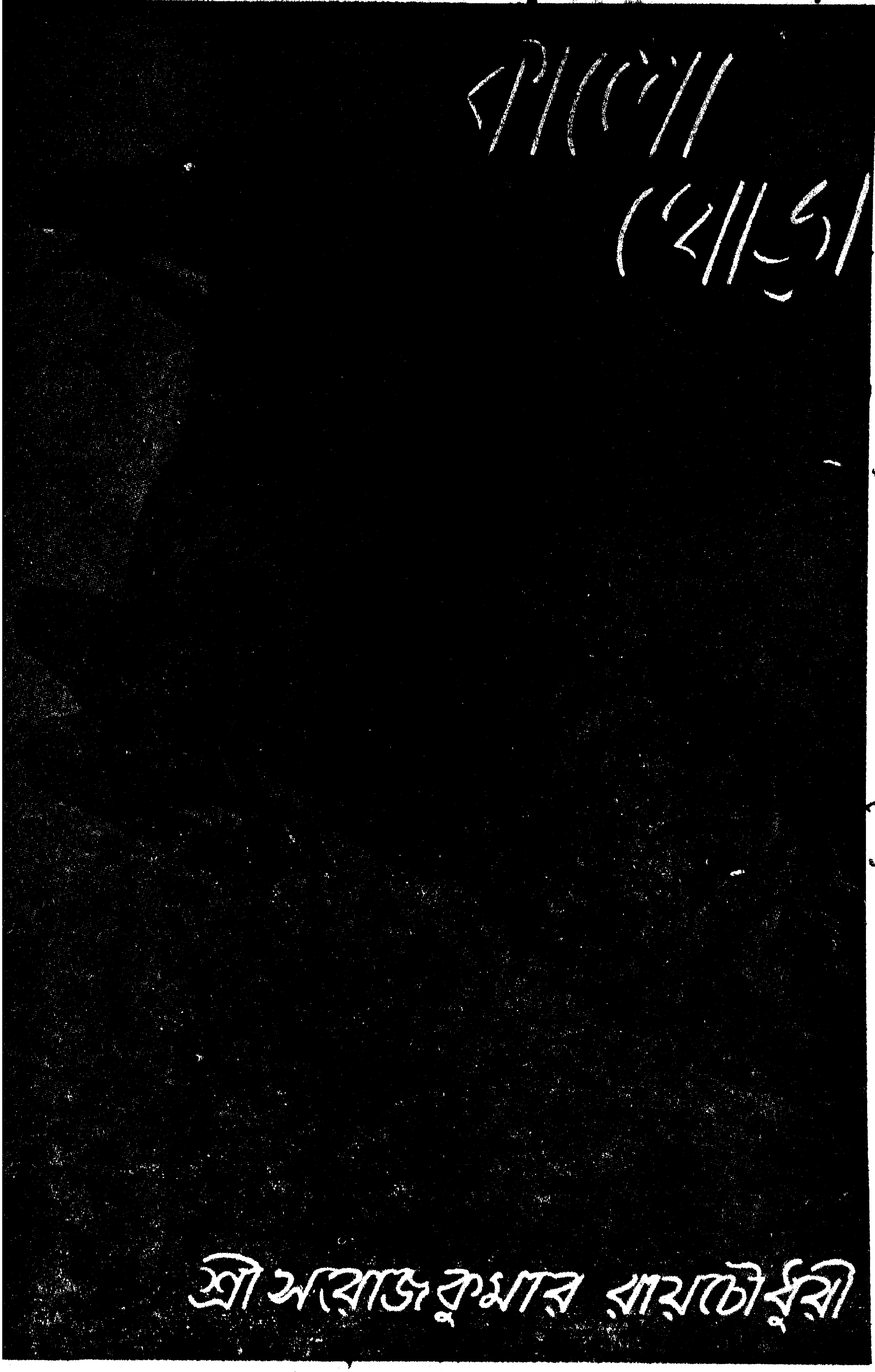
"কেন, আমরাও তো আপনাদের যখন তখন স্যার (Sir) বলি। যাক্, এখন তবে চলি—"

"যাবেন কোথা, যাই বললেই কি যাওয়া যায়!"

"ওরে বাবা! লোকটা বলে কি? এ ভূত-ছাড়ানোর মন্তর যে গঙ্গা ময়রার পিতামহের পুঁথিতেও নেই। ক্রমে নিজমূর্তি ধরচেন যে! কি কুক্ষণেই —

শেষ বললেন—সেদিন পণ্ডিতজীর বৈঠকে পাঁচজনের সামনে বলিয়ে নিয়েছি—আপনারই মুখ থেকে,—মহামতি অদ্বিতীয় পণ্ডিত চার্বাকের অমর বাণীগুলি কি তা মনে আছে কি? তারপর এক সপ্তাহ ধরে' চার্বাকের দর্শন ঘেঁটেছি,—আর যাবেন কোথা। সত্যটা আমাদের কাছে বেশী দিন গোপন রাখতে কেউ পারেন নি, পারেনও না। উত্তেজনা জিনিসটা আমাদের বড় উপকার করে। চার্বাক মতলবীদের একদম নির্বাক করে' দিয়েছেন।" —আবার সেই অভদ্র হাসি।

(৪১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)


কালো
ঘোড়া
শ্রী সরোজকুমার রায়চৌধুরী

কালোঘোড়া

শ্রীমন্তর বি-এ পরীক্ষার আর কয়েক মাস মাত্র বাকি। সে মাঝারি শ্রেণীর ছেলে। ভালোভাবে তাকে পাস করতে হলে প্রচুর পরিশ্রম করা প্রয়োজন। তাতে সে ত্রুটি করে না। ভগবান তাকে ক্ষুরধার বুদ্ধি দেননি। কিন্তু সে-ত্রুটি তিনি পুষিয়ে দিয়েছেন অটুট স্বাস্থ্য এবং অসামান্য পরিশ্রম করবার শক্তি দিয়ে।

শ্রীমন্ত পড়ছিলো।

রাত্রি তখন দুটোর কম নয়। ঘোষেদের অত বড় বাড়ি 'দেবধাম', একেবারে নিস্তব্ধ। বাইরের দোতলার বালাখানায় বারোটা পর্যন্ত হল্লা চলেছে। মদ্যপান এবং আনুষঙ্গিক অনেক কিছু। তাঁদের আর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। ফটকের রামমনোহর সিং ঘণ্টাখানেক আগেও সুর ক'রে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ছিলো। সেও চুপ করেছে। কেবল দূরের বস্তিতে কারা হোলির গানের একঘেয়ে মহড়া দিচ্ছে। তারাই এখনো স্তিমিত হয়ে পড়েনি। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে তাদের সুর এবং ঢোলের বাজনার শব্দ ভেসে আসছে।

যে ঘরটিতে শ্রীমন্ত থাকে, সেটাকে ঠিক বাইরের ঘর বলা যায় না। অন্দরও নয়। সদর এবং অন্দরের মাঝামাঝি একটি ছোট ঘর। তার একধারে একটা ছোট তক্তাপোষে তার বিছানা পাতা। ঘরটি জীর্ণ হ'লেও বিছানা বেশ ধোপ-দুরস্ত। ঝালর-দেওয়া নরম জোড়া-বালিশ, সুদৃশ্য বিছানার চাদর। বালিশ এবং চাদরের কোণে সুন্দর লতা-পাতার মধ্যে তার নামের আদ্যক্ষর S লেখা।

তক্তাপোষের পাশে একটি ছোট্ট টিপয়। ওদিকে জানালার ধারে একটি ছোট টেবিল এবং চেয়ার। টেবিলের উপর শ্রীমন্তের পড়ার বইগুলো সাজানো রয়েছে। কলমদানিতে একটি মূল্যবান ফাউন্টেন পেন।

পা-তলার দিকে একটি র‍্যাকে তার কাপড়-জামাগুলোও গোছানো রয়েছে। সেগুলো মলিন নয়।

দেখলে বোঝা যায়, পরের বাড়িতে শ্রীমন্ত দুঃস্থ অনাদৃতভাবে নেই। বরং বেশ আরামেই রয়েছে। তার পোষাক-পরিচ্ছদ চাল-চলন এ বাড়ির নিকট-আত্মীয়ের মতো। যাকে 'চ্যারিটি বয়' বলে সে-রকমের নয়।

চেহারাও তার এই বাড়িরই নিকট-আত্মীয়ের মতো। টকটক করছে রং। দীর্ঘচ্ছন্দ, বলিষ্ঠ, সুঠাম চেহারা। ঠোঁটে অল্প গোঁফের রেখা। মাথার কোঁকড়া চুল সযত্নে পিছন দিকে ব্রাশ করা। আজকালকার ফ্যাশান অনুযায়ী লম্বা জুলফি। ললাট, ভুরু ও নাক নিখুঁৎ। কেবল থুঁতের মধ্যে চোখ দুটি ছোট এবং ঠোঁট পুরু। কিন্তু সে-ত্রুটি চোখে পড়ে না। চাঁদে কলঙ্কের মতো তার মুখের সঙ্গে তা চমৎকার মানিয়ে গেছে।

নিজের রূপ সম্বন্ধে সে সকল সময় সচেতন। সে জেনেছে, সংসারে এই রূপের মূল্য আছে। সে সৌখীন ছেলে। সকল সময় দিব্যি ফিটফাট থাকে। বিকেলে বেড়াতে বেরুবার সময় একটু স্নো-পাউডার মাখে, রুমালে এসেন্সও নেয়। আর যা ব্যবহার করে সেগুলো সস্তা খেলো জিনিস নয়, ভালো-ভালো দামী জিনিসই।

সন্ধ্যা থেকে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত শ্রীমন্ত একনাগাড়ে ঠায় চেয়ারে ব'সে পড়েছে। তার মেরুদণ্ড টন টন করছিল। ক্লান্তিতে চোখ জড়িয়ে আসছিলো।

কিন্তু ঘুমোনো কিছুতেই চলবে না। ভবিষ্যতের একটি কর্মপন্থা নির্ধারণ
বড়লোকের ছেলেদের ফেল করা ... আপনারা সর্বপ্রকারে আমাদের
কিন্তু তার নয়। তাকে পাস করতে ... আদর্শ কেন্দ্র স্থাপন করা।
এবং এইবারে, এই প্রথমবারেই। রাত্রি ... শিক্ষার জন্যে ব্যবস্থা করা।
অবধি সে পড়বে। তারপর ঘড়িতে ... হাজার শিশু ছাত্রদের প্রত্যহ বিনামূল্যে
এলার্ম দিয়ে সে শোবে। এলার্ম
সে উঠে, মুখহাত ধুয়ে আবার
বসবে,—বেলা এগারোটা পর্যন্ত ... লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিদ্যালয় ও ছাত্রনিবাস
যাদের পাস করতে হবে, তিন
তাদের পক্ষে যথেষ্ট। ... সাথে গৃহীত হবে। আপনার সেই সাহায্য

তবু ঘুমে চোখ বুজে আ... ক্রশ সমিতি অথবা ভারতীয় রেড ক্রশ
শ্রীমন্ত ঘড়ি দেখলে একা... , এই ঠিকানায় পাঠান।
স্টোভ জেলে নিজেই একটু
খেলে।

হ্যাঁ। ঘুম এবার কেটে
পা ঝুলিয়ে ব'সে থেকে
গিয়েছিল। কফি খেয়ে
হ'ল। কফির গুণ আ
বেদনা কফিতে সারে
নয়, বাকি সময়টা
পড়া করাই ভালো।

... এই নভেম্বর
আরম্ভ হয়েছে। তা ...
তাও যেন ভেঙ্গে ...

রাখতে হবে। 'ডিক্লোভাইন'টা আরও কিছুদিন ব্যবহার করা প্রয়োজন। এ শিশিটা ফুরিয়ে আসছে। কাল আর এক শিশি কিনতে হবে।

টাকাও কিছু দরকার। ব্যাগে আর বিশেষ কিছু নেই।

শ্রীমন্ত টেবিল-ল্যাম্পটা বিছানার মাথার দিকে টিপয়ের উপর রাখলে। রুপোর ডিবেয় সুগন্ধী পান তৈরী করাই ছিল। গোটা-দুই পান মুখে পুরে একটা সিগারেট ধরালে।

সিগারেটটি শেষ ক'রে অ্যাশ-ট্রে'র মধ্যে ফেলে দিয়ে চিৎ হয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়া করতে লাগলো।

হঠাৎ দরজায় শব্দ হ'ল, ঠুক ঠুক।

তারপরে আবার ঠুক ঠুক ঠুক।

খুব আস্তে আস্তে শব্দ। শ্রীমন্ত লেপটা সরিয়ে দিয়ে উঠে এসে সন্তর্পণে দরজা খুলে দিলে।

হৈমন্তী!

তাড়াতাড়ি ওর পাশ
ঘরের মধ্যে ঢুকে ৮,৩৯০
বন্ধ করে দিলে। ৫,২২২
বিরক্তভাবে ৭,২১৭
ক'রে রেখে ৬,১৫২
সেই ... ৩,১২৫
তো ...
১,৮৩৪ ১,৩০,২৯০

...ন্ত
... নয়
!
আমার
গেলে
সর্ব-
ছ'দিন
মধ্যে
ঠলো।
পেলে
... টের
... টের
তাতে
।
তুমি
জানি,
বেঁচে
কালের
বছরের
নে না
কাজও
... আছেন,



মাথায় ছোট ছোট করে ছাঁটা চুলে পরিপাটি টিকি

খানি সে করুণ করে বলল, ছিঃ! ছিঃ! এমন কথা তুমি ভাবলে হিমু? অবশ্য আমি ভেবেছিলাম, আজ আর হয়তো তুমি আসবে না। কিন্তু দরজা সেজন্যে বন্ধ করিনি। ও-দরজাটা এমনি বেয়াড়া যে একটু হাওয়াতেই খুলে যায়। ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা এসে গায়ে লাগে।

হৈমন্তীর মন একটুখানি প্রসন্ন হ'ল।

বললে, বাইরে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেও ভয় লাগে। কি জানি, কখন কে দেখে ফেলে। সে-কথা বোঝ না কেন?

শ্রীমন্ত তেমনি কুণ্ঠিতভাবে বললে, বুঝি। কিন্তু ওই যে বললাম, ভেবেছিলাম আজ আর তোমার দয়া হবে না।

হৈমন্তী এবারে ফিক করে হেসে ফেললে। বললে, তোমার পরীক্ষা। আসব না-ই ভেবে-ছিলাম। কিন্তু এগারোটা, বারোটা, একটা বাজলো, ঘুম আর কিছুতে আসে না। শেষে দুটো যখন বাজলো আর পারলাম না থাকতে। চুপি-চুপি বাইরে বেরিয়ে এলাম। বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে দেখি, তোমার জানালার খড়খড়ি দিয়ে আলো আসছে। ঘরের মধ্যে দিদি অঘোরে ঘুমুচ্ছে। আর থাকতে পারলাম না। চলে এলাম।

—দিদি জানতে পারবেন না তো?

একটা রহস্যময় হাসি হেসে হৈমন্তী বললে, কি জানি!

—তোমার ভয় করছে না?

হৈমন্তীর মুখ হঠাৎ পাথরের মতো কঠিন হয়ে উঠলো। বললে, না। তোমার জন্যে আরও অনেক শক্ত কাজ আমি করতে পারি। হয়তো করতে হবেও। সেদিন দেখো।

হৈমন্তী অন্যদিকে চেয়ে স্তব্ধভাবে বসে রইলো।

শ্রীমন্ত খুশি হয়ে উঠলো। তার মস্তিষ্কে তখন ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো দোল খাচ্ছে একটি কথাঃ ব্যাগ খালি হয়ে এসেছে; কিছু টাকার দরকার।

খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসে ছিল হৈমন্তী। শ্রীমন্তর জন্যে অনেক শক্ত কাজ হয়তো একদিন তাকে করতে হবে,—এই কথার সম্পূর্ণ অর্থ শুধু সেই জানে। শ্রীমন্ত জানে না, জানার আগ্রহও তার নেই। তার ব্যাগ খালি হয়েছে। কিছু টাকার বড় দরকার। সে হৈমন্তীর পায়ের তলায় মেঝের উপর বসলো। তার মুখের নিচের অর্ধেকটায় টেবিল-ল্যাম্পের অনাবৃত আলো এসে পড়েছে। উপরার্ধে নীল-সোনালি ঝালরের ফাঁক দিয়ে নীল-সোনালি আলো।

নিজের সুন্দর মুখের মূল্য সে বোঝে।

সেই বিচিত্র আলোয় সুন্দর মুখখানি হৈমন্তীর মুখের দিকে তুলে সে আগ্রহভরে বললে, সে আমি জানি হিমু। কিন্তু তবু তুমি যখন রাগো, তখন আমার ভয় করে। নিজেকে এত অসহায় বোধ হয় যে, চারিদিকে অন্ধকার দেখি।

হৈমন্তীর স্তব্ধতা তখনও কাটেনি। গুরুতর কিছু-একটা হয়তো ঘটেছে। কিন্তু সেটা এখনও শ্রীমন্তকে বলার সময় হয়নি। একা তার মনকেই ভারাক্রান্ত ক'রে রেখেছে। হয়তো এখনও কিছুদিন একা তাকেই সেই ভার বইতে হবে।

শ্রীমন্তের কথায় সে নিঃশব্দে তার মাথার কোঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলো।

হৈমন্তী যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো।

তখন পাঁচটা বেজে গেছে। কিন্তু শীতের রাত্রি, বেশ অন্ধকার রয়েছে। অন্দর সুখসুপ্ত। সদরে রামমনোহরের ঘটি মাজার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। রাজপথে ট্রাম তখনও চলছে না। কিন্তু মাঝে মাঝে রিক্সার ঠুং ঠুং শব্দ ভেসে আসছে।

যাবার আগে হৈমন্তী বাইরের দিকের জানলাটা খুলে দিয়ে সেইখানে ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু দাঁড়ালো।

কী চমৎকার কুয়াশা করেছে বাইরে!

শ্রীমন্ত ওর পাশে এসে দাঁড়িয়ে সেই হাওয়া ফুসফুস ভর্তি ক'রে গ্রহণ করতে লাগালো। ঠাণ্ডা হাওয়ায় হৈমন্তীর উত্তপ্ত মুখ যেন জুড়িয়ে গেল। আঃ!

একটু পরে শ্রীমন্ত বললে, আর নয় হিমু। আর দেরি করা ঠিক নয়?

হৈমন্তী রেগে বললে, তাড়িয়ে দিচ্ছ!

—ছিঃ! ছিঃ! ওকথা বোলো না। আমার বড় ভয় করে। দিদির ঘুম ভেঙে গেলে সর্বনাশ হবে।

ফিক করে হেসে হৈমন্তী বললে, সর্ব-নাশের কি কিছু বাকি আছে? দিদি ছ'দিন হ'ল এসেছেন, তুমি কি মনে কর, এর মধ্যে সে কিছুই টের পায়নি?

ভয়ে শ্রীমন্তের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠলো। বললে, বলো কি!

অন্ধকারে ওর মুখ হৈমন্তী দেখতে পেলে না। কিন্তু কণ্ঠস্বরে ওর ভয়ার্ত অবস্থা টের পেলে।

বললে, আমি ঠিক জানি না। এখনও টের না পেলেও টের শিগগির পাবেই। তাতে তোমার ভয়টা কি?

শ্রীমন্তর সমস্ত দেহ শিউরে উঠলো।

বললে, ছেলেমি কোরো না হিমু। তুমি তো জানো না, কিন্তু আমি নিজে জানি, এইভাবে কত খুনখারাপি হয়ে গেছে।

হৈমন্তী দৃঢ়ভাবে বললে, আমি বেঁচে থাকতে নয়।

ওর সাহস দেখে শ্রীমন্ত মুহূর্তকালের জন্যে হতবাক হয়ে গেল। কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ের বুকে এত সাহস? বোধ করি, জানে না ব'লেই।

ব্যাকুলভাবে শ্রীমন্ত বললে, অমন কাজও কোরো না লক্ষ্মীটি। দিদি যে ক'দিন আছেন,

সে ক'দিন অন্ততঃ সাবধানে থেকো। নইলে তুমিও যাবে, আমিও যাব।

হৈমন্তী ওর ব্যাকুলতা দেখে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলো।

শ্রীমন্ত ওর হাত দুটি জড়িয়ে ধরে বললে, তুমি হাসছ হিমু, কিন্তু ভয়ে আমার সর্বশরীর হিম হয়ে গিয়েছে। তুমি কথা দাও, তুমি সাবধানে থাকবে?

এক মুহূর্ত গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে থেকে হৈমন্তী বললে, আচ্ছা, দিলাম কথা। দিদি আরও হপ্তাখানেক থাকবে। এর মধ্যে এ-ঘর আর মাড়াবো না।

বলতে-বলতে হৈমন্তীর চোখ ফেটে জল এল। কিন্তু তা শ্রীমন্তর চোখে পড়লো না।

সে খুশি হয়ে বললে, কেবল কাল একবার আসতে হবে। রাত্রে নয়, দিনে। আমি যখন থাকবো না সেই সময় এসে ইকনমিক্স-খানার ভিতরে দুখানা দশটাকার নোট রেখে যাবে, কেমন?

হৈমন্তী তখনও নিজেকে সামলাতে পারেনি। কোনোমতে বললে, আচ্ছা।

তারপর চুপি-চুপি বেরিয়ে গেল।

(২)

ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পেনীর আমলের কথা।

হরেরাম ঘোষ সেই আমলে একটি ইংরেজ ব্যবসায়ী ফার্মের মুৎসুদ্দি ছিলেন। তিনি নামে রাজা হননি বটে, কিন্তু মুৎসুদ্দিগিরি থেকে যে অর্থ তিনি ক'রেছিলেন তা রাজারই ঐশ্বর্য। ওদিকের চমৎকার ঠাকুরবাড়ী, নাটমন্দির, রাধা-বিনোদের নিত্যভোগ, অতিথিশালা এবং এদিকের নহবৎখানা, চাকর-দরওয়ানের থাকবার ঘর, বালাখানা, ভিতরের বিরাট অন্দরমহল,—এর অধিকাংশই তাঁর তৈরী।

অনেককাল তিনি গত হয়েছেন, কিন্তু বালাখানায় ইংরেজ শিল্পীর হাতে আঁকা তৈলচিত্র দেখলে তাঁকে অনেকটা বোঝা যায়ঃ মাথায় ছোট-ছোট ক'রে ছাঁটা চুলে পরিপুষ্ট টিকি, কণ্ঠে মোটা-মোটা তুলসী কাঠের মালা, ললাটে, নাসিকায়, অনাবৃত, লোমশ বক্ষে, বাহুতে তিলক, হাতে হরিনামের ঝুলি,—ঘোষ মশাই ভগবানের নাম করছেন। প্রশস্ত ললাট, আয়ত চক্ষু এবং গরুড়ের মতো বক্রাগ্র নাসিকা দেখলে বোঝা যায় তাঁর তীক্ষ্ম বিষয়বুদ্ধির অভাব ছিল না। বৈষ্ণবী বিনয় বিষয়বুদ্ধি অর্জনে সাহায্যই করেছে।

তাঁর পুত্র রামরাম অনেকটা পিতার মতোই বৈষ্ণব। তবে পিতার চেয়ে সুপুরুষ এবং অর্থের ঔদ্ধত্য চোখের কোণে ঈষৎ প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁর যে তৈলচিত্র বালাখানায় টাঙানো আছে তাও ভক্ত বৈষ্ণবেরই ছবি। কিন্তু পিতার মতো অনাবৃত গাত্রে নয়, গায়ে হালকা জরির কাজ-করা একখানা মিহি চাদর আছে।



তুমি হাসছো হিমু, কিন্তু ভয়ে আমার সর্বশরীর হিম হয়ে গিয়েছে

বলতে গেলে, এই বংশের আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যায় রায় বাহাদুর প্রতাপচন্দ্র ঘোষের তৈলচিত্র থেকে। তিনি মুৎসুদ্দিগিরি করতেন না। পিতৃ-ত্যক্ত বিপুল অর্থ ও সম্পত্তি থেকে রাজার মতো বিলাসে দিনযাপন করতেন। ছবিতেও এই পার্থক্য দেখা যায়। প্রতাপচন্দ্রের ছবি বিনীত বৈষ্ণবের নয়, সেকালের অভিজাত ভদ্রলোকের। মাথায় কার্ণিসওয়ালা পাগড়ী, পরিধানে মূল্যবান চোগা-চাপকান, বক্ষে গণিত চিহ্নের মতো পাকদেওয়া চাদর।

হরেরাম এবং রামরাম ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠতেন। প্রাতঃকৃত্য এবং পূজা সেরে বাইরের বালাখানায় এসে বসতেন। গঙ্গাস্নান-প্রত্যাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ফেরার পথে পায়ের ধুলো দিয়ে যেতেন। সেই রজ তাঁরা মূল্যবান রেশমী রুমালে ক'রে নিয়ে একটি রূপার কৌটায় সংগ্রহ করে রাখতেন। পাড়ার পাঁচজন ভদ্রলোক এবং প্রার্থীর সমাগম হ'ত। সাধ্যমত প্রার্থীদের কিছু-কিছু দিতেনও।

পাড়ার তিনকড়ি মুদী হঠাৎ মারা


প্রতি উৎসবে
রূপ সাধনার
প্রধান অঙ্গ
সি. আর. দাশের
রাঙ্গাজবা
সিন্দুর
কুমকুম
আলতা
"রূপং দেহি, জয়ং দেহি"—রূপের এই আরাধনা বিলাস প্রচেষ্টা নহে। সুন্দর হবার সুনিবিড় আহ্বান মানুষ পেয়েছে তার অন্তর পুরুষের কাছ থেকে। তাই কোটর ছেড়ে প্রাসাদ—বল্কল ছেড়ে সে সৃষ্টি করেছে বিচিত্র বসন ভূষণ। এ তার কত বড় গর্ব ও আনন্দ! প্রসাধন দ্রব্যও ক্রমোন্নতির পথ ধ'রে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। তার পরিচয় পাওয়া যায় ঘরে ঘরে "রাঙগাজবা"র নিত্য ব্যবহারে। বিশুদ্ধতায় ও বর্ণসম্পদে নারীকে সে দিয়েছে পরিপূর্ণ তৃপ্তি। তাই আজ প্রতি উৎসবে "রাঙগাজবা"র স্থান সবার উপরে। জাতি, ধর্ম ও বয়স নির্বিশেষে ভারত নারীর প্রিয়তম প্রসাধন, "সি. আর দাশের রাঙগাজবা সিন্দুর, কুমকুম ও আলতা।"
অনুপমা কেমিক্যাল : কলিকাতা

গেছে। নাবালক ছেলে অসহায়। শ্রাদ্ধের খরচ তাঁরাই দিতেন। নটুদত্ত দুপুরে রাত্রে মদ খেয়ে, বাড়ী ফিরে স্ত্রীর উপর অত্যাচার করেছে। দরওয়ান দিয়ে তাকে ধরে নিয়ে এসে সকলের সামনে কানে ধ'রে ওঠ-বস করিয়ে ছেড়ে দিলেন। সেই লোকটাই দুদিন পরে সন্ধ্যাবেলায় এসে বাবুর কাছ থেকেই মদ খাবার জন্যে দুটো টাকা নিয়ে গেল।

পাড়ার লোকের রোগে-শোকে বিপদে-আপদে তাঁরা যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। প্রয়োজন হ'লে খালি গায়ে একজোড়া খড়ম পায়ে দিয়েই তাদের বাড়ীতে উপস্থিত হতেন। পাড়ায় কোনো ক্রিয়াকর্ম হ'লে তাঁর বালাখানা থেকেই তার ব্যবস্থা হ'ত। আবার তাঁর নিজের প্রয়োজনের সময়ও পাড়ার ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই এসে প্রাণ দিয়ে খেটে সাহায্য করত।

• •

তখন কলকাতা এতবড় সহর হয়নি।

পাড়াও ছিল ছোট। ধনীর প্রাসাদকে কেন্দ্র ক'রে কতকগুলি দালান এবং কতকগুলি গোলপাতার ঘর। গরুতে-মহিষে ধনীতে-দরিদ্রে একটি পল্লী, একটি ইউনিট।

প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের চেনা। যেতে-আসতে দেখা হ'লে পরস্পর অভিবাদন-বিনিময় করে, কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। সমাজের শ্রেণী বিভাগ তখনও অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তখনও বর্ণাশ্রমের পূর্ণ প্রতাপ। ব্রাহ্মণ তো বর্ণের গুরু। তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। ক্রিয়াকর্মে স্বজাতির কাছেও জোড়হস্তে থাকতে হয়।

হরেরাম অথবা রামরাম কারও কাছেই ব্রাহ্মণ অথবা স্বজাতির কাছে জোড়-হাত ক'রে থাকাটা ক্ষোভ অথবা লজ্জার বিষয় ছিল না। তখন সেইটেই ছিল সামাজিক ভদ্রতা। তার ব্যতিক্রমই ছিল লজ্জার বিষয়।

সামাজিক ছাড়া অন্য ক্রিয়াকর্মও অবশ্য ছিল। তার চাল কিন্তু আলাদা।

সন্ধ্যার পরে উপরের বালাখানায় কার্পেট বিছানো হ'ল। ঝাড়ের আলো ঝলমল করতে লাগলো।

বাইজির নাচ হবে।

তাতে নিমন্ত্রিতের দল কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশী নয়। সহরের গণ্যমান্য বিশিষ্ট লোক, হরেরাম-রামরামের সমপদস্থ ব্যক্তি, সাহেব-সুবো। আতর-গোলাপ-পানের ছড়া-ছড়ি। মদ্য এবং গড়গড়ায় সুগন্ধী তাম্রকুটের আয়োজনও আছে।

এ মজলিস বর্ণাশ্রমী নয়। অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা এরই সাহায্যে বর্ণাশ্রমকে ধীরে ধীরে স্থানচ্যুত করার চেষ্টা করছিল, অথচ কেউ তা টের পাচ্ছিল না। এখানে দরিদ্রের স্থান ছিল না। ইংরেজ শাসক ও ব্যবসায়ীকে কেন্দ্র করে নতুন অভিজাত সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠছিল প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে। •

হরেরাম-রামরামের দল টিকি রাখতেন, সন্ধ্যাহ্নিক করতেন। পূজা-পার্বণ, দোল-দুর্গোৎসবও ভক্তির সঙ্গে অনুষ্ঠিত হ'ত। আবার মজলিসে গিয়েও বসতেন। সাহেব-সুবোদের সঙ্গে পান-তামাকও চলতো। একসঙ্গে বিলিতি মদ্যপানেও আপত্তি করতেন না।

কিন্তু সমাজের সম্বন্ধে তখনও তাঁরা বেপরোয়া হননি। সমাজব্যবস্থার উপর শ্রদ্ধাও একটা ছিল। তাই অনাচার যা করতেন তা গোপনেই করতেন, ভয়ে ভয়ে। এবং প্রকাশ্যে বর্ণাশ্রমী সমাজের নিয়ম-কানুন যথাসাধ্য মেনে চলতেই চেষ্টা করতেন। ব্রাহ্মণ-সজ্জন, ইতর-ভদ্র, ভালো-মন্দ নিয়ে দোষে-গুণে যে সমাজ তার সঙ্গে সংযোগ অব্যাহত রেখেছিলেন।

এমন কি, তাঁরা যা গোপনে করতেন, প্রকাশ্যে তাই যারা করতো তাদের বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করতেও তাঁরা দ্বিধা করতেন না। অর্থাৎ অনাচারের উপর রাগ তাঁদের প্রবল ছিল না, কিন্তু সমাজের উপর অনুরাগ ছিল প্রবল। তাই প্রকাশ্যভাবে সমাজকে উপেক্ষা করবার ঔদ্ধত্য কেউ প্রদর্শন করলে তাকে তাঁরা কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে চাইতেন না। আমাদের সমাজে শাস্তিদানের যতগুলি ব্যবস্থা আছে একে একে সেইগুলো তাঁদের উপর প্রয়োগ করা হ'ত। এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের তাঁরা বশম্বদ সহযোগী ছিলেন।

কিন্তু কলকাতা সহর অত্যন্ত দ্রুতবেগে বাড়তে লাগলো।

ইংরেজের শাসন যত সুপ্রতিষ্ঠিত হতে লাগলো, বাংলা এবং বাংলার বাইরের অন্যান্য প্রদেশেরও সহর এবং গ্রামাঞ্চল থেকে তত লোক এসে ক'লকাতায় জমতে লাগলো। কেউ চাকুরীর চেষ্টায়, কেউ ব্যবসার জন্যে।

পাড়ায়-পাড়ায় ঝোপ-জঙ্গল খানা-ডোবা ভর্তি হয়ে সেখানে ছোট-বড় নানারকম বাড়ী উঠতে লাগলো। রাত্রে শেয়ালের ডাক ধীরে ধীরে দূরে স'রে যেতে লাগলো। যে সব রাস্তার দুইদিক জঙ্গলে আবৃত ছিল, লোকে সন্ধ্যার পরে যে সব রাস্তা দিয়ে হাঁটতে ভয় পেত, তার দু'ধারে বাড়ী তৈরী হতে লাগলো। নানা দিকে নতুন-নতুন রাস্তা তৈরীও আরম্ভ হয়ে গেল।

নানা দিক থেকেই অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তন দেখা যেতে লাগলো।

আগে অভিজাতদের এবং সাধারণ ভদ্র গৃহস্থ রমণীদের একমাত্র যান ছিল পালকী। দেখতে-দেখতে ক'লকাতার রাজপথে নতুন-নতুন দিশী ও বিলাতী প্যাটার্ণের ঘোড়ার গাড়ী দেখা যেতে লাগলো। বাতি ও প্রদীপের জায়গায় এল কেরোসিনের আলো।

এতদিন রেড়ীর তেলের আলোয় যারা অভ্যস্ত ছিল, কেরোসিনের জ্যোতিতে তাদের বিস্ময়ের আর শেষ রইল না। ইংরিজি সভ্যতার হাওয়া চারিদিক থেকেই তাদের চমক লাগিয়ে দিলে।

ঘোষেদের 'দেবধামেও' হাওয়া বদলাতে লাগলো।

• •

হরেরাম গত হলেন। সদরে এবং অন্দরে রামরাম পিতার পুরোনো ব্যবস্থাই যথাসম্ভব অব্যাহত রাখবার চেষ্টা করলেন। সদরে সকালে সন্ধ্যায় পাড়ার ব্রাহ্মণ-সজ্জন এবং প্রতিবেশীরা আসেন। প্রার্থীরা কিছু-কিছু পায়। যে সব দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় এবং অনাত্মীয়দের হরেরাম অর্থসাহায্য করতেন, রামরাম তাঁদের পূর্ববৎই সাহায্য পাঠাতে লাগলেন। কাশীতে যে সব দুঃস্থ বিধবাদের জন্যে টাকা যেত তাও যেতে লাগলো।

সদরে বিশেষ পরিবর্তন বোঝা গেল না। কিন্তু অন্দরে?

অন্দরেও বাইরে থেকে কিছুই পরিবর্তন বোঝা যায় না। কিন্তু ভিতরে ভাঙনী ধরেছে।

প্রতাপচন্দ্র তখন হিন্দু কালেজের উঁচু ক্লাশের ছাত্র। সেকালে হিন্দু কালেজে পড়ার গৌরবই আলাদা। তার পড়ার ঘর, লাইব্রেরী এবং ড্রইং রুমের মূল্যবান বিলাতী সজ্জা একটা দেখবার জিনিস।

বাড়ীর এই অংশটা সদর এবং অন্দরের মাঝামাঝি জায়গা। রামরাম ভিতরে-ভিতরে পুত্রের ইংরিজি চাল-চলন সম্বন্ধে গর্ব অনুভব করতেন, এবং পুত্রের অনুপস্থিতিতে মাঝে-মাঝে প্রতিবেশীদের নিয়ে গিয়ে ছেলের ঘরগুলো দেখাতেন।

সকালে-বিকালে প্রতাপের বন্ধুরা মাঝে মাঝে পালকীতে এ-বাড়ী আসতো। সেও একটা দেখবার জিনিস।

এমনি ক'রে বিলিতি চাল-চলন প্রতাপের ঘরে এবং সেখান থেকে, রামরামের অজ্ঞাত-সারে, অন্দরে মেয়েদের মধ্যেও সঞ্চারিত হচ্ছিল।

যাঁরা বলেন, আমাদের দেশের মেয়েরা স্বভাবতঃ রক্ষণশীলা তাঁরা, শুধু আমাদের দেশেরই নয়, কোনো দেশের মেয়েকেই জানেন না। মেয়েরা যত সহজে এবং বিনায়াসে পরি-বর্তনকে গ্রহণ করতে পারে এমন পুরুষেও পারে না।

বলতে গেলে রামরামের গৃহিণী ছাড়া আর সকলেই রামরামকে লুকিয়ে হাত-ওলা বডিস ও হাত-কাটা শেমিজ ব্যবহার করতে লাগলো এবং মাথায় চুলে 'এলবার্ট'ও কাটতে লাগলো।

রামরামকে লুকোনো কিছুই কঠিন ছিল না। সেকালে পুরুষেরা অন্দরে যেত অল্পই। দুপুরে আহার ও নিদ্রার জন্যে ঘণ্টাকয়েক এবং রাত্রে বারোটা-একটার পর তাঁরা অন্দরে যেতেন। দিন-রাত্রির অধিকাংশ সময় তাঁরা বাইরেই কাটাতেন। সুতরাং অন্দরে যা-খুশি করবার অবাধ সুবিধা মেয়েদের ছিল।

রামরাম জীবিত কালেই দেখে গেলেন, তাঁদের বাড়ী এবং পরিবারকে কেন্দ্র ক'রে যে পল্লীটি গড়ে উঠেছিল, প্রতাপচন্দ্র তার থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছেন।

পল্লী বেড়ে গেছে।

এসেছে সেখানে অনেক অপরিচিত লোক। তাদের সংখ্যা অনেক। সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। তাদের সঙ্গে সমাজ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে সময় লাগে। কিন্তু মানুষের হাতে সময় কম হয়ে আসছে।

প্রতাপচন্দ্রের সঙ্গে ওদের আচারে-আচরণেও যথেষ্ট পার্থক্য এসেছে। ওরা যেন এক সমাজের লোকই নয়। প্রতাপের ইঙ্গ-বঙ্গ-সমাজবিহারী মন আর ওদের সঙ্গে যেন খাপ খাচ্ছে না। প্রাচীন সমাজব্যবস্থার উপর সে-শ্রদ্ধাও তার নেই, সে-ভয়ও নেই। মস্ত বড় বাড়ী, অপরিমিত অর্থ এবং জুড়ি-বুহাম নিয়ে প্রতাপ স্বতন্ত্র হয়ে গেলেন। বাড়ীতে পাড়ার ইতর-ভদ্র, অর্থী-প্রত্যর্থীর আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

বন্ধ হয়ে গেল শুধু সদরেই নয়, অন্দরেও।

'দেবধামের' অন্দরের তেতলার জানালাগুলো খুললেই পাড়ার অনেকগুলি বাড়ী দেখা যায়। রামরামের গৃহিণী যতদিন বেঁচে ছিলেন, সেই দিক দিয়ে পাড়ার গৃহিণী ও বধূদের সঙ্গে তিনি সংযোগ রেখে ছিলেন। দুপুরে প্রতিবেশিনীরা ছাদে এলে তিনি জানালা দিয়ে তাদের সঙ্গে গল্প করতেন। কার কি দিয়ে রান্না হ'ল, কার ক'টি ছেলে-মেয়ে, কার মেয়ে শ্বশুর বাড়ীতে কি কষ্ট পায়,—সব খবর তিনি রাখতেন। নিজের বাড়ীর সুখ-দুঃখের কথাও অসঙ্কোচে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। কারও মেয়ে শ্বশুর বাড়ী থেকে ছেলে হ'তে এলে তার সাধ পাঠিয়ে দিতেন। তাঁর নিজের অন্তঃস্বত্ত্বা মেয়ের জন্যে কেউ সামান্য কুলের আচার পাঠালে হাসিমুখে হাত পেতে নিতেন। বিপদে-আপদে দু'পয়সা দিয়ে লোককে সাহায্যও করতেন এবং তার জন্যে গর্ব বোধ করতেন না।

মানুষের মধ্যে ছোট-বড়র বিচার তিনি করতেন জাত নিয়ে। দরিদ্র ভট্টাচার্য গৃহিণী মোটা গড়া প'রে এবং ফাটা-পা নিয়ে তাঁর বাড়ী এলে তিনি ভক্তি সহকারে তাঁকে প্রণাম করতেন। দত্ত-গৃহিণীকেও দরিদ্র ব'লে ঘৃণা করতেন না। বাড়ী এলে সমাদরে নিজের পাশে বসাতেন। কত সুখ-দুঃখের গল্প করতেন।

তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সে পাট উঠে গেল। জানালায়-জানালায় পর্দা পড়লো।

পুরানো অভ্যাসবশে প্রতিবেশিনীরা ছাদে এসে জানালার দিকে চাইলেই এ-বাড়ীর মেয়েরা দ্রুতবেগে পর্দা টেনে দিয়ে স'রে যেতে লাগলেন।

প্রতিবেশীর সঙ্গে মনের কথার আদান-প্রদান বন্ধ হয়ে গেল।

ধনীর সঙ্গে দরিদ্রের এই যে ব্যবধান ইউরোপীয় সভ্যতার পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই রচিত হ'ল, তা আজও পর্যন্ত রয়ে গেছে বরং আরও প্রসারিত হয়েছে।

কিন্তু এই ব্যবধানও সম্পূর্ণরূপে অর্থগত ছিল না। অনেকখানি সংস্কৃতিগত।

তখন হিন্দু কালেজ থেকে যাঁরা বেরিয়ে আসতেন, আচারে, ব্যবহারে, চিন্তাধারায় এবং দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁদের সঙ্গে পুরাতন সমাজের শুধু যে মিল ছিল না তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা প্রাচীন সমাজের বিরোধী ছিলেন।

প্রতাপের বালাখানার পুরাতনপন্থী সজ্জা

বদলে গেল। সেই সঙ্গে সেখানকার পুরানো মজলিসের রূপও। তাদের আলাপ-আলোচনা এ-পাড়ার লোকদের দুর্বোধ্য।

সুতরাং ব্যবধান একতরফা ছিল না। উভয়পক্ষই স্বেচ্ছায় পরস্পরের থেকে স'রে এসেছিল।

(৩)

কিন্তু বিদেশী সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধনীর বালাখানাতে এসেই থেমে গেল না। ধীরে ধীরে মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যেও তা প্রবেশ করতে লাগলো।

বিদেশী বণিকের মুৎসুদ্দির প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। তাঁদের এবং গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজন পড়লো বিশেষ ক'রে কেরাণীর।

সেই উদ্দেশ্যে ইংরিজি শিক্ষার প্রসার হ'তে লাগলো।

যা ছিল মুষ্টিমেয় একটা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তা ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে, মফঃস্বলের সহরে-সহরে, এমন কি সুদূর পল্লীগ্রামে পর্যন্ত। ইংরিজি শিক্ষা যারা পায়, তারা দলে-দলে চ'লে আসে ক'লকাতায় কেরাণীগিরির প্রত্যাশায়। তখন কেরাণীগিরি দুর্লভ ছিল না।

কলকাতা সহর দিন-দিন বেড়ে চলে।

প্রতাপচন্দ্রের পরে তাঁর দুই ছেলে সম্পত্তির মালিক হ'লেন, স্নেহাংশু আর শুভ্রাংশু।

স্নেহাংশু পড়াশুনোয় বেশিদূর এগুলেন না। গোটা পাঁচ-ছয় স্কুল ঘুরে তিনি একদিন বাড়ীতে এসে বসলেন। চেষ্টা নিষ্ফল বুঝে প্রতাপচন্দ্রও তাঁর উপর আর চাপ দিলেন না। তৎপরিবর্তে বিবাহ দিয়ে স্নেহাংশুকে সম্পত্তি দেখাশুনার কাজে নিযুক্ত করলেন।

ছোট শুভ্রাংশু পড়াশুনায় ভালো। এখানকার পরীক্ষাগুলো কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ ক'রে তিনি চ'লে গেলেন বিলেত,—আই সি এস পরীক্ষা দেবার জন্যে। আর ফিরলেন না।

কি যে তাঁর হ'ল সে খবর নেবার জন্যেও কেউ রইলেন না। প্রতাপচন্দ্র মারা গেলেন। স্নেহাংশু তাঁর জন্যে বিশেষ উদ্বেগ বোধ করার প্রয়োজন দেখলেন না। বেটা ছেলে, উদ্বেগের কি আছে? তিনি পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ভায়ের কাছে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিলেন। এ ছাড়া আর করবার কি আছে?

বছরখানেক পরে প্যারিস থেকে এবং আরও বছরখানেক পরে মণ্টিকার্লো থেকে দু'বার শুভ্রাংশু চিঠি দিয়েছিলেন। দু'খানাই তাঁর বাবার নামে। তা থেকে বোঝা যায়, পিতার মৃত্যু সংবাদ তিনি পাননি।

স্নেহাংশু এর উত্তর দেবার প্রয়োজনবোধ করলেন না। কারণ দু'খানা চিঠিতেই টাকার তাগাদা ছিল।

উত্তর তো দিলেন না, চিঠির কথাটাই একেবারে চেপে গেলেন। মা তখনও বেঁচে। শুভ্রাংশু যে বেঁচে আছেন এবং টাকা চাইবার মতো বিপজ্জনকভাবে বেঁচে আছেন, সে কথাটা ভারতবর্ষের কেউ জানতেই পারলেন না।

অন্ততঃ দশ বৎসরের জন্যে।

তার পরে জানা গেল। তখন স্নেহাংশুর মাও গত হয়েছেন। ভালোই হয়েছিল। কারণ ছেলের মৃত্যুসংবাদ শোনার চেয়ে বড় আঘাত সে বয়সে আর কী হতে পারতো? ভাগ্য ভালো বলতে হবে যে, মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে ছেলের মৃত্যুসংবাদ শুনে যেতে হয়নি!

জানা গেল একটি মেম সাহেবের মুখে।

তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং শুভ্রাংশুর ধর্মপত্নী।

স্নেহাংশুকে তিনি তাঁদের বিবাহের এবং শুভ্রাংশুর মৃত্যুর সার্টিফিকেট দেখালেন এবং আরও অনেক স্মৃতিচিহ্ন। যাতে ক'রে স্নেহাংশুর মতো কূট বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও মনে-মনে মেম সাহেবের উক্তির সত্যতা স্বীকার করতে হ'ল।

কিন্তু মুখে তিনি কিছুই বললেন না।

মেমসাহেব আপনমনে ব'লে যেতে লাগলেন, কি ক'রে কলেজে পড়ার সময় শুভ্রাংশুর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়, কি ক'রে সেই বন্ধুত্ব বৎসরখানেকের মধ্যে প্রণয়ে পরিণত হয়। তারপরে উভয়ের বিবাহ।

বিবাহের কিছুদিন পরেই শুভ্রাংশু মদ্যপান আরম্ভ করলে। আই সি এস দিতেই পারলে না। বাড়ী থেকে কেন জানিনে তার টাকা আসাও বন্ধ হ'ল।

—আপনারা কি তাঁর কোনো চিঠিই পাননি?

স্নেহাংশু অম্লানবদনে 'না' বললেন।

—তা হবে। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন তিনি। কিন্তু প্রচুর মদ্যপানের ফলে বুদ্ধির তাঁর স্থিরতা ছিল না। হয়তো নেশার মুখে ঠিকানা ভুল ক'রেছিলেন। কিংবা সে চিঠি হয়তো শেষ পর্যন্ত তিনি ডাকবাক্সে ফেলেনইনি।

একটু থেমে মেমসাহেব আবার বলতে লাগলেন ঃ

—কিন্তু তবু আমি হাল ছাড়লাম না। নিজে একটা চাকরী নিয়ে ওঁর পড়ার খরচ যোগাতে লাগলাম,—ব্যারিষ্টারী পড়ার খরচ। আশা ছিল, ব্যারিষ্টারী পাশ ক'রে এখানে এসে বসলেও চলে যাবে। কিন্তু মন দিয়ে পড়াশুনো করার শক্তিই ওঁর আর ছিল না। তার উপর অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে কঠিন অসুখ হ'ল। আমার পুঁজি বেশি ছিল না। তবু যা ছিল তাই দিয়েই ওঁর চিকিৎসার ত্রুটি করিনি। ওঁকে মণ্টিকার্লো চেঞ্জে পাঠালাম।

দশ বৎসর আগের কথা। সুতরাং এরের পর ঘটনাগুলো স্মরণ করবার জন্যে মেমসাহেব আবার একবার থামলেন। কিন্তু বিশেষ কথা বোধ করি মনে পড়লো না। সংক্ষেপে শেষ করার জন্যে বললেন ঃ

—এর পরে তিন বৎসর ইউরোপের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে উনি স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন। আমি তখন প্রচুর ঋণগ্রস্ত। শেষ পর্যন্ত আমার একটি আত্মীয়কে ধ'রে ইণ্ডিয়া অফিসে ওঁর জন্যে একটা চাকরীও যোগাড় করলাম। ধীরে ধীরে দেনা শোধ হচ্ছিল। আমরা একটু শান্তির মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম। এমন সময়...

মেমসাহেবের ঠোঁট থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো। নিজেকে সামলাবার জন্যে তিনি চুপ করলেন।

স্নেহাংশুও ভায়ের জন্যে অনেক দুঃখ করলেন। তাঁর বিশ্বাস, যে উদ্দেশ্যে শুভ্রাংশু বিলেত গিয়েছিলেন, নিজের কৃতকর্মের দোষে সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ায় তিনি বাপের কাছে মুখ দেখাবার লজ্জাতেই আর দেশে ফেরেননি। বাপের মৃত্যু সংবাদ তাঁকে জানানো হয়েছিল। কেন যে তিনি পাননি বোঝা যাচ্ছে না। পেলে, ইউরোপে অত দুঃখ সহ্য না করে তিনি নিশ্চয় সস্ত্রীক দেশেই ফিরতেন। সবই অদৃষ্ট!

সে কথা মেমসাহেবও স্বীকার করলেন।

কিন্তু এহ বাহ্য।

আসল কথা, শুভ্রাংশুর অংশের সম্পত্তি মেমসাহেব বিক্রী ক'রে দিতে চান। স্নেহাংশু যদি নেন, তাহ'লেই সব চেয়ে ভালো হয়। তিনি অর্ধেক দামেই তাহ'লে ছেড়ে দেবেন। নইলে......

স্নেহাংশু নিলেন না এবং নানারকম টাল-বাহানা করতে লাগলেন।

তারপরে হঠাৎ একদিন শুনলেন, কুড়ি লক্ষ টাকার সম্পত্তি মাত্র এক লক্ষ টাকায় এক ইহুদীকে বিক্রী ক'রে মেমসাহেব বিলেত চলে গেছেন।

এরপরে আরম্ভ হ'ল সেই ইহুদীর সঙ্গে মামলা।

ইহুদী নিঃসহায় বিদেশিনী নয়। ঝানু ব্যবসায়ী। সুতরাং তাকে কাবু করা সহজ হ'ল না। অনেক দিন হাইকোর্টে ধস্তাধস্তির পর অবশেষে ঘোষেদের মর্যাদারক্ষার জন্যে সেই সম্পত্তি স্নেহাংশুকেই পোনেরো লক্ষ টাকায় কিনে নিতে হ'ল।

কিন্তু তাতেই জের মিটলো না।

তার মানে, সমস্ত টাকাটাই তাঁকে দেনা করতে হ'ল। এবং সে দেনা তিনি তো শোধ করতে পারলেনই না, তাঁর ছেলে হিমাংশু এই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তাই নিয়ে বিব্রত হয়ে রয়েছেন। সুদ যথাসম্ভব মেটানো হচ্ছে, কিন্তু আসলে এখনও পর্যন্ত বিশেষ হাত পড়েনি।

হিমাংশুকে নিয়েই এই কাহিনী।


নির্ভীক নূতন পৃথিবীর পথই এই
আজকের জীবন যা আণবিক ও রশ্মিময় শক্তিকে কেন্দ্র করে রয়েছে তা দুর্জ্জয় সাহসে ভরা জীবন। এমনি বিস্ময়কর পরিবেষ্টনী মানুষের মনকে বাল-সুলভ চপলতা বা আদিম মনোবৃত্তির বহু উর্দ্ধে আকর্ষণ করে। এই গৃহের যিনি প্রতিষ্ঠাতা তাঁর নির্ভীক দূরদৃষ্টি দিয়ে তিনি অনাগত ভবিষ্যতের রূপ প্রত্যক্ষ করে তাঁর জ্ঞানদীপ্ত কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন। ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রসারে যে আলস্য আর বাধা তার বাঁধ ভেঙ্গে তিনি বহুদূর অগ্রসর হয়েছেন, তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিল্পবাণিজ্যগুলি ভারতীয় বাণিজ্যের ইতিহাসে এক গৌরবময় স্থান অধিকার করে আছে।
The House of
DATTAS
এইচ দত্ত এণ্ড সন্স লিমিটেড
SEF

ঘোষ পরিবারের এখন তিনিই কর্তা। বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। রং নীলাভ গৌর। শীর্ণ দেহ, কিন্তু এখনও নুয়ে পড়েনি। সুপক্ক আমের মতো ঢলঢলে মুখ। সেই মুখখানি এবং উজ্জ্বল, আয়ত চোখদুটি দেখলেই বোঝা যায় ভদ্রলোকের মনের মধ্যে গোলমাল নেই। দিলদরিয়া মেজাজ।

শ্রীমন্ত তার সব কিছুর জন্যে এই লোকটির কাছেই ঋণী। বাইরে শিকারে বেরিয়ে অনেক দিন আগে তিনি এই পিতৃমাতৃহীন সুদর্শন ছেলেটিকে সংগ্রহ ক'রে এনেছিলেন।

তখন শ্রীমন্তর বয়স দশ-এগারো বৎসর।

হিমাংশুই তাকে এনে নিজের পরিবারে স্থান দিয়েছিলেন। তার পড়াশনোর ব্যবস্থা করেছিলেন। তাকে নিজ পরিবারের একজনের মতোই রেখেছিলেন। তার খাওয়া-পরা, স্কুল-কলেজের মাইনে, কোনো দুঃখই রাখেননি।

সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারে এই অবস্থায় বাইরের লোক অতি সহজেই পরিবারভুক্ত হয়ে যায়। আর বোঝাই যায় না, সে এই পরিবারেরই একজন নয়। অভিজাত পরিবারে তা সম্ভব নয়। অসংখ্য দাস-দাসী ও কর্মচারীদের ব্যবহার ও দৃষ্টি সকল সময়েই তাকে নিজের প্রকৃত মর্যাদা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্নেহপরায়ণ আশ্রয়দাতা ও স্নেহভাজন আশ্রিতের মধ্যে একটা স্থায়ী ব্যবধান অব্যাহত রাখার তারা আশ্চর্য কৌশল জানে।

শ্রীমন্তর থাকবার জন্যে নিজস্ব পৃথক ঘর, তার মূল্যবান জামা-কাপড়, ঘরের আবশ্যকীয় আসবাবপত্র, সর্বোপরি প্রিয়দর্শন চেহারা,—সবই ছিল। তবু সে এই অভিজাত পরিবারের মধ্যে মিশে যেতে পারেনি। বরং যতই বয়স বাড়তে লাগলো, ততই যেন এই পরিবারের থেকে সে দূরে সরে আসতে লাগলো।

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর থেকেই অন্দরের মধ্যে তার যাতায়াত কমে আসতে থাকে। এখন একেবারেই যায় না। পরিবারে নতুন বধূ কেউ আসেনি। তাকে নিষেধও কেউ করেনি। তবু যেতে পারে না। বোধ করি ওই দাসী-চাকর ও কর্মচারীদের ছুঁচ-ফোটানো দৃষ্টির জন্যেই।

হৈমন্তীও আগে দিনের বেলায় হামেসাই আসতো তার ঘরে। এখন ক্বচিৎ আসে। তাও লুকিয়ে, সকলের অজ্ঞাতসারে, শ্রীমন্তর অনুপস্থিতিতে।

তাকে নিষেধ করলে কে?

(৪)

বেলা তখন দশটা।

সরকার বালাখানা থেকে উঁকি দিয়ে ফিরে এল। বড়বাবু তখনও ওঠেননি।

এ-বাড়ীর দাসী-চাকর থেকে বাইরের মোসাহেবরা পর্যন্ত সকলেই হিমাংশুবাবুকে বড়বাবু বলে। বালাখানার পাশে যে ছোট ঘর, সেই ঘরে তিনি ছিলেন শুয়ে। বাইরের বালাখানায় যেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত আনন্দ হয়, সে রাত্রে আর তিনি অন্দরে ফেরেন না। ওই ছোট ঘরটিতেই শুয়ে থাকেন।

তখনও তিনি ওঠেননি।

উঠলেন আরও এক ঘণ্টা পরে।

পুরাতন ভৃত্য রঘুয়া কাল রাত্রি থেকেই বড়বাবুর কাছে হামেহাল হাজির আছে। পানোন্মত্ত প্রভুর পরিচর্যায় সে পোক্ত হয়ে উঠেছে। কোন্ অবস্থায় কি করা দরকার সব জানে।

বড়বাবুর ঘুম ভাঙগামাত্র সেই সব প্রক্রিয়া সে আরম্ভ ক'রে দিলে : গরম জল দিয়ে একটুখানি লেবুর রস, একটু মদ্য, একটু চা, খাবার, পরের পর একটি একটি ক'রে আরম্ভ হয়ে গেল।

তারপরে স্নান।

স্নানান্তে বড়বাবু বালাখানায় ফরাসে এসে বসলেন। সরকার এসে কতকগুলো কাগজে সই করিয়ে নিয়ে গেল।

তারপর এলেন ম্যানেজার।

কথাটা ক'দিন থেকেই বলি-বলি ক'রে



ম্যানেজার মাথা চুলকে বললেন জানুয়ারী কিস্তি ফেল করেছি।

তিনি বলতে পারছিলেন না। কিন্তু বিষয়টা জরুরী। আর দেরি করা চলে না।

বললেন বলছিলাম মৌজা হরিহরপুরের ব্যাপারটা।

—কি ব্যাপারটা?

ম্যানেজার মাথা চুলকে বললেন, জানুয়ারী কিস্তি ফেল করেছি। এক সঙ্গে জানুয়ারী-মার্চ দুটো কিস্তি দিতে হবে।

বড়বাবু অবলীলাক্রমে বললেন, বেশ তো। দিয়ে দিন। টাকা নেই?

ম্যানেজারের মাথা-চুলকানি বেড়েই চললো: সতেরো হাজার সাতশো তিরানব্বই টাকা আট আনা ন'পাই-এর ব্যাপার!

বড়বাবুর মৌজ তখনও কাটেনি। এসব অপ্রীতিকর প্রসংগ ভালো লাগছিল না। সন্ধ্যার পরে আসতে বললেন। সে সময় মেজাজ কেমন থাকবে, তাই বা কে জানে।

ম্যানেজার অতঃপর আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলেন।

বড়বাবু ফরাসে আড় হয়ে শুয়ে খবরের কাগজখানা ওলটাতে লাগলেন। যুদ্ধের খবরে তাঁর খুব উৎসাহ।

কিন্তু আজ আর যুদ্ধের খবরে তাঁর মন বসলো না।

কালবৈশাখীর ঝড়ের মতো ছুটে চলেছে জার্মাণ সৈন্যদল। পোল্যাণ্ড শেষ হয়ে গেল দেখতে দেখতে। গেল দুর্বল বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড। ফ্রান্সও যেতে বসেছে।

শুনতে রক্ত গরম হ'য়ে ওঠে। কিন্তু হিমাংশুবাবু উৎসাহ পেলেন না। তাঁরও যেন যুদ্ধ চলেছে ঋণের সংগে। ঝড়ের মতো হু হু শব্দে ঋণ এগিয়ে আসছে তাঁকে গ্রাস করবার জন্যে। পৈতৃক ঋণ তো আছেই, তার উপর নিত্য নতুন উপলক্ষে নতুন নতুন ঋণও মাঝে মাঝে হচ্ছে।

বিশেষ ক'রে এই জমিদারী।

এ যেন ঋণের উৎস হয়ে উঠেছে। একটা কিস্তি যাচ্ছে, আর একটা আসছে, তার পরে আর একটা। এর যেন আর শেষ নেই। প্রজারা খাজনা দেওয়া এক রকম বন্ধই করেছে। কর্তাদের আমলে প্রজাদের উপর শাসন ছিল। অবাধ্য প্রজার উপর মাঝে মাঝে শাসনের নামে নিষ্ঠুর অত্যাচারও হ'ত।

সেদিন আর নেই, সে দিন আর নেই।

দুশ্চিন্তায় হিমাংশুবাবুর সুন্দর ললাট রেখাঙ্কিত হ'য়ে উঠেছে।

দুপুরে বড়বাবু খেতে বসলেন। বড় মেয়ে বাসন্তী তাঁর সামনে এসে বসেছে।

এই মেয়েটি হচ্ছে হিমাংশুবাবুর সবচেয়ে প্রিয়।

এত রূপ কদাচিৎ চোখে পড়ে। বিশেষ রূপের সংগে গুণের এমন সমন্বয় বড় একটা দেখাই যায় না। কে জানে, বোধ হয় এত রূপ-গুণ স্বয়ং বিধাতারও সহ্য হ'ল না। তাই যত রূপ তিনি দিলেন, তার সংগে দুঃখও জুড়ে দিলেন ততখানি।

হিমাংশুবাবু বাসন্তীর বিয়ে দিয়েছিলেন খুব ধুমধামের সংগে কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ বসু পরিবারে। ধনে-মানে-বিদ্যায় বসু পরিবার কলকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয়। ধনপতি বসুর বড় ছেলের সংগে বাসন্তীর বিবাহ হয়। তখন বাসন্তীর বয়স মাত্র এগারো।

কিন্তু সে সুখ বেশিদিন সইলো না। দুটি বৎসর যেতে না যেতে প্রথমে ধনপতি বসু এবং তার পরে তাঁর বড় ছেলেও দুরারোগ্য রোগে মারা গেলেন।

বাসন্তী তখন তেরো বৎসরের বালিকা।

আশ্চর্য মেয়ে! সেই বয়সেই সে যোগিনী সাজলে। বাপ-মায়ের কান্না তাকে নিরস্ত করতে পারলে না। অথচ ওই বয়সে কী-ই বা সে বুঝেছিল?



এত রূপ কদাচিৎ চোখে পড়ে

এর পর থেকে একাদিক্রমে সে শ্বশুর-বাড়ীতেই কাটাচ্ছে। মাঝে মাঝে বাপের বাড়ী আসতো, কিন্তু বাপের সামনে দাঁড়াতো না। তার বৈধব্যবেশ হিমাংশুবাবু সহ্য করতে পারতেন না। অল্প কিছুদিন থেকে সে বাপের সামনে আসছে।

বাপের সংগে দুটো কথা কইবার এইটেই সময়।

হাতের পাখাটা অনাবশ্যক একবার দুলিয়ে বাসন্তী বললে, হিমুর বিয়ের জন্যে বলছিলাম।

এই শিক্ষাটা বাসন্তীর শাশুড়ীর। তিনি বলেন, গুরুজনের খাওয়ার সামনে শুধু হাতে বসতে নেই। তাই শীতের দুপুরবেলা, তবু বাসন্তীর হাতে পাখা।

হিমাংশুবাবু খেতে খেতে মুখ তুলে চাইলেন।

—তোর হাতে ভালো পাত্র আছে নাকি?

বাসন্তীর বাল্যবৈধব্য দেখে হিমাংশুবাবু বাল্যবিবাহের উপর চটে গেছেন। হৈমন্তীর বিবাহ সেইজন্যেই এখনও তিনি দেননি। এখন বাসন্তীর কথা শুনে মনে হ'ল, ভালো পাত্র পেলে তার বিয়ে দিতে তিনি প্রস্তুত।

খুশি হ'য়ে বাসন্তী বললে, আমার দেওরের কথা বলছিলাম। এবারে এম-এ পাশ করেছে। আসছে বারে ল' দেবে। ঠিক হয়েছে এটর্ণীগিরি পড়বে।

বড়বাবু আনন্দে খাওয়া ভুলে গেলেন।

ছেলেটি তাঁর দেখা। বাসন্তী এবাড়ী এলে সে মাঝে মাঝেই আসে। বাসন্তী না থাকলেও সে বাসন্তীর খবর নিয়ে এবাড়ী আসে। ছিপছিপে লম্বা চেহারা। রংও খুব ফর্সা। বাসন্তীরই বয়সী।

এমন ছেলে হাতছাড়া করা যায় না।

—ছেলে এখন বিয়ে করবে না শুনছিলাম যেন?

বাসন্তী হাসলে।

আজকালকার ছেলেদের ওই একটা চাল। ছেলে এখনও যে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে, তা নয়। কিন্তু বাসন্তী তা আমল দিতে চায় না। ছেলের মা ভয় পান, দ্বিধা করেন। কিন্তু বাসন্তী ভয় পায় না।

বললে, শোনেন কেন ওসব কথা?

বড়বাবু সানন্দে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথাও থেকে সম্বন্ধ আসছে না কি?

—আসেনি। কিন্তু আসতে কতক্ষণ? তাই বলছিলাম, অন্য কোনো সম্বন্ধ আসবার আগেই আপনি আমার শাশুড়ীর কাছে গিয়ে সব পাকাপাকি ঠিক ক'রে ফেলুন।

—বেশ তো।

কিন্তু কথাটা বলতে গিয়েই বড়বাবুর স্বর যেন হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে গেল। তাঁর মনে পড়লো বাসন্তীর বিয়ের কথা। সে সব স্মৃতি স্বপ্নের মতো কোথায় মিলিয়ে গেল?

বাসন্তী এবং তার এই দেবর সুবিমল দুজনে সমবয়সী। হয় বাসন্তী, নয় সুবিমল একজন অন্যের চেয়ে এক মাসের বড়। কিন্তু কে যে বড় সেটা কিছুতেই সুনিশ্চিতভাবে জানা যাচ্ছে না। সুতরাং এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে গত তেরো বৎসরকাল যে কলহ চলে আসছে, আজও তার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়নি।

স্বামীগৃহে এই দেবরটিই তার একমাত্র অবলম্বন এবং সান্ত্বনা। একেই নিয়ে তার শ্বশুরবাড়ী, তার বর্তমান, তার ভবিষ্যৎ।

সেই ভবিষ্যৎ নিয়ে এই বয়সেই তার মনের কোণে গোপনে একটা দুশ্চিন্তা এসে জমেছে। বেটাছেলের পক্ষে চব্বিশ বৎসর বয়সটা ভবিষ্যৎ কেন, বর্তমান নিয়েও দুশ্চিন্তা করার বয়স নয়। কিন্তু মেয়েদের, বিশেষ

প'রে বাঙালী ঘরের বিধবা মেয়েদের মনের গতি স্বতন্ত্র। নিজেদের দুঃখময় অখণ্ড পরমায়ু সম্বন্ধে তারা নিঃসংশয় হ'য়ে ওঠে এবং অল্প বয়সেই সেই সুদীর্ঘ ভবিষ্যতের কথা তারা ভাবতে শেখে।

বাসন্তীর শ্বশুর রাজার সম্পদ রেখে গেছেন। সুতরাং তার একবেলা হবিষ্যান্নের জন্যে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। জীবিতকালের জন্যে সেই সম্পত্তির অর্ধেকের সে অংশীদার। কিন্তু দেবরের সংসারে নিঃসহায় বিধবা স্ত্রীলোকের জীবনস্বত্বের অর্থ কি?

সুবিমলের শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বে সে সন্দেহ করে না। তার লেশমাত্র কারণও এখনও পর্যন্ত ঘটেনি। কিন্তু বিবাহের পরে পুরুষের মন ও বুদ্ধির কত বড় পরিবর্তন সম্ভব, এই বয়সে সে নিজেই তো তার অনেক দৃষ্টান্ত দেখেছে।

সেই তার চিন্তা।

সত্য কথা বলতে কি, সুবিমলের বিয়ের বয়স এখনও হয়নি। কিন্তু মায়ের আগ্রহে বিয়ে তাকে শীঘ্র করতেই হবে। কতদিন সে মায়ের ইচ্ছায় বাধা দিতে পারে?

তাহ'লে এখনই সে বিয়ে করুক না, তার বোন হৈমন্তীকে? তাতে আপত্তি করবার কি আছে? হৈমন্তী সুন্দরী, পাশ-করা না হলেও লেখাপড়া মন্দ জানে না। দুজনে মানাবেও বেশ।

তাহ'লে হৈমন্তীকেই সে বিয়ে করুক না কেন?

তাতে বাসন্তী খানিকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পারে।

অপরিচিত, নিঃসম্পর্কীয় কোনো মেয়ে জা হ'য়ে এলে তার উপর বাসন্তী নির্ভর করতে পারে না। কিন্তু হৈমন্তী আর যা-ই করুক, তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তার সঙ্গে বিয়ে হ'লে সুবিমলের উপর চিরকালের জন্যে সে নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারে।

এই বুদ্ধিটা মাথায় আসতেই সে ছুটে এসেছে বাপের বাড়ীতে। কার্যোদ্ধার হ'য়ে যাওয়া মাত্রই সে শ্বশুরবাড়ী ফেরবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো।

বাসন্তী কতদিন পরে এসেছে। এর মধ্যে তাকে ছেড়ে দেবে কে? মা এখনো বেঁচে।

কিন্তু শাশুড়ীর দোহাই দিয়ে বাসন্তী মায়ের হাত থেকে যদি বা নিষ্কৃতি পেলে, ছোট ভাই শঙ্কর এসে পথ আগলে দাঁড়ালো।

—তুমি পাগল হয়েছ বড়দি? কাল বাদে পরশু আমার সরস্বতী পুজো। তার আগে তোমার যাওয়া হয়?

—তার আগে আবার আমি আসবো রে পাগলা!

মাথা নেড়ে শঙ্কর বললে, তেমন বোকা আমাকে তুমি পাওনি বড়দি। তোমাকে আমি খুব চিনি। সরস্বতী পুজোর আগে তোমার যাওয়া হ'তেই পারে না।

(৫)

হৈমন্তী মুখ শুকিয়ে বেড়ায় কেউ জানে না কেন।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, তোর মুখ অমন শুকনো কেন রে? জ্বর হয়নি তো?

হৈমন্তী জোর করে বললে, না।

সময়টা খারাপ। চারিদিকে বসন্ত হচ্ছে। সুতরাং ছোট্ট একটুখানি উত্তরে মা সান্ত্বনা পেলেন না।

বললেন, এদিকে স'রে আয় তো দেখি।

বিরক্তভাবে হৈমন্তী কাছে স'রে এল। হাত দিয়ে তার ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা ক'রে তিনি নিশ্চিন্তভাবে নিজের কাজে চলে গেলেনঃ না, জ্বর হয়নি।

কিন্তু তাতেও নিষ্কৃতি নেই।

খানিক পরেই বাসন্তী তাকে দেখে চমকে উঠলোঃ তোকে অমন লাগছে কেন রে? জ্বর নাকি?

—হ্যাঁ।

বলে হৈমন্তী তার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। সে জানে তার জ্বর নয়। কিন্তু জ্বরের মতো। তার কিছুই ভালো লাগছে না।

বিকেলে শ্রীমন্ত যখন একবার বেরিয়ে গিয়েছিল, হৈমন্তী একখানা চিঠিতে সব কথা লিখে তার বিছানার তলায় রেখে এসেছে। কে জানে সে চিঠি তার চোখে পড়েছে কি না। শ্রীমন্ত আজকাল যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছে! বেশে-ভূষায় কেমন যেন বিশৃঙ্খল। বোধ করি পরীক্ষার দুশ্চিন্তায়। কে জানে কেমন তার পড়া তৈরি হ'ল।

হৈমন্তী রেগে যায় ওর ওপর। মানুষের জীবনের চেয়ে কি পড়ার দাম বেশি? ভালবাসার চেয়েও?

আর শুয়ে থাকতে পারলে না সে। গায়ে একখানা চাদর জড়িয়ে চুপি চুপি ছাদে চলে গেল। কি জানি কেন, সবাইকে তার এড়িয়ে চলতে ইচ্ছে হচ্ছে।

শেষ শরতের অপরাহ্ন।

সীসার মতো মলিন আকাশে সূর্যাস্তের বর্ণ-সমারোহও যেন তেমন জমছে না। বড়-লোকের প্রসাদী পুরোনো মূল্যবান পোষাক-পরা গরীবকে যেমন দেখায় তেমনি। উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ,—তিন দিক থেকে একটা কালো পাৎলা পর্দা সেই বর্ণাঢ্যতাকে ছুটে গ্রাস করতে আসছে।

দূরে পশ্চিম দিগন্তে উড়ছে ক'টা কালো কালো পাখী। নীড়ে ফিরে চলেছে বোধ করি। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হৈমন্তীর মন যেন আরও উদাস হয়ে গেল।

আলিসায় ভর দিয়ে অভিভূতের মতো



সুবিমল সুন্দর, আশ্চর্য সুন্দর

একদৃষ্টে সেই দিকেই সে চেয়ে রইল।

হঠাৎ এক সময় সিঁড়িতে জুতোর শব্দে এবং কাদের যেন কলকণ্ঠে সে সচকিত হয়ে উঠলো।

বড়দিদি আর সুবিমল!

সুবিমল তার অপরিচিত নয়। এ বাড়ীতে তার প্রায়ই আসা-যাওয়া। দিদির দেওর হিসাবে হৈমন্তী তার সঙ্গে কত রসিকতা করেছে, ক্যারম খেলেছে, গল্প করেছে। কিন্তু এখন তাকে দেখামাত্র হৈমন্তীর মন যেন হঠাৎ বরফের মতো জমে গেল।

বাসন্তী বললে, কি রে, তোর না জ্বর হয়েছে? ঘরে গিয়ে শুয়েছিলি না? হঠাৎ ছাদে ঠাণ্ডায় চলে এলি যে!

হৈমন্তী ফিকে একটু হাসলে। বললে, জ্বর কে বললে? মাথাটা কেমন ধরেছে, তাই।

—মাথা ধরার চমৎকার ওষুধ জানি আমি। সুবিমল হাসতে হাসতে বললে।

—কি?—বাসন্তী জিজ্ঞাসা করলে।

—ক্যারম খেলা। —সুবিমল গম্ভীরভাবে উত্তর দিলে।

ওরা দুজনেই হেসে উঠলো।

ক্যারম হৈমন্তীর একটা নেশা। ক্যারমের নামে মনের বরফ যেন গলতে লাগলো।

ভুরু কুঁচকে বললে, তবু যদি খেলতে জানতেন!

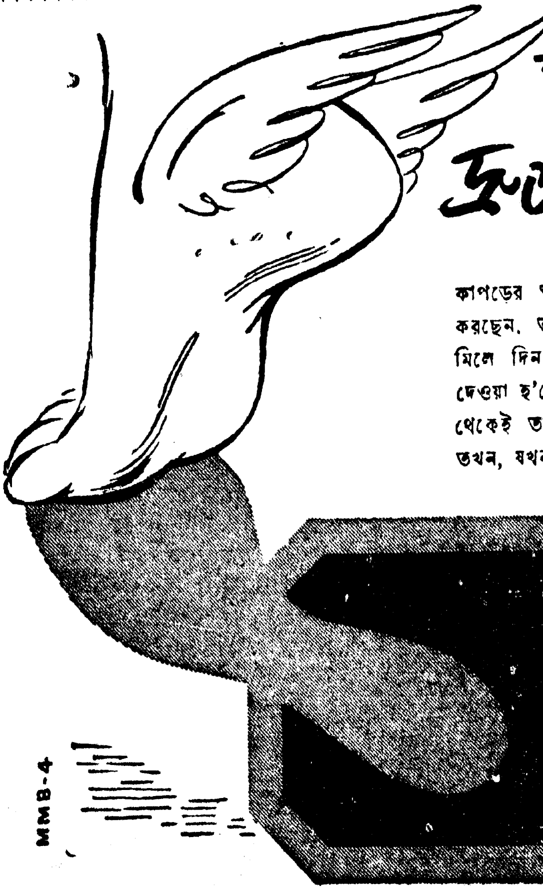
এর উত্তরে সুবিমল শুধু একটা অট্টহাস্য ক'রে উঠলো। বললে, চলো, গোটা কয়েক নতুন মার তোমাকে শিখিয়ে দিয়ে যাই।

দুজনে বেধে গেল কলহ।

সেই উত্তেজনায় ওরা দুজনে বাসন্তীর দুখানা হাত ধরে নিচে নিয়ে গেল। সে হবে ওদের খেলার বিচারক।

কি জানি কেন, খেলা তেমন জমলো না।

অনেকগুলো সহজ মার হৈমন্তীর ফসকে গেল। তার আঙুল কাঁপছে। বাসন্তী বুঝতে পারছে কেন। কিন্তু সুবিমল কিছুই জানে না। সরু সরু লম্বা আঙুল দিয়ে সে





একদৃষ্টে সেই দিকেই সে চেয়ে রইল

চমৎকার ষ্ট্রাইক্ করছে। আজকে তার হাত যেন আরও খুলে গেছে।

কিন্তু হৈমন্তী পারছে না।

একদৃষ্টে সে সুবিমলের চাঁপার কলির মতো সুন্দর আঙ্গুলের দিকে চায়। শ্রীমন্তও সুপুরুষ। কিন্তু তার আঙ্গুল এমন সুন্দর নয়। দিনমজুরের মতো শক্ত-শক্ত, মোটা মোটা তার আঙ্গুল। এমন সূক্ষ্মাগ্র নয়।

উভয়েই সুন্দর। কিন্তু সুবিমলের মুখে যে অভিজাত সৌকুমার্য আছে, শ্রীমন্ত তা কোথায় পাবে?

খেলার অবসরে হৈমন্তী মনে-মনে উভয়ের মধ্যে তুলনা ক'রে দেখে। বিদ্যা বিত্ত, রূপ কোনো দিক দিয়েই সুবিমলের সঙ্গে শ্রীমন্তের তুলনা চলে না। শ্রীমন্ত অনেক ছোট, অনেক নিচে। সে এই বাড়ীর একজন আশ্রিত ছাড়া আর তো কিছুই নয়। আর সুবিমল এই মহানগরীর একটি অভিজাত বংশের সুশিক্ষিত যুবক। আচারে ব্যবহারে নিখুঁত।

কিন্তু সুবিমলের সান্নিধ্য তাকে আনন্দ দিতে পারে না কেন? তার এত কাছে বসেও ওর মন চঞ্চল হ'য়ে উঠছে কই? খেলার ছলে দুজনের আঙ্গুলে আঙ্গুলে ঠেকে গেলে দেহে শিহরণ জাগে না কেন?

হৈমন্তী ভাবতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়। খেলায় ভুল করে। সহজ মার ফসকে যায়। বাসন্তী হাসে। সুবিমল ব্যঙ্গ করে। হৈমন্তী লজ্জা পায়। আবার মন দিয়ে খেলবার চেষ্টা করে। পারে না।

সুবিমল সুন্দর, আশ্চর্য সুন্দর। এক-তাল গলিত কাঁচা সোনার মত ঢলঢল। আর শ্রীমন্ত যেন পাথর। তার মূল্য বেশি নয়। কিন্তু কোথায় যেন তার মধ্যে একটা কঠিন অদম্য শক্তির উৎস আছে। তার পুরু-পুরু ঠোঁটে, ছোট-ছোট তীক্ষ্ম চোখে এবং মোটা বেঁটে লোহার শিকের মতো আঙ্গুলের ফাঁকে যেন সেই শক্তি লুকানো আছে। সেখানে, সেই শক্তির ক্ষেত্রে সুবিমল তার কাছে কতটুকু?

শ্রীমন্ত এই বাড়ীর আশ্রিত। পোষা বাঘের মতো সে হৈমন্তীর পায়ের তলায় বসে থাকে। হৈমন্তীর ভালো লাগে। সে ওকে ভালোবাসে......এবং একটু বোধ করি যেন ভয়ও করে। ওকে তার অদেয় কিছুই নেই।

আর এই সুবিমল......মোমের পুতুলের মতো আশ্চর্য সুন্দর এই সুবিমল......একে নিয়ে সে করবে কি? মনের আলমারীতে ঝেড়ে-মুছে সাজিয়ে তুলে রেখে দেবে?

হৈমন্তী একটা অ্যাঙ্গল্ মারতে গিয়ে পারলে না।

সবাই হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

হঠাৎ রেগে গিয়ে হৈমন্তী ক্যারমের বোর্ড-খানাই উলটে দিয়ে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ওরা হৈ হৈ করে উঠলো।

সে চীৎকারে বাসন্তীর মা পর্যন্ত কৌতূহল রাখ'তে না পেরে ছুটে এলেনঃ

—কি হ'ল রে তোদের?

বাসন্তী হাসতে হাসতে বললে, খেলায় না পেরে হিমু বোর্ড উলটে দিয়ে ছুটে পালালো।

—কার সঙ্গে খেলছিল?

—ঠাকুরপোর সঙ্গে।

শুনে নয়নতারা হাসতে হাসতে পালালেন। আজকালকার ছেলেমেয়েগুলো যেন কী! না লজ্জা, না সরম। কিন্তু তার জন্যে তিনি দুঃখিত হলেন বলেও মনে হ'ল না।

অনেকক্ষণ বিছানায় ছটফট ক'রে হৈমন্তী আর পারলে না।

রাত তখন দুটো। পাশেই বাসন্তী শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। দেখতে দেখতে দিদিটা কি মোটা হচ্ছে! আর কী ঘুমুতেই পারে! সমস্ত রাত্রির মধ্যে আর সাড়া পাওয়া যাবে না। আর কী নাকটাই ডাকে! মোটা হওয়ার জ্বালা কম নয়!

হৈমন্তীর ঘুম আসে না কিছুতে।

সমস্ত বাড়ী নিস্তব্ধ। রাজপথে শব্দ নেই। হৈমন্তীর মাথার মধ্যে অসংখ্য দুশ্চিন্তা যেন সাপের মতো কিলবিল করছে।

আস্তে আস্তে সে উঠে বসলো।

শ্রীমন্ত তাকে তার ঘরে আসতে নিষেধ করেছে। সে ভয় পায়। অথচ শ্রীমন্তকে তার বিশেষ প্রয়োজন। তার সঙ্গে অনেক আলোচনা করার আছে।

কি করছে এখন সে?

ঘুমোয়নি নিশ্চয়ই। হয়তো পরীক্ষার পড়া তৈরি করছে রাত জেগে। নয়তো ঘুম ভাঙ্গাবার জন্যে স্টোভে কফি তৈরি করছে।

হৈমন্তী অত্যন্ত সন্তর্পণে দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

দিদি জানতে পারবে না তো?

জানে জানুক, কাউকে সে ভয় করবে না।

অন্ধকার রাত্রি। কিন্তু শ্রীমন্তর ঘর পর্যন্ত এই রাস্তাটা তার একেবারে মুখস্থ। দূর থেকেই দেখতে পেলে শ্রীমন্তর ঘরে আলো জ্বলছে। দরজা খোলা। আস্তে আস্তে ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখলে শ্রীমন্ত টেবিলের উপর মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে কি, কি করছে বোঝা যাচ্ছে না।

ক্লান্ত বোধ করি।

পরীক্ষার আর বেশি দেরি নেই। হৈমন্তী জানে এই পরীক্ষাটা পাশ করবার জন্যে কি ভীষণ পরিশ্রম সে গেল ক'মাস থেকে করছে। সমস্ত দিন রাত্রির মধ্যে কতটুকু সময়ই বা সে ঘুমোয়?

শ্রীমন্তের প্রতি মমতায় হৈমন্তীর মন কানায় কানায় পূর্ণ হ'য়ে উঠলো।

নিঃশব্দে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দিয়ে ওর শিয়রে এসে সে দাঁড়ালো।

অঘোরে ঘুমুচ্ছে শ্রীমন্ত। টেবিল-ল্যাম্পের নিচে খোলা রয়েছে তার পড়ার বই। তারই আধখানায় মাথা রেখে ক্লান্ত হ'য়ে ও ঘুমুচ্ছে।

হৈমন্তীর আসা টেরও পেলে না।

কী রোগা হয়ে গিয়েছে শ্রীমন্ত! অনেক দিন হৈমন্তী আসেনি এ-ঘরে। অনেক দিন ওর দিকে ভালো ক'রে এমন পরিপূর্ণ আলোয় চেয়ে দেখেনি।

ওর পেশীবহুল লোহার মতো শরীরের এ কী অবস্থা হয়েছে! সব যেন ঢিলে হয়ে গিয়েছে। ব্যায়াম করার ফলে মুখখানি তার কখনই খুব ভরন্ত নয়। এখন যেন একেবারেই চুপসে গিয়েছে। নিমীলিত চোখে অপরি-সীম ক্লান্তি। রুগ্ন দেহে শুধু হাড় সার হয়েছে।

এ কী দুশ্চর তপস্যা আরম্ভ করেছে শ্রীমন্ত! বিদ্যার জন্যে অমন দেবদুর্লভ স্বাস্থ্য পর্যন্ত বিসর্জন দিতে বসেছে!

ওকে জাগাতে হৈমন্তীর মমতা হ'ল। নিঃশব্দে ফিরে যেতেও মন সরলো না। এই অবসরে ওকে একটুখানি সেবা করার লোভ হৈমন্তীর পক্ষে দুর্জয় হয়ে উঠলো। পাশে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে ওর মাথার বড় বড় কোঁকড়া চুলে হাত বুলোতে লাগলো।





য়ে দিলে। একবারও তার পুরানো বাঁধাগতের আপত্তি তুললে না। সেদিন ক্যারম খেলায় যে হৈমন্তীর রুদ্ধ পরাজিত মুখভাব সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

এত সহজে যে সুবিমল রাজি হয়ে যাবে, তা বাসন্তী স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। সে ভেবেছিল, সুবিমল অনেক বিদ্রূপ-পরিহাস করবে, অনেক সংগত-অসংগত আপত্তি তুলবে, অনেক ধানাই-পানাই ক'রে বাসন্তীকে নাস্তা-নাবুদ করবে। বাসন্তী রাগ করবে, তিরস্কার করবে এবং শেষ পর্যন্ত কাঁদবে, তবে সে রাজি হবে।

কিন্তু সে সব কিছুই হ'ল না। এমন কি এই নিয়ে সুবিমল একটা সহজ পরিহাস পর্যন্ত করলে না। সমস্ত ভার এমন গম্ভীর-ভাবে তাদের দুজনের উপর ঝেড়ে দিলে যে, বাসন্তী প্রথমটা শুধু বিস্মিত নয়, একটু বাধাগ্রস্তও হ'ল।

বললে, বেশ। আমার আর মায়ের খুব মত আছে। এর পরে তুমি আর কোনো আপত্তি তুলবে না তো? পরিষ্কার ক'রে বলো।

এতক্ষণে সুবিমল একটু হ'সলে। বললে, পরিষ্কার করেই তো বললাম বৌদি। তোমাদের মত হ'লে আমার কোনো আপত্তি নেই।

—ঠিক তো?

—ঠিক।

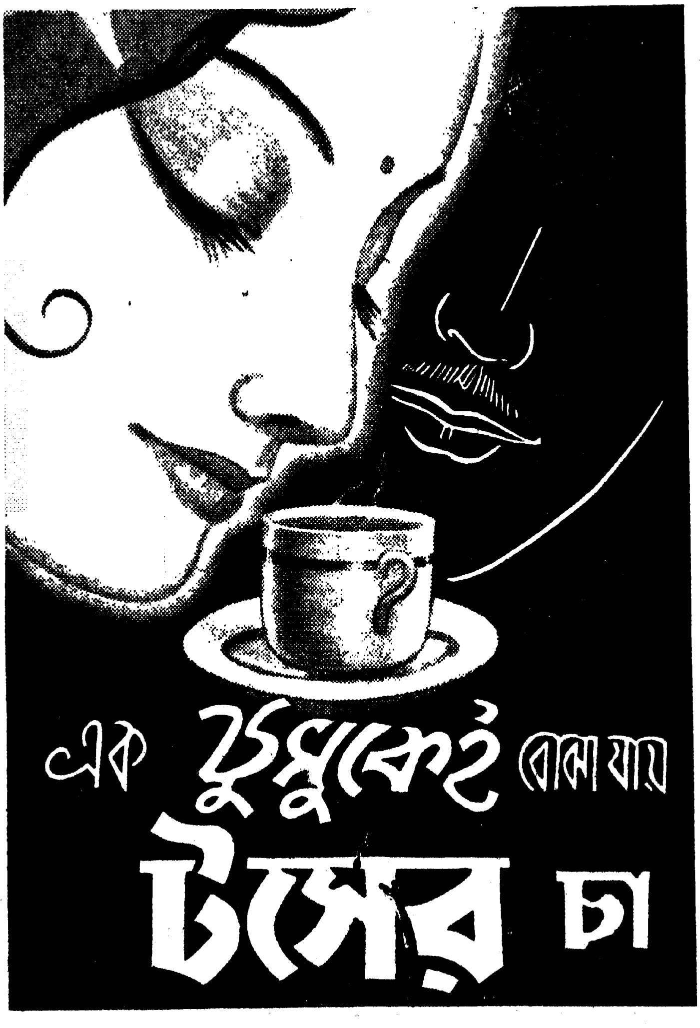
বাসন্তী ছুটতে ছুটতে এসে সুখবরটা ওঁদের দিলে। শুনে ওঁরা আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন।

হিমাংশুবাবু হাত জোড় ক'রে বললেন, তাহ'লে বেয়ান, এই ফাল্গুনেই যাতে শুভ কাজ হয়ে যায়, তার চেষ্টা করা যাক। আজকালকার ছেলে-মেয়ের মতিগতি!

—সে ঠিকই বলেছেন বেয়াই। আমি এখনই ঠাকুর মশাইকে খবর দিচ্ছি।

সতেরো বছর পরে এই বাড়ীতে আবার বিয়ের নহবৎ বসবে। সুবিমলের মায়ের চোখ দিয়ে আনন্দে জল গড়িয়ে পড়লো। তাঁর আর সবুর সইছিল না। পুরোহিতকে ডেকে সেই মুহূর্তেই কোষ্ঠী বিচার হয়ে গেল। কোষ্ঠী মিলতেই উভয়পক্ষের আশীর্বাদের এবং বিবাহের দিন পর্যন্ত স্থির হয়ে গেল। দুটি অভিজাত ধনী পরিবারের মধ্যে দেনা-পাওনার প্রশ্ন অবান্তর। বিশেষ কুটুম্বের ঘর। সুতরাং সে প্রশ্ন উঠলো না। এক কথায় সমস্ত পাকা-পাকি ঠিক হয়ে গেল।

বসু-গৃহিণী মধ্যাহ্ন ভোজন না করিয়ে সেদিন আর বেয়াই-বেয়ানকে ছাড়লেন না।



কিন্তু শ্রীমন্ত কোথায়?

বিবাহের সংবাদ হৈমন্তী নিঃশব্দে শান্ত-ভাবেই গ্রহণ করেছিল। শ্রীমন্তের চোখে সেই রাত্রে সাপের মতো হিংস্র যে জ্বালা দেখেছিল, তাতে সে কেমন ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সুতরাং প্রথম দিকে সুবিমলের সঙ্গে বিবাহের সংবাদ শান্তভাবে গ্রহণ করতে তাকে চেষ্টা করতে হয়নি। সহজেই পেরেছিল।

তারপরে যত দিন কাছে আসতে লাগলো ততই যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো।

কিন্তু শ্রীমন্ত কোথায়?

তার পরীক্ষা দিন কয়েক আগে শেষ হয়ে গেছে। পড়ার চাপ আর নেই। তবু সে যে কি করছে, কোথায় থাকছে, কখন আসছে, কখন যাচ্ছে, তার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না।

সে এখানে আছে কি না তাও বোঝা যাচ্ছে না। দিন দুই আগে গভীর রাত্রে হৈমন্তী তার ঘর তালাবন্ধ দেখে ফিরে এসেছে।

আশ্চর্য এই লোকটি!

ও কি বিয়ের কথা কিছুই শোনেনি? শুনে কি ওর মনে এতটুকু ঈর্ষারও উদ্রেক হয়নি? ওর নির্বিকার ভাব দেখে হৈমন্তী যেমন অবাক হচ্ছে, তেমনি কষ্ট পাচ্ছে।

অথচ শ্রীমন্তকে তার বিশেষ প্রয়োজন। মনের সঙ্গে যুদ্ধে সে ক্ষতবিক্ষত। তাকে বাঁচাতে পারে একমাত্র শ্রীমন্ত। কিন্তু কে জানে সে কোথায়। পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো জানা যেতে পারে। কিন্তু কাউকে জিজ্ঞাসা করতে তার লজ্জা করে।

অবশেষে একদিন শ্রীমন্তর পাত্তা পাওয়া গেল। দিন দশ বারো কলকাতায় সে ছিলই না। বড়বাবুই তাকে পাঠিয়েছিলেন মফঃস্বলে জমিদারীতে। কেন কেউ জানে না। সকালে সে ফিরেছে।

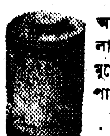
আড়াল থেকেই সে দেখলে, দুপুরে খেয়ে-দেয়ে শ্রীমন্ত ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। রেল ভ্রমণে ক্লান্ত হয়তো। দুপুর রাত্রে ওর ঘরে গিয়ে হৈমন্তী উপস্থিত হ'ল।

শ্রীমন্ত তখনও ঘুমোয়নি। দিনে প্রচুর ঘুমুনোর জন্যেই বোধ করি ঘুম আসছিল না।

ঘরে আলো জ্বলছিল।

সেই আলোয় হৈমন্তী এসে যখন দাঁড়ালো, শ্রীমন্ত চমকে উঠে বসলো। এক মুহূর্তে





আধুনিক-রুচি তরুণীরা লাবণ্যের জন্য গায়ে ও মুখে সর্বদা 'শ্রী রোজেস'র পাউডারই মাখেন। ইহার উপকরণ সর্বোৎকৃষ্ট।



শ্রী রোজেস

মুখে ও গায়ে মাখার পাউডার

এম. বি. মজুমদার ৩সেন্ট্রাল এভিনিউ কলিকাতা

সঞ্চয় প্রবৃত্তি মানুষকে বাঁচবার জন্য প্রবুদ্ধ করে

আপনার পরমায়ু আপনার হাতে।

খুব বেশী দিনের কথা নয় ঃ এই পঞ্চাশ বছর আগেও মানুষ টাকা লুকিয়ে রাখতো চালের হাঁড়িতে, সিঁদুরের চুবড়িতে,—না হয়, মাটির গর্তে। এমনি ক'রে টাকার অপচয় ক'রে আজ মানুষ শিখেছে টাকা কিভাবে নিরাপদ করা যায় এবং সেই টাকা কিভাবে কাজে লাগানো যায়।

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আপনাকে সেই নির্দেশই দিবে।

হেড অফিস ঃ ৩ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

ফোন ঃ কলিকাতা ২০১৮

ডাইরেক্টর-ইন-চার্জ—**মিঃ সুহৃদ রায়।** (জমিদার, ভাগ্যকুল)।

আপনি যা চান তাই পাবেন অর্থাৎ সকল রকম সুবিধাই দেওয়া হয়।

!

সকল রকম ব্যাঙ্কিংএর কাজ এবং ক্লিয়ারিং ফেসিলিটিজ-এর সুবিধা আছে।

দেশবিদেশে শাখাঃ

শ্যামবাজার, দার্জিলিং, কার্সিয়াং, কালিম্পং, ফরিদপুর, বোয়ালমারি (ফরিদপুর), জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ), গোদনাইল (ঢাকা), ডালসিংসাড়াই (ইউ পি), দিল্লী, টাঙ্গাইল।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ঃ পি, কে, গুহ

দিনাজপুর ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস ঃ দিনাজপুর

কলিকাতা অফিসঃ

১১নং ক্লাইভ রো ঃঃ ফোন—ক্যাল ৬৫১৭

শাখাসমূহ ঃ

রাজসাহী, জলপাইগুড়ি, আলীপুরদুয়ার, রায়গঞ্জ।

শীঘ্র আরও কয়েকটি শাখা খোলা হইবে। প্রগতিশীল, সুদৃঢ় ভিত্তিতে পরিচালিত সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক — আমানতি টাকার শতকরা ৭০ ভাগ গবর্ণমেণ্ট কাগজে, অন্যান্য ব্যাঙ্কে এবং নিজ তহবিলে মজুত রাখা হয়।

সুদের হার—কারেণ্ট ½ পারসেণ্ট, সেভিংস—২ পারসেণ্ট। স্থায়ী—৩ ও ৩½ পারসেণ্ট এবং তদধিক।

সরকারী এবং বে-সরকারী বিল, গভর্ণমেণ্ট পেপার, বাজারে চলতি শেয়ার এবং অন্যান্য সিকিউরিটির উপর কম সুদে টাকা কর্জ দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টরঃ

হিন্দুস্থান জেনারেল ইনস্যুরেন্স

সোসাইটি লিমিটেড

হেড অফিস ঃ—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন	...	১,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রয়ার্থ ও বিক্রীত মূলধন	...	৩০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	...	১৫,০০,০০০৲ টাকা

চেয়ারম্যান ঃ—মিঃ এন আর সরকার

—ডিরেক্টর বোর্ড—

ডাঃ এন এন লাহা এম এ, পি-এইচ ডি
ডাঃ এস বি দত্ত পি-এইচ ডি (লণ্ডন)
মিঃ এন সি দত্ত এম এল সি (বেঙ্গল)
স্যার আবদুল হেলিম গজনবী, কে-টি
মিঃ এম এল দাহানুকার
কুমার প্রমথনাথ রায়
ডাঃ বি সি রায়
ডাঃ জে সি দাস
মিঃ এম এম আমেরাসি
মিঃ সি আর সদাশিব মুদালিয়র
পিলাভিতের রাজা রাধারমণ

—শাখাসমূহ—

বোম্বাই—হর্ণবী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই।
মাদ্রাজ—আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, জি টি, মাদ্রাজ।
লক্ষ্ণৌ—হজরতগঞ্জ, লক্ষ্ণৌ।
লাহোর—দি মল, লাহোর।
নয়াদিল্লী—কুইন্স ওয়ে, নয়াদিল্লী।

অগ্নি—মেরিন—দুর্ঘটনা প্রভৃতির বীমা করা হয়।

চ ঘর যেন ঝলমল ক'রে হেসে উঠলো। হৈমন্তী সুন্দরী, রূপসী। কিন্তু তার রূপ শ্রীমন্ত কখনও দেখেনি।

পরণে তার ফিকে গোলাপী রঙের এক- জর্জেট। সর্বাঙ্গে মূল্যবান জড়োয়া থেকে আলো ঠিকরে বার হচ্ছে। ধনের গন্ধ উঠছে ভুর্‌ভুর ক'রে। একটা রূপ ভঙ্গীতে দরজার গোড়ায় সে দাঁড়িয়ে। কিন্তু শ্রীমন্ত যেন পাথর হ'য়ে গেছে। সাধ্য নেই উঠে গিয়ে হৈমন্তীর হাত ধরে আসে।

ওর প্রস্তরীভূত ওষ্ঠের ফাঁক দিয়ে শুধু ট শব্দ বার হ'লঃ এসো।

সমুদ্র মন্থনের সময় ভগবানের যে মোহিনী রূপ দেখে সুরাসুর উন্মাদ হ'য়ে উঠেছিল, সেও বোধ করি এমনি।

হৈমন্তী কলকণ্ঠে হেসে উঠলোঃ তবু ভালো যে, এসেছ বললে! আমি এটুকুও প্রত্যাশা করিনি।

কণ্ঠস্বরে সূচের মতো খোঁচা ছিল। কিন্তু শ্রীমন্ত তা গায়ে মাখলো না।

হেসে বললে, বটে! যার জন্যে খেটে মরি, সেই বলে চোর!

হৈমন্তী বিস্ময়ের সঙ্গে বললে, আমার জন্যে খেটে মরছ তুমি? কি রকম খাটুনি শুনি?

শ্রীমন্ত বললে, শুনবে? শোনো তা'হলে। বড়বাবুর ছোট মেয়ের বিয়ে। ধুমধাম করেই হবে। অন্ততঃ ত্রিশ হাজার টাকা খরচ হবে। সেই টাকাটা জোগাড় করতে গিয়ে- ছিলাম। সেও কি এক জায়গায়? কখনও রেলে, কখনও ষ্টীমারে, কখনও নৌকায়, কখনও বা হেঁটে। কোনো দিন খাওয়া হয়েছে, কোনো দিন চিঁড়ে মুড়ি খেয়ে কেটেছে, কোনো দিন তাও জোটেনি। আরও শুনবে?

—না। আমি ভাবছি, তোমার মনে কি লজ্জা ঘৃণা বলতে সত্যিই কিছু নেই?

—না। তোমাকে তো আগেই বলেছি, আমার জীবনের নীতি হচ্ছেঃ লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে নয়।

শ্রীমন্ত মিটিমিটি হাসতে লাগলো।

হৈমন্তী দপ্‌ ক'রে জ্বলে উঠলো। বললে, লজ্জা করে না তোমার হাসতে? তোমার জিনিস অন্যে চুরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। এর জন্যে কোনো দুঃখ, কোনো ক্ষোভ নেই তোমার?

—'কোনো দুঃখ, কোনো ক্ষোভ নাই সুলক্ষণে'।—তারপরে পরিহাস বন্ধ ক'রে শ্রীমন্ত বললে,—তাহ'লে শোনো বলিঃ পথের কুকুর আমি। এরই মধ্যে দু'দিনের জন্যেও যদি তোমায় পেয়ে থাকি, সেই আমার ঢের। তারও চেয়ে বেশি যদি লোভ করি, নিজেও ডুববো, তোমাকেও ডোবাব।

হৈমন্তী তীব্র দৃষ্টিতে ওর দিকে একটু- ক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর বললে, দেখ, তোমাকে আমি চিনি। তাই তুমি যে ডুববে না, সেই কথাটা বোঝাবার জন্যেই এই ক'খানা জড়োয়া গয়না আজ পরে এসেছি। এর দাম জানো?

—না। জানবার দরকারও নেই। তবে আমাকে যদি চিনেই থাক, তাহ'লে তোমায় বলি শোনো, ওর লোভে যারা ভুল করতে পারে, আমি তাদের চেয়েও চালাক।

ব্যাকুল কণ্ঠে হৈমন্তী বললে, তুমি আমার কথাটাও কি ভাববে না? তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, এও কি আমাকে মুখ ফুটে বলতে হবে?

—কিছুই বলতে হবে না হিমু। সবই দু'দিন পরে সয়ে যাবে। মানুষের মন বড় আশ্চর্য জিনিস! হাঃ হাঃ হাঃ! বিবেকানন্দ পড়েছ? 'পুত্রশোকাতুরা নারী বৎসরান্তে পুনরায় পুত্রবতী হয়।' (ওর চোখে আবার সেই সাপের মতো হিংস্র জ্যোতিঃ!) যাক গে, বাজে কথা। তোমায় একটু কফি ক'রে খাইয়ে দি, আজ শেষবারের মতো। কফি আমি ভালো তৈরি করি, কি বল?

আশ্চর্য সহজ ওর কণ্ঠস্বর! যেন কিছুই হয়নি। যেন প্রতিদিনের মতো আজও এসেছে হৈমন্তী।

বিস্ময়ে, ঘৃণায়, ক্রোধে এবং বেদনায় হৈমন্তীর সমস্ত দেহ যেন অসাড় হয়ে গেল।

র যেন সমস্ত সংজ্ঞা লোপ পেয়ে গেছে; মনি অবশভাবে বসে রইল। কিছুক্ষণের ন্যে ওর বাক্‌শক্তি পর্যন্ত যেন রুদ্ধ হয়ে ল।

কিছুক্ষণের জন্যে।

শ্রীমন্ত নিঃশব্দ মনোযোগের সঙ্গে কফি তৈরি করলে। পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবার পর কে একটা রাত্রেও ওর কফি খাওয়ার য়োজন হয়নি। রাত তো জাগতে হ'ত । তার উপর পরীক্ষা শেষের অব্যবহিত রেই তাকে হৈমন্তীর বিবাহের অর্থ-গ্রহের জন্যে বাইরে যেতে হয়েছিল।

অনেক দিন পরে আজ আবার গভীর ত্রে কফি তৈরি করতে বসে তার মনে হ'ল, নেক দিনের অভ্যাসে এই জিনিসটা তার শাতেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অথচ এর ধ্যে একদিনও সে কফির অভাব অনুভব রেনি। আশ্চর্য নয়?

নেশাখোর বহুদিনের পর নেশার বস্তু পলে তার যেমন সমাদর করে, তেমনি াদরে দু'পেয়ালা কফি সে পরিপাটি ক'রে তৈরি করলে।

প্রথম পেয়ালা যখন সে হৈমন্তীর হাতে লে দিলে, তখন তার চোখ যেন মিট মিট ক'রে হাসছে,—সেই সাপের মতো হিংস্র, ারালো ছোরার মতো ঝকঝকে চোখ!

মুহূর্ত মধ্যে নিদারুণ ঘৃণায় হৈমন্তীর বশ দেহের শিরায় শিরায় বিদ্যুৎবেগে যেন াভিজাত্য-নীল উষ্ণ রক্ত ঝিলিক মেরে গল! হাতের পেয়ালা ছুঁড়ে দিলে মেজের উপর ঝনঝন ক'রে। বাসি রক্তের মতো কোলেট রঙের কফি ছিটিয়ে পড়লো চার-দিকে। ওর মুখে কে যেন হঠাৎ মাখিয়ে য়েছে সিন্দুর। স্ফীত নাসিকা উত্তেজনায় াঁপছে।

বললেঃ ছিঃ! ছিঃ! তোমার হাতের ছোঁয়া খেলেও পাপ হয়। তুমি শয়তানেরও অধম। শয়তানেরও হয়তো হৃদয় আছে, তোমার তাও নেই। ছিঃ! ছিঃ! তোমায় দিয়ে-ছিলাম ভালোবাসা?

তীরের মতো ছিটকে বেরিয়ে এল হৈমন্তী দরজার কাছে। দু'হাত বাড়িয়ে শ্রীমন্ত ওকে আটকালে।

তার চোখে সেই হাসি!

শান্ত কণ্ঠে বললে, কালকে গোটা কুড়ি টাকা পাঠিয়ে দেবে হিমু? হাতে কিচ্ছু নেই।

—দোব, দোব, দোব।

হৈমন্তীর গা'টা ঘিন ঘিন ক'রে উঠলো। ছুটতে ছুটতে নিজের ঘরে এসে স বিছানার উপর যেন ভেঙে পড়লো।

তারপরে কী কান্না! যেন অশ্রুর সমুদ্রকে ক তীরের বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে দিয়েছে!

কিন্তু কেন কাঁদে সে? ভালোবাসা, না ঘৃণা?

(৭)

হ্যারিসন রোডের একটা মেস।

শ্রীমন্ত বি-এ পাশ ক'রেছে এবং সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে একটা চাকরী পেয়েছে। এর জন্যে তাকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। যুদ্ধের জন্যে বহু লোক নিচ্ছে। সুতরাং তার পক্ষে সেখানে একটা চাকরী যোগাড় করা বিশেষ কিছুই কঠিন হয়নি।

এর পরেও সে অবশ্য 'দেবধামে' যথাপূর্ব থেকে যেতে পারতো। বড়বাবু সত্যিই তাকে ভালোবাসেন। সুতরাং সেখানে থেকে যাওয়া তার পক্ষে কিছুই অসুবিধাজনক হ'ত না। পয়সার দিক দিয়েও সুবিধা হ'ত।

কিন্তু অতখানি সে পারলে না।

হৈমন্তী সে রাত্রের পরে আর একদিনও দেখা দেয়নি। মহাসমারোহে তার বিবাহ হয়ে গেল। তাতে শ্রীমন্ত সাধ্যেরও অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে। বরবধূ ফিরে এল। ক'দিন ধ'রে বাড়ীতে খুব হৈ হৈ চললো। পরিশ্রান্ত শ্রীমন্ত সে ক'টাদিন এক রকম ঘুমিয়েই কাটালে। বিশেষ অসুবিধা টের পেলে না।

কিন্তু বৈশাখের প্রথমেই যেই হৈমন্তী চলে গেল, এই বাড়ীর সঙ্গে শ্রীমন্তর যোগসূত্র যেন হঠাৎ ছিন্ন হয়ে গেল। কিছু যেন তার ভালো লাগে না। অভ্যস্ত জীবন-যাত্রায় হঠাৎ যেন একটা ছেদ পড়েছে।

সমস্ত দিন লাটাই-ছেঁড়া ঘুড়ির মতো অনির্দেশ্যভাবে কলকাতার রাজপথে ঘুরে বেড়ায়। রাত্রে শ্রান্তদেহে শোয়, তবু ঘুম আসে না।

এ তো ভালো নয়। শ্রীমন্ত নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করে। কিন্তু বোঝাবার আছে কি, তাও ভেবে পায় না।

এই অবস্থায় কিছুদিন কাটলো। তার-পরে পরীক্ষার ফল বেরুলো এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের চাকরীটা পেয়ে গেল।

আর নয়, এবাড়ীতে আর নয়।

শ্রীমন্ত হ্যারিসন রোডের এই মেসটা ঠিক করলে। এবং একটা রবিবার হিমাংশু-বাবুর অনুমতি নিয়ে, তাঁকে প্রণাম ক'রে, চাকর-বাকরদের বখশিস দিয়ে মেসে চলে এল।

অপরিচিত আবহাওয়া।

এর পূর্বে জীবনে কখনও সে মেসে থাকেনি। এক ঘরে দুটো সীট। চাকর-ঠাকুর, লোকজন সকল সময়েই বারান্দা দিয়ে যাওয়া-আসা করছে এবং উন্মুক্ত দ্বারপথে তার দিকে একবার উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। 'গোপনীয়তার' বালাই নেই। মেসের জীবনযাত্রায় 'Privacy'র কোনো স্থান নেই। খাওয়া কদর্য এবং এক-ঘেয়ে। আলু-পটোল-ঝিঙে-কুমড়ো-কাঁচকলা, মাছের ঝাল, মাছের ঝোল একটা আশ্চর্য কৌশলে সমস্ত কিছুর স্বাদ এক রকম দাঁড়িয়ে গেছে। চোখ বন্ধ ক'রে খেলে কোনটা কি কিছু বোঝবার উপায় নেই। যেন এক বহু হয়েছিল, আবার একে পরিণত হয়েছে।

বাড়ী যেমন নোংরা, তেমনি বিশৃঙ্খল।

কিন্তু শ্রীমন্ত দমলো না। সে জানে, জীবনের চলার পথে এসব এক একটি পান্থ-শালা মাত্র। জীবনের ইতিহাসে এর মূল্য হয়তো আছে। কিন্তু সে বেশি নয়।

কোথায় কোন অখ্যাত গ্রামে দরিদ্র পরিবারে তার জন্ম, সে আজ আর তার ভালো ক'রে মনেই পড়ে না। ঘোষেদের প্রাসাদ,—তার বাল্য, কৈশোর এবং যৌবনের প্রথমাংশ যেখানে কেটেছে,—সেও ভুলতে তার বেশি দেরি হবে না। এতো তুচ্ছ মেস, হৃদয়ের বন্ধন যেখানে স্বভাবতঃই শিথিল!

শ্রীমন্তর মন মাঝে-মাঝে উদাস হয়ে যায়। কিন্তু তবু সে দমে না। নিজের প্রয়োজনে যে ক'টা দিন প্রয়োজন, এই মুসাফেরখানায় তাকে সেই ক'টা দিন চোখ-কান বুজে কাটিয়ে দিতেই হবে। এর মধ্যে দ্বিধার অবকাশ নেই, ক্ষোভ কিংবা দুঃখেরও কোনো কারণ নেই। অনেকটা 'রোগী যথা নিম খায় নয়ন মুদিয়া'!

এরই মধ্যে একটা সুবিধা শ্রীমন্তর হয়েছে।

তার ঘরে সীট যদিচ দুটো, কিন্তু এই চারদিনের মধ্যে আছে সে একাই। পাশের সীটটা খালি নয়, তা বোঝা যায়। তক্তা-পোষের উপর বিছানাটা গুটোনো। তলায় একটা ট্রাংকও আছে। কেবল লোক নেই। কে জানে তিনি কোথায় গেছেন।

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন একটি যুবক এসে উপস্থিত হ'ল। মাথার চুল রুক্ষ, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, পরণের কাপড় আধময়লা এবং গায়ে রুপোর বোতাম-বসানো একটা সাদা জিনের কোট। বিড়ি টানতে টানতে এসে শ্রীমন্তর দিকে অবাক হয়ে চাইলে।

—কাকে চান?—শ্রীমন্ত একটু বিরক্ত-ভাবেই জিজ্ঞাসা করলে।

সে-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে যুবকটি গায়ের কোটটি খুলে আলনায় ঝুলিয়ে রাখলে। বিছানাটি বেশ ক'রে ঝেড়েঝুড়ে পাতলে। হাতের বিড়িটা ফেলে দিয়ে বিছানায় আরাম ক'রে ব'সে আর একটি বিড়ি ধরালে।

জিজ্ঞাসা ক'রলে, আপনিই বুঝি ওই সীটে নতুন এলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।—বিস্মিত শ্রীমন্ত অন্য-মনস্কভাবে উত্তর দিলে।

—আমার নাম হরিশ ভদ্র। আপনার নামটি কি?

—শ্রীমন্ত মিত্র।

—আপনার কুঁজোয় জল আছে?

—আমার তো কুঁজো নেই।

—বলেন কি মশাই? তেষ্টা পেলে করেন কি?

—হুঁ। কিনতে হবে একটা।

হরিশ চীৎকার ক'রে বললে, ওরে ঘেন্টো, কুঁজোয় একটু জল দিয়ে যাস তো। আর আসবার সময় এক গ্লাস জল নিয়েও আসবি অমনি। তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেল।

শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় ছিলেন এ ক'দিন?

—রাণাঘাটে।

—সেইখানেই বুঝি আপনার বাড়ী?

বিরক্তভাবে হরিশ বললে, আজ্ঞে না মশাই। রাণাঘাটে আমার চোদ্দ পুরুষে কেউ কখনও যায়নি।

—তবে? আপনি গেলেন কেন?

চাকরী করতে। আর বলেন কেন মশাই, রেলের রিলীভিং চাকরী। যখন যেখানে লোক থাকে না, সেইখানে ছুটতে হয়। বাসা তো পাইনি, তাই থাকি-না-থাকি মেসের সীটটা রেখেছি। নইলে ক'দিনই বা থাকি এখানে?

—এখন দু'দিন ছুটি তো?

—ওই দুটো দিনই। পরশু আবার কোথায় ঠেলবে কে জানে। এনেছিস বাবা? আঃ! কলকাতার কলের জল খেয়ে বাঁচলাম! এইবার কুঁজোটা ধুয়ে একটু জল পুরে দাও। দিন দুই থাকতে হবে।

লোকটিকে শ্রীমন্তর খারাপ লাগলো না। ওরই সমবয়সী। দিনের প্রায় সমস্ত ক্ষণই তো অফিসে কাটবে। যেটুকু সময় মেসে থাকবে, দুজনে গল্প ক'রে মন্দ কাটবে না,—এই ব'লে মনকে সে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করলে।

অফিসেও শ্রীমন্তর দু'চারটি নতুন বন্ধু-বান্ধব জুটেছে। সবাই তারই মতো সদ্য-পাশ-করা যুবক; ট্রাউজারের উপর হাফসার্ট প'রে আসে। বেশ চটপটে, স্ফূর্তিবাজ ছোকরা। যে-কোনো স্বাধীন দেশে এরা মস্ত বড় মূলধন ব'লে বিবেচিত হ'তে পারতো।

কিন্তু কোথায় যেন কি গলদ ঘটেছে। এরা দেশের সেবা করে না, চাকরী করে শুধু। প্রথম-প্রথম এসে ওরা পলিটিক্স আলোচনা করতো বেশি। এখন কাজের চাপে তেমন সময় পায় না। তবু, শিক্ষিত ছেলের দল, বাইরের দু'চারটে বড় বড় কথা আলোচনা না ক'রে পারে না।

—খবর শুনেছ হে? এদিকে ইটালী গ্রীস আক্রমণ করলে, ওদিকে জাপান ত্রিশক্তি চুক্তিতে সই করলে। Very significant.

—কি হবে বলো দেখি?

—জানিনে। কিন্তু দেখে নিও জার্মাণ সৈন্যদের বুলগেরিয়ায় ঢুকতে আর দেরি নেই।

—তারপরে?

—যুগোশ্লাভিয়া। তারপরে তুরস্ক। ব্যস, ইউরোপ খতম। রইলো শুধু বৃটেন।

—তা যেন হ'ল। কিন্তু আফ্রিকায় ইটালী ওরকম হারছে কেন বলো তো?

—পারছে না ব'লে। দেখছ না, সিদি বারানি, সোল্লুম, ফোর্ট কাপুৎসো, বার্দিয়া, বেনগাজী, এমন কি শেষ ঘাঁটি মোজাদিসর পর্যন্ত গেল? ওদের আছে কি?

—কেন, মুসোলিনী?

—হ্যাঁ। আর তার goose-step, কিন্তু তাতে লড়াই জেতা যায় না।

যুদ্ধের খবর সোমেশের কণ্ঠস্থ। ওদের সেকশানে এ বিষয়ে ওকে অথরিটি বলা যেতে পারে।

ইউরোপীয় রাজনীতিতে বিজনের উৎসাহ কম।

বললে, ও সব রেখে বলো দিকি জাপান কি করবে?

—যুদ্ধ। ঝড়ের মতো। দেখে নিও।

বিজন চিন্তিতভাবে বললে, ওকেই আমার ভয়।

(যেন এ যুদ্ধ তাকেই লড়তে হবে!)

—ভয় তো আছেই। দেখে নিও, ওদিক থেকে জার্মাণী আর এদিকে থেকে জাপান সাঁড়াশীর মতো এদিকে ছুটে আসবে।

—সর্বনাশ!

—ইংরেজ কি পারবে?

সোমেশ গম্ভীরভাবে বললে, মনে তো হয় না।

সবাই খুসি হয়ে উঠলো। জার্মাণী তখনও রাশিয়াকে আক্রমণ করেনি। তখনও রাশিয়া জার্মাণীর মিত্র এবং ভারতবর্ষে বিভিন্ন কমিউনিষ্ট দলের মধ্যে রিক্তহস্ত আস্ফালন ক'রে 'জাপানকে রুখতে হবে' জিগীর ওঠেনি। প্রভুশক্তির পরাজয় সম্ভাবনায় পরাধীন জনসাধারণের পক্ষে খুশি হওয়া

অস্বাভাবিক কিছু নয়। সেই অনস্বাভাবিক খুশি সকলের চোখে-মুখে ফুটে উঠলো।

শ্রীমন্ত এতক্ষণ নিঃশব্দে চা খাচ্ছিল।

এইবার মুখ তুলে বললে, তার মানে এই সিভিল সাপ্লাই অফিস আর থাকবে না। আমরা বেকার হব। সেটা ভেবেছ ?

—তাতে কি, তাতে কি ?—সবাই এক সংগে হৈ হৈ ক'রে উঠলো।

শ্রীমন্ত একটু মুচকে হাসলে।

বললে, কিছু নয়। শুধু "make hay while the sun shines." ব্যস্।

টেবিলের উপর চায়ের পেয়ালাটা ঠক ক'রে নামিয়ে রেখে ঘাড় বেঁকিয়ে শ্রীমন্ত উঠে দাঁড়ালো।

(৮)

১৯৪১ সালের ২২শে জুন জার্মাণী রাশিয়া আক্রমণ করলে। ফিনল্যান্ড থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত ১৫০০ মাইল ফ্রন্টে বেধে গেল প্রচণ্ড যুদ্ধ। ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলেছে জার্মাণ বাহিনী। সাত দিনের মধ্যে ব্রেস্টলিটভস্ক, ভিলনা, কাউনাস এবং গ্রাদনোর পতন ঘটলো। পোনেরো দিনের মধ্যে সমগ্র বেসারেবিয়া জার্মাণীর করতলগত হ'ল। অক্টোবরের শেষে জার্মাণ বাহিনী মস্কোর মাত্র ৩৫ মাইল দূরে গিয়ে পেঁছুলো। ষ্ট্যালিন নিজে মস্কো রক্ষার ভার নিলেন।

এর মাস খানেক পরেই ৭ই ডিসেম্বর জাপান বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে। সংগে সংগেই খবর পাওয়া গেল, জাপানী বিমান আক্রমণে পার্ল হারবার বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। দু'দিন পরেই আরও খবর পাওয়া গেল, উত্তর মালয়ের উপকূলে বৃটিশ ব্যাটলশিপ 'প্রিন্স অফ ওয়েলস্' এবং ক্রুজার 'রিপালস' নিমজ্জিত!

বৃটেন এবং আমেরিকা এত বড় ধাক্কায় থমকে গেল। এত বড় আঘাতের জন্যে তারা প্রস্তুত ছিল না।

১২ই ডিসেম্বর তারিখে জার্মাণী এবং ইটালীও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে এবং জার্মাণী, জাপান ও ইটালীর মধ্যে একটা সামরিক চুক্তিও সম্পাদিত হ'ল।

খবর সাংঘাতিক। কিন্তু এই দুর্যোগেও দিগন্ত-কোলে একটি রুপালি রেখার সাক্ষাৎ মিললো ঃ এতদিন পরে আমেরিকাকেও অবশেষে এক্সিসের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে নামতে হ'ল। তার ধনবল, জনবল এবং সম্পদ অপরিমিত। অনেকে আশা করতে লাগলো, তার চেষ্টায় অদূর ভবিষ্যতে এই যুদ্ধের মোড় ফিরলেও ফিরতে পারে।

কিন্তু সে কতটুকু আশা?

থাইল্যান্ড থেকে এগিয়ে আসছে জাপানী সৈন্য। ১৪ই ডিসেম্বর তারা দক্ষিণ বর্মায় ভিক্টোরিয়া পয়েন্টে প্রবেশ করলে। আর বাংলা দেশে আরম্ভ হয়ে গেল একটা বিপর্যয় কাণ্ড।

ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই ক'লকাতা থেকে লোক পালাতে আরম্ভ করলো। শেয়ালদা আর হাওড়া ষ্টেশনে সকল সময় একটা জনসমুদ্রের কল্লোল উঠছে। কেউ টিকিট কিনতে পারছে, কেউ পারছে না। ঘুস চলছে বেপরোয়া। পুলিশ, মিলিটারী আর রেলের কর্মচারীরা লাল হয়ে উঠলো। এক একদিনে তারা এক এক মাসের রোজগার করছে। যত ঘুস পাচ্ছে, তত লোভ যাচ্ছে বেড়ে। এবং আরও ঘুসের লোভে যাত্রীদের উপর অত্যাচার আরও বাড়ছে।

৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে মালয়ের যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেল।

ক'লকাতায় তখন স্ত্রীলোক ও শিশুর চিহ্ন নেই বললেই চলে। বহু বাড়ী খালি। স্কুল-কলেজ বন্ধ। যারা রয়েছে তাদের মুখে সকল সময় একটা আতংকের ভাব। কখন কি হয় বলা যায় না।

এদেশের সত্যকার অবস্থা কি, তা তারা জানে না। কিছুই তারা নিশ্চিত ক'রে বুঝতে পারছে না। আর যে যত বেশি বুঝতে পারছে না, সে তত বেশি ভয় পাচ্ছে। এ বাড়ীর ভয় পাশের বাড়ীতে সংক্রমিত হচ্ছে মহামারীর মতো। দেখতে দেখতে পাড়া শূন্য হয়ে যাচ্ছে।

গুজব উঠছে নিত্য নতুন। তার বৈচিত্র্য কি!

যারা শোনে তাদের পীলে চমকে ওঠে। আবার একটা পালাবার হিড়িক পড়ে যায়।

অর্থের অভাবে, বাইরে উপযুক্ত আশ্রয়ের অভাবে অথবা অন্য কোনো কারণে যারা রয়ে গেল, তাদের আর দুর্দশার অবধি রইলো না।

ব্ল্যাক আউটের অন্ধকার রাত্রি। সন্ধ্যার পরেই গলি রাস্তা জনশূন্য হয়ে যায়। ঘরের মধ্যে বসে থেকেও লোকের গা ছমছম করে। রাত্রে ঘুম হয় না ভালো ক'রে। কোথাও একটা কুকুর ডেকে উঠলে লোকে বিছানার উপর উঠে বসে। শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসে।

১৫ই ফেব্রুয়ারী গেল সিংগাপুর।

আর আশা কোথায় ? গবর্ণমেণ্ট পর্যন্ত কাগজ-পত্র সরাতে আরম্ভ করলেন। চিড়িয়াখানা, যাদুঘর পর্যন্ত খালি হয়ে গেল। সিংগাপুর ভারতের পূর্বদ্বার। সেই সিংগাপুর গেলে আর রইলো কি ?

আরও কিছু লোক ক'লকাতা ছেড়ে চলে গেল।

১০ই মার্চ গেল রেংগুন।

ব্যস্।

হ্যারিসন রোডের মেসের অবস্থাও তথৈবচ।

ঠাকুর-চাকর দুই পালিয়েছে। দু'চারজন বাবুও চাকরী ছেড়ে পালিয়েছে দেশে। ক'দিন ওরা নিজেরাই রেঁধেছে, বাসন মেজেছে। সম্প্রতি দ্বিগুণ মাইনেতে একটা ঠাকুর আর একটা চাকর পাওয়া গেছে। কিন্তু তারাও কখন পালায় কে জানে! ওদের কাছে বাবুরা সব সময় জোড়হাতে থাকে।

হরিশের এখন তিলমাত্র অবসর নেই। কখন আসছে, কখন যাচ্ছে তার ঠিক নেই। মাথার চুল রুখু। দাড়ি কামাবার সময় নেই। চোখ কোটরে বসে গেছে। তবু সর্বদাই বেশ হাসিখুশি।

—খুব হাসিখুশি যে! ব্যাপার কি ?—শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করে।

হরিশ হাসে, জবাব দেয় না। দেওয়ার আবশ্যকও নেই। দুই পকেট তার নোটে, আধুলিতে, সিকিতে, দুয়ানিতে ভর্তি।

—আপনার তো দেখাই পাওয়া যায় না। চব্বিশ ঘণ্টাই ডিউটি।

হরিশ হেসে বললে, ডিউটি কি আর চব্বিশ ঘণ্টাই থাকে মশাই? ব্যাপার কি জানেন ? গেলেই দু'পয়সা পাওয়া যায়।

—ভালো, ভালো। কিন্তু মেসের কি করা যায় বলুন তো?

কেন?

—'লেসি' তো চলে যাচ্ছেন।

—কোথায় ?

—শোনেননি ? ওঁদের অফিস চললো লক্ষ্ণৌ।

—তাতে কি ?

—বাড়ীর 'লীজ' কার নামে নেওয়া যায়?

—আমার নামে নিন। কি আপনার নামে?

—আপনার আপত্তি নেই তো?

—আপত্তি কি ? থাকতে তো হবে।

'লেসীর' ঝামেলা অনেক। বিশেষতঃ এই দুর্যোগের মধ্যে। কিন্তু হাতে দু'পয়সা আসছে ব'লে হরিশ এখন সে ঝামেলা গ্রাহ্যই করে না। তার জন্যে ভয়ও পায় না।

তার নামেই নতুন 'লীজ' নেওয়া হ'ল। বহু বাড়ী খালি। সুতরাং একটু চেষ্টা করতেই বাড়ীভাড়াও বেশ কিছু কমলো।

কয়েকজন নতুন মেম্বারও এলো। একটু বয়স্ক। ওঁরা জাপানী বোমার ভয়ে স্ত্রীপুত্র দেশে পাঠিয়ে দিয়ে মেসে আশ্রয় নিয়েছেন। একটু আয়েসী লোক। মেসে বেশ কষ্ট হয়। কিন্তু কি করবেন? উপায় তো নেই। বিশেষ সকলেরই বিশ্বাস আর ক'টা দিন মাত্র। তারপরে সবাইকেই তো ক'লকাতা ছাড়তে হবে। মেসের দুঃসহ জীবনে সেইটুকুই একমাত্র সান্ত্বনা।

ইতিমধ্যে দলে দলে আসতে লাগলো লোক। রেংগুণ থেকে 'ব্ল্যাক রুট' দিয়ে পায়ে হেঁটে এরা আসাম সীমান্তে পেঁছোয়। সেখান থেকে ট্রেণে ক'লকাতায়।



বাহুতে, দাও মা শক্তি
হৃদয়ে দাও মা ভক্তি
নিপীড়িত জনগণের উদরে নাই অন্ন, অংগে নাই আবরণ,—দুর্ভিক্ষের মহাকবলে সোণার বাঙলার শ্যামল পল্লী মহাশ্মশানে পরিণত। তাই—আজ বাঙলায় মায়ের অর্ঘ্য রচনার উদ্দীপনা স্তিমিত, —ভক্তের হৃদয়ে ভক্তির আসন টলমল। তবুও—প্রকৃতির আবাহনে মায়ের আগমন—আর নৈষ্ঠিক পূজারীর—নৈবেদ্য-রচনায়—অভিনব আয়োজন।
রচনা কৌশলী - নৈষ্ঠিক পরিবেশক
দারিকা নাথ ঘোষ এণ্ড সন্স লিঃ
★ ★ ★ ভারতের বৃহত্তম মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান ★ ★ ★

সর্বহারার দল!

এদের অনেকেই একদিন ভাগ্যান্বেষণে রিক্তহস্তে বাঙলা দেশ ছেড়ে ছিল। সেখানে বিবিধ প্রকারে যথেষ্ট অর্থও করেছিল। ভাগ্যের চক্রান্তে সমস্ত সম্পদ বর্মাতেই ফেলে রেখে আবার রিক্ত হস্তেই দেশে ফিরলো।

কী চেহারা!

দেখলে মনে হয়, যেন চিতা থেকে এইমাত্র উঠে এল। চোখমুখ ঝল্‌সে গেছে।

শ্রীমন্ত ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। কি যেন ভাবে। কি ভাবে, সেই জানে।

দেখতে দেখতে সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের আশ্চর্য শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগলো। নবাগত তরুণ-তরুণী কেরাণীতে ফুলে ফেঁপে উঠলো। রঙ বেরঙের শাড়ীতে আর রকম-বেরকমের স্যুটে আফিস সরগরম।

কাজও হু হু ক'রে বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার চাপ এসে পড়েছে মুষ্টিমেয় জনকয়েক কেরাণীর উপর। বাকি অধিকাংশই যেন বরযাত্রী এসেছে, এমনিভাবে হালকা হাওয়ায় প্রজাপতির মতো ভেসে বেড়ায়।

শ্রীমন্তের মুরুব্বির জোর আছে। কিন্তু সে জানে মুরুব্বির জোরে চাকরী রাখা যেতে পারে, কিন্তু উপরে উঠতে গেলে ফাঁকির কারবার চলবে না। কাজ শিখতে হবে এবং তার জন্যে খাটতে হবে।

সে অটুট স্বাস্থ্য পেয়েছে। খাটতে ভয় পায় না। খাটেও প্রচুর। আর যে খাটে, স্বাভাবিকভাবেই তার টেবিলে ফাইলও জমে প্রচুর। সেই স্তূপ ঠেলতে অধিকাংশ দিনই তার সন্ধ্যা উৎরে যায়। তার জন্যে সে বিরক্ত হয় না। যতক্ষণ আফিসে থাকে ততক্ষণ অবিশ্রান্ত খাটে। ফাইল থেকে মুখ তোলবার সময় পায় না।

বৃদ্ধ বড়বাবু এর জন্যে তাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন।

কিন্তু এতাবৎ তাঁর সেই স্নেহ ফাইলের পর ফাইল পাঠানোর মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। যত কঠিন এবং জটিল ফাইল তার কাছে পাঠিয়ে তিনি বাধিত করতেন। সোমেশ-বিজনের দল তার জন্যে তাকে বিদ্রূপও কম করতো না। শ্রীমন্ত তাদের কথার উত্তর দিত না। নিঃশব্দে একটু হেসে সমস্ত বিদ্রূপ শিরোধার্য ক'রে নিত।

ও শুধু অপেক্ষা করছিল।

কিসের জন্যে? সে ও নিজেও জানতো না। বোধ করি ওর ভবিতব্যের জন্যে,—নিঃশব্দে এবং পরম শ্রদ্ধা ও গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে।

দিন যায়, মাস যায়। খাটুনীর উপর খাটুনী বাড়ে। সে তবু নিঃশব্দে প্রতীক্ষা ক'রে চলে। কোনো ব্যর্থতায় ওর বিশ্বাস এতটুকু শিথিল হয় না।

ভবিতব্য? কি ওর ভবিতব্য?

কেউ জানে না। ও নিজেও না। ও কেবল স্বপ্ন দেখে এবং সেই স্বপ্নে বিশ্বাস করে।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন বড়বাবু ওর টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ালেন। মাথা নিচু ক'রে একমনে ও কাজ ক'রে যাচ্ছিল। বড়-বাবুর আসা টের পায়নি।

—শ্রীমন্ত!

জোরে নয়, আস্তেই বড়বাবু ডাকলেন।

—Yes Sir!

শ্রীমন্ত সোজা উঠে দাঁড়ালো।

—যাবার সময় আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাবে।

—আমার যেতে সাতটা বেজে যায় স্যার। আপনি কি তখন পর্যন্ত থাকবেন?

—থাকব।

বড়বাবু মশমশ ক'রে নিজের টেবিলে ফিরে গেলেন।

শ্রীমন্ত অন্যমনস্কের মতো ওর দিকে চেয়ে রইলো ঃ

—লাবধ্য তসরেটের একটা কোট, ভাঁজহীন একটা ট্রাউজার, পায়ে বার্নিশ অভাবে মলিন একজোড়া দামী জুতো। কষের ফাঁকে একটা পান, তার জন্যে একদিকের গাল ফোলা। দাঁত অনেকগুলিই প'ড়ে গেছে। যে ক'টা আছে তাও পানের ছোপে পাকা তরমুজের বীচির মতো কালো।

বৃদ্ধ মানুষ!

মাথার ছোট-ছোট-ক'রে-ছাঁটা চুলগুলি সব পেকে বিরল হয়ে এসেছে। এক প্রস্থ পুরাপুরি চাকুরী সেরে অবসর নিয়ে এই আফিসে এসেছেন বাণপ্রস্থ উপভোগ করতে।

ওঁকে দেখে শ্রীমন্তর করুণা হয়।

কেন যে ডেকেছেন কে জানে? কাজ সেরে ও যখন বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেল তখন আফিসে বড়বাবুর খাস বেয়ারা ছাড়া আর কেউ বড় নেই।

গোপনে দুজনে অনেকক্ষণ অনেক কথা হ'ল।

কী যে কথা তা কেউ জানলে না।

আফিস তখন খালি।

বেয়ারাটা দূরে একটা টুলের উপর বসে ঝিমুচ্ছে।

(৯)

[illegible]না নীতি!

মে মাসের ৮ তারিখে বাংগলায় জাপ-বিমানের প্রথম আক্রমণ হ'ল চট্টগ্রামে। বৃটিশ সৈন্য তখন অত্যন্ত দ্রুতবেগে বাংগলায় পিছিয়ে আসছে। মে মাস যখন শেষ হ'ল তখন বর্মায় একটিও বৃটিশ সৈন্য আর রইলনা,— সমরবন্দী ছাড়া।

বাংগলায় তখন অত্যন্ত ব্যস্ততার সংগে নৌকো পোড়ানো এবং সাইকেল আটক চলেছে। যে-কোনো সময় জাপানী বাহিনী পূর্ব ভারতে প্রবেশ করতে পারে। তখন যাতে তারা স্থানীয় নৌকা কিংবা সাইকেল ব্যবহারের সুবিধা না পায়, তার জন্যেই এই সতর্কতা।

শুধু যানবাহন নয়, খাদ্যের সম্বন্ধেও সতর্কতার অন্ত নেই। অত্যন্ত তাড়াতাড়ি যতটা সম্ভব চা'লও পূর্ব বাংগলা থেকে সরানো হ'ল, ফলাফল চিন্তা না ক'রে।

ক'লকাতায় তখন একটা থমথমে ভাব।

এমন সময় একদিন উত্তর ক'লকাতার একটা সিনেমা হলে শ্রীমন্ত আর সুমিত্রা রায়কে দেখা গেল।

সুমিত্রা সুন্দরী নয়, কিন্তু বেশ স্মার্ট। তার একটা জৌলুস আছে। সেই জৌলুসে ওকে সুন্দরীই দেখায়। শ্রীমন্তদের অফিসে ওর সংগে আলাপ করবার জন্যে তরুণদের মধ্যে যথেষ্ট ব্যাকুলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

অথচ এত লোক থাকতে আলাপ হ'ল ওর শ্রীমন্তের সংগে,—অফিসে যার মাথা তোলবার সময় নেই, গল্পগুজবের অবকাশ নিতান্তই কম। সেও এক আশ্চর্যভাবে। এই সিনেমা হলে।

শ্রীমন্ত বসে সিনেমা দেখছিল একটা রবিবারে সন্ধ্যায়। মাঝখানে বিরামের সময় হঠাৎ দেখলে সামনের সীটে সুমিত্রা!

সুমিত্রাও মুখ ফিরিয়ে ওকে দেখে চমকে উঠল!

—একি, আপনি?

শ্রীমন্ত হেসে নমস্কার করলে।

—আমার ধারণা ছিল আপনি কোথাও যান না।

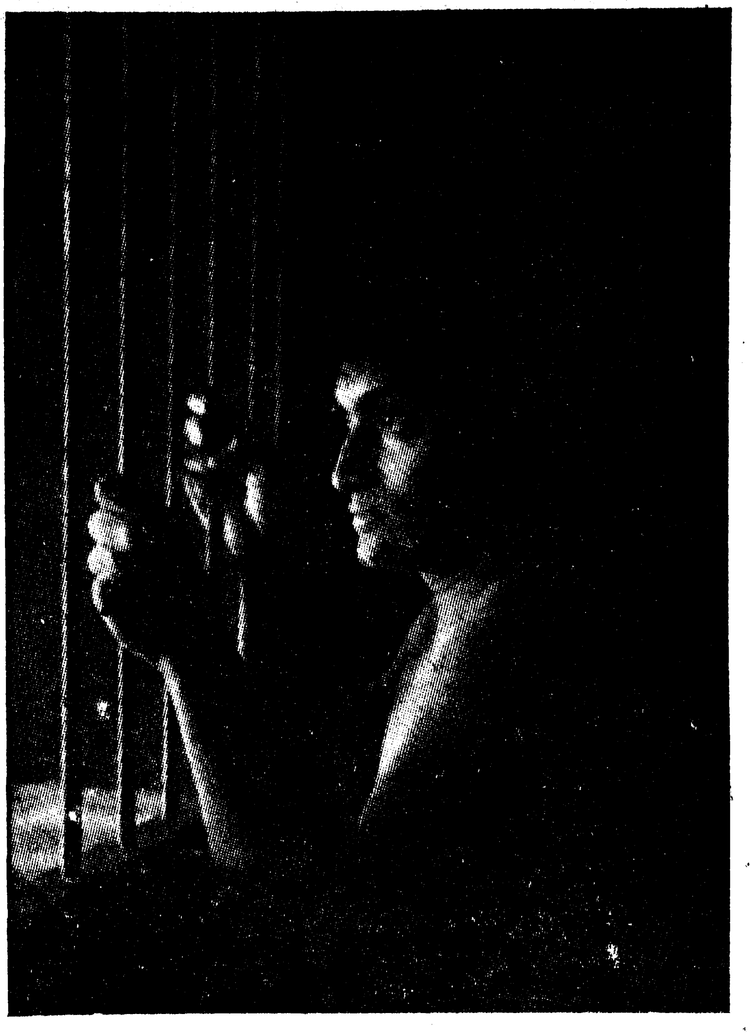
—তবে আমি কি করি ব'লে আপনার জানা?

—শুধু ফাইল ঘাঁটেন আর নোট লেখেন। সুমিত্রা কলকণ্ঠে হেসে উঠলো।

—রবিবারেও?

—সব বারেই।

খুব চটপটে মেয়েটি তো! শ্রীমন্তর মন



বন্দী — শিল্পী—শ্রীনীরদ রায়

উসখুস করে, চোখে আবার সেই পুরোনো নেশা ঘনায়।

—কাল আফিসে যাচ্ছেন তো?—সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে।

—কাল তো ছুটি। জানেন না আপনি?

—জানি। আমার ধারণা ছিল, পর পর দু'দিন ছুটি আপনি কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না। বাধ্য হয়ে অফিস যাবেন।

—ব্যাপার সেই রকমই। সত্যি কথা বলতে কি, সমস্ত দিন একলা হোটেলের ঘরে কাটানোর চেয়ে শাস্তি আর নেই। তার চেয়ে অফিস ভালো।

—আপনি হোটেলে থাকেন বুঝি? কোথায়?

—হোটেল লাকজুরিয়াস। কাছেই।

—I see.

ঘণ্টা বেজে গেল। একে একে হলের আলো নিভতে আরম্ভ করলে। কিছু পরে আবার সিনেমা আরম্ভ হ'ল।

কিন্তু শ্রীমন্তের আর সিনেমা দেখতে মন বসে না। তার দুই চোখ জ্বালা করছে।

সিনেমার শেষে শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করলে, কেমন লাগলো?

—মন্দ নয়।

—কিন্তু গল্পটা যেন ঠিক দানা বাঁধেনি। না?

সিনেমা-ভাংগা জনস্রোতের সংগে সংগে মন্থরগতিতে ওরা দুজন পাশাপাশি চলছে।

হঠাৎ চুপি-চুপি সুমিত্রা বললে, জাপানীরা হোমালিনে এসে গেছে, শুনেছেন?

—হোমালিন? সে কোথায়?

—ইম্ফল থেকে ৬৫ মাইল দূরে। Only sixty-five miles.

—কাছেই তাহ'লে?—উত্তেজনায় কথাটা শ্রীমন্তের মুখ দিয়ে জোরেই বেরিয়ে গেল।

—চুপ।

সুমিত্রা সাবধান ক'রে দিলে। এই ভিড়ের মধ্যে ও সম্বন্ধে এত জোরে কথা কওয়া নিরাপদ নয়। এত লোকের মধ্যে কে কি, কেউ জানে?

ওরা সিনেমা গৃহের ফটকে এসে দাঁড়ালো।

—আপনার সংগে কেউ নেই?—এতক্ষণ পরে এ প্রশ্ন শ্রীমন্তের মাথায় এলো।

সুমিত্রা তাড়াতাড়ি পিছনে চেয়ে বললে, এই যে! আমার বোন মঞ্জরী রয়েছে। আপনার সংগে পরিচয় করিয়ে দিই। ও বেথুনে থার্ড ইয়ারে পড়ে।

ওরা পরস্পর নমস্কার বিনিময় করলে।

—কী ভিড় দেখছেন? ট্রামে বাসে ওঠাই মুস্কিল।

ট্রাম-বাসের দিকে চেয়ে শ্রীমন্ত বললে, সিনেমা-ভাংগার সময় কি না। আপনি কি দূরে থাকেন?

—খুব দূরে নয়।—অন্যমনস্কভাবে সুমিত্রা উত্তর দিলে।

ওর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মঞ্জরী বললে, হেঁটেই চলো না দিদি। চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে। বেশ লাগবে এটুকু আস্তে আস্তে হেঁটে যেতে।

—সেই ভালো।—সুমিত্রা সম্মতি দিলে।

তারপর শ্রীমন্তর দিকে ফিরে নমস্কার ক'রে বললে, আচ্ছা আসি তাহ'লে। কাল ফের অফিসে দেখা হবে।

শ্রীমন্ত ঘাড় বেঁকিয়ে নমস্কার ক'রে হেসে বললে, এবার আপনি ভুল করলেন। কাল ছুটি।

হাসতে হাসতে ওরা একদিকে চ'লে গেল, শ্রীমন্ত আর একদিকে।

হোটেলে ফিরে জামা খুলতে খুলতে শ্রীমন্তর মনে পড়ল ঃ জাপানীরা হোমালিনে এসে গেছে, ইম্ফল থেকে ৬৫ মাইল দূরে—Only sixty-five miles......সুমিত্রার সেই রহস্যঘন চাপা কণ্ঠস্বর!

দিন কয়েকের মধ্যেই ওদের দুজনের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল,—

শ্রীমন্ত আর সুমিত্রার মধ্যে।

চমৎকার মেয়ে এই সুমিত্রা। শ্রীমন্তর এত ভালো লেগেছে যে, বলবার নয়। রং শ্যামবর্ণ। কিন্তু এই অফিসে আরও তো কত মেয়ে চাকরী করে, তার মধ্যে এমন স্বাস্থ্য কার? চোখে-মুখে, ঘোরা-ফেরায় সেই পরিপূর্ণ নিটোল স্বাস্থ্যের আনন্দ যেন উছলে পড়ছে। বি-এ পাশের পাণ্ডুর চিহ্ন সকলের উপর সুস্পষ্ট, কেবল এই মেয়েটি বাদে। পরীক্ষা-পাশের পড়া কেবল একেই জব্দ করতে পারেনি। স্বচ্ছন্দ বনলতার মতো পরিপুষ্ট শ্যামশ্রী একেই কেবল ত্যাগ করেনি।

সুমিত্রাও ঠিক এই কথাই ভাবে ঃ

শ্রীমন্তের স্বাস্থ্য একটা দেখবার মতো জিনিস। লোহার মতো শক্ত দেহে বাজে চর্বির বালাই নেই। কিন্তু ওই দীর্ঘচ্ছন্দ ঋজু দেহে যে প্রচুর শক্তি সংহত হয়ে রয়েছে, ওর মসৃণ প্রশস্ত ললাট, ঋজু নাসিকা, ছোট ছোট তীক্ষ্ম চোখ এবং পুরু ঠোঁটের দিকে চাইলেই তা বোঝা যায়।

হৈমন্তীর মতো সুমিত্রাকেও এই শক্তিই বুঝি দুরন্তবেগে আকর্ষণ করেছে। তারই জন্যে সমস্ত কাজ ফেলে অফিসের ছুটির পর সুমিত্রা বেঁটে ছাতাটি বগলে ক'রে এসপ্লানেডের মোড়ে শ্রীমন্তের জন্যে অপেক্ষা করে. ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

শ্রীমন্তের কাজ আর শেষ হয় না।

বাইরে ক্ষান্ত-বর্ষণ শেষ অপরাহ্নের মেঘ রঙে-রঙে মনোহর হয়ে উঠেছে। গাছের জলে-ধোয়া চিকণ পাতায় লেগেছে রঙের নাচন। মাঠের কচি ঘাসে পড়েছে নবীন মেঘের ছায়া।

শ্রীমন্ত জানে. সুমিত্রা এমনি সময় এসপ্লানেডে তার জন্যে প্রতীক্ষা করছে সেই ছয়টা থেকে। তার কচি পাতার মতো লাবণ্যমণ্ডিত মুখে এসে পড়েছে অস্ত-মেঘের আভা। ছটফট করছে সে।

তবু শ্রীমন্তের কাজ আর শেষ হয় না।

মাথা তোলবার তার অবসর নেই। টেবিলের উপর তখনও অনেক ফাইল। কাজ ফেলে রেখে যাওয়া সে পছন্দ করে না। যখন টেবিলে আর একখানাও ফাইল থাকবে না, তখন সে উঠবে। বাথরুম থেকে বেশ ক'রে হাত-মুখ ধুয়ে আসবে। তারপর কোটটি গায়ে দিয়ে বড়বাবুর সংগে একবার নিরিবিলি দেখা ক'রে আসবে।

কিছুদিন থেকেই বড়বাবুর সংগে খুব ভাব হয়েছে। নিরিবিলি অনেকক্ষণ আলোচনার পরে দুজনেই অফিস থেকে বেরুবে।

তারপর বড়বাবুকে সেই ভিড়ের মধ্যে বহু ক্লেশে ট্রামে উঠিয়ে দিয়ে একটি সিগারেট ধরিয়ে এসপ্লানেডের দিকে ফিরবে।

রাস্তায় তখন ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকার নেমে এসেছে। কিন্তু শ্রীমন্তর কিছু ভুল হয় না। নির্দিষ্ট জায়গায় এসে সুমিত্রার গায়ে হাত দিতেই সুমিত্রা প্রথমটা চমকে ওঠে। তারপর কলকণ্ঠে অনর্গল বকতে আরম্ভ করে। তার মধ্যে কিছু রাগের, কিছু অনুরাগের।

বলে ঃ Brute! ভদ্রমহিলাকে এমনি ক'রে অপেক্ষা করিয়ে রাখতে লজ্জা করে না তোমার?

শ্রীমন্ত হাসে। সাপের জিভের মতো লিকলিকে হাসি। অন্ধকারে সুমিত্রা তা দেখতে পায় না।

শান্ত কণ্ঠে শ্রীমন্ত বলে, Excuse me! আর কোনোদিন দেরি হবে না।

রোজই এই কথা বলে; রোজই দেরি হয়।

সেখান থেকে ওরা যায় হোটেল ডি-রিওতে। তারপরে ন'টার শো'তে সিনেমায়। রাত বারোটায় একটা ট্যাক্সী ক'রে ওকে পেঁছে দেয়।

সুমিত্রার পিছনে কী খরচটাই না ক'রে শ্রীমন্ত! কে জানে, এত টাকা সে কোথায় পায়? সব কাজেই সে যেন জলের মতো টাকা খরচ করে! দেখে ওর সম্বন্ধে সুমিত্রার সম্ভ্রম জাগে।

(১০)

হ্যারিসন রোডের মেস। সেখান থেকে অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল হোটেল। তারপরে সুন্দর একটি ফ্ল্যাট। এই একটা বৎসরে শ্রীমন্ত ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে।

ধর্মতলার উপরেই এই ফ্ল্যাট। চারতলায় দু'খানি প্রশস্ত ঘর। সামনের ঘরখানি, বসবার ঘর। এই দুর্মূল্যের বাজারেও তা মূল্যবান আসবাবপত্রে সাজানো। পাশেরটি শোবার ঘর। সেটিও সুসজ্জিত। একটি চাকর রেখেছে। সেই রান্নাও করে।

অফিস থেকে বেরিয়ে মাঝে মাঝে ওরা হোটেল ডি-রিওতে এখনও যায়। কিন্তু বেশির ভাগ সন্ধ্যায় ওদের এই ঘরেই মজলিস বসে।

শীতের সন্ধ্যা।

নিভৃত গৃহকোণে একটি সোফায় একখানি রাগ কোলের উপর রেখে দুজনে সন্ধ্যা-যাপন কি মনোরম! সিগারেটের ধোঁয়া ওঠে স্বপ্নের মতো।

সেদিন সন্ধ্যায় একটু বিশেষ ব্যবস্থা ছিল।

ওরই মধ্যে ঘরখানিকে একটু বিশেষভাবে সাজানোও হয়েছে। উপরে রান্নাঘরে রকমারি রান্নাও হচ্ছে।

সুমিত্রা ঘরে পা দিয়েই বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার?

ওকে সযত্নে একটি সোফায় বসিয়ে শ্রীমন্ত বললে, আছে ব্যাপার।

সুমিত্রাকে ওইখানে বসাবার জন্য আগে থেকেই যেন ব্যবস্থা করা আছে। ও বসতেই ঢাকা-আলোর ফাঁক দিয়ে সমস্ত আলো ওরই মুখের উপর. ওর পরণের হালকা নীল শাড়ীর জরিদার পাড়ের উপর ঝলমলিয়ে উঠলো।

ওর পায়ের তলার লাল কার্পেটখানা আধো-আলো, আধো-অন্ধকারে যেন অবগুণ্ঠ-নের মধ্যে হাসতে লাগলো। রেডিও সেটটা বাজছে। ওরা দুজনে থাকলে রেডিও বড় একটা বাজে না।

সুমিত্রা সন্দিগ্ধভাবে আবার বললে, কি ব্যাপার বলো তো?

হেসে শ্রীমন্ত বললে, একটু পরেই বুঝতে পারবে।



হার্ভিন
ভগ্ন দেহে
নবজীবন সঞ্চারকারী
আদর্শ টনিক
HERVIN
G.C. WORKS CALCUTTA
জি·সি·ওয়ার্কস · কলিকাতা

—তবু ?

শ্রীমন্তকে উত্তর দিতে হ'ল না, স্বয়ং বড়বাবু এসে দাঁড়ালেন ঘরের একেবারে মাঝখানে।

আধো-অন্ধকারে লোকটিকে প্রথম দৃষ্টিতে সুমিত্রা চিনতে পারলে না। সেই গলাবন্ধ তসরেটের কোট নেই, পেন্টুলুন নেই, সেই ভারি শু-জুতোও না। তার বদলে মূল্যবান শান্তিপুরী ধুতি, গিলাকরা আদ্দির পাঞ্জাবী, জরিপাড় সূক্ষ্ম চাদর এবং পায়ে সোয়েডের নিউ-কাট জুতো।

গা দিয়ে ভুর ভুর ক'রে এসেন্সের উগ্র গন্ধ বার হচ্ছে।

প্রথম দৃষ্টিতে সুমিত্রা কেন সকলেরই চেনা মুস্কিল।

শ্রীমন্ত 'আসুন, আসুন' ব'লে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো। সেই সঙ্গে সুমিত্রাও।

কর্কশ কণ্ঠ যথাসাধ্য মোলায়েম ক'রে বড়বাবু উত্তরে বললেন, এই যে ! কি ব্যাপার বলো তো ? হঠাৎ আমার মতো অরসিককে আহ্বান !

—কিছু না, এমনিতেই আমার ঘরে একটু আপনার পায়ের ধুলো চাইলাম।

শ্রীমন্ত এমন সমাদরে ওঁকে সুমিত্রার পাশের কুশনটায় বসালে যেন স্বয়ং গবর্ণর এসেছেন ওর ঘরে।

অভ্যাসবশে সুমিত্রা পর্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলো। অফিসে এই ব্যক্তিটি সামান্য তো নন, গবর্ণরেরই সামিল। 'মারিলে মারিতে পারে, রাখিতে কে করে মানা' ! তাঁর ওই কর্কশ কণ্ঠস্বর এবং ততোধিক কর্কশ বাক্য অনেকেরই হৃদকম্প সৃষ্টি করে।

সোনালি তবক-মোড়া পান এলো, দামী সিগারেটের টিন এবং উৎকৃষ্ট জর্দা এলো। চাকরটা একটা অ্যাশ-ট্রে এনেও রেখে গেল।

দেখতে দেখতে বড়বাবু সম্বন্ধে সুমিত্রার ধারণা গেল বদলে। তাঁকে যতখানি ভয়াবহ এবং নীরস ব্যক্তি ব'লে তার ধারণা ছিল, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হ'ল। দেখা গেল, বৃদ্ধ হলেও ভদ্রলোক অতি সুরসিক ব্যক্তি। নিজের হাতে ওকে তিনি সিগারেট এগিয়ে দিলেন।

হাত জোড় ক'রে সুমিত্রা অসম্মতি জানালে। কিন্তু বড়বাবুর অমায়িক ব্যবহারে সে এত মুগ্ধ হয়ে গেল যে, নিজে দেশলাই জেলে ও'র সিগারেটটা ধরিয়ে দিলে। দুজনের মুখ কাছাকাছি আসতেই ভক ক'রে তার নাকে যেন মদের গন্ধ এলো।

কাঠিটা নিবিয়ে ট্রের মধ্যে ফেলে এদিকে চাইতেই দেখলে, শ্রীমন্ত দিব্যি একটা সিগারেট ধরিয়ে বড়বাবুর সামনে টানছে।

বড়বাবুর সামনে সিগারেট !

বিস্ময়ে তার চোখ-মুখের এমনই অবস্থা হ'ল যে, ত[illegible]বাবুর ক্ষীণ দৃষ্টিও এড়ালো না।

জবাফুলের মতো লাল চোখ ঢুলঢুল ক'রে বললেন, Never mind Miss Roy. We are friends here, —we are all friends here. এটা অফিস নয়। এখানে সব বন্ধু আমরা।

ব'লে ভদ্রলোক এমন জোরে হেসে উঠলেন যে, সুমিত্রা চমকে উঠলো।

পরের দিন সুমিত্রা অফিসে এলো না। লিখে পাঠিয়েছে তার মাথা ধরেছে জ্বরের মতো হয়েছে।

শ্রীমন্ত অফিসের শেষে বড়বাবুর কাছে গিয়ে হাসতে হাসতে বললে You perhaps drove too rashly, Sir.

বাঁ হাতে খানিকটা হাওয়া যেন ঢেউ দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বড়বাবু বললেন, Don't you worry. সব ঠিক হো যায়েগা। শোনো। একটা ভালো চাকরী খালি হচ্ছে। পরেশ চলে যাচ্ছে দিল্লীতে। তার জায়গায় আমি তোমার নাম সুপারিশ ক'রেছি। সাহেব রাজি হয়েছেন।

আহ্লাদে গদগদ হয়ে শ্রীমন্ত বড়বাবুর পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লো। তখন তার দেহ যেন তুলোর মতো হাল্কা হয়ে গেছে।

এই চাকরীটার মানে মাসে তিনশো পঁচাত্তর টাকা!

আর এক ধাপ, তার পরেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট!

বাসায় ফিরে সে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিলে। শোবার ঘরে এসে গুণ গুণ ক'রে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে যখন সে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে মাথা আঁচড়াচ্ছে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সুমিত্রা এসে ওর খাটের এক প্রান্তে বসলো।

নিঃশব্দে।

শ্রীমন্ত টেরই পেতো না, যদি না আয়নায় ওর ছবি পড়তো।

পিছন ফিরেই সে চমকে উঠলো:

সুমিত্রা!

সুমিত্রা সাড়া দিলে না। নীরবে চোখ মেলে চাইলে।

এই ঘরটিতে আলোটা এমন জায়গায় বসানো যে, জানালা খোলা থাকলেও বাইরে আলো পড়ে না। সেজন্যে এ-ঘরের আলোয় আর কাগজের ঘেরাটোপ দেবার আবশ্যক হয়নি।

সেই পরিপূর্ণ আলোয় শ্রীমন্ত দেখলে, সর্বস্ব হারালে মানুষের চোখে যে দৃষ্টি ফুটে ওঠে, সেই বিভ্রান্ত ব্যাকুল দৃষ্টি সুমিত্রার চোখে!

শ্রীমন্ত ধীরে ধীরে ওর পাশে ব'সে ওর পিঠের উপর একখানি হাত রাখলে। মিনিট কয়েক তার মুখে একটাও সান্ত্বনার কথা বার হ'ল না।

একটু পরে বললে, বিশ্বাস কর সুমিত্রা, আমি নিজেও এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না।

সুমিত্রা ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলে।

তারপর বললে, আমাকে তুমি কচি খুকী পেয়েছ, না? তাই বোঝাতে চাইছ, তুমি কিছু জানতে না?

শ্রীমন্ত অভিনয় মন্দ করে না।

কাতরস্বরে বললে, আমাকে তুমি অবিশ্বাস কোরো না সুমিত্রা।

তীব্রকণ্ঠে সুমিত্রা বললে, তাহ'লে তুমি বড়বাবুকে নিমন্ত্রণ করেছিলে কেন?

—এমনি। একটু তোয়াজ করবার জন্যে। বুঝতেই তো পারছ।

—বুঝতে সবই পারছি। তুমি জানতে সন্ধ্যের পর আমি আসব। তার পরেও বড়বাবুকে নিমন্ত্রণ করেছিলে। খাবার আয়োজনও করেছিলে তিন জনের জন্যে। বড়বাবু এলেন মত্ত অবস্থায়। বললেন, We are all friends here! তার পরেও বলতে চাও, এর পিছনে কোনো ষড়যন্ত্র ছিল না?

প্রতিবাদে শ্রীমন্ত কী একটা বলতে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে সুমিত্রা বললে, বড়বাবুকে তোয়াজ করবার জন্যে? আমি শুধু এই কথাটা জানতে এসেছি, বড়বাবুকে তোয়াজ করবার জন্যে বতদূর যেতে পারো তুমি? শেষ পর্যন্ত?

শ্রীমন্ত রাগ করলে না। বরং আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে শান্তকণ্ঠে বললে, রাগ কোরো না সুমিত্রা। রাগ করবার কী আছে এতে? কী এমন হয়েছে?

অবাক হয়ে সুমিত্রা ওর দিকে চাইলে:

—তুমি বলছ কি?

খুব বিজ্ঞের মতো শ্রীমন্ত হাসলে।

বললে, এমন কিছু হয়নি। একটা গলিত-নখদন্ত কামার্ত বৃদ্ধ...

আকাশে দুই হাত তুলে সুমিত্রা বললে, থামো, থামো, থামো। ঘেন্নায় আমার সমস্ত শরীর পাক দিয়ে উঠছে!

—তবে?

শ্রীমন্ত হো হো ক'রে উচ্ছ্বসিত হেসে উঠলো:

—তাহ'লেই বোঝ, রাগের কিছু নেই। ব্যাপারটা ঘেন্নার। তবু লোকটির সম্পূর্ণ পরিচয় তুমি জানো না। যে লোকটি কাল স্বচ্ছন্দে তোমাকে সিগারেট এগিয়ে দিয়েছিল, বাড়ীতে সেই লোকটিরই রূপ আলাদা। গৃহিণীর ছাদে যাবারও হুকুম নেই। রাস্তার দিকের জানালা কাঠ দিয়ে পেরেক মেরে বন্ধ করে দিয়েছে। পাছে তার গৃহিণী তার অনুপস্থিতিতে জানালায় এসে দাঁড়ায় এবং বাইরের কেউ দেখে ফেলে।

—বলো কি?

সুমিত্রা সব ভুলে অবাক হয়ে বললে।

—অই। অফিসে বেরুবার আগে স্ত্রীকে ঘরের মধ্যে অর্গলবদ্ধ ক'রে রেখে দেয়, বড় বড় ছেলেমেয়ের সামনে।

—যাঃ! —সুমিত্রা হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

—সত্যি কথা।

ওকে হাসতে দেখে শ্রীমন্তর সাহস বেড়ে গেল।

বললে, স্বার্থের খাতিরে এই লোককে যদি একটু নাচানো যায়, কী এমন দোষ?

—এর জন্যে তুমি আমাকে পর্যন্ত ব্যবহার করবে?

অম্লান বদনে শ্রীমন্ত বললে, যদি তুমি রাজি হও।

মুহূর্তের জন্যে সুমিত্রা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর হো হো ক'রে হেসে বললে, তুমি একটা Villain। তবু আশ্চর্য তুমি! সকালে উঠে ভেবেছিলাম, জীবনে বুঝি তোমার কাছে আর মুখ দেখাতে পারব না। ভালোই হ'ল এলাম। তোমায় চিনলাম, তোমার বড়বাবুকেও চিনলাম। মনটা হালকা হ'ল। ব্যাপারটা সত্যিই রাগের নয়।

সুমিত্রা হাসলে।

বললে, একটু চা খাওয়াবে?

সুমিত্রার কথাগুলি কেমন যেন বাঁকা বাঁকা। একবার শ্রীমন্ত একটু দ্বিধা করলে। তারপর বললে, চলো না, হোটেল ডি-রিও?

—হো-টে-ল-ডি-রি-ও? চলো।

শ্রীমন্ত তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিয়ে নিলে। মানি-ব্যাগটা পকেটে পুরে উঠে দাঁড়ালো।

বললে, চলো।

অন্যমনস্কের মতো সুমিত্রা উঠে দাঁড়ালো। শ্রীমন্ত বুঝলে, মুখে যাই বলুক কালকের ধাক্কা সুমিত্রা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

• •

হোটেলের একটি কোণে একখানা নিরিবিলি টেবিলে ওরা দুজন বসলো।

চারিদিকে যেন তরুণ-তরুণীর মেলা ব'সে গেছে। যেন অসংখ্য প্রজাপতি গুচ্ছে-গুচ্ছে ফুলে-ফুলে ব'সে গেছে। তারই এক কোণে ওরা দুজনে বসলো।

শ্রীমন্ত খাবারের ফরমাস দিয়ে অপাঙ্গে সুমিত্রার দিকে চাইলে। মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করলে, রাগ পড়লো?

কৃত্রিম কোপে ভ্রূভঙ্গি ক'রে সুমিত্রা শুধু বললে, Brute!

এই জায়গাটার একটা বিশেষ গুণ আছে। এই আলো-ঝলমল প্রশস্ত সুসজ্জিত হল, এই গুচ্ছ-গুচ্ছ প্রজাপতির সুসংযত ভিড়, খাদ্য ও পানীয়, সমস্ত মিলে মানুষের মনকে যেন সমাজ, স্বদেশ ও সংস্কার থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে আনে। তাকে শুধু হালকা হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

কামার্ত বৃদ্ধের আচরণে যে গ্লানি সকাল থেকে সুমিত্রার দেহ ও মনকে পীড়িত করছিলো তার কিছুটা গিয়েছিল শ্রীমন্তের ঘরে। অবশিষ্ট এই সুন্দর হলে প্রবেশ করামাত্র নিঃশেষ হয়ে গেল।

সুমিত্রার মন আবার আগের মতো হালকা হয়ে গেল। শ্রীমন্তের দিকে চেয়ে সে অকারণে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো।

শ্রীমন্ত বললে, তোমাকে একটা সুখবর দিই শোনো।

সুমিত্রা উৎসুক দৃষ্টিতে চাইলে।

—পরেশ হালদারকে তুমি চেনো?

—কে পরেশ হালদার?

—আমাদের অফিসে চাকরী করে। Permanent staff। দিল্লীতে বদলী হয়ে যাচ্ছে।

—তারপরে?

একটু থেমে মুচকি হেসে শ্রীমন্ত বললে, তার জায়গায় আমি যাচ্ছি।

—বলো কি? তুমি তো এখনও temporary।

—Permanent হয়ে যাব। সঙ্গে সঙ্গে তিন শো প'চাত্তর টাকা মাইনে।

সুমিত্রা ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখলে। তারপর চায়ে একটু চুমুক দিয়ে হেসে বললে, এর মূল্য দিতে হ'ল আমাকে তো?

—হুঁ। তুমি করুণাময়ী, তোমার জয় হোক।

শ্রীমন্ত হাসলে।

Good evening Miss Roy.

দুজনেই চমকে উঠলো। একটি শ্বেতাঙ্গ সৈনিক ওদের টেবিলে এসে দাঁড়িয়েছে।

সুমিত্রা আনন্দে লাফিয়ে উঠলো ঃ

Good evening Capt. Alexander! তুমি এখানে? ভারি খুশি হ'লাম। দাঁড়াও তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। মিঃ বোস, ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার of the American Army.

ওরা পরস্পরের করমর্দন করলে।

সুমিত্রা ওকে চায়ে আহ্বান করলে। মার্কিণ ভদ্রলোকটি বড় অমায়িক লোক, তখনই রাজি হয়ে গেলেন।

শ্রীমন্তর দ্বিধা ঘোচেনি। সন্দিগ্ধভাবে ওর দিকে চাইতে লাগলো। তবু বিদেশী অতিথি। চুপ ক'রে থাকা ভদ্রতা নয়।

জিজ্ঞেস করলে, কেমন লাগছে এ দেশ?

—Splendid! আশ্চর্য তোমাদের এই দেশ! আমাদের সঙ্গে তোমাদের মিল নেই, আচারে-ব্যবহারে। বাইরে থেকে যারা তোমাদের দেখবে, তাদের অদ্ভুত লাগবে। কিন্তু আমার ভাগ্য ভালো, আমি তোমাদের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেয়েছি। তোমাদের যত দেখছি......

সুমিত্রা বাধা দিলে। হাসতে হাসতে বললে, থামো, থামো। তারপর দেশে গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে বই লিখবে তো? তোমাদের আমরা চিনেছি।

আলেকজাণ্ডার গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, সে অপরাধ আমি স্বীকার করি মিস রায়। আমার লজ্জা হচ্ছে, আমি সেই সব অভিযোগ বিশ্বাস করেছিলাম।

শ্রীমন্ত বললে, কেন বিশ্বাস কর না? আমি তো দেখেছি, তার অনেক অভিযোগ একেবারে মিথ্যে নয়।

—না। —আলেকজাণ্ডার উৎসাহিত হয়ে উঠলো,—সেইটেই আরও অনিষ্টকর। আধখানা সত্যের চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কিছু নেই।

চায়ে চুমুক দিয়ে আলেকজাণ্ডার বললে, আসল কথা কি জানো, আচার-অনুষ্ঠানটা বাইরের জিনিস। তার পেছনের যে ফিলজফি সেইটে না বুঝলে কিছুই বোঝা হয় না। তার জন্যে সময় দরকার। দরকার সহানুভূতির। এ টুরিষ্টের কাজ নয়।

আলেকজাণ্ডার উৎসাহের সঙ্গে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল।

হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠলো আহত কুকুরের আর্তনাদের মতো।

চক্ষের পলকে এত বড় হল-ঘরের সমস্ত আলো নিভে গেল। শুধু দু'প্রান্তে দুটি আলো মিটমিট ক'রে জ্বলতে লাগলো। এক মুহূর্তে সমস্ত পরিবেশ যেন ভয়ে ও দুর্ভাবনায় স্তব্ধ হয়ে গেল!

সাইরেন অনেকক্ষণ ধরে কাৎরে-কাৎরে কেঁদে চুপ করলো।

কোথাও একটা শব্দ নেই।

বাইরে রাজপথের যানবাহন, জন-কোলাহল বন্ধ হয়ে গেছে।

সকলে রুদ্ধ-নিশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

কিসের? মৃত্যুর?

এরোপ্লেনে চড়ে আসছে মৃত্যুর দূত। বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ দান! অদৃশ্য ঊর্ধ্বলোক থেকে করবে মৃত্যুবর্ষণ। বাড়ী উড়ে যাবে। মাঠ পুকুর হয়ে যাবে। আর মানুষ মরবে কীটের মতো!

আহত কুকুরের আর্তনাদ থেমেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। শোনা যাচ্ছে, শুধু নিজের হৃদপিণ্ডে হাতুড়ী-পেটার মতো শব্দ।

এমনি কাটলো মিনিট দশেক।

তারপরে,—

দুমদুম দুমদুম......

খুব দূরে......অস্পষ্ট ভাবে......

ওই! আলো নেবাও, আলো নেবাও!

হলের দুই প্রান্তে যে দুটো আলো জ্বলছিল, তাও নিবিয়ে দেওয়া হ'ল। কে জানে, এই আলো কোনো ছিদ্রপথে যদি বাইরে যায়! মৃত্যুদূতের মোটা-মোটা ফিল্ডগ্লাস-পরা চোখের দৃষ্টি শকুনের মতো তীক্ষ্ন।

গুম্......গুড়ুম......

আরম্ভ হয়ে গেল।

খুব দূরে বোধ হয় নয়। হয়তো ড্যালহৌসী স্কোয়ারে, কিংবা ফোর্টে।

উপর থেকে পড়ছে বোমা। নিচে থেকে ছুঁড়েছে অ্যাণ্টি-এয়ারক্রাফট্ কামান। শব্দ হচ্ছে প্রচুর। এ বাড়ীর দরজা-জানালাগুলো থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

বুম্।

প্রচণ্ড শব্দ! এবারে যেন বেশ কাছে। ও কোণে কে একটি মেয়ে সুতীক্ষ্ন চীৎকার ক'রে উঠলো।

ভয় সবাই পেয়েছে। সুমিত্রাও। ভয়ে সে আলেকজাণ্ডারের একখানা হাত জড়িয়ে ধরেছে খুব জোরে। কে জানে, এ জীবনের আজকেই শেষ দিন কি না।

তবু নিজের নিজের আসনে বসেই পুরুষেরা যথাসম্ভব শান্তকণ্ঠে ও কোণের মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিলেঃ ভয় কি, ভয় কি!

পঁয়তাল্লিশ মিনিট এমনি কাটলো।

বোঁ-ও ও ও......

অসংখ্য মৌমাছি যেন একসঙ্গে গুঞ্জন ক'রে উঠলো।

অল ক্লিয়ার!

আঃ!

আলো, আলো!

আলো জ্বললে দেখা গেল, ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার নেই,—সেই সঙ্গে সুমিত্রাও নেই।

অল ক্লিয়ার দিতেই কখন তারা উঠে চলে গেছে!

শ্রীমন্ত স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

(১১)

১৯৪২ সালের ডিসেম্বর।

সে এক স্মরণীয় দিন।

রাত্রে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। চাঁদ ওঠার দু'ঘণ্টা পরেই বাজে সাইরেন। ভীত মানুষ যে যেখানে পারে, আশ্রয় নেয়। জাপানী এরোপ্লেন আসে শহরের মাথায়। বোমা পড়ে,—কখনও সহরের ভিতরে, কখনও বাহিরের শিল্পাঞ্চলে পরদিন সকাল থেকে আরম্ভ হয় শহর ছাড়বার ধুম।

হাওড়া আর শিয়ালদহ,—দু'দিকের দুটো ষ্টেশনে সমস্ত দিন রাত্রি জনসমুদ্র গর্জন করছে। ট্রেণের সংখ্যা কমে গেছে। নির্দিষ্ট সংখ্যক টিকিট সকালের দিকে কিছুক্ষণের জন্যে বিক্রি হয়। সে আর ক'খানা? তারপরে সারাদিন চলে ঘুষের খেলা। ধনীরা মুঠো-মুঠো নোট দেয় গুঁজে, ট্রেণে ওঠবার তাড়ায়, সহর থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার ব্যাকুলতায়।

মধ্যবিত্তেরাও দিচ্ছে তাদের সর্বস্ব উজাড় ক'রে। যারা চালাক, তারা ফন্দী-ফিকির খুঁজছে। ট্রেণ প্ল্যাটফর্মে আসবার আগেই কেউ বা দু'টাকা ঘুষ দিয়ে, কেউ বা লুকিয়ে বেড়া টপকে ইয়ার্ডে গিয়ে ঢুকছে।

যারা পারছে না তারা ষ্টেশনের প্রবেশ-পথে অপমানিত হচ্ছে, মার খাচ্ছে। যারা জখম হচ্ছে, দয়া ক'রে তাদের ষ্টেশনে ফার্ষ্ট এড দেওয়া হচ্ছে এবং ষ্ট্রেচারে করে নিয়ে গিয়ে



ট্রেণে উঠিয়েও দেওয়া হচ্ছে। তাদের 'আহত বিবর্ণ মুখে তখন পরিতৃপ্তির কী হাসি!

এত ঝামেলা যারা পোয়াতে রাজি নয়, তারা চলেছে হেঁটে। কেউ কেউ সপরিবারেই।

নিরবচ্ছিন্ন ধারায় চলেছে মূষিকের মতো মানুষের দল।

কারও মাথায় পাগড়ি, কারও হাতে লাঠি, কারও কাঁধে বাঁক—তাতে তার সমস্ত সম্পত্তি। কেউ চলেছে একা, কেউ সপরিবারে, কচি-কাচা ছেলেপুলে নিয়ে, কারও সঙ্গে গরু-বাছুর মহিষ।

জনতার যেন আর শেষ নেই।

দেখতে দেখতে চোখ ক্লান্ত হয়ে আসে। এত লোকও এই কলকাতা সহরে ছিল ? চলেছে তো চলেছেই। এর আর ছেদ নেই। চৌবাচ্চা খুলে দিলে যেমন হুড় হুড় ক'রে জল বেরিয়ে যায়, এই দুটি নির্গম পথ দিয়ে তেমনি ক'রে লোক বেরিয়ে চলেছে।

এ ছাড়া নদীপথও আছে। নৌকো ভাড়া ক'রেও বহু পরিবার চলে যাচ্ছে। তিন ঘণ্টার পথ, তিন দিনে পেঁৗছুবে। কি আর করা যায়? হাঁটবার শক্তি নেই, ট্রেণে ভিড় ঠেলাও অসম্ভব। তার চেয়ে তিন দিন, তিন দিনই সই।

যারা রইলো তাদের অবস্থাও সুখকর নয়।

সকাল হ'লেই রকম-বেরকমের গুজব উঠছে। সে সমস্ত শুনলেও বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। সন্ধ্যে হ'লে যখন পথের লোক যায় বিরল হয়ে, পল্লী স্তব্ধ হয়ে আসে,—তখন ঘরের মধ্যে বসে থেকেও গা ছমছম ক'রে। ঘুম আসে না, কখন সাইরেন বাজে।

এই সাইরেন!

আহত মুমূর্ষু কুকুরের আর্তনাদের মতো এই যে ডাক,—বোমার চেয়েও এই ডাক ভয়ংকর। শুনলে মুখ শুকিয়ে যায়, হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়, দেহের গাঁটে গাঁটে ঝিঁঝিঁ ধরে।

যেন শ্মশানের প্রেতের আর্তনাদ।

শ্রীমন্ত কোথাও যায় নি।

সে অবশ্য বড় কথা নয়। যারা পালাচ্ছে তাদের মধ্যে ঝি-চাকর, রিক্সওলা-ঘোড়াগাড়ীওলা-ফিরিওলা, কুলী-মজুর আর ছোট-বড় মাঝারি ব্যবসাদারের সংখ্যাই বেশি। চাকুরীজীবি সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব কমই পালাচ্ছে। তারা যে সাহস বেশি ব'লে পালাচ্ছে না তা নয়, এখনই-এখনই চাকরী ছেড়ে পালানো তারা শ্রেয় মনে করছে না। তারাও পালাবে। সত্য কথা বলতে কি, পালাবার জন্যে তারা সকল সময় তৈরি হয়েই রয়েছে। কেবল আরেকটু না দেখে পালাতে প্রস্তুত নয়।

সুতরাং শ্রীমন্ত যে পালায়নি তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তাদের অফিসের মোটে তিনজন ছাড়া আর কেউ পালায়নি। আশ্চর্য এইখানে যে, সে বলে, তার ভয় করে না।

কলকাতা সহরে এখন বাড়ীর অভাব নেই। সস্তায় চমৎকার একখানা বাড়ী সে ভাড়া করেছে।

সেই রাত্রের পর হোটেলে সে বড় একটা আর যায় না। সন্ধ্যার পরে আজকাল বাইরে কোথাও বেরুনো ঠিকও নয়। অফিসেও আজকাল সে আর অত রাত্রি করে না। সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসে।

হাত-মুখ ধুয়ে পোষাক ছেড়ে আজকাল সে বাইরের বারান্দায় এসে বসে।

মেয়েছেলে দেশের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবার পর বাড়ী পাহারা দেবার কাজ বড়-বাবুর কমেছে। তিনিও মাঝে মাঝে আসেন। মাঝে মাঝে আসে আলেকজাণ্ডার। তার সঙ্গে শ্রীমন্তরও খুব ভাব জমেছে। দুজনে দুজনকে নাম ধ'রেই আজকাল ডাকে। শ্রীমন্ত ডাকে হেনরি ব'লে, আর আলেকজাণ্ডার বলে, মণ্টি।

ওদের দুজনের এই ঘনিষ্ঠতায় সুমিত্রা খুশি নয়।

শ্রীমন্ত তা বুঝতে পারে। কিন্তু কি করবে? রাগ ওর আসে না ওর মনে 'জেলাসি' ব'লে কিছু নেই। মনের 'ফ্রণ্টে' সুমিত্রা ক্রমাগত সৈন্যসমাবেশ করছে। কিন্তু শ্রীমন্তের সেজন্যে কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা আছে বলে মনে হয় না। সে যুদ্ধ করবেই না।

এমন কি সেই হাওয়াই-হামলার রাত্রে সুমিত্রা যে হেনরির সঙ্গে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, তাকে একলা ফেলে রেখে, তার জন্যে আজ পর্যন্ত কোনো দিন একটা কৈফিয়ৎও সে চায়নি।

সুমিত্রা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একটা কৈফিয়ৎ হয়তো দিতে চেয়েছে। কিন্তু তার ভণিতাতেই আন্দাজ পেয়ে শ্রীমন্ত তাড়াতাড়ি অন্য বিষয়ের অবতারণা করেছে।

ভেবে পায় না সুমিত্রা, এ রাগ, না অভিমান, না ঔদাসীন্য?

শুধু শ্রীমন্ত জানে, ওসব কিছুই নয়। হৃদয়বৃত্তির চর্চা করার সময় তার নেই। জীবনের গতিপথে কালো ঘোড়ার মতো সে ছুটে চলেছে আপন লক্ষ্যের দিকে। তার ভাগ্যদেবতাই জানে, সেখানে তার জন্যে কি সঞ্চিত হয়ে রয়েছে—অভিশাপ, না আশীর্বাদ। যাই থাক, সে-ই তার একান্ত লক্ষ্য। এ পথে হৃদয়ের কোনো স্থান নেই।

মানুষের মূল্য তার কাছে প্রয়োজনের তুলাদণ্ডে ওজন করা হয়। কারবার চলে cash and carry'র। তার মধ্যে রাগ-অভিমানের বালাই নেই।

বড়বাবু, সুমিত্রা, হেনরি, এদেরকে তার প্রয়োজন। সেই হিসাবেই এদের সে খাতির করে, যত্ন করে এবং এদের পিছনে খরচও করে। তার জন্যে ওরা সবাই খুশি।

বাদে সুমিত্রা। সেই কেবল মাঝে মাঝে বিগড়ে যায়। মাঝে মাঝে বুঝতে পারে না শ্রীমন্তর ব্যবহারে সে চটবে কি খুশি হবে। পুরুষমানুষের মনে 'জেলাসির' বাষ্প পর্যন্ত নেই, একথা ভাবতেও ওর অবাক লাগে।

এ কি ক'রে সম্ভব হয় ?

সুমিত্রা ভাবে, কিন্তু ভেবেও কোনো কিনারা পায় না।

প্রতিদিনের মতো আজকেও শ্রীমন্ত অফিস থেকে ফিরে বারান্দার উপর থেকে চলমান জনতা দেখছিল।

প্রথম দু'দিনের পরে জনতা অনেক ফিকে হয়ে এসেছে। তবু এখনও কম নয়। সেই জনতার স্রোতে তার মন করবী ফুলের মতো নিরুদ্দেশ ভেসে চলেছে।

হঠাৎ পিছন থেকে তার পিঠের উপর একটা টোকা পড়লো।

—সুমিত্রা ? এসো, বোসো।

শ্রীমন্ত খুশি হয়ে উঠলো। তার মন কোনো কারণেই এমন ক'রে ভেসে চলে, এ সে সহ্য করতে পারে না। সুমিত্রা এলো, ভালোই হ'ল। একটা নোঙ্গরের তার দরকার ছিল।

—কি দেখছিলে ? জনতা ?

—হ্যাঁ।

শ্রীমন্ত পাশের চেয়ারে বসে বললে, দেখছিলাম, ওদের মুখে কি লেখা রয়েছে।

—কি দেখলে ?

—দেখলাম, শুধু ভয় নয়।

তবে ?

—পিছন থেকে ভয়ের একটা ঠেলা অবশ্য আছেই। কিন্তু সেই সঙ্গে সামনের একটা টানও আছে।

—সে টানটা কিসের ?

—বুঝলে না? গেল বারে ইভ্যাকুয়েশানে যাদের বাইরে পাঠিয়েছে, মা-বাপ-স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, টানছে তারা। ট্রেণে এখনও যথেষ্ট ভিড়। বড়বাবুকে বললাম, এই ভিড়ে একটা দিনের জন্যে কেন কষ্ট ক'রে দেশে যাচ্ছেন ? বললেন, বোঝ না ভায়া, বাড়ীতে সবাই ভাবছে। খবরের কাগজে যা পাচ্ছে তা তারা বিশ্বাস করতে পারছে না। চোখে না দেখে পর্যন্ত তারা শান্ত হ'তে পারবে না। সেই থেকেই কথাটা ভাবছি।

—ভেবে কিছু কিনারা পেলে ?

এমন সময় ভারি বুটের শব্দ ক'রে হেনরি এল। তাকে সম্বর্ধনা জানিয়ে শ্রীমন্ত সুমিত্রার কথার উত্তর দিলে।

—কিনারা ঠিক পাইনি। তবে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। এখন মনে হচ্ছে যেন পায়ে মাটি ঠেকচে।

হেনরি জিজ্ঞাসা করলে, কিসের মাটি ?

শ্রীমন্ত হেসে বললে, কবরের। শোনো হেনরি, আমাদের সম্বন্ধে তুমি কি ধারণা নিয়ে যাবে জানিনে। কিন্তু ক'টা কথা তোমার জানা দরকার।

হেনরি আগ্রহে বললে, কি বল ?

শ্রীমন্ত বললে, আমাদের একটা বদনাম আমরা ভীরু। বাইরে থেকে দেখলেও তাই মনে হবে। কিন্তু সেটা সত্যি নয়।

হেনরি বললে, সত্যিটা তবে কি ?

—সত্যি এই যে, আমরাও তোমাদেরই মতো সাহসী।

—প্রমাণ কর।

প্রমাণ করছে, ভারতের সৈন্যবাহিনী।

—আর এই যারা পালাচ্ছে ?

—তারাও ভীরু নয় সবাই। —শ্রীমন্ত চেয়ারে সোজা হয়ে উঠে বসলো—ইউরোপের

যে সব সহরে বোমা পড়েছে সেখানকার কথা ভাবো। এমন কি, তোমার লণ্ডনের লোকেরাও এর চেয়ে সাহস দেখায়নি। তারপরে বলতে পারো এখানে থেকে এরা প্রাণ দেবে কিসের জন্যে? একি স্বাধীন দেশ? না ওদের হাতে অস্ত্র আছে?

হেনরি জিজ্ঞাসা করলে, অস্ত্র তুমি কাকে বলো? তলোয়ার? রিভলবার? বন্দুক? কিন্তু সে নিয়েও তো হাওয়াই-হামলা ঠেকানো যায় না।

এবারে সুমিত্রা উত্তর দিলে। বললে, না, যায় না। তবু তাতে মনের বল বাড়ে। ভাবো তো হেনরি, এত বড় দুর্দিনেও যারা আত্মরক্ষার প্রয়োজনেও বন্দুক-রিভলবার ব্যবহারের অনুমতি পেলে না, আত্মরক্ষার জন্যে তাদের পলায়ন ছাড়া আর কি রইল?

এই উত্তরে হেনরি এবং শ্রীমন্ত উভয়েই হেসে উঠলো।

শ্রীমন্ত বললে, তাছাড়াও কথা আছে। ব্যক্তিগতভাবে আমরা তোমাদের মতো মরিয়া হ'তে পারি না।

—কেন পারো না?

—সেই কথাই সুমিত্রাকে বলছিলাম। পারি না আমাদের এই সমাজ-ব্যবস্থার জন্যে। আশ্চর্য একটা ব্যবস্থা! কিন্তু দাঁড়াও, তার আগে তোমাদের চায়ের কথাটা ব'লে আসি।

হেনরি না বলে পারলে না ঃ বলে আসতে হবে কেন মণ্টি, এখানেই তাকে ডাকো না?

—তা সম্ভব নয়। —গম্ভীরভাবে শ্রীমন্ত বললে,—কারণ এই নতুন লোকটি বদ্ধ কালা।

—সর্বনাশ!

—কিছু সর্বনাশ নয়, বরং ভালোই হয়েছে। সাইরেন যখন বাজে তখন ও নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। বোমার শব্দে ওর ঘুমও ভাঙে না, ভয়ও করে না।

শ্রীমন্ত হাসতে হাসতে চলে গেল।

ফিরে এসে শ্রীমন্ত বলতে লাগলো ঃ

—আমাদের এই দেশকে যদি বুঝতে চাও, তাহ'লে সব চেয়ে আগে বুঝতে হবে এদেশের সমাজ-ব্যবস্থা। একান্নবর্তী পরিবার যে কি বস্তু সে তোমার ধারণা নেই। একজন উপার্জনক্ষম ব্যক্তির উপর নির্ভর ক'রে থাকে বৃদ্ধ বাপ-মা, বিধবা পিসিমা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, নাবালক ভাই-বোন, অনেকে। তারপরে ধরো, এদেশে বিধবা-বিবাহ নেই। তোমরা যুদ্ধে এসেছ, তোমাদের এই ভরসা আছে, কারও মৃত্যু হ'লে তার স্ত্রী একেবারে পথে বসবেন না। প্রথমতঃ তাঁর নিজের উপার্জন করবার শক্তি আছে, দ্বিতীয়তঃ তিনি হয়তো আবার বিবাহ ক'রে ঘর-সংসার পাতবেন। কিন্তু এদেশের কথা ভাবো ঃ স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীর ভাই কিংবা দেওরের গলগ্রহ হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

হেনরি বললে, কিন্তু এই তো, মিস রায় চাকরী করছেন।

সুমিত্রা হেসে বললে, করছি। কিন্তু এত বড় দেশে আমাদের মতো মেয়ের সংখ্যা কত! তাছাড়া তুমি জানো না, এর জন্য আমাদের এই মুষ্টিমেয় ক'জনকে কত বাধা এবং নিন্দার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়।

শ্রীমন্ত বললে, তাছাড়াও বাধা আছে। আজ যুদ্ধের জন্যে চাকরী সুলভ হয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় বারো আনা ছেলে বেকার থাকে। এর উপর মেয়েরাও যদি চাকরী খুঁজতে আরম্ভ করে, তাহলে বেকার সমস্যা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠবে।

চাকরে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এল। সুমিত্রা উঠলো চা তৈরি করতে।

সুমিত্রা হেসে জিজ্ঞাসা করলে, এই লোকটি কালা?

শ্রীমন্ত বললে, হ্যাঁ। বদ্ধ কালা। প্রথম দিন বোমা পড়তেই সে চাকরটা পালিয়েছে। বহু কষ্টে দ্বিগুণ মাইনেতে একে পেয়েছি। কানে শোনে না। ভরসা হচ্ছে বোমায় একে ভয় দেখাতে পারবে না। কি বল?

সবাই হেসে সম্মতি দিলে।

ওর হাতে একটা টাকা দিয়ে শ্রীমন্ত ইসারায় এক প্যাকেট সিগারেট আনতে বললে।

লোকটি বললে, ভাঙানী ছাড়া দেবে না।

বিরক্ত কণ্ঠে চীৎকার করে শ্রীমন্ত বললে, ভাঙানীর দরকার নেই, ওতে যত প্যাকেট হয় নিয়ে আয়। পয়সা কিছু বাঁচলে দেশলাই নিয়ে আসবি। বুঝলি?

লোকটি বুঝলে কি না, কে জানে! বাবুর চীৎকারে ভয় পেয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল।

শ্রীমন্ত ওদের দিকে চেয়ে বললে, এই আর এক বিপদ হয়েছে। চাকরটা পালিয়ে যাওয়ার পর দুদিন চা খেতেই পেলাম না। এ পাড়ার চায়ের দোকান সব বন্ধ। মুদির দোকান, তাও বন্ধ। এ রকম করে ক'দিন চলবে?

চিন্তার কথা!

সুমিত্রা বললে, এমনি একটা কালা আমাকে যোগাড় করে দিতে পার?

শ্রীমন্ত হেসে বললে, দেখব।

তারপর বললে, কী লোকটাই পালালো এবং এখনও পালাচ্ছে! কদিন ধরেই ভাবছি এদের কথা। আমার কি মনে হচ্ছে জানো? প্রাণের ভয় একটা মস্ত বড় কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের সমাজ-ব্যবস্থাও এর জন্যে অনেকখানি দায়ী। অনেকে শুধু বুড়ো বাপ-মা, স্ত্রীপুত্রের চিন্তিত মুখ স্মরণ করেই পালিয়েছে। নইলে হয়তো থেকে যেত।

হেনরি অনেকক্ষণ নিঃশব্দে ঘাড় নীচু করে ব্যাপারটা ভেবে দেখতে লাগলো। তারপর বললে, তুমি যা বলছ মণ্টি, সে অসম্ভব নয়। অন্ততঃ এর মধ্যে ভেবে দেখবার ব্যাপার আছে। আমার কি মনে হচ্ছে জানো? মেয়েদের অসহায় করে তোমরা নিজেরাই নিজেদের বিড়ম্বনা বাড়িয়েছ। এখন দুঃখ করা বৃথা। তোমাদের পায়ে পরাধীনতার বেড়ি এবং সমাজ-ব্যবস্থার বেড়ি পরস্পর জড়িয়ে গেছে। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কিছু চিন্তা করেছ?

শ্রীমন্ত হাসলে। বললে, আমার কথা ছেড়ে দাও। এদেশের যাঁরা জ্ঞানে, চিন্তায়, কর্মে সকলের বড়,—যাঁরা অন্য দেশের কারও চেয়েও ছোট নন, তাঁরা চিন্তা করছেন। কিন্তু কিনারা পেয়েছেন বলে মনে হয় না। আমাদের দেশের যত কিছু সমস্যা সব পরস্পর সম্বন্ধ হয়ে একটা দুষ্টচক্রে ঘুরছে। এর মধ্যে একক কোনোটিকে আলগোছে তুলে নিয়ে সেই সমস্যাটির সমাধান করবে তার উপায় নেই। অনেক চিন্তা করে দেখা গেছে, আমাদের দেশের পরাধীনতার সমাধান না হলে কোনোটিরই সমাধান সম্ভব নয়।

হেনরি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা [illegible] ততোদিন অন্য সমস্যাগুলি অ[illegible]

—উপায় কি?—হেনরির মুখের দিকে চেয়ে হেসে শ্রীমন্ত বললে, আমি বুঝতে পারছি, তোমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু মার্কিণ স্বাধীনতা-যুদ্ধের কালে যাঁরা জন্মেছিলেন তোমার সেই পূর্বপুরুষদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা আমার কথাতেই সায় দিতেন।

অজ্ঞাতসারে শ্রীমন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। সেটা ওর পক্ষে এমনই একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার যে সুমিত্রা পর্যন্ত চায়ের পেয়ালার ফাঁক দিয়ে অবাক হয়ে ওর দিকে চাইলে।

(১২)

দুর্ভিক্ষ যে আসন্ন একথা গবর্ণমেণ্ট ছাড়া আর সবাই বুঝেছিল।

জাপানী সৈন্য বাঙলা ও আসামের সীমান্তে এসে থমকে গেল। মাঝে মাঝে বোমা ফেলে ভয় দেখায়। কিন্তু আসে না অথচ মালয়-সিঙ্গাপুর-বর্মার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তার জন্যে গবর্ণমেণ্টের সতর্কতার আর অন্ত নেই। নৌকো-সাইকেল তো গেছেই, চালও যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

চালের দর হু হু বেড়ে চলে। গবর্ণমেণ্ট ভরসা দেন, ও কিছু নয়, ইনফ্লেশন। মানুষের টাকা সস্তা হয়েছে।

চাল পাওয়া যায় না। গবর্ণমেণ্ট বললেন, চোরাবাজার। হুমকি দিলেন, তিন দিনের মধ্যে সব চোরাবাজারীকে সায়েস্তা করে দেওয়া যাবে। তাহলেই আর চালের অভাব থাকবে না।

ফাঁকা ভরসায় পেট মানে না। পাড়াগাঁ থেকে ভিক্ষুকের আমদানী হতে লাগলো।

একদিন সন্ধ্যার পরে শ্রীমন্ত করযোড়ে বড়-বাবুর কাছে এসে দাঁড়ালো।

বড়বাবু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার?

—দরবার আছে।

—হুকুম হোক।

—আমাদের মহেন্দ্র গেছে সিভিল সাপ্লাইএ ভালো চাকরী নিয়ে।

—তারপরে?

—তিন জন মক্কেল আছে, কন্ট্রোলের দোকান চায়।

—কি রকম খরচ করবে?

—বলেছে, দোকান পিছু হাজার টাকা।

—আর কিছু উঠবে না?

—উঠতে পারে।

—বখরা কি রকম?

—মহেন্দ্রর আট আনা, আপনার পাঁচ আনা, আমার তিন আনা?

বড়বাবু ভেবে বললেন, বেশ। এখন কি তাকে ফোনে পাওয়া যাবে?

—বোধহয় না। কাল অফিসের সময় মনে করিয়ে দোব বরং। কিংবা যদি বলেন, ফেরবার পথে যেতে দেখিতে খবর দিয়ে যেতে পারি। আমি লোকও এই কাজের।

খুশি হয়ে বড়বাবু বললেন, সেই ভালো। শুভস্য শীঘ্রম্‌। বোলো, কাল সকালে আমার বাড়ীতে যেন দেখা করে।

মহেন্দ্র বড়বাবুর বিশেষ অনুগত লোক, একথা শ্রীমন্ত বেশ ভালো করেই জানে। অফিস বদলালেও সেই আনুগত্যের জের এখনও মেটেনি তাও সে জানে।

সুতরাং বড়বাবুর আশ্বাস পেয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল।

চোরাবাজার! চোরাবাজার! চোরাবাজার!

ক্ষুধিত মানুষ চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাট টাকা মণ দিয়ে সেখান থেকে চাল কিনে নিয়ে আসে। আশ্চর্য এই যে, গবর্ণমেণ্ট কিছুতেই সে সব জায়গার ঠিকানা সংগ্রহ করতে পারলেন না। পুলিশ হোস্টেলের কোণ থেকে রিভলবার বার করে, কলেজের ছেলের পকেট থেকে বার করে অননুমোদিত ইস্তাহার। কিন্তু হাজার হাজার বস্তা চাল কোন গুদামে লুকানো আছে কিছুতেই তার কিনারা করতে পারলে না।

অবশেষে চোরাবাজারের পাশাপাশি চলতে লাগলো কন্ট্রোলের চালের দোকান।

মহেন্দ্রের অনুগ্রহে শ্রীমন্ত এমনি তিনখানা কন্ট্রোলের দোকান বেনামীতে পেয়ে গেল। একখানা গ্রে ষ্ট্রীটে, একখানা চিত্তরঞ্জন এভিন্যুতে আর একখানা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে।

চাল যা আসে তার অর্ধেক, কখনো বা বারো আনা চড়াদামে চলে যায় চোরাবাজারে। সেখান থেকে আরও চড়াদামে যায় ক্ষুধিত নাগরিকের রান্নাঘরে। বাকি যা থাকে তাই কন্ট্রোলের দরে সারবন্দী লোকদের বিক্রী করা হয়। মুষ্টিমেয় জনকয়েক পায়, অবশিষ্ট লোক সমস্ত সকাল প্রত্যাশার পর হতাশ হয়ে ঘরে ফেরে।

শ্রীমন্তের ব্যাঙ্কের অঙ্ক দিন দিন স্ফীত হয়ে ওঠে।

আর সে কী চাল!

মাত্র দুর্ভিক্ষের দিনে বিচারবিহীন জঠরাগ্নিই সেই কদন্ন গ্রহণ করতে পারে! দুটো বৎসর আগে যে চাল ভিক্ষুকে ভিক্ষা নিতেও সম্মত হ'ত না, তাই কিনছে লোকে চতুর্গুণ মূল্য দিয়ে, কত ক্লেশ স্বীকার করে। না পেলে তার ক্ষোভের আর সীমা থাকে না! যেন কত পরম পদার্থ!

ভোরে উঠে শ্রীমন্ত বেরিয়ে যায় দোকান তদারক করতে। দেখে দুর্গত মানবের সারি তার দোকানের নিচে থেকে অজগর সাপের মতো এঁকে বেঁকে পাশের গলির ভিতর পর্যন্ত চলে গেছে।

একদিকে পুরুষের—একদিকে স্ত্রীলোকের সারি এক মুষ্টি চালের জন্য ঠেলাঠেলি করছে।

শ্রীমন্ত ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। ভদ্রঘরের লোকও আছে,—স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় সারিতেই। সেই কোন্ ভোরে এরা 'কিউ'তে এসে দাঁড়িয়েছে। সকলের আগের দিকে যারা দাঁড়িয়ে তারা রাত থেকেই ওইখানে রয়েছে।

মাঝে মাঝেই গুঁতোগুঁতি চলছে। সামনের দিকের নীচ শ্রেণীর কাট স্ত্রীলোক বিশ্রীভাষায় গালাগালি দিচ্ছে। সে কানে শোনা যায় না। সিভিক গার্ডের ছেলেরা তাদের ধমকাচ্ছে। কিন্তু কে কার কথা শোনে!

তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে একটি কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ে।

নিঃশব্দে।

তার শীর্ণ দেহ থেকে সমস্ত লাবণ্য এখনও মিলিয়ে যায় নি। পরনে একখানা মোটা শাড়ী। একটু আগে ওদের মাথার উপর দিয়ে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ভিজে কাপড়খানি ওর গায়ে একেবারে লেপ্টে রয়েছে। মাথায় ঘোমটা বোধ করি ছিল, কিন্তু এই ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ির মধ্যে কখন যে তা খুলে গেছে তা সে নিজেও টের পায়নি।

অদূরে একটা চারা গাছের নিচে এগারো বারো বছরের একটি শীর্ণ দেহ স্ফীতোদর বালক ওর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পা ব্যথা করলে একটু বা বসছে। বোধ করি মেয়েটির ভাই, কিংবা দেবর হবে।

মেয়েটির অনাবৃত কৃশ মুখের দিকে চেয়ে শ্রীমন্তর চোখে সাপের মতো হিংস্র দৃষ্টি লিকলিক করে উঠলো।

তারপরে আস্তে আস্তে সে আবার অন্য দোকানের দিকে চলে গেল। সর্বত্রই একই দৃশ্য। অস্থিচর্মসার নর ও নারীদেহের যাদুঘর!

কি একটা ছুটির দিন ছিল।

বাইরের দিকের খোলা বারান্দায় একখানা বেতের চেয়ার টেনে শ্রীমন্ত বসে বসে একখানা সস্তা ইংরিজি নভেল পড়ছিল।

একটু আগে মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছিল। চাকরটা এসে দক্ষিণ দিকের ভারী পর্দাটা ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পরেও সেটা এখনও তেমনি ফেলাই রয়েছে।

সামনের রাস্তা দিয়ে পর পর দুখানি গরুর গাড়ী যাচ্ছে। তার পিছন-পিছন লোক চলেছে এক পাল। কৌতূহলী হয়ে শ্রীমন্ত রেলিংয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালো।

কয়লার গাড়ী!

গাড়ীর উপরেই একটা বস্তার উপর কালো গেঞ্জী-পরা কয়লাওয়ালা বসে ছিল। ভিড় দেখে সে ভয় পেয়ে গিয়েছে। কখনও রেগে, কখনও স্তোক বাক্যে সে অনুসরণকারী জনতাকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করছিল।

কিন্তু কে কার কথা শোনে!

—শুনুন বাবু মশাইরা, সারাদিন শরীরের উপর দিয়ে ধকল গেছে। এখন যাব, চান করব, দুটো খাব। কাল সকাল! নইলে আর কয়লা বিক্রী করতে পারবো না।

—ওরে বাবা, কাল সকাল! সকালে তোমার দোকানে কয়লার একটা গুঁড়োও থাকবে না, রাত্রেই তুমি ব্ল্যাক-মার্কেটে চালান করে দেবে। তোমাকে চিনি না। চলো, যত রাত্রি হয় আমরা বসে থাকব, কয়লা নোব, তারপর বাড়ী যাব। কাল থেকে রান্না বন্ধ আছে!

শ্রীমন্ত মুচকি হেসে সরে এল।

এ তো সামান্য! তার কন্ট্রোলের দোকান তিনটেয় কান্নাকাটি চলছে প্রত্যহ। সেদিন একটা বুড়ি আধ সের চালের জন্যে তার দোকানের বারান্দায় এমন করে মাথা কুটলে যে রক্তারক্তি কাণ্ড!

কী করা যাবে? ছ' হাজার টাকা শুধু প্রণামী দিতে হয়েছে। সে-টাকা তুলতে হবে না? মমতা করলে এ বাজারে চলে কই?

সুমিত্রা এল।

পরণে জাফরাণী রংয়ের শাড়ী। যেন ওর দেহের উপর ক্লান্ত বর্ষণের ঘনঘটা নেমেছে।

শ্রীমন্ত উল্লসিত হয়ে উঠলো: এসো, এসো।

সুমিত্রা শ্রান্তভাবে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললে, কিছু চিনি যোগাড় করে দিতে পারো? কাল থেকে গুড় দিয়ে চা হচ্ছে। আমরা কোনো রকমে চালাচ্ছি। কিন্তু বাবা বুড়োমানুষ, তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে।

শ্রীমন্ত হেসে বললে, এমন চমৎকার বর্ষার অপরাহ্নে তোমায়-আমায় কথা আরম্ভ হবে কি চিনি, চাল, কয়লা নিয়ে?

অপ্রস্তুতভাবে হেসে সুমিত্রা বললে, কী করা যায়? এখন ওই হয়েছে মানুষের জপমন্ত্র। আমাদের একজন প্রোফেসর, স্থূলে বিষয় নিয়ে তাঁকে কোনো দিন কথা বলতে শুনিনি। একটু আগে রাস্তায় তাঁর সঙ্গে দেখা হতেই জিগ্যেস করলেন, চাল পাচ্ছ তো মা?

দুজনেই হেসে উঠলো।

সুমিত্রা হাসি থামিয়ে বললে, হাসির কথা নয় মণ্টি (হেনরির দেখাদেখি ও আজকাল মণ্টি বলছে)! এ আমরা কোথায় চলেছি? চাল-চিনি-নুন-কেরোসিন, এসব কোথায় গেল অদৃশ্য হয়ে? কোন্ অতলস্পর্শী গহ্বরে?

শ্রীমন্ত হাসলে। বললে, সেটা জানতে পারলে তো ভাবনা চুকেই যেত!

—সে কি কোনো দিন জানা যাবে না?

—কোনোদিনের কথা জানি না সুমিত্রা, তবে এখন যে জানা যাবে না তা বলতে পারি।

—কি করে?

—কার্ফ্যু, তাহলে ব্ল্যাকমার্কেট বন্ধ হয়ে যায়।

দ্‌'জনেই হেসে উঠলো।

স্‌মিত্রা বললে, দ্‌-একটা চোরাবাজারী ধরা পড়ছে কিন্তু।

শ্রীমন্ত হেসে বললে, হ্যাঁ! যেমন আমার চাকরের মাসী। দেশে ফসল নেই। সে আসছিল কলকাতায় দাসীবৃত্তি করতে। শুনেছে কলকাতায় চাল পাওয়া যাচ্ছে না। নিজের খাবার জন্যে সের দুই চাল আনছিল সংগে করে। শেয়ালদা ষ্টেশনে ধরা পড়ে গেল!

—বড়রা ধরা পড়ছে না কেন?

শ্রীমন্ত মুচকি হেসে বললে, কি করে জানব?

—লোকেরাই বা ধরিয়ে দিচ্ছে না কেন?

—কি হবে? চোরাবাজারী কিছু টাকা ঘুষ দিয়ে ছাড়া পেয়ে যাবে। মাঝে থেকে সে যে চাল পাচ্ছিল তা বন্ধ হয়ে যাবে। দুর্নীতি কতদূর প্রবেশ করেছে বুঝতে পারছ,— সমাজের একেবারে মেরুদণ্ডে। এরপরে যুদ্ধ একদিন থামবে, ব্ল্যাকমার্কেট বন্ধ হবে। কিন্তু এই যে দুর্নীতির রক্ষ্যা—এ সহজে সারছে না।

একটু থেমে শ্রীমন্ত দাঁতে দাঁত চেপে বললে, এই চোরাবাজারীদের জনে-জনে শূলে দেওয়া উচিত।

ব্ল্যাক-আউটের রাত্রি। সন্ধ্যার পরেই বারান্দায় ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে। এখন আবার নতুন করে বৃষ্টি নামলো ঝমঝমিয়ে। ছাট আসছে বারান্দায়। সুমিত্রার হাত ধরে শ্রীমন্ত ঘরের মধ্যে নিয়ে এল।

তারপরে কাঁচ কলাপাতা রঙের একখানা বেনারসী শাড়ি ওর হাতে তুলে দিলে।

বললে, ভেবেছিলাম, এই দিয়ে আজ আমাদের আলোচনা আরম্ভ হবে। কিন্তু তুমি নুন-তেল-লকড়ির কথায় সব মাটি ক'রে দিলে!

খুশিতে সুমিত্রার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললে, এ কাণ্ড কখন করলে?

—আজ সকালে।

কিছু চাল ব্ল্যাকমার্কেট ক'রে আজ সকালেই সে হাজারখানেক টাকা পেয়েছিল। তাই থেকে পাঁচ শো টাকা দিয়ে সুমিত্রার জন্য এই শাড়িখানা সে কিনেছে।

জিজ্ঞাসা করলে, পছন্দ হয়েছে?

উত্তরে সুমিত্রা একেবারে ওর বুকের কাছে সরে এলো। হাসিভরা মুখ ওর দিকে তুলে বললে, How nice of you!

একটা দমকা হাওয়া হুড়মুড় ক'রে ঘরে ঢুকলো। সংগে সংগে প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত হল।

সুমিত্রা সভয়ে বললে, সর্বনাশ! আমাকে যে ফিরতে হবে কিন্তু।

শ্রীমন্ত হেসে বললে, বৃষ্টিটা থামুক!

(১৩)

—মাগো,—দুটি খেতে দাও মা!

এই কান্না যেন ক্ষুধার্ত ক'লকাতার মর্ম-মূল থেকে দিন রাত্রি উঠছে। গৃহস্থের আহার-নিদ্রা বিষিয়ে উঠলো। সমস্ত সময় মানুষের কানে এই একটি সুর নিদ্রায় জাগরণে বেজে চলেছে : মা, মাগো...

পথে-পথে প'ড়ে রয়েছে দুর্গতের শবদেহ। অস্থি-চর্মসার বীভৎস মুখে ওরা যেন প্রচলিত সমাজ ও শাসন-ব্যবস্থাকে মুখ ভেঙাচ্ছে। চোখে দেখা যায় না। প্রথম প্রথম পথচারী চমকে উঠতো। কিন্তু তাও ধীরে ধীরে সয়ে এল।

'দেবধামে'র ঘোষ পরিবারে দুর্গতির আর সীমা রইলো না।

দেবসেবার জন্যে আতপ চালের প্রয়োজন। সে কোথায় পাওয়া যায়? আশ্রিত-পরিজন, বামুন-চাকর-ঝি, সব মিলিয়ে অনেকগুলি প্রাণী। এতগুলি প্রাণীর চালই বা কোথায় পাওয়া যায়?

হিমাংশুবাবু সদাশিব লোক। এসব কথা তাঁর কানে কেউ বড় একটা তুলতো না। কর্মচারীরা যেখান থেকে পারতো চাল যোগাড় করতো, তাঁর জন্যে মিহি চালও। দামের প্রশ্ন এখন আর ওঠে না। সুতরাং এতে কর্মচারীদের দু'পয়সা থাকতো।

ইতিমধ্যে মিহি চাল একদিন আর কোনো-ক্রমেই পাওয়া গেল না। হিমাংশুবাবু খেতে ব'সে চমকে উঠলেন!

এ কী চাল! যেমন মোটা, তেমনি বিচিত্র-বর্ণ, তেমনি কাঁকর!

গৃহিণী কাঁচুমাচু করে বললেন, এ ছাড়া আর কোনো চাল পাওয়া গেল না।

ঋণের দায়ে হিমাংশুবাবু বিব্রত। এবং ঋণ যত বাড়ছে, তাঁর মদ্যপানও তত বাড়ছে, বাড়তে বাড়তে এখন এমন হয়েছে যে, দিন-রাত্রির খুব অল্প সময়ই তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকেন।

কিন্তু চালের দিকে চেয়ে তাঁরও নেশার ঘোর কেটে গেল।

শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, দুর্ভিক্ষ কি তাহ'লে সত্যিই আরম্ভ হয়েছে? আমি ভাবছিলাম, খবরের কাগজের কারসাজি।

হিমাংশুবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

গৃহিণী বললেন, ভিখিরীদের ডাক তোমার কানে যায় নি?

—ডাক' কি ডাক? শুনিনি তো!

নোয়াখালির মহালটা বিক্রি হয়ে যাবার পর থেকেই উনি আর বাইরের বালাখানায় যান না। মোসাহেবের দলও কিছুদিন ব্যর্থ চেষ্টার পর তাঁকে ত্যাগ করেছে। যে-ঘরে আগে শ্রীমন্ত থাকতো, সেই ছোট ঘরটিতেই এখন তিনি একা দিনরাত্রির অধিকাংশ সময় থাকেন।

কেউ তাঁর কাছে আসে না। তিনিও কোথাও যান না। ভিখিরীর কান্না এত দূরে পৌঁছয় না। নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে যদি-বা পৌঁছয়, হিমাংশুবাবু তখন প্রকৃতিস্থ থাকেন না।

অনুযোগের সুরে গৃহিণী বললেন, তুমি একটু জাগো, চোখ মেলে চাও কি ঝড় যে বয়ে যাচ্ছে একবার দেখ!

হিমাংশুবাবু একটু চুপ ক'রে থেকে করুণ কণ্ঠে বললেন, আমার আর সামর্থ্য নেই গিন্নি। আমার ভরসা তোমরা ছেড়ে দাও। শঙ্করকে ধরো। তাকে মানুষ ক'রে তোলো। দুঃখ যে কি তাকে চিনতে দাও।

—কী যে বলো তুমি! শঙ্কর ছেলেমানুষ সে কি করতে পারে?

—না পারে, সব যাবে। আমি কি করব? আমার আর শক্তি নেই।

হিমাংশুবাবু অনেক ভেবেচিন্তে এক গ্রাস ভাত মুখে দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কেমন একটা দুর্গন্ধে নাক সিঁটকে ভাত ফেলে দিলেন। তারপরে একটু তরকারি, একটু মাছ মুখে দিয়ে উঠে পড়লেন।

ম্লান হেসে শান্তকণ্ঠে [illegible] আজ পারলাম না গিন্নি। [illegible] না, আস্তে আস্তে অভ্যেস হয়ে যাবে। তোমরা এই চালই খাও তো? বেশ, বেশ।

যেমনকার ভাত তেমনি প'ড়ে রইলো।

গৃহিণী কাঠের মতো শক্ত হয়ে ব'সে রইলেন। একটা কথাও বলতে পারলেন না। দুঃখের তাতে শঙ্কর যেন অকালেই পেকে যাচ্ছে।

নোয়াখালির মহালটা বিক্রি হয়ে যাবার খবর পেয়েই বাসন্তী এবং হৈমন্তী দুজনেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল।

কিন্তু হিমাংশুবাবু কোথায়? কার কাছে তারা দুঃখ জানাবে? হিমাংশুবাবু তখন বাইরের বালাখানায় ইয়ার-বক্সি নিয়ে সন্ধ্যার মজলিসের পরিকল্পনা তৈরি করছেন। তাঁকে পাওয়া অসম্ভব।

তাঁর বদলে পেলে শঙ্করকে।

ছেলেমানুষ ব'লে তাকে তারা নিষ্কৃতি দিলে না। যা-কিছু উপদেশ দেবার, বাবাকে যা-কিছু বলবার, সে সমস্ত তারা তাকেই ব'লে বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেল।

নায়েব-গোমস্তা-কর্মচারীর দল, তারাও তাকেই সব জানাতে লাগলো : বড়বাবু যে-রকম ক'রে চলেছেন, তাতে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি উড়ে যেতে বেশি দিন লাগবে না। কিন্তু তিনি তো শুনবেন না। তিনি চোখ বুজে ছুটে চলেছেন অন্ধকার গহ্বরের দিকে। এখন শঙ্কর যদি শোনে,—সে যদি বোঝে।

শঙ্কর শোনে। যেখানে যা-কিছু দুঃসংবাদ সব তার কানে এসে পৌঁছয়। বোঝবার বয়স তার হয়নি, তবু বোঝবার চেষ্টা করে, ভাবে।

এবং এত অল্প বয়সে ভাবতে শিখলে যা হয়, শঙ্কর অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেল। বাইরে বেরুতে তার ইচ্ছা করে না। বেরুলেই চোখে পড়ে অস্থি-চর্মসার নরনারী ও বীভৎস মৃতদেহ। সে দৃশ্য সে সইতে পারে না।

বাইরে সে বেরোয় না। বাড়ীতেও সঙ্গী কেউ নেই। একলা ব'সে ব'সে ভাবে, এই বৃহৎ বাড়ী,—এর পরিণাম কি!

সেদিন হিমাংশুবাবু ভিতরে এলে ও নিঃশব্দে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো।

অনেকদিন পরে ওকে দেখে হিমাংশুবাবু যেন চমকে উঠলেন :

—তুমি এত রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন?

শঙ্কর উত্তর দিলে না।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে চোখ নামিয়ে বললে, আমি বলছিলাম, এতগুলো ঝি-চাকর রাখার দরকার কি?

ওর বিজ্ঞজনোচিত কথার ভঙ্গিতে হিমাংশুবাবু বিস্মিত হলেন।

একটু ভেবে বললেন, এত বড় বাড়ী, এর চেয়ে কম দাসী-চাকরে কি চলবে?

—চালাতে হবে। যখনকার যেমন।

হিমাংশুবাবুর মুখ পলকের জন্যে বিবর্ণ হয়ে গেল। এই দুধের ছেলে, এও বুঝেছে তারা ধীরে ধীরে দরিদ্র হয়ে আসছে!

[illegible]তে দেশ্বর জন্যে তাঁর মুখ থেকে যেন কথা লোকও এই কল্প

কোনো রকমে স্খলিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মা কি বলেন?

—মাও বলেন, এত ঝি-চাকরের দরকার নেই।

—তাহ'লে তাই করো, আসছে মাস থেকে জনকয়েক ছাড়িয়ে দিও।

হিমাংশুবাবু আবার বেরিয়ে গেলেন।

শঙ্কর বুঝলে, তিনি মনে কষ্ট পেলেন এবং এই কষ্ট ঢাকবার জন্যেই বাইরে গেলেন। দেখে তারও কষ্ট হ'ল। কিন্তু কি করা যায়? এ সময় একটু শক্ত হতেই হবে। সমারোহ করার দিন আর তাদের নেই। মাথার উপর পর্বতপ্রমাণ দেনা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। এখনও যদি হিসাব ক'রে তারা চলতে না পারে, তাহ'লে যা আছে, তাও রাখা যাবে না। এই 'দেবধাম', এই বিখ্যাত ঘোষ পরিবার,—দেখতে দেখতে এর চিহ্নও থাকবে না।

শঙ্কর স্থির করলে, তার মায়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যত দিকে সম্ভব খরচ কমাতে হবে। বাইরের চাল যা নিতান্ত না রাখলে নয়, তাই মাত্র রাখা হবে। হিমাংশুবাবুর দুঃখ হবে, অনেক অসুবিধা এবং কষ্টও হবে। কিন্তু এ অবস্থায় শক্ত না হলে উপায় কি?

দাসী-চাকর কয়েকজন ছাড়িয়ে দেওয়া হ'ল; অন্দরের জন্যে রইলো শুধু একজন চাকর আর একজন ঝি। আর সদরে রইলো হিমাংশুবাবুর খাস চাকর রঘুয়া। রঘুয়াকে ছাড়ালে তাঁর একটা মিনিট চলে না। এতে টাকার দিক দিয়ে যে খুব বেশি সুবিধা হ'ল তা হয়তো নয়। ক'টা টাকাই বা ওরা মাইনে পেতো? সুবিধা হ'ল চালের। চাল সংগ্রহ করা সম্প্রতি খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সত্য কথা বলতে গেলে, ওদের নিজেদের পরিবার নিতান্তই ছোট। কর্তা, গিন্নি আর শঙ্কর। বাড়ী সরগরম থাকতো চাকর-বাকরেই। তাদের প্রায় সবগুলো চ'লে যাওয়াতে বাড়ী একেবারে খালি হয়ে পড়লো। নিস্তব্ধ, নিঝুম। গিন্নি মাঝে মাঝে হাঁফিয়ে ওঠেন। মনকে সান্ত্বনা দেন, দু'দিন পরে সয়ে যাবে।

ঠাকুরটাকেও ছাড়িয়ে দেওয়া তাঁর ইচ্ছা ছিল। লোকজন নেই, কি হবে শুধু শুধু ঠাকুর রেখে?

কিন্তু এইখানটায় বড়বাবু বেঁকে দাঁড়ালেন।

গিন্নি বললেন, ক'জনই বা লোক! এমন বুড়ো-হাবড়াও হইনি। এই ক'জনের রান্না আমি খুব পারব।

বড়বাবু কঠোরকণ্ঠে বললেন, না।

এই সংক্ষিপ্ত বাক্যের গুরুত্ব যে কতখানি, গিন্নি তা জানতেন। সুতরাং ঠাকুরকে সরাতে সাহস করলেন না।

ভাবলেন, থাক। মেয়ের বাড়ী যাওয়া, খবরাখবর নেওয়া, ঠাকুর ছাড়া কেউ পারবে না। থাক ও।

রয়ে গেল বাইরের দরওয়ানটাও।

এই অবস্থায় একদিন হঠাৎ শ্রীমন্ত এসে উপস্থিত। এখান থেকে চলে যাওয়ার পরে এ বাড়ীতে এই তার প্রথম পদার্পণ।

দেউড়ির দরওয়ান ম্লান হাস্যে তাকে সম্বর্দ্ধনা করলে।

বললে, ভিতরে চলে যান। সদরের বালাখানা বন্ধ।

শ্রীমন্ত উপরের দিকে চেয়ে দেখলে, বন্ধই বটে। চারিদিক কেমন শ্রীহীন বোধ হতে লাগলো। বাড়ী ঢোকবার গোল রাস্তার দুপাশে জঙ্গল হচ্ছে। গাড়ীবারান্দার এক কোণে কতকগুলো ময়লা জমেছে। ফোয়ারাটা দিয়ে আর জল পড়ে না। সেই সখের লাল-নীল মাছগুলোও আর নেই। নেই সেই কলরব, ছুটোছুটি এবং চঞ্চল সজীবতা।

উপরে উঠে শ্রীমন্ত প্রথমে তার নিজের পুরোনো ঘরটির দিকে উঁকি দিলে।

দেখলে সেই ঘরে মেঝেয় ফরাস বিছিয়ে বড়বাবু গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে একখানা খবরের কাগজ পড়ছেন।

শ্রীমন্ত গিয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

হিমাংশুবাবু বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে চেয়ে সবিস্ময়ে বললেন, শ্রীমন্ত! অনেক দিন পরে এলে বলে মনে হচ্ছে যেন।

শ্রীমন্ত উত্তর দিলে না। দেখলে, বড়বাবুর শরীর অনেকখানি কাহিল হয়ে গেছে। সেই গম্ভীর শান্ত কণ্ঠস্বরও যেন দুর্বল।

জিজ্ঞাসা করলে, আপনার কি অসুখ ক'রেছিল?

—না তো।

—শঙ্কর এরা সব কোথায়?

—ভেতরে, ভেতরে। চ'লে যাও। তোমার আর সঙ্কোচ কি?

শ্রীমন্তর বুক একবার দ্রুততালে নেচে উঠলো: হৈমন্তী কি আছে?

ভিতরের প্রশস্ত দরদালানে গৃহিণী তরকারি কুটছিলেন। শ্রীমন্তকে দেখে লজ্জিত-ভাবে তাড়াতাড়ি বঁটিটা বন্ধ ক'রে এক পাশে সরিয়ে রেখে দিলেন।

—ওমা, শ্রীমন্ত! বুড়ো বাপ-মাকে এতদিনে মনে পড়লো? এসো, এসো।

শ্রীমন্ত হেঁট হয়ে ওঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মেঝেতেই বসে পড়লো।

—ওকি, ওকি! দাঁড়াও, একখানা আসন এনে দিক। অ কদম!

—কিচ্ছু দরকার নেই মা। এই বেশ বসেছি। কেমন আছেন বলুন? শরীর তো ভালো দেখাচ্ছে না!

কেমন থাকার কথায় গৃহিণীর বুকের ভিতরটা যেন হাহাকার ক'রে উঠলো। চোখ জ্বালা করতে লাগলো।

তবু হেসে বললেন, আমাদের আর থাকা-থাকি বাবা! বয়স হচ্ছে, এখন তোমাদের রেখে ভালোয়-ভালোয় যেতে পারলেই বাঁচি। তুমি কেমন আছ?

ব'লে শ্রীমন্তর দিকে চাইলেন।

পরণে তার কোঁচানো দিশী ধুতি। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবীতে ঝলমল করছে হীরার বোতাম। আঙুলে দামী-দামী কয়েকটা আংটি। এতগুলো আংটি এক সঙ্গে সে বড়-একটা পরে না। আজকে কেন পরেছে, কে জানে?

গিন্নী হেসে বললেন, যাই বল বাছা, তোমার সেই লাবণ্য যেন নেই। বড্ড কি বেশী খাটতে হয়?

—ঠিক ধরেছেন মা! মায়ের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।

শ্রীমন্ত হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

গৃহিণীর স্নেহের পরিচয় শ্রীমন্ত বরাবরই পেয়ে এসেছে। কিন্তু এই শান্ত অথচ রাশ-ভারী মহিলার এত কাছে ব'সে এমন জোরে হাসতে শ্রীমন্ত এর আগে কখনও সাহস করেনি। ব্যাপারটা এমনই অভিনব যে, ঘোষ-গৃহিণীর চোখে পর্যন্ত বিস্ময় ফুটে উঠলো।

কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই শ্রীমন্ত বলতে লাগলো:

—খাওয়ার যে কি কষ্ট সে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না। ঠাকুরটা বোমা পড়ামাত্র পালিয়েছে, সেই সঙ্গে চাকরটাও। তার বদলে যে চাকরটা পেয়েছি, সেটা বদ্ধ কালা। ঝোল রাঁধতে বললে ভাজা করে, ডাল বললে টক। আর সে কী রান্না!

—তাহ'লে তুমি এইখানেই আজ খেয়ে যাবে বাছা! সেইজন্যে শরীর অমন হয়েছে। অ কদম!

শ্রীমন্ত হাত জোড় ক'রে বললে, আজ থাক মা। আজকে অনেক ঝামেলা, অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে। আর একদিন এসে প্রসাদ পেয়ে যাব।

গৃহিণী হেসে বললেন, আর একদিনও আসবে বাবা। আজকেও খেয়ে যেতে হবে। অ কদম!

শ্রীমন্ত বুঝলে, এর পরে বাধা দেওয়া নিরর্থক।

এমন সময় ধীরে ধীরে হিমাংশুবাবু এসে ওদের কাছে দাঁড়ালেন।

গায়ে একখানা সিল্কের কল্কাদার



কিমোনো, পরণে পায়জামা। মুখে চুরুট। ডান হাতে একখানা 'স্টেটস্‌ম্যান'।

হিমাংশুবাবুর শরীর যে কত খারাপ হয়ে গেছে, শ্রীমন্ত এতক্ষণে পরিপূর্ণভাবে টের পেলে। এই দু'বৎসরেই ভদ্রলোক বেশ খানিকটা কুঁজো হয়ে গেছেন। ডান হাতের খবরের কাগজখানা অনবরত কাঁপছে। দুই হাতেরই বোধ হয় এই অবস্থা। স্খলিত চরণ, জড়িত কণ্ঠ।

এই কিমোনোটা শ্রীমন্তের অপরিচিত নয়। অনেক দিন থেকে দেখে আসছে। মাঝে মাঝে ফুটো হয়ে গেছে। বাইরের ছোট ঘরটিতে যখন তিনি ব'সেছিলেন, এটা গায়ে ছিল না। এখন শ্রীমন্তর কাছে কেন যে প'রে এলেন, কে বলবে? দারিদ্র্যের লজ্জা ঢাকবার জন্যে? কে জানে!

বললেন, যুদ্ধের খবর কি হে?

রঘুয়া তাড়াতাড়ি একটা কুশন-চেয়ার এনে দিলে। শ্রীমন্তর কাছে তিনি সেইটেতে বসলেন।

শ্রীমন্ত যুদ্ধের খবর খুব বেশি রাখে না। তবু বললে, খুব ভালো ব'লে মনে হচ্ছে না।

উত্তেজিতভাবে হিমাংশুবাবু বললেন, নয়ই তো। সেদিন সলোমন আইল্যাণ্ডসের কাছে আকাশে আর সমুদ্রে যে বিরাট যুদ্ধ হয়ে গেল, তার ফলাফল কিছু জানো?

ফলাফল দূরের কথা, যুদ্ধের খবরটাই সে এই প্রথম শুনলে। কিন্তু ভূগোলের সব এখনও সে ভুলে যায়নি। বুঝলে, যুদ্ধটা ঘটেছে জাপানে আর আমেরিকায়।

সুতরাং তৎক্ষণাৎ সহাস্যে বললে, ফলাফল তো বোঝাই যাচ্ছে। ও কি আর বলবার?

—এই! আমিও সেই কথাই বলছিলাম। ফল যা হয়েছে তা জানাই, কি বলো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

হিমাংশুবাবু চেয়ারটা শ্রীমন্তের কাছে আর একটু সরিয়ে এনে ফিস্ ফিস্ ক'রে বললেন, আচ্ছা, জাপানীরা কি শিগ্‌গির ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে ব'লে মনে হয়?

—সে বিষয়ে আর সন্দেহ আছে? এরা তো বাঙলা দেশ ছেড়ে দেবার জন্যে তৈরি হয়েই বসে আছে।

হিমাংশুবাবু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তাঁর বাহুতে কপালে নীল শিরা স্ফীত হয়ে উঠলো।

বললেন, যাক, যাক। সব ধ্বংস হয়ে যাক। পাপে এই সহর পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আবার যদি এইখানেই সহর পত্তন করতে হয়, তাহ'লে এর এক হাত মাটি তুলে ফেলতে হবে। এর মাটির নীচে পর্যন্ত বিষ ঢুকেছে, জানো শ্রীমন্ত, মাটির নীচে পর্যন্ত।

হিমাংশুবাবু ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে বাইরে চলে গেলেন। শ্রীমন্ত অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। এই শান্ত নির্বিরোধ মানুষটির মনে এমন ভূমিকম্পের উত্তাপ জমলো কি ক'রে?

কার উপর ক্রোধ?

শ্রীমন্ত জানে, ঘোষ বংশের আভিজাত্যের এই শেষ প্রতীক এখনও বৃটিশ শাসনের অনুরাগী। তবে? কার বিরুদ্ধে, কিসের বিরুদ্ধে ও'র জীর্ণ মনে এই উত্তাপ সঞ্চিত হচ্ছে? কে জানে! কে জানে!

শঙ্কর আর শ্রীমন্ত এক সঙ্গে দোতলার দরদালানে খেতে বসলো অনেককাল পরে।

গৃহিণী সামনে বসে খাওয়াতে লাগলেন।

শ্রীমন্তের উপর গৃহিণীর অনুগ্রহ বরাবরকার। কিন্তু আজকের আয়োজনে যেন একটু বিশেষত্ব আছে। এ যেন একটা সম্মান এবং তার জীবনে এ সম্মান এই প্রথম।

গৃহিণী বললেন, তুমি বাড়ীর লোক তাই খেতে বললাম। নইলে, যা চাল, বাইরের লোককে আর খেতে বলা যায় না।

হেসে বললেন, জামাই এলে দিনের বেলাতেও লুচি দিই। লজ্জায় সুবিমল দিনে আসে না।

ভাতের দিকে চেয়ে শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করলে, বড়বাবুও কি এই চালের ভাত খান?

—তাঁর ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। এ ভাত খেতে পারেন না, একটু নাড়াচাড়া ক'রে উঠে পড়েন।

শঙ্করের দিকে চেয়ে শ্রীমন্ত বললে, তুমি আমাকে বলোনি কেন?

সবিস্ময়ে শঙ্কর বললে, তুমি ভালো চাল দিতে পারতে?

—এখনও পারি। তা তোমাকে আর যেতে হবে না, আমিই বরং একদিন মণ দুই ভালো চাল দিয়ে যাব। কিন্তু...

শঙ্করের ভাতের গ্রাস মধ্যপথেই থেমে গেল।

বললে, কিন্তু কি?

শ্রীমন্ত একটু ভেবে বললে, কাল সোমবার। কাল রাত একটার সময় চাল নিয়ে আসব। দরোয়ানকে গেট খুলে জেগে থাকতে বলবে।

শঙ্কর হেসে বললে, দরোয়ান কেন শ্রীমন্তদা, আমরা বাড়ীশুদ্ধ সবাই সারারাত গেটের গোড়ায় ব'সে থাকতে পারি,—এমনি অবস্থা হয়েছে।

গৃহিণী বললেন, হাসির কথা নয় বাবা, সত্যি তেমনি অবস্থা হয়েছে। বিশেষ, ওঁর শরীরের জন্যে আমাদের সবারই ভয় হয়েছে। কিন্তু অত রাত্রে চাল আনবে কেন বাবা? একটু সময় ক'রে দিনের বেলায় আনতে পারো না? বলো যদি...

শ্রীমন্ত হেসে বললে, সময়ের জন্যে নয় মা। সে আছে অনেক ব্যাপার, শঙ্কর বুঝেছে। কিন্তু বাবুর শরীরের ওপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে মা। শরীরটা ওঁর একেবারেই ভেঙে গেছে।

—শুধু শরীর?—গৃহিণীর মুখের উপর একটা কালো ছায়া নামলো।

শঙ্কর বললে, কিছুদিন থেকে বাবার মাথার অবস্থাও খুব ভালো বোধ হচ্ছে না।

গৃহিণী বললেন, ওই শুনলে না তখন? সব ধ্বংস হয়ে যাক, এই হয়েছে ওঁর বুলি। বিচিত্র কিছুই নয়। আজীবন মদ্যপান ক'রে এসেছেন। দেহ ব্যাধিমন্দিরে পরিণত হয়েছে। তার উপর অর্থসংকট এবং এই চারিদিকের ডামাডোল। শ্রীমন্ত ভাবলে, ঋণগ্রস্ত প্রাচীন জমিদারবংশের এছাড়া আর কি পরিণতি প্রত্যাশা করা যায়?

সে নিঃশব্দে খেয়ে যেতে লাগলো।

একটু পরে মাথা তুলে জিজ্ঞাসা করলে, হৈমন্তীর খবর কি মা? ভালো আছে তো?

গৃহিণী বললেন, এখন পর্যন্ত ভালই আছে। আশ্বিন মাসে ছেলে হবে বলে দিন পোনেরো হ'ল এখানেই এনেছি। এখন ভালোয় ভালোয় যাদের ছেলে-বৌ তাদের কাছে ফিরে পাঠাতে পারলে বাঁচি।

শ্রীমন্তর কানের ভিতরে হঠাৎ যেন সহস্র ঝিঁ-ঝিঁ পোকা ডাকতে আরম্ভ ক'রে দিলে...

হৈমন্তীর আশ্বিন মাসে ছেলে হবে?... এই বাড়ীতেই আছে?...অথচ এর মধ্যে একবারের জন্যেও এসে তার সঙ্গে দেখা ক'রে গেল না?...এও সম্ভব? এও সম্ভব?

শ্রীমন্তর গলার ভিতরটা যেন শুকিয়ে গেল। ভাতের গ্রাস গলা দিয়ে নামতে চাইলো না। এটা-ওটা নাড়াচাড়া ক'রে সে উঠে পড়লো।

—তোমার যে কিছুই খাওয়া হ'ল না বাবা?

শ্রীমন্ত ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। গৃহিণীর কথায় এক গাল হেসে বললে, কী যে বলেন মা! আজ যা খেলাম, আমার অনেক দিন মনে থাকবে —

(১৪)

সন্ধ্যার পরে শ্রীমন্তর বাড়ীতে এসে সুমিত্রা শুনলে, বাবু সেই যে সকালে বেরিয়েছেন এখনও ফেরেন নি।

এতে অবাক হবার কিছু নেই। শ্রীমন্তর সঙ্গে তার যতদিনের চেনা, তাকে সে এই-রকমই দেখছে। সে যে কি করে, আর কি না করে সুমিত্রা আজও তার হদিস পেলে না। কিন্তু কিছুদিন থেকে এইটে সে নিঃসংশয়ে বুঝেছে, শ্রীমন্ত প্রচুর রোজগার করছে। আমীরের মতো দরাজ হাতে সে খরচ করে এবং টাকাও বোধকরি ভালোই জমিয়েছে। এত টাকা সে কি ক'রে কোথা থেকে পাচ্ছে, তা সে জানে না। কিন্তু সদুপায়ে যে নয় তা' বুঝতে পারে এবং যথাসম্ভব তাকে দোহনও করে।

সুমিত্রাও বেরিয়েছিল দুপুর বেলায়। হেনরির সঙ্গে গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে লাঞ্চ সেরে ওরই সঙ্গে গিয়েছিল মেট্রোয় সিনেমা দেখতে।

ছ'টায় সেখান থেকে বেরিয়ে ক্যাসানোভায় চা খেয়েছে সাতটা পর্যন্ত।

সেখান থেকে হেনরি চলে গেছে ডিউটিতে, আর ও এসেছে শ্রীমন্তর খবর নিতে। কিন্তু শ্রীমন্ত সেই যে সকালে বেরিয়েছে এখনও ফেরেনি। হয়তো ফিরবে এখনই। সুমিত্রা একটু অপেক্ষা করতে পারে। হাতে এখন তার কোনোই কাজ নেই।

রাস্তার দিকের বারান্দায় একখানা বেতের চেয়ার টেনে ও বসলো।

কালা চাকরটা এসে জিজ্ঞাসা করে গেল, চা দিয়ে যাবে কি না। তাকে 'না' বলে দিয়ে সুমিত্রা একটা সিগারেট ধরালে। হেনরির সঙ্গে ঘোরবার সময় মাঝে মাঝে এক-আধটা সিগারেট আজকাল সে খাচ্ছে। কিন্তু গোপনে।

সিগারেটের ধোঁয়ার আড়ালে ও শ্রীমন্তর কথা ভাবতে লাগলো।

অনেক ছেলে সে দেখেছে, কিন্তু এমন আশ্চর্য ছেলে এর আগে কখনও তার চোখে পড়েনি। ওর দেহে যেমন শক্তি মনেও তেমনি মত্ততা। কিন্তু সে মত্ততা নির্বিকার,— সমুদ্রের তরঙ্গের মতো যেন একটা রুটিন মেনে চলেছে। ওর ছোট ছোট দুই চোখের ফাঁক দিয়ে যেন দুখানা ভোজালির প্রান্ত চকচক করছে। ওর সঙ্গের একটা আকর্ষণ আছে। কিন্তু সেই আকর্ষণের উৎস যে কোথায়, বোঝা যায় না। ওর কথা ভাবতে সুমিত্রার অবাক লাগে।

হেনরির একটা শক্তি আছে। হাউইএর মতো সুমিত্রাকে সে প্রচণ্ডবেগে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে নিজে ফুরিয়ে যায়। মৃৎপিণ্ডের মতো সুমিত্রা তখন মাটিতে এসে পড়ে।

আর শ্রীমন্ত যেন লোনা জলের দুরবগাহ সমুদ্র। সে জল খাওয়া যায় না। সেখানে নামতেও ভয় করে। কিন্তু একবার যে নেমেছে, সে ভয়ংকর খেলার নেশায় মেতে উঠবে।

তেমনি নেশা লেগেছে সুমিত্রার। এই আশ্চর্য-অদ্ভুত মানুষটির উপর।

হঠাৎ সিঁড়িতে শ্রীমন্তর পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। সুমিত্রা তাড়াতাড়ি হাতের সিগারেটটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিবে নির্বিকার বসে রইলো বাহিরের আকাশের দিকে চেয়ে।

শ্রীমন্ত ওর দিকে চেয়েই অট্টহাস্য করে উঠলো:

—সুমিত্রা যে! কতক্ষণ?

—এই আধ ঘণ্টাটাক। কোথায় বেরিয়েছিলে, সেই সকাল থেকে?

ওর পাশে একখানা চেয়ার টেনে বসে শ্রীমন্ত বললে, বহু জায়গায়। সর্বশেষে তোমার বাড়ী।

—আমার বাড়ী?

—হ্যাঁ সখি! গিয়ে শুনলাম, দুপুরেই তুমি বেরিয়েছ, কোথায় নাকি লাঞ্চের নেমন্তন্ন আছে।

ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সকৌতুক জিজ্ঞাসা করলে, কার নিমন্ত্রণ সখি! হেনরির?

ওর মুখ দিয়ে ভক ভক করে উগ্র মদের গন্ধ বেরুচ্ছে!

হেনারকে নিয়ে এই শ্রেণীর রসিকতা শ্রীমন্ত কখনও করেনি।

সুমিত্রা লাফিয়ে চীৎকার করে উঠলো:

—তুমি মদ খেয়েছ?

সে চীৎকারে শ্রীমন্ত চমকে চেয়ার নিয়ে পিছিয়ে এল। তারপর ধীরে ধীরে জড়িত কণ্ঠে বলতে লাগলো:

—মদ? হ্যাঁ, খেয়েছি। বেশী নয় একটুখানি। আমার বুক পুড়ে যাচ্ছে সুমিত্রা। আজকে তুমি তিরস্কার কোরো না। চুপ করে একটুখানি আমার কাছে বোসো। হ্যাঁ, that's like a good girl!

সুমিত্র বসলো, কিন্তু কাছে নয়, একটুখানি দূরে। ওর বিস্ময় লাগছিল, সেই সঙ্গে আমোদও। ওকে এমন দুর্বল, এমন অসতর্ক এবং অসহায় আর কখনও সে দেখেনি। আটলান্টিক সমুদ্রে কে যেন এক রাশ তেল ঢেলে দিয়েছে। আর সমস্ত তরঙ্গ গেছে থেমে। সমুদ্র যেন বীর্যহীন, নিস্তরঙ্গ পুকুরে পরিণত হয়েছে!

শ্রীমন্ত বললে, তুমি কখনও কাউকে ভালোবেসেছ সুমিত্রা?

অন্য সময় শ্রীমন্তের মুখ থেকে এই কথা শুনলে ও অপমানিত বোধ করতো, রেগে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠতো। কিন্তু শ্রীমন্তের অবস্থা দেখে এ প্রশ্নে ও রাগলে না। বরং হেসেই ফেললে। বললে, কি জানি?

—ঠিক। জানো না। আমিও জানতাম না। দুপুরে রাত্রে বিশ হাজার টাকার গহনা গায়ে দিয়ে হৈমন্তী আমাকে সেধেছে। কিন্তু টলাতে পারেনি। সেই মেয়ে আজ আমার সঙ্গে দেখা করলে না, এই কথাটা ভাবছি আর আমার বুকের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে। কেন বলো দেখি? আমি কি তাকে ভালোবেসেছিলাম?

—তুমি কাউকে ভালোবাসতে পারো, এ আমার বিশ্বাস হয় না।

—আমারও হয় না। কিন্তু বুক যে জ্বলছে সুমিত্রা, এ তো অবিশ্বাস করবার ব্যাপার নয়!

হঠাৎ সুমিত্রার চোখ জ্বালা করে উঠলো। বললে, তোমার বুকে আগুন জ্বালাতে পারে এমন মেয়ে আমি কল্পনাও করতে পারি না। তোমার হৃদয় নেই, এই আমার বিশ্বাস।

—সেই দৃঢ়বিশ্বাস আমারও ছিল সুমিত্রা। আমার বিশ্বাস টলেছে এবং আশঙ্কা হচ্ছে তোমারও টলবে। অনুমতি কর সুমিত্রা, আর একটুখানি খাই? খুব সামান্য একটুখানি?

শ্রীমন্ত বাঁ পকেট থেকে একটা ফ্লাস্ক বের করলে।

সুমিত্রা যেন ছোঁ মেরে সেটা কেড়ে নিয়ে দূরে গিয়ে দাঁড়ালো।

দৃঢ়কণ্ঠে বললে, না।

—একটি ফোঁটা। Please.

সুমিত্রা তেমনি দৃঢ় কণ্ঠে বললে, একটি ফোঁটাও না। ওঠ, শোবে চলো।

এক রকম জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে সুমিত্রা ওকে খাটের উপর শুইয়ে দিলে।

বললে, একটু ঘুমোও দেখি?

অত্যন্ত দুষ্ট ছেলের মতো মিট মিট করে হেসে শ্রীমন্ত বললে, না।

ধমক দিয়ে সুমিত্রা বললে, না কেন?

—হয় আমাকে একটি ফোঁটা মদ দাও, please,—নয় তুমি বলো আজ রাত্রে এখানে থেকে যাবে। আমার বুক পুড়ে যাচ্ছে। মাইরি!

সুমিত্রা হেসে ফেললে। বললে, আচ্ছা, থাকব। তুমি ঘুমোও।

—সত্যি? শ্রীমন্ত ধড়মড় করে উঠে বসলো। ও যেন নিজের কাণকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

—সত্যি।

সুমিত্রা ওকে খাটের উপর শুইয়ে একখানা ইজিচেয়ার ওর খাটের কাছে টেনে নিয়ে এল। টেবিল ল্যাম্পের ঢাকাটা টেনে দিয়ে ওর চোখের দিকটা অন্ধকার করে দিলে। পাখাটা দিলে খুলে। তারপরে ওর একখানি হাত বুকের উপর টেনে নিয়ে ঈজিচেয়ারে শুয়ে পড়লো।

বললে, আমি এইখানে রইলাম। দুষ্টুমি না করে লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘুমিয়ে পড়ো দিকি?

শ্রীমন্তর বোধকরি তন্দ্রা আসছিল। একটু পরেই সে ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু সুমিত্রা জেগে রইলো অনেকক্ষণ। ক্ষুধা ছিল না। শুধু একটুখানি কফি খেলে। তারপরে সেই ঈজিচেয়ারে ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। এই অসহায় নিদ্রিত মাতাল তার নিদ্রাহীন চোখে যেন পদ্ম মধুর অঞ্জন পরিয়ে দিয়েছে। এত সুখের রাত্রি তার জীবনে এর আগে আর আসেনি। সারা রাত সে জেগে কাটালে।

ভোরের দিকে কখন এক সময় সুমিত্রা ঘুমিয়ে পড়েছিল। পূবের জানালা দিয়ে আলো এসে তার চোখে পড়তে ঘুম ভেঙে গেল। জেগে দেখে খাটে শুয়ে শুয়েই শ্রীমন্ত এক দৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে!

ভোজালির মতো কঠিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এখনও ওর চোখে জাগেনি। দৃষ্টি এখনও অলস, শ্রান্ত,—ভোর-হয়ে-আসা আকাশের শুকতারার মতো একটু যেন করুণও।

তাড়াতাড়ি বেশ-বাস সংযত করে সুমিত্রা উঠে দাঁড়ালো। অপাঙ্গে ওর দিকে চেয়ে একটু হেসে বাথরুমে চলে গেল।

ফিরে এসে দেখে শ্রীমন্ত তখনও অলসভাবে চোখ বুজে শুয়ে।

ওর পায়ের শব্দে চোখ মেলে শ্রীমন্ত বললে, নীচে চাকরটার ঘোরাফেরার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে যেন। ওকে একটু গরম জলে লেবুর রস দিয়ে নিয়ে আসতে বলবে সুমিত্রা? না হলে বোধহয় উঠতে পারবো না। সেই সঙ্গে চা'ও।

শ্রীমন্ত ম্লান ভাবে হাসলে।

সুমিত্রা চাকরকে গরম লেবুজল আর চায়ের জন্যে বলে এসে বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা ঠিক করে নিলে।

শ্রীমন্ত বললে, কাল রাত্রে তোমাকে আটকানো আমার ঠিক হয়নি সুমিত্রা। ভয় হচ্ছে, তোমার বাবা-মা হয়তো রাগ করবেন।

সহজ কণ্ঠে সুমিত্রা বললে, রাগ করবেন কেন? নিজের ভালো-মন্দ বোঝবার বয়স আমার হয়েছে। তাঁরা এতে কিছু মনে করবেন না।

কালা চাকর লেবু, গরম জল, চা দুধ চিনি রেখে গেল। সুমিত্রা তৈরী করতে বসলো।

শ্রীমন্তকে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কি এখানে আসবে, না তোমার লেবু জল বিছানার কাছে দিয়ে আসব?

হেসে শ্রীমন্ত বললে, চায়ের গন্ধে শরীরে একটু একটু করে যেন শক্তি ফিরে আসছে। উঠতে পারব মনে হচ্ছে।

চায়ের টেবিলে বসে বললে, তোমার মুখে ভোরের আলো এসে পড়েছে সুমিত্রা। সোনালি আলো। শরতের আর বোধ হয় দেরী নেই বেশী।

সুমিত্রা জবাব দিলে না। মুখ নীচু করে হাসতে হাসতে চা তৈরী করতে লাগলো। এক পেয়ালা চা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, দেখ তো, চিনি আর লাগবে কি না।

চুমুক দেবার আগেই শ্রীমন্ত বললে, বোধ হয় না। তোমার হাত এমনিতেই যথেষ্ট মিষ্টি।

সুমিত্রা হেসে ফেললে। বললে, তোমার কি হয়েছে বলো তো?

কী জানি! মুখ দিয়ে ক্রমাগত ভালো ভালো কথা বেরুচ্ছে। এমন তো বড় একটা হয়না! আমার বিশ্বাস, এ একটা ব্যাধি। আশা করছি, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেটে যাবে।

—Amen. তোমার বুকের সেই যন্ত্রণাটা আর নেই তো?

কাল রাত্রের সব কথা শ্রীমন্তর পরিষ্কার মনে পড়ছে না। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, কিসের যন্ত্রণা?

চায়ের পেয়ালার আড়ালে ঈষৎ হেসে সুমিত্রা বললে, সে আমি কি জানি? তুমিই বলছিলে তাই জিজ্ঞেস করলাম।

শ্রীমন্ত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলে।

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, হৈমন্তী কে?

—তার নাম তুমি কোথায় শুনলে?—শ্রীমন্ত প্রায় চীৎকার করে উঠলো।

—শুনেছি। তাকে একবার দেখাতে পারো?

—কেন বলো তো?

—বুক পোড়ানোর মন্তরটা শিখে আসব।

—সুমিত্রা টিপে টিপে হাসতে লাগলো।

একটুক্ষণ স্তব্ধভাবে কাকে যেন শ্রীমন্ত ভেবে নিলে। বোধকরি হৈমন্তীকেই।

তারপর বললে, তাতে কাজ নেই সুমিত্রা। ও মন্তরটা ভালো নয়। তার চেয়ে আমি বলি কি......

শ্রীমন্ত থামলে।

সুমিত্রা চায়ের পেয়ালাটা মুখের কাছে তুলেছিল, আবার নামালে। বললে, কী বলো?

—আমি বলি, এসো আমরা বিয়ে করে ফেলি।

সুমিত্রার হাতের পেয়ালাটা প্লেটের উপর ঠক করে একবার কেঁপে উঠলো।

শ্রীমন্ত বলতে লাগলো, এ মাসটা বোধ হয় ভাদ্র মাস। তা হোক, আমাদের বিয়ে হবে তিন আইনে। কি বল?

সুমিত্রা অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল। কী বলে শ্রীমন্ত? ও কি পরিহাস করছে? ওর কথা ও যেন বুঝতে পারছে না।

শ্রীমন্ত আপন মনেই বলে চলেছেঃ

—আমার বিশ্বাস, এ ভালোই হবে। আমরা পরস্পরকে চিনি। কারও সম্বন্ধেই কারও কোনো মিথ্যে আশা, কি মিথ্যে বিশ্বাস নেই। আমরা কেউ কারও উপর জবরদস্তি করব না। ভুল-ভাঙারও কোনো প্রশ্ন উঠবে না। বিনা দাবী-দাওয়ায় আমরা ঘর বাঁধব,—যাকে বলে সংসার। ইচ্ছে করলে তুমি চাকরী করতে পারো। ইচ্ছে করলে নাও করতে পারো। যে টাকা আমার জমেছে, সে নিতান্ত সামান্য নয়। কি বলো, আমি কি মন্দ প্রস্তাব করেছি?

শ্রীমন্ত হয়তো আরও কিছু বলতো, কিন্তু সুমিত্রা হঠাৎ সজোরে হেসে উঠলো। হাতের ঘড়িটা ওর নাকের কাছ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়ে বললে, ক'টা বাজছে খেয়াল আছে মশাই? সাড়ে আটটা। দশটায় অফিস না? আমি চললাম।

—ওঃ তাই নাকি! কী সর্বনাশ! শ্রীমন্ত লাফিয়ে উঠে বাথরুমে চলে গেল।

সমস্ত পর্বটাই যেন একটা অভিনয়!

(১৫)

সমস্ত দিন শ্রীমন্তর মন কেমন উড়ু উড়ু করতে লাগলো। কাজে মন বসে না কিছুতেই।

দুমণ উৎকৃষ্ট মিহি চালের ব্যবস্থা সে করেছে। একটু বেশি রাত্রে নিয়ে যেতে পারলেই ভালো হয়। পুলিশের ধরবার ভয় থাকে না। কিন্তু অত রাত্রি পর্যন্ত তার সবুর সইলো না। একটু ঝুঁকি নিয়ে রাত্রি সাড়ে নটার মধ্যেই সে একখানা ট্যাক্সি করে বেরিয়ে পড়লো। 'দেবধামের' একেবারে গাড়ী-বারান্দার নীচে গিয়ে ট্যাক্সি থামলো কর্কশ শব্দে।

সেই শব্দে এক গাল হেসে শঙ্কর বেরিয়ে এলো।

—এনেছ, শ্রীমন্তদা?

—হুঁ। একজন কাউকে বলো বস্তাটা ভিতরে নিয়ে যেতে। খবর সব ভালো তো?

সেই ট্যাক্সিতেই শ্রীমন্ত চড়তে যাচ্ছিল। অনুনয়ের সুরে শঙ্কর বললে, একটু চা খেয়ে যাবে না শ্রীমন্তদা?

—চা?—শ্রীমন্ত একটু কি যেন ভাবলে। বললে, আচ্ছা।

ট্যাক্সির ভাড়াটা মিটিয়ে দিয়ে সে ভিতরে গেল শঙ্করের সঙ্গে। দোতলায় উঠে ওর আগেকার ঘরের পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছে, ভিতর থেকে শব্দ এলো, কে ও?

হিমাংশুবাবুর কণ্ঠস্বর। কিন্তু কালকের মতো ক্ষীণ নয়।

শঙ্কর নিষেধ করবার আগেই শ্রীমন্ত সবিনয়ে জবাব দিলে, আজ্ঞে আমি।

ব'লে দরজা থেকে উঁকি দিতেই হিমাংশুবাবুর চোখে চোখ পড়ে গেল। বড়বাবু একাই তখন ফ্ল্যাস্কে, ডিকেণ্টারে, গ্লাসে, প্লেটে আসর সাজিয়ে বসেছেন।

—শ্রীমন্ত? আরে এসো, এসো।

শ্রীমন্ত না এসে পারলে না।

—বোসো, বোসো। তুমি নাকি খুব বড়লোক হয়েছ? বেশ, বেশ। শুনে ভারি খুশি হয়েছি। খাবে নাকি একটু? তাতে কি হয়েছে? ওসব বাজে সঙ্কোচ আমি পছন্দ করি না। প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে তোমার বয়স ষোলো বছর তো পেরিয়ে গেছে। খাও ভালো জিনিস। আমরা পুরোনো খদ্দের বলেই পাই। নইলে এখন আর এসব জিনিস পাবার উপায় নেই। বাইরে কে রে?

বাবার কবল থেকে শ্রীমন্তকে বাঁচাবার জন্যে শঙ্কর বাইরে থেকে ইসারা করছিল। কিন্তু হিমাংশুবাবু যেন আটঘাট বন্ধ করে সতর্কভাবে বসে ছিলেন। তাঁর ধমক খেয়ে শঙ্কর পালালো।

হিমাংশুবাবু নিজের হাতে এক পাত্র ওকে ঢেলে দিলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, যুদ্ধের নতুন কি খবর শুনলে বাবা। দেশে নাকি ভয়নক দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়েছে? লোক মরছে পথে পথে? সত্যি? বাইরে তো বেরুই না। কেউ আমাকে খবর এনেও দেয় না। আরেকটু খাবে? খাও না। খুব ভালো জিনিষ, নয়? চালের বড় কষ্ট হচ্ছে বাবা। ও চাল তো খেতে পারিনা। জাপানীরা কবে আসবে বলতে পারো? কিছু না হোক, একদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পযন্ত বোমাই বৃষ্টি করে যাক না। এ আর ভালো লাগে না!

—এক বস্তা সরু চাল নিয়ে এসেছি আজ।

এতক্ষণ পরে শ্রীমন্ত কথা বললে।

—এনেছ? বেশ, বেশ। এসব এলেম চাই, বুঝলে? চাকর-বাকর কর্মচারীদের ব'লে ব'লে হয়রাণ হয়ে গেছি। ওরা পারে না। অথচ তুমি তো পারলে? বেশ, বেশ। Thank you.

শ্রীমন্তর সঙ্কোচ হচ্ছিল। বাপের চেয়ে বড় হিমাংশুবাবু। এই বাড়ীতে এই বাড়ীর ছেলের মতোই সে মানুষ হয়েছে। সেই বাপের মতো হিমাংশুবাবুর সঙ্গে বসে মদ্যপান। ওর সমস্ত শরীর কাঠের মতো শক্ত হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু আশ্চর্য এই 'তরল অনলের' মহিমা! দেখতে দেখতে সেই আড়ষ্ট ভাব কেটে গেল। রাত্রি বারোটার সময় শঙ্কর উঁকি দিয়ে দেখলে, দুজনে গলা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে নৃত্য করছে! আর সে কি হুল্লোড়!

রাত্রিটা শ্রীমন্তকে 'দেবধামেই' থাকতে হোল। একেবারে বেহুঁস হয়ে সে যায়নি বটে, কিন্তু বাড়ী ফেরার মতো অবস্থাও ছিল না। যে ঘরে তার বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবন কেটেছে, সেই ঘরেই তার বিছানা হল।

রঙিন চোখে সে ঢাকা-দেওয়া আলোয়

আলো-আঁধারী ঘরের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলোঃ

মেঝেয় একখানা লাল মীর্জাপুরী কার্পেট পাতা। তারই উপর ঢাকার ফাঁক দিয়ে বিজলী আলোর একটা বৃত্ত এসে পড়েছে। শ্রীমন্তর মনে হ'ল রক্ত! কার যেন চাপ চাপ তাজা রক্ত ওইখানে পড়ে রয়েছে!

খাটের ওপর সে ধড়মড় করে উঠে বসলো। মাথা অল্প অল্প ঘুরছে, শরীর দুলছে, চোখ লাল। শ্রীমন্ত স্পষ্ট দেখলে, রক্ত!

কিন্তু কার রক্ত?

হৈমন্তীর?

শ্রীমন্তর মনে পড়লো, সেই দিন, সেই শেষ দিন হৈমন্তী এক-গা গহনা পরে ওইখানটিতেই এসে দাঁড়িয়েছিল না? ও কি তারই বুকের রক্ত? তাজা, টকটকে! এতদিন পরে আজ সেই রক্ত তার চোখে পড়লো?

শ্রীমন্ত বুকে যেন একটা বেদনা অনুভব করলে। তার হৃদপিণ্ডে কে যেন সহস্র ছুঁচ ফোটাচ্ছে। মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করছে।

সে খাটের বাজুতে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করলে।

তাতেও নিষ্কৃতি নেই!

চোখ বন্ধ ক'রেও সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, গলিত পাঁচের মতো জমাট কালো অন্ধকারের ঠিক মাঝখানটিতে একটা চাপ টকটকে লাল রক্ত!

খাটের বাজু থেকে মাথা না তুলেই সে আড়চোখে সম্মোহিতের মতো আলোর বৃত্তটার দিকে চেয়ে রইলো।

কত রক্ত! ওইটুকু বুকে এত রক্ত ছিল!

শ্রীমন্তর চোখে আবার সাপের সেই হিংস্র দৃষ্টি ফুটে উঠলো। প্রভাত সূর্যের আভা-লাগা লাল শিশির বিন্দু যেমন জ্বলতে থাকে, ওর চোখ তেমনি ক'রে জ্বলতে লাগলো।

ওই রক্তের বিষ লেগেছে ওর দেহে। সেই বিষের জ্বালায় পা থেকে মাথা পর্যন্ত ওর সমস্ত দেহ যেন পুড়ে যাচ্ছে। অসহ্য যন্ত্রণায় ও ছটফট করতে লাগলো। আর যেন ও সইতে পারছে না, এক্ষুণি যেন বুক ফেটে যাবে।

হঠাৎ ও উঠে দাঁড়ালো।

এ-বাড়ীর সমস্ত ওর নখদর্পণে। হৈমন্তী কোন ঘরে শোয় সে ও জানে। ও যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, তেতলার সেই সিঁড়ির পাশের ছোট ঘরখানিতে মেহগনির খাটের উপর হৈমন্তী শুয়ে। নিশ্বাসের তালে-তালে ওর বুক দুলছে। মাঝে মাঝে নড়াচড়ায় ওর চুড়ির কিঙ্কিনি, শাড়ীর খসখস শব্দ উঠছে। সেই শব্দ যেন এত দূরেও ওর কানে এসে ওকে অস্থির ক'রে তুলছে।

শ্রীমন্ত উঠলো। ঘরের আলো নিবিয়ে দিলে। সন্তর্পণে দরজা খুলে বাইরে এসে একবার দাঁড়ালো।

আঃ! বাইরের হাওয়া কি ঠাণ্ডা! ওর বুকের ভিতরটা যেন জুড়িয়ে গেল।

ওদিকের একটা তেতলা বাড়ীর আড়ালে চাঁদ বোধ করি একটু আগে অস্ত গেছে। পৃথিবীতে অন্ধকার নেমেছে, কিন্তু আকাশের গা থেকে আলোর সমস্ত রেখা এখনও মুছে যায়নি।

সেই অন্ধকারে শ্রীমন্ত সতর্ক দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে। কোথাও জীবনের চিহ্ন নেই। দু'হাতে দু'দিক ধ'রে ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের মতো টলতে টলতে শ্রীমন্ত চললো হৈমন্তীর ঘরের দিকে।

দ্বার বন্ধ।

শ্রীমন্ত ঠুক ঠুক ক'রে দরজায় টোকা দিলে। কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। একটুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে আবার টোকা দিলে। এবারও কোনো সাড়া পেলে না। সে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলো।

হৈমন্তীর দরজা কি তার কাছে চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে?

শ্রীমন্ত তবু অপেক্ষা ক'রে রইলো। সেই দরজার গোড়ায়। সময়ের বোধ তার লোপ পেয়ে গেছে। সমস্ত পৃথিবী ঘুমিয়ে। অনন্ত কালের বটপত্রে সে একা রয়েছে জেগে,—হৈমন্তীর জন্যে অপেক্ষা ক'রে।

কিন্তু কবে তার দুয়ার খুলবে কে জানে?

পা টলছে শ্রীমন্তর। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। সেইখানে চৌকাঠের গোড়ায় দরজায় মাথা ঠেকিয়ে সে ব'সে পড়লো।

কতক্ষণ পরে কে জানে, হঠাৎ এক সময় দরজা খুলে গেল।

দরজার গোড়ায় অমনিভাবে একজনকে ব'সে থাকতে দেখে হৈমন্তী একটা অস্ফুট শব্দ ক'রে পিছিয়ে এল।

শ্রীমন্তর ঘুম আসেনি, তন্দ্রাও না, কেমন একটা আচ্ছন্নের ভাব। হৈমন্তীর অস্ফুট চীৎকারে সে তার ছোট ছোট লাল চোখ মেলে চাইলে।

হৈমন্তী সবিস্ময়ে বললে, তুমি? ওখানে ও রকম ক'রে কেন? কি চাও?

জড়িতকণ্ঠে শ্রীমন্ত কি বললে বোঝা গেল না। ডান হাতখানা সে হৈমন্তীর দিকে বাড়িয়ে দিলে।

হৈমন্তী নড়লো না। আলোর শিখার মতো নিষ্কম্প দাঁড়িয়ে রইলো।

কঠিন কণ্ঠে বললে, দরোয়ানের চোখ এড়িয়ে এ-বাড়ী ঢুকলে কি করে?

শ্রীমন্ত জড়িতকণ্ঠ যথাসাধ্য পরিষ্কার ক'রে উত্তর দিলে, দরোয়ানের চোখ এড়িয়ে নয়। সন্ধ্যার পর থেকে এখানেই আছি।

—কোথায় লুকিয়ে ছিলে?

—লুকিয়ে নয়,—আমার সেই পুরানো ঘরে বড়বাবুর কাছে ছিলাম।

—মদ খাচ্ছিলে? আগে তো খেতে না।

—না।

—এখন খাও?

—হুঁ।

হৈমন্তী এক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলে। ওর চোখের কঠিন দৃষ্টি করুণায় ধীরে ধীরে কোমল হয়ে এলো।

বললে, তুমি উঠতে পারো?

—পারি।

শ্রীমন্ত চৌকাঠ ধ'রে উঠে ঘরের মধ্যে একটা পা বাড়ালে।

হৈমন্তী ধমক দিলে: এ-ঘরে না। তোমার সেই পুরোনা ঘরে ফিরে যেতে পারো?

শ্রীমন্ত ভয়ে-ভয়ে বললে, দেওয়াল ধ'রে ধ'রে গেলে হয়তো পারি।

—তাই যাও। এখানে অমন ক'রে দাঁড়িয়ে থেকো না।

শ্রীমন্ত ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়ালে। পা কাঁপছে, সমস্ত দেহ টলছে। সে পা যেতে-যেতে বারান্দার রেলিঙ ধ'রে সামলে নিলে।

হৈমন্তী ওর কাণ্ড দেখে হেসে ফেললে। মাতাল দেখে-দেখে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। মাতালে তার ভয় করে না। হাসি আসে।

বললে, দাঁড়াও। তুমি পারবে না যেতে। আমি নিয়ে যাচ্ছি ধরে-ধরে।

হৈমন্তী কোমরে বেশ ক'রে আঁচল জড়ালে। তারপর ওর একখানা হাত ধ'রে বহুকষ্টে ধীরে ধীরে ওর ঘরে নিয়ে গেল। আলোটা জেলে ওকে খাটে শুইয়ে দিলে।

সমস্ত পথ শ্রীমন্ত একটা কথাও বললে না। আচ্ছন্নের মতো খাটে এসে শুয়ে পড়লো। আলো নিবিয়ে দেবার জন্যে হৈমন্তী সুইচের দিকে হাত বাড়াতেই শ্রীমন্ত হঠাৎ অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে খাটের উপর উঠে বসলো।

হৈমন্তী চমকে উঠলোঃ কি হ'ল?

শ্রীমন্তর চোখের তারা যেন বেরিয়ে আসছে। কার্পেটের দিকে কম্পিত তর্জনী নির্দেশ করলে।

আলোর বৃত্তটার দিকে চেয়ে হৈমন্তী সবিস্ময়ে বললে, কি?

আশ্চর্য অদ্ভুত স্বরে শ্রীমন্ত বললে, ওই দেখ। ওটা কার রক্ত বলতে পারো? তোমার না আমার?

হৈমন্তীর নিষ্কম্প আলোর শিখার মতো দেহ পলকের জন্যে একবার কেঁপেই স্থির হয়ে গেল। একটা ধমক দিয়ে বললে, ও কিছু নয়, শুয়ে পড়।

ধমক খেয়ে শ্রীমন্ত আর একটা কথাও বললে না। শান্ত ছেলের মতো নিঃশব্দে শুয়ে পড়লো। হৈমন্তী একটুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে আলো নিবিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে চুপি-চুপি বেরিয়ে গেল।

(১৬)

শ্রীমন্তের বাইরের দিকের বারান্দায় চায়ের মজলিস বসেছে। আছে সুমিত্রা আর হেনরি।

হেনরি বললে, যুদ্ধের চাকা এবার আমাদের দিকে ঘুরতে সুরু করবে দেখো।

সুমিত্রা বললে, এই কথা তুমি আমাদের বিশ্বাস করতে বলো? কাল'কও জার্মানদের উত্তর ককেসাসে তড়িৎ অভিযানের সাফল্যের

খবর পাওয়া গেছে। তারা ভলগা আর ককেসাসের দিকে এগিয়ে চলেছে। দশ দিন আগেও খবর পাওয়া গেছে, সোভিয়েট বাহিনী রস্টোভ ছেড়ে পালিয়েছে। দু'মাস আগেও জাপানীরা এলিউসিয়ান দ্বীপে নেমেছে। এর মধ্যে চাকা ঘুরে যাবে?

হেনরি হেসে বললে, সুমি, চাকা যে কখন ঘোরে কেউ বলতে পারে না। মুহূর্তের ভুলে যুদ্ধের চাকা অপ্রত্যাশিতভাবে ঘুরে যায়।

শ্রীমন্ত হেসে বললে, কিন্তু সেটা তখনই-তখনই বিশ্বাস করা কঠিন হয়।

হেনরি হেসে বললে, কিন্তু তোমাদের কিম্বা আমাদের পক্ষে নয়।

—কেন?

—আশার কথা মানুষ সহজেই বিশ্বাস করে। এ যুদ্ধ থেমে গেলে তোমরাও বাঁচো, আমরাও বাঁচি। নয় কি না বলো?

হেনরি হাসতে লাগলো।

শ্রীমন্ত বললে, সে কথা যদি বলো হেনরি, তাহলে শোনো, এ যুদ্ধ থামলে সুমিত্রা কিম্বা আমি বাঁচি না।

হেনরি সবিস্ময়ে বললে, কেন?

—কারণ, যুদ্ধ থেমে গেলে আমরা বেকার হয়ে যাব। এই যুদ্ধে যারা না খেয়ে মরছে, কিংবা জিনিষপত্রের দাম চ'ড়ে যাওয়ায় যারা অশেষ দুঃখ ভোগ করছে তারা বাঁচবে। কিন্তু আমাদের মতো যাদের যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে চাকরী যাবে, কিংবা ঘুসে, ব্ল্যাক-মার্কেটে অথবা মিলিটারী কন্ট্রাক্ট নিয়ে যারা আঙুল-ফুলে-কলাগাছ হয়েছে, তারা বাঁচবে একথা মনে করছ কেন?

—বুঝলাম।—হেনরি হাসতে লাগলো।

শ্রীমন্ত হাসলে। বললে, ভালো-মন্দ সব নিজের নিজের স্বার্থের দিক দিয়ে, কি বলো?

—নিশ্চয়।

সুমিত্রা বললে, তোমাদের স্বাধীন দেশ। যুদ্ধ শেষে যে সব সমস্যা তোমাদের দেশে দেখা দেবে, তোমাদের গবর্ণমেণ্ট তার সমাধানের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করবেন। আমাদের তো স্বাধীন দেশ নয়। এখানে সমস্যার সমাধান হয় না। আমরা বড় দুঃখের চাপে ছোট দুঃখকে ভুলতে চেষ্টা করি, এই মাত্র। সৌভাগ্য এই যে, ছোট দুঃখকে ভোলবার জন্যে বড় দুঃখের অভাব কখনও হয় না।

সবাই হাসলো।

হেনরি বললে, তোমাদের কথা আমি জানতে চাই। একটা প্রশ্নের জবাব দেবে, তোমাদের দেশে হিন্দু-মুসলমানে এত বিরোধ কেন?

সুমিত্রা চট করে বললে, মিথ্যা কথা।

শান্তভাবে শ্রীমন্ত বললে, না সুমিত্রা, একেবারে মিথ্যা নয়। বিরোধ একটু আছে। স্বার্থের বিরোধ।

বিস্ময়ের সঙ্গে হেনরি বললে, দেশের চেয়ে বড় সেই স্বার্থ?

—সেই রকমই দাঁড়িয়েছে! তোমাদের বুঝতে কষ্ট হবে। কি রকম জানো? তোমাদের দেশে আইনসভার আসন যদি ধর্ম হিসাবে ভাগ ক'রে দেওয়া হ'ত,—যদি শতকরা এতটি আসন প্রোটেস্ট্যাণ্টের, এতটি রোমান ক্যাথলিকের, এতটি ইহুদীর জন্যে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হ'ত,—তাহ'লে তোমাদের দেশেও ঠিক এই রকম হ'ত। আমেরিকায় এমন একটা ব্যবস্থার কথা তুমি কল্পনা করতে পারো?

হেনরি সভয়ে বললে, সর্বনাশ!

—এদেশে সেই ব্যবস্থাই চলছে। দেশের স্বার্থ যে সব চেয়ে বড়, একথা গোঁড়া সাম্প্রদায়িকও জানে। কিন্তু সম্প্রদায়ের ছোট স্বার্থ সব সময় এমন ক'রে তার চোখের সামনে ঝুলছে যে, তাকে ভোলা অসম্ভব।

হেনরি অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো।

তারপর বললে, তাহ'লে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো?

—একটা জটিল দুষ্টচক্র। স্বাধীনতা পেলেও এর হাত থেকে মুক্ত হতে অনেক সময় নেবে।

হেনরি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। বললে, আজকে উঠলাম মণ্টি। ডিউটি আছে। তোমাকে কি বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে, সুমি?

শ্রীমন্ত ইঙ্গিতে সুমিত্রাকে নিষেধ করলে।

সুমিত্রা বললে, না। ধন্যবাদ।

হেনরি চলে গেল।

হেনরি চলে যাবার পরে ওরা দুজনে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো। শ্রীমন্ত ওর এক-খানা হাত নিজের দুই হাতে তুলে নিলে।

বললে, হেনরির সম্বন্ধে আমি যেন ক্রমশঃ 'জেলাস' হচ্ছি সুমিত্রা। এ দুর্বলতা তো ছিল না।

সুমিত্রা হেসে বললে, সুলক্ষণ সন্দেহ নেই। কিন্তু কি জন্যে আটকালে বলো।

—তোমার কাছে একটা পরামর্শ চাই।

—আমার কাছে? পরামর্শ? তুমি যে ক্রমশঃ হেঁয়ালি হয়ে উঠছ মণ্টি!

—সত্যি। পরামর্শ চাওয়ার অভ্যাস আমার নেই। কিন্তু এ ব্যাপারটা আমার গণ্ডীর বাইরে।

—কি রকম ব্যাপার শুনি? বৈষয়িক?

—না। বৈবাহিক।

—সর্বনাশ!

সুমিত্রা ব্যাপারটা শোনবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।

একটুক্ষণ দ্বিধা ক'রে শ্রীমন্ত বললে, দেখ সুমিত্রা, অবিলম্বে আমার একটা বিবাহ করা প্রয়োজন।

—তাতে বাধা হচ্ছে কোথায়?

—পাত্রীর।

—বলো কি! বাংলা দেশে পাত্রীর অভাব!

—সকলের নয়, আমার। আমি এমন একটি পাত্রী চাই, যে আমাকে ঘৃণা করবে না। তুমি রাজি হ'লে সব চেয়ে ভালো হ'ত। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, আমার প্রার্থনা তুমি হেসেই উড়িয়ে দিচ্ছ!

একটু চিন্তা ক'রে সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, হঠাৎ আমাকে তোমার এত পছন্দ হ'ল কেন?

—পছন্দ! আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, তোমাকে বোধ হয় একটু ভালোবেসেই ফেলেছি!

সুমিত্রা হেসে ফেললে। বললে, এরকম দুর্ঘটনা তোমার জীবনে কি এই প্রথম?

—ও প্রশ্ন কোরো না সুমিত্রা। ওর জবাব দিতে পারব না। মানুষ যে তার নিজের মন নিজেও জানে না, এ অভিজ্ঞতা সম্প্রতি আমার হয়েছে।

—কবে থেকে হয়েছে? হৈমন্তীর আগুন যেদিন থেকে তোমার বুকে এসে লেগেছে, সেদিন থেকে?

হৈমন্তীর প্রসঙ্গে শ্রীমন্ত কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে। বললে, বিচিত্র নয়। কিন্তু তোমাকে যা বললাম, তার কি করেছ?

—আমাকে তুমি কিছুই বলোনি তো!

—বললাম না? আমার বিয়ের একটা ব্যবস্থা ক'রে দাও।

—আমি ব্যবস্থা ক'রে দোব? আমি কি প্রজাপতি অফিস।

সুমিত্রা খিল খিল করে হেসে উঠলো।

শ্রীমন্ত কিছুমাত্র অপ্রস্তুত হ'ল না। বললে, না। তুমি প্রজাপতি স্বয়ং। এখন রঙিন ডানা বন্ধ ক'রে আমার একটা ব্যবস্থা করো।

শ্রীমন্ত হাত জোড় করলে।

সুমিত্রা হেসে উঠে ওর বাহুতে একটা মৃদু চপেটাঘাত করলে। তারপরে গম্ভীরভাবে বললে, পাত্রী একটি আছে,—মিসেস পিঠাবালা। আমাদের সেক্শনে কাজ করে। তুমি চেনো বোধ হয়।

—অল্প-অল্প চিনি। পিঠার উপর আমার আকর্ষণও আছে। কিন্তু মিসেস্?

—তাতে কি? ঠিক হয়ে গেছে, ও স্বামীকে ডাইভোর্স করবে।

—না, না। মিসেস্ চলবে না সুমিত্রা। মামলা-মোকদ্দমা......তারপরে হয়তো এক দল ছেলেপুলে নিয়ে আসবেন। তুমি মিসের খবর দাও।

—মিস্?—চিন্তায় ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সুমিত্রা বললে, তাও আছে কতকগুলো। কিন্তু...

—তাদের নাম-ঠিকানা মনে করতে হবে... তারপরে...

—হ্যাঁ। একটু ভাবতে হবে বই কি।

—বেশ তো। তুমি ভাবো, তাদের নাম-ঠিকানা মনে কর। ইতিমধ্যে আমাদের একটা interim বিবাহ হয়ে যাক। কি বলো?

কথা শেষ করার আগেই সে সুমিত্রাকে বাহুর বন্ধনে বেঁধে ফেললে।

প্রথম ধাক্কায় সুমিত্রা এমনই অভিভূত হয়ে প'ড়েছিল যে একটা কথাও বলতে পারেনি। কোথা থেকে রাজ্যের লজ্জা এসে যেন তার মুখ বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু সে শক্ত মেয়ে। তার সামলাতে দেরি হ'ল না।

ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে

শ্রীমন্তকে বললে, তোমার কথা শুনলাম, এবার আমার কথার জবাব দাও : আমাকে কি তুমি বিশ্বাস করতে পারবে?

শ্রীমন্ত উত্তর দিলে, এ সংসারে সবাই নিজের নিজের স্বার্থের চিন্তায় মগ্ন। কেউ কাউকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না। আমার মনে হয়, আমরা যদি পরস্পরকে লাভের অংশ দিই, তাহ'লে স্বার্থের বিরোধ ঘটবে না।

—কিন্তু তাতেই কি পরস্পরের উপর শ্রদ্ধা জাগে?

—জানি না। না জাগলেই বা কি? সুমিত্রা, আমরা শ্রদ্ধা-প্রীতি-প্রেম নিয়ে ভণ্ডামি করবই না। শুধু একটি জায়গায় খাঁটি থাকবার চেষ্টা করব : আমরা সতর্ক থাকব যেন কিছুতেই কেউ কাউকে ঘৃণা না করি।

—তুমি শ্রদ্ধা-প্রীতি-প্রেমে বিশ্বাস করো না?

—না। আমার মনে হয় কেউই করে না। সবাই বিশ্বাস করার ভাণ করে।

সুমিত্রা এতদূর যেতে প্রস্তুত নয়। সে দ্বিধা করতে লাগলো।

লক্ষ্য ক'রে শ্রীমন্ত বললে, এত বড় নিষ্ঠুর সত্য তোমার মেনে নিতে কষ্ট হবে। কিন্তু চেয়ে দেখ পশ্চিমের দিকে যেখানে প্রেমের ছড়াছড়ি সব চেয়ে বেশি। ডাইভোর্স কি সেইখানেই সর্বোশ নয়?

—কিন্তু এদেশে?

—এদেশে ডাইভোর্সের ব্যবস্থা নেই বলেই হয় না। লাঠালাঠি, মারামারি, সন্দেহ, অবিশ্বাস ক'রেও একই শয্যায় তারা জীবন কাটায়। আমার কি মনে হয় জানো? জলের মতো মানুষের মনের প্রবণতাও নিচের দিকে। সেই স্বাভাবিক প্রবণতার অভাবই হচ্ছে মহত্ত্ব। ওটা একটা negative virtue. এই সত্য উপলব্ধি করতে পারলেই পথ-চলা সহজ হয়।

সুমিত্রা তবু দ্বিধা করতে লাগলো।

শ্রীমন্ত ওকে আশ্বাস দিয়ে বললে, তুমি দ্বিধা কোরো না সুমিত্রা। আমি তোমাকে দু'দিনে আদিম মানুষে পরিণত করব। আসলে বিবাহ বলতে আমি কি বুঝি জানো? আপোষ। তোমার স্বার্থ আমি ক্ষুন্ন করব না, আমার স্বার্থ তুমি ক্ষুন্ন কোরো না। বাস। এরই নাম অনাবিল স্বর্গীয় প্রেম।

—তুমি স্বর্গ মানো?

—মানি। স্বর্গ মানে সেই দেশ যেখানে কেউ কোনো দিন যেতে পারে না।

—কেন পারে না?

—সে দেশ কোথাও নেই ব'লে।

সুমিত্রা হেসে উঠলো। বললে, উত্তম। স্বর্গে যাবার আশঙ্কা যখন তোমার কিংবা আমার কারো নেই, তখন এই পৃথিবীতেই আমরা যথাসাধ্য ভদ্রভাবে বাস করার চেষ্টা করব,—তার মানে কেউ কারও স্বার্থ ক্ষুন্ন করব না। কি বলো?

—হ্যাঁ।

তাহলে তুমি রাজি?

—এত বড় যুক্তির পরে রাজি না হয়ে উপায় কি?

সুমিত্রা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্তও প্রাণ-খুলে হাসতে লাগলো।

(১৭)

দিন পনেরোর মধ্যে শ্রীমন্ত আর সুমিত্রার বিবাহ হয়ে গেল। সমারোহের সঙ্গে নয়, শান্তভাবে এবং তিন আইন অনুযায়ী। সাবালিকা কন্যার ভালো-মন্দ বোঝবার শক্তির উপর যথেষ্ট আস্থা থাকা সত্ত্বেও ভাদ্র মাসে তিন আইন অনুযায়ী রেজিষ্ট্রি করা বিবাহে সুমিত্রার বাপ-মা কেউ উপস্থিত হতে পারলেন না। শ্রীমন্তের বাপ-মায়ের বালাই নেই। উভয়-পক্ষের একমাত্র সাক্ষী ক্যাপ্টেন হেনরি আলেকজাণ্ডার।

হেনরি ওকে উপহার দিয়েছে একখানা গোলাপী রঙের বেনারসী এবং ডাকছে 'গোলাপী বধূ' ব'লে। আর শ্রীমন্ত নিজে দিয়েছে জড়োয়া গহনা থেকে আরম্ভ ক'রে, সাবান পর্যন্ত প্রায় দশ হাজার টাকার জিনিস। মাইনে থেকে সুমিত্রাও কিছু জমিয়েছিল। তাই থেকে শ্রীমন্তকে সে একটা হীরার আংটি দিয়েছে।

বাপ-মা বিয়েতে আসেননি ব'লে সুমিত্রার দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু সে দুঃখ এখন আর নেই। বেশ আনন্দেই সে আছে। এখন তার মনে একমাত্র প্রশ্ন, চাকরী ছেড়ে দেবে কি না। ঘরে তার মন বসেছে, বাইরের চাকরী আর ভালো লাগে না। বিয়ের পরে কোন্ মেয়েরই বা লাগে?

কথাটা একদিন ও শ্রীমন্তকে বললে আপিস থেকে আসবার পথে।

শ্রীমন্ত আজকাল আর অফিস থেকে বেরুতে আগের মতো দেরি করে না। যদি-বা একটু দেরি হয়, সুমিত্রা অপেক্ষা করে। আশ্চর্য এই যে, ওদের বিয়ের খবর অফিসের জনপ্রাণীও জানে না,—এমন কি বড়বাবু পর্যন্ত না।

তার ফলে বড়বাবু মাঝে মাঝে শ্রীমন্তর সামনেই সুমিত্রার সঙ্গে রসিকতা করেন। ওরা হাসে, রাগ করে না।

ট্রামে যা ভিড় তাতে শ্রীমন্ত দূরের কথা, সুমিত্রা পর্যন্ত কোনো কোনো দিন বসবার জায়গা পায় না। সুতরাং বড় একটা কথা হয় না। একে আফিসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনী, তার উপর ট্রামের এই ভিড়!

সুমিত্রা বিরক্তভাবে বললে, আর ভালো লাগে না চাকরী। মনে করছি, ছেড়ে দোব। তুমি কি বলো?

শ্রীমন্ত বললে, যা ট্রামে ভিড়! ভদ্রতা বজায় রেখে মেয়েদের পক্ষে যাওয়া-আসা করাই মুস্কিল।

ওরা বাড়ী এসে গিয়েছিল। হাতের বেঁটে ছাতাটা দুলিয়ে সুমিত্রা বললে, শুধু সেই জন্যেই নয়।

—তবে?

সুমিত্রা একটু রহস্যময় হেসে বললে, দুজনে খেটে-খুটে আসব, আর চাকরে চা দেবে, এইটে আমার ভালো লাগে না।

—কি করতে চাও তার বদলে?

—তার বদলে আমি তোমার জন্যে সেজে-গুজে তৈরি হয়ে বসে থাকব। তুমি এলে হাসি দিয়ে তোমায় অভ্যর্থনা করব, নিজের হাতে চা তৈরি ক'রে দোব। সেই ভালো না?

—নিশ্চয়!—শ্রীমন্ত উৎসাহের সঙ্গে বললে।

সত্য কথা বলতে গেলে, এই বিয়েতে সব চেয়ে লাভ হয়েছে শ্রীমন্তের। শুধু যে বাড়ীর চেহারাই বদলে গেছে তাই নয়, তরকারিগুলোর স্বাদ পর্যন্ত।

একটা ঠাকুর সম্প্রতি পাওয়া গেছে। ভাগ্যের বিষয়, সেটা কালা নয়। কিন্তু রান্না যে শুধু তারই নয়, তাতে সুমিত্রার হাতেরও স্পর্শ আছে, অন্ততঃ সুমিত্রার তত্ত্বাবধান, তা বুঝতে বিলম্ব হয় না।

ফলে এই অল্প দিনেই শ্রীমন্তের খাওয়ায়, শোওয়ায়, বেশে আরামের বোধ এসেছে। ও বুঝতে পারে, এই আরামের রসে জারিয়ে সুমিত্রা ওকে ধীরে ধীরে কাবু করে ফেলছে। তবু আরামের লোভ শেষ পর্যন্ত ছাড়তে পারে না। জ্ঞাতসারেই ও মাকড়সার জালে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ছে। জ্ঞাতসারে এবং স্বেচ্ছায়।

সুমিত্রা চাকরী ছেড়ে দিলে সেই আরাম ওর আরও বাড়বে এই সম্ভাবনায় পুলকিত হয়ে বললে, তাহ'লে আর দেরি কোরো না। কালকেই এক মাসের নোটিশ দিয়ে দাও।

পরের দিন সকালবেলা হঠাৎ শঙ্কর এসে উপস্থিত।

—শ্রীমন্তদা!

শ্রীমন্ত তখন একটা ইজি-চেয়ারে শুয়ে জোরে জোরে খবরের কাগজ পড়ছিলো। ওর চেয়ারের হাতলে বসে সুমিত্রা শুনছিলো। শঙ্কর আসতে ধীরে ধীরে উঠে পাশের চেয়ারে গিয়ে বসলো।

—কি খবর শঙ্কর?—শ্রীমন্ত খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলে।

শঙ্কর তখনও হাঁফাচ্ছে। মুখ উত্তেজনায় লাল। বললে, তোমার বাড়ীর সামনে একটা খুন হয়ে গেল।

শ্রীমন্ত এবং সুমিত্রা দুজনে এক সঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠলো : খুন?

—হ্যাঁ। মোড়ের মাথায় কতকগুলো ছেলে একটা ট্রাম পোড়াচ্ছিল। এমন সময়ে একটা মিলিটারী পেট্রল এসে পড়লো। ছেলেরা যে-যেদিকে পারলে পালালে। মারা পড়লো একটা ফল-ওলা।

শুনে ওরা স্তব্ধ হয়ে গেল।

কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ আটক হওয়ার পর থেকেই এই কাণ্ড চলেছে। ভারতের নানাস্থানে রেলের লাইন তুলে, টেলিগ্রাফের তার কেটে, রেলষ্টেশন আর পোষ্টাপিস পুড়িয়ে লোকেরা একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। ক'লকাতাতেও খুব গোলযোগ আরম্ভ হয়ে মধ্যে একটা বছর বন্ধ ছিল। আবার কি নতুন ক'রে আরম্ভ হ'ল নাকি?

শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করলে, তুমি এদিকে কি করতে এসেছিলে?

—তোমার কাছেই আসছিলাম। পথে ট্রাম পোড়ানো দেখে ওরই মধ্যে মেতে গিয়েছিলাম।

—সর্বনাশ! খবর্দার, ওর মধ্যে যেও না। মারা পড়বে কোন দিন।

সলজ্জভাবে হেসে শঙ্কর বললে, আমাদের পাড়াতেও খুব গোলযোগ চলেছে। আমাদের বাড়ীর সামনে একটা কাঁদুনে বোমা ছুঁড়েছিল। আমাদের দারোয়ানটা চোখ জ্বালা ক'রে যায় আর কি?

—তারপরে?—সুমিত্রা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে।

উত্তর দিতে গিয়ে শঙ্কর থমকে গেল। উত্তেজনার মুহূর্তে সে প্রথমে সুমিত্রাকে খেয়ালই করেনি। এখন সবিস্ময়ে ওর দিকে চেয়ে রইলো।

শ্রীমন্ত হেসে বললে, তোমার বৌদিদি।

বৌদিদি? শঙ্কর তবু যেন বুঝতে পারছিল না।

শ্রীমন্ত লজ্জিতভাবে বললে, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বিয়ে হ'ল, তোমাদের কাউকে জানাতে পারিনি। মাকে বোলো একদিন ওকে নিয়ে যাবো তোমাদের বাড়ী।

তারপরে সুমিত্রার দিকে চেয়ে বললে, ওর নাম শঙ্কর। ওদেরই বাড়ীতে আমি মানুষ হয়েছি। শোভাবাজারের ঘোষদের নাম শোনোনি? তাদেরই বাড়ীর ছেলে।

বিদ্যুৎবেগে অনেক কথা সুমিত্রার মাথার ভিতর দিয়ে ঘুরে গেল। বললে, বুঝেছি, তুমি হৈমন্তীর ভাই?

ছোটদিকে আপনি চেনেন?

—ঠিক চিনি না, নাম শুনেছি অনেক বার। বোসো, তোমার জন্যে চা নিয়ে আসি। শেষে তোমার ছোটদির কাছে গিয়ে নিন্দে করবে, ওদের বাড়ী গেলাম, এক পেয়ালা চাও খাওয়ালে না।

দ্রুতপদে সুমিত্রা ভিতরে চলে গেল।

শ্রীমন্ত এক দৃষ্টে সুমিত্রার মুখের দিকেই চেয়েছিল। এখন শঙ্করের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তারপরে?

—আরও কিছু চাল চাই যে শ্রীমন্তদা।

—বেশ তো। কালকে দিয়ে আসব। কিছু লজ্জা কোরো না আমাকে।

—না। লজ্জা করব কেন?

ব'লে শঙ্কর বুক-পকেট থেকে পাঁচখানা দশ টাকার নোট বের করলে।

বললে, সেবারের চালের দাম তো ব'লে আসোনি। মা বললেন, পঞ্চাশটা টাকা নিয়ে যা। বেশি হলে শ্রীমন্তকে বলবি এর পরের দিন যখন আসবে যেন চেয়ে নিয়ে যায়।

দু'মণ চালের দাম তখন ত্রিশ টাকা। কিন্তু বিনা দ্বিধায় শ্রীমন্ত সমস্ত টাকাই পকেটে ফেললে। বললে, না। মাকে বোলো এর চেয়ে বেশি লাগবে না আর বোলো কালকেই হোক, আর পরশুই হোক, আরও এক বস্তা চাল আমি সেদিনকার মতো গিয়ে দিয়ে আসব।

খুশি হয়ে শঙ্কর উঠতে যাচ্ছিল। এমন সময় সুমিত্রা এক হাতে একটা প্লেটে খাবার, অন্য হাতে চা নিয়ে এসে ওর সামনে রাখলে।

শঙ্কর আবার বসলো।

খেতে-খেতে বললে, আপনারা দুজনে একদিন কিন্তু আমাদের বাড়ী আসবেন বৌদি। নইলে মা খুব দুঃখ করবেন।

—নিশ্চয় যাব। তোমার ছোটদি রয়েছেন তো? তাঁকে বোলো একদিন গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে আসব।

—বেশ।

শঙ্কর চলে যাওয়ার পরে শ্রীমন্ত সুমিত্রাকে জিজ্ঞাসা করলে, ক'বারই তুমি হৈমন্তীর কথা বললে সুমিত্রা। তুমিও কি তার সম্বন্ধে 'জেলাস' হতে আরম্ভ করলে?

সুমিত্রা ওর ঈজি-চেয়ারের হাতলের উপর বসলো।

বললে, না। কেন বলো তো? হৈমন্তীর সঙ্গে দেখা করব শুনে কি ভয় করছে তোমার?

—ভয় কেন করবে?

—পাছে তার কাছ থেকে বুক-পোড়ানো মন্তরটা শিখে আসি?

শ্রীমন্ত হাসলে। বললে, সে কি সবাই পারে?

কথাটার মধ্যে একটা খোঁচা ছিল। সেই খোঁচা সুমিত্রার বুকে বিঁধলো। এবং সুমিত্রার মুখে কে যেন মুহূর্তের মধ্যে কালি মাখিয়ে দিলে।

শ্রীমন্ত তাড়াতাড়ি নিজের কথা সংশোধন ক'রে বললে, তুমি হ'লে ভরা বর্ষার মেঘ, আর ও হ'ল বজ্র। বজ্রেরই কাজ বুক পোড়ানো,—মেঘের নয়।

সুমিত্রা বুঝলে, এটা সান্ত্বনা। কিন্তু এ নিয়ে কলহ করতে তার প্রবৃত্তি হ'ল না। বরং প্রকাশ্যে হেসে ব্যাপারটাকে হালকাভাবে উড়িয়ে দেবারই চেষ্টা করলে।

জিজ্ঞাসা করলে, শঙ্কর কি জন্যে এসেছিল?

শ্রীমন্ত হেসে বললে, সে এক কলঙ্কজনক ইতিহাস। চাল পাওয়া যাচ্ছে না জানো তো? চালের অভাবে 'দেবধামে' বহু দাসী চাকর ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিছু কিছু চাল ব্ল্যাক-মার্কেট থেকে কিনে কোনো রকমে চালাচ্ছেন। কিন্তু সে যা চাল, তা মানুষের খাদ্য নয়। তবু অভাবের তাড়নায় 'দেবধামের' অন্য সবাই তাই কোনো রকমে খাচ্ছেন। কিন্তু বড়বাবু পারছেন না।

—এই ব্ল্যাক-মার্কেট কি এমনি ক'রেই চলবে?

—চলবে। কারণ যারা চালের মহাজন, বেশী লাভের লোভে তারা চাল লুকিয়ে ফেলেছে। সেই চাল ব্ল্যাক-মার্কেটে চড়া দামে বিক্রি করছে।

—চাল লুকুচ্ছে কোথায়? হাজার হাজার বস্তা চাল তো সহজ নয়। ধরা পড়ছে না কেন?

—না। ধরা না পড়বার কৌশল জানে তারা। যেখানে ইংরেজের রাজত্ব যাবার আশঙ্কা থাকে, সেখানে গবর্ণমেণ্ট সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেন। ব্ল্যাক-মার্কেটে ইংরেজের রাজত্ব যাবার আশঙ্কা তো নেই। তাই অবারিত ঘুষের জোরে ব্ল্যাক-মার্কেট প্রকাশ্যেই চলেছে।

—কিন্তু লোকের কত কষ্ট হচ্ছে?

শ্রীমন্ত হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

বললে, ভারতবর্ষে লোকের কষ্ট কবে কম সুমিত্রা? বরাবরই তো এরা পঙ্গপালের মতো জন্মায় আর পিঁপড়ের মতো মরে। এ আর একটা নতুন ব্যাপার কি?

ওর কথা শুনে এবং বলবার ভঙ্গি দেখে সুমিত্রা স্তব্ধ হয়ে গেল।

শ্রীমন্ত বলতে লাগলো:

—ব্ল্যাক মার্কেট কি শুধু বড় মহাজনেই করছে ভেবেছ? ঝি-চাকরগুলো পর্যন্ত এই নেশায় মেতেছে। তারা সদলবলে এসে কণ্ট্রোলের দোকান থেকে কণ্ট্রোলের দরে চাল, চিনি, কেরোসিন নিচ্ছে, আর অসহায় ভদ্রলোকদের কাছে চারগুণ দামে তাই বিক্রি করছে।

—বলে কি, তারাও?

শ্রীমন্ত বললে, এদিকে ঝি-চাকর খোঁজো, পাবে না। বোমার ভয়ে যারা পালিয়েছিল সব ফিরে এসেছে। কিন্তু তারা এখন আর লোকের বাড়ী চাকুরী করতে চাচ্ছে না। সেদিন সোমেশ কি বললে জানো?

কি বললে?

—ওদের বাড়ীর ঝিটা ছেলের অসুখে দেশে যাবার নাম ক'রে সরে পড়েছে। সোমেশের স্ত্রী পাশের বস্তীর একটি স্ত্রীলোককে ডেকে বললেন, একটা ঝি দেখে দিতে পারো দিদি? এক গাল হেসে স্ত্রীলোকটি বললে, দিন কতক এখন নিজেই বাসন ক'খানা মেজে নাও দিদি; ঝি আর পাওয়া যাবে না। কণ্ট্রোলে দাঁড়িয়ে তারা দিন দুটো ক'রে টাকা রোজগার করছে। শুনলে কথা?

সুমিত্রা স্তব্ধ হয়ে শুনলে।

জিজ্ঞাসা করলে, লাভের নেশায় এই যে সব মানুষে উন্মাদ হয়ে ছুটে চলেছে, এর পরিণাম কি বলতে পারো?

—মৃত্যু। লাভের নেশায় যারা ট্যাঙ্ক নিয়ে যুদ্ধে চলেছে, তাদেরও যে পরিণতি, এদেরও তাই।

—তবে যাচ্ছে কেন?

শ্রীমন্ত হাসলে। বললে, আলোর দিকে পতঙ্গ কেন ছোটে?

সুমিত্রা নিঃশব্দে ভাবতে লাগলো।

হঠাৎ এক সময় জিজ্ঞাসা করলে, শঙ্করদের যে মিহি চাল দেবে, সে চালের তোমার যোগাড় আছে?

—আছে।

—কি ক'রে যোগাড় করলে গো? এক বস্তা চাল তো আজকের দিনে সামান্য ব্যাপার নয়।

শ্রীমন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ হেসে বললে, তোমাকে

জানাতে সংকোচ নেই, বেনামীতে তিনখানা কন্ট্রোলের দোকান আমি চালাচ্ছি। ব্যাঙ্কে যে টাকা আমার জমেছে, তার অধিকাংশই এই থেকে। আমি বুঝতে পারছি, তুমি লজ্জা পাচ্ছ। কিন্তু যুদ্ধের পরে হীরে মুক্তো সোনায় তোমার সমস্ত লজ্জা ঢেকে দোব, এই প্রতিশ্রুতি দিলাম।

তৃপ্তির আনন্দে শ্রীমন্ত হা হা ক'রে হাসতে লাগলো।

ট্যাক্সির পিছনে এক বস্তা চাল লুকিয়ে নিয়ে সুমিত্রা ও শ্রীমন্ত 'দেবধাম' রওনা হ'ল।

সন্ধ্যার মুখে। সূর্যের আলো তখন নেই, কিন্তু আলোর আভা একেবারে মিলিয়ে যায়নি। তারই একটুখানি সুমিত্রার প্রসাধনসুন্দর মুখে এসে পড়েছে।

শ্রীমন্ত আড়চোখে চেয়ে দেখলে, সুমিত্রা আজ যেন বিশেষ ক'রে সেজেছে। ওই জমকালো শাড়ীখানা সেদিন শ্রীমন্ত সাধ্যসাধনা ক'রেও সুমিত্রাকে পরাতে পারেনি। এত গহনাও সুমিত্রাকে সে এর আগে কখনও পরতে দেখেনি।

এ কি তার যোদ্ধৃবেশ ?

হৈমন্তীর সামনে সে কি তার ঐশ্বর্যের বর্মচর্ম পরিধান ক'রে দাঁড়াতে চায়?

শ্রীমন্ত মনে মনে হাসলে। মুখে কিছু বলতে সাহস করলে না। সুমিত্রার কাছে হৈমন্তীর প্রসঙ্গে হৈমন্তীর পক্ষ টেনে কিছু বলতে এখন সে ভয় পায়।

সেদিনকার মতো আজও ওদের ট্যাক্সি একেবারে 'দেবধামের' ভিতরে গাড়ী-বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু আজ আর শংকর এলো না ওদের সম্বর্ধনা করতে।

রঘুয়া বললে, উপরে যান বাবু। মা ডাকছেন।

শ্রীমন্ত ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে রঘুয়াকে বললে, পিছনের ক্যারিয়ারে এক বস্তা চাল আছে। সেটা নামিয়ে নাও। খবর সব ভালো তো রঘু ?

চালটা নামাতে-নামাতে রঘুয়া বললে, ভালো কিছু নয় বাবু। উপরে গেলেই শুনতে পাবেন।

শ্রীমন্তর বুক ঢিপ ঢিপ ক'রে উঠলো ঃ কি এমন খারাপ খবর ! কে জানে কার আবার কি হ'ল।

ওরা দুজনে দ্রুতপদে দোতলায় গেল। হিমাংশুবাবুর দরজা বন্ধ। ওদিকের বারান্দায় সন্ধ্যার অন্ধকারে শোকের প্রতিমূর্তির মতো নয়নতারা স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে।

ওরা তাঁকে প্রণাম করতেই দুজনের মাথায় হাত রেখে তিনি আশীর্বাদ করলেন।

—এসো মা, ভিতরে এসো। অ কদম, এ ঘরে দুটো আসন দিয়ে যা তো।

—কিচ্ছু দরকার নেই মা। এই তো চমৎকার বসলাম। ওরা মেঝেতেই ব'সে পড়লো এবং উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে গৃহিণীর দিকে চেয়ে রইলো।

মিনিট খানেক নিঃশব্দে থেকে নয়নতারা বললেন, শংকরকে পুলিশে ধ'রে নিয়ে গেছে।

—শংকরকে !—ওরা দুজনে চমকে উঠলো।

-কেন ?

—আমাদের দেউড়ির পাশে যে চিঠির বাক্স আছে, সেইটেতে কয়েকজন ছেলেকে নিয়ে ও আগুন দিচ্ছিল।

—তারপরে ?

—পিছন থেকে মোটরে ক'রে পুলিশ আসছিল, ওরা টের পায়নি। এসেই ওদের ধ'রে ফেলে।

শ্রীমন্ত ও সুমিত্রা স্তব্ধভাবে ব'সে রইলো।

নয়নতারা বললেন, ছাড়াবার জন্যে বহু চেষ্টা হচ্ছে, হয়তো ছাড়া পেয়ে যেত। কিন্তু শংকর জেলে যাবার জন্যে বদ্ধপরিকর। সে যেন ছাড়া পেতেই চায় না।

নয়নতারা আবার বললেন, এ বাড়ীর ছেলে জেলে গেল এই প্রথম। তা যাক্। কিন্তু যাদের সঙ্গে মিশে জেলে গেল সেইটেই লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা কারা জান, এ পাড়ার যত ভবঘুরে ছেলে। তাদের না আছে চাল, না আছে চুলো। জীবনে কখনও ও তাদের সঙ্গে মেশেনি। তাদের চেনে কি না সন্দেহ। কেন যে এমন মতিগতি হ'ল!

নয়নতারা শংকরের জেলে যাওয়া মার্জনা করতে প্রস্তুত। কিন্তু যার-তার সঙ্গে মিশে যে জেলে গেল, এইটে কিছুতে মার্জনা করতে পারছেন না। এ-বংশের ধারা যেন ও বদলে দিতে যাচ্ছে। সেইটেই পরিপাক করা ওঁদের পক্ষে কঠিন হচ্ছে।

সেই ভারী নিস্তব্ধতার মধ্যে অনেকক্ষণ ব'সে থেকে সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, হৈমন্তীদি কোথায় মা ?

নয়নতারা ব্যস্তভাবে বললেন, ওমা তাই তো! সে বোধ হয় তোমাদের আসা টেরই পায়নি। অ কদম, বৌমাকে ছোট দিদিমণির ঘরে নিয়ে যা তো। বড্ড আঘাত পেয়েছে মা সে। আজ সকালে শংকর ধরা পড়লো, তার পর থেকে সে আর ওঠেনি। সে যে কি ক'রে ভালোয়-ভালোয় নেয়েধুয়ে উঠবে মা, সেই আর এক চিন্তা।

নয়নতারা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

কদম এসে সুমিত্রাকে তেতলায় হৈমন্তীর ঘরে নিয়ে গেল।

হৈমন্তী দরজার দিকে পিছন ক'রে খাটে শুয়েছিল। ওদের পায়ের শব্দে পাশ ফিরেই ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো। সুমিত্রার দিকে এক-মুহূর্ত অবাক হয়ে সে চেয়ে রইলো। ধীরে ধীরে ওর মুখ অনাবিল হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

আস্তে আস্তে বললে, আপনি বৌদি, না? শংকরের মুখে আপনার কথা অনেক শুনেছি।

হৈমন্তী ওকে জড়িয়ে ধ'রে খাটে নিয়ে এসে বসালে।

বললে, আপনার সঙ্গে অনেক ঝগড়া করবার ছিল। কিন্তু এমন একটা নিরানন্দ দিনে এলেন যে, ঝগড়া করারও মন নেই।

সুমিত্রা বললে, শংকর ঠাকুরপোর কথা শুনলাম। কিন্তু দুঃখ ক'রে লাভ নেই ছোটদি যুগের হাওয়া কেউ রোধ করতে পারে না নইলে রায়বাহাদুরের বংশধর সাধারণের ছেলেদের সঙ্গে এক দড়িতে বাঁধা পড়ে?

—কেন এমন হচ্ছে বৌদি ?

—কি জানি ভাই। কিন্তু হচ্ছে,—শুধু এখানেই নয়, পৃথিবী জুড়ে সর্বত্রই এই হচ্ছে নীল রক্তের আভিজাত্য আর বুঝি থাকে না।

—আমাদের অপরাধ কি ?

—মানুষকে দূরে ঠেকিয়ে রাখা মস্ত বড় অপরাধ দিদি। দীর্ঘকালের সঞ্চয়ে সেই অপরাধ পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর ভারকেন্দ্র আজ টলেছে। তাইতেই বুঝি এই বিপর্যয়।

একটুক্ষণ চিন্তা ক'রে হৈমন্তী জিজ্ঞাসা করলে, শংকরকে কি ছাড়ানো যাবে না ?

—জেলের থেকে ? কেন যাবে না ? এই শহরে আপনাদের কত বড় বড় আত্মীয়-স্বজন তাকে ছাড়িয়ে আনা কিছু কঠিন নয়। কিন্তু আমার কি মনে হচ্ছে জানেন? তার মধ্যে নীল রক্তের ধারা বোধ করি স্তিমিত হয়ে এসেছে। আমার সন্দেহ হয়, 'দেবধামে'র উত্তরাধিকারীকে আপনারা আর কোনো দিন ফিরে পাবেন না।

—ওসব কথা বলবেন না বৌদি। আমার বড় ভয় করে।

—ভয়েরই তো কথা ছোটদি। সেইজন্যেই মায়ের কাছে আমি চুপ করে ছিলাম। আপনাকে বলছি এই জন্যে যে, আপনি হয়তো প্রকৃত অবস্থা বুঝবেন।

হৈমন্তী উষ্মার সঙ্গে বললে, 'দেবধামে' নীল রক্ত শেষ হয়ে আসছে, একথা বুঝতে আমার ভালো লাগবে, এ আপনি কেমন ক'রে প্রত্যাশা করেন?

সুমিত্রা হাসলে। বললে, ভালো লাগার কথা নয় ছোটদি। ভালো লাগবে না তাও জানি। তবু তৈরি থাকা ভালো। তাতে আঘাত কম লাগে।

হৈমন্তী হঠাৎ চটে গেল। তার চোখ দপ্ ক'রে জ্বলে উঠলো। বললে, এসে পর্যন্ত তুমি শক্ত-শক্ত কথা শোনাচ্ছ কেন জানিনে বৌদি। ওসব আমার ভালো লাগে না।

গ্রীবা বেঁকিয়ে হৈমন্তী গুম হয়ে বসে রইলো।

সুমিত্রা এবার জোরে জোরে হেসে উঠলো। বললে, কী সুন্দর! তোমার এই রূপ দেখবার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম ছোটদি! এতক্ষণে দেখতে পেলাম!

হৈমন্তী অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইলো।

সুমিত্রা ওকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ ক'রে বলতে লাগলোঃ যেদিন থেকে তোমার কথা শুনেছি, তোমাকে কল্পনা করেছি হোমাগ্নি শিখার মত। এসে দেখি, সেই শিখা জ্যোতিঃহীন, ধোঁয়ায় মলিন। দুঃখ হ'ল। ভাবলাম, প্রথম দিন তোমার এই মলিন রূপ দেখেই কি ফিরে যেতে হবে? ভাগ্য ভালো,

ম প্রসন্ন হ'লে। তোমার চোখে আগুন তে পেলাম।

হৈমন্তী বললে, কী পাগলের মতো এলো-লো বকছ বৌদি?

সুমিত্রা প্রাণপণবলে ওকে জড়িয়ে ধ'রে লে, এলোমেলোই বটে। তুমি বুঝবে না, ঝবার চেষ্টাও কোরো না। তোমাকে আমি ত রাত্রি স্বপ্ন দেখেছি, জানো?

—স্বপ্ন দেখেছ? আমাকে?—হৈমন্তীর ময়ের আর শেষ নেই।

—হ্যাঁ, তোমাকে। সংসারে একটিমাত্র মেয়ে, কে আমি—সুমিত্রা—স্বপ্ন দেখি।

—কেন বলো তো?

—তোমার শক্তি আমাকে অভিভূত করেছে।

—আমার শক্তি? আমাকে তো তুমি চিনতেই না বৌদি! আমার শক্তির তুমি কী জানো?

সুমিত্রা হঠাৎ নিজেকে সামলে নিলে। হেসে বললে, বিশেষ কিছুই জানিনে ছোটদি, তবু তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু বকে-বকে গলা যে শুকিয়ে গেল। একটু চা-ও কি খাওয়াবে না?

হৈমন্তী হেসে বললে, আমার অন্নপূর্ণা মায়ের সঙ্গে যখন দেখা হয়েছে, তখন ভয় কিছুই নেই। ওই দেখ, কদম চা এনেছে দুজনেরই। রাত্রে নিশ্চয় খেয়েও যেতে হবে। শ্রীমন্তদা কোথায় কদম?

—বাবুর ঘরে।

কদম টিপয়ের উপর দুজনের চা-খাবার নামিয়ে দিয়ে গেল।

শ্রীমন্ত আবার বাবুর ঘরে! হৈমন্তী ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু কিছু বললে না।

ট্যাক্সিতে ব'সে শ্রীমন্ত প্রথম কথা কইলো: বড়বাবু একেবারে মুষড়ে গেছেন। মুহুর্মুহুঃ শুধু মদ খাচ্ছেন আর কাঁদছেন।

সুমিত্রা বোধ করি অন্যমনস্ক ছিল। বললে, হুঁ।

শ্রীমন্ত বলতে লাগলো, শুধু ছেলের জেলই নয়। সংসারের অবস্থাও ভালো নয়। দু' লক্ষ টাকার দু'টো ডিক্রি ঝুলছে। এটর্নী জানা লোক। তাঁকে ব'লে-ক'য়ে কোনো রকমে থামিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু আর বোধ হয় থামানো যায় না। জমিদারীর কিছু কিছু বিক্রি হয়ে গেছে। বাকিও বুঝি যায়। বড়বাবুর ধারণা, এই দুঃখেই শঙ্কর জেলে গেছে। বোধ হয় ভেবেছে, নিজের চোখে সেই সর্বনাশ দেখার চেয়ে জেলে ব'সে থাকা ভালো।

অন্যমনস্কভাবেই সুমিত্রা আবার বললে, হুঁ।

—আমি ব'লে এলাম, জমিদারী আপনার একটা আয়। এটা রাখতেই হবে। বাড়ীখানা বিক্রি ক'রে দিন। এ বাজারে ওর দাম তিন লক্ষ টাকার কাছাকাছি হবে। এত বড় বাড়ীর কোনো দরকার নেই। দেনা শোধ ক'রে বাকি টাকা দিয়ে একটা ছোট বাড়ী কিনুন। তাতে খরচও অনেক বাঁচবে। ভদ্রলোক হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে উঠলেন।

কান্নার কথায় সুমিত্রা চমকে উঠলো। বললে, কে কাঁদলে?

—বড়বাবু।

—কেন?

—কি বলো? কত পুরুষের 'দেবধাম': ওদের সমস্ত মর্যাদা, সমস্ত আভিজাত্য ওই বাড়ীর ইটের সঙ্গে গাঁথা। সেই বাড়ী বিক্রি করার কথায় কে না কেঁদে পারে?

সুমিত্রা নিঃশব্দে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলো।

শ্রীমন্ত নড়ে-চড়ে বেশ শক্ত হয়ে ব'সে বললে, কিন্তু বাড়ী ওঁকে বিক্রি করতেই হবে। না করলে ওঁকে জমিদারীও বিক্রি করতে হবে, বাড়ীও।

সুমিত্রা শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, দেনা কি খুব বেশী হয়েছে?

—বেশী হয়নি? দু'লক্ষ টাকার তো ডিক্রিই ঝুলছে। আরও কত আছে কে জানে? আমার বিশ্বাস, আরও অন্ততঃ লাখখানেক টাকার আছেই।

সুমিত্রা সাড়া দিলে না। বাইরের দিকে চেয়ে রইলো।

একটু পরে শ্রীমন্ত হঠাৎ জোরের সঙ্গে বললে, বাড়ীটা ও'কে বিক্রি করাতেই হবে। ওটা আমার চাই।

সুমিত্রা অবাক হয়ে ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে চাইলে। বললে, ওর তো অনেক টাকা দাম!

—তার জন্যে চিন্তা করি না। সে জোগাড় হয়ে যাবে।—শ্রীমন্ত অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসলে।

বললে, আজ বলামাত্র কেঁদে ফেললেন। আর একদিন এসে ভালো ক'রে বোঝাতে হবে। মারোয়াড়ীর হাতে যাওয়ার আগে আমার হাতে আনতে হবে।

—ওই পুরোনো বাড়ীর উপর তোমার এত লোভ কেন? তুমিও কি আর একটা অভিজাত-বংশের পত্তন করতে চাও?

—না। আভিজাত্যের পরিণতি আমি অনেক দেখেছি। কিন্তু যখন ভাবি, ওই বাড়ীতে অনুগৃহীত অনাথ বালকের মতো আমি মানুষ হয়েছি, তখন ওর মালিক হবার জন্যে আমার লোভ দুর্জয় হয়ে ওঠে।

বাকি পথটুকু ওরা দুজনে নিঃশব্দে চললো। বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই শ্রীমন্ত সচেতন হয়ে উঠলো। ড্রাইভারকে বললে, রোকো, ওই সামনের বারান্দাওয়ালা বাড়ী।

গাড়ী থামলো। কিন্তু সুমিত্রার তখনও ধ্যান ভাঙেনি। তাকে একটা ঠেলা দিয়ে শ্রীমন্ত বললে, ওঠো। এসে গেছি।

—এর মধ্যে এসে গেছি?

মন্ত্রাভিভূতের মতো সুমিত্রা উঠলো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে একবার চেয়ে শ্রীমন্ত ট্যাক্সি-ভাড়াটা মিটিয়ে দিলে।

সিঁড়িতে উঠতে-উঠতে বললে, তুমি কী ভাবছ বলো তো?

—কী হবে শুনে?—সুমিত্রা হেসে উত্তর দিলে।

—শুনি না?

—তোমার হৈমন্তীর কথা।

—আমার হৈমন্তী?—শ্রীমন্তর কণ্ঠস্বরে অপরিসীম বিস্ময়।

পাখাটা খুলে দিয়ে শ্রীমন্তর চেয়ারটা ঘুরে ওদিকের চেয়ারে গিয়ে সুমিত্রা বসলো।

বললে, হ্যাঁ গো, তোমারই হৈমন্তী। ওই তো 'দেবধামের' আত্মা। তাই তো 'দেবধামের' উপর তোমার লোভ এত দুর্জয়! দাঁড়াও একটু কফির ব্যবস্থা ক'রে আসি।

হাওয়ায় শাড়ীর তরঙ্গ তুলে সুমিত্রা ভিতরে গেল।

(১৮)

শঙ্করকে বাঁচানো গেছে।

কিন্তু 'দেবধাম' বুঝি বাঁচানো যায় না।

ওর উপরে যেন শনির দৃষ্টি পড়েছে। শ্রীমন্ত সেই শনি। আজকাল সন্ধ্যার পরে প্রত্যহ সে লুকিয়ে হিমাংশুর ঘরে আসছে। তাঁকে বহু কষ্টে সংগৃহীত দুর্লভ মদ্য দিয়ে আপ্যায়িত করছে। অনেক রকম যুক্তি-তর্ক উত্থাপন ক'রে তাঁকে বাড়ী বিক্রির সুবিধার কথা বোঝাচ্ছে। রাত্রে মাঝে-মাঝে মদের ক্রিয়ায় তিনি বাড়ী-বিক্রিতে রাজি হয়ে যান। শ্রীমন্তকে লোক দেখতে বলেন। কিন্তু সকালে সে উৎসাহ আর থাকে না।

তখন বলেন, দাঁড়াও একটু ভেবে দেখি। সুবিমলকে একবার জিগ্যেস করা দরকার।

শ্রীমন্ত বলে, নিশ্চয়ই। তার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দেখুন। কিন্তু দেরী করবেন না। তা'হলে এমন ভালো পার্টি হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

ওর চোখের দিকে হিমাংশুবাবু চাইতে পারেন না। ওর চোখে যেন অজগরের তীব্র দৃষ্টি। মুখ নিচু করে বলেন, না দেরি হবে না। আজ বিকেলে আসবার কথা আছে। এলে জিগ্যেস করব।

সুবিমল হয়তো আসে। কিন্তু হিমাংশু-বাবু লজ্জায় বাড়ী বিক্রির কথা জামাইএর কাছে তুলতে পারেন না।

শ্রীমন্ত শঙ্করকেও জপাবার জন্যে চেষ্টা করে। কিন্তু তার পাত্তা পায় না। যখনই শ্রীমন্ত আসে, শোনে সে বেরিয়ে গেছে। আগে সে যেমন বাড়ীর বাইরে বেরুত না, এখন ঠিক তার উল্টো। বাড়ীর ভিতরেই সে থাকে না।

বাড়ীর লোকেদের সন্দেহ, সে আজকাল বস্তির ছেলেদের সঙ্গে মিশে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীমন্তর সন্দেহ, অজ্ঞাতসারে সে তার ভবিতব্যের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। অমোঘ যে বিধিলিপি, তারই দিকে অশ্ববেগে সে ছুটে চলেছে।

তাকে পাওয়া যাচ্ছে না, সুবিমলকেও হিমাংশুবাবু এড়িয়ে চলেছেন। এর মধ্যে শ্রীমন্তর বহু টাকার মদ হিমাংশুবাবুর জঠর সমুদ্রে হারিয়ে গেল। আরও কত যাবে কে জানে?

শ্রীমন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লো। এবং আর কূলকিনারা না পেয়ে একদিন নয়নতারার শরণ নিলে।

দোতলার চওড়া বারান্দায় একখানা কার্পেটের আসনের উপর ব'সে তিনি তখন

জানমালাজপ করছিলেন। ইঙ্গিতে শ্রীমন্তকে বসতে কণ্ঠেবললেন।

শ্রীমন্ত দেখলে, এই ক'মাসের মধ্যে ও'র বয়স যেন দশ বৎসর বেড়ে গেছে। গালের মাংস ঝুলে পড়েছে। কপালে দুশ্চিন্তার অগণিত রেখা।

চোখের তারায় সে কৃষ্ণজ্যোতিঃ নেই।

জপ সেরে হরিনামের ঝোলা ললাটে, মাথায় ঠেকিয়ে শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে নয়নতারা জিজ্ঞাসা করলেন, সব ভালো তো? বৌমা ভালো আছে?

—ভালো।

একটু পরে শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করলে, হৈমন্তী কেমন আছে মা?

—ভালো নেই বাবা। কেমন যেন দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে।

চিন্তিতভাবে শ্রীমন্ত বললে, কেন যে এ রকম হচ্ছে! বড়বাবুর শরীরের দিকেও চাওয়া যায় না।

নয়নতারা উত্তর দিলেন না। শুধু তাঁর বুকের ভিতর থেকে একটা ভারি দীর্ঘ নিশ্বাস বের হয়ে এল।

একটু এদিক-ওদিক ক'রে শ্রীমন্ত বাড়ী বিক্রির কথাটা পাড়লে। বললে, আমি পুনঃ পুনঃ বলছি, এই বাড়ীটা বিক্রি ক'রে সমস্ত দেনা শোধ ক'রে দিন। এত বড় বাড়ীর কোনো দরকার নেই এই ক'টি লোকের জন্যে। এখন এর দামও হবে অনেক। তাই থেকে দেনা শোধ ক'রেও নিজেদের থাকবার মতো একটা বাড়ী খুব কেনা যাবে। জমিদারীটাও বাঁচবে। তার আয়ে রাজার হালে দুটো পুরুষ চলে যাবে।

নয়নতারা বাধা দিয়ে বললেন, সে পরের কথা পরে হবে বাবা। আপাততঃ ও'কে বাঁচাবে কি ক'রে সেইটে ভাবো। ঋণে ও'র ভিতরটা পর্যন্ত যেন কুরে-কুরে খাচ্ছে বাবা, ও'র দিকে চাইছি আর আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে।

নয়নতারা আঁচলে চোখের জল মুছলেন।

শ্রীমন্ত বললে, সেইটেই তো ভাবনার কথা মা। সেইজন্যেই বাড়ী বিক্রির কথা এত ক'রে বলছি।

এমন সময় হৈমন্তী নিঃশব্দে এসে দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো।

ওর দিকে চেয়ে শ্রীমন্ত থমকে গেল। কী চেহারা হয়েছে হৈমন্তীর! সারা দেহে একটি ফোঁটা রক্তের চিহ্ন নেই। শরীর হয়েছে কাঠির মতো শীর্ণ।

—এ কী চেহারা হয়েছে তোমার?

হৈমন্তী উত্তর দিলে না। শুধু রক্তহীন বড় বড় চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে তেমনি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো।

নয়নতারা বললেন, তুমি এ বাড়ীর বড় ছেলে বাবা। ও'র উপর ভরসা কোরো না। সুবিমলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যাতে ভালো হয় তাই করো।

শ্রীমন্ত বললে, সুবিমলবাবুর কথা উনিও বলেন। শুনি তিনি আসেনও প্রায়। কিন্তু লজ্জায় বোধ করি তাঁর সঙ্গে একথা তুলতে পারেন না। সেই হয়েছে মুস্কিল।

নয়নতারা বললেন, মুস্কিল বললে তো হবে না বাবা। যা করতে হবে, তা সময়ে করাই ভালো।

—কিন্তু বাড়ীটা বিক্রি করা ছাড়া কি আর উপায় নেই?—এতক্ষণ পরে হৈমন্তী কথা বললে।

ওর কথার সুরে কি যেন একটা ছিল যে, শ্রীমন্ত পর্যন্ত চমকে ওর দিকে চাইলে। মনে পড়লো সুমিত্রার সেই কথা : ওই তো 'দেব-ধামের' আত্মা।

শ্রীমন্তর চোখে আবার সেই দুর্জয় ক্ষুধা লক লক ক'রে উঠলো। বললে, আমি তো কিছু দেখি না। সুবিমলবাবু যদি কিছু কিনারা করতে পারেন।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে শ্রীমন্ত সেদিনকার মতো চলে এল।

এর পরে একটা রবিবারে হঠাৎ শঙ্কর এসে উপস্থিত। মাথার চুল রুক্ষ, বিশৃঙ্খল। পরণের দিশী ধুতির কোঁচার নিচেটা কাদায় মাখামাখি। গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবীর উপর এক-খানা মূল্যবান শাল। কিন্তু তারও খানিকটা কিসে লেগে ছিঁড়ে গেছে।

শ্রীমন্তর শিক্ষিত দৃষ্টিতে কিছুই এড়িয়ে গেল না। বললে, কি খবর শঙ্কর?

—আমাকে একটা চাকরী-বাকরী কোথাও ক'রে দাও না শ্রীমন্তদা।

শ্রীমন্তর চোখ কপালে উঠলো। এতখানির জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না।

বললে, তুমি চাকরী করবে কি! এই বয়সে!

শঙ্কর বিজ্ঞের মতো বললে, তা ছাড়া উপায় নেই শ্রীমন্তদা। সংসারের অবস্থা তো বুঝতেই পারছো। কাল জামাইবাবু এসে-ছিলেন। তিনি বলছেন, বাড়ীটা বিক্রি ক'রে দিতে। এই তো অবস্থা! বাবাকেও তো চেনো। তাঁর সঙ্গে আমার বনবে না। সুতরাং চাকরী যদি করতেই হয়, এখন থেকে করাই ভালো। না কি বলো?

শ্রীমন্ত মনোযোগের সঙ্গে ওর সমস্ত কথা শুনলে। তারপর সুমিত্রাকে ডেকে বললে, শঙ্কর এসেছে। কিছু খাবার-টাবার আনাও। একটু চায়ের জন্যেও বলো।

শঙ্করকে চা-খাবার খাইয়ে শ্রীমন্ত বললে, চলো।

—কোথায়?

—তোমাদের বাড়ী।

সুমিত্রাকে জিজ্ঞাসা করলে,—তুমিও যাবে না কি?

অনেকদিন সুমিত্রা হৈমন্তীকে দেখেনি। একদিনেই ওকে যেন সে ভালোবেসে ফেলেছে। ওকে দেখবার আগ্রহে সুমিত্রা ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বললে, নিশ্চয় যাব।

চলো।

শঙ্কর একটু ইতস্তত করছিল। হগ মার্কেট থেকে হৈমন্তীর জন্যে কি কতকগুলি টুকিটাকি জিনিস কেনবার ছিল। কিন্তু শ্রীমন্ত তাকে ছাড়লে না। ওর একটা কথাও শ্রীমন্তর বিশ্বাস হচ্ছিল না। এক রকম জোর ক'রেই ওকে নিয়ে ট্যাক্সিতে তুললে।

ট্যাক্সি গ্রে ষ্টীটের মোড়ে আসতেই শঙ্কর হঠাৎ ব্যস্তভাবে ড্রাইভারকে বললে, থামো, থামো।

ট্যাক্সি থেমে গেল।

শ্রীমন্ত বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, কি হ'ল?

শঙ্কর বললে, ছোটদির কতকগুলো সাবান আর স্নো। ওই সামনের দোকান থেকেই নিয়ে যাই বরং। নইলে ছোটদি অনর্থ করবে। ওই যা : ! টাকাটা কোথায় ফেললাম!

এপকেট ওপকেট হাৎরে হতাশভাবে শঙ্কর বললে, তোমার কাছে দশটা টাকা হবে? দাও তো, বাড়ী গিয়ে দিয়ে দোব।

শ্রীমন্ত নিঃশব্দে ওকে দশটা টাকা দিলে। জিজ্ঞাসা করলে, আমরা কি অপেক্ষা করব?

—করতে পারো। কিংবা চলে যাও। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে যাচ্ছি।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিতে শ্রীমন্ত হেসে বললে, ও আর আসবে না।

সুমিত্রা বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, তার মানে?

—তার মানে 'দেবধামের' নীলরক্তের ধারা নিঃশেষ হয়ে এসেছে। 'দেবধামের' শেষ বংশধর অধঃপাতের পথ খুঁজে পেয়েছে। ও এখন গড় গড় ক'রে নিচের দিক চলবে। কেউ ওকে রুখতে পারবে না। ওকে দেখে বুঝতে পারোনি?

শ্রীমন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

'দেবধামে' পৌঁছানো মাত্রই ওরা হিমাংশু-বাবুর চীৎকার শুনতে পেলে। এত কালের মধ্যে শ্রীমন্ত হিমাংশুবাবুকে কখনও চীৎকার দূরে থাক, জোরে কথা বলতেও শোনেনি। সেই হিমাংশুবাবুর চীৎকার এত দূর থেকে শোনা যাচ্ছে। দুর্ভাবনায় শ্রীমন্তর বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ ক'রে উঠলো : শেষ পর্যন্ত ও'র কি মাথা খারাপ হয়ে গেল!

তাড়াতাড়ি ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ওরা দুজনে ভিতরে গেল।

দোতলায় উঠেই দেখে, হিমাংশুবাবু সমস্ত বাড়ী যেন মাথায় ক'রে তুলেছেন। আর এমন কদর্য ভাষায় কাকে যেন গালাগালি করছেন যে তা কানে শোনা যায় না। শ্রীমন্ত আর সুমিত্রাকে তিনি যেন দেখতেই পেলেন না।

শ্রীমন্ত ইসারায় সুমিত্রাকে অন্দরে যেতে ব'লে হিমাংশুবাবুর পায়ের গোড়ায় উবু হয়ে পড়লো।

হিমাংশুবাবু থমকে গেলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর সঙ্গে সঙ্গে নেমে গেল :

—শ্রীমন্ত? ভিতরে এসো।

ঘরের ভিতরটা মদের বোতলে, ডিকাণ্টারে, এ'টো প্লেটে, মাংসের হাড়ে ও ঝোলে এমন নোংরা হয়ে আছে যে পা বাড়াতে ঘৃণা হয়।

শ্রীমন্তের একটা হাত ধ'রে হিমাংশুবাবু সেই ঘরের মধ্যে তাকে নিয়ে এলেন। হাত দিয়ে এ'টো প্লেটগুলো একটু সরিয়ে জায়গা ক'রে বললেন, বোসো। খাবে একটু?

তারপরে শ্রীমন্তের উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে ঢক ঢক ক'রে খানিকটা নির্জলা মদ নিজের গলায় ঢেলে দিলেন।

বললেন, শুনেছ সব?

শ্রীমন্ত ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লে।

হিমাংশুবাবু বললেন, কালকে হিমুশংকরকে দশটা টাকা দিয়েছিল কি সব জিনিষ কিনতে। সেই যে সে বেরিয়ে গেছে এখনও পর্যন্ত ফিরলো না। এদিকে আমি একটা পাওনাদারকে দেবার জন্যে পাঁচ শো টাকা লোহার সিন্দুকে তুলে রেখেছিলাম। আজ পাওনাদারের লোক আসন্তে সেই টাকাটা দেবার জন্যে সিন্দুক খুলে দেখি, সব ফক্কা। একটি তামা কোথাও নেই। বুঝলে, একটি তামা নেই।

বড়বাবু হাঃ হাঃ ক'রে অট্টহাস্য করলেন। আবার খানিকটা নির্জলা মদ গলায় ঢেলে বিকৃত কণ্ঠে বলতে লাগলেনঃ

—এই আমার পুত্র! এরই জন্যে বাড়ী রাখব, জমিদারী রাখব, কত আশাই না ক'রেছিলাম! শোনো শ্রীমন্ত, বাড়ী কেনবার জন্যে যে লোকটিকে তুমি স্থির করেছিলে, সে এখনও বাড়ী কিনতে রাজি?

—বোধ হয় রাজি।

—তাহ'লে তুমি সব ঠিক কর। কাল সোমবারে সবু চুকিয়ে ফেলতে চাই। মনে কোরো না, আমি মাতাল হয়ে বলছি। আমি স্থির করেছি, বাড়ী-জমিদারী সমস্ত বিক্রি করব। ক'রে দেনাপত্র যা আছে পাই-পয়সা মিটিয়ে, যা থাকবে নিয়ে তোমার মা আর আমি বাকি জীবনটা কাশীবাস করব। তোমার মায়েরও তাই মত। তুমি কালকের মধ্যেই সব ঠিক ক'রে ফেল। জীবনে ঘেন্না ধ'রে গেল শ্রীমন্ত, জীবনে ঘেন্না ধ'রে গেল!

হিমাংশুবাবু মুখটা বিকৃত করলেন।

শ্রীমন্তর চোখ আবার চকচক ক'রে উঠলো। লিকলিকে জিভের ডগা দিয়ে পুরু পুরু ঠোঁট একবার চেটে নিলে।

বললে, তাহ'লে দলিল-পত্র আজকেই তৈরী ক'রে ফেলতে হয়। আপনার শরীর কেমন আছে? এখন উঠতে পারবেন?

—খুব পারব। কী যে বলো তুমি।

হিমাংশুবাবু টলতে টলতে উঠে বললেন, চলো, কোথায় নিয়ে যাবে।

শ্রীমন্তও উঠে দাঁড়ালো। একবার দ্বিধা-ভরে জিজ্ঞাসা করলে, পারবেন তো যেতে? না হয় আজ থাক।

—না, না। থাকবে না। আজই সব শেষ করে ফেলতে চাই। কালকের জন্যে যেন কিছু না থাকে। দাঁড়াও, বোতলে আর একটু প'ড়ে আছে মনে হচ্ছে।

সেইটুকু নিঃশেষ করবার জন্যে হিমাংশুবাবু আবার বসলেন।

শ্রীমন্ত বাইরে এলো রঘুয়াকে একখানা ট্যাক্সি ডাকতে বলবার জন্যে। সুমিত্রা ব্যস্ত-ভাবে এসে ওর হাত চেপে ধরলে।

—কি?

সুমিত্রা ব্যাকুল কণ্ঠে বললে, ছোটদি অজ্ঞান হয়ে গেছে।

—কখন?

—ঘণ্টা দুই হ'ল। জ্ঞান তো হচ্ছে না।

শ্রীমন্ত একবার দ্বিধা করলে। কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে নিজেকে সামলে নিলে। 'দেবধাম' তার চাই। এত বড় সুযোগ জীবনে আর নাও আসতে পারে।

এক মুঠো নোট সুমিত্রার হাতে গুঁজে দিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললে, ডাক্তারকে খবর দাও। ওর জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত এ-বাড়ীতেই থেকো। আমি একবার বেরুচ্ছি। ফিরতে রাত হতেও পারে। যাও।

সুমিত্রা চ'লে গেল।

শ্রীমন্ত বাড়ীর দলিলপত্র নিয়ে হিমাংশুবাবুকে সঙ্গে ক'রে ট্যাক্সিতে বেরিয়ে গেল এটর্নী বাড়ী। ভালো এটর্নী তার জানা আছে। তাঁর সঙ্গে এই বাড়ী কেনা-সম্বন্ধে মোটামুটি কথা হয়েও রয়েছে।

(১৯)

বায়নাপত্র সম্পাদন ক'রে হিমাংশুবাবুকে নিয়ে শ্রীমন্ত যখন ফিরলো তখন রাত্রি এগারোটার কাছাকাছি।

'দেবধাম' নিঃঝুম।

ট্যাক্সি থেকে নেমে শ্রীমন্ত থমকে দাঁড়ালোঃ 'দেবধাম' কি মরে গেল?

এদিকটা অন্ধকার, ওদিকের দেওয়ালে শীতের পাণ্ডুর চাঁদের আলো এসে পড়েছে। সে তো আলো নয়, যেন 'দেবধামের' মৃত-দেহের উপর শাদা চাদর বিছানো রয়েছে।

এই 'দেবধাম',—বলতে গেলে এই শ্রীমন্তের জননী, তার ধাত্রী। সাড়া দিচ্ছে না কেন? এর সমস্ত আলো কেন এমন ক'রে নিবেনো? কী ভবে কিনলে সে? সে কি কতকগুলো ইট-কাঠ-পাথর? এর আত্মার আলো কই?

শ্রীমন্ত ভিতরে-ভিতরে ব্যাকুল হয়ে উঠলো। তার পা টলছে। কিন্তু তারও চেয়ে বেশী টলছে হিমাংশুবাবুর পা। ভদ্রলোক বোধ করি তাঁর জীবনের শেষ মদ্যপান আজ সেরে নিলেন।

তাঁকে নিয়ে শ্রীমন্ত খুব মুস্কিল বোধ করলে।

রঘুয়াকে ডাকা যায়, কিন্তু শ্রীমন্তের কণ্ঠ যেন বসে গেছে। এ-বাড়ীতে যেন চীৎকার করা চলে না।

অন্য সময় বাবুর ফেরার সাড়া পেলে রঘুয়া নিজেই ছুটে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু আজকে সে যেন যাদুমন্ত্রে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। সে আসছে না।

শ্রীমন্ত নিজেই টলছে। তবু এক মাতাল

আর এক বৃদ্ধ মাতালকে ধ'রে ধ'রে নিয়ে চললো। বারান্দা, বারান্দা পেরিয়ে একটা ঘর, তার পরে দোতালায় ওঠবার একটা সিঁড়ি, সেখানে থেকে আবার বারান্দা ঘুরে-ঘুরে তবে সেই ছোট ঘর, যেখানে বড়বাবু মদ্যপান করেন।

এই পথটা আসতে, শ্রীমন্তের মনে হ'ল, যেন অনন্তকাল লাগলো। পথেরও শেষ নেই, সময়েরও না।

কী ভয়ঙ্কর আজকের রাত্রি!

মরা ছাগলের চোখের মতো নিষ্প্রভ ওই মহাকাশ, অনন্তকালের সূক্ষ্ম সুতোয় ফোঁটা ফোঁটা চোখের জলের মালা গেঁথে গলায় পরেছে। পায়ের তলায় মৃত অজগরের মতো প'ড়ে রয়েছে নির্জীব মহাপথ, যেখানে পা বাড়াতেও ঘেন্না করে!

কী হ'ল এই পৃথিবীর? এর কি অন্তিম ঘনিয়ে আসছে?

ঘরের মধ্যে তখনও মদের বোতল, ডিকাণ্টার এবং এঁটো প্লেট ছড়ানো। ফরাসের উপর বসবার জায়গা নেই। ওরা ঘর থেকে গেছে অনেকক্ষণ। এর মধ্যে রঘুয়া এসে যে ঘর পরিষ্কার ক'রে যায়নি কেন কে জানে!

নেশার ঘোরে আলো জ্বালবার কথা শ্রীমন্তর মনেই পড়লো না। সে একটা কোণে হিমাংশুবাবুকে দাঁড় করিয়ে সেই স্বল্পালোকে নিজেই ঘর পরিষ্কার করতে লেগে গেল। তারও সর্বশরীর নেশায় টলছে, চোখে যেন ভালো দেখতে পাচ্ছে না। অনেক কষ্টে বোতল-ডিকাণ্টার-প্লেটগুলো এক পাশে সরিয়ে রাখলে। হাত দিয়ে জাজিমখানা যতটা সম্ভব পরিষ্কার করলে। এবং সেইখানে হিমাংশুবাবুকে শুইয়ে দিলে।

মদ্যের প্রভাবে হিমাংশুবাবু যেন তুরীয় লোকে পেঁছে গেছেন। তাঁর সাড়াও নেই, শব্দও নেই। মাঝে-মাঝে শ্রীমন্তর দিকে জবা-ফুলের মতো লাল চোখে ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে চাইছেন, আবার চোখ নামিয়ে নিচ্ছেন। মাঝে-মাঝে কি যেন তাঁর বলবার ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু বলতে পারছেন না। গলার কাছটা একবার থরথর ক'রে ন'ড়ে উঠছে, তারপর চোখ দিয়ে ঝর ঝর জল ঝরছে।

শ্রীমন্ত ওঁকে শুইয়ে দিতেই একবার ছটফট ক'রে হিমাংশুবাবু চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর নাক ডাকতে আরম্ভ করলো।

এইবারে শ্রীমন্ত যেন ঝাড়া-হাত-পা হ'ল। তার যেন একটা বোঝা নেমে গেল। হাতে হাত ঘষতে-ঘষতে সে নিশ্চিন্তভাবে চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে।

এইবার তাকে বাড়ী ফিরে যেতে হবে। এবং আরও যেন কি একটা ব্যাপার আছে তার ঠিক মনে পড়ছে না। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দুই হাতে বুক চেপে ধ'রে সে ব্যাপারটা স্মরণ করবার চেষ্টা করতে লাগলো।

এমন সময় জুতোর শব্দ ক'রে কতক-গুলো লোক তার ঘরের পাশ দিয়ে নিচে নেমে চলে গেল।

কে ওরা?

শ্রীমন্ত কান পেতে শুনলে ওদের পায়ের শব্দ নিচে মিলিয়ে গেল। মোটরের ষ্টার্ট দেওয়ার শব্দ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে মোটরখানা একটা শব্দ ক'রে বাইরে চলে গেল।

ওর সবই কেমন যেন অদ্ভুত বোধ হচ্ছে। এ কি ভৌতিক বাড়ীতে সে এসে পড়লো!

ওই আবার যেন কারা সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে না? শ্রীমন্তর ভারি কৌতূহল হচ্ছে, বাইরে গিয়ে দেখে আসে ওরা কারা। কিন্তু সে সামর্থ্য নেই। ওর দুটো পা-ই কে যেন মেঝের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে।

হঠাৎ ঘরের আলোটা জ্বলে উঠলো।

শ্রীমন্ত নিঃশব্দে চেয়ে দেখলে, রঘুয়া। উপরে আসতে-আসতে রঘুয়ার কি মনে হয়েছে, আলোটা জেলে একবার দেখলে।

—কোথায় গিয়েছিলেন আপনারা? কখন এলেন?

উত্তরে জড়িত কণ্ঠে শ্রীমন্ত কি বললে, বোঝা গেল না।

রঘুয়া ছুটতে-ছুটতে গিয়ে কোথা থেকে একটা বিছানা নিয়ে এলো। নিপুণ ক্ষিপ্রহস্তে সেটা এক পাশে পেতে বড়বাবুকে সেইখানে ভালো ক'রে শুইয়ে দিলে।

অঘোরে ঘুমুচ্ছেন ভদ্রলোক। এত কাণ্ডেও তাঁর ঘুম ভাঙলো না।

রঘুয়া শ্রীমন্তের দিকে চেয়ে বললে, ছোটদিদিমণির অসুখ খুব কঠিন দাদাবাবু। ডাক্তার এসে ইনজেকশন দিলেন, কত কি করলেন, কিন্তু এখনও জ্ঞান হ'ল না। সেই অবস্থায় পেট চিরে ছেলে প্রসব করানো হ'ল,—মরা ছেলে। কি হবে বাবু, বাঁচবেন তো?

রঘুয়া হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলো।

বললে, এমন মেয়ে আর হয় না। যেন লক্ষ্মীপ্রতিমা। যেদিন থেকে এ-বাড়ী ছাড়লেন, সেইদিন থেকেই এ-বাড়ীর মা-লক্ষ্মীও যেন ছেড়ে গেলেন। এমন গুণের মেয়ে আর হয় না। কখনও কাউকে একটা কড়া কথা বলেননি। চাকর-বাকরের উপর দয়া কত?

কাপড়ের খুঁটে রঘুয়া চোখ মুছলো।

বললে, যাবেন উপরে বাবু?

শ্রীমন্ত ঘাড় নেড়ে বললে, না।

—চলুন না বাবু। সবাই রয়েছেন। বাগ-বাজার থেকে জামাইবাবু, বড়দিমণি, তাঁর শাশুড়ী, সবাই এসেছেন। বৌদিও রয়েছেন। আহা! ছোটদিমণিকে একবার যে দেখেছে সেই ভালোবেসেছে। বৌদির সঙ্গে ক'দিনেরই বা পরিচয়! কিন্তু বিকেল বেলায় সেই যে তাঁর কাছে ব'সেছেন, কেউ নড়াতে পারলে না!

বৌদিদি!

সুমিত্রা যে এ-বাড়ী এসেছে সেইটেই শ্রীমন্ত এতক্ষণ পর্যন্ত স্মরণ করতে পারছিল না।

বললে, আমি যাব না রঘুয়া। দেখছ তো আমার অবস্থা! এই অবস্থায় কোথাও যাওয়া যায় না। তোমার বৌদিদিকে তুমি এইখানে একবার ডেকে দেবে? তাড়াতাড়ি!

—যাই।

ব'লে রঘুয়া দ্রুতপদে চলে গেল।

শ্রীমন্ত আর দাঁড়াতে পারছে না সাবধানে সেইখানে সে ব'সে পড়লো। পকেটের ফ্লাস্কে এখনও একটু মদ বোধ করি আছে। বাঁদিকের পকেট থেকে ফ্লাস্কটা সে বের করলে।

সুমিত্রা ঝড়ের মতো ছুটতে ছুটতে এল:

—এইখানে ব'সে রয়েছ তুমি? আর উপরে কী কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে খবর রাখো না? ছোটদি যে যায়!

নির্বিকারভাবে শ্রীমন্ত বললে, তা আমি কি করব? তার সময় ফুরিয়েছে, সে যাচ্ছে। আমাদের যখন সময় ফুরোবে, আমরাও যাব।

ওর নির্বিকার কথা শুনে সুমিত্রার বিস্ময়ের আর সীমা রইলো না। বললে, এই কথা তুমি বলছ? ছোটদির সম্বন্ধে?

—এই কথা সবাই বলবে সুমিত্রা। কেউ দু'দিন আগে যায়, কেউ দু'দিন পরে। ঠিক কি না বলো?

এতক্ষণে সুমিত্রার দৃষ্টি পড়লো অর্ধশূন্য ফ্লাস্কটার দিকে। বিস্ময়ে, ক্রোধে, ঘৃণায়, তার বাক্যস্ফূর্তি হ'ল না। কাঠের মতো শক্ত হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল।

শ্রীমন্ত নিশ্চিন্তভাবে টেনে টেনে বলতে লাগলো: দুঃখ করবার কিছু নেই সুমিত্রা। ভাগ্য যার ভালো সেই আগে যেতে পারে। হৈমন্তী চললো, আর ওই দেখ হৈমন্তীর বুড়ো বাবা মদ খেয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন! উনি যেতে পারলেন না। এই দুনিয়া! এতে দুঃখ করবার কিছু নেই।

ফ্লাস্কের সেই তীব্র সুরা বিনা জলে শ্রীমন্ত গড়গড় ক'রে গলায় ঢেলে দিলে।

সুমিত্রা চীৎকার ক'রে উঠলো: অমনি ক'রে মদ খাচ্ছ তুমি?

বিষাক্ত সরীসৃপের মতো ছোট ছোট লাল চোখ মেলে শ্রীমন্ত সুমিত্রার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে চাইলে। বললে:

—হ্যাঁ। এমনি করেই মদ খাব সুমিত্রা, আগুনের মতো তীব্র নির্জলা মদ। খাব না? তুমি বলো কি সুমিত্রা! যে দেশে দেনার জ্বালায় 'দেবধাম' বিক্রি হয়ে যায়, আর শ্রীমন্ত মিত্তির ব্ল্যাক-মার্কেটে লাখ-লাখ টাকা করে; আর সোনার মেয়ে হৈমন্তী মরে অকালে, সেদেশে মানুষ মদ খাবে না তো খাবে কি?

একটু থেকে অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে শ্রীমন্ত আবার বললে, তুমি ঠিক কথা বলেছ সুমিত্রা। হৈমন্তী এই 'দেবধামের' আত্মা। সে যাচ্ছে চলে। তার বুড়ো বাপ মাতাল হয়ে ওই অঘোরে ঘুমুচ্ছে। আর আমি এই মরা বাড়ী তিন লাখ টাকা দিয়ে কিনলাম! এর পরেও মদ খাব না?

কিন্তু আর নয়, এইবার বাড়ী চলো।

ব'লে এঁটো প্লেট আর হাড়ের টুকরো আর খালি ডিকাণ্টারের পাশে সেই ঝোলের দাগ ধরা জাজিমের উপর শ্রীমন্ত নিশ্চিন্তভাবে শুয়ে পড়লো।

বাঙ্গালা দেশের জন্মকথা



ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী

অচিন্তনীয় মহাশক্তির অভাবনীয়, অবর্ণনীয়, অবোধ্য, বিক্ষোভের ফলে সূর্যমণ্ডলের ঘূর্ণমান বিশাল নীহারিকা হইতে যেদিন আমাদের এই পৃথিবী বিরাট অগ্নি-গোলকরূপে ছুটিয়া বাহির হইল এবং লাটিমের মত ঘুরপাক খাইতে খাইতে সূর্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ কার্যে লাগিয়া গেল, পৃথিবীর ইতিহাস সেই দিন হইতে আরব্ধ হইয়াছে। মহাশূন্যে সহস্র সহস্র বৎসর তাপ ছড়াইতে ছড়াইতে ক্রমশঃ এই অগ্নিগোলকের উপর ভাগ জমিয়া শক্ত হইয়া উঠিল, নিম্ন ভূমিতে জলীয় বাষ্প জমিয়া স্থানে স্থানে দিগন্তবিস্তৃত মহাসাগর গড়িয়া উঠিল। কতকাংশে কঠিন, প্রস্তরময়, জীবনের চিহ্ন মাত্র শূন্যে বিশাল মহাদেশ এবং বাকী অংশে স্থলভাগেরই মত জীবনের চিহ্ন-মাত্র শূন্য সীমা পরিসীমাহীন মহাসাগর, এই বৈচিত্র্যহীন রূপই আমাদের এই জীবধাত্রী সুজলা-সুফলা-তৃণবনরাজি-শ্যামলা পৃথিবীর আদি রূপ!

ক্রমশঃ ভূগর্ভস্থ অগ্নি নানা কারণে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভূপৃষ্ঠে স্থানে স্থানে পর্বত শ্রেণী গড়িয়া তুলিল। ভূগর্ভের সলিলধারা উৎসরূপে পাহাড়ের গাত্র ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইল এবং গড়াইয়া নীচের প্রান্তর অতিক্রম করিয়া সাগরাভিমুখে ছুটিল। উচ্চ পর্বতের চূড়ায় বরফ জমিতে লাগিল এবং গ্রীষ্মে উহা গলিয়া উৎসের জলধারার সহিত মিলিয়া নদীর সৃষ্টি করিল। সূর্যের তাপ ও তাপের অভাবে শৈত্য এবং প্রবহমান জলস্রোতের বেগ তিল তিল করিয়া পাহাড় কাটিয়া বালুকা, ধূলি ও কর্দমের সৃষ্টি করিতে লাগিল। বাতাসে উড়িয়া বা নদীর জলস্রোতের সহিত নীচের প্রস্তরময় প্রান্তরে নামিয়া আসিয়া এ ধূলি বালু ও কাদা পাথরের উপর মাটির প্রলেপ দিতে লাগিল। এইরূপে ভূ-পৃষ্ঠের মাটি,—আমাদের অতি পরিচিত মাটি, গড়িয়া উঠিল। মাটিতে বৃক্ষাণু এবং জলে জীবাণু কি করিয়া প্রথম জন্মিল সে রহস্য আজিও অজ্ঞাত রহিয়াছে।(১) কিন্তু লক্ষ লক্ষ বৎসরের বিবর্তনের ফলে সেই জীবাণু হইতে মানবাদি প্রাণিগণ এবং বৃক্ষাণু হইতে বিবিধ প্রকার উদ্ভিদ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহাই বৈজ্ঞানিকগণের মত।

(1) "The truth is that no one knows how life began in a lifeless world. It is one of the great unsolved wonders of creation, how a world which was a desert could become a flowering garden."
Page 22-24. The Modern Encyclopedia for young people. Edited by Messrs. Griffith, Crossland and Parrish, New York Collins Clear Type Press 1935.

ভূতত্ত্ববিদগণ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, আনুমানিক ১০ কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীর জন্ম হইয়াছিল।(২) ইহার পরে ক্রমশঃ শীতল হইয়া, বায়ুমণ্ডল, সমুদ্র, পর্বত, নদী, প্রান্তর, বনরাজি দ্বারা ভূষিত হইয়া জীববাসের যোগ্য হইবার পরেও ভূগর্ভস্থ উত্তপ্ত অগ্নির প্রভাবে বহুবার এবং বহু লক্ষ বৎসর ধরিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভূপৃষ্ঠ পুনঃ পুনঃ নূতন নূতন মূর্তি ধারণ করিয়াছে।

"কত মরু হ'ল সাগর, কত সাগরে শুকাল বারি,
কত নদী গেছে পথ ভুলি গো, গলে গেছে কত গিরি।"

ইহা মোটেই কবি কল্পনা নহে। সত্য সত্যই প্রাচীনকালের বহু মহাদেশ সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে এবং সমুদ্রগর্ভ উন্নত হইয়া গগন-স্পর্শী গিরিশৃঙ্গে পরিণত হইয়াছে।

ভূপৃষ্ঠের যে স্থানে বর্তমানে ভারতবর্ষ বলিয়া পরিচিত প্রকাণ্ড দেশটি গড়িয়া উঠিয়াছে, ভূতত্ত্ববিদগণের মতে তাহা অধুনা লুপ্ত সুপ্রাচীন গণ্ডোয়ানা মহাদেশের অন্তর্গত। এককালে এই বিশাল মহাদেশ অস্ট্রেলিয়া হইতে বর্তমান আফ্রিকার পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত অখণ্ড ভূভাগ রূপে বিস্তৃত ছিল। তখন ভারত মহাসাগরের অস্তিত্ব ছিল না, বর্তমান ভারতবর্ষ এবং আফ্রিকার মধ্যস্থিত আরব সাগরও শুষ্ক ভূমি রূপেই বিরাজ করিত। এই বিস্তৃত মহাদেশের দক্ষিণে ছিল দক্ষিণ মেরুসাগর। হিমালয় পর্বত তখন পর্যন্ত গড়িয়া উঠে নাই। এই মহাদেশের উত্তরে হিমালয় পর্বতের অবস্থান ভূমি এবং তিব্বতাদি দেশ জুড়িয়া এক সাগর বর্তমান ছিল, ভূতত্ত্ববিদগণ এই সাগরের নাম দিয়াছেন টেথিস।

(2) "Age of the Earth" by E. G. Jobling, Dacca Review, December, 1913. PP. 280ff. Quoted from "Knowledge."
মতান্তরের অভাব নাই। প্রথম পাদটীকায় উদ্ধৃত কৈশোরক বিশ্বকোষেই আছে, পৃষ্ঠা ২২
"Some scientists think that as many as 150,000,000 years may have elapsed since the earth first formed a solid crust.
কাজেই পৃথিবীর জন্ম বৎসর ইহারও অনেক পূর্ববর্তী।

ভূতত্ত্ববিদগণ ভূপৃষ্ঠের স্তরগঠন পর্য-বেক্ষণ করিয়া ঐ স্তর গঠনকালকে প্রাণী-গণের বিবর্তন চিহ্নাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তিন-ভাগে বা তিন যুগে বিভক্ত করিয়াছেন। যে স্তরে আদিম জীবের চিহ্নাঙ্ক পাওয়া যায় তাহার গঠন যুগের নাম প্রত্নজীবক। উহার পরের স্তরের গঠনযুগের নাম মধ্যজীবক। এবং বর্তমানকাল পর্যন্ত চলিতেছে যে স্তরের গঠন যুগ—তাহার নাম নব্যজীবক। সহজেই বুঝা যায় যে, দশ কোটি বৎসর যদি পৃথিবীর বয়স হইয়া থাকে তবে এক একটি স্তরের গঠন যুগের বয়স ৩।৪ কোটি বৎসর হওয়াই সঙ্গত। এই স্তর গঠন যুগগুলি আবার কতকগুলি উপযুগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম যুগ সাতটি উপযুগে বিভক্ত। দ্বিতীয় যুগ তিনটি উপযুগে বিভক্ত। শেষ যুগ, অর্থাৎ বর্তমান কাল পর্যন্ত চলিতেছে যেই যুগ, তাহাও সাতটি উপযুগে বিভক্ত(১)।

মধ্য যুগের শেষভাগে ভূপৃষ্ঠে এক বিরাট প্রলয় ও পরিবর্তনের চিহ্ন ভূতত্ত্ববিদগণ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই মহাপ্রলয়ে ভূগর্ভের গলিত ধাতু প্রস্তরাদি উৎক্ষিপ্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যের বিশাল মালভূমির সৃষ্টি করিল। কচ্ছ, কাঠিয়াবার, গুজরাট এবং মধ্যভারতের পর্বতমালাও এই মহাপ্রলয়ে উৎক্ষিপ্ত হয়। এইরূপে বিন্ধ্য পশ্চিমঘাট, নীলগিরি ও পূর্ব-ঘাট পর্বতমালা-বেষ্টিত দাক্ষিণাত্যের জন্ম হইয়াছিল। ইহার পূর্বেই পৃথিবীতে জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া বিবর্তিত হইতে হইতে এই যুগের শেষে স্তন্যপায়ী জীব ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হইল।

দাক্ষিণাত্য গঠনের পর হাজার হাজার বৎসর চলিয়া গেল, ধরিত্রী স্থিতিলাভ করিল। নব্যজীবক যুগের প্রথম উপযুগে কিন্তু আবার ভূপৃষ্ঠ মহাপ্রলয়ে দুলিয়া উঠিল। এই ভয়ানক বিপ্লবে গণ্ডোয়ানা মহাদেশ ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। উহার অনেকাংশ

(১) সম্পূর্ণাঙ্গ বাঙ্গলার ইতিহাস রচনার পথ-প্রদর্শক বিভিন্ন-মুখী প্রতিভাসম্পন্ন অদ্বিতীয় ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গলার ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে গৃহীত বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাগুলিই কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিলাম।

"মহাকালী আশ্রম" দেখিয়া ঢুকিবেন নচেৎ প্রতারিত হইবেন।

'মহাকালী আশ্রম' হাতীবাগান টোল



হেড অফিস—৮২ (বি), গ্রে ষ্ট্রীট।

ব্রাঞ্চ—৮০।১২ (বি), গ্রে ষ্ট্রীট।

শাখা অফিস—৬০ডি যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ—গ্রে ষ্ট্রীট মোড়

পি-এম বাকচির পঞ্জিকার প্রধানতম গণক এবং ভারতবর্ষের তামিল প্রভৃতি বহুবিধ পঞ্জিকা প্রণেতা ৫০ বর্ষের অভিজ্ঞ ও তন্ত্রশাস্ত্রে পূর্ণাভিষিক্ত তান্ত্রিক পণ্ডিত

শ্রীচণ্ডীচরণ স্মৃতি-জ্যোতির্ভূষণ।

আপনি যে কোন স্থানেরই লোক হউন আপনি বা আপনার নিকট বা দূরে আত্মীয় পণ্ডিত মহাশয়ের গুণমুগ্ধ। স্বপ্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডি স্থাপিত শ্রীশ্রীকালীমন্দিরে পুরঃশ্চরণ সিদ্ধ প্রত্যেক কবচ সদ্য ফলপ্রদ, কবচগুলি দ্রব্যগুণে ও মন্ত্রপ্রভাবে জীবন্তের ন্যায় কার্য করে। কবচ ধারণ করিবামাত্র অভিনব স্ফূর্তি ও সাহস আসিবে। প্রত্যেক কবচ বিশ্বাসের সহিত ধারণ করিতে হয়, বিশ্বাস না থাকিলেও দ্রব্য ও মন্ত্রশক্তি প্রভাবে নিশ্চয় অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। পণ্ডিত মহাশয়ের পূর্বতন পুরুষগণ ইংরাজ ও মুসলমান রাজত্বের পূর্ব হইতে অদ্যাবধি ভারতবর্ষে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া খ্যাত। এই কবচগুলি গ্রহণ সময়ে শনিবার অমাবস্যায় ত্র্যহস্পর্শ মহানিশায় স্নাতবস্ত্রে হোমান্তে একবর্ণা সাবৎসা গাভী দুগ্ধে কুমকুম গোরোচনা মিশ্রিত মসিযোগে ব্রহ্মদণ্ডী লেখনী দ্বারা হোমাগ্নি-শিখালোকে প্রণব বীজ ও মন্ত্রাদি লিখিত হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—এলোপ্যাথিক কবিরাজী প্রভৃতি ঔষধ সেবনে ফল না পাইলে এই কবচ ধারণে নিশ্চয় রোগমুক্ত হইবেন।

কবচ ধারণকারীর নাম, গোত্র এবং উদ্দেশ্য সহ পত্র লিখিবেন। এই মহাশক্তিসম্পন্ন কবচ ধারণে ফল না পাইলে মূল্য ফেরৎ পাইবেন।





শ্রীশ্রী৺নবগ্রহ কবচ

সর্ব কার্য সিদ্ধি—চাকুরী প্রাপ্তি, কর্মোন্নতি হয়, মূল্য—২।০, **মহানবগ্রহ কবচ**—৯৷।

বংশরক্ষা কবচ

এই কবচ চিরবন্ধ্যা ৪০ বর্ষ বয়সেও উত্তম দীর্ঘায়ু পুত্র লাভ করিবেন। মূল্য ৫৷।

সূর্য্য কবচ

ধারণে মানব সুস্থকায়, হার্টের দোষ, প্রমেহ, ভগন্দর, আমাশয় হৃৎকম্প প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্ত হয়। মূল্য—৪।০।

বগলামুখী কবচ

ধারণে যে অভিলাষ করিবেন অচিরে তাহা লাভ করিবেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শত্রু নষ্ট হইবে, মোকদ্দমায় জয় ও চাকুরী পুনঃপ্রাপ্তি, ব্যবসায় উন্নতি হইবে। মূল্য—১০৷।

চন্দ্র কবচ

ধারণে যক্ষ্মা, উদরী, সর্দি, হাঁপানি, গণ্ডমালা, শ্লেষ্মা ঘটিত পীড়া আরোগ্য হয়। মূল্য—৪।০।

মঙ্গল কবচ

ধারণে চর্মরোগ, পিত্তরোগ, রক্তস্রাব, রক্তামাশয়, অর্শ, শ্বেত-কুষ্ঠ, গলিত-কুষ্ঠ ভাল হয়। মূল্য—৪।০।

বুধ কবচ

লাবণ্য বৃদ্ধি হয়। মূল্য—৪।০।

বৃহস্পতি কবচ

ধারণে বায়ু রোগ, ব্লাডপ্রেশার, শিরঃ-পীড়া, মূর্ছা ভাল হয়। মূল্য—৪।০।

শুক্র কবচ

ধারণে স্ত্রীলোকের নাড়ীর দোষ গর্ভাশয়ের যাবতীয় পীড়া অকালে ঋতু বন্ধ—হইয়া পেটে বলের মত হওয়া বিনা অস্ত্রোপচারে সুস্থ হয়। মূল্য—৪।০।

শনি কবচ

ধারণে কার্যসিদ্ধি, ব্যবসায় উন্নতি। মূল্য—৪।০।

রাহু কবচ

ধারণে বাতব্যাধি, পক্ষাঘাত, শরীর কম্পন, উন্মাদ (পাগল) রোগ মুক্ত হয়।

মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ

ধারণে ব্যাধি-গ্রস্ত, চিররুগ্ন ব্যক্তি আরোগ্য এবং যে কোন রিষ্ট ফাঁড়া কাটিয়া দীর্ঘায়ুলাভ করিবেন। মূল্য—১০৷। বৃহৎ মহামৃত্যুঞ্জয় ১০১৷।

ধনদা কবচ

ধারণে সৌভাগ্য বৃদ্ধি ও ঋণমুক্তি হয়। মূল্য—১০৷। ঐ বৃহৎ ৫১৷।

মৃতবৎসা কবচ

স্ত্রীলোকের পুনঃ পুনঃ সন্তান হয় ৫।৬।৭।৮।৯ মাসগর্ভে আঁতুড়ে এবং ৫ বর্ষ মধ্যে পুনঃ পুনঃ সন্তান নষ্ট হয়, এই কবচ ধারণে নিশ্চয় দীর্ঘায়ু সন্তান হইবে। মূল্য—৭।০।

সরস্বতী কবচ

স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি ও পরীক্ষায় পাশ এবং দুষ্ট বালক শান্ত প্রকৃতি হইয়া বিদ্যালাভ করে। মূল্য—৫৷।

বশীকরণ কবচ

চিরশত্রু পর্যন্ত বশীভূত হয়, সত্বর কর্মে প্রমোশন হয়। মূল্য—৫৷। **বৃহৎ বশীকরণ কবচ**—৫১৷।

রাম কবচ

প্রত্যেক গর্ভবতীর ধারণ কর্তব্য। ভৌতিক দোষ নষ্ট হয়, মূল্য—১০৷।

বাস্তু বিচার

বাস্তু হতে ২॥ হাত নিম্নের মাটী এক ছটাক পাঠাইলে ভূগর্ভে ধনরত্ন ও দূষিত অস্থি থাকিলে তাহা নিজে গিয়া তুলিয়া দিব, গণনার ব্যয়—৫৷।

নিম্নোক্ত ডাক্তারগণ নিজে ও স্ত্রী পুত্রকে কবচ ধারণ করাইয়া রোগ মুক্ত হইয়াছেন—

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসার **একেন্দ্রনাথ ঘোষ,** এম এস সি এম ডি এস সি এফ জেড এস এফ আর সি এস।

ডাঃ জে এন মৈত্র, এম ডি প্রফেসার ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল ও হাসপাতালের প্যাথলজিকেল ডিপার্টমেণ্ট।

সিভিল সার্জেন **রাজেন্দ্রনাথ কুণ্ডু,** সিউড়ি, বীরভুম।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির **ডাঃ কৃষ্ণচন্দ্র শেঠ,** এম এ এম বি।

পত্রাদি উপরোক্ত ঠিকানায় অধ্যক্ষ শ্রীচণ্ডীচরণ স্মৃতি-জ্যোতির্ভূষণের নামে দিবেন।

সহকারী পণ্ডিত ও আশ্রমের কর্মচারী **শ্রীশান্তিপদ জ্যোতিরঞ্জন, শ্রীবিভূতিভূষণ স্মৃতি জ্যোতিঃশাস্ত্রী** ও **শ্রীগোবিন্দচন্দ্র জ্যোতির্বিনোদ, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শাস্ত্রী।**

সাগরে ডুবিয়া গেল। অস্ট্রেলিয়া সমুদ্র বেষ্টিত পৃথক মহাদেশে পরিণত হইল। পূর্বাংশের উন্নততর ও স্থিরতর স্থানগুলিই শুধু বোর্ণিও শেলেবেস, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, মলয় উপদ্বীপ ইত্যাদি রূপ গ্রহণ করিয়া সমুদ্র জলের উপর মাথা তুলিয়া থাকিতে সমর্থ হইল। বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের গঠনে ভারতবর্ষে ইহার বর্তমান ত্রিকোনাকৃতি প্রাপ্ত হইল। আফ্রিকা-মহাদেশ আরব সাগরের জলদ্বারা ভারতবর্ষ হইতে পৃথক হইয়া গেল।

কিন্তু ইহার অপেক্ষাও বিস্ময়জনক পরিবর্তন হইল গণ্ডোয়ানা মহাদেশের উত্তরাংশে। যে মহাপ্রলয়ের অভাবনীয় শক্তিতে গণ্ডোয়ানা মহাদেশের দক্ষিণাংশ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া বর্তমান রূপ পাইল, সেই শক্তিই আবার টেথিস মহাসাগর গর্ভকে উপরদিকে টানিয়া তুলিল। যেখানে সাগর ছিল দেখিতে দেখিতে সেখানে বিরাট পর্বত শ্রেণী মাথা তুলিল, ইহারই নাম আমরা রাখিয়াছি হিমালয় পর্বত। একটা চারা গাছকে টানিয়া তুলিয়া ফেলিলে যেমন নানা দিক হইতে চড়চড় করিয়া মাটি ভাঙ্গিয়া তাহার আস্ত শিকড় দুই চারিটিও উঠিয়া পড়ে, হিমালয়ের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে আসাম ও আফগানীস্থানের পর্বতমালাও তেমনি করিয়া মাথা তুলিয়া ছিল। এইরূপে আমাদের জননী জন্মভূমি সাগর জলে পাদুখানি রাখিয়া, পূর্ব পশ্চিমে উত্তরের গিরিমালার উপর দিগন্ত-বিস্তৃত রুক্ষ কেশভার ছড়াইয়া, নর্মদা-সিন্ধু-কাবেরী কৃষ্ণা, গোদাবরী, গঙ্গা, যমুনা ব্রহ্মপুত্রের রূপালী পাতের বসন পরিয়া, বিন্ধ্যমেখলা, অনন্ত তুষার কিরিটিণীরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া আমাদের মাতৃভূমির এই মহিমময়ী রূপের কোন পরিবর্তন হয় নাই।

হয় নাই বলিয়া যে কখনও হইবে না, ভূতত্ত্ববিদগণ এমন মিথ্যা আশ্বাস কখনও আমাদিগকে দেন না। আবার একদিন মহাপ্রলয়ে সমস্তই পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে এবং পৃথিবীর এই ৮।১০ হাজার বৎসরের নিতান্ত শিশু সভ্যতার সমস্ত চিহ্ন ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইতে পারে। ক্রীড়ারত বালক কোন্ দিন স্বকৃত তাসের ঘর, পছন্দ হইল না বলিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিয়া, ফিরিয়া গড়িতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার কিছু মাত্র স্থিরতা নাই।

হিমালয়ের উন্নয়নের সমকালে এক বিচিত্র ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। যে মহাশক্তি হিমালয়কে ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করে, দাক্ষিণাত্যের লক্ষ বৎসরের স্থিতিবান কঠিন মালভূমিকে নড়াইতে তাহার সাধ্যে কুলাইল না। ফলে, একটা মোটা লোহা বা তামার পাত যদি একধার ধরিয়া কেহ উঠাইতে চেষ্টা করে এবং প্রবলতর শক্তি তাহার অপর ধার চাপিয়া বসিয়া থাকে, তবে যে ব্যাপার সংঘটিত হয়, এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির অব্যবহিত উত্তরে এবং হিমালয়ের পাদমূল হইতে দক্ষিণে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া এক সুদীর্ঘ বিরাট গহ্বরের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই গহ্বর প্রথম অবস্থায় সমুদ্রজলে পরিপূরিত ছিল। ক্রমশঃ হিমালয় হইতে এবং পূর্ব, পশ্চিমে ও দক্ষিণের পর্বতমালা হইতে আবির্ভূত নদীসমূহ গড়াইয়া আসিয়া এই গহ্বরে পড়িতে লাগিল। নদীর জলের সঙ্গে প্রত্যেক বৎসর অজস্র বালু ও কাদা আসিয়া দ্রুত এই গহ্বর ভরিয়া ফেলিতে লাগিল এবং সমুদ্র সরিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে লক্ষ লক্ষ বৎসরের পলিমাটি দ্বারা পশ্চিমে পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ এবং পূর্বে যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বাঙ্গলা, আসাম ও শ্রীহট্ট গড়িয়া উঠিয়াছে। ভূতত্ত্ববিদগণ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, গড়ে প্রায় সাড়ে চারি হাজার বৎসরে এক ফুট পলিমাটি জমিয়া ওঠে(১) কলিকাতা অঞ্চলে নীচে হাজার ফুট খুঁড়িয়া এবং যুক্ত প্রদেশে ১৩০০ ফুট খুঁড়িয়াও এই গহ্বরের প্রস্তরময় তলদেশ পাওয়া যায় নাই। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে বাঙ্গলা ইত্যাদি দেশের গঠনকার্য আনুমাণিক ১০০০×৪৫০০=৪৫০০,০০০ মোটামুটি পঞ্চাশ লক্ষ বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া চলিতেছে।

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের, সুবর্ণরেখা, কাঁসাই, রূপনারায়ণ দামোদর, অজয়, ময়ুরাক্ষী, দ্বারকা ব্রাহ্মণীর;কৌশিকী কালিন্দী পুনর্ভবা আত্রেয়ী করতোয়া ত্রিস্রোতার; সুরমা কৌশিকা মেঘনাদ

(1) Old Chipped Stones of India by Logan, 1906, p. 48.

গোমতী ফণীর প্রাণঢালা দানে পুষ্ট, সমবেত চেষ্টায় গঠিত আমাদের এই বাঙ্গলা দেশ! এই দেশের গঠনকার্য বর্তমান কাল পর্যন্ত আমাদের চোখের উপরে প্রত্যহ চলিতেছে। ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার প্রবাহ-পথ ব্রিটিশ শাসন কালেই এক একবার পরিবর্তিত হইয়াছে। নদী দীর্ঘকাল যে খাতে প্রবাহিত হয়, জলবাহিত বালুকা ও কর্দম স্থিতি লাভ করিতে করিতে সেই খাত ক্রমশঃ উচ্চ ও জলপ্রবাহ বহিতে অক্ষম হইয়া দাঁড়ায়। নদী তখন আপন বেগেই নূতন খাত খুঁজিয়া লয়। এইরূপে বার বার খাত পরিবর্তনে নদী বিধৌত প্রদেশগুলি ক্রমশঃ উন্নত হইয়া উঠে এদিকে সিন্ধু সঙ্গমে বদ্বীপের গঠনে সাগর ক্রমশঃ সরিয়া যাইতে থাকে। এইরূপে লক্ষ লক্ষ বৎসরে নদীসমূহ দ্বারা ধীরে ধীরে বাঙ্গলা দেশ গঠিত হইয়া উঠিয়াছে এবং নব্যজীবক যুগে এই গঠন ধারা কখনও বিশেষ ব্যাহত হয় নাই। ছোটখাট প্রলয় দেশকে যে মধ্যে মধ্যে একটু নাড়াচাড়া দিয়া না গিয়াছে, এমন নহে। কয়েকটি বড় ভূমিকম্প আমাদের জীবনকালেই দেখিলাম। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে এক বিশেষ প্রবল ভূমিকম্পে ব্রহ্মপুত্র হইতে ভাগীরথী পর্যন্ত এক রেখায় বঙ্গোপসাগরের উত্তর তীরের একাংশ বসিয়া যায় এবং ফরিদপুর, যশোহর-খুলনা ও চব্বিশ পরগণা জুড়িয়া পূর্ব পশ্চিমে দীর্ঘ বড় বড় নিম্নভূমি বা বিল দেখা দেয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুনের (৩০শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩০৪) ভূমিকম্পে আসাম ও উত্তর বঙ্গের অনেক স্থানে নানারূপ পরিবর্তন হয়। তথাপি এ কথা সত্য যে, নব্যজীবক যুগের আরম্ভে হিমালয় এবং পূর্ব ও পশ্চিমস্থ গিরিশ্রেণী উন্নমিত এবং বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর অবনমিত হইয়া বর্তমান ভারতবর্ষ গঠিত হইবার পরে, রুদ্রদেব আর প্রলয় নৃত্যে বিশেষ মত্ত হন নাই।

হিমালয়ের পাদমূল পর্যন্ত বিস্তৃত সাগর, নদী বাহিত বালুকা কর্দম গঠিত পলিমাটির আক্রমণে ক্রমশ দক্ষিণে সরিয়া গিয়া কিরূপে বাঙ্গলা দেশ গঠনের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিয়াছিল, তাহা আমরা দেখিলাম। ভূতত্ত্ববিদগণ এই পলিমাটির প্রকৃতি বিচার করিয়া এই পলিমাটিকে প্রাচীন পলি, মধ্য পলি এবং আধুনিক পলি, এই তিনভাগে ভাগ করিয়াছেন। পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের অধিকাংশ এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার ভাওয়াল ও মধুপুর জঙ্গল প্রাচীন পলি দ্বারা গঠিত। আধুনিক পলি নদীমুখস্থ বদ্বীপগুলিতে দেখা যায়। বাঙ্গলা দেশের বাকী অংশ মধ্য পলি দ্বারা গঠিত।

বাঁকুড়া জেলার কয়েকটি বিক্ষিপ্ত পাহাড় এবং ত্রিপুরার সমতল ভূমিতে স্থিত ময়নামতী-লালমাই পাহাড় পলিগঠিত ভূমি অপেক্ষা প্রাচীনতর। ময়নামতীর পাহাড়টি ভারতের পূর্বস্থ পর্বত শ্রেণীর পশ্চিমস্থ ক্ষুদ্র শাখা। বাঁকুড়ার পাহাড়গুলিও তেমনি বাঙ্গলার পশ্চিমস্থ পর্বতসঙ্কুল দেশের পূর্বদিকস্থ বিক্ষিপ্ত প্রসার মাত্র। ময়নামতী-লালমাই পাহাড়ে প্রস্তরীভূত বৃক্ষাংশ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, লালমাই পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত চণ্ডীমুড়া নামক শিখর চণ্ডী ও অসুরগণের পৌরাণিক সংগ্রামস্থল এবং বহু অসুর এখানে নিহত হইয়াছিল। প্রস্তরীভূত বৃক্ষাংশগুলিকে লোকে তাই অসুরের অস্থি বলিয়া থাকে।

নব্যজীবক যুগের পঞ্চম যুগের নাম ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের সংজ্ঞানুসারে Pleistocene বা অন্ত্যাধুনিক যুগ। এই যুগে মানব ভূপৃষ্ঠে দেখা দিয়াছিল।

আমাদের আধুনিক সভ্যতাকে পূর্বে একবার ৮।১০ হাজার বছরের শিশু সভ্যতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। বস্তুতঃ ভূতত্ত্বের কারবারই হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ বছর লইয়া। প্রত্নতত্ত্বের মূলধন বর্তমান জগতের কোন দেশেই হাজারদশেক বছরের বেশী নহে। অন্য দেশের কথা ছাড়িয়া আমাদের দেশের কথাই ধরা যাউক। মহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পায় লুপ্ত সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারে ভারতে আর্য আগমনের কালের একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া গিয়াছে এই যে, উহা ২০০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দের বেশী আগে হইবে না। উহার পূর্ববর্তী দ্রাবিড় সভ্যতার আরম্ভও ৫০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের বেশী আগে লইয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে। কাজেই বর্তমান ১৯৪৫ যোগ করিয়া ভারতে সভ্যতার ইতিহাসের বয়স মোট সাত হাজার বৎসর মাত্র।

বাঙ্গলা দেশের সমুদ্রকূল সম্বন্ধে কাহারও কাহারও নিতান্ত ভুল ধারণা আছে যে, রামায়ণ মহাভারতের বর্ণিত যুগেই বুঝি সমুদ্র হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই স্থানে সংক্ষেপে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আমাদের সাত হাজার বছরের (ভূতত্ত্বানুযায়ী অতি ক্ষুদ্র) ঐতিহাসিক যুগে সমুদ্রকূলের বিশেষ কোন পরিবর্তনই হয় নাই। বর্তমানে সমুদ্রকূল যেখানে আছে, ৩০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দেও প্রায় সেইখানেই ছিল। ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভে বরং সমুদ্রকূলস্থ স্থানগুলি বর্তমান অপেক্ষা সমৃদ্ধ ও সমুন্নত ছিল, ষষ্ঠ শতাব্দের ভূমিকম্পই সমুদ্রকূলের বর্তমান অবনতির কারণ।



গুনিনের ওপরে শীতলার ভর হল।

গাঁয়ের বারোয়ারী অশথতলা। তার নীচে পুরাণো বেদীটা প্রদীপের তেলে আর মেটে সিঁদুরে একটা বিচিত্র রঙ ধরেছে। নীল শ্যাওলার ওপর দিয়ে কালো পোড়া তেল ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ছে—একপাশে থকথকে সিঁদুর জমেছে চাপ বাঁধা রক্তের মতো। ধুনোর গন্ধে যেন নিশ্বাস আটকে আসে।

বেদীর ওপরে একখানা কালো পাথর—তার সারা গায়ে ব্রণের চিহ্ন। মারী জননীর প্রতীক। মাঝখান দিয়ে একটা প্রকাণ্ড ফাটল—দেখলে মনে হয় কেউ যেন সেটাকে দুটুকরো করে কেটে ফেলবার চেষ্টা করেছিল। পৌত্তলিকতাদ্বেষী রাঢ়জয়ী মুসলমানেরই তলোয়ারের কোপ পড়েছিল কিনা কে জানে।

ফাল্গুনের রৌদ্রে উদ্ভাসিত এই ভরা দুপুরেও অশথের বিস্তীর্ণ শান্ত ছায়ার নীচে ঘনিয়েছে উগ্রগন্ধী অন্ধকার। ধুনো পুড়ছে—গুগ্গুল পুড়ছে। পট পট করে শব্দ হচ্ছে—কালো ধোঁয়া চক্রাকারে উঠছে সাপের কুণ্ডলীর মতো। ঢাকের গগন-ভেদী বোল বোল উঠছে—ক্যান্ ক্যান্ করে তীক্ষ্ণ পেত্নীর কান্নার মতো স্বর তুলছে কাঁসর। আর তার ভেতরে বসে গুনিন একটানাস্বরে মন্ত্রপাঠ করে যাচ্ছে। তার কতকটা সংস্কৃত, কতকটা বাঙলা, কতকটা দুর্বোধ্য ড় আর ট-এর সমারোহ। অশুদ্ধ উচ্চারণে জোর দিয়ে বলে যাচ্ছে : হাড় কটুন, মাংস চর্বণ—

চারিদিকে মেয়ে-পুরুষের ছোট একটা দল জমেছে। গলায় আঁচল দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেউ, কেউবা তাকিয়ে আছে বিস্ফারিত বিহ্বল দৃষ্টিতে। ঢোল আর কাঁসরের বিরামযতিতে সেই গম্ভীর মন্ত্রনাদটা যেন অলৌকিক হয়ে উঠেছে। ধুনোর ধোঁয়ায় যাদের মাথা ঘুরছে, চোখে যারা দেখছে অন্ধকার—তাদের যেন মনে হচ্ছে ওই কালো পাথরটা হঠাৎ একসারি ধারালো দাঁতশুদ্ধ কালো এক-

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

খানা রক্তাক্ত মুখ মেলে দেবে, আর কড়মড় করে হাড় মাংস চিবোতে সুরু করে দেবে।

—হেই গুনিন, ভালো করে মন্তর পড় বাবা। মার অনুগ্রহ একটু না কমলে যে আর বাঁচি না।

জনতার মধ্য থেকে কার যেন সকাতর অনুনয়। গুনিন একবার পেছন ফিরে তাকালো। মদের নেশায় আর ধুনোর আগুনে চোখ দুটো রাক্ষসের মতো টকটক করছে। প্রকাণ্ড একটা গোলাকার মুখ—খাড়া খাড়া চোয়াল। মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলোয় কপালের আদ্ধেকটা ঢাকা পড়েছে।

যেমন করে ম্যালেরিয়ার ঝাঁকুনি আসে, তেমনি থরথর করে একটা কাঁপন এসে যেন গুনিনের আপাদ-মস্তক ঝাঁকিয়ে দিয়ে গেল। দুহাতে দুটো ধুনুচী নিয়ে উঠে দাঁড়ালো গুনিন—সমস্ত শরীর তার টলছে। তারপরে সুরু হল তাণ্ডব নাচ।

গুনিনের ওপরে শীতলার ভর হয়েছে। মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ করে বেরুচ্ছে একটা বীভৎস চাপা আওয়াজ। কখনো মাটিতে আছড়ে পড়ছে—পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে নেচে চলেছে রুদ্রতালে। ঝাঁকড়া চুলগুলো থেকে ধুলোর ঝড় উড়ছে। ফটাস করে একটা ধুনুচী মাটিতে পড়ে দুখানা হয়ে গেল—চারদিকে ছিটকে গেল আগুন। 'সর সর' করে লোক পালিয়ে যেতে পথ পেল না।

গুনিন আবার উঠেছে—আবার নাচ সুরু করেছে। কিন্তু নাচের তালে কেন যেন ভাঁটা পড়েছে এবার। পা আর তেমনভাবে চলছে না। মুখ থেকে চাপা গোঙানির শব্দটা কেমন বিকৃত আর অস্বাভাবিক বোধ হচ্ছে। জ্বলন্ত চোখ দুটো যেন ঝিমিয়ে আসছে ক্রমশ।

এবারে গুনিন থেমে দাঁড়ালো। টলমল করে কাঁপতে লাগল তার সর্বশরীর। তারপর ঠিক ইচ্ছে করে নয়—পেছন থেকে কে যেন মস্ত একটা ধাক্কা দিয়ে তাকে ঘাড় মুচড়ে ফেলে দিলে মাটিতে। চারপাশের জনতা চঞ্চল হয়ে উঠল। কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগছে—যা হওয়া উচিত এ তো তা নয়। বিস্ফারিত ভয়ার্ত-চোখে গুনিন কিছুক্ষণ গোঁ গোঁ করতে লাগল, কষ দিয়ে ফেনার সঙ্গে বেরিয়ে এল এক ঝলক রক্ত। বলি দেওয়া পশুর মতো বার কয়েক হাত পা ছুঁড়েই সে সটান শক্ত হয়ে গেল। সমস্ত শরীরের ঢেউয়ের মতো দোলা দিয়ে বেরিয়ে এল অন্তিম একটা দীর্ঘশ্বাস—নাকের সামনে থেকে খানিকটা ধুলো উড়ে গেল হাওয়ায়।

হৈ হৈ করে ছুটে এল জনতা। কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। মরে পাথর হয়ে গেছে গুনিন।

ঢাকের বোল থেমে গেল, স্তব্ধ হয়ে গেল কাঁসরের আর্তনাদ। স্তম্ভিত জনতা এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ, নিদারুণ ভয়ে একটি কথাও কেউ বলতে পারলে না।

একজন বললে, নিশ্চয় অশুচি হয়ে পুজোয় বসেছিল, তাই—

ধুনোর অন্ধকারে ব্রণ-চিহ্নিত শীতলার পাথরটা গাঢ় রক্তের মতো খানিক সিঁদুর মেখে ক্ষুধার্ত হয়ে তাকিয়ে আছে। অশ্বত্থের পাতায় শাঁ শাঁ একটা উদাস বাতাস বয়ে গেল। যেন একটা অশরীরী কণ্ঠ চাপা গর্জন করে বলে গেলঃ এবার তোদের পালা, গুনিনের মতো তোরাও—

মুহূর্তে বারোয়ারীতলা জনশূন্য। প্রাণ নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছে সকলে। শুধু অসমাপ্ত পুজোর উপকরণের সামনে নিঃস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল গুনিনের দেহটা। মুখের পাশে রক্তের চাঁপ ক্রমে ঘন হয়ে উঠতে লাগল—ধূপ আর গুগ্গুলের ধোঁয়া একটা কালো পর্দার মতো নিবিড় হয়ে নামতে লাগল তার চারপাশে।

* * *

গুনিনের আসল নাম অভিরাম দাস—জাতিতে অন্ত্যজ।

এই জাতিটা নাকি বর্ণসঙ্করের কঠিনতম শাস্তির প্রতীক। প্রতিলোম বিবাহকে ক্ষমা করবে না ব্রাহ্মণ-চালিত সমাজ, ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়ে অব্রাহ্মণকে পতিরূপে বরণ করলে তাদের সন্তান হবে অন্ত্যজ। সমাজের সমস্ত পথ তার কাছে বন্ধ হয়ে যাবে। তাকে শ্মশানে বাস করতে হবে, অখাদ্য আহার করতে হবে, মড়ার কাপড় নিয়ে লজ্জা নিবারণ করতে হবে। তাদের ছায়া মাড়ালে খণ্ডে যাবে—খয়ে যাবে সতেরো-বার বিশ্বনাথ দর্শনের পুণ্য।

আজকাল অবশ্য অন্ত্যজ মাত্রেই শ্মশানের বাসিন্দা নয়। কিছু কিছু পদোন্নতি যে তাদের হয়েছে তাতে আর সন্দেহ কী। এখন তারা ভদ্রপাড়ার কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে কিছুটা। শুয়োর চরায়, ডালা কুলো ধুচুনি তৈরী করে, ভদ্রসমাজের দৈনন্দিনের পক্ষে সেগুলো অপরিহার্য। কেউ কেউ ক্ষেত করে, তরি-তরকারী লাগায়, বিক্রী করে বাজারে। দু'একটা ভালো ফল-ফুলুরি উপহার দিলে ন্যায়রত্ন স্মৃতিরত্নেরা খুশি মনেই সেগুলো গ্রহণ করে থাকেন, অবশ্য নেবার সময় কিছু কিছু গঙ্গা-জল ছিটিয়ে দেওয়া হয় তাতে। কিন্তু এছাড়াও আর একটা দিক আছে এদের। সে জন্যে ইতর ভদ্র নির্বিচারে ভয় করে এদের—শ্রদ্ধা করে। এরা মন্ত্রসিদ্ধ।

অভিরামের বাপ নিধিরাম ছিল এ তল্লাটের সেরা গুনিন। না জানত এমন মন্ত্র নেই, না পারত এমন ঝাড়ফুঁক নেই। কুকুরে কামড়েছে, একটুখানি জলপড়ায় সে তা ভালো করে দিত। সাপে ছোবল মেরেছে—পিঠের ওপর পেতলের থালা আটকে দিয়ে তার ওপর মন্ত্রপড়া মাটি ছড়িয়ে সে বিষ নামিয়ে নিত। ভূতে ধরলে তো আর কথাই নেই, নিধিরাম না গেলে কার সাধ্য সে ভূত নামায়। বাণ মারতে পারত, বাটি চালান করতে পারত, জ্বলন্ত একটা প্রদীপ আকাশে উড়িয়ে দিয়ে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে দিতে পারত দূরের কোনো একটা নিশ্চিন্ত নিদ্রিত গ্রামে।

তা ছাড়া বংশানুক্রমিক ভাবে তারা বারোয়ারী শীতলার পূজারী। শুধু পূজারী নয়, দেবীর প্রসাদপুষ্ট। কোনো এক অতীত অনার্য সংস্কৃতির ধারায় অন্তত এখানে ওদের অধিকার অব্যাহত। কোন্ অনাদিকাল থেকে এরা শীতলার পুজো করে আসছে কেউ বলতে পারে না। ব্রাহ্মণের প্রবেশ নিষেধ। শোনা যায় কিছুদিন আগে তন্ত্রসিদ্ধ এক ব্রাহ্মণ এসেছিলেন গাঁয়ে। অন্ত্যজে দেবীর পুজো করে শুনে তিনি ক্ষেপে উঠলেন। বললেন, দেবী অশুচি—তাঁকে শোধন করে নিয়ে ব্রাহ্মণকে দিয়ে পুজো করাতে হবে।

গাঁয়ের লোকে নিষেধ করলে, কিন্তু দাম্ভিক তন্ত্রসিদ্ধ সে কথা শুনলেন না। দেবী শোধনের ব্যবস্থা করে পুজোয় বসলেন তিনি। আর পরমুহূর্তেই আশ্চর্যকাণ্ড। কোথা থেকে প্রকাণ্ড একটা চড় বাজের মতো শব্দ করে তাঁর গালে এসে পড়ল। অদৃশ্যহাতের সেই চড় খেয়ে ব্রাহ্মণ যে উলটে পড়ে গেলেন, আর উঠলেন না।

সেই থেকে অন্ত্যজেরা এখানে পুজো করবার কায়েমি অধিকার পেয়েছে। খাতির বেড়েছে তাদের, খ্যাতি বেড়েছে আরো অনেক বেশি। গাঁয়ের উঁচু জাতেরা অসংকোচে অন্ত্যজের দেবীকে পুজো করেন, অন্ত্যজ পূজারীর ছোঁয়া প্রসাদ পান। আর বসন্ত চিকিৎসার ব্যাপারে অধিকার তো তাদের একচেটিয়া।

কোথা থেকে একদিন পেতনী নামিয়ে এসে ভরা দুপুরের সময় নিধিরাম ঢকঢক করে এক ঘটি জল খেল। আর মারাও গেল তার ঘণ্টা-খানিক পরেই। দু'চারজন লোক মুখে বললে, সর্দিগর্মি, কিন্তু সকলেই মনে প্রাণে বিশ্বাস

করে নিলে রোজার ঘাড় ভূতেই মটকেছে শেষ পর্যন্ত।

তার ছেলে অভিরাম। বাপের মতো তারও এমনি হঠাৎ মৃত্যু ঘটে গেল। আশ্চর্য হবার কিছু নেই—এ যেন ইতিহাসের সহজ এবং স্বাভাবিক ধারা। কিন্তু তারও আগে আরো একটু গল্প আছে।

বাঙলা দেশের ওপর দিয়ে মহামন্বন্তর বয়ে গেল।

যারা যাওয়ার তারা তো মরে বাঁচল, কিন্তু যারা রয়ে গেল, তাদের দুর্গতির আর সীমা রইল না। শ্মশান বাঙলার গ্রামে গ্রামে শ্মশানের প্রেতের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল মানুষ। এক মুঠো কাঁকর মেশানো ভাত সম্বল, এক ফালি ছেঁড়া ন্যাকড়া সম্বল। রাতারাতি যেন সবাই মায়া প্রপঞ্চময় সংসারটাকে চিনেও ফেলেছে—দেহে মনে, বেশে বাসে অনাসক্ত বৈরাগ্য। চোখের দৃষ্টি অর্থহীন—যেন বাইরের অবাস্তব পৃথিবীটার ফাঁকিটা ধরে ফেলে ব্রহ্মলাভের জন্যে একান্তভাবে অন্তর্মুখী হয়ে গেছে।

শাস্ত্রে বলেছে সবই যখন 'নলিনীদলগত-জলমিব'—তখন একটি মাত্র ভরসা আছে। সেটি হচ্ছে সাধুসঙ্গ এবং তার দ্বারাই ভবার্ণব পার হওয়া যায়। এবং ঈশ্বর করুণাময়—সাধুসঙ্গ তিনি পাঠালেন।

দুর্ভিক্ষ যখন শেষ হয়ে গেল তখন দেশের লোককে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সরকারী ধানের গোলা বসতে লাগল এখানে



ওখানে। এল লাইসেন্সপ্রাপ্ত সরকারী এজেন্টের দল-মহাজনের করাল গ্রাস থেকে দেশকে বাঁচাবার মহৎ ব্রত নিয়েছে তারা। তার সঙ্গে এল সিভিল সাপ্লাই ইন্সপেক্টার, এল বোট অফিসার, এল এনফোর্সমেন্ট—কে এল এবং কে এল না!

এখান থেকে বারো মাইল দূরে ধান-চালের মস্ত বড় একটা গঞ্জ। তার পাশ দিয়ে যে নদী, বর্ষার সময় ছাড়া তাতে নৌকো চলে না। হাঁটু জলের ওপর যে পরিমাণে কচুরির স্তূপ জমে ওঠে, তাতে বরং মোটর চালিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু নৌকোর প্রশ্ন অবান্তর। অতএব—

অতএব রাস্তা তৈরী করতে হবে।

সে কাজ নিলে কৃষ্ণপ্রসাদ। গৌরী সেনের টাকা—অফুরন্ত এবং অকৃপণ। একবার টেণ্ডার নেওয়াতে পারলে আর ভাবনা নেই। পরবর্তী পথটুকু মসৃণ—তৈলাক্ত।

ধানের আল আর মজা দীঘির পাশ দিয়ে কৃষ্ণপ্রসাদ সাইকেল চালিয়ে এল। বারোয়ারী অশথতলায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালো। ভারী ভালো লাগছে ঠাণ্ডা ছায়া আর ঠাণ্ডা বাতাসটা।

—আপনি, হুজুর?

মস্ত একটা প্রণাম জানিয়ে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলে অভিরাম।

—আমি? বাঁ হাতটাকে হাফপ্যাণ্টের পকেটে পুরে কৃষ্ণপ্রসাদ সিগারেটের ধোঁয়া উড়াতে লাগল। বললে, সরকারী লোক।



রাস্তা করতে হবে এখানে—আঠারো মাইল মোটরের রাস্তা। সরকারী লরী যাবে, গাড়ি যাবে, বুঝেছ?

—রাস্তা হুজুর?

—নিশ্চয়। মুখস্ত করা বুলির মতো কৃষ্ণপ্রসাদ বলে গেলঃ দেশের ভালোর জন্যেই। ধানচালের ইজি সাপ্লাই হবে গ্রামের উন্নতি হবে, ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষের পথ বন্ধ হবে। একেবারে পাকাপাকি বন্দোবস্ত। অভিরাম বিস্মিতমুখে তাকিয়ে রইল। কৃষ্ণপ্রসাদ যেন আকাশ থেকে কথা বলছে। দেশটাকে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে নিস্তার দেবার জন্য স্বর্গ থেকে মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছে হাফপ্যাণ্টপরা সাইকেলধারী একটি দেবতা। অশথতলায় পাথরের শীতলা নিদ্রিত হয়েই আছেন, কিন্তু ইনি যেমন জাগ্রত, তেমনি মুখর।

ভাবতে পারা যায় রাস্তা তৈরী হবে এই গ্রামের মধ্য দিয়ে? যেখান দিয়ে কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে রেল গাড়ি চলে যায়, তার চাকায় চাকায় চলে মুখর সভ্যতার গর্জন, সে এখানে থেকে কতদূরে! একটা মরা নদীর খেয়া, তিনখানা হাট, ছ'খানা মাঠ, আরো এক ক্রোশ জেলাবোর্ডের পথ। এখানকার মানুষ যেন রাস্তা বেঁধেছে জীবনের তটতীর থেকে বিচ্ছিন্ন একটা দ্বীপের মধ্যে। একটা প্রাইমারী ইস্কুল—সেও দু'মাইল দূরে। রাত্রির অন্ধকারে বহু দূর থেকে যেমন মহানগরীর মাথার ওপরে একটা স্বচ্ছ জ্যোতির্মণ্ডল দেখা যায় এখান থেকেও তেমনি নাগরিক জীবনের একটা দুর্লক্ষ্য জ্যোতিঃসংকেত অনুভব করা চলে মাত্র। তবু চৌকীদারী ট্যাক্স আসে; তামাকের ওপরে, দেশলাইয়ের ওপরে নতুন খাজনা আসে, শহরের তৈরী লোভের কারখানা থেকে মন্বন্তর আসে। এখানে আমদানী নেই—এ শুধু রপ্তানির দেশ।

এখানে রাস্তা হবে, গ্রামের উন্নতি হবে।

কী রোমাঞ্চকর অনুভূতি! শুধু অভিরাম নয়, অভিরামের তো দু'চারজন নয়। সমস্ত গ্রামটাই আনন্দিত বিস্ময়ে সজাগ হয়ে উঠল। আর সেই বিস্মিত আনন্দকে তটস্থ করে দিয়ে মাঠের পাশ দিয়ে একরাশ তাঁবু পড়ে গেল। যেন উড়ে এল হাওয়াতে।

পাঁচশো বছর আগে শীতলার থানে মুসলমানের তলোয়ারের ঘা পড়েছিল—তারপরে আর কোনো জীবন চাঞ্চল্য জাগেনি এখানে। পাঁচশো বছরের মরা গাঙে নতুন করে জোয়ার এল। সেদিন এসেছিল রাষ্ট্রবিপ্লবে, আজ এল মন্বন্তরে।

অশথগাছের ঠাণ্ডা ছায়ার নীচে দাঁড়িয়ে হীরালাল বাগদী বললে, কারবারটি একবার দেখেছ গুনিন ভাই?

অভিরাম সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিল। বললে হুঁ।

—উঃ কী পেল্লায় কাণ্ড করছে রে বাবা। বনজঙ্গল গাছ পালা সব লোপাট করে দিয়ে সড়ক বানাচ্ছে। মানুষের নাকি আর ভাতের দুঃখু থাকবে না। এই যদি মনে ছিল-রে বাপু, তা হলে কটা দিন আগে এলিনে কেন? সব সাবাড় করে দিয়ে—

—তখন তো ওদের সময় হয়নি।

—ওদের সময় হয় একটু দেরীতে, তাই না?—হীরালাল রসিকতার চেষ্টা করলেঃ সিঁদেল চোরে সব লোপাট করে নিয়ে তিন মাইল ডাঙা পেরিয়ে গেলে চৌকীদারে এসে হাঁক পাড়ে।

অভিরাম জবাব দিলে না—কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। সামনে যা চলছে তা প্রলয়-কাণ্ডই বটে। পাথরের মতো শক্ত টিলা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে—সাফ হয়ে যাচ্ছে জঙ্গল, আদ্যিকালের পচা ডোবাগুলো দেখতে দেখতে ভরাট হয়ে গেল, আর নাকি ম্যালেরিয়া থাকবে না দেশে। শাবল, গাঁইতি, কোদাল। একশো কুলি খাটছে—শব্দ উঠছে ঝপ্-ঝপ্ ঝপাস, ঠন-ঠন ঠনাঠ্ঠন। কোদালের মুখে মাটির তলা থেকে বাদামী রঙের মানুষের হাড় উঠে আসছে, পাঁচশো বছর আগেকার হাড় কি-না কে জানে!

চোখ দুটোকে হঠাৎ সংকুচিত করে আনলে অভিরাম। মোটা মোটা ভ্রূদুটো এক সঙ্গে এসে যোগ হয়ে গেল, তার ওপরে রেখা ফুটল একটা অর্ধবৃত্তের আকারে।

—লক্ষণ আমার ভালো লাগছে না হীরু।

—কেন গুনিন ভাই, কেন?

কী জানি কেন। অভিরাম নিজেও জানে



না। হয়তো এই আকস্মিকতাকে ভয়—হয়তো এই নতুনকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। গাঁইতি আর কোদালের মুখে পুরোনো মাটি যেন যন্ত্রণায় কেঁদে উঠছে, যেন অভিশাপ দিচ্ছে। অথবা এ হয়তো ওর রক্তার্জিত সংস্কার। আকাশে বাতাসে যেসব অশরীরী শক্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই সভ্যতা বর্জিত নগণ্য গ্রামে যাদের ছিল একাধিপত্য; রাতদুপুরে যারা অকারণে ঝপঝপ সর সর করে প্রকাণ্ড বটগাছের ডাল-পালাগুলোকে ঝাঁকিয়ে দিত, ভরা অমাবস্যায় মড়ার মাথা নিয়ে যারা শ্মশানে খটাখট করে গেণ্ডুয়া খেলত আর খিলখিল্ করে হাসত, কিংবা পুরোনো দীঘির ধারে যাদের মুখে লকলক করে আগুন জ্বলে উঠত—তারাই কি প্রেতসিদ্ধ গুনিনের অনুভূতির ওপরে সঞ্চারিত করছে তাদের অলৌকিক প্রতিবাদ?

রহস্যময় মুখখানাকে আরো রহস্যময় করে গুনিন বললে, সে যাক।

ওদিকে রাস্তা তৈরী হয়ে চলেছে: চমৎকার রাস্তা—উঁচু নীচু অসমতল মাটিকে দীর্ণবিদীর্ণ করে দিয়ে সরকারী লরীর মসৃণ মনোরম চলবার পথ। রাজপথ।

কিন্তু কাজ এগোতে পারছে না। কৃষ্ণপ্রসাদ হিসেব করে দেখলে এভাবে চললে বাঁধা সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হবে না। ওপরওলা আর কর্তাদের কাছ থেকে তাগিদের পর তাগিদ আসছে। অতএব আরো লোক চাই। ঝড়ের গতিতে কাজ শেষ করো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পথ তৈরী করে দাও। যুদ্ধ—খাদ্য-সংকট—এমার্জেন্সি।

কুলির জন্যে খবর গেল সদরে। কিন্তু কুলিরও বাজার দর বেড়েছে—বর্মা থেকে আসামফ্রন্ট পর্যন্ত তাদের চাহিদা। আরো এই অজগর বিজেবনে লোক পাঠানোর বন্দোবস্ত করতে শক্ত। সুতরাং সদর থেকে পালটা খবর এলঃ লোক্যাল রিক্রুট করো।

কৃষ্ণপ্রসাদের স্বর্গীয় আভিজাত্য আর রইল না। খাকি হাফপ্যান্টের নীচে হাঁটু পর্যন্ত জমে উঠল ধুলো। ঘরে ঘরে তাগিদ পড়লঃ এসো তোমরা, কাজে লেগে যাও সবাই।

সকলের হয়ে এগিয়ে এল অভিরাম।

—কুলির কাজ আমরা করব না হুজুর।

বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে কৃষ্ণপ্রসাদ বললে কেন?

—আমাদের বাপ-পিতেমো কখনো মাটিতে কোদাল মারেনি—ছোট কাজ করেনি। সে পারে ছাতুরা, আমরা পারব না।

—ছোট কাজ! কৃষ্ণপ্রসাদ হেসে উঠল হা হা করে। একবেলা খেতে জোটে না—আভিজাত্যের জ্ঞানটা টনটন করছে একেবারে। ঢোঁড়া নয়, হেলে সাপ; কুলোপানা চক্কর নয়—বারকোশপানা।

কিন্তু পরক্ষণেই বেদনায় কৃষ্ণপ্রসাদের গলার স্বর যেন ভারী হয়ে গেল।

ছিঃ, ছিঃ এ কী কুবুদ্ধি তোদের! গায়ে খাটবি, পয়সা পাবি, এতে অপমানের আছে কী। এই জন্যেই না বাঙালীর এমন দুর্দশা। আর এই ঘরপোড়া দুর্বুদ্ধির জন্যেই তো এত লোক না খেয়ে শুকিয়ে মরল। অথচ পশ্চিম থেকে হিন্দুস্থানী কুলি এসে কীভাবে যে বাঙলা দেশকে লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে—

পাঁচ মিনিট একটা দীর্ঘ টানা বক্তৃতা। উদারা, মুদারা এবং তারায়। ঘুরে-ফিরে অতি-কোমল নিখাদে যখন যুক্তিপূর্ণ ভাষণটা সমাপ্ত হল, দেখা গেল আবেগে কৃষ্ণপ্রসাদের চোখের কোণায় কোণায় জলের বিন্দু দেখা দিয়েছে।

—এখনো ভেবে দ্যাখ সবাই। এক বেলাও তো পেট পুরে ভাত জুটছে না তোদের। অথচ কুলিগিরি করে যা মজুরী পাবি তাতে—

অর্ধভুক্ত ক্ষুধিত চোখগুলো লোভে জ্বল-জ্বল করে উঠল। দৃষ্টির সামনে ঝলক দিয়ে গেল সোনালি মরীচিকা। সত্যিই তো, এতে অন্যায়টা তাদের কোন্‌খানে। জমিতে যদি লাঙ্গল ঠেলতে পারে, তাহলে কোদাল মারায় মহাভারত সত্যিই কিছু অশুদ্ধ হয়ে যবে না।

অভিরাম মাথাটা ঝাঁকিয়ে বললে, কিন্তু বাবু—

কিন্তু লোকচরিত্র বোঝে কৃষ্ণপ্রসাদ। অভিরামের সর্বাঙ্গে বিদ্রোহ ঘনিয়েছে—গাঁয়ের লোকের ওপরে তার অপ্রতিহত প্রতিপত্তি, অন্য নতুন লোক এসে সে অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে এটা সে কল্পনাই করতে পারছে না। কিন্তু তার আধিপত্যটা আধ্যাত্মিক—আধিভৌতিক প্রয়োজনের দাবীটা ঢের ঢের বেশি এবং বাস্তব—এই সহজ কথাটুকু বোঝবার বুদ্ধি কৃষ্ণপ্রসাদের আছে।

ঠোঁটের কোণা দুটো একটু বিস্তৃত করে কৃষ্ণপ্রসাদ তীক্ষ্ম সর্পিল হাসি হাসলে। অভিরাম ছাড়া আর সমস্ত মানুষগুলির মুখই একাকার হয়ে গেছে। অলৌকিক ভীতি নয়—লৌকিক ক্ষুধা। লোভে এবং দ্বিধায় তারা বিচলিত হয়ে উঠেছে। মুহূর্তের জন্যে কৃষ্ণপ্রসাদ অনুভব করলে অভিরাম তার প্রতিদ্বন্দ্বী তার ক্ষমতা-লাভের পথে প্রতিপক্ষ। কিন্তু কৃষ্ণপ্রসাদের হাসিটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে আরো খানিকটা বিকীর্ণ হয়ে পড়লঃ শেষ পর্যন্ত জয় হবে তারই।

পকেট থেকে কালো চামড়ার নোট বই বেরুল।—বলো, কে কে রাজী আছো।

একবার কৃষ্ণপ্রসাদ আর একবার অভিরামের মুখের দিকে তাকালো সকলে। অভিরামের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, শক্ত হয়ে উঠেছে খাড়া

চোয়াল। যেন কে নাম লেখাবে, বাঘের মতো তারই ঘাড়ের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়বে সে।

কিন্তু জয় হল অপদেবতার নয়—সরকারী কন্ট্রাক্টারের। কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল নিষ্কম্প স্তব্ধতায়। তারপর গলাটা সাফ করে নিয়ে হীরালাল বললে, লিখুন—

অভিরাম নড়ে উঠল। দুটো চোখ থেকে এক ঝলক আগুন বৃষ্টি করলে যেন। তারপর হনহন করে হেঁটে চলে গেল।

এবারে শব্দ করে হেসে উঠল কৃষ্ণপ্রসাদঃ লোকটা পাগল নাকি?

গাঁয়ের লোক সে হাসিতে যোগ দিল না।

গুনিনের চোখের সামনে দিয়েই সরকারী রাস্তা তৈরী হয়ে চলল।সবাই খাটে সেখানে হীরালাল, মতিলাল, জনক। তিনচার দিনের মধ্যেই হালচাল বদলে গেছে তাদের। রাতারাতি সব বড় মানুষ। গাঁয়ের দুঃখ দূর হল এতদিনে। কৃষ্ণপ্রসাদের বক্তৃতায় ফাঁকি নেই। দেশের দুঃখে ঝরে-পড়া তার চোখের জল যে নিঃসন্দেহে আদি এবং অকৃত্রিম, এ সম্পর্কে মনে আর কেউ সন্দেহ পোষণ করেন না।

এক পয়সার বিড়ি জুটত না কোনকালে পোড়া বিড়ি কুড়িয়ে নিয়ে ধূমপানের তৃষ্ণাটা নিবারণ করত জনক। সেই এসে হাজির হল এক বাক্স সিগারেট নিয়ে। বললে, নাও গুনিন —একটা সিগারেট নাও। ভালো জিনিস— ঠিকাদারবাবু দিয়েছে।

অসীম বিরক্তিভরে অভিরাম বললে, নাঃ।

—না? কেন, আপত্তিটা কিসের? সত্যি দাদা, তুমিই ঠকলে। খালি ভূত ঝাড়লেই কি পেটের ব্যবস্থা হয় আজকাল? চলে এসো, আমাদের সঙ্গে দু কোপ মাটি তোলো, দিন-মজুরী দুটো টাকা তোমার রোখে কে?

—একটা চড় মেরে তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।

আস্তে আস্তে জনক পিছু হটতে লাগল। ভীরু গলায় বললে, কেন—কেন অন্যায়টা কী বলেছি। সবাই যখন দু-পয়সা করে নিচ্ছে—

দু পয়সা!—হঠাৎ রাক্ষসের মতো গলায় গুনিন গর্জে উঠল ঃ নিজের মান-সম্মান বিসর্জ্জোন দিয়ে অমন পয়সার মুখে লাথি মারি আমি। ভাবিসনি, এ সুখ তোদের সইবে। মা শীতলে জেগেই আছেন—জানলি, ধর্মের গাঁয়ে এ অধর্মো তিনি সইবেন না।

জনকের বুকের মধ্যটা কেঁপে গেল। শাপ দিচ্ছে নাকি গুনিন! মন্ত্রসিদ্ধ ভূতসিদ্ধ লোক সে, তার অসাধ্য কুকাজ নেই। একি শুধু কথার কথাই—না এমনিভাবে দেশশুদ্ধু লোকের সর্বনাশ করবার মতলব আঁটছে সে! কিন্তু কেন? এমন কি অপরাধ করেছে তারা। ঘরের ভেতর ছটফটিয়ে মরলেও যখন একটিবার কেউ ডেকে জিগেস্ করে না কিংবা এক ফোঁটা জল দেয় না খেতে, তখন গায়ে গতরে খেটে দুটো পয়সা রোজগার করলে কার কী বলবার আছে। অথচ কেন এমন করছে গুনিন, কেন সে এমনভাবে হিংস্র হয়ে উঠেছে! জনক কিছু বুঝে উঠতে পারল না।

কিন্তু সর্ষের মধ্যেই যে ভূতে ধরেছে সে খবর অভিরামের জানা ছিল না।

সন্ধ্যার সময় গুনিনের বউ পদ্মা এসে সামনে দাঁড়াল। বললে, একটা কথা বলব?

কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়ে অভিরাম ডালা বুনছিল। বললে, কী বলবি?

গাঁয়ের মেয়েরা তো সবাই রাস্তায় কাজ করতে যাচ্ছে। দু পয়সা পাচ্ছেও। তাই—

তাই?—হাতের ডালাটা নামিয়ে রেখে সন্দিগ্ধ উগ্র চোখে তাকালো অভিরাম। চোয়ালের হাড় দুটো কঠিন হয়ে উঠেছে, মাথার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলো নেমে এসেছে কপাল ছাড়িয়ে। অগ্নিগর্ভ স্বরে বললে, তাতে কী হয়েছে!

ডালা-কুলো বেচে আর ভূত ঝেড়ে তো সংসার চলে না। যা আকাল পড়েছে! আমিও যদি ওখানে গিয়ে কাজ করি, তা হলে অন্তত একটা করে টাকা—

অভিরাম তীরের মতো খাড়া হয়ে দাঁড়ালো।

—খবরদার, খবরদার পদ্মা। ওকথা আর একবার মুখে আনবি তো সোজা খুন হয়ে যাবি। গুনিনের বংশ আমরা। মা শীতলের দয়া আমাদের ওপরে। ঘরে না খেয়ে মরে থাকবো সে-ও ভালো; কিন্তু ওসবের মধ্যে আমরা নেই। গোলামী করি না আমরা—ছোট কাজ করি না।

অন্ত্যজের ঘরের সুন্দরী বউ পদ্মা ঠোঁট ওলটালো। স্বাস্থ্যপুষ্ট কালো শরীরটা যেন নদীর জলের মতো ছলছলিয়ে উঠল চাঞ্চল্যে এবং অবিশ্বাসে।

—তোমার মান নিয়েই তুমি গেলে। সবাই যখন কাজ গুছিয়ে নিলে, তখন—

পদ্মাকে মারবার জন্যে একটা ব্যাঘ্রমুষ্টি তুললে অভিরাম। আর সেই মুহূর্তেই বাইরে থেকে ডাক পড়ল, গুনিন—গুনিন?

—কে?

অপরাধী গলায় উত্তর এল ঃ আমি হীরালাল।

একটা ঘোমটা টেনে ঘরের মধ্যে সরে গেল পদ্মা, আর কেরোসিনের অনুজ্জ্বল আলোর সামনে হীরালাল এসে দাঁড়ালো। চোখ দুটো ভীতিতে বিস্ফারিত এবং বিহ্বল।

—কী হয়েছে?

—একবার এসো ভাই। আমার বড় মেয়েটার যেন কী হয়েছে। জ্বর নেই, জারি নেই, সন্ধ্যে থেকে কেবল তড়পাচ্ছে আর থেকে থেকে চোখ উলটে আসছে। তুমি একবার চলো।—হীরালালের গলা কান্নায় কাঁপছে।

হুঁ, এবার গুনিনকে মনে পড়েছে তা হলে।



রাগ কোরোনা ভাই চলো। তুমি রাগ করলে আমরা কোথায় দাঁড়াই।

একটা বিরাট আত্মপ্রসাদ ভরে উঠল অভিরামের মন। খালি কৃষ্ণপ্রসাদ নয়, তারও দাম আছে, তারও প্রয়োজন আছে। এ তাদের বংশগত অধিকার মা-শীতলার অনুগ্রহে আধিব্যাধি সারাবার দায়িত্ব একমাত্র তাদেরই। পেটের ক্ষিদে মেটাবার লোভ দেখিয়ে কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রামের লোককে বশীভূত করতে পারে, কিন্তু যে শত্রুকে চোখে দেখা যায় না, তার বেলায় মা ওলাইচন্ডী আর মা শীতলার যে সমস্ত অনুচর দৃষ্টির অলক্ষ্যে মৃত্যুবান নিয়ে ঘুরছে, তাদের হাত থেকে বিপন্ন মানুষকে রক্ষা করতে পারে কে? অন্ধকার শ্যাওড়া গাছে যাদের আস্তানা কিংবা এলোচুলে ভর সন্ধ্যেতে পুকুর ঘাটে গেলে যাদের নজর পড়বেই—কোনো সরকারী ঠিকাদারের সাধ্য নেই যে মুঠো মুঠো টাকা ছড়িয়ে দিয়ে তাদের বশীভূত করতে পারে।

ছোট বেতের ঝাঁপিটা তুলে নিয়ে অভিরাম বললে, চলো।

হীরালালের দাওয়ায় তখন লোকারণ্য। ছোট মেয়েটা পাগলের মতো ছটফট করছে, গড়াচ্ছে, কষ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফেনা। অমানুষিক দুটো বড় বড় চোখ মেলে তাকাচ্ছে, আর থেকে থেকে উঠছে প্রচন্ড এক একটা হিক্কার ধমক। হীরালালের বউ মড়া-কান্নার রোল তুলেছে তারস্বরে।

কটমট করে খানিকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল অভিরাম। তারপর সংক্ষেপে বললে, হুঁ, পেত্নীতে পেয়েছে।

বাড়িময় কোলাহল—কান্নার রোল আরো প্রবল হয়ে উঠল। গুনিন প্রকান্ড একটা ধমক দিয়ে বললে, চুপ। কিছু শর্ষের জোগাড় করো।

ভূত ঝাড়া সুরু হল। সর্ষের পর সর্ষের প্রহার—সর্বাঙ্গে জলের ছিটে। কিন্তু পেত্নীর নামবার লক্ষণ নেই। মেয়েটা তেমনি করেই দাওয়াময় গড়িয়ে বেড়াচ্ছে। থেকে থেকে এমন এক একটা হিক্কা উঠছে যে, সন্দেহ হয় কখন তার দম আটকে যাবে।

অভিরামের কপালে ঘাম জমে উঠতে লাগল। সংশয়ে ভরে যাচ্ছে মন। কিছুতেই কিছু হবার লক্ষণ নয়। সমস্ত বাড়িময় কালো অন্ধকার ঘনিয়েছে—ছোট আলোটা মিট মিট করছে, নিবে যাবে এক্ষুনি। আর সেই অস্পষ্ট আলোয় মেয়েটার দুটো ভয়াবহ চোখ দেখে তারই অন্তরাত্মা শিউরে উঠল। কামরূপ-কামিখ্যের ডাকিনীর আদেশ কোনো কাজে লাগছে না, বাঁচানো গেল না মেয়েটাকে।

টর্চের জোরদার আলো পড়ল প্রায়ান্ধকার প্রাঙ্গণে। জুতোর মচমচ শব্দ করে এসে ঢুকেছে কৃষ্ণপ্রসাদ। সঙ্গে আরো একটি ভদ্রলোক।

কৃষ্ণপ্রসাদ হাসল ঃ তোমার মেয়ের অসুখের খবর শুনে ডাক্তার নিয়ে এলাম হীরালাল। আমারি বন্ধু—এদিকে কাজে এসেছিলেন। সুবিধেই হলো তোমার।

হীরালাল দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বললে, গুনিন্ ওকে ঝাড়ছিল কিনা হুজুর, তাই—

ডাক্তার তাচ্ছিল্যভরে বললে, হ্যাং ইয়োর গুনিন। ওসব বুজরুকিতে কাজ চলে না, রোগও সারে না। তোমার ওই ঝুলি কাঁথা নিয়ে সরে দাঁড়াও তো বাপু, আমি একবার দেখি।

বিদ্রোহী ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে অভিরাম বসে রইল। এক তিল নড়ল না।

কৃষ্ণপ্রসাদ টর্চের আলোটা অভিরামের মুখের ওপর ফেলল ঃ একটু সরে বসো তুমি। অনেক তো করলে, কিছু পারলে না দেখতেই পাচ্ছি। এবার ডাক্তারবাবুকে দেখতে দাও।

অভিরাম তবুও নড়ে না। বললে, আমাকে ডেকে এনেছে হীরালাল। আমি ঝাড়ব একে— কোনো ডাক্তার-ফাক্তারের পরোয়া রাখি ঃ আমি।

—নন্‌সেন্স—ইডিয়ট!—নতুন ডাক্ত ধৈর্যচ্যুতি হল ঃ রোগীকে মেরে ফেলবে লোকটা? এদের নামে ক্রিমিন্যাল কে দেওয়া উচিত!

অভিরামের মাথায় চড়ে গেল উদ্বেলিত সেই রক্তের উচ্ছ্বাস যে পড়বার উপক্রম করলে দুটো ে একটা অশ্লীল গাল দিয়ে খবর্দার!

মুহূর্তে কোথা ডাক্তার সজোরে জুতো লাথি বসিয়ে দিলে অ ভূত ঝাড়বার সরঞ্জা তিন হাত দূরে ব্যাপারটা যেন ভে যে ঘটতে পারে এ

জনতা নিঃশ বললে, ছিঃ ছিঃ

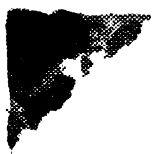
সেন তখন নির্বিকার মুখে করা উচিত, ত পেসেন্টকে মে তার ওপরে ত এক কাজ ক হ্যান্ড্‌-ওভার রেগুলার ঃ মেরে ফেলে

কিন্তু পড়েছিল। স্বাভাবিক হ প্রকোপটা ক সিগারেট ধ

ক্রাইসিস কেটে ত কণ্ঠে ে জোচ্চোরটা গেল তে দুর্লক্ষ

ডাক্তারের লাথি, যেন ছিটকে পড়েছিল গুনিনকার শ কোন ফাঁকে সে উঠে অভিরাম পায়নি। মাথার ক

রাত ঝম ঝম করছে। এ চাঁদ উঠেছে আকাশে, তার মাঠের ওপারে কতগুলে তাঁবুগুলো ঘুমন্ত হ জোরালো আলো



বন্ধ, বিদেশ হইতে স্বাধীনভাবে পণ্যক্রয় নিষিদ্ধ। সরকারী সুদী ঋণপত্র ক্রয় করিয়া সঞ্চয়ের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা যদি স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যে খাটান, ইচ্ছামত বাগানবাড়ী, জমিদারী, মোটর-গাড়ী কিংবা আর কিছু মনোহারী ক্রয় করিয়া ব্যয় করা না যায়, তাহা হইলে সেই অর্থও ভূতের মত ঘাড়ে চাপিয়া নানা কুমন্ত্রণার মন্ত্রী হইয়া বসিবে। জড়বাদী সমাজতন্ত্রে সূক্ষ্ম-তত্ত্বের বা আধ্যাত্মিক আনন্দের স্থান নাই। সুতরাং সেই পথে শান্তি ও সান্ত্বনা লাভের পথও অবরুদ্ধ। এদিকে রুশিয়ার কোন কোন শিল্পে ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত উৎপাদন শুরু হইয়াছে। একদিকে অব্যবহার্য ও অনাচরণীয় অর্থের প্রাচুর্য, অন্যদিকে ক্ষেত্রবিশেষে উৎপাদনের আধিক্য। ইহার পরিণাম সম্ভবতঃ ধনতান্ত্রিক পন্থায় বৈদেশিক বাণিজ্যের পুনঃপত্তন—অর্থাৎ উৎপাদন শুধু দেশবাসীর ভোগের জন্য, অর্থের বিনিময়ে মুনাফার আশায় সর্বত্র বিক্রয়ের জন্য নহে, এই সমাজতান্ত্রিক নীতির পুনঃপরিবর্তন। ইহার অর্থ—ধনতন্ত্রের প্রথম ধাপে সমাজতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন এবং বৈদেশিক বাণিজ্য লইয়া কাড়াকাড়ি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তার পরের ধাপে পুরাপুরি সাম্রাজ্যবাদ ও লড়াই। অবশ্য এই অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া পুনর্মূষিক যাহাতে না হইতে হয় তাহার চেষ্টা ইহারা নিশ্চয়ই করিবে। কিন্তু প্রতিকূল হাওয়া যেভাবে বহিতে শুরু করিয়াছে তাহাতে ইহাদের এই চেষ্টা কতদূর সফল হইবে তদ্বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। সন্দেহের কারণ বলিতেছি। ইহারা ছাঁচে ফেলিয়া লৌহ ঢালাই করার মত মানুষ ও সমাজ গড়িতে চাহিয়াছিল এবং তাহার জন্য পূর্বাহ্ণেই কয়েকটি প্রতিজ্ঞাকে স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে স্বীকার করিয়া লয়। যথা,—(১) দুনিয়ার মানব-সমাজে মাত্র দুই শ্রেণীর মানুষ বাস করে—ধনিক ও শ্রমিক এবং একে অপরের উপর জুলুম করে। ইহা ছাড়া আর কেহ নাই, আর কিছু নাই। (২) মানব-জাতি আদিকাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত দৈহিক ক্ষুধা-সর্বস্ব এবং মানব-সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস হইতেছে মানুষের জীবন-সংগ্রামেরই ইতিহাস মাত্র। ইহার মধ্যে অধ্যাত্মবাদের, আত্মিক ক্ষুধার কিংবা অন্য কোন প্রকার মানসিক ও নৈতিক বৃত্তির প্রভাব বা স্থান নাই। (৩) মানুষের মধ্যে অসাম্য কোন প্রকারেই প্রকৃতিগত বা মৌলিক নহে—সম্পূর্ণরূপে সামাজিক ব্যবস্থার ফল। বর্তমান অসংগত সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনে পুরাপুরি ও স্থায়ী সাম্যলাভ সম্ভবপর। (৪) উদ্দেশ্য মহৎ হইলে সকল পথই পথ—সেখানে ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচার অনাবশ্যক। অর্থাৎ the end justifies the means. (৫) Sense of possession বা "আমার"—জ্ঞানকে সর্বসাধারণের মন হইতে সমূলে উৎপাটন সম্ভব।

এই পাঁচটি প্রতিজ্ঞার উপর ভিত্তি করিয়া ইহারা একদিন গোপনতার গভীর অন্ধকারে এক ভয়ঙ্কর রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়া সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তি বলপূর্বক গ্রহণ করেন এবং রাষ্ট্রের উপর তাহাদের মালিকী স্বত্ব আরোপ করিয়া সকল মানুষকে এক স্তরে নামাইয়া একটি সমানরেখা হইতে সকলে এক সাথে নূতন পথে নূতন করিয়া যাত্রা শুরু করেন। এতদিন যে জীবন-দৌড় চলিয়াছিল, তাহাতে কেহ ছিলেন দুচাকার পা-গাড়ীর উপর, কেহ অশ্ব-যানে, কেহ বা হাওয়া-গাড়ীতে, আবার কেহ আকাশ-রথে। তার মধ্যে ছিল এক বিরাট হতভাগ্যের দল যাদের সম্বল শুধু দুখানা ল্যাগ ব্যাগে ঠ্যাং। তার উপর, কেহ দশ মাইল, কেহ বিশ মাইল, কেহ বা পঞ্চাশ মাইল আগাইয়া রহিয়াছেন। তারপর—ওয়ান, টু-উ-উ, থ্রি। ব্যাস, দৌড় শুরু। কিন্তু হায়! হতভাগ্য পদাতিকরা কি করিয়া অপর সব দলের সংগে দৌড়াইয়া পারিবে। জীবন-সংগ্রামে এরকম অবিচার অসহনীয় ও অমার্জনীয় সন্দেহ নাই। মার্কস্-এঙ্গেলস্-লেনিন ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

করিয়া পৃথিবীর ইতিহাসে পদাতিকদের জন্য নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়া গিয়াছেন নিঃসন্দেহ। কিন্তু বিপদ হইয়াছে এই যে, যাহারা বহু আগে চলিয়া গিয়াছিল তাহাদের টানিয়া আনিয়া পিছনে সকলের সঙ্গে সারবন্দী করিয়া একসঙ্গে যখন স্টার্ট দেওয়া হইল তখনও যে একদল আবার অপর অনেককে পিছনে ফেলিয়া আগে বাড়িয়া যাইতেছে এবং সম্মুখের গাড়ী, ঘোড়া, মোটর যাহা পাইতেছে তাহাতে চড়িয়া বসিয়া পিছনের সহিত ব্যবধান ক্রমেই বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। সমান সুযোগ চাহিয়াছিলাম, পাইয়াছি। ইহা যে বঞ্চিতের দল কোথাও কোনদিন পাইবে আশা ছিল না। বহু ধন্যবাদ রুশ-বিপ্লবকে। কিন্তু এ কি! এই অপূর্ব অপ্রত্যাশিত সুযোগ পাইবার পরও তাহার সুফল আমাদের হাত হইতে এমন করিয়া ফস্‌কাইয়া যাইতেছে কেন? ইহাতে বিস্মিত হইবার বিশেষ কারণ নাই; যেহেতু সকল মানুষকে সমান সুযোগ দান করা এবং সকলকে সর্বকালের জন্য জোর করিয়া সমান করিয়া রাখা এক জিনিস নহে। প্রথমটি বর্তমান কালের সর্বপ্রধান দাবী—সকল সমাজের আশু ও অবশ্য কর্তব্য। দ্বিতীয়টি কিন্তু দুষ্পালনীয় ও দুঃসাধ্য। তাহা করিতে হইলে চীন দেশের মেয়েদের চরণকমলকে ক্ষুদ্রাকৃতি বা পদ্মাকৃতি করিবার জন্য যে লৌহ-পাদুকার ব্যবস্থা ছিল সেইরূপ লৌহ-নিগড়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবেই সম্ভবত সকল পদের ন্যায় সকল শিরও সমান থাকিবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রকৃতির প্রতিকূলে এই লড়াই টিকিবে কি এবং তাহা হইতে বাঞ্ছিত সুফলই বা পাওয়া যাইবে কি? সেই জন্যই গান্ধীজী প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছেনঃ—My ideal is equal distribution, but so far as I can see, it is not to be realised. I, therefore, work for equitable distribution." ইহাও বলিয়াছেন, "The idea of inequality, of 'high and low' is an evil, but I do not believe in eradicating evil from the human breast at the point of the bayonet. The human breast does not lend itself to that means."

মোট কথা, inequalityকে সম্পূর্ণ দূর করা, সকল মানুষের কর্মক্ষমতা, অর্থোপায় ও প্রতিপত্তিকে একেবারে একই স্তরে নিশ্চল স্থির করিয়া ধরিয়া রাখা কখনো সম্ভব নহে। ইহাদের অত্যাচারকে দূর করা সম্ভব এবং অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু তাহা জোর করিয়া পাশবিক বা সশস্ত্র বলের সাহায্যে সম্পন্ন করিতে গেলে সাময়িক ফল পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার শেষ পরিণাম শুভ হইবে বলিয়া গান্ধীজী বিশ্বাস করেন না, আমরাও করি না।

মানব-সমাজ মাত্র দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত—ধনিক ও শ্রমিক, এই অবসেসন বা ভাবাবেশ সোশ্যালিজম চিন্তাধারার মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টির জন্য অনেকখানি দায়ী। কারণ ইহা য়ুরোপের উনবিংশ [illegible]

ইণ্ডাষ্টিয়াল রেভোলিউশনের পর শ্রমিকের উপর ধনিকের একাধিপত্য ও তাহার অসহায় দাসজীবনের বিষময় কুফল দর্শনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হইলেও, মূলত সত্য নহে। বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্ন অবস্থার অগণিত মানুষের যদি কোন প্রকার শ্রেণী বিভাগ সম্ভব হয়, তাহা হইলে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ উক্ত গুণ ও কর্ম-দ্বারা নির্ণীত চতুর্বর্ণই সর্বাপেক্ষা বৈজ্ঞানিক বিভাগ। চতুর্বর্ণ না হইয়া অষ্ট বর্ণ হইলে ক্ষতি ছিল না। কারণ শ্রেণী বৃদ্ধিতে মানবের বিচিত্র ও বহুমুখী কর্মধারাকেই স্বীকার করা হয়। কিন্তু ক্ষতি তখনই ঘটে যখন কোন সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা তাহার অধীনস্থ সকল মানুষকে অন্ন-বস্ত্র শিক্ষা-আরোগ্যের সঙ্গে সঙ্গে নির্ভয় আত্ম-অভিব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা বা সুযোগ দান করিতে পারে না।

বুর্জুয়া ও প্রলিটেরিয়েট এই দুইটি দলের মধ্যে বুর্জুয়া দলটি যে সমূলে ধ্বংস করিতে পারিলেই জগতে আর একটি মাত্র দল থাকিবে এবং তাহা হইলেই সম্পূর্ণ ইকুওয়ালিটির উপর দলবিহীন (classless) সম্পত্তিবিহীন আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে—সাম্যবাদীদের এই লক্ষ্য রুশিয়ায় সশস্ত্র বিদ্রোহের মধ্য দিয়া আদিতে আশ্চর্য সাফল্যলাভ করিল। কিন্তু তার পর? একদল ধনী গিয়াছে, আর একদল নূতন ধনী সৃষ্টি হইতেছে। 'জার' সবংশে নিহত হইয়াছে, 'জার' অপেক্ষা বহুগুণে শক্তিশালী একনায়ক রাষ্ট্রপতি তাঁহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। 'আমার' বলিতে কিছু নাই বলিয়া মরুভূমির মত বুক ধু ধু, প্রাণ হাহাকার করিতেছিল—স্নেহ-প্রীতি ঢালিবার, যত্ন-সেবা করিবার, সুন্দর করিয়া সাজাইবার নিজস্ব অবলম্বন খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না, এখন আবার আমার গরু, আমার মুরগী, আমার বাগান, আমার বাড়ী ফিরিয়া পাইয়াছি—আমার মোটর, আমার ব্যাঙ্কের পাশবইও পাইয়াছি। ধর্মকে অস্বীকার করিয়াছিলাম, নীতিকে বাদ দিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু গত লড়াইয়ের সময় বিপাকে ফেলিয়া আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট আমাদের ছত্রপতিকে দিয়া 'রাম' নাম লওয়াইয়া ছাড়িয়াছেন। অক্টোবর রেভোলিউশনের পূর্বেকার ইতিহাস মুছিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলাম, এখন তাহা লইয়াই মাতামাতি করিতেছি এবং উগ্র জাতীয়তার নূতন খোরাক জোগাইবার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিকদের শরণাপন্ন হইয়াছি। সত্যকার ডিমক্রেশী চাহিয়াছিলাম, যেখানে মানুষ স্ব স্ব প্রধান হইয়াও স্বতঃ-উৎসারিত সম্প্রীতি ও সহযোগিতার মধ্যে সংযমী ও নিয়মানুবর্তী হইয়া বাস করিবে, যেখানে রাষ্ট্রের আর আবশ্যক হইবে না—রাষ্ট্র আপনা হইতে শুকনো পাতার মত ঝরিয়া পড়িবে ("Shall wither away"), কিন্তু পাইয়াছি অতি দুর্ধর্ষ ডিকটেটারশিপ। চাহিয়াছিলাম দেশে দেশে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া দুনিয়ার কৃষক-শ্রমিকের দুঃখ হরণ করিতে, এখন দেখিতেছি অ্যাংলো-আমেরিকার মন রাখিতে সে পথে যাইবার উপায় নাই। সাম্রাজ্য-বাদ ধ্বংস করিব, প্রলিটেরিয়েটের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিব, এই ছিল আমাদের পণ; কিন্তু এমনি অদৃষ্টের ফের, এখন দেখিতেছি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী আমার দোস্ত। ভাবিয়া-ছিলাম নিজ দেশের কৃষক-শ্রমিকদের অন্ততঃ খানিকটা বিশ্রাম ও শান্তি দিতে পারিব, কিন্তু লড়াইয়ের জন্য পারিলাম কৈ? পরেও যে পারিব তাহার ভরসাই বা কোথায়? কারণ আজকার দোস্ত যে কালকার দুষমণ নয়, সেই বিশ্বাস রাখিতে পারিতেছি কৈ? সেই জন্যই আত্মরক্ষার প্রয়োজনে অবস্থার চাপে কিছু কিছু আদর্শ ছাড়িতে হইতেছে। কি করিব? ইহাই পাশ্চাত্য রাজনীতি। আগে আপন প্রাণ, তবে ত জগৎ-ত্রাণ। বুঝিলাম। কিন্তু এরকম ভয় (fear complex), অবিশ্বাস ও শস্ত্রশক্তির প্রতিযোগিতার মধ্যে শেষ পর্যন্ত আদর্শের আর কিছু বাকি থাকিবে কি?

সত্যকে ছাড়িয়া পাশ্চাত্য রাজনীতির অর্থাৎ 'পাওয়ার পলিটিক্সের' পথে গেলে শেষ পর্যন্ত সকলের ভাগ্যে ঐ একই গতি। সমাজ-তন্ত্রের মহৎ আদর্শ ও লক্ষ্যের দোহাই দিয়াও লড়াই ও তাহার আনুষঙ্গিক ভয়াবহ পরিণামের হাত হইতে আর তখন বাঁচিবার উপায় থাকে না। অহিংসা ও অহিংস সংগ্রামের কথা এখানে তুলিব না, কারণ তাহাতে আমাদের বিচারশীল বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক বিবেক অত্যন্ত আঘাতপ্রাপ্ত হইবে এবং বিতর্ক আরো অনেক বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু সত্যের কথা না তুলিয়া পারিলাম না, যদিও প্র্যাকটিক্যাল ম্যান হিসাবে ইহাকেও আধুনিকেরা বাহিরে অস্বীকার না করিলেও অন্তরে অস্বীকার করেন। কারণ ইহার মধ্যেও তাহারা আধ্যাত্মিকতার দুর্গন্ধ পাইয়া থাকেন। কিন্তু এই জিনিসটিকে বাদ দিয়া তাঁহারা কিছুতেই বাঁচিতে পারিবেন না, পারিতেছেনও না। তা ছাড়া, "সত্য" আধ্যাত্মিক বস্তু নহে, একেবারে খাঁটি বিজ্ঞান, সর্বোচ্চ লজিক,—যে র‍্যাশনেলিজমের আমরা বড়াই করি তাহারই সার। যে 'ল' বা আইন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে তাহার অনুসন্ধান ও নির্ণয়ই বিজ্ঞানের কাজ। সেই আইন সম্বন্ধে নির্ভুল সিদ্ধান্তই সত্য। সৌরজগতে যখন জড় ও সূক্ষ্ম, matter ও

spirit দুই-ই রহিয়াছে দেখিতে পাইতেছি তখন শুধু 'ফিজিক্স'-কেই বিজ্ঞান বলিব, মেটাফিজিক্সকে বলিব না এবং দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক সত্যকে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিব, ইহা কি প্রকারে সম্ভব? এই অন্যায় অস্বীকৃতির মধ্যেই শুধু ধনতন্ত্রের নহে, সমাজতন্ত্রের বিরাট কীর্তির বিনাশের বীজও উপ্ত হইয়া আছে। এতকাল ইহাদের বাহিরের বিস্ময়কর সৃষ্টি-মাহাত্ম্যই বিহ্বল হইয়া দেখিয়া আসিয়াছি, এখন তাহারই আত্মহত্যার ততোধিক ভয়াবহ আয়োজন সন্ত্রস্ত হইয়া দেখিতেছি। শুধু আদর্শ-মাহাত্ম্যের জোরে নিজের আইন নিজে তৈরি করিয়া বিশ্বের মূল নীতির সহিত অসহযোগ করিয়া প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়িতে গেলে আদর্শ রক্ষা হওয়া কঠিন।

দুনিয়ার উৎপীড়িত বঞ্চিতদের মুক্তি-সাধন গান্ধীজীরও আদর্শ, জীবনের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু তাহার জন্য "সত্য"*ও "অহিংসা" ভিন্ন তাঁহার আর কোন অস্ত্র বা অবলম্বন নাই। সম্পূর্ণ নির্লোভ, নির্বিত্ত, নিষ্ক্রোধ ও নিষ্কাম হইয়া আত্মশুদ্ধি দ্বারা তিনি আজীবন এই অস্ত্রেই শান দিতেছেন। ইহা হইতে এই সার সত্যটুকু তিনি বুঝিয়াছেন যে, সৃষ্টিপ্রবাহকে মানুষের ইচ্ছামত নির্দিষ্ট খাদে ধরিয়া রাখা যায় না—এই সৃষ্টিপ্রবাহ পণ্ডিতদের বিশুদ্ধ থিওরি বা নির্ভুল ফর্মুলার বাধ্য নহে। তিনি দেখিয়াছেন, জাগতিক বিধানে (ঈশ্বরের বিধান বলিব না) আলোর সহিত অন্ধকার, সত্যের সহিত অসত্য এবং অমৃতের সহিত মৃত্যু মিশিয়া রহিয়াছে। এককে বাদ দিয়া অপরের চিন্তা করা যায় না। কিন্তু মানবের চিরন্তন প্রার্থনা, শাশ্বত অভিযান চলিয়াছে অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে আলোতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে। অন্ধকারকে, অসত্যকে, মৃত্যুকে গলা টিপিয়া আমরা একেবারে মারিয়া ফেলিতে পারি না; কিন্তু তাহাদিগকে নির্বিষ করিয়া অমৃতসিক্ত করিতে পারি এবং তাহা করিতে পারি বলিয়াই আজও সৃষ্টি টিকিয়া আছে। হিংসা, বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব, কলহ বাহিরে হুংকার করিয়া, আত্মপ্রচার করিয়া বেড়ায় বলিয়া তাহারাই জগৎ নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে প্রধান নহে, সংখ্যাগরিষ্ঠও নহে। তবে সম্প্রতি ইহাদের উৎপাত অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু হিট্‌লার ও মুসোলিনীর এবং জার্মাণীর ও ইটালীর শোকাবহ পরিণাম দেখিয়া উহাদের অবিলম্বে সতর্ক হওয়া দরকার। অন্যথা পরের অঙ্কে এবারকার বিজয়ীদের পালা। দেয়ালের লেখা অতি পরিষ্কার।*

এই ধ্বংসের পথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্যই গান্ধীজীর আবির্ভাব। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, গান্ধীজীর সত্য ও অহিংসা ভিন্ন কোন অস্ত্র নাই। সুতরাং ধনীকে মারিয়া কাটিয়া নিঃশেষ করিয়া গরীবকে সেই ধন দান করিবারও কোন অভিপ্রায় নাই। সেই দানে তিনি বিশ্বাস করেন না। ইহা এক অন্যায় হইতে অন্য অন্যায়ে, এক জুলুম হইতে অপর জুলুমে মানুষকে টানিয়া লইয়া যায় এবং অন্যায় বাড়িয়াই চলে। কিন্তু গরীবের দুঃখ-হরণ তাঁহাকে করিতে হইবে—তাহাই তাঁহার জীবনের ব্রত। কিন্তু বলই যদি প্রয়োগ না করিবেন, তাহা হইলে ধনী মহাপুরুষরা যে শুধু গান্ধী মহাত্মার দর্শন লাভ করিয়াই তাঁহাদের সর্বস্ব গরীবের জন্য বিলাইয়া দিবেন, ইহাও ত উন্মাদ ভিন্ন আর কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না। অতি সত্য কথা। কিন্তু গান্ধীজীর শক্তি নাই কিংবা গান্ধীজী শক্তি প্রয়োগ করিবেন না, এই কথা কে বলিল? এই কপর্দকহীন নিরস্ত্র অহিংস ব্যক্তি যদি সত্যই শক্তিহীন, তাহা হইলে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শস্ত্রশালী ইংরেজ শক্তি পুনঃ পুনঃ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন কেন এবং ভারতের অবিসম্বাদী নেতা হিসাবে তাঁহাকে ডাকিয়া সন্ধি ও আপোষের আলোচনা করিতে ব্যগ্র হন কেন? তাঁহার শক্তি অতি মারাত্মক শক্তি—বাহিরে কাটে না, ভিতরে জখম করে ও দুর্বল করে। আমরা সেই শক্তিকে আজও ভাল করিয়া চিনি না, চিনিতে চেষ্টা করি না। সেই জন্যই তিনি আমাদের জন্য আজও জয়মাল্য আনিয়া দিতে পারেন নাই। কিন্তু পরাজয়ও তাঁহার হয় নাই; কারণ সত্যের পরাজয় নাই। তিনি অগ্রসর হইয়াই চলিয়াছেন। প্রতিপক্ষ তাই জিতিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। পাশবিক শক্তিকে তাহারা জানে, তাহার বিরুদ্ধে স্বচ্ছন্দচিত্তে লড়িতে পারে, জয়লাভে একটা বিজাতীয় উল্লাস পায়। কিন্তু ইহাদিগকে গুলী চালাইয়া, জেলে পুরিয়া প্রাণে শান্তি নাই। তার উপর আজকাল পৃথিবীর লোকগুলিও যেন কেমন হইয়াছে! গান্ধীজী, জওহরলালদের জন্য তাহাদের আবার মাঝে মাঝে মাথাব্যথা উপস্থিত হয়। অনধিকার চর্চা করিতেও ছাড়ে না।

অহিংসার বা আত্মিক বলের অমোঘ শক্তির আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তৎসম্বন্ধে যাঁহারা জানিতে চান, তাঁহারা যেন গান্ধীজীর "Non-Violence in Peace & War" ও অন্যান্য পুস্তক* পাঠ করেন। আমরা শুধু ইহাই জানাইয়া রাখিতে চাই যে,

* ইহা লিখিতে না লিখিতে বিজয়ী চার্চিলের দলবল সহ পতন!

* Discipline For Non-Violence by Richard Gregg. "Practical Non-Violence" by K. G. Mashruwala.

"non-violence is the summit of bravery" গান্ধীজীর এই কথাটাকে ভাল করিয়া যাচাই না করিয়া আমাদের ষড়রিপু-সম্মোহিত বুদ্ধির অহমিকায় যেন পূর্বাহ্নেই সরাসরি বরখাস্ত করিয়া না দেই।

Non-violence is not passivity in any shape or form. Non-violence, as I understand it, is the most active force in the World. Its hidden depths sometimes stagger me just as much as they stagger fellow-workers—

—ইহা অন্যায়ের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামশীল সত্যাশ্রয়ী নিরস্ত্র বীরের অভিজ্ঞতাপ্রসূত স্বগতোক্তি—ফাঁকা বাহ্যাড়ম্বর নহে।

মূল বিষয়ে ফিরিয়া যাওয়া যাক্। সত্য কখনো কামান-বন্দুকের ধার ধারে না। বল-প্রয়োগ করিয়া কাজ হাসিল করিতে গেলে তখনকার মত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু স্থায়ী ফললাভ হয় না। তাই গান্ধীজীর শাস্ত্রে পথ ও লক্ষ্য ভিন্ন জিনিষ নহে, একই বস্তু। সেখানে "Ends justify the means" এই নীতি সম্পূর্ণ অচল। গান্ধীজীর ভাষায়ঃ—

"There is no wall of separation between means and ends—Realisation of the goal is in exact proportion to that of the means."

সত্য লইয়া গান্ধীজীর আজীবন গবেষণার শেষ সিদ্ধান্ত হইতেছেঃ

"Permanent good can never be the outcome of untruth and violence."

তাই গান্ধীজী পাশবিক বলপ্রয়োগ করিয়া স্বাধিকারবাদ কিংবা স্বকীয়বৃত্তিকে (private property and private enterpriseকে) ধ্বংস করিতে উদ্যত হন নাই। ইহার অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি প্রতিরোধ করিবার জন্য বিশ্বের ঘুমন্ত বিবেককে তিনি জাগ্রত করিতে চাহিয়াছেন। ইহার জন্য ধনীর দয়া বা অনুগ্রহের আবশ্যক নাই, তাহাদিগকে গলা টিপিয়া মারিবারও প্রয়োজন নাই। কারণ, গান্ধীজীর একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না যে,

"No person can amass wealth without the co-operation willing or forced, of the people concerned. The moment labour recognises its own dignity, money will find its rightful place, i.e. it will be held in trust for labour. For labour is more than money."

তিনি আরো বলেনঃ—

"If capital is power, so is work. Either power can be used destructively or creatively. Either is dependent on the other. Immediately the worker realises his strength, he is in a position to become a co-sharer with the capitalist, instead of remaining his slave."

ইহার জন্য বোমা ও পিস্তল ছুঁড়িবার আবশ্যক হইবে না, আমাদের হাত দুটি একটু গুটাইয়া লইলেই আপনি কর্মসিদ্ধ হইবে। প্রশ্ন হইবে, এই ইচ্ছা জাগান যাইবে কোন্ উপায়ে? উহাদের এজেন্টরা পথরোধ করিয়া দাঁড়াইবে যে। কাহার পথরোধ করিবে, কোন অপরাধে পথরোধ করিবে? কামান-বন্দুক, গোলা-বারুদ লইয়া দল পাকাইয়া আমরা সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন করিতেছি না, নির্লোভ, নির্ভীক, সংযত ও অহিংস হইয়া আমরা গ্রামে বসিয়া আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন করিয়া স্বাবলম্বী হইতে চাহিতেছি। অপরাধ কোথায়? আর ইহাও যদি অপরাধ হয়, তবে কত লোককে বিনা অপরাধে বিনা বিচারে জেলে ভরিবে? কয় বৎসর পূর্বে 'স্বরাজ' শব্দ মুখে আনিতে লোক ভয় পাইত। আজ বৃটিশ সাম্রাজ্যের বহির্ভূত পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী লোকের মুখে মুখে, কাগজের ছত্রে ছত্রে। শাসকের হয়ত ইহা অসহ্য। কিন্তু কত মুখ বন্ধ করিবে? কত লেখনী থামাইবে? দেখিতে দেখিতে অসংখ্য মুখ, অসংখ্য লেখনীর সৃষ্টি হইয়া গেল যে। যেখানে প্রকৃত অপরাধ নাই, পাপ নাই, পরন্তু অন্যায় ও অধর্ম যেখানে অপর পক্ষে, সেখানে সত্য ধীরে ধীরে আপনার নিয়মে আপনি প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহার পশ্চাতে কত দারোগা কত দিকে দৌড়াইবে? মোট কথা, যাহারা বিশ্বাস হারাইয়াছে, সত্যের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিতে হইবে। তাহা করিতে পারিলে যে শক্তির আবির্ভাব হইবে, তাহাকে কেহ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। এই আধ্যাত্মিক সত্যকে বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে স্বীকার করিবার দিন আজ আসিয়াছে।

সেই জন্যই গান্ধীজী ব্যক্তিগত সম্পত্তির বলপূর্বক বেদখলে (expropriation-এ) বিশ্বাস করেন না। ধনীকে দেশের ট্রাষ্টি হিসাবে তাহাদের ধন ব্যবহার করিবার একটা সুযোগ তিনি প্রথমে দিতে চান। তাঁহার সেই সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি সব গাচ্ছিত ধনসম্পত্তির ন্যায় গণ্য হইবে এবং ধনীর অবস্থা হইবে আদালত নিয়োজিত ট্রাষ্টির মত। শুধু জনমতের নিকট নহে, আদালতের আইনের

নিকট তিনি দায়ী থাকিবেন 'তাঁহার' ধন-সম্পত্তির হিসাব-নিকাশের জন্য। যদি তিনি তাঁহার অর্থ সাধারণের হিতার্থে ব্যয় না করিয়া নিজের ভোগবিলাসে অপব্যয় করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ট্রাষ্টিপদ হইতে বরখাস্ত করা হইবে। অবশ্য যতদিন তিনি সদ্ভাবে চলিবেন, ততদিন তিনি সম্পত্তির বা কারবারের লভ্যাংশ হইতে শতকরা ৫৲।৬৲ টাকা তাঁহার নিজ খরচ বাবদ পাইবেন। গান্ধীজির প্ল্যানে সর্বোচ্চ আয় সর্বনিম্ন আয় হইতে ১২ গুণ অপেক্ষা অধিক হইতে পারিবে না। [সোভিয়েট রুশিয়ায় ইতিমধ্যেই সর্বোচ্চ আয় সর্বনিম্ন আয় হইতে অনেক ক্ষেত্রে ৮০ গুণ অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে!] যদি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার এদেশের ধনীরা না করে, তাহা হইলে যে শক্তি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিবে, তাহা নিশ্চয়ই দেশের ধনীদেরও সহজেই দমন করিতে পারিবে। আর বৃটিশরাজ যদি পূর্ণ শক্তিতে আত্মনিয়োজিত Trustee হিসাবে বলপূর্বক এই দেশে বিরাজ করিতে পারে, তাহা হইলে এই সব দেশী ধনিকের ধ্বংসের কথা অবান্তর! যদি কোন কম্যুনিষ্ট ইংরেজশাসন দেশে বজায় রাখিয়া দেশের ধনিকদের পৃথক্ভাবে প্রথম ধ্বংস করিতে চায়, আর প্রচার করিয়া বেড়ায় যে ইংরেজকে পরে তাড়াইবে, তবে বুঝিতে হইবে যে, সে বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদীর এজেণ্ট, মস্কোর মুখোস পরিয়া গরীব ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছে।

গান্ধীজী বাস্তববাদী (অথচ তাঁহাকেই স্বপ্নবিলাসী বলা হয়); তাই সমাজতন্ত্রের মত অসম্ভব কল্পনা তিনি করেন নাই।

"I cannot picture to myself a time when no man shall be richer than another. Even in a most perfect world, we shall fail to avoid inequalities, but we can and must avoid strife and bitterness."

সেইজন্যই তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন যে, সমবণ্টন (equal distribution তাঁহার আদর্শ হইলেও সেই আদর্শে পেঁছান সম্ভবপর হইবে বলিয়া তাঁহার মনে হয় না। তাই সঙ্গত বণ্টনের ((equitable distributionএর) জন্য তিনি চেষ্টা করিতেছেন।

গান্ধীজীর পরিকল্পনানুযায়ী বৃহৎ যন্ত্র-সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকবণ সাধিত হইলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইবে যে, বিপুল অতিরিক্ত মুনাফা কাহারো পক্ষে কিংবা ধন সঞ্চয়ের সুযোগ ও সম্ভাবনাই তিরোহিত হইবে। তখন শ্রমিকেরা মালিকের দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীনভাবে গৃহে বসিয়া আপন যন্ত্র সাহায্যে সৃষ্টির আনন্দলাভ ও জীবিকার উপায় করিতে পারিবে। তখন আর লক্ষ লক্ষ লোককে খুন করিয়া সমস্ত স্বকীয় সম্পত্তি শক্তিশালী একনায়কাধীন রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দিয়া থাওয়া-পরার বিনিময়ে সেই পুরাতন যন্ত্র-দাসত্ব করিতে হইবে না; "ইদং নীরমিদং ক্ষীরং স্নাত্বা পীত্বা সুখী ভব"—এই আশীর্বাদের লোভে পড়িয়া "আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ" প্রেতাত্মা হইতে হইবে না এবং গান্ধীজীর সঙ্গত বণ্টনের আদর্শ সফল হইবে।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে গান্ধীজী স্বাধীন কর্মোদ্যম ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির (private enterprise and private propertyর) বলপূর্বক বিলোপ সাধনের বিপক্ষে, তিনিই জনসেবাব্রত আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালে প্রথমেই সর্বপ্রকার বিষয়সম্পত্তি হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করিয়াছিলেন—নিজের বা পরিবারের নামে কপর্দক মূল্যের সম্পত্তি রাখেন নাই! অনেকেই হয়ত একথা জানেন না; কিংবা জানিলেও বিস্মৃত হইয়া আছেন। অতি সংক্ষেপে তাঁহারই ভাষায় তাঁহার এই সঙ্কল্প ও সাধনার কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"When I found myself drawn into the political coil I asked myself what was necessary for me in order to remain absolutely untouched by immorality, by untruth, by what is known as political gain. I came definitely to the conclusion that, if I had to serve the people in whose midst my life was cast and whose difficulties I was witness from day to day, I must discard all wealth, all possession."

আত্মীয়ের ও নিজের সহিত দিনের পর দিন সংগ্রাম করিয়া যখন একে একে স্থাবর-অস্থাবর সর্বপ্রকার বিষয়ের উপর তিনি তাঁহার স্বত্ব পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন, সেইদিন তাঁহার কি আনন্দ!

"I felt that I could now walk with ease and do my work also in the service of my fellow-men with great comfort and still greater joy. The possession of anything then became a troublesome thing and a burden."

নিজের নামে একখানা বীমাপত্র ছিল; কিন্তু তাহাও ভগবানের প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে অনাস্থা সূচনা করে বলিয়া বাতিল করিয়া দেন! গান্ধীজী অপেক্ষা সত্যকারের সোস্যালিষ্ট বিশ্ব-ইতিহাসে কয়জন জন্মিয়াছেন? তাও সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী নহে, ঘোর বিষয়ী! যদিও পরার্থে! আপনি আচরি' ধর্ম জগতে শিখায়'—রাজনীতিক্ষেত্রে তার চরম দৃষ্টান্ত তিনি আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। বলপ্রয়োগপূর্বক ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার নৈতিক অধিকার তাঁহার অপেক্ষা অধিক আর কাহার থাকিতে পারে? এবং তাহা স্বেচ্ছায় জাতির কল্যাণে সর্বসাধারণের হিতার্থে উৎসর্গ করিবার দাবীই বা তাঁহার ন্যায় আর কে করিতে পারেন? তারপরেও সেই দাবী উপেক্ষিত বা অবহেলিত হইলে অহিংস শক্তির অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগে তখন তাঁহাকে কে বাধা দিতে পারে? কারণ, সে সংগ্রাম তখন অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের, অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের, অধর্মে ও অধর্মে এবং অসত্যে ও অসত্যে নহে।

পরিশেষে গান্ধীজির বক্তব্য এই যে, ধনী কর্তৃক মূলধনের অপব্যবহার, এই আবিষ্কার হইতে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্যদেশে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব এই ধারণা সত্য নহে। ইহার সহস্র দুই বৎসর পূর্বে ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকে এই তত্ত্ব প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। প্রকৃত ব্যাপার হইয়াছে,—সমাজ-সংস্কারকগণ নৈতিক বলের সাহায্যে মানবচরিত্র সংশোধন সম্পর্কে যখন তাঁহাদের আস্থা হারাইলেন, তখনই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র নামে এই নূতন সমাজতন্ত্র জন্মলাভ করিল। যদিও জগতে পশুবৃত্তি ও পশুবল আছে ও সম্ভবতঃ থাকিবে, তাহা স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই, তথাপি ইহা অপেক্ষা অধিকতর সত্য ও বলশালী নৈতিক শক্তির উপরে মানব-সমাজের আস্থা ফিরাইয়া আনিতে না পারিলে কোন আদর্শ, কোন তত্ত্ব, বা 'ইজম', এমন কি 'বিজ্ঞানও' টিকিবে না শেষ পর্যন্ত। সেইজন্যই গান্ধীজির আবির্ভাব ও গান্ধীজির ভারতীয় সমাজতন্ত্রের প্রয়োজন।

গড়ের বাদ্যি



একটি প্রায় সত্তর বৎসরের বৃদ্ধা দোড়গোড়ায় বসিয়াছিল, আমি সামনে গিয়া পড়িতেই অর্ধেক ঘোমটা টানিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। স্বরূপ মণ্ডল আমাকে দেখিতে পাইয়াই চরখার হাতটা থামাইয়া অভ্যর্থনা করিল—"আসুন দাদাঠাকুর, পাতঃপেন্নাম হই। এবারে অনেকদিন বাদ দয়ে এলেন মসনেতে।"

বলিলাম—"সে ছিল বোমার ভয় স্বরূপ, পালিয়ে পালিয়ে আসতে হোত। নৈলে কলকাতার লোকের বাইরে আসা যে কী শক্ত বুঝবে না তো। আমরা এক আলাদা জীবই হয়ে দাঁড়াই যে।"

মোড়ার উপর গিয়া বসিলাম, স্বরূপ নাতিকে তামাক আনিতে বলিয়া আলাদা জীবের কথায় একটু হাসিয়া হাতটা চলাইতে চালাইতে বলিল—"তারপর খবর কি কন শুনি।"

বলিলাম—"খবর তো দেখতেই পাচ্ছ? যারা ম'ল এখন তাদের কথা ভেবে হিংসে হ'চ্ছে, তবু কোমরে একখানা করে কাপড় সুদ্দু মানে মানে সরে পড়েছে, এখন চালের এক রকম ব্যবস্থা হয়েছে, বাঁচতেই হবে, কিন্তু......"

স্বরূপ 'কিন্তু'-র পরের অবস্থাটা কল্পনা করিয়া লইয়া একটু হাসিয়া আবার হাতটা থামাইয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"গদার মাকে তো এতক্ষণ সেই কথা বলছিলুম দাদাঠাকুর, বলি দেখে রাখ—এত বড় কারবারটা চালাচ্ছে তার ভোজবাজিটা একবার দেখে রাখ—গোড়ায় চরখা, তাঁতীর তাঁত; তারপর দিনকতক বিলিতী কলের কাপড় এলাহি কাণ্ড, কে কত পরবি পর; তারপর ঢো উঠল আগুনে দে ওগুনোকে; তারপর স্বদিশী কল, আবার নেও কত কাপড় নেবে; তারপর এখন এক কথায় বাজার ফরসা; আবার ডাক তাঁতীকে, নে আয় চরখা।...... চারকুড়ি বয়েস হতে চলল, অনেক......"

এমন সময় খানিকটা দূরে কোথায় ঝমঝম করিয়া ব্যাণ্ডের আওয়াজ উঠিল। স্বরূপ উচ্ছ্বসিতই হইয়া উঠিতেছিল, ও-প্রসঙ্গটাই ছাড়িয়া দিয়া স্বরটা খাদে নামাইয়া বলিল—"গড়ের বাদ্যি!"

একটু যেন ব্যঙ্গ হাস্য করিয়া আবার চরখা চালাইতে সুরু করিয়া দিল।

স্বরূপের এই সব অতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, হাসির টুকরা প্রভৃতির অন্তরালে বড় বড় গল্প লুকাইয়া থাকে, প্রশ্ন করিলাম—"হাসলে যে মোড়লের পো?"

স্বরূপ বলিল—"এই চারকুড়ি বয়সের মধ্যে মসনেতে শুদু একটি বার বাদ্যি শুনেছেনু দাদাঠাকুর, হ্যাঁ, যাকে গড়ের বাদ্যি বলতে হয়! আর একি ছেলেখেলা! মেয়েরা ঐদিকে উলু দিচ্ছে আর ঢাক আর দুটো পেতলের বাঁশি নিয়ে—ভ্যাঁপ্পো ভ্যাঁপো, ভ্যাঁপ্পো—ভ্যাঁপো, কি না? মিত্তিরদের মেয়ের বিয়েতে গড়ের বাদ্যি হচ্চে! বাজনাটার জাত মেরে দিলে বেটারা দাদাঠাকুর হাসি কি সাদে আসে? অনেক দুঃখে।"

স্বরূপের নাতি তামাক লইয়া আসিল। হুঁকাটা হাতে লইয়া বলিলাম—"একটু অন্য জায়গায় বরাৎ ছিল, তা একটু বসে শুনেই যাই খাঁটি গড়ের বাদ্যির ব্যাপারটা কি। নাও, শুরু করো।"

স্বরূপ বলিল—"তা বৈকি দাদাঠাকুর, গড়ের বাদ্যি একবার শুনে যদি জীবন ভোর না মনে গে'তে বসে রৈল তো তাকে আবার গড়ের বাদ্যি বলতে হবে?......তা হলে দিন একটু পেসাদ পেয়ে নি।"

বাঁ হাত দিয়া ডান হাতটা স্পর্শ করিয়া স্বরূপ কলিকাটা তুলিয়া লইল, কয়েক টান দিয়া আবার সেইভাবে বসাইয়া রাখিয়া বলিল—"আমার বয়েস তখন কতই বা হবে,—এই ধরুন দশ, তার বেশি নয়; সেই সময়কার কথা। চৌধুরী বাড়ির কত্তা ত্যাখন দামোদর চৌধুরী। মানুষটো যে কেমন ছেল তা কি করে বোঝাই আপুনিকে? সে ধরণের মানুষই যে নোপাট হয়ে গেল ধরাতল থেকে। ইয়া গোঁফ, ইয়া গালপাট্টা, এই টানা চোখ, এই টানা ভুরু; এদিকে যেমনি লম্বায় তেমনি আড়ে। গলার আওয়াজ ছিল তেমনি, একটা যদি হাঁক দিলেন তো সদর থেকে

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

অন্দর পর্যন্ত ঐ অত বড় দেউড়িখানা যে গম গম করতে থাকত। ঐ যে বলনু দাদাঠাকুর, সে ধরণের মানুষ নোপাট হয়ে গেল ধরাতল থেকে তো আপনিকে বোঝাই কি করে?

দোষ কি ছেল না? ছেল। অবিশ্যি এখনকার হিসেবে বলছি, ত্যাখনকার দিনে জমিদারের মধ্যে সেগুলো দোষের মধ্যে ধরবার রেওয়াজ ছেল না। তা, না ধরলেই যে দোষের হবে না এমন কথা তো নয় দাদাঠাকুর। চৌধুরীদের বংশটাই একটু কি যে বলে, ইয়ে ছিল; তার মধ্যে আবার দামোদর চৌধুরীর দাপট পূর্বের সবাইকেই গেছল ছাড়িয়ে। ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, কি, মানুষকে মানুষ গুম করে ফেলা এগুনো তো ধর্তব্যের মধ্যেই ছেল না, ডাকাতি করে গাঁ কে গাঁ লুটে নিয়ে আসা পজ্জন্ত নিত্যিকার ব্যাপার ছেল। তবে নিজের জমিদারিতে নয়। তুমি পাশের জমিদার, মাথা তোলবার চেষ্টা করচ, সমস্ত জমিদারী তচনচ করে এমন ঠাণ্ডা করে দিলে যে আর দু'পুরুষ ধরে মাথা তোলবার জো



স্বরূপ বলিল—সবটা না শুনলে বুঝবেন না

রইল না। তা, একেবারে ঠাণ্ডা তো করা যেত না, কেন না সবারই নিজের নিজের নেটেড়ার দল ছেল, তাই অষ্টপহরই দাঙ্গা ফেসাদ লেগে থাকত দাদাঠাকুর, দেশটা এমন জুড়িয়ে যায়নি। আজ দামোদর চৌধুরীর দল কার্তিকপুরের রায়েদের জমিদারীতে পড়ল তো কাল রায়েদের দল মসনের আশে পাশে এসে হানা দিলে, কিছু মাথা নিয়ে গেল, কিছু মাথা রেখে গেল, এই রকম। আপনি আমি রেয়েৎ, কিছু খোয়ালুম, নয় হয়ে দুএকজন। প্রানই দিলুম, কিন্তু সমস্ত ধকলটা তো ওনাদেরই সামলাতে হোত দাদাঠাকুর? তা, ঠাণ্ডা মেজাজে তো সে হবার জো নেই, তাই একটু একটু করে নেশাপত্তর এসে পড়তই, দামোদর চৌধুরীর ওপর ধকলটা ছিল বেশি, তাই নেশারও একটু বাড়াবাড়ি ছেল; শাদা চোখে তানাকে বড় কম দেখেছি দাদাঠাকুর। ঐ যে পদ্ম পলাস লোচনের মতন দুটি চোখ, সর্বদাই রক্ত জবার মতন রাঙা টকটক করতো। শুধু দু'টি মাস ছেল শাদা, একদিন দু'দিন করে গোনাগুনতি দুটি মাস তাইতেই চারিদিকে সামাল সামাল রব উঠে গেছল।"

মন্তব্যটা একটু নূতন ধরণের হওয়ায় হুঁকা থেকে মুখ সরাইয়া বলিলাম—"বুঝলাম না স্বরূপ।"

স্বরূপ বলিল—"সবটা না শুনলে বুঝবেন না।"

তামা ফুরাইয়া গিয়াছিল, নূতন খানিকটা লইয়া আবার সুতো কাটা চালু করিয়া বলিতে লাগিল—"ময়নাগাছির চিন্তামণি ঠাকুর ছিলেন দামোদর চৌধুরীর বোনাই। উনাদের পদবি রায়-রায়ান। নবাবী আমলে মস্ত বড় তালুক ছেল, এদিকে এসে মাত্তোর কয়েকখানা গ্রামে ঠেকেছিল। তা বিষয় সম্পত্তি তো পদ্মপত্রের জল দাদাঠাকুর, সব সময় সমান থাকে না; তবে চিন্তামণি ঠাকুর নিজে বড় ধড়িবাজ লোক ছিলেন, আর সুমুন্দির ওপর তাঁর দাবটা ছিল খুব বেশি রকম। লোকে বলত দামোদর চৌধুরীর মাথায় যত রকম কু মতলব খেলত তার বারো আনা চিন্তামণি ঠাকুরের। মসনে থেকে ময়না-গাছি বেশি দূরও নয়, যাওয়া আসাটা লেগেই ছেল। নেশার দোষটা ওনার আবার একটু বেশি ছেল, বোনাই সুমুন্দি একত্তর হলে বেশ একটু বাড়াবাড়ি হোত।

একদিন পাল্কি থেকে নেমে চিন্তামণি ঠাকুর বললেন—"দামোদর ভেবে দেখলুম সংসারটা কিছুই নয়, আমরা হীরে ফেলে

কাচে গেরো দিয়েছি। বড়ই অনুতাপ হচ্ছে মনে।"

অন্য এক পাল্কিতে একজন বোষ্টম বাবাজী বসে ছেল। দামোদর চৌধুরীর দাপটের কথা শুনে নামতে হেম্মৎ পাচ্ছেল না; চিন্তামণি ঠাকুর নিজে গিয়ে তাঁকে ডেকে নিয়ে এলেন। তিনজনে গিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকলেন।

কি মন্তর ঝাড়লে নারায়ণ জানেন দাদাঠাকুর, তারপর দিন থেকেই দামোদর চৌধুরী



একেবারে অন্য মানুষ।
চৌধুরী মশায়ের
নেশাপত্রের যা কিছু
একেবারে মাঝখা
হবে। দলের যে স
একত্তর করে। দে
বাজিয়ে জ্বালানে
জোড়া পাঁঠা পড়
চালকুমড়োর
থেকে, বেশ
বাবাজী বিন্দাব
সঙ্গে রইল,
ভিড়ে গেছল
করেই ল্যাঠা

পাঁঠার
এমন কিছু
হোল, এর সা
করবার। রা
করবার ঘটায়
দাদাঠাকুর।

করে মন্তর দেওয়ানো—এই
হুহু করে টাকা বেরিয়ে যে
লুট তরাজে মালক্ষ্মীর
নিত্যিকার আয় ছেল, এখ
পালা—দিন কতকের মধ্যে
এল। ওদিকে রাণী
বুঝতে লাগলেন,
মাথায় সেঁদ্যে ব
লুম এবারে
হবে। আ

তেমনি, ভক্তি,—য্যাতক্ষণ সে পরের ওপর, নিজের বাপ্‌মা, খুড়ি, পিসি,—এদের ওপর ভক্তি, এদের বাধ্য হওয়া সে তো ঘরোয়া ব্যাপার, তার মধ্যে আর মজ্জেদাই বা কোথায় পুণ্যিই বা কোথায়? বাইরে দয়া, ধর্ম, নিচু ভাব—যাই বলুন, তা বলে, মেয়ের মুখ চাইতে হবে, পরিবারের বুক চাপড়ানি গেরাহ্যি করতে হবে. খুড়ি-পিসির কথায় কান দিতে হবে—তাহলেই তো ধম্ম করা হয়েছে মানুষের; কথাটা বুঝলেন না?"

বলিলাম—"তারপর কি হোল বল।"

"বিয়ের জন্যে হুলুস্থুলু পড়ে গেল। এই শেষ কাজ, এর পরেই বিন্দাবন যাবেন, আয়োজনের আর কোন হিসেব রইল না। যেখানকার যা নামকরা সেরা জিনিস—বাইজী থেকে নিয়ে রংতামাসা, বাজনাবাদ্যি—সব জোগাড় করবার জন্যে চারিদিকে লোক ছুটল—কোথায় কাশী, কোথায় ঢাকা, কোথায় মুর্শিদাবাদ, কোথায় কলকাতা—ত্যাখন রেল হয়নি, ডাকের ব্যাপার, একটা হৈহৈ পড়ে গেল।

দিন যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল রাণীমা ততই যেন পাগলের মতন হয়ে উঠতে লাগল, পেটে ধরেচে তো? —তার ওপর ঐ রকম মেয়ে, দেবকন্যে বললেই হয়। শেষে য্যাখন কুল্যে তিনটি দিন বাকি, আর কোন রাস্তা না দেখে আমার বাবাকে ডেকে পাঠালেন। কর্তা নেশা-ভাঙ্ ছেড়ে দেওয়ায় বাবার সন্ধেবেলায় আর এদানি কোন কাজ ছেল না; মনমরা হয়ে বসে থাকত, বেশ মনে পড়ে রাণীমার খাস দাসী সৈরভী এসে বাবাকে চুপি চুপি ডেকে নিয়ে গেল।

সামনে বেরুত না, দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে সামনে এগিয়ে দিয়ে রাণীমা চোখের জল মুছতে মুছতে অনেক কথা বললে বাবাকে "—শিবদাস"—বাবার নাম ছেল শিবদাস—বললে, "শিবদাস আত্তহত্যে মহাপাপ, নৈলে মেয়েটাকে বুকে করে কুয়োর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তুম। আর তা কোন উপায় নেই, তুমি পুরণ চাকর—শুদু পুরণই নয়, বংশগত চাকর—কত পুরুষ ধরে তোমাদের বংশে এ বাড়ির অন্নজল খেয়েছে—আর কোন উপায় না দেখে মেয়েটাকে তোমার হাতে সঁপে দিলুম। তুমি মসনের চৌধুরী বংশের নাম ডুবতে দিও না। কিছু একটা উপায় করো, না পারো, বিয়ের দিন সন্দের সময় আমার কাছে এসে বলো—পারলুম না রাণীমা—আমি মেয়েটাকে তোমার হাতে তুলে দেব, নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিও। আমি কোথায় রাজাপুরের মুকুজ্জেদের ছেলে-টিকে মনে মনে এঁচে রেখেছিলুম—যেমন নিকষ কুলিনের বংশ, তেমনি কাছে পিঠেও হোত।...তা, ভাসিয়ে দিয়ে এসো পোড়া-কপালীকে।"

কম কথা নয় তো দাদাঠাকুর, কিই বা বামতা বাবার? অথচ স্বয়ং রাণীমা নিজে ডেকে বললেন অমন কাতরে কাতরে। পরের দিন আর বাবাকে কেউ দাঁতে কুটোটি কাটাতে পারলে না, যখনই দেখি নিঝুম হয়ে বসে ভাবচেই—ভাবচেই—ভাবচেই। সন্দের সময় গিয়ে হঠাৎ ঝেড়ে ঝুড়ে উঠল, মাকে বললে—রুপোর মা—বাবা আমায় রুপো বলে ডাকতো—বলল, রুপোর মা, বেশ একটু তোয়াজ করে রান্নাটা কর্ দিকিন, জাল ফেলে একটা মাছও তুলে দিচ্চি। মা বললে—সমস্ত দিন উপোসের পর হঠাৎ রান্নার আদর, বলি ব্যাপারখানা কি? বাবা বললে—তুই কর তো জোগাড়, আজ ফাঁসির খাওয়া খেয়ে নিতে হবে। ...মা সুদোলে—বলি ব্যাপারখানা কি আগে তাই কও,—এমন অমঙ্গুলে কথা!.........বাবা বললে—ঐ তো বললুম, আজ ফাঁসির খাওয়া খেয়ে নিতে হবে, কাল এসপার কি ওসপার; তোর সিঁদুরের জোর থাকে ফিরে পাবি, নৈলে থান কাপড় বরাদ্দ।'.........এর বেশি আর ভাঙলে না।"

সুতোয় কি রকম একটু জোট পাকাইয়া গেছে; স্বরূপ সেটা ঠিক করিয়া লইয়া আবার আরম্ভ করিল—"মসনের ঠিক বাইরে সরস্বতীর ধারে তাঁবু ফেলে বরযাত্রীরা এসে উঠল। এমন প্রায় পাঁচশ লোক হবে। মসনেতে বিয়ের এমন আয়োজন এর আগে কেউ দেখে নি দাদাঠাকুর, যেমন এদিকে ঘটা তেমনি ওদিকে ঘটা। হাতী, ঘোড়া, পাল্‌কি, তাঞ্জাম, গাড়ি, জুড়ি, বাজনা-বাদ্যি। একটা গুজব উঠল, কুসমির ওনারা নাকি আবার গড়ের-বাদ্যির ব্যবস্থা করেচে, কোলকাতার কেল্লা থেকে নাকি গোরার দল এসে সেই বাজনা বাজাবে। ত্যাখন গড়ের-বাদ্যি এমন হ্যালা-ফ্যালার জিনিস হয়নি দাদাঠাকুর, গোরাও এ রকম বাঁশতলায়, ডোবার ধারে হ্যাংলার মতন ঘুরে বেড়াত না; আমরা সবাই দেখতে ছুটলুম। ভেতরের তাঁবুগুলোর দিকে যাওয়া গেল না, কাজেই চোখে দেখাটা আর হয়ে উঠল না কারুর। নানারকম গুজব উঠল; কেউ বললে বাবুদের তাঁবুর পাশেই তাদের আস্তানা, কেউ বললে এখনও এসে পোঁচোয়নি, সন্দের সময় ঠিক মোয়াড়ায় এসে হাজির হবে; কেউ বললে গোরা নয়, গোরার সাজপরা মোছলমান বাজনদারের দল। হাজার রকমের গুজব। ব্যবস্থা হল, বরযাত্রীর দল মসনেয় ঢুকে আদ্যেকটা পথ নিজেরা আসবে—রতন দিঘীর জোড়া মন্দির পজ্জন্ত, সেখান থেকে কন্যেযাত্রীর দল তানাদের অভ্যত্থনা করে নিয়ে আসবে, কত্তা একটু এগিয়ে দেউড়ির সামনেতে গিয়ে অভ্যত্থনা করবেন।... দামোদর চৌধুরীর মেয়ের বিয়ে নিয়ে অনেক গপ্প চলিত আচে মসনেয় দাদাঠাকুর, ওরকম আয়োজন আর তার পূর্বে এখানে হয়নি কি নাঃ একটা শুনবেন—বরযাত্রীদের জন্যে—রতনদিঘী থেকে সারা পথটা মখমল দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল। অতটা বিশ্বেস করবেন না, তবে হ্যাঁ, যা হয়েছেল তা এ তল্লাটে কোনখানেই কোনকালে হয়নি—এক রামায়ণ-মহাভারতেই শোনা যায়।

সন্দের আগে তিনবার ডেকে পাঠালেন রাণীমা। প্রেথম পহরেই লগ্ন, শেষবার ডেকে আর কাকুতি-মিনতি নয়, একেবারে শাপমন্যি—'তোমরা পুরুষানুক্রমে এঁদের নেমক খেয়ে এসেচ, লক্ষ্মীপ্রিতিমে চোখের সামনে ভেসে যেতে দেখেও কিছু করলেন না, নিব্বংশ হবে, সমস্ত মসনে শ্মশান হয়ে যাবে, এই আমি পাতব্বাক্যে বলচি'—এইরকম কত কথা, একেবারে পাগলের মতন হয়ে গেছেন কিনা। বাবা মুখটি বুজে শুনে গেল, একটা মতলব ঠাউরেচে, কিন্তু লাগবে কিনা লাগবে তার তো ঠিক নেই। শুদু বললে—'মা, চেষ্টার কসুর করচি না, তবে সবই তো মা জগদম্বার হাতে। কালী হয়েচে তিনি অসি ছেড়ে বাঁশী ধরেচে, নৈলে মসনের লক্ষ্মী-প্রিতিমের দিকে কিনা কুসমির কালপেঁচায় নজর দেয়? তবু করচি চেষ্টা, আপনি রাজা-পুরের ওনাদের আনিয়ে রেখো চুপিচুপি; না পারি আশীব্বাদ করো তোমার শাপমন্যিগুনো যেন আমার বরে দাঁড়ায়, এ অঘটন চোখে দেখবার আগেই যেন শিবেকে চোখ বুজতে হয়।

সেই রকম ব্যবস্থাই করেছেল কিনা বাবা, দাদাঠাকুর। ঐ যে আগের রাত্তিরে মাকে বললে, এসপার কি ওসপার হবে, ফাঁসির খাওয়া খাচ্চি, তার অর্থটা কি? কুমড়ো বলি দিয়ে যখন মা'র পুজো হচ্চে, চুপি চুপি পুরুতমশাইয়ের হাতে একটিএক নম্বর খাঁটির বোতল তুলে দিয়ে বললে—"পুরুতঠাকুর, কত্তার হুকুমে এসব তো ছেড়ে দিয়েচি, তবে আজ নাকি বড় সুখের দিন; সুদু এক রাত্তিরের জন্যে লঙ্ঘন করব কত্তার হুকুম। আপনি বেদ, পুরাণ, তন্ত্র; আগমে যত মন্ত্র আছে, সব এই বোতলটির মধ্যে ঠেসে খুব কড়া গোছের 'কারণ' করে দিন, যেন এক চুমুকেই জন্ম পালটে যায়।

তাই গেলোও দাদাঠাকুর, সেকথা পরে বলচি।

সন্দের একটু আগে তোড়জোড় করে বরযাত্রী বেরিয়ে পড়ল। মিনিটে মিনিটে কত্তার কাচে লোক পোঁছুতে লাগল—কতদূর এগুল, কি বিত্তান্ত এই সব খবর নিয়ে। সন্দের একটু পরে গা-ঢাকা হতে বরযাত্রীরা রতনদীঘির জোড়ামন্দিরের সামনে এসে পোঁচুল। এখান থেকে এনাদের এলাকা, দুদলের বাজনা বাদ্যি, নোক-নস্কর গুছিয়ে একত্তর কপে নিয়ে আবার এগুবে। কি ভেবে বাবা আমায় সমস্তদিন দেউড়ীতে নিজের কাচে আটকে রেখেছে। কাণপেতে রয়েছি গড়ের বাদ্যি বাজবে কখন, ও জিনিস তো শুনিনি

তার
তো দে

আগে কখনও। বাবাকে একবার সুদোলাম, বাবা বল্লে—'সময় হলেই বাজবে, তুই ঠাণ্ডা হয়ে বোস তো।'

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি দাদাঠাকুর, আসল কথাটাই। দামোদর চৌধুরীর বোনাইয়ের কথা বলেচি না?—সেই যে গোড়াতেই যিনি বোষ্টম বাবাজীকে ডেকে এনে অনিষ্ট ঘটিয়ে বিন্দাবনে চলে গেছল। আজ বিয়ে, আগের দিন বৈকালে তিনি হঠাৎ এসে হাজির। চেহারার সে জলুস নেই, কেমন একটা যেন মনমরা ভাব; কিছু অবিশ্যি ভেঙে বললে না নিজের মুখে, তবে আমার মন বললে যেন ওসব বোষ্টম-বাবাজীটাবাজী কিছু নয়, কোন এক জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছেল—ফোঁপরা করে ছেড়ে দিয়েচে। যাই হোক, তিনিও হাজির ছেল, ওদিক থেকে বরযাত্রী দেউড়িতে এসে পোঁছুবে আর শালা-ভগ্নীপতে নেমে গিয়ে অভ্যথনা করবে।

সন্দে উৎরে গিয়ে বেশ গা-ঢাকা গোছের হয়েচে, দলটা এইবার জোড়ামন্দির ছাড়বে, হৈ-চৈটা বেড়ে উঠেচে, এমন সময় বাবা যথ-পদ্ধতি গলায় গামছা জড়িয়ে এসে সুদোলে—'হুজুরের সরবৎটা কি এখনই খেয়ে নেবেন আজ? এর পরে আর ফুরসৎ থাকবে না কিনা—তাই জেনে নিচ্চি।'

আহারের পূব্বে যে সময়টা আগে নেশার ব্যাপার চলত, সে সময় এখন শ্বেতপাথরের জয়পুরী গেলাসে করে এক গেলাস সরবৎ খাওয়ার রেওয়াজ করেছিলেন চৌধুরী মশাই, বাবাই তোয়ের করত, বাবাই এনে দিত। চৌধুরী মশাই বললে—'তা তুই মন্দ বলিস নি, দোরে বরযাত্রী এসে গেল, আর কি ফুরসৎ পাবো? —জোগাড় করগে।'

এক গেলাসের বেশি খেতেন না, মালটানা মুখে মিছরীর সরবৎ ভালো লাগবে কেন? নেহাৎ মনকে চোখঠারা বৈতো নয়। বেশি খেতেন না, কিন্তু তোয়াজ ছেল, সেইরকম শ্বেতপাথরের গোলটেবিলের সামনে কোচে বসে, একটু একটু করে চাখতে চাখতে, গপ্প করতে করতে খাওয়া চলত। বাবা তোয়ের করতে গেল।"........স্বরূপ সতৃষ্ণনয়নে বার-দুয়েক কলিকাটার পানে চাহিল, হুঁকাটা বাড়াইয়া বলিলাম—"নাও, দুটো টান দিয়ে নাও স্বরূপ।"

একটু দম করিয়া লইয়া কলিকাটি হুঁকার মাথায় বসাইয়া দিয়া স্বরূপ বলিতে লাগিল—"সরবৎ দিয়েই দোরের আড়াল হয়ে বাবা তো কাঁপতে কাঁপতে ইষ্টিমন্ত্র জপ সুরু করে দিলে। সরবতটা কি বুঝেচেন তো দাদা-ঠাকুর? সেই কারণকরা এক নম্বর বিলিতি মাল, নিজ্জলা খাঁটি একেবারে। তায় ইদিকে দু'মাসের উপোসী, একটা চুমুক দিলেই একেবারে বেম্মতলে গিয়ে উঠবে।......বাবা তো বাঁশপাতার মতন কাঁপতে লাগল দাদাঠাকুর। তারপরেই সেই সিংহি ডাক—'শিবে!'......বাবা তো দুগ্গানাম স্মরণ করে গলায় গামছা দিয়ে সামনে এসে হাজির হোলো। চিন্তামণি ঠাকুর ত্যাখনও চুমুক দিচ্চে, চৌধুরী মশাইয়ের গেলাস খালি। বাবার মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, চোখ রাঙা হয়ে রয়েচে, গা ঈষৎ দুলচে; জিগ্যেস করলে—'সরবৎ তুই নিজের হাতে তোয়ের করেচিস? বাবা হাত-জোড় করে বললে—'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।'......'খাসা বানিয়েচিস তো; আর আচে?' বাবা বললে—'আজ মেহনৎ পড়বে হুজুরের, তাই একটু বেশি করেই বানিয়েছি।'......'লে আও, রায়মশাই আপনারও চাই তো?' রায়মশাই বললে—'তা দিক্, বিন্দাবন ছেড়ে ইস্তক এ রকম সরবৎ কৈ দেখিনি তো।' তারপরেই স্রেফ লে আও, আর লে আও......বাবা সব ব্যবস্থাই করে রেখেছেল, দেখতে দেখতে চারটি বোতল খালি হয়ে গেল। এমন সময় গড়ের বাদ্যি বেজে উঠল, মানে জোড়ামন্দির তলা থেকে বরযাত্রী কণেযাত্রী মিলে আবার এগুতে সুরু করলে আর কি। চৌধুরী-মশাই জবার মতন টকটকে চোখ দুটো তুলে সুদোলে—খাজনা কিসের?'

ওই জন্যই ব্যবস্থাটা করা কিনা বাবার, মানে পেটে একটু পড়লে চৌধুরীমশাইয়ের আর আগেকার কথা কিছু মনে থাকত না, বাবা ভাবলে, বিয়ে রদ করতে হলে সেই সাবেকের চৌধুরী মশাইকে ফিরিয়ে আনতে হবে, আর সাবেকের চৌধুরীমশাইকে ফেরাবার ঐ একটি মাত্র মন্তর আচে। বাবার শুধু ভয় ছেল উল্ট না হয়ে যায়, এমন ব্যাপারটা তো হয়নি দু'মাসের মধ্যে।......বললে—'আজ্ঞে, দুগ্গা-মাকে বিয়ে করে নিতে এসেচে কুসমি থেকে।'......চৌধুরীমশাই টলতে টলতে একেবারে দাঁড়িয়ে উঠল; এক চুমুকেই জ্ঞান থাকে না—আর এ প্রায় দু'পাট সফা হয়ে গেছে; রাগটাকে যেন চাপবার চেষ্টা করে সুদোলে—কার হুকুমে?......রায়-মশাই, আপনি হুকুম দিয়েচেন?'......রায়মশাই বললে—'আমি! কুসুমিকে। তা ভেন্ন এ তো বিয়ের সানাই নয়, গড়ের বাদ্যি, লুটে নিয়ে যাবার ব্যাপার দেখচি যে।' ...আর যাবে কোথায়? দেউড়ী কাঁপিয়ে সেই পুরণ গলা বরযাত্রীর বাজনার ওপর গিয়ে উঠল—'কোই হ্যায়? কুসমির শালারা এসে আমার ঘর থেকে আমার মেয়ে লুটে নিয়ে যাবে? গড়ের বাদ্যি বাজিয়ে? বাগ্দিপাড়ার বেটোরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে? লে আও আমার বন্দুক, একাই লড়েঙ্গা।'

আর বলতে আচে? বাবা আন্দাজে আন্দাজে সব ব্যবস্থাই করে রেখেছেল, নুটে বাগ্দির দল রে-রে করে গিয়ে একেবারে বরযাত্রীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপরে সে যুদ্ধ!...কথাটা বুঝলেন না দাদাঠাকুর? কুসমির বাবুরাও একটু ধাঁধার মধ্যে পড়ে গিয়ে ভেতরে ভেতরে তোয়ের হয়ে এসেছিল কতকটা—ভাবলে, ভালো রে ভালো, এক কথাতেই মেয়ে দিতে রাজী হয়ে গেল,—মসনের দামোদর চৌধুরী, ব্যাপারখানা কি!... মোছলমানও না, অন্য জাতও নয়, গোর'র দলই গড়ের-বাদ্যি বাজাচ্ছেল দাদাঠাকুর, কুসমির বাবুদের সরকারে খুব খাতির ছেল তো?—বলে-কয়ে কি করে জোগাড় করেছেল। চৌধুরীমশাইয়ের হুকুমে তাদের ঘেরে-ঘুরে এনে দেউড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে। তারা ভাবলে, এ শ্রাদ্ধের বুঝি এই রীত—তায় মদ গিলে আছে—গলা ফাটিয়ে লড়াইয়ের বাদ্যি শুরু করে দিলে।

লড়াই আর কি হবে দাদাঠাকুর? এক-দিকে সমস্ত গ্রাম আর একদিকে গোটাকতক বরযাত্রী—সমস্ত রাত শুধু খোঁজ—খোঁজ, মার মার শব্দ, আর তার সঙ্গে গড়ের-বাদ্যি। বর-যাত্রীদের কত লোক খানায় পড়ল, কত লোক ডোবায় ফেলে হাঁড়ি মাথায় দিয়ে কাটালে, আবার কত লোক সরস্বতী পেরিয়ে পালাতে গিয়ে একেবারে বৈতিরিণীর পারে গিয়ে উঠল। শেষরাত্তির পর্যন্ত শব্দ যদি কমল, বাদ্যি আর থামে না। গোরা, রক্ত গরম হয়ে গেছে কিনা দাদাঠাকুর। বাজিয়ে চলেচে তো বাজিয়েই চলেচে—ঝমোর ঝমোর ঝম্—ঝমোর ঝমোর ঝম্......

তাই বলছিলুম—গড়ের বাদ্যি শুনেছিলুম সেই একবার। আজকাল তো হুট বলতে গড়ের বাদ্যি, জাতই মেরে দিলে জিনিসটার।"

ধর্ম্ম ও প্রথা

শ্রীসরলাবালা সরকার

মানুষ পশুজীবন হইতে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া মানুষ হইয়াছে। মানুষের সেই পশুজীবনের পশুত্ব মানুষ হইয়াও একেবারে লোপ পায় নাই। তাহার ভিতর পশুত্ব অনেক-স্থলে পূর্ণমাত্রাতেই আছে, কিন্তু আবার সেই সঙ্গে দেবত্বও আছে—যে দেবত্ব তাহাকে পশুত্বের ভাব হইতে আকর্ষণ করিয়া আর এক উন্নততর পথে লইয়া যাইতেছে। সেইজন্য মানুষের ভিতর দুইরকম প্রকৃতি দেখা যায়, একটি পশুপ্রকৃতি এবং অপরটি দেবপ্রকৃতি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবী ও আসুরী সম্পদ বিভাগযোগে মানুষের এই দ্বিবিধ প্রকৃতির বর্ণনা আছে। এই দৈবী ও আসুর ভাব যে পৃথক্ ভাবে থাকে তাহা নয়, অধিকাংশ স্থলে জড়িতভাবেই থাকে। একই ব্যক্তির প্রকৃতিতে আমরা কখনও দৈবী কখনও বা আসুর ভাবের প্রকাশ দেখিতে পাই। দৈবী-ভাবাপন্ন ব্যক্তির ভিতরেও যে কিছু কিছু আসুর বা পশুভাব সংগুপ্ত আছে তাহার পরিচয় মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। আবার যাঁহাদের ভিতর আসুর ভাবই অধিক তাঁহারাও দৈবীভাব হইতে একেবারে বর্জিত নহেন তাহার পরিচয়ও আমরা মাঝে মাঝে পাইয়া থাকি।

চিন্তাশীল মনীষিগণ মানুষের ভিতরে যে দুইরকম প্রকৃতি আছে তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন এবং সে বিষয়ে আলোচনাও করিয়াছেন। বিখ্যাত ঔপন্যাসিকগণের অঙ্কিত চরিত্রে পাত্রপাত্রীদিগের মনোবিশ্লেষণের ভিতর দিয়া আমরা মানুষের অন্তর্নিহিত এই দ্বিবিধ ভাবের পরিচয় পাই। এই দুইভাবে এবং বিশেষ করিয়া তাহার প্রত্যেক কার্য, প্রত্যেক সংস্কার ও অনুভূতিগুলি এমনভাবে প্রভাবিত হয় যে, অনেক সময় মানুষ সহজভাবেই অতি অন্যায় আচরণকেও ন্যায় বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে।

মানুষের সকল প্রকার সংস্কারের ভিতর ধর্মবোধের সংস্কার প্রবলতম। ধৃ ধাতু হইতে "ধর্ম" শব্দের উৎপত্তি। যাহা ধরিয়া মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় তাহাই মানুষের ধর্ম। কিন্তু এই ধর্মভাবের ভিতরেও মানুষের চরিত্রগত দেবভাব ও পশুভাব প্রতিফলিত হয়, এমনকি ধর্মকেই আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহারা পশুত্বের চরম অভি-ব্যক্তিকেও মহাধার্মিকতা বলিয়া গর্ব করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ধর্মের নাম লইয়া মানুষ যেভাবে তাহার অন্তর্নিহিত পাশবিক হিংসা প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়াছে সহজভাবে তাহা কখনই পারিত না।

মানবসমাজে "ধর্মভাবের" কাজ এই যে, মানুষের সম্মুখে এমন এক আদর্শ স্থাপন, যাহা অবলম্বন করিয়া মানুষ তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে উন্নীত হইতে পারে। ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্বল্য পরিহার করিয়া মহীয়ান্ হইতে পারে। কিন্তু যে সরিষা দিয়া ভূত ছাড়ানো যাইবে তাহাতেই ভূতের গুপ্তভাবে অবস্থানের ন্যায় এই ধর্ম নামধেয় সংস্কারের ভিতরেই তাহার অন্তর্নিহিত পশুভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়া তাহাকে এমন এক পথে পরিচালিত করিয়া থাকে, যাহা প্রকৃত মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত পথ।

যুগে যুগে এইভাবে ধর্মের গ্লানি ঘটিয়াছে এবং যুগে যুগে এক একজন মহা-পুরুষ আবির্ভূত হইয়া প্রচলিত ধর্মকে আদর্শভ্রষ্টতা হইতে উদ্ধার করিয়া মানব-সমাজের সম্মুখে ধর্মের প্রকৃত আদর্শ স্থাপন করিয়া মানবজাতিকে উন্নত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। দেশভেদে ও কালভেদে জগতের সর্বত্র নানা মহাপুরুষের উদ্ভব হইয়াছে, কিন্তু সর্বত্রই তাঁহারা ধর্মের যে আদর্শ প্রচার করিয়াছেন তাহার ভিতর একটি বিশেষ মিল আছে। ধর্মের আদর্শের ভিতর ইহাই তাঁহাদের প্রধান কথা যে, "তোমাদের জন্মের সহিত যে প্রবৃত্তিগুলি লাভ করিয়াছ—সেগুলিকে হীন-পথ হইতে ফিরাইয়া উচ্চপথে পরিচালিত কর, অর্থাৎ সেগুলিকে ব্যক্তিগত ভোগের লালসা চরিতার্থের প্রয়াস, উচ্ছৃংখলতা, অন্তর্নিহিত হিংসা প্রভৃতির পথে ধাবিত হইতে না দিয়া সংযত কর; সেই সংযমে যে শক্তি অর্জিত ও সংহত হইবে সেই শক্তিকে সমাজের, দেশের—সমস্ত মানবজাতির উন্নতির জন্য দান কর, এবং ইহাই মানবজীবনের পরম তপস্যা ও একমাত্র উন্নতির পথ।" যুগে যুগে এইভাবে মহাপুরুষগণের দ্বারা ধর্মের সারতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে এবং সেই ধর্মনীতি সমসাময়িক জনগণের মনে কতকটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে কিন্তু তাঁহাদের লোকান্তরের পর অধিক দিন আর সে প্রভাব টিকিয়া থাকে না। তাঁহারই পরবর্তী প্রচারকগণের ভিতর তাঁহার ধর্মনীতির আদর্শ আর তেমন সজীব থাকে না, সেই আদর্শে নানা বিকৃত ব্যাখ্যা সংযোজিত হয়, প্রচারকগণের ভিতরও নেতৃত্বের অভিমান ও অহমিকা প্রবল হইয়া উঠে। দেবভাবের স্থানে ক্রমশঃ দলগত প্রভুত্বস্পৃহা, পদমর্যাদা ও শক্তির অপব্যবহার, মতবাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি প্রকট হইয়া উঠে। নেতাদিগেরই যখন এরূপ অবস্থা তখন তাঁহাদের অনুবর্তী শিষ্য-গণের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়।

আমাদের এই ভারতবর্ষ এককালে হিন্দু-গণেরই আবাসভূমি ছিল, এখনও ইহা 'হিন্দুস্থান' নামে পরিচিত। ভারতবর্ষ 'দেশ' হইলেও মহাদেশের সমস্ত লক্ষণ ইহাতে বর্তমান। এই দেশের নানা প্রদেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন আচার অবলম্বী, বিভিন্ন মতবাদ আশ্রয়ী বহু হিন্দু বাস করেন এবং তাঁহারা সকলেই আপনাকে 'হিন্দু' বলিয়াই

মনে করেন। তাঁহাদের একের আচার ও মতের সহিত অপরের আচার ও মতের হয়তো সম্পূর্ণ পার্থক্য আছে কিন্তু এই আচার ব্যবহারের পার্থক্যে তাঁহাদের হিন্দুত্বের কোন বাধা হয় না, এবং ইহাতেই বুঝা যায় 'ধর্ম' আচার ও মতবাদ বা প্রথার সমষ্টিমাত্র নয়। ভারতবর্ষের কথা দূরে থাকুক, এই বাঙ্গলা-দেশেই হিন্দুদিগের মধ্যে যে কত ধর্মসম্প্রদায় আছে ও দিনে দিনে কত নূতন ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই। বিশাল হিন্দুধর্মস্বরূপ মহামহীরুহের এই সম্প্রদায়-গুলি যেন শাখা-প্রশাখাস্বরূপ। হিন্দুধর্মকে বৃক্ষের সহিত তুলনা করায় ইহা সুস্পষ্ট হয় যে, সমগ্র ধর্মের একই মূল, এবং সেই মূলই তাহার জীবনস্বরূপ, তাহার উপরেই তাহার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার তথা সমস্ত হিন্দুজাতির জাতিত্ব ও অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে।

কিন্তু হিন্দু এখন পল্লবগ্রাহী, মূলের সম্বন্ধে তাহার কোন চেতনা নাই। বস্তুতঃ হিন্দু এখন যেধর্ম মানিয়া চলেন তাহা প্রথাগত ধর্ম, আচারগত ধর্ম বা সম্প্রদায়গত ধর্ম। অবশ্য এই প্রথা ও আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি প্রত্যেক ধর্মমতের সহিতই জড়িত থাকে। আমরা ধর্ম মানিয়া চলিতেছি, আমরা ধর্ম সাধনা করিতেছি—ইহার কতকগুলি বাহ্য নিদর্শনস্বরূপ এই আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। দেশভেদে কালভেদে এই আচার, অনুষ্ঠান ও প্রথার বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের বাঙ্গলাদেশের কতকগুলি স্থানে বিধবারা নির্জলা একাদশী-প্রথা ধর্মের কঠোর অনুশাসনরূপে প্রচলিত আছে, আবার কতক অংশে এই প্রথা তেমন-ভাবে প্রচলিত নাই। উত্তরবঙ্গে রাজসাহী, নাটোর প্রভৃতি স্থানে অর্থাৎ বরেন্দ্রভূমে এবং নবদ্বীপ শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে এই প্রথার এমন কঠিন প্রচলন ছিল (অধুনা কিছু শিথিল হইয়াছে) যে ৮।৯ বৎসরের শিশু বিধবা এবং অশীতিপর বৃদ্ধা নির্জলা একাদশী ব্রতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন অথচ তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনও মহাপাতক হইবার ভয়ে তাহাদের মুখে একবিন্দু জল দিতে পারে নাই। আবার অল্প দূরে পদ্মাপারে পূর্ববঙ্গে ঢাকা প্রভৃতি স্থানে একাদশীর এই কঠোর প্রথা একেবারেই নাই, বিধবারা ফল দুগ্ধ মিষ্ট প্রভৃতি পরিতোষরূপে আহার করিতে পারেন, কেবলমাত্র অন্নব্যঞ্জন বা গোধুমজাত পাকদ্রব্য আহার করেন না। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এভাবে নির্জলা একাদশী পালন পুত্রবতী বিধবার পক্ষে পুত্রের অকল্যাণকর বলা হয়। অথচ ইঁহারা সকলেই নিষ্ঠাবান হিন্দু।

প্রথা এইভাবে ধর্মের নাম লইয়া প্রচলিত হওয়াতে সংস্কারবশীভূত জনসাধারণ ইহার সংস্কার ত্যাগ করিতে পারেন না, ইহা আমরা বুঝিতে পারি, কিন্তু যখন দেখি, বহু শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতও সংস্কারের বশীভূত হইয়া বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিতেছেন তখন সংস্কারের মোহ যে কত প্রবল তাহার অনেকটা ধারণা হয়। এই যে প্রথা, যাহা এককালে হয়তো কোন কারণবশতঃ প্রচলিত হইয়াছিল এবং ধর্মের নামে চলিয়া আসিতেছিল, কালক্রমে তাহাই আবার দারুণ অধর্মরূপে পরিগণিত হইল এমনও দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বৈদিক যুগে যজ্ঞে গাভী ও বৃষ বলিদানের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। এককালে যাহা ধর্মের নামে প্রচলিত ছিল, এখন কোন হিন্দু কি পূজায় ছাগের পরিবর্তে গাভী বলিদান কল্পনাও করিতে পারেন? অথচ তাঁহারাই বলিদানপ্রথা ধর্মের নামে সমর্থন করিবার জন্য বেদকে সাক্ষী মানেন ও বৈদিক যুগের যজ্ঞের কথা টানিয়া আনেন।

এই সমস্ত প্রথা সময় সময় এত নিষ্ঠুর বীভৎস যে, সহজ বুদ্ধিতে কোন মানুষই তাহা সমর্থন করিতে পারে না, কিন্তু ধর্মের সংস্কার স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিকে এমন মোহ-গ্রস্ত করে যে, সেই দারুণ নৃশংসপ্রথাও মানুষ অক্লেশে সমর্থন করিয়া যায়। এ বিষয়ে পণ্ডিত ও মূর্খের ভেদ দেখা যায় না। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দেবীপূজায় মহিষাসুর বধ বলিয়া একটি প্রথা আছে। দেবী মহিষাসুর বধ করিয়াছিলেন তাহাই স্মরণ করাইবার জন্য বোধ হয় এই প্রথার সৃষ্টি। একটি মহিষকে সামান্য আহত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং পূজার উৎসবে যোগদানকারী গ্রামবাসিগণ চারিধারে বর্শা, সড়কী প্রভৃতি অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া স্থানটি ঘিরিয়া থাকে। আঘাতপ্রাপ্ত মহিষ প্রাণ বাঁচাইবার জন্য যেদিকে ছুটিতে থাকে সেই দিক হইতেই সড়কী বর্শা প্রভৃতির আঘাত পায়। প্রাণের দায়ে পাগলের মত দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া যতক্ষণ তাহার সামর্থ্য থাকে ততক্ষণ চারিধারে ছুটিয়া বেড়ায় ও গ্রামবাসিগণ মহোৎসাহে মহিষাসুর বধরূপ পুণ্যকার্য করে, অবশেষে যখন নিস্তেজ হইয়া মাটিতে পড়িয়া যায় তখন মহিষাসুর বধ সমাপ্ত হয়।

পুরীধামে সমুদ্রতীরবাসী নুলিয়া জাতিরা মুরগী বলিদান করে। তাহারা জীবন্ত মুরগীর দুই পা সবলে আকর্ষণ করিয়া ছিঁড়িয়া পেটের নাড়িভুঁড়ি বাহির করিয়া ফেলে, ইহাই তাহাদের বলিদানের প্রথা। এগুলি অবশ্য নিরক্ষর গ্রামবাসী ও বর্বর জাতির বলিদান-প্রথা। এই সঙ্গে একজন বিখ্যাত পণ্ডিতেরও মতের উল্লেখ করিতেছি, ইঁনি সুবিখ্যাত দ্রাবিড় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী। ইঁনি অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ, প্রত্যহ বৈদিক মতে অগ্নিহোম করেন। দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে বলিদান রহিত করিবার জন্য শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় যখন দেশে দেশে পণ্ডিতগণের মত সংগ্রহ করিতে-ছিলেন তখন কাশীধামে গিয়া ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং পূজায় বলিদান অবৈধ প্রতিপাদক ব্যবস্থাপত্রে ইঁহার স্বাক্ষর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সে সময় ইঁহার ও শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত যে কথাবার্তা হয় তাহা শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজের কথাতেই এখানে উদ্ধৃত করিতেছিঃ—"আমি তাঁহাকে ব্যবস্থা-পত্রে স্বাক্ষর করিবার অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, 'আমি এই ব্যবস্থাপত্রে সম্মতি দিব কি করিয়া? আমরা যাজ্ঞিক, অগ্নিহোমাদি যজ্ঞে পশু আলম্ভন করিয়া থাকি। আমরা যে পশু আলম্ভন করি তাহার প্রণালী স্বতন্ত্র। যজ্ঞারম্ভের পূর্বে একটি কৃষ্ণবর্ণ সুলক্ষণযুক্ত ছাগ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে যথাবিধি স্নান করাইয়া যজ্ঞক্ষেত্রে আনা হয়। তাহার পর বামহস্তে ছাগকে ধারণ করিয়া ও দক্ষিণহস্তে একখণ্ড প্রস্তর লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক উদ্বর্তন (অর্থাৎ বলপূর্বক প্রস্তর ঘর্ষণ) করিতে করিতে যখন ছাগটি অবসন্ন হইয়া পড়ে তখন তীক্ষ্ণ ছুরিকার দ্বারা উহার দেহ হইতে মাংসখণ্ড কর্তনপূর্বক ঘৃতাক্ত করিয়া যজ্ঞে আহুতি প্রদান করা হয়।" আমি বলিলাম, "যজ্ঞে এরূপ পশু আলম্ভন-প্রণালী বধ্যমান পশুর পক্ষে অত্যধিক যন্ত্রণাদায়ক।" তিনি বলিলেন, "তাহা নিশ্চয়, কিন্তু আমরা মনুষ্যবাণী দ্বারা পরিচালিত হই না, বেদই আমাদের একমাত্র অনুশাসক। বৈদিকবিধি নৃশংসই হউক বা করুণাপূর্ণই হউক উহাই আমাদের শিরোধার্য।"

(শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত। "শক্তিপূজায় ছাগাদি বলিদান বিষয়ে ভারতীয় পণ্ডিতগণের মত" শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী প্রবাসী, আশ্বিন ১৩২০)।

অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের বেদের উপর এই একান্ত শ্রদ্ধা অবশ্য প্রশংসনীয়। কিন্তু বৈদিকবিধি তিনি যথার্থই কি যথাযথ প্রতি-পালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? বেদে গাভী ও বৃষ আলম্ভন সম্বন্ধে যে সকল বিধি আছে এখন কি তিনি সাহস সহকারে সেই সকল বিধি প্রতিপালন করিতে পারিতেন? অথবা বৈদিকযুগের যে সকল অন্যান্য আচার ও অনুষ্ঠান ছিল তাহার সমস্তই সর্বাঙ্গ-সুন্দরভাবে প্রতিপালন করা কি তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত? তবে কৃষ্ণবর্ণ বৎসের পরিবর্তে নিরীহ ছাগশিশুকে অমানুষিক যন্ত্রণা দিবার বিধিটিই বা কেন তাঁহার নিকট এত অবশ্য পালনীয় হইয়া উঠিয়াছিল?

বৈদিকযুগ বহু পূর্বকালের কথা। সে যুগের ভারতবর্ষ হইতে এ যুগের ভারতবর্ষ কালানুযায়ী নানাদিক দিয়া পরিবর্তিত

হইয়াছে। সে যুগের যাজ্ঞিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি এখন আর অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়, তবে পরিবর্তিত আকারে তাহার কিছু অবশেষ হয়তো আছে। কিন্তু হিন্দুধর্মের যাহা মূল-স্বরূপ তাহা আজও অপরিবর্তিতভাবে রহিয়াছে, তাই হিন্দুজাতি আজিও জীবিত আছে। সেই মূল, উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ। যিনি প্রকৃত বৈদিক তিনি বাহিরের আচার অনুষ্ঠানকে আঁকড়াইয়া থাকাকেই ধর্মসাধন বলিয়া গ্রহণ করেন না। বেদ মানিতে হইলে কর্মকান্ড অর্থাৎ বাহিরের অনুষ্ঠানগুলিই মানিব এবং প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার যাহা পথপ্রদর্শন করিতেছে সেই জ্ঞানকান্ডের উপদেশ সম্বন্ধে মাথা ঘামানো অপ্রয়োজনীয় মনে করিব এরূপ মনের ভাবের তাৎপর্য গ্রহণ করা কঠিন। ভগবান শাক্য সিংহ যিনি দশ অবতারের এক অবতাররূপে গণ্য হইয়াছেন তিনি এই নির্দয় যাজ্ঞিক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন; আচার্য শঙ্কর বেদের প্রকৃত তাৎপর্য যাহাতে গৃহীত হয় সেজন্য তাঁহার জীবনের সাধনা দান করিয়া ভারতবর্ষের ধর্মমতকে সজীব করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি আজিও বৈদিক প্রথার দোহাই দিয়া হিন্দুধর্মে বলিদানকে ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়া কেন যে রাখা হইয়াছে এ সম্বন্ধে কোন যুক্তিই পাওয়া যায় না।

আবার অনেক সাধক এই বলিদান প্রথাকে রূপকমাত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, মানুষের অন্তরের কাম, ক্রোধ, লোভ ও অহঙ্কার প্রভৃতি রিপুগুলিকে জগজ্জননীর পাদারবিন্দে উৎসর্গ করাই বলিদানের প্রকৃত তাৎপর্য। অশ্বমেধের অশ্বের যে বিরাট মহান্ রূপ বেদে বর্ণিত আছে, একটি ঘোড়াকে নানাদেশ ঘুরাইয়া আনিয়া যজ্ঞের অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার সহিত তাহার কোন সঙ্গতিই দেখা যায় না। তবে এই প্রথার ভিতর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হয়তো রহিয়াছে এবং তাহা ধর্মের নামে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বাস্তবিক প্রচলিত প্রথাগুলির ভিতর যে কি তাৎপর্য আছে তাহা বুঝিয়া উঠা সহজ নয়। তন্ত্রশাস্ত্রের "পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা" শ্লোকের যদি এই অর্থ করা হয় যে মদ খাইয়া বারবার ভূমিতলে লুণ্ঠিত হওয়াই মোক্ষলাভের উপায়, তাহা হইলে মাতালকে মোক্ষলাভের অধিকারী বলিতে হয়, এবং সমস্ত দেশে তাড়ির দোকান খুলিয়া দেওয়াই মোক্ষসাধনার সহায়তা করা ইহাই মানিয়া লইতে হয়।

সুতরাং শাস্ত্রের বচন সরাসরি অনুসরণ যে নিরাপদ নয় ইহা সহজেই বুঝা যায়। এবং শাস্ত্রও বহুসংখ্যক আর সকল শাস্ত্রকার একমতও নহেন। তবে শাস্ত্র আমরা যতটা মানি বা না মানি প্রথা লঙ্ঘন করার সাহস অল্প লোকেরই থাকে। প্রথাও বহু শ্রেণীর আছে, কতকগুলি প্রচলিত প্রথা, কতকগুলি কৌলিক প্রথা, কতকগুলি আবার দেশানুযায়ী প্রথা। এই সব প্রথার উৎপত্তির কারণ ও ইতিহাস সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিলে অনেক কৌতুককর কাহিনীও পাওয়া যাইতে পারে। এক সময়ে এক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে সত্যনারায়ণ পূজার সময় একটি কালো বিড়াল বারবার পূজার দ্রব্যে মুখ দিতে আসিতেছিল. বাড়ীর পোষা বিড়াল, তাড়াইয়া দিলেও আবার আসে। তাহাকে কোনমতেই নিবারণ করা যায় না দেখিয়া গৃহস্থ বিড়ালটিকে পূজামন্ডপে একটি খুঁটির সহিত দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিলেন। সত্যনারায়ণের কথা শুনিবার ও প্রসাদ গ্রহণ করিবার জন আগত ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইল, বিড়ালটি পূজামন্ডপে খুঁটির সহিত বাঁধা আছে। দেখিয়া তাহাদের মনে হইল ইহাও বোধ হয় নারায়ণ পূজার একটি অঙ্গ। বিড়াল ষষ্ঠীর বাহন, বিশেষতঃ কালো বিড়াল; সত্যনারায়ণ পূজার সময় বিড়ালও নারায়ণ পূজার কথা শুনিলে নিশ্চয়ই গৃহস্থের ধন পুত্রে শ্রীবৃদ্ধি হইবে, তাই ইঁহারা পূজামন্ডপে বিড়ালটিকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। ইহার পর সেই গ্রামে ক্রমশঃ সত্যনারায়ণ পূজার সময় কালো বিড়াল বাঁধিয়া রাখার প্রথা প্রচলিত হইল, অন্য গ্রামবাসী কেহ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সকলে এই উত্তর দিত যে, এটি আমাদের গ্রামের প্রথা।

আমাদের দেশে সতীদাহ প্রথা ছিল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায় এই প্রথা এখন আইন দ্বারা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। স্বামীর সহিত স্ত্রীকেও পরলোক অনুগামী করার প্রথা অতি বর্বর অসভ্য দেশেও আছে। বাড়ীর প্রভুর মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রীদিগকে দাসদাসীদিগকে এবং ঘোড়া, গরু প্রভৃতি কতকগুলি পালিত জীব ও মৃত ব্যক্তির ব্যবহার্য বস্তুগুলিকেও তাহার সহিত কবরস্থ করা হইত। কেননা মৃত ব্যক্তি পরলোকে গিয়া সেইগুলি লইয়া আবার ইহলোকের মতই ঘর-সংসার করিবে। ঠিক এইভাবেরই কথা আমরা মহাভারতে পান্ডু রাজার স্ত্রী মাদ্রীর সহগমনে পাই। মাদ্রী সহমরণে গেলেন, কেননা স্বামী তাঁহাকে উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত না হইতেই সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, মাদ্রী স্বামীর সহগামিনী হইলে তিনি পরলোকে গিয়া সেই উপভোগ সম্পূর্ণ করিতে পারিবেন। ইহা ছাড়া মহাভারতে বা রামায়ণে সতীদাহের অপর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধের পর নিহত বীরগণের পত্নীরা চিতায় পুড়িয়া মরিয়াছিলেন অথবা যদুবংশ ধ্বংসের পর যাদবরমণীদিগকে পুড়িয়া মরিতে হইয়াছিল, সেরূপ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

তবে এই সতীদাহ প্রথা আসিল কোথা হইতে? "অগ্নে বা অগ্রে" এই একটি পুঁথিগত শব্দের অর্থ হইতেই কি শত শত জীবন্ত মানবীকে মৃতের সহিত চিতায় দগ্ধ করিবার হেতুর উৎপত্তি হইয়াছিল? সতীদাহ প্রথার একটি কারণের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সে কারণটি এই যে, স্বামী হইলেন প্রভু, স্ত্রী তাঁহার সম্পত্তিস্বরূপ, সুতরাং স্বামীর মৃত্যুর পরও স্ত্রী জীবিতা রহিয়া পৃথিবীর আলোক বাতাস উপভোগ করিবেন ইহা ঘটিতে দেওয়া অবাঞ্ছনীয়। আর 'পরলোক' আছে, সেখানে যদি স্ত্রী কোটি কোটি বৎসর স্বামীর উপভোগ্যা হইয়া রহিতে পারেন তাহাতো স্ত্রীর পক্ষে পরম সৌভাগ্য। রাজপুতানায় সহমরণ বা 'জহর ব্রতের' প্রধান কারণ ছিল শত্রুর হস্তে পড়িয়া নারীদিগের লাঞ্ছিত হইবার সম্ভাবনা হইতে আত্মরক্ষা। এই লাঞ্ছনার ভয়ে তাঁহারা আগেই পুড়িয়া মরিতেন অথবা পুড়িয়া মরিতে বাধ্য হইতেন। যাহা হউক যত দেশেই যত সহমরণ প্রথা থাকুক বাঙ্গলা দেশ এক সময় সহমরণের প্রতিযোগিতায় সকল দেশকেই হারাইয়া দিয়াছিল। বাঙ্গলা দেশে কুলীন ব্রাহ্মণগণের বিবাহ করাই জীবিকাস্বরূপ ছিল, এজন্য তাঁহারা অনেক বিবাহ করিতেন। তাঁহাদের সেই সকল তথাকথিত বিবাহিতা স্ত্রীদিগের মধ্যে অনেক স্ত্রী হয়তো বিবাহের পর জীবনে আর স্বামীর দেখাও পাইতেন না, কিন্তু স্বামী মরিলে সহমরণরূপ সৌভাগ্যের অধিকার ভোগ করিতেন। ইহার ভিতর বৈষয়িক হেতুও যে না থাকিত এমন নয়, বিধবা স্ত্রী জীবিতা থাকিলে ভবিষ্যতে স্বামীর সম্পত্তির দাবীও করিতে পারেন। আবার এতগুলি নামেমাত্র বিবাহিতা যদি পরিণামে নিষ্কলঙ্ক না থাকিতে পারেন সে ভয়ও যে ছিল না এমন নয়, সুতরাং বিধবাগুলি স্বামীর সহিত এক চিতায় পুড়িয়া মরিলে অনেক সমস্যারই সহজ নিষ্পত্তি হয়। অতগুলি বিধবাকে বাঁচাইয়া রাখা সমাজের পক্ষে নিরাপদ নয়। কিন্তু জীবন্তে পুড়িয়া মরা সহজ ব্যাপার নয়, কাজেই ইহার জন্য শাস্ত্রের উক্তি, পরলোকে স্বর্গসুখের প্রলোভন, ইহলোকে সুনামের জয়ধ্বনি প্রভৃতি অনেক কিছুই প্রয়োজন হইত। শোকাবেগে বা পুণ্যের প্রলোভনে এবং আত্মীয়স্বজনের প্ররোচনায় বিধবা যদি অনুমৃতা হইবার স্বীকৃতি দিতেন তাহা হইলে পরে আর তাঁহার অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না, জয়ধ্বনি ও তুমুল ঢাকের বাদ্য প্রভৃতির ভিতর অনেক সময় তাঁহাকে বলপূর্বক চিতানলে দগ্ধ করা হইত এরূপ অনেক কাহিনী শুনা যায়। অথচ এই প্রথাই যেন হিন্দুধর্মের প্রাণস্বরূপ, এই প্রথা রহিত হইলে যেন হিন্দুধর্মের একেবারে সর্বনাশ হইবে এইভাবে এই প্রথাকে বাঙ্গলা দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সমর্থন করিয়াছিলেন। সতীদাহ প্রথা যে প্রথামাত্রই, ধর্মের সহিত তাহার কোন

স্পর্ক নাই, এই প্রথা উঠিয়া যাওয়ায় অধুনা তাহা সম্পূর্ণ প্রমাণিত হইয়াছে।

বাঙ্গলা দেশে এককালে তান্ত্রিক ধর্ম বিশেষভাবে প্রবল হইয়াছিল। প্রবল হইবার হেতুও আছে। মৎস্য মদ্য প্রভৃতি পঞ্চ 'ম'কার য সাধনার বিশেষ অঙ্গ তাহাতে যোগ দিতে য অনেকেই লালায়িত হইবেন ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। হিন্দুধর্ম যখন ক্রিয়া বহুল অনুষ্ঠান মাত্রেই পর্যবসিত হইবার পথ আশ্রয় করিল, বৌদ্ধধর্মও যখন তাহার সহজ নিষ্কাম কর্মসাধনার পথ ছাড়িয়া নানা জটিলতাকে ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়া লইল, তখনই তান্ত্রিক ধর্মের আবির্ভাব। এই ধর্ম যেন ক্রিয়াকাণ্ডবাদী হিন্দু ও বিপথগামী বৌদ্ধ এই উভয় ধর্মমতের সংমিশ্রণে নানা রহস্যজালের আবরণে আবৃত এক অভিনব সাধনপদ্ধতি। শোনা যায় অনেক তান্ত্রিক সাধক সাধনপথে সিদ্ধিলাভ করিয়া মহাশক্তিশালী হইয়াছিলেন, কিন্তু সে শোনা কথা মাত্র। বেদের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ডের ন্যায় তন্ত্রেরও দুইপ্রকার সাধনপন্থা আছে, বামমার্গ ও দক্ষিণমার্গ। দক্ষিণমার্গে তন্ত্রের যে সকল লক্ষণ বর্ণিত আছে তাহার সহিত বেদান্তের বিশেষ ঐক্য দেখা যায়। তাহা বামমার্গীয় "বামে রামা রমণকুশলা দক্ষিণে পানপাত্রম্" রূপে সাধন নয়। তবে তাহার মধ্যে নিয়মের গণ্ডী উল্লঙ্ঘনের জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা আছে। মানুষ যেন সাহসী হয়, "ইহা ধর্ম, ইহা ধর্ম নয়" এইভাবে প্রতি পদক্ষেপে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া সহজপথে চলিবার শক্তি না হারায়, সম্ভবতঃ সেইদিকেই ইহার প্রেরণা। "ইহা অধর্ম উহা ধর্ম" এইরূপ সংস্কারও মানুষের সহজভাবে মনুষ্যত্বের পথে চলিবার বাধাস্বরূপ হয়, তাই তন্ত্র হয়তো সেই দিক দিয়াই বলিয়া থাকিবেন "ধর্মাধর্মং যদাত্যক্তং ক্ষিপ্রং মুঞ্চতি মালকঃ।" মানুষের সর্ববিষয়ে সাহসিকতা বাড়াইবার জন্য আমাবস্যা রাত্রে শ্মশানে শবসাধনা প্রভৃতি এবং সামাজিক নিয়মাবলীকে একেবারে উপেক্ষা করিবার সাহস দেখাইবার জন্যই সম্ভবতঃ স্ত্রীপুরুষ মিলিত সাধনার পন্থা প্রবর্তিত করা হইয়াছিল। রহস্যময় আবহাওয়া বিশেষভাবে তন্ত্রের পথে একটি আকর্ষণ ছিল। কিন্তু এততেও মানুষের বন্ধনমোচন হইল না, বরং তান্ত্রিক বিধি-বিধানরূপ এক নূতন বন্ধনের সৃষ্টি হইল।

তান্ত্রিক ধর্মের প্রাবল্যের সময়ে রচিত 'কর্পূর মঞ্জরী' নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত একখানি সট্টকে আমরা তান্ত্রিক সাধনা সম্বন্ধে যে শ্লেষাত্মক বর্ণনা পাই তাহা এইরূপঃ—

ভৈরবানন্দ নামে একজন পরম নিষ্ঠাবান তন্ত্রচারী তন্ত্রের সাধনার সারকথা এইভাবে ব্যক্ত করিতেছেন, যথাঃ—

"মন্তো ন তন্তো ন অকিং কি বর্লেং
ধানং অ নো কিং পি গুরুপ্রসাদা।
মজ্জং পিয়া মো মহিলং রসামো
মোক্ষং ব যামো কুলমগ্গ লগ্না॥"

অর্থাৎ মন্ত্রেরও ধার ধারি না, তন্ত্রেরও ধার ধারি না, ধ্যানেই বা কি প্রয়োজন? গুরুর প্রসাদে মদ্যপান করি, মহিলা ভোগ করি, ইহাতেই কৌলিক মার্গে মোক্ষলাভ হয়।"

এই যে তন্ত্রোক্ত সাধনাপ্রথা এগুলির ব্যাখ্যা দুইভাবে হইতে পারে। তন্ত্রে 'সহজিয়া' নামে এক সম্প্রদায় আছে, তাহাদের সাধন সর্ববন্ধন হীন হইয়া, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ-বুদ্ধি বিসর্জন দিয়া 'সহজ' পথে চলা। ভোগ ও বিলাসিতার ভিতর থাকিয়াও নির্লিপ্তত'। চণ্ডিদাস যেমন বলিয়াছেনঃ—

"সাপের মাথায় ভেকেরে নাচাবি
সাপে না ছুঁইবে তায়।"

এবং আর এক দিকে আমরা ইহাও দেখিতে পাই, এই সাধনপ্রণালীটি রহস্যময়। সুতরাং এ প্রশ্ন সহজেই মনে উদয় হইতে পারে যে, তন্ত্রোক্ত সাধনার উপকরণ স্বরূপ মৎস্য, মাংস, মদ্য প্রভৃতি কি যথার্থই জড়দ্রব্য সম্পর্কিত উপাদান অথবা Mystic Phraselogy রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল? গীতায়ঃ—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধন"

শ্লোকে যজ্ঞ শব্দের তাৎপর্য যেমন পার্থিব ক্রিয়াবহুল স্বার্থ কামনাত্মক যজ্ঞ নহে, বরং ব্যক্তিগত স্বার্থ মহান্ কার্যে (অর্থাৎ ভগবানের জন্য) উৎসর্গ করাই প্রকৃত যজ্ঞ, এখানেও সেইরূপ অর্থ হইতে পারে। গীতার এই যজ্ঞের সহিত,

"ছাগে দত্তে ভবেদ্বাগ্মী, মেষে দত্তে
কবির্ভবেৎ।
মহিষে ধনবৃদ্ধি স্যাদ্মৃগে মোক্ষফলং লভেৎ।
পক্ষিদানে সমৃদ্ধিঃ স্যাদ্ গোধিকায়াং
মহাফলম্।
নরে দত্তে মহদ্ধির্ স্যাদষ্টসিদ্ধি রণুত্তমা।

রূপ যজ্ঞের কোন ঐক্য তো নাই-ই, বরং 'যামিমাং পুষ্পিতা বাচং' এই ফল হইবে সে ফল হইবে" এরূপ কামনাত্মক যজ্ঞের গীতায় বিশেষভাবে নিন্দা করা হইয়াছে।

আমরা ধর্ম ও প্রথা সম্বন্ধে আলোচনায় ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারি, মানবসমাজে কতকগুলি প্রথা ধর্মের নাম লইয়া যখন প্রবল হয়, তখন কি ভাবে মানুষ সংস্কারের মোহে বিচারবুদ্ধি শূন্য হইয়া মনুষ্যত্বের পথ হইতে ভ্রষ্ট হয়। এবং ইহাও দেখিতে পাই যে, প্রকৃত ধর্মের যাহা স্বরূপ তাহা নির্ণয় করা কিরূপ কঠিন। শাস্ত্রবচন বলিয়া যাহা আমরা মানি, বিচার-বুদ্ধির দিক দিয়া হয়তো তাহা একান্ত বর্জনীয়। মনু বলেন,—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ
যুক্তিহীনবিচারেতু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে॥
মনু ১৪।১১৩

অর্থাৎ বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া অযৌক্তিক ভাবে শাস্ত্রের অনুসরণে ধর্ম-হানি হয়।

শ্রুতে ধর্ম ইতিহোকে বদন্তি বহবো জনাঃ
ততো ন প্রত্যসূয়ামি ন চ সর্ব বিধীয়তে।
৫৩-
প্রভাবার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতং। ৫৭।

অনেকে শ্রুতিকেই ধর্মপ্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন, কিন্তু শ্রুতিতেও সমুদয় ধর্মতত্ত্ব নির্দিষ্ট হয় নাই, এজন্য বিচার দ্বারা ধর্মাধর্ম নির্ণয় করিতে হয়।



সেকালিনী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

হলুদপুরের কবিরাজ শ্রীহরিহর শর্মার কন্যা শৈল আমাদের কাহিনীর নায়িকা কিন্তু আজকাল গল্পের নায়িকাদের যেসব অসমসাহসিক প্রগতিপূর্ণ কার্য করিতে দেখা যায় তাহার কিছুই সে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। শৈল নিতান্তই সেকালিনী।

হলুদপুর স্থানটির এক পা সহরে এক পা গ্রামে। তবে সামনের পা সহরের দিকে। গত কয়েক বছরে সে বেশ লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া নাগরিক সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এতদূরে অগ্রসর হইয়াছে যে হলুদপুরে দুটি স্কুল পর্যন্ত হইয়াছে—একটি ছেলেদের একটি মেয়েদের। তা'ছাড়া লাইব্রেরী আছে, নাট্য-সমিতি আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রীহরিহর শর্মাও আছেন।

দু'বছর আগে পর্যন্ত হরিহর কবিরাজ হলুদপুরের একমাত্র চিকিৎসক ছিলেন, সারা হলুদপুরের নাড়ী তাঁহার মুঠার মধ্যে ছিল। মরিতে হইলে হলুদপুরের রোগী হরিহর কবিরাজের হাতে মরিত, বাঁচিতে হইলে তাঁহার হাতেই বাঁচিত। কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার একচ্ছত্র আধিপত্যে বিঘ্ন ঘটিয়াছে, মেডিক্যাল কলেজের নূতন পাসকরা এক ডাক্তার তাঁহার পাশের বাড়ীতে আসিয়া প্র্যাক্টিস্ সুরু করিয়াছে।

হরিহর কবিরাজ একনিষ্ঠ সেকেলে মানুষ। সেকালের সহিত একালের ভেজাল দিয়া একটা বর্ণসংকর জীবন-প্রণালী গঠন করিবার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না; হলুদপুরের দ্রুত অগ্রগতি তিনি প্রসন্নতার সহিত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। প্রথমটা বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য না হইয়া শেষে নিজের গৃহেই সেকালত্বের একটি ঘাঁটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। কন্যা শৈল স্কুলে পড়িতে যাইতে পায় নাই; দশ বছর বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঘরের বাহির হওয়া বন্ধ হইয়াছিল। গৃহিণী হৈমবতী শেমিজ ব্লাউজ পরিতেন না। সংসারে সাবানের পাট ছিল না; প্রয়োজন হইলে মেয়েরা ক্ষার খৈল দিয়া গাত্র মার্জনা করিবে। বেশী কথা কি, বাড়ীতে পাথুরে কয়লা ঢুকিতে পাইত না, চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী কাঠ-কয়লা ও ঘুঁটের দ্বারা রন্ধনাদি কার্যনির্বাহ হইত। রাত্রে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলিত।

এইরূপ আবহাওয়ার মধ্যে শৈল বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং সে যে পরিপূর্ণরূপে সেকালিনী হইবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। গৃহস্থালীর সকল কর্মে সে নিপুণা হইয়াছিল, এমন কি কবিরাজ মহাশয়ের পাচনাদি রন্ধনেও তাহার যথেষ্ট পটুত্ব জন্মিয়াছিল, কিন্তু লেখাপড়ার দিক দিয়া ক অক্ষরটি পর্যন্ত কেহ তাহাকে শেখায় নাই। মাতা হৈমবতী শক্ত মেয়েমানুষ ছিলেন; স্বামীর কঠিন সেকালত্ব সম্বন্ধে মনে মনে তাঁহার সম্পূর্ণ সায় ছিল কিনা বলা যায় না কিন্তু তিনি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত স্বামীর ইচ্ছা পালন করিয়া চলিতেন। শৈল যখন বড় হইয়া উঠিল তখন তিনি সর্বদা তাহার উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন এবং রাত্রে তাহাকে লইয়া এক শয্যায় শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু শৈল শেমিজ বা ব্লাউজ পরিবার অনুমতি পাইল না। কেবল রাঙা পাড় শাড়ী পরিয়াই সে যৌবনে উপনীত হইল।

শৈল মেয়েটি দেখিতে ছোটখাট এবং অত্যন্ত নরম বস্তুতঃ তাহাকে দেখিলে ঐ নরম শব্দটাই সর্বাগ্রে মনে আসে—সে সুন্দরী কি চলনসই তাহা লক্ষ্যের মধ্যেই আসে না। চোখের দৃষ্টি, মাথার চুল, লালপেড়ে শাড়ীতে সযত্নে আবৃত দেহটি—সবই যেন নরম তুল্-তুল্ করিতেছে। স্বভাবটিও তাই; মুখের কথা মুখে মিলাইয়া যায়, নরম হাসিটি কিশলয়পেলব অধরপ্রান্তে লাগিয়া থাকে। বয়স যদিও ষোল পূর্ণ হইতে চলিল তবু দেখিলে চৌদ্দ বছরেরটি বলিয়া মনে হয়।

তাহার সত্যকার চৌদ্দ বছর বয়স হইতে হরিহর তাহার জন্য পাত্র খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কারণ, যতই সেকেলে হউন, আইনভঙ্গ করায় তাঁহার আপত্তি ছিল। কিন্তু নানা অনিবার্য কারণে সুপাত্র যোগাড় হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। হরিহর যে-ধরণের সুপাত্র চান, বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের বাংগলা দেশে সেরূপ পাত্র একান্ত বিরল। তিনি চান সংস্কৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত সুদর্শন অবস্থাপন্ন পাল্টি ঘরের ছেলে। কার্যকালে দেখা গেল, যদি বর মেলে তো ঘর মেলে না, ঘরবর মেলে তো কোষ্ঠী মেলে না। এইরূপে দেরী হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে আর একটি ব্যাপার ঘটিয়া হরিহরের মন হইতে কন্যাদায়ের চিন্তা কিছু-দিনের জন্য লুপ্ত করিয়া দিল। কলেজে পাশ করা ছোকরা ডাক্তার অজয় গাঙ্গুলী বাহির হইতে আসিয়া যখন তাঁহার পাশের বাড়ীতেই ডাক্তারী আরম্ভ করিল তখন হরিহর এইরূপ ব্যবহারকে ব্যক্তিগত শত্রুতা বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু অজয় ছেলেটি অতিশয় বিনয়ী ও বাক্‌পটু, সে আসিয়া প্রথমেই তাঁহার সহিত দেখা করিল এবং এমনভাবে কথাবার্তা বলিল যেন সে হরিহরের অধীনেই আশ্রয় লইতে আসিয়াছে। হরিহর মনে মনে একটু নরম হইলেও অনুরাগ-বিরাগ কিছুই প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু ক্রমে যখন দেখা গেল, হলুদপুরের যেসব লোক এতদিন তাঁহার উপরেই জীবনমরণের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল তাহারা অধিকাংশই এই নবীন ডাক্তারের দিকে ঝুঁকিয়াছে, তখন হরিহরের অন্তঃকরণ তাঁহার স্বহস্তে প্রস্তুত পাচনের মতই তিক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু করিবার কিছু ছিল না, অগত্যা তিনি স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন,—'পাশের বাড়ীতে বাইরের লোক এসেছে; দক্ষিণ দিকের জানলাগুলো যেন বন্ধ থাকে।'

ফলে বাড়ীর দক্ষিণ দিকের তিনটি জানালা বন্ধ হইয়া গেল।

দশ বছর বয়সে শৈলর জীবন যখন বাড়ীর চারিটি ঘর ও উঁচু পাঁচিল ঘেরা উঠানের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন হইতে এই জানালাগুলিই ছিল বহির্জগতের সহিত তাহার প্রধান যোগসূত্র। জানালা দিয়া দক্ষিণের বাতাস আসে, খোলা মাঠের গন্ধ আসে, পাশের বাড়ীটাও দেখা যায়; একটু তেরছাভাবে দৃষ্টি প্রেরণ করিলে পথের লোক চলাচল চোখে পড়ে। নির্জন দ্বিপ্রহরে জানালায় দাঁড়াইয়া শৈল ঘরের সহিত বাহিরের ক্ষণিক সংযোগ স্থাপন করিত। আকাশে লাল নীল রঙের ঘুড়ি উড়িতেছে, পরিষ্কার স্বচ্ছ আকাশে তাহাদের সুতাগুলি পর্যন্ত দেখা যাইতেছে; রাস্তা দিয়া বিচালি বোঝাই গরুর গাড়ী নিশ্চিন্ত মন্থরতায় চলিয়া যাইতেছে; পাশের বাড়ির কার্ণিসে একটা পায়রা গুমরিয়া গুমরিয়া কাহার উদ্দেশে অভিমান ব্যক্ত করিতেছে।—রাত্রে শয়নের পূর্বে সে শয়ন-ঘরের জানালাটিতে গিয়া দাঁড়াইত। অন্ধকার ঘর, বাহির হইতে কিছু দেখা যায় না; শৈল গায়ের কাপড় একটু আলগা করিয়া জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইত। বাহিরের অন্ধকার ঝিঁঝিঁপোকার ঝঙ্কারে পূর্ণ হইয়া থাকিত, গাছের পাতায় পাতায় জোনাকির পরী-আলো জ্বলিত আর নিভিত; দক্ষিণা বাতাস গায়ে লাগিয়া হঠাৎ গায়ে কাঁটা দিত—

কিন্তু জানালাগুলি যখন বন্ধ হইয়া গেল তখন শৈল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল না, তাহার মুখের হাসিও ম্লান হইয়া গেল না। রাত্রে শয়নের পূর্বে সে কেবল একবার বন্ধ জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইত; পুরানো জানালার তক্তায় একটা চোখ উঠিয়া গিয়া একটি ফুটা হইয়াছিল, সেই ফুটায় চোখ দিয়া সে বাহিরে দৃষ্টি প্রেরণ করিত, তারপর বিছানায় গিয়া শয়ন করিত। মা কাজকর্ম শেষ করিয়া আসিয়া দেখিতেন শৈল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

সে যাহোক, হরিহর কবিরাজ প্রতিদ্বন্দ্বি-সংঘর্ষের প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া আবার যথারীতি কাজকর্মে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন প্রতিদ্বন্দ্বীর আগমনে তাহার ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্তু ক্ষতি মারাত্মক নয়। বিশেষতঃ দীর্ঘ একাধিপত্যের সময় তিনি যথেষ্ট সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি আবার কন্যার জন্য পাত্রের সন্ধানে মন দিলেন।



একবার বন্ধ জানালার কাছে দাঁড়াইত

শৈলর বয়স তখন চতুর্দশী পার হইয়া পূর্ণিমায় পা দিয়াছে।

কয়েকমাস খোঁজখুঁজির পর কাছেপিঠে হালুইপুর গ্রামে একটি পাত্র পাওয়া গেল। পাত্র ভালই অর্থাৎ হরিহর যাহা চান তাহার ষোল আনা না হোক চৌদ্দ আনা বটে। হরিহর বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিলেন। মেয়ে দেখা-দেখির কোনও কথা উঠিল না, কারণ দুই পক্ষই গোঁড়া—ঠিকুজি কোষ্ঠী যখন মিলিয়াছে তখন অন্য কিছু দেখিবার প্রয়োজন নাই। আশীর্বাদ পর্বটাও বর যখন বিবাহ করিতে আসিবে তখনই সম্পন্ন হইবে।

আষাঢ়ের শেষের দিকে বিবাহের দিন। উদ্যোগ আয়োজন সমস্তই প্রস্তুত, আত্মীয়-কুটুম্বেরা এখনও আসিয়া পোঁছিতে আরম্ভ করেন নাই, এমন সময় বিবাহের ঠিক সাতদিন আগে একটি ব্যাপার ঘটিল। স্নান করিবার সময় শৈলর হাত পিছলাইয়া জলভরা ঘটি তাহার পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর পড়িল। আঙুলটা থেঁতো হইয়া নখ প্রায় উড়িয়া গেল। রক্তারক্তি কাণ্ড!

হরিহর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। বিবাহের মাত্র সপ্তাহকাল বাকি, এই সময় মেয়েটা এমন কাণ্ড করিয়া বসিল! সাত দিনের মধ্যে ঘা শুকাইবে বলিয়াও মনে হয় না। ক্ষতযুক্তা কন্যাকে তিনি পাত্রস্থ করিবেন কি করিয়া?

হরিহর বরপক্ষকে দুর্ঘটনার কথা জানাইলেন এবং বিবাহ কিছুদিন পিছাইয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। বরপক্ষ বিরক্ত হইলেন, হয়তো কন্যার সুলক্ষণ সম্বন্ধেও সন্দিহান হইলেন। দুইপক্ষে একটু কথা কাটাকাটি হইল। তারপর বরপক্ষ অপ্রসন্নভাবে জানাইলেন যে, তেশরা শ্রাবণ একটি বিবাহের দিন আছে, সেই দিনের মধ্যে যদি বিবাহ সম্ভব হয়, তবেই তাঁহারা বিবাহ দিবেন, নচেৎ সম্বন্ধ ভাঙিয়া যাইবে; যেখানেই হোক, শ্রাবণ মাসের মধ্যে পাত্রের বিবাহ দিতে তাঁহারা বদ্ধপরিকর।

হরিহর তেশরা তারিখের মধ্যে ঘা সারাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। কিন্তু 'বুড়ীর গোপান' প্রভৃতি ডাকাতে ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও ঘা সারিল না। পায়ের বুড়ো আঙুলের ঘা সারা সহজ কথা নয়; বিশেষতঃ মেয়েরা খালি পায়ে থাকে, চলিতে ফিরিতে পায়ে হোঁচট লাগে, আরোগ্যোন্মুখ ঘা আবার আউরাইয়া উঠে। তেশরা শ্রাবণ তো এমন অবস্থা হইল যে, শৈলকে শয্যা লইতে হইল। আঙুলের ঘা বারবার অতর্কিত আঘাত পাইয়া বিষাইয়া উঠিয়াছে।

বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেল।

শৈলর ঘা কিন্তু তবু সারে না, মাঝে মাঝে একটু উন্নতি হয়, আবার বাড়িয়া যায়। সারা শ্রাবণ মাসটাই এইভাবে কাটিল। হরিহর ঔষধ প্রয়োগ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। মেয়ে শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। হৈমবতীর মায়ের প্রাণ আকুলি বিকুলি করিতেছিল, শেষে আর থাকিতে না পারিয়া তিনি স্বামীকে বলিলেন,—'ওগো, ঘা তো কিছুতেই সারছে না; শেষে কি মেয়েটা জন্মের মত খোঁড়া হয়ে যাবে! —একবার ঐ ডাক্তার ছেলেটিকে খবর দিলে হয় না?'

হরিহর অনেকক্ষণ মেরুদণ্ড শক্ত করিয়া বসিয়া রহিলেন, তারপর সংক্ষেপে বলিলেন,—'বেশ, খবর পাঠাও।'


শারদীয় উপলক্ষে
আপনার প্রিয়জনকে দেবার মত উৎকৃষ্টতম উপহার
বেনীরাম মূলচাঁদের
জুল্‌ফে পাঞ্জাব
হেয়ার অয়েল
কুইন অফ্‌ দি নাইট
অটো মূলচাঁদ
বেনীরাম মূলচাঁদ
পারফিউমার্স. কনৌজ. (ইউ. পি.)

খবর পাইয়া অজয় ডাক্তার তৎক্ষণাৎ আসিল। হরিহর কোনও কথা না বলিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন; শৈল দালানের মেঝেয় বসিয়াছিল, নীরবে তাহার পায়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। অজয় শৈলর পায়ের বন্ধন খুলিয়া ক্ষত পরীক্ষা করিল; শৈল পাশের দিকে মুখ ফিরাইয়া নতনেত্রে বসিয়া রহিল।

এতটুকু আইবুড়ো মেয়েকে সম্ভ্রম দেখানো অজয়ের অভ্যাস নাই; সে ক্ষতস্থানটি টিপিতে টিপিতে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল,—'কি খুকি, লাগছে?'

শৈলর মুখ একটু বিবর্ণ হইল; একবার অধর দংশন করিয়া সে তেমনি পাশের দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল, কেবল মাথা নাড়িয়া জানাইল—না।

অজয় তখন হাইড্রোজেন পেরকসাইড দিয়া ক্ষতস্থান ধৌত করিল, তারপর তাহাতে টিঞ্চার আয়োডিন ঢালিতে ঢালিতে মুচকি হাসিয়া বলিল,—'এবার জ্বালা করছে তো?'

শৈল এবারও মাথা নাড়িয়া জানাইল—না। তাহার মুখখানি কিন্তু আরও একটু পাংশু দেখাইল।

মলম লাগাইয়া ভাল করিয়া পা ব্যাণ্ডেজ করিয়া অজয় উঠিয়া দাঁড়াইল, হরিহরকে বলিল,—'তিন দিন পরে ব্যাণ্ডেজ খুলবেন, বোধহয় ততদিনে শুকিয়ে যাবে। বেশী নড়াচড়া কিন্তু বারণ। খুকি, দৌড়াদৌড়ি কোরো না।'

এবার শৈলর মুখের বিবর্ণতা ভেদ করিয়া একটু অরুণাভা দেখা দিল। সে নীরবে একবার অজয়ের দিকে আয়ত দৃষ্টি হানিয়া আবার মাথা হেঁট করিল। অজয়ের হঠাৎ মনে হইল মেয়েটিকে সে যতটা খুকী মনে করিয়াছিল বোধহয় ততটা খুকী নয়। সে একটু অপ্রস্তুত হইল।

বাহিরের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া হরিহর ট্যাঁক হইতে দুটি টাকা বাহির করিয়া অজয়কে দিতে গেলেন, অজয় হাত জোড় করিয়া প্রত্যাখ্যান করিল,—'আমরা দুজনেই ডাক্তার। আপনার কাছ থেকে টাকা নিতে পারি না।' দ্বার পর্যন্ত গিয়া সে ফিরিয়া আসিল—'একটা কথা এতদিন বলবার সাহস হয়নি, যদি অনুমতি দেন তো বলি।'

হরিহর ঘাড় নাড়িয়া অনুমতি দিলেন, অজয় তখন বলিল,—'আমার মা অনেকদিন থেকে অম্বলে ভুগ্‌ছেন। কিন্তু তিনি বিধবা মানুষ, ডাক্তারী ওষুধ খেতে চান না; তা ছাড়া আমার ওষুধে কাজও কিছু হচ্ছে না। এখন আপনি যদি ব্যবস্থা করেন।'

হরিহরের মনের গ্লানি অনেকটা কাটিয়া গেল; তিনি বুঝিলেন অজয় তাঁহাকে ঋণী করিয়া রাখিতে চায় না। বলিলেন,—'বেশ, আজ বিকেলে আমি তোমার বাড়ী যাব।'

বৈকালে অজয়ের মাকে পরীক্ষা করিয়া হরিহর ঔষধের ব্যবস্থা দিলেন—পাচন, গুলি ও অবলেহ। ঔষধ ব্যবহারের বিধি বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন,—'এক হপ্তা এই চলুক, আশা করি দোষটা কেটে যাবে।'

তিন দিনের দিন শৈলর ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া দেখা গেল ঘা শুকাইয়া গিয়াছে। ওদিকে অজয়ের মা সপ্তাহকাল ঔষধ সেবন করিয়া দিব্য চাঙ্গা হইয়া উঠিলেন।

এইরূপে দুই পরিবারের মধ্যে প্রথম স্বার্থ-সংঘাতের উষ্মা অনেকটা প্রশমিত হইল, হয়তো পরস্পরের প্রতি একটু শ্রদ্ধাও জন্মিল; কিন্তু উহা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পাইল না। স্বার্থের ঠোকাঠুকি যেখানে নিত্য-নৈমিত্তিক, সেখানে আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা হওয়া বড়ই কঠিন। হরিহর ও অজয়ের সম্পর্ক দেঁতো হাসি ও মিষ্ট কথার পর্যায়ে উঠিয়া আট্‌কাইয়া রহিল।

এদিকে শ্রবণ মাস ফুরাইয়া ভাদ্র মাস আরম্ভ হইয়াছে। শৈলর শরীরও সারিয়াছে। মাঝে আর দুটি মাস বাকি, অঘ্রাণ মাসে মেয়ের বিয়ে দিতেই হইবে। হরিহর আবার সবেগে তত্ত্ব-তল্লাস আরম্ভ করিয়া দিলেন।

কার্তিক মাসের শেষে একটি পাত্র পাওয়া গেল, হরিহর আর বিলম্ব না করিয়া দিন স্থির করিয়া ফেলিলেন। পাত্রটি এবার অবশ্য তেমন মনের মত হইল না, হরিহর যাহা চান তাহার আট আনা মাত্র। কিন্তু উপায় কি। মেয়ের ষোল বছর বয়স পূর্ণ হইতে চলিল, আর বিলম্ব করা চলে না। আবার বাড়ীতে বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইল।

বিবাহের সাত দিন আগে, দুপুরবেলা হরিহরের উঠানে প্রকাণ্ড উনানের উপর প্রকাণ্ড মাটির হাঁড়িতে কোনও একটি রসায়ন তৈয়ার হইতেছিল। এরূপ কবিরাজী ঔষধ নিত্যই বাড়ীতে তৈয়ার হয়। শৈল একলা দাঁড়াইয়া হাঁড়িতে কাঠি দিতেছিল। বহু গাছগাছড়া ও গুড়ের মত একটি বস্তু একত্র সিদ্ধ হইয়া বেশ একটি স্বর্ণাভ গাঢ় পদার্থে পরিণত হইয়াছে, বড় বড় বুদ্বুদ উদ্‌গীর্ণ করিয়া টগ্‌-বগ করিয়া ফুটিতেছে।

উঠানে কেহ কোথাও নাই; শৈল একাকিনী দাঁড়াইয়া হাতা নাড়িতেছিল এবং মাঝে মাঝে এক হাতা তুলিয়া আবার হাঁড়ির মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া দেখিতেছিল কতখানি গাঢ় হইয়াছে। শীতের রৌদ্র তেমন কড়া নয়, কিন্তু আগুনের আঁচে তাহার মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। আর নরম ঠোঁটে একটুখানি গোপন মিষ্ট হাসি ক্রীড়া করিতেছিল।

এক হাতা ফুটন্ত পদার্থ তুলিয়া লইয়া শৈল সন্তর্পণে চারিদিকে তাকাইল। কেহ নাই; মায়ের ঘরের দরজা খোলা রহিয়াছে বটে, কিন্তু তিনি এখন কাঁথা মুড়ি দিয়া একটু ঘুমাইয়া লইতেছেন। শৈল সুমিষ্ট হাসিতে হাসিতে নিজের বাঁ হাতের কব্জির উপর ফুটন্ত হাতা উপুড় করিয়া দিল।

একটা চাপা চীৎকার—! কিন্তু শৈল চীৎকার করে নাই, চীৎকার আসিল ঘরের ভিতর হইতে। হৈমবতী ছুটিতে ছুটিতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার আর্তোক্তিতে শৈলর বোধহয় হাত কাঁপিয়া গিয়াছিল, সবটা পদার্থ তাহার কব্জিতে না পড়িয়া মাটিতে পড়িল।

আগুনখাকীর মত হৈমবতী আসিয়া মেয়ের সম্মুখে দাঁড়াইলেন; তাহার বিস্ফারিত চক্ষুর সম্মুখে শৈল চক্ষু নত করিয়া রহিল। হৈমবতী যে সমস্তই দেখিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; তিনি সহসা কথা খুঁজিয়া পাইলেন না, বয়লারে বাষ্পাধিক্য ঘটিলে যেরূপ শব্দ করিয়া বাষ্প বাহির হয় তিনি সেইরূপ ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

তারপর সহসা শৈলর একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে ঘরের দিকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া শৈলকে খাটে বসাইলেন, একটি তালের পাখা শক্ত করিয়া হাতে ধরিয়া বলিলেন,—'ইচ্ছে করে পায়ে ঘটি ফেলেছিলি। আবার হাত পুড়িয়েছিস। হারামজাদি, কি চাস তুই বল্‌।'

শৈল উত্তর না দিয়া মায়ের কোলের মধ্যে মাথা গুঁজিল; ক্রুদ্ধা হৈমবতী তাহার পিঠে পাখার এক ঘা বসাইয়া দিলেন।

অতঃপর মাতা ও কন্যার মধ্যে কি হইল তাহা আমরা জানি না। আধঘণ্টা পরে হৈমবতী ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং স্বামীর ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন।

সন্ধ্যাবেলা হরিহর অজয়ের বাড়ী গেলেন। অজয় রুগী দেখিতে বাহির হইতেছিল, তাহাকে বলিলেন,—'তুমি একবার শৈলিকে দেখে যেও, সে আবার হাত পুড়িয়ে ফেলেছে।'

অজয় চলিয়া গেল। তখন হরিহর অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার মাতার সহিত কথা কহিলেন।

ইহার পর হলুদপুরের রোগীরা লক্ষ্য করিল, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী চিকিৎসকের মধ্যে একটা আশ্চর্য রকমের রফা হইয়া গিয়াছে। অজয় রোগীকে বলে—'আপনার রোগ ক্রণিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, আপনি বরং কবিরাজ মশায়কে দেখান।' হরিহর নিজের রোগীকে বলেন,—'তোমার দেখছি চেরা-ফারার ব্যাপার আছে, তুমি বাপু অজয়ের কাছে যাও।'

কথাটা এখনও প্রকাশ হয় নাই, কিন্তু অজয়ের সহিত শৈলর বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। আগামী মাঘ মাসে বিবাহ। আশা করা যইতেছে, এবার আর কোনও রকম দুর্ঘটনা ঘটিবে না, সেকালিনী মেয়ে শৈলর বিবাহ নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হইবে।



রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা

[illegible] প্রসাদ ঘোষ

কবি মাত্রেই রচনা [illegible] [illegible] সীমায় [illegible]

কবিদলের রচনার অনুবাদ দেশে দেশে পাঠককে ও শ্রোতাকে তৃপ্তি ও আনন্দ প্রদান করে, তাহাতেই সে সকল রচনার চিরন্তন ভাব সপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যে বহু দেশের ভাষায় অনূদিত হইয়াছে—বহু দেশের পাঠক সমাজে সমাদৃত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহারও কারণ সে সকল কবিতার ভাব দেশবিশেষের মানবসমাজে বদ্ধ নহে।

কিন্তু কবির জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতার বিরোধী হয় না পরন্তু তাঁহার আন্তর্জাতিকতা অনেক ক্ষেত্রেই জাতীয়তার [illegible] প্রতিষ্ঠিত হয়। সেক্সপীয়র হইতে টেনিসন পর্যন্ত ইংরেজ কবিদিগের রচনা পাঠ করিলে দেখা যায় তাঁহাদিগের রচনায় আন্তর্জাতিকতা যতই কেন থাকুক না সে সকল জাতীয়তায় [illegible]।

সেক্সপীয়রের [illegible] স্বদেশের বর্ণনা—

"The other Eden, demi-paradise.

• • •

The happy breed of men, the little world,
The precious stone set in the silver sea.

• • •

The blessed plot, this earth, this England."

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশের বর্ণনা—স্বদেশ সম্বন্ধীয় স্তোত্র:—

"অয়ি ভুবন মনোমোহিনি!
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বলধরণি!
জনক-জননী-জননি!
নীলসিন্ধুজলধৌতচরণতল,
অনিলবিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত-ভাল হিমাচল,
শুভ্র তুষারকিরীটিনি;
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে—
জ্ঞানধর্ম কত কাব্য কাহিনী।
চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী-যমুনা বিগলিত করুণা,
পুণ্যপীযূষস্তন্যবাহিনি!"

টেনিসন তাঁহার স্বদেশ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন:—

"A land of settled government,
A land of just and old renown,
Where, Freedom slowly broadens down,
From precedent to precedent."

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বদেশের বর্ণনা করিয়াছেন:—

"ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ।
দুই নয়নে স্নেহের হাসি,
ললাট-নেত্র আগুন-বরণ।"

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব তিনি ১৩১১ সালে কলিকাতায় শিবাজী উৎসব উপলক্ষে রচিত কবিতায় সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন—ভারতবর্ষ এক, তাহাকে মহাভারতেই গৌরবান্বিত ও শক্তিশালী করিয়া রাখিতে হইবে; আর তাহার শাসক ত্যাগী হইবেন; তাহার পতাকা সন্ন্যাসীর পতাকা হইবে।

শিবাজীর সংকল্প:—

"এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড-ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।"

মারাঠার বজ্রনির্ঘোষে তিনি সেই বার্তা—সেই মুক্তির বাণী শুনিয়াছিলেন; সমগ্র জাতির পক্ষ হইতে বলিয়াছিলেন, যেদিন শিবাজীর মুক্তি-মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল—

সেদিন শুনিনি কথা—আজ মোরা তোমার
আদেশ
শির পাতি লব!
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব!
ধ্বজা করি' উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী বসন
দরিদ্রের বল!
'একধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে' এ মহাবচন
করিব সম্বল!"

বাঙ্গলাই প্রথমে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া মুক্তির জন্য জয়যাত্রায় অগ্রণী হইয়াছিল। তখন তিনি বাঙ্গলার সেই কার্যে সাফল্য কামনা করা—যে ঐক্য সে সাফল্যের উপকরণ ভগবানের নিকট তাহাই প্রার্থনা করিয়াছিলেন:—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান।
বাংলার ঘর, বাংলার মাঠ,
বাংলার বন, বাংলার হাট
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
পূর্ণ হউক, হে ভগবান।
বাঙ্গালীর পণ, বাঙ্গালীর আশা,
বাঙ্গালীর কাজ, বাঙ্গালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক, হে ভগবান।
বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর মন,
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাইবোন,
এক হউক, এক হউক,
এক হউক, হে ভগবান!"

এই সকল রচনায় যে জাতীয়তা স্বপ্রকাশ সে সকল পাঠ করিলেই রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সেই জাতীয়তার ভাব যে তাঁহার কার্যেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা তাঁহার চরিতকার দেখাইবেন—সে কথা তাঁহার রচনার আলোচনাকারীর কার্যসীমার বাহিরে অবস্থিত।

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা—তাঁহার দেশাত্মবোধ মৌলিক নহে, তাহা কৌলিক। তাহা রবীন্দ্রনাথই লিখিয়াছেন:—

"বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশী প্রথার চলন ছিল, কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুতঃ সে সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়ীতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরাজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র তখনই লেখকের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছিল।"

রাজনারায়ণ বসু মহাশয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত ঘনিষ্ঠতার সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন:—

"কুমারী মেরী কার্পেণ্টার যখন কলিকাতায় আসেন, তখন দেবেন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন; সে অভিলাষের কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার জমিদারীর নিকটস্থ কুষ্টিয়া উপনগরে পলাইয়া যান। দেবেন্দ্রবাবু স্বভাবতঃ ইংরাজের সঙ্গে আলাপ করিতে অনিচ্ছুক। যেহেতু ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় বিষয়ে তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার মতের মিল হয় না। ইংরাজের মতানুমোদন করিয়া চলিলে ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়; কিন্তু দেবেন্দ্রবাবু ইংরাজদিগের নিকট প্রতিষ্ঠালাভ করিবার জন্য আদবে ব্যগ্র নহেন। এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণরূপে কেশববাবুর বিপরীত।"

কৃষ্ণনগর কলেজের বিখ্যাত প্রিন্সিপ্যাল লব সাহেব কোন সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন,

"The proud old man does not condescend to accept the praise of Europeans.'"

লব যাহাকে গর্ব বলিয়াছিলেন, তাহা গর্ব নহে—বরং বিনয়। তিনি বিবাদ করিতে চাহেন নাই—যে বিষয়ে তাঁহার সহিত ইংরেজদিগের মতের অনৈক অনিবার্য সে বিষয়ে তিনি তাঁহাদিগের সহিত আলোচনা করিয়া অপ্রীতি অর্জন করিতে চাহিতেন না।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন:—

"আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধি করিবার চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত 'মিলে সব ভারত-সন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। সেই মেলায় দেশের স্তব গান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।"

তিনি বলিয়াছেন, সেই মেলায় তিনি একটি কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন। "সেটা পড়িয়াছিলাম, হিন্দু মেলার গাছের তলায় দাঁড়াইয়া। শ্রোতাদের মধ্যে নবীন সেন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। আমার বড় বয়সে তিনি একদিন একথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।"

এই হিন্দু মেলা (১২৭৩ সালের চৈত্র সংক্রান্তিতে প্রথম 'চৈত্র-মেলা' নামে অনুষ্ঠিত) কংগ্রেসের পূর্ববর্তী। ইলবার্ট বিলের বিরোধিতা করিয়া এদেশে ইংরেজদিগের অনেকে ভারতবাসীর আত্মসম্মানজ্ঞানে যে আঘাত করিয়াছিল, তাহার ফলে এ দেশে রাজনীতিক সম্মিলনের পরিকল্পনা হইয়াছিল। হিন্দু মেলার কার্য বিবরণে প্রকাশ:—

"১৭৮৮ শকের চৈত্র সংক্রান্তিতে যে একটি জাতীয় মেলা হইয়াছিল, স্বজাতিদিগের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন করাই তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু যদি এই জাতীয় মেলার উৎসাহ কেবল ক্ষণকালের নিমিত্ত হয় এবং অস্মদ্দেশীয়দিগের মধ্যে সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের এই বিষয়ে একটি অটল উৎসাহ ও যত্ন স্থাপনের উপায় না করা হয়, তাহা হইলে আমাদিগের এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল হইবার ব্যতিক্রম ঘটিবে। এই অভিপ্রায়ে আমাদিগের দেশীয় কতিপয় ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে উদ্যোগী হইতে অনুরোধ করা হইয়াছে এবং স্বদেশের বিশেষ বিশেষ উন্নতিসাধক কার্য সংসাধন জন্য বিশেষ বিশেষ মণ্ডলী স্থাপিত হইয়াছে। ইহারা সকলেই

স্ব স্ব নির্দিষ্ট কার্য সাধন করিয়া সাধারণ কার্যের প্রতি যত্ন করিবেন। যেরূপে কার্য নির্বাহ হইবে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

"১। এই মেলাভুক্ত একটি সাধারণমণ্ডলী সংস্থাপিত হইবে, তাঁহারা সমুদয় হিন্দু জাতিকে উপরোক্ত লক্ষ্য সকল সংসাধন জন্য এক দলে অভিযুক্ত এবং স্বদেশীয় লোকগণ মধ্যে পরস্পরের বিদ্বেষভাব উন্মূলন করিয়া উপরোক্ত সাধারণ কার্যে নিয়োগ করতঃ এই জাতীয় মেলার গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।

"২। প্রত্যেক বৎসরে আমাদিগের হিন্দু সমাজের কতদূর উন্নতি হইল, এই বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ জন্য চৈত্র-সংক্রান্তিতে সাধারণের সমক্ষে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত পাঠ করা হইবে।

"৩। অস্মদেশীয় যে সকল ব্যক্তি স্বজাতীয় বিদ্যানুশীলনের উন্নতি সাধনে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উৎসাহবর্ধন করা হইবে।

"৪। প্রতি মেলায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের পরিশ্রম ও শিল্প-জাত দ্রব্য সংগৃহীত হইয়া প্রদর্শিত হইবে।

"৫। প্রতি মেলায় স্বদেশীয় সংগীত-নিপুণ ব্যক্তিগণের উৎসাহ বর্ধন করা যাইবে।

"৬। যাঁহারা মল্ল বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, প্রতি মেলায় তাঁহাদিগকে একত্রিত করিয়া উপযুক্ত পারি-তোষিক বা সম্মান প্রদান করা যাইবে এবং স্বদেশীয় লোকদের মধ্যে ব্যায়াম শিক্ষা প্রচলিত করিতে হইবে।"

রবীন্দ্রনাথ হিন্দু মেলা সম্পর্কে সত্যেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের গানের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা যেরূপে মেলায় গীত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

১

"মিলে সব ভারত-সন্তান,
একতান মনপ্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান॥

২

"ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শতখনি রত্নের নিধান॥
হোক ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৩

"রূপবতী সাধ্বী সতী ভারত ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা?
শর্মিষ্ঠা, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত-ললনা॥
হোক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৪

"বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ,
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন।
বাল্মীকি বেদব্যাস ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারতভূষণ॥
হোক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয়, কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৫

"বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী;
অধীনতা আনিল রজনী;
সুগভীর সে তিমির ব্যাপিয়া কি রবে থির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি॥
হোক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৬

"ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জুন নাহি কি স্মরণ
পৃথ্বীরাজ আদি বীরগণ?
ভারতের ছিল সেতু যবনের ধূমকেতু,
আর্তবন্ধু দুষ্টের দমন॥
হোক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৭

"কেন এত ভীরু কর সাহস আশ্রয়,
যতোধর্মস্ততো জয়॥
ছিন্নভিন্ন হীনবল ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?
হোক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' গ্রন্থের উপসংহারে এই সংগীতে ভারতের জয়োচ্চারণ করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থের সমালোচনায় 'বঙ্গদর্শন' বলিয়া-ছিলেনঃ—

"এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক! হিমালয় কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক! গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, নর্মদা ও গোদাবরী তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক! পূর্ব-পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জনে মন্দ্রীভূত হউক! এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়-যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।"

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ডিরোজিওর "আমার স্বদেশ" ইংরেজী কবিতার বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার 'মেঘদূতের' অনুবাদ পাঠ করিয়াছেনঃ—

"কুবের-আলয় ছাড়ি উত্তরে আমার বাড়ি,
গিয়া তুমি দেখিবে সেথায়—
সম্মুখে বাহির দ্বার বাহার কে দেখে তার,
ইন্দ্রধনু যেন শোভা পায়।
পার্শ্বে এক সরোবর, দেখা যায় মনোহর,
পদ্ম সনে অলি করে ঠাট।
তাহার একটি ধারে, অপরূপ দেখিবারে
পরকাশে মণি-বাঁধা ঘাট।
সরসীর স্বচ্ছ জলে ভাসি ভাসি দলে দলে
হংসহংসী ভ্রমে অবিশ্রামে।
যাইতে মানস সরে কারো না মানস সরে,
আছে তারা এমনি আরামে।"

তাঁহারা তাঁহার অনুবাদ-নৈপুণ্য অবগত আছেন—তাঁহার অনুবাদ মূলের সৌন্দর্য ধারণ করিত। তিনি ভারতবর্ষের "মলিন মুখ-চন্দ্রমা" দেখিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইহার পরে রবীন্দ্রনাথের আর একজন অগ্রজের কথা বলিতে হয়। তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তিনি স্বদেশ প্রেমের প্রেরণায় আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধানুভব করেন নাই। তিনি তাঁহার নাটকে, কবিতায়, গানে—দেশাত্মবোধের বিকাশে সহায় হইয়াছিলেন। ১৭৮৯ শকাব্দের চৈত্র মেলার অধিবেশনে তিনজনের কবিতা পঠিত হইয়া-ছিল—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহাদিগের একজন। অপর দুইজন—অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও শিবনাথ শর্মা (পরে শাস্ত্রী)। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কবিতার আরম্ভ—

"জাগ জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান!
মাকে ভুলি কতকাল রহিবে শয়ান?
ভারতের পূর্ব কীর্তি করহ স্মরণ।
রবে আর কতকাল মুদিয়ে নয়ন?"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন স্মৃতিতে' 'জাহাজের খোল' শিরোনামায় লিখিয়াছেনঃ—

"কাগজে কি একটা বিজ্ঞাপন দেখিয়া একদিন মধ্যাহ্নে জ্যোতিদাদা নিলামে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিলেন যে, তিনি সাত হাজার টাকা দিয়া একটা জাহাজের খোল কিনিয়াছেন। এখন ইহার উপরে এঞ্জিন জুড়িয়া কামরা তৈরী করিয়া একটা পুরো জাহাজ নির্মাণ করিতে হইবে।

"দেশের লোকেরা কলম চালায়, রসনা চালায় কিন্তু জাহাজ চালায় না, বোধকরি এই ক্ষোভ তাঁহার মনে ছিল। দেশে দেশলাই কাঠি জ্বালাইবার জন্য তিনি একদিন চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেশলাই কাঠি অনেক ঘর্ষণেও জ্বলে নাই; দেশে তাঁতের কল চালাইবার জন্যও তাঁহার উৎসাহ ছিল, কিন্তু সেই তাঁতের কল একটিমাত্র গামছা প্রসব করিয়া তাহার পর হইতে স্তব্ধ হইয়া আছে। তাহার পর স্বদেশী চেষ্টায় জাহাজ চালাইবার জন্য তিনি হঠাৎ একটা শূন্য খোল কিনিলেন. সে খোল একদা ভর্তি হইয়া উঠিল শুধু কেবল এঞ্জিন এবং কামরায় নহে—ঋণে এবং সর্বনাশে। কিন্তু তবুও একথা মনে রাখিতে হইবে, এই সকল চেষ্টার ক্ষতি যাহা সে একলা তিনিই স্বীকার করিয়াছেন, আর তাহার লাভ যাহা তাহা নিশ্চয়ই এখনো তাঁহার দেশের খাতায় জমা হইয়া আছে। পৃথিবীতে

এইরূপ বে-হিসাবি অব্যবসায়ী লোকেরাই দেশের কর্মক্ষেত্রের উপর দিয়া বারংবার নিষ্ফল অধ্যবসায়ের বন্যা বহাইয়া দিয়া থাকেন; সে বন্যা হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলিয়া যায়, কিন্তু তাহা স্তরে স্তরে যে পলি রাখিয়া চলে তাহাতেই দেশের মাটিকে প্রাণ-পূর্ণ করিয়া তোলে—তাহার পর ফসলের দিন যখন আসে তখন তাঁহাদের কথা কাহারও মনে থাকে না বটে, কিন্তু সমস্ত জীবন যাঁহারা ক্ষতি বহন করিয়াই আসিয়াছেন, মৃত্যুর পরবর্তী এই ক্ষতিটুকুও তাঁহারা অনায়াসে স্বীকার করিতে পারিবেন।

একদিকে বিলাতি কোম্পানী আর এক-দিকে তিনি একলা—এই দুই পক্ষে বাণিজ্য-নৌযুদ্ধ ক্রমশই কিরূপ প্রচণ্ড হইয়া উঠিল তাহা খুলনা ও বরিশালের লোকেরা এখনো বোধ করি স্মরণ করিতে পারিবেন। প্রতি-যোগিতার তাড়নায় জাহাজের পর জাহাজ তৈরী হইল, ক্ষতির পর ক্ষতি বাড়িতে লাগিল এবং আয়ের অঙ্ক ক্রমশই ক্ষীণ হইতে হইতে টিকিটের মূল্যের উপসর্গটা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল—বরিশাল-খুলনার ষ্টীমার লাইনে সত্য যুগ আবির্ভাবের উপক্রম হইল। যাত্রীরা যে কেবল বিনা ভাড়ায় যাতায়াত সুরু করিল তাহা নহে, তাহারা বিনামূল্যে মিষ্টান্ন খাইতে আরম্ভ করিল। ইহার উপরে বরিশালের ভলাণ্টিয়ারের দল স্বদেশী কীর্তন গাহিয়া কোমর বাঁধিয়া যাত্রী সংগ্রহে লাগিয়া গেল, সুতরাং জাহাজে যাত্রীর অভাব হইল না। কিন্তু আর সকল প্রকার অভাবই বাড়িল বই কমিল না। অঙ্ক শাস্ত্রের মধ্যে স্বদেশ-হিতৈষিতার উৎসাহ প্রবেশ করিবার পথ পায় না; কীর্তন যতই জমুক, উত্তেজনা যতই বাড়ুক, গণিত আপনার নামতা ভুলিতে পারিল না—সুতরাং তিন-ত্রিক্কে নয় ঠিক তালে তালে ফাড়িংয়ের মত লাফ দিতে দিতে ঋণের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

"অব্যবসায়ী ভাবুক মানুষের একটা কুগ্রহ এই যে, লোকেরা তাঁহাদিগকে অতি সহজেই চিনিতে পারে, কিন্তু তাঁহারা লোক চিনিতে পারেন না; অথচ তাঁহারা যে চেনেন না এইটুকু মাত্র শিখিতে তাঁহাদের বিস্তর খরচ এবং ততোধিক বিলম্ব হয় এবং সেই শিক্ষা কাজে লাগানো তাঁহাদের দ্বারা ইহ-জীবনেও ঘটে না। যাত্রীরা যখন বিনামূল্যে মিষ্টান্ন খাইতেছিল তখন জ্যোতি দাদার কর্মচারীরা যে তপস্বীর মতো উপবাস করিতেছিল, এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় নাই। অতএব যাত্রীদের জন্যও জলযোগের ব্যবস্থা ছিল, কর্মচারীরা বঞ্চিত হয় নাই; কিন্তু সকলের চেয়ে মহত্তম লাভ রহিল জ্যোতি দাদার—সে তাঁহার সেই সর্বস্বক্ষতি স্বীকার।

"তখন খুলনা-বরিশালের নদী পথে প্রতিদিনের এই জয়-পরাজয়ের সংবাদ আলোচনায় আমাদের উত্তেজনার অন্ত ছিল না। অবশেষে একদিন খবর আসিল, তাঁহার স্বদেশী নামক জাহাজ হাওড়ার ব্রিজে ঠেকিয়া ডুবিয়াছে। এইরূপে যখন তিনি তাঁহার নিজের সাধ্যের সীমা একেবারে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিলেন, নিজের পক্ষে কিছুই আর বাকি রাখিলেন না, তখনই তাঁহার ব্যবসা বন্ধ হইয়া গেল।"

ইহার পরেও স্বদেশী জাহাজ চালাইতে ভারতবাসীকে অনেক বাধা পাইতে হইয়াছে—বিদেশী জাহাজ কোম্পানীসমূহের প্রতি-যোগিতা অনেক ক্ষেত্রে অন্যায়ে প্রশ্রয় পাইয়াছে। কিন্তু সে বিষয়ে পথিপ্রদর্শকের গৌরব জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবং তাঁহার উদ্যম অন্ধকারের মধ্যে আলোকশিখার মত সপ্রকাশ।

তাঁহার চেষ্টা তখন দেশে কিরূপ উৎসাহের উদ্ভব করিয়াছিল, তাহা সেই সময়ে তাঁহার লিখিত ও 'বালক' পত্রে প্রকাশিত সচিত্র "বরিশালের পত্রে" জানিতে পারা যায়।

ঐ পত্রে বরিশালের বর্ণনাদির পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেনঃ—

"বাস্তবিক আমাদের সাহস ও অধ্যবসায় অত্যন্ত কম। আমরা বড়ই সাবধানী জাত। অতি-সাবধানটা ভাল নয়। ইংরাজেরা আমাদের বুঝে নিয়েছে। তুমি অবশ্য জান এখানে আমার যেমন জাহাজ চলবে তেমনি ফ্লোটিলা কোম্পানী নামক একটি ইংরেজ কোম্পানীর জাহাজ চলবে। আমাদের উভয়ের মধ্যে খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলবে। ফ্লোটিলা কোম্পানীর অনেক খরচপত্র লোক-জনের ব্যয় কিন্তু তারা প্রায়ই যাত্রী পায় না! অধিকাংশ যাত্রী আমাদের জাহাজে যায়। তাদের বিস্তর ক্ষতি হচ্ছে তবু তারা সমান নিয়মিতভাবে জাহাজ চালাচ্চে—যত্নের একটু ত্রুটি কিম্বা শৈথিল্য করে না! আর তারা প্রকাশ্য-ভাবে বলে—বাঙ্গালীর অধ্যবসায় নাই; তাহারা আমাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কতদিন জাহাজ চালাতে পারবে? এখানে আমাদের জাহাজ যাতে স্থায়ী হয় তার জন্য এখানকার লোকের—বিশেষতঃ ইস্কুলের ছাত্রদের অপরিসীম উৎসাহ ও যত্ন। এমন উৎসাহ আমি কখন দেখিনি। তাদের ভাব দেখে চমৎকৃত হতে হয়। প্রত্যহ খুব ভোরে আমাদের জাহাজ এখান থেকে যাত্রী নিয়ে খুলনায় যায়। ফ্লোটিলা কোম্পানীর জাহাজও সেই সময় যায়। পাছে আমাদের জাহাজে লোক না গিয়ে প্রতিপক্ষের জাহাজে যায় এই জন্য কতকগুলি ভদ্রলোক ও ইস্কুলের ছাত্র রাত্রি ৪টার সময় উঠে দলবদ্ধ হয়ে উৎসাহের সহিত জাহাজের ঘাটে প্রত্যহ উপস্থিত হন ও যদি কোন যাত্রী প্রতিপক্ষের জাহাজে যেতে চায়, তাকে অনেক প্রকার বুঝিয়ে এমন কি পায়ে পর্যন্ত ধরে ফিরিয়ে আনেন। এমন কি, জালি বোটে করে প্রতি-পক্ষের জাহাজে লোক উঠছে—সেখান পর্যন্ত গিয়ে তাদের বুঝাতে থাকেন। "আমাদের কথাটি একবার শুনুন, তারপর যে জাহাজে ইচ্ছা হয় যাবেন। দেশের টাকা দেশে থাকে এটা কি প্রার্থনীয় নহে? প্রতিপক্ষের জাহাজে স্বদেশীয়দিগের প্রতি কু-ব্যবহার করা হত, অপমান করা হত—আমাদের নিমন্ত্রণেই, আমাদের আহ্বানেই ঠাকুর বাবুরা এখানে জাহাজ এনেছেন—তখন কি আপনার ও জাহাজে যাওয়া উচিত? 'হাঁ বটে যা বল্লে তার উত্তর নাই, চল ঐ জাহাজে যাওয়া যাক' এই বলে যাত্রীরা আবার আমাদের জাহাজে অনেকে ফিরে আসেন। একটি বার বৎসর বয়স্ক বালক ঘাটে সেদিন বক্তৃতা দিয়েছিল—"হে ভাই সকল, তোমরা আপনার জাহাজ থাকতে পরের জাহাজে যাইবা না। উহাদের ঐ যে জাহাজ দেখিতেছ উহার যেরূপ গঠন তাহাতে একটু বেশি বাতাস উঠিলেই দোদুল্যমান হইয়া জলগর্ভে নিমগ্ন হইবে—তাহার সাক্ষী দেখ, উহারা এখানে জাহাজ রাখিতে— নাই—ওপারে লইয়া গিয়াছে এবং এই বাতাসেই দোদুল্যমান হইতেছে—যদি তোমরা প্রাণ বাঁচাইতে চাও তো ভাই সকল ঐ জাহাজে যাইবা না।" এই কথা শুনে নীচশ্রেণী লোকদের ভয় হল, আর প্রতিপক্ষের জাহাজে তারা গেল না। ঝড় হোক—বৃষ্টি হোক—রৌদ্র হোক—যে কোন বাধা হোক তাঁহারা জাহাজের সিটি (বাঁশীর ডাক) শুনবামাত্র দৌড়ে ঘাটে এসে উপস্থিত হন। তাঁহারা বলেন, আমাদের জাহাজের সিটি তাঁহাদের এমন মিষ্টি লাগে ও তাহা শুনতে পেলে তাঁদের এমন আহ্লাদ হয় যে, তাহা বলবার নয়। বন্ধুদের সুপরিচিত গলার স্বর দূর হতে শুনলে যেমন বুঝা যায়, কে আসছে, তেমনি সিটি শুনলেই কোন্ জাহাজ আসছে তাঁরা বুঝতে পারেন। ঐ আজ 'ভারত' আসছে, ঐ আজ 'লর্ড রিপণ' আসছে, ঐ আজ 'বঙ্গলক্ষ্মী' আসছে—ঐ আজ 'স্বদেশী' আসছে, এই বলে সকলে উৎসাহের সহিত হাস্য মুখে দলবদ্ধ হয়ে ঘাটে এসে উপস্থিত হন। সেদিন একজন বলছিলেন, 'যেমন বৃন্দাবনের কৃষ্ণের বংশীর ধ্বনিতে হৃদয় আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ তাঁদেরও হৃদয় আকৃষ্ট হয়।' আবার প্রতিপক্ষের জাহাজের নাম পর্যন্ত তাঁরা সইতে পারেন না—তার সিটিও তাঁদের কাণে অত্যন্ত কর্কশ লাগে। প্রতি-পক্ষের জাহাজ যদি কোনদিন যাত্রী পায় সেদিন তাঁদের আপসোসের আর সীমা থাকে না।

"সেদিন আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য এখানে যে একটি বৃহৎ সভা হয়েছিল, তাতে

একটি বক্তা আমার ষ্টিমারের উল্লেখ করতে করতে হঠাৎ আপনাকে সম্বরণ করে বললেন, 'তাঁর . ষ্টিমার ভুলক্রমে বলেছি—ইহাও আমাদেরই ষ্টিমার'—এই কথাটি আমার বড়ই ভাল লেগেছিল। সেদিন সে সভায় অনেক লোক একত্র হয়েছিলেন—একটি প্রকান্ড গৃহ লোকে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এখানকার হাকিম, উকীল, জমীদার, দোকানদার, মহাজন অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এখানকার প্রধান জমীদার শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। অনেকগুলি সুবক্তা সেদিন বক্তৃতা করেছিলেন। সেদিন ছাত্রদিগের আহ্লাদ ও উৎসাহের সীমা ছিল না। তারা আপনারাই সভার বিজ্ঞাপন ঘরে ঘরে গিয়ে বণ্টন করেছিল, গাছের পাতা দিয়ে ঘরটি সুন্দর সাজিয়েছিল। তাদের উৎসাহ দেখলে নিরাশ প্রাণেও আশার সঞ্চার হয়—নিরুদ্যম হৃদয়েও উদ্যমের ভাব আসে।

"সেদিন এখানে জাতীয় সংকীর্তন হয়েছিল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' অঙ্কিত নিশান হাতে নিয়ে, খোল কর্তাল বাজাতে বাজাতে, বাহু তুলে, উৎসাহের সহিত গান করতে করতে সংকীর্তনের দলরা বাবুর বাড়ী থেকে বৈকালে বেরুলেন—যেতে যেতে রাস্তায় লোকের ভীড় বাড়তে লাগল—তারপর বাজারে পেঁাছিলে লোকারণ্য হয়ে উঠল। প্রথমে লোকেরা মনে করেছিল, বুঝি কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের সংকীর্তন, তাই অ—বাবু* একটা টুলের উপর দাঁড়িয়ে এ কীর্তনের উদ্দেশ্য অল্প কথায় ও সহজ ভাষায় বেশ বুঝিয়ে দিলেন—তাতে লোকেরা বেশ বুঝতে পারলে ও উৎসাহের সঙ্গে সংকীর্তনে সবাই যোগ দিলে।

"নগর সংকীর্তনের যে কি মাতালে ভাব, আমি সেদিন বেশ বুঝতে পারলাম। এইরূপ জাতীয় সংকীর্তন যদি নগরে নগরে গ্রামে গাওয়া হয়, তাহলে বড়ই উপকার হয়। সাধারণের মধ্যে জাতীয় ভাব প্রচারের ভাল উপায় এর চেয়ে আর কিছুই নেই।"

যে গান গীত হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। কিন্তু তাহাতে ছিলঃ—

"ভিন্ন ভিন্ন জাতি মিলে দিবারাতি
ভাই ভাই হয়ে করিব সাধন।
দেখবে দেশে দেশে এ ভারতে মিশে
কত জাতির হল প্রেমেতে মিলন।"

ইহা পাঠ করিলে মনে পড়েঃ—

"হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগোরে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু'বাহু বাড়ায়ে নাম নর-দেবতারে
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যান গম্ভীর এই যে ভূধর
নদী-জপমালা ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে॥
কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হোলো হারা।
হেথায় আর্য হেথা অনার্য হেথায় দ্রাবিড়, চীন—
শক হূণ দল পাঠান মোগল
এক দেহে হোলো লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে।
এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি' মন ধরো হাত সবাকার
এসো হে পতিত,
হোক অপনীত সব অপমান ভার।
মা'র অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থনীরে।
আজি ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে॥"

স্বদেশের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত গানে পাওয়া যাইবেঃ—

"সার্থক জনম, মাগো জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম, মাগো, তোমায় ভালবেসে।

*অশ্বিনীকুমার দত্ত


চিকিৎসা জগতে নব যুগের সূচনা
বিশ্বাস করুন আর নাই করুন
ক্যালোফিল
খেলে ফাইলেরিয়া রোগে উপকার দেবেই দেবে...
নিয়মিত সেবনে পুরোনো রোগও সারতে দেখা গেছে।
TRADE MARK
মেধা ও বীর্য্য ফিরে দ্যায়
নিউরোবেটোল
• অনিদ্রা
• স্মৃতিশক্তি হ্রাস
• স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য
দূর করে নূতন জীবনের সূচনা করে।
ইণ্ডিয়ান হারবল্ রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রডাক্টস্
মারুতি ড্রাগ সিণ্ডিকেট
৮৪এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জানিনে তোর ধন রতন
আছে কিনা রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায়
তোমার ছায়ায় এসে।
কোন্ বনেতে জানিনে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়াল,
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে।"

এইভাবেই কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ গাহিয়াছিলেন ঃ—

"স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি
রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান;
যাঁহার সলিলে মন্দাকিনী চলে
অনিলে মলয় সদা বহমান।
"নন্দন-কাননে কিবা শোভা হার,
বনরাজিকান্তি অতুল তাহার;
ফল শস্য তার সুধার আধার;
স্বর্গ হ'তে সে যে মহামহীয়ান।
"এদেহ তোমার তা'র মাটিই হ'তে
হয়েছে সৃজিত শোধিত তাহাতে
মাটী হয়ে পুন মিশিবে তাহাতে
ভবলীলা যবে হ'বে অবসান।
"পিতৃপিতামহ অস্থিমজ্জা যত—
ধূলিরূপে তা'হে রয়েছে মিশ্রিত;
এই মাটি হ'তে হইবে উত্থিত
ভাবীকালে তব ভবিষ্য সন্তান।
"নিজ দেহ প্রাণ করিয়া অর্পণ
যে করিবে মা'র অশ্রু বিমোচন;
জেন, তা'র(ই) হ'বে সার্থক জীবন—
হ'বে তা'র মাতৃ-ঋণ প্রতিদান।"

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশকে ভালবাসিতেন বলিয়াই দেশের সকল কল্যাণকর কার্যে তাঁহার যেমন আগ্রহ ছিল, দেশের অধিবাসীদিগের অপমান তাঁহাকে তেমনই পীড়িত করিত। কলিকাতায় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে হয়। তখন রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়স্ক। তিনি সেই অধিবেশনে গাহিয়াছিলেন ঃ—

"আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে!
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে
আয় ব'লে ঐ ডেকেছে কে,
সেই গভীর স্বরে উদাস করে,
আর কে কা'রে ধরে' রাখে?
যেথায় থাকিবে যেখানে বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,
প্রাণের টানে টেনে আনে
সেই প্রাণের বেদন জানে না কে?
মান অপমান গেছে ঘুচে
নয়নের জল গেছে মুছে
নবীন আশা হৃদয়ে ভাসে
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে।
কত দিনের সাধন ফলে মিলেছি আজ দলে দলে,
আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয় রে মা'কে।"

কংগ্রেসের আর এক অধিবেশনে প্রতিনিধিগণের জন্য অনুষ্ঠিত সম্মিলনে প্রথম "অয়ি ভুবন মনোমোহিনী" গীত হইয়াছিল এবং পরবর্তী এক অধিবেশনে তিনি "বন্দে মাতরম্" গান করিয়াছিলেন।

যখন কলিকাতায় আর এক অধিবেশনে মডারেটগণ ডাক্তার এণী বেসাণ্টকে সভানেত্রী করিতে ভয় পা'ন, তখন তিনি অগ্রবর্তী দলের সমর্থকরূপে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইতেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি "আবেদন আর নিবেদন থালা" বাহিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। পাঞ্জাবে যখন ভারত-বাসীরা লাঞ্ছিত হয়, তখন তিনি তাহার যে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহা কে ভুলিতে পারে?

তিনি তাঁহার দেশবাসীর জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন ঃ—

"নিশ্চল নিবীর্য বাহু কর্মকীর্তিহীনে,
ব্যর্থশক্তি নিরানন্দ জীবন-ধন-দীনে,
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে
জাগ্রত ভগবান হে।
* * * * *
গত-গৌরব হৃত-আসন নত-মস্তক লাজে,
গ্লানি তা'র মোচন কর, নর-সমাজ মাঝে।
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে,
জাগ্রত ভগবান হে।
আত্ম-অবিশ্বাস তা'র নাশ কঠিন ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদ ভার হান অশনি-পাতে।
ছায়া-ভয়-চকিত-মূঢ় করহ পরিত্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে।"
* * * * *

ব্রজগোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে বিস্মৃতি হইতে আপনাদিগের মধ্যে সংকুচিত করিয়া তাঁহার ধ্যান করিয়াছিল ঃ—

"হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে।

তেমনই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বদেশকে বাঙ্গালায় সংকুচিত করিয়াছিলেন ঃ—

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
* * *
ওমা তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে,
দেগো তোর পায়ের ধূলো
সে যে আমার মাথার মাণিক হ'বে।
* * * * * *
আমি পরের ঘরে কিনব না আর ভূষণ ব'লে
গলার ফাঁসি॥"

তিনি বাঙ্গালার দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন ঃ—

"কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ,
কোথা সে তোর মলিন হাসি।
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল
ঐ চরণের দীপ্তি রাশি।"

তিনি সেইভাবেই রাখীবন্ধনের মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের রচনা পাঠ করিলেই তাঁহার জাতীয়তা কিরূপ—সে জাতীয়তা তাঁহার দেশাত্মবোধের উৎস হইতে কিরূপে উদ্ভূত—তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। তিনি জাতীয়তার ভিত্তি কখন ত্যাগ করেন নাই এবং তাঁহার আন্তর্জাতিকতা সেই জাতীয়তার উপরেই প্রতিষ্ঠিত—মানব মনীষার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি সেই আন্তর্জাতিকতা কখন তাঁহার জাতীয়তার গৌরব ম্লান করিতে পারে নাই —পারিবে না।

ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের স্থান

ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী



ভারতীয় সভ্যতায় বৌদ্ধধর্মের অবদানের সঠিক মূল্য এখনো নির্ধারিত হয়নি। তার প্রধান কারণ বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হতে বিলুপ্তপ্রায়। নেপালে বৌদ্ধধর্মের যে ক্ষীণধারা প্রবাহিত হচ্ছে তা থেকে বৌদ্ধধর্মের গৌরবময় যুগের কোন ধারণা করা সম্ভব নয়। চট্টগ্রাম অঞ্চলে অধুনা যে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত রয়েছে তার ইতিহাসও খুব প্রাচীন নয়। সিংহলের মহাবোধি সোসাইটির প্রচেষ্টায় যে কয়টি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, তার কাজও যথেষ্ট পরিমাণে অগ্রসর হয় নাই। অপরপক্ষে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের বাইরে নানা দেশ, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ, ক্যাম্বোডিয়া, চীন ও জাপানে প্রচলিত রয়েছে বলেই সে ধর্মকে আমরা সাধারণতঃ বৈদেশিক ধর্ম মনে করে থাকি।

আমাদের আধুনিক ধর্মজীবনে বৌদ্ধধর্মের স্থান নাই বটে, কিন্তু আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসে তার স্থান যে অতি উচ্চে তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। অশোকের সময় হতে আরম্ভ করে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল পর্যন্ত যদি ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট যুগ ধরা যায়, তবে সে যুগকে বৌদ্ধযুগ বললে কোন অত্যুক্তি হবে না। ভারতীয় সাহিত্য, শিল্প ও দর্শনের ইতিহাসে যা কিছু শ্রেষ্ঠ রচনা তা প্রধানতঃ এই যুগের মধ্যেই নিবদ্ধ। আর সেই সৃষ্টিতে যে বৌদ্ধধর্ম একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল, তা অস্বীকার করা চলে না।

অশোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হবার পর স্বদেশে ও বিদেশে মৈত্রীর মন্ত্র প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ভারতবর্ষের বাইরে নানা দেশে তিনি ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন এবং তাদের হাতেই সে সব দেশে বৌদ্ধধর্মের বীজ উপ্ত হয়েছিল। শক যবন পহ্লব প্রভৃতি





বৈদেশিক জাতি যখন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করল, তখন ভারতীয় সাংস্কৃতিক গণ্ডী তার প্রাকৃতিক সীমা হতে ক্রমশঃ বহু দূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করতে লাগল এবং কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই এক দিকে সমগ্র মধ্য এশিয়া, চীন, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশ এবং অন্যদিকে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, যবদ্বীপ, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশ এক বিরাট সভ্যতার গণ্ডীর মধ্যে স্থান পেল। এই সভ্যতাই হচ্ছে বৌদ্ধসভ্যতা।

বৌদ্ধধর্ম কেন বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের আকৃষ্ট করতে পেরেছিল, তার কারণ অতি সুস্পষ্ট। বৌদ্ধধর্ম বর্ণাশ্রমকে অবলম্বন করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। এ ধর্ম ছিল মূলতঃ গৃহত্যাগী ভিক্ষুর ধর্ম, আর সে ভিক্ষুর চোখে বিভিন্ন জাতি বা বর্ণের মধ্যে কোন তারতম্য নাই। পরোপকার ও সেবাই হচ্ছে ভিক্ষুর প্রধান ধর্ম, অপরের আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পেও যখন তিনি আত্মোৎসর্গ করেন, তখন তিনি হন কল্যাণমিত্র। বৌদ্ধধর্ম ভিক্ষুর আদর্শকে এক সার্বজনীন পটভূমিকার উপর স্থাপিত করেছিল বলেই তা জাতিবর্ণনির্বিশেষে সবাইকে আকৃষ্ট করেছিল।

বৌদ্ধধর্মের আরও কতকগুলি শ্রেষ্ঠ গুণ ছিল। অলৌকিকে বিশ্বাসের উপর এধর্ম অবস্থিত নয়। কর্মবাদ হচ্ছে তার প্রধান ভিত্তি। কৃতকর্মের ফলেই মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে। তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন ও পরিণতি ঘটছে। এই কর্মফলেই যেমন তার অধোগতি হয়, সেই কর্মের প্রভাবেই তার ঊর্ধ্বগতি বা বুদ্ধত্ব লাভ হতে পারে। সুতরাং বুদ্ধত্বলাভও তার আয়ত্তের মধ্যে। প্রত্যেক মানুষই তার সাধনার দ্বারা এই চরম অবস্থা লাভ করতে পারে। এই ধর্ম বা দৃষ্টিভঙ্গী প্রত্যেক মানুষকেই অভিভূত করতে

পারে। ফলে ঘটেছিলও তাই। অতি অল্প-কালের মধ্যেই বহু বৈদেশিক জাতি এ ধর্মকে নিজস্ব বলে গ্রহণ করেছিল।

এই কারণে বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে সার্বজনীন সংস্কৃতি বললে কিছু ভুল হয় না। তার মধ্যে এই আন্তর্জাতিকত্ব ছিল বলেই তা বিভিন্ন জাতি গ্রহণ করতে পেরেছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির এই বৌদ্ধ ধারাকেই International বলা চলে। ভারতীয় প্রতিভা সর্ব-জাতিকে দেবার উপযোগী করে যে সংস্কৃতিকে গড়ে তুলেছিল তা ছিল এই বৌদ্ধসংস্কৃতি। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে জাতীয় সংস্কৃতি বলা চলে। জাতীয় শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কার ও ধর্ম নিয়েই এ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। সেই কারণে যখনই বৌদ্ধ-ধর্ম বিদেশীর ভারতপ্রবেশ সুগম করেছে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম নানাভাবে তার জন্য বাধা সৃষ্টি করেছে এবং জাতীয় সংস্কৃতিকে বিদেশীর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবার চেষ্টা করেছে। সে চেষ্টা যে সম্পূর্ণ ফলবতী হয়েছে তা মনে করবার কোন কারণ নেই, তবে তা ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসে বহু সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

বৌদ্ধধর্মের প্রধান অবদান হচ্ছে যে তা এশিয়ার নানা জাতির সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপনা করেছে। তুর্কী, চীনা, তিব্বতী, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি জাতির সঙ্গে আমাদের কোন জাতিগত বা ভাষাগত সম্পর্ক নাই। কিন্তু বহুকাল ধরে তারা বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির অনুশীলন করেছে বলে তাদের মনোভাবের সঙ্গে আমাদের মনোভাবের যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উপরন্তু নানা রাজনৈতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও ঐ সব জাতি এখনো ভারতবর্ষকে তাদের Holy Land মনে করে। ভারতবর্ষ হতেই যে তাদের শিক্ষা ও ধর্মের ধারা প্রবাহিত হয়েছিল, এ কথা তারা ভোলে নি। সেই কারণে ভারতবাসীকে যে তারা নিকটআত্মীয় বিবেচনা করে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

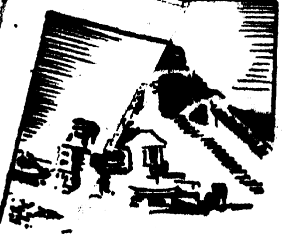
বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান অবদান হচ্ছে শিল্প। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবেই ভারতে প্রথম শিল্পের উন্মেষ হয়। মৌর্যযুগে এ শিল্প মূলতঃ নিবদ্ধ ছিল স্তম্ভ ও স্তূপ নির্মাণে। এই যুগের দু'একটি যক্ষ যক্ষিণী মূর্তিতেও অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মৌর্যযুগের শেষভাগে এবং তৎপরবর্তী শুঙ্গ যুগেই একটি উন্নত শিল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। বৌদ্ধস্তূপের চতুর্দিক সুসজ্জিত করবার প্রয়োজনেই এই শিল্পের সৃষ্টি। সাঞ্চী ও ভরহুত স্তূপেই তার সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনা পাওয়া গিয়েছে। খোদিত চিত্রবহুল প্রস্তর-নির্মিত রেলিং, সুসজ্জিত দ্বারস্তম্ভ প্রভৃতি থেকে বোঝা যায় যে, এই শিল্প খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকেই যথেষ্ট উন্নতিলাভ করেছিল।

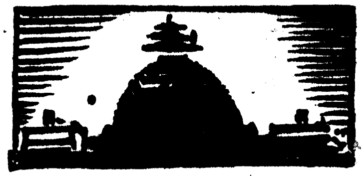
পরবর্তী যুগের শিল্পও বৌদ্ধ শিল্প। তিনটি বিভিন্ন স্থানে এই শিল্পের উদ্ভব ও পরিণতি ঘটেছিল—গন্ধার বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, মথুরা ও কৃষ্ণানদীর উপত্যকায় ধান্যকটক বা অমরাবতী। গন্ধার প্রদেশের শিল্পে গ্রীক প্রভাব স্বীকৃত হয়েছে, সেই কারণে গন্ধার শিল্পকে কেহ কেহ ইন্দোগ্রীক্ শিল্পও বলেন। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত গ্রীক এবং পরে কুষাণদের হাতে এই শিল্পের উন্নতি-সাধন হয়। এই যুগেই বুদ্ধদেবের প্রথম মূর্তিকল্পনা হয় খুব সম্ভবতঃ বিদেশীদের হাতে। মথুরা অঞ্চলে এই যুগের যে বৌদ্ধ-শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়, তার মধ্যে একটি বিশিষ্ট রচনাশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। তার মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক প্রভাব লক্ষিত হয় না। দক্ষিণে অমরাবতীও একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এই কেন্দ্রকে অবলম্বন করেই আর একটি বিশিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই শিল্পের রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্যের জন্যই একে একটি নূতন সম্প্রদায়ভুক্ত করা হয়। এই বিভিন্ন বৌদ্ধ শিল্প সম্প্রদায়ের হাতেই ভাবতীয় শিল্পের উদ্ভব ও উন্নতি ঘটে। এই সব সম্প্রদায়ের উদ্ভব না হলে গুপ্ত যুগের চরম শিল্পোন্নতি সম্ভব হত না। পরবর্তী-কালের শিল্পের মধ্যে বৌদ্ধশিল্প একটি প্রধান স্থান অধিকার করে। সে আলোচনা না করলেও একথা স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, ভারতীয় শিল্পের সৃষ্টি ও পরিণতির ইতিহাসে বৌদ্ধধর্ম শ্রেষ্ঠ স্থান গ্রহণ করেছিল। ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাস আলোচনা করলেও একই কথা বলা চলে। বৌদ্ধ গুহামন্দিরেই তার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায়।

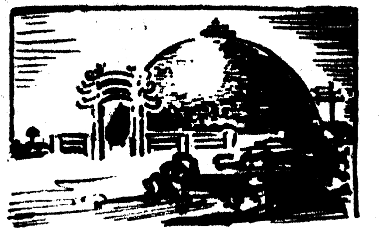
ভারতীয় সাহিত্যেও বৌদ্ধধর্মের একটি বিরাট অবদান স্বীকার করতে হয়। ধর্ম-সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী, উপদেশগ্রন্থ প্রভৃতির কথা বাদ দিলেও বৌদ্ধ গাথা সাহিত্যে এমন বহু রচনা আছে যা এখনও সাহিত্যরসিককে আনন্দ দিতে পারে। পালিভাষায় রচিত "ধর্মপদ" ও "সুত্ত নিপাত" এই জাতীয় গ্রন্থ। এসব গ্রন্থের গাথায় সরলতা সুষ্ঠু শব্দ প্রয়োগ, ছন্দের সহজগতি প্রভৃতি সমস্তই পাওয়া যায়। অথচ এগুলি অতি প্রাচীনকালের রচনা, কতকাংশ মৌর্যযুগের একথা বললেও অত্যুক্তি হয় না। পালি ভাষায় রচিত "মিলিন্দপঞ্হো" অতি প্রাচীন রচনা। এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু গ্রীকরাজা মিনাণ্ডার ও বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনের মধ্যে ধর্মসম্বন্ধীয় আলোচনা। এ গ্রন্থও বৌদ্ধ সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যেও অনেক অমূল্য সম্পদ রয়েছে। অশ্বঘোষের "বুদ্ধচরিত" একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। অশ্বঘোষ যে একজন মহাকবি ছিলেন তা সকলেই স্বীকার করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে সত্যকার মহাকবিদের রচনা যে বেশী আছে তা বলা যায় না এবং অশ্ব-ঘোষকে বাদ দিলে সে রচনার সংখ্যা আরও কমে যায়। অশ্বঘোষ খৃষ্টীয় প্রথম শতকের, সুতরাং কালিদাসের পূর্বগামী। কালিদাস যে তাঁর অনুবর্তন করেছেন সে কথা এখন অনেকেই স্বীকার করেন। অশ্বঘোষের রচিত একখানি নাটকের খণ্ডিতাংশ মধ্য এশিয়ার মরুভূমি হতে উদ্ধার করা হয়েছে। আমাদের নাটকের ইতিহাসে এ নাটক যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়, তার কারণ অশ্বঘোষের কাল নির্ণয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। নানা কাব্যগ্রন্থ ও গাথা সংগ্রহ ছাড়া সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যে আর এক শ্রেণীর রচনা আছে যা বর্তমান যুগের সাহিত্যিকদেরও উদ্বুদ্ধ করেছে, সে রচনা হচ্ছে "অবদান।" সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্যে "দিব্যাবদান", "অবদানশতক", "অবদানকল্পলতা" প্রভৃতি গ্রন্থ আছে। আর এই সব সংগ্রহের মধ্যে এমন অনেক অবদান আছে, যার রচনা ও গল্পাংশ এখনো আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে। এই সব রচনা এক সময়ে যে শিল্পীকেও উদ্বুদ্ধ করেছিল তা প্রাচীন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের খোদিত বা অঙ্কিত চিত্র থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়।

অতএব ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্যে বৌদ্ধধর্মের অবদান অতি মূল্যবান। ভারত-বর্ষের বাইরেও নানা দেশে বৌদ্ধধর্ম শিল্প ও সাহিত্যে প্রেরণা দিয়েছিল। মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ও তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রসারলাভ করবার পূর্বে কোন সাহিত্য বা শিল্প ছিল না। এমন কি কোন লিপিও ছিল না। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করবার পর সে সব দেশের অধিবাসীরা ভারতীয় লিপির প্রয়োগ আরম্ভ করল এবং বৌদ্ধ সাহিত্য হতে নানা গ্রন্থ নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করল। এই অনূদিত গ্রন্থই হল তাদের প্রথম সাহিত্য। এই সব অনুবাদই তাদের পরে সাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। ঐসব দেশের প্রথম শিল্প নিদর্শনও ভারতীয় শিল্পের বিশিষ্ট ধারা হিসাবে গণ্য হতে পারে। ভারতীয় বৌদ্ধগুহা মন্দিরের ন্যায় গুহা মন্দির, প্রাচীর চিত্র, গন্ধার শিল্পের অনুকরণে রচিত বুদ্ধমূর্তি, প্রভৃতি হচ্ছে মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ শিল্পের বিশিষ্ট নিদর্শন। তিব্বতের প্রথম শিল্পের নমুনাও মগধ ও বঙ্গ-দেশের পালযুগের শিল্পের অনুকরণ। অনেক সময় বঙ্গমগধ হতে শিল্পী গিয়েই তিব্বতের







...ধবিহার ও বুদ্ধমূর্তি রচনায় স... নানাস্থা... ছিলেন। অতএব ভারতের বাহিরে না... হায়ত... ত দেশের সাহিত্য ও শিল্প প্রতি... বৌদ্ধধর্ম যে প্রেরণা জুগিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই প্রেরণার মূলে ছিল ভক্তিবাদ। বৌদ্ধধর্মই যে প্রথম ভক্তিবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করে একথা মনে • করবার যথেষ্ট কারণ আছে। বৈদিক ধর্মের মূল কথা ভক্তি নয়। ক্রিয়াকাণ্ডের মূলে যাজ্ঞিক ক্রিয়ার অমোঘ শক্তি সম্বন্ধে বিশ্বাস। সেই ক্রিয়ার প্রভাবে বিশ্বের সমস্ত দৈব ও প্রাকৃতিক শক্তিকে আত্মহিতে নিয়োগ করবার ক্ষমতা। উপনিষদোক্ত জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের উপর। এই দুই চিন্তার ধারার মধ্যে ভক্তিবাদের বিশেষ কোন স্থান নাই। বেদপরবর্তী যুগে বৌদ্ধধর্মই প্রথম ধর্ম যা ক্রমশঃ ভক্তিবাদের গোড়া পত্তন করে। বুদ্ধের জীবদ্দশায় তা ঘটে নি। কারণ বুদ্ধদেব স্বয়ং ছিলেন জ্ঞানবাদী। তিনি তাঁর শিষ্যদিগকে তাঁর মৃত্যুর পর বৌদ্ধশাস্ত্রের সত্যানুসরণ করতেই বলেছিলেন।

কিন্তু কালক্রমে তারা বুদ্ধদেবের পূজাতেই আত্মনিয়োগ করেছিল। তার কারণ বৌদ্ধ ধর্মে দেবদেবীর কোন স্থান নাই, বুদ্ধদেবই ছিলেন তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্যরূপী দেবতা। সেই জন্য তিনিই হয়েছিলেন তাদের ভক্তিভাজন। স্তূপের মধ্যে সমাহিত বুদ্ধদেবের নশ্বরদেহের "শরীর" বা অস্থিকে পূজা করা, স্তূপকে প্রদক্ষিণ করা, পুষ্পচন্দনে সে স্তূপের পূজা করা—এ সমস্ত প্রথাই বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যেই বৌদ্ধ পূজা-পদ্ধতিতে স্থান পেয়েছিল।

এই ভক্তিবাদ মৌর্যযুগের পূর্বেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল? অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করবার পর বুদ্ধধর্মাবলম্বীর উপাসনার জন্য দেশময় স্তূপ নির্মাণের আয়োজন করেন। তিনি নিজে বুদ্ধদেবের জন্মস্থান পর্যন্ত তীর্থযাত্রা করেন এবং বুদ্ধদেবের স্মৃতিরক্ষাকল্পে নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। বুদ্ধদেবের উপর এই ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং বুদ্ধের স্মৃতিরক্ষার জন্য এই ব্যাকুলতাই হয়েছিল শিল্প ও সাহিত্য রচনার উৎস বিশেষ। ভক্তিবাদের এই প্রথম ধারা প্রবাহিত হবার পরই তা বহুমুখী হতে আরম্ভ করে। এর অতি অল্পদিনের মধ্যে শৈব, ভাগবত প্রভৃতি নূতন নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় যা এই ভক্তিবাদকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের এই নূতন পরিণতির ফলে বৈদিক ধর্মের প্রকৃত পরিসমাপ্তি ঘটে, পরবর্তীকালে তার প্রচলন থাকলেও তার সত্যকার প্রয়োজন শেষ হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এই সব ভক্তিমূলক নূতন সম্প্রদায়ের হাতেই বৌদ্ধও শিল্পী ও সাহিত্যেব অনুরূপ শিল্প ও সাহিত্যের সৃষ্টি হয় এবং ভারতে নূতন সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা হয়। অতএব একথা স্বীকার না করা চলে না যে বৌদ্ধ ধর্মই ভারতের এই অভিনব সংস্কৃতির সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল। এই সংস্কৃতিকেই আমরা "হিন্দু" সংস্কৃতি বলে থাকি।

মনোমোহন বসু

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে সকল বঙ্গ-মনীষী বিভ্রান্ত বাঙালী জাতিকে আত্মস্থ হইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মনোমোহন বসু একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তিনি একাধারে কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক ও চিন্তাশীল লেখক; তাঁহার প্রতিটি চিন্তা ও কর্মের মূলে উৎস ছিল—স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেম। তাই তাঁহার লেখনী একদিকে যেমন সে-যুগের বিপথগামী বাঙালী জাতিকে কশাঘাত করিতে দ্বিধা করে নাই, অন্য দিকে তেমনি তাহার সম্মুখে একটি মহৎ আদর্শ উপস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তখন এই আদর্শকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য সে-যুগের বাঙালীরাও সচেষ্ট হইয়াছিলেন। হিন্দুমেলায় প্রদত্ত মনোমোহনের জাতীয় ভাবোদ্দীপক ওজঃপূর্ণ বক্তৃতাবলী, 'হরিশ্চন্দ্র' ও অন্যান্য নাটক এবং জাতীয় সঙ্গীতাদি বাংলা-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্‌। বাঙালীর জাতীয় অভ্যুত্থানের ইতিহাসে ইহাদের প্রত্যেকটির স্থান সুনির্দিষ্ট। তাঁহার

"দিনের দিন, সবে দীন, হয়ে পরাধীন!
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা জ্বরে জীর্ণ, অপমানে
তনু ক্ষীণ!"
—'হরিশ্চন্দ্র'।

সঙ্গীতটি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। ইহার পর ৭০ বৎসরেরও অধিক কাল অতীত হইয়াছে, কিন্তু যে-সব সমস্যার কথা এই সঙ্গীতটির বিষয়, আজিও তাহার সমাধান হয় নাই।

জন্ম

মনোমোহনের পিতার নাম—দেবনারায়ণ বসু; তাঁহার নিবাস—২৪ পরগণার ছোট জাগুলিয়া গ্রামে। ইহার ১৬ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত বর্তমান যশোহর জেলার অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুর নামে ক্ষুদ্র গ্রামে মাতামহালয়ে মনোমোহনের জন্ম হয়। অনেকে তাঁহার জন্ম-তারিখ—আষাঢ় ১২৩৪ সাল বলিয়া আসিতেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা ৩০ আষাঢ় ১২৩৮ (১৪ জুলাই, ১৮৩১)। আমরা মনোমোহনের স্বহস্তে লেখা একখানি ডায়ারি বা দিনলিপি পাইয়াছি; তাহাতে তিনি স্বীয় জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

খৃঃ অব্দ ১৮৮৬

> এক্ষণে আমার বয়ঃক্রম ৫৫ পঞ্চান্ন বৎসর ৪ চারি মাস—যেহেতু সন ১২৩৮ সালের আষাঢ় মাসে প্রথম রথের পর দ্বিতীয় রথের মধ্যে যে বুধবার, সেই বুধবারে আমার জন্ম। তিথি ঠিক মনে নাই বোধ হয় শুক্লা পঞ্চমী। ঠিকুজী ছিল, হারাইয়া গিয়াছে।

ডায়ারিতে লিখিত জন্ম-তারিখটি যে নির্ভুল, তাহার আর একটি প্রমাণ দিতেছি। মনোমোহন তৎসম্পাদিত 'মধ্যস্থ' পত্রে (২য়—৩য় বর্ষ, ইং ১৮৭৩-৭৪) "সমাজচিত্র ইত্যাদি' অথবা কেঁড়েলের জীবন লিখিয়াছিলেন। ইহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই বাল্যজীবনের কথা। "কেঁড়েল" নাম গ্রহণ করিয়া তিনি এই সময়ে 'নাগাশ্রমের অভিনয়' নামে একখানি প্রহসনও রচনা করিয়াছিলেন। "কেঁড়েলের জীবনে" তিনি যে জন্ম-বিবরণ দিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি, ডায়ারির উপরিলিখিত অংশের সহিত ইহার সাদৃশ্য লক্ষণীয় :—

> ["সপ্তদশ ত্রিপঞ্চাশৎ শকাব্দাঃ, আষাঢ়ী শুক্লা পঞ্চমী, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের প্রথম বিমান যাত্রার দুই দিবসান্তে, ঘোরা, গভীরা, 'জলধর পটলাবৃতা' তাহাতে যেন তিমিরাবগুণ্ঠন-ধারিণী যামিনী ঠাকুরাণী প্রথম দশ দণ্ড পতি-সোহাগিনী থাকিবার পর এক্ষণে বিরহিণী, সুতরাং নিতান্ত বিষাদিনী হইয়া মুখ আঁধার করিয়া রহিয়াছেন; হেন কালে টিপ্‌টিপ্‌নী বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল, তিনি যেন অশ্রুপাত করিলেন! তাঁহার অন্তরের তাপ জানিতে পারিয়া অনুচর বাদুড় ডায়া তিন্তিড়ীশাখা ছাড়িয়া বিশাল দুটি পাখা নাড়িয়া বাতাস করিতে লাগিল; তাঁহার চিত্তবিনোদনার্থ চির-সখা পেচক মহাশয় মধুর স্বরে গান জুড়িয়া দিলেন; সানায়ের যুড়ি যেমন বিরাম ব্যতীত একঘেয়ে 'পোঁ' শব্দ ছাড়িতে থাকে, গায়ক প্রধান পেচকের ঝিল্লিও তেমনি অবিশ্রান্ত অক্লান্ত স্বর সংযোগ করিল। গ্রাম্য চোর, চৌকীদারের সহিত ভাগের বন্দোবস্ত করিয়া সচকিত অতি-ত্রস্ত সন্ধি-শলাকা (সিঁধকাটী) [illegible] আস্তে গৃহস্থের গবাক্ষনীচে দাগ দিতেছে, সেই শুভ লগ্নে নিশ্চিন্তপুর গ্রামে মাতামহ-ভবনে কর্কট রাশিতে আমি (কেঁড়েল) ধরণী-পৃষ্ঠে প্রথম অবতীর্ণ হইয়া 'ট্যাঁ ট্যাঁ' করিয়া কাঁদিয়াছিলাম! আমি চতুর্থ গর্ভের সন্তান। এই আমার জন্মবৃত্তান্ত বা জন্মকোষ্ঠী!"
> 'মধ্যস্থ'—৪ঠা আশ্বিন ১২৮০

বাল্যজীবন

"সমাজচিত্র অথবা কেঁড়েলের জীবন" হইতে আমরা মনোমোহনের বাল্যজীবনের কথা



মনোমোহন বসু

যেটুকু জানিতে পারি, তাহা "কেঁড়েলের" ভাষায় সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি :—

> "আমি কুলীন-কুল-সম্ভূত। মাতামহ মহাশয়ও কুলীন। তিনি কলিকাতা জেনার‍্যাল পোষ্ট অফিসের খাজাঞ্চি এবং আমার পিতা

মহাশয় কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর পর্যন্ত কোম্পানীর ডাকের ঠিকাদার ছিলেন। তাঁহা হইতেই ডাকের ঠিকাগ্রহণ প্রথার প্রথম সূত্রপাত হয়। তিনি আর কিছুকাল জীবিত থাকিলে এদেশের সমস্ত রাজবর্ত্মই তাঁহার ঠিকা-ভুক্ত হওনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ কাল তাহা শুনিল না—অকালেই পিতাকে হরণ করিয়া লইল। সে শোচনীয় ঘটনা নিশ্চিন্তপুরে নয়, আমাদের নিজ বাটীতেই ঘটে।......তিন বৎসর বয়সের সময় পিতার পরলোক হয়।......

মা ও পিসীমা বলিতেন আমি ৫।৬ মাসেই বসিতে, ৭ মাসেই হামাগুড়ি দিতে, ১০।১১ মাসেই দাঁড়াইতে এবং এক বৎসরের পরেই চলিতে পারিয়াছিলাম।......তৎকালে সমস্ত বঙ্গদেশ মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে এই প্রথা ছিল, যে, পুত্র সন্তান পঞ্চম বর্ষীয় হইলে ভাল একটা দিন দেখিয়া হাতে খড়ি দেওয়া হইত।......কিন্তু যৎকালে আমার হাতে খড়ি হইবার বয়স, আমি তাহার বহুপূর্ব্বে হইতেই বর্ণমালা প্রভৃতি লেখা পড়া ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলাম।......সুধু ইহা নহে, তখন আমি দাতাকর্ণ, গুরু-দক্ষিণা ও প্রহ্লাদচরিত্র পুঁথি অবলীলাক্রমে পড়িতাম।......আমাদের নিজ বাটীতেই পাঠশালা ছিল; তাহাতেই লিখিতাম পড়িতাম।...

ছয় বৎসর বয়সের সময় আমি এবং আমার মধ্যমাগ্রজ জননীর সহিত নিশ্চিন্তপুরে গেলাম।......কৃষ্ণনগর জিলার অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুর নামা ক্ষুদ্র, কিন্তু ভদ্র গ্রামে আমার মাতামহ বাস করিতেন। আমাদিগের নিজ গ্রাম হইতে নিশ্চিন্তপুর যোল ক্রোশ উত্তর দিগে স্থিত।......সেখানে ঘটনাসূত্রে চারি বৎসরের অধিক কালও মামার বাড়ী থাকি।......

হরিশ গুরু মহাশয় গেলেন, আমার চিত্ত অত্যন্ত উদাস হইল। আমাদের পুরোহিত ঠাকুরের পরামর্শে আমার মাতামহী কহিলেন "তুই কেন টোলে পড়তে যা না?" আমি এই নূতন বিদ্যার নাম শুনিয়া উৎসাহে নাচিয়া উঠিলাম—অবিলম্বে রাধামোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে মুগ্ধবোধ পড়িতে আরম্ভ করিলাম।......এক বৎসর কাল অত্যন্ত মনোভিনিবেশ সহকারে পড়িয়াছিলাম তাহার পর অত অনুরাগ ছিল না।"

"কেঁড়েলের জীবন" হইতে মনোমোহনের বাল্যজীবনের আর কোন কথা জানা যায় না।

মনোমোহন অতঃপর মাতামহালয় হইতে ছোট জাগুলিয়ায় ফিরিয়া আসেন। তথায় কিছুদিন ইংরেজী পড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্তি হন। এখানকার পাঠ সাঙ্গ হইলে তিনি জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে (বর্তমানে স্কটিশচার্চ কলেজে) প্রবেশ করেন। মনোমোহন কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি একবার রচনা-প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া কলেজ-কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সুবর্ণপদক লাভ করিয়াছিলেন। রচনার বিষয় ছিল—ছাত্র-জীবনের কর্তব্য।

সাময়িক-পত্র পরিচালন

শৈশব হইতেই মনোমোহন কবিতা রচনায় অভ্যস্ত ছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি 'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত পরিচিত হন। পাঠক মহলে তখন 'প্রভাকরে'র প্রবল প্রতিপত্তি। মনোমোহন ঈশ্বরচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রাথমিক রচনাগুলি 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হইয়াছিল। শোনা যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত-সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তেও নাকি তাঁহার কোন কোন রচনা স্থান লাভ করিয়াছিল। রচনা উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করিলে মনোমোহন নিজেই একখানি সাময়িক পত্র পরিচালন করিতে অগ্রসর হইলেন। এই পত্রিকাখানির নাম—

'সংবাদ বিভাকর'

ইহা একখানি অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্র। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৫ জুন ১৮৫২ (৩ আষাঢ় ১২৫৯, মঙ্গলবার)। ইহার আবির্ভাবে পরবর্তী ১৭ই জুন তারিখে 'সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয়' পত্র লেখেনঃ—

> "আমরা আহ্লাদপূর্বক পাঠকবর্গের গোচরার্থ প্রকাশ করিতেছি যে গত পরশ্বাবধি শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু কোং কর্তৃক 'সংবাদ বিভাকর' নামক অর্ধ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র অর্ধ মুদ্রা মাসিক মূল্যে প্রকাশারম্ভ হইয়াছে নবীন সম্পাদকদিগের অভিপ্রায় এবং পত্রের রচনা উত্তম হইয়াছে......।"

এক বৎসর যাইতে না যাইতেই 'সংবাদ বিভাকরে'র প্রচার বন্ধ হয়। ৯ মে ১৮৫৩ তারিখের 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সা'র পত্রে প্রকাশ—

> The Bibhakar has ceased to exist since the commencement of the new Bengallee year.

কিন্তু যে পত্রিকাখানি পরিচালন করিয়া সংবাদপত্রসেবী হিসাবে মনোমোহন বিশেষ সুনাম অর্জন করেন, তাহার কথা এইখানেই বলা প্রয়োজন। ইহা একখানি সাপ্তাহিক (পরে মাসিক) পত্র; নাম—

'মধ্যস্থ'

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে—১২৭৯ সালের ২রা বৈশাখ (১৩ এপ্রিল, ১৮৭২) হইতে এই সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রচারিত হয়। পত্রের শিরোভাগে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি শোভা পাইত—

> নবীনভাবাচ্ছপলাম্নবাম্নবেহযবীয়সোহপীহ
> চিরাগত-প্রিয়ান্।
> নিরীক্ষ্য ভিন্নপ্রকৃতীনমূনতঃ মধ্যস্থ
> ইত্থং যততে সমন্বয়ে॥

প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা প্রচারের "প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে সম্পাদক যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার অংশ-বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ—

> "আমি কোন পক্ষের পক্ষ কি বিপক্ষ হইতে আসি নাই; কাহারো সহিত প্রণয় বা বিবাদ করিতে আসি নাই; ব্যক্তিবিশেষকে তোষামোদ বা শ্লেষাস্ত্রের লক্ষ্য করিতেও আসি নাই; আমি আমোদজনক নীতি-প্রসঙ্গের সঙ্গে এক পক্ষকে এই কথা বলিতে আসিয়াছি—এই চীৎকার করিতে আসিয়াছি—এই দোহাই পাড়িতে আসিয়াছি, যে,—'স্থির হও, উন্নতির পথে যাইতেছ উত্তম! কিন্তু একটু মন্থর-গতিতে চল; শনৈঃ শনৈঃ পাদক্ষেপ কর; সম-যাত্রীদের কুড়াইয়া লও; সঙ্গী ছাড়িয়া কোথা যাও?—সঙ্গীহারা কেন হও? উন্নতির পথে বিঘ্ন-দস্যু অনেক আছে, একা একা গেলে অগ্রবর্তী পরবর্তী সকলেরি বিপদ; গমনে বিলম্ব হয়, তাও ভাল, কিন্তু একত্র হও! কিছু বিলম্বে গেলে হানি হইবে না, অতএব সময় বুঝিয়া পথ দেখিয়া চল—রাতারাতি অত দৌড়াদৌড়ি, অত ব্যস্তসমস্ততার আবশ্যক কি?......"
>
> "......এই সব সামাজিক প্রয়োজন ব্যতীত রাজকীয় ও অন্যান্য সামান্য বিষয়াদি সম্বন্ধেও কিছু কিছু প্রয়োজন আছে, তত্তাবৎ বিশেষ-রূপে উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা নাই—'ফলেন পরিচীয়তে'!' "

দ্বিতীয় বর্ষের ২৭শ সংখ্যা (৯ কার্তিক ১২৮০) পর্যন্ত সাপ্তাহিক আকারে চলিবার পর 'মধ্যস্থ' অগ্রহায়ণ মাস হইতে মাসিক পত্রে পরিণত হয়। সম্পাদকের স্বাস্থ্যভঙ্গই পত্রিকার এই রূপান্তরের কারণ। মাসিক আকারে 'মধ্যস্থ' প্রায় দুই বৎসর চলিয়াছিল। বার বার অসুস্থ হইয়া মনোমোহন শেষে পত্রিকা রহিত করিতে বাধ্য হন। ইহার শেষ সংখ্যার প্রকাশকাল—আশ্বিন ১২৮২।

'মধ্যস্থ' একখানি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা ছিল। ইহার গ্রাহক-সংখ্যা নগণ্য ছিল না। ইহাতে কবিতা, উপন্যাস, বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ, গ্রন্থ-সমালোচনা, দেশ-বিদেশের সংবাদ, এমন কি, রাজনীতির আলোচনাও স্থান পাইত।

চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলা

বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে যাহাতে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়—পরানুচিকীর্ষার পরিবর্তে যাহাতে আত্মনির্ভরতা বা স্বাবলম্বন বৃত্তির উন্মেষ হয়, তদুদ্দেশ্যে চৈত্র বা হিন্দু-মেলা জন্মলাভ করে। ইহা প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত। ১২৭৩ সালে চৈত্র-সংক্রান্তির দিন (এপ্রিল ১৮৬৭) কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলগাছিয়া ভিলাতে এই মেলার প্রথম অধিবেশন হয়। তদবধি প্রতি বৎসর—প্রধানতঃ কলিকাতার নিকটবর্তী কোন উদ্যানে—এই মেলা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। মেলার মূল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বদেশীয় সাহিত্য বিজ্ঞান কৃষি শিল্প বাণিজ্যাদি বিষয়ের আলোচনায় মেলার কর্তৃপক্ষ অগ্রণী হন।

মনোমোহন এই জাতীয়মেলার একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। তিনি ইহার বার্ষিক অধিবেশনগুলিতে যে-সকল জাতীয় ভাবোদ্দীপক বক্তৃতা দিতেন, তাহাতে বাঙালীর প্রাণে নব বলের সঞ্চার হইত। এগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্ হইয়া রহিয়াছে। হিন্দু মেলার অন্তর্ভুক্ত জাতীয় সভা—ন্যাশনাল সোসাইটির সহিতও মনোমোহন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এখানেও সমাজের নানা জটিল সমস্যা সম্পর্কে তিনি বক্তৃতা

তেন এবং ইহার বিভিন্ন আন্দোলন ও হিতকর কার্যে যথাসাধ্য সহায়তা করিতেন। হার 'মধ্যস্থ' বাংলা ভাষায় হিন্দুমেলা ও তীয় সভার মুখপত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল বলা লে। জাতীয়-মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে দত্ত বক্তৃতার প্রথমেই তিনি বলেনঃ—

"স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে বোধ হয়, আজ আমরা একটি অভিনব আনন্দ-বাজারে উপস্থিত হইয়াছি। সারল্য আর নির্মৎসরতা আমাদের মূলধন, তদ্বিনিময়ে ঐক্যনামা মহা-বীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছি। সেই বীজ স্বদেশ-ক্ষেত্রে রোপিত হইয়া সমুচিত যত্ন-বারি এবং উপযুক্ত উৎসাহ-তাপ প্রাপ্ত হইলেই একটি মনোহর বৃক্ষ উৎপাদন করিবেক। এত মনোহর হইবে যে, যখন জাতি-গৌরবরূপ তাহার নব পত্রাবলীর মধ্যে অতি শুভ্র সৌভাগ্য-পুষ্প বিকশিত হইবে, তখন তাহার শোভা ও সৌরভে ভারতভূমি আমোদিত হইতে থাকিবে। তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয় না, অপর দেশের লোকেরা তাহাকে 'স্বাধীনতা!' নাম দিয়া তাহার অমৃতাস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে। আমরা সে ফল কখনো দেখি নাই, কেবল জনশ্রুতিতে তাহার অনুপম গুণগ্রামের কথা মাত্র শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় থাকিলে সে ফল না পাই, অন্ততঃ "স্বাবলম্বন"নামা মধুর ফলের আস্বাদনেও বঞ্চিত হইব না! ফলতঃ একতাই সেই মিলন সাধনের একমাত্র উপায় এবং অদ্যকার এই সমাবেশরূপ অনুষ্ঠান যে সেই ঐক্য স্থাপনের অদ্বিতীয় সাধন, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।......

এই চৈত্রমেলা নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান, ইহাতে ইউরোপীয়দিগের নামগন্ধ মাত্র নাই, এবং যে সকল দ্রব্যসামগ্রী প্রদর্শিত হইবে, তাহাও স্বদেশীয় ক্ষেত্র, স্বদেশীয় উদ্যান, স্বদেশীয় ভূগর্ভ, স্বদেশীয় শিল্প, এবং স্বদেশীয় জনগণের হস্তসম্ভূত। স্বজাতির উন্নতিসাধন, ঐক্য স্থাপন এবং স্বাবলম্বন অভ্যাসের চেষ্টা করাই এই সমাবেশের একমাত্র পবিত্র উদ্দেশ্য।

প্রথম। অসম্বন্ধ হিন্দু সমাজ মধ্যে ঐক্য স্থাপন ও তাহাতে অনুরাগ উৎপাদন করিয়া দেওয়া এবং তাহার জীর্ণ সংস্কারের চেষ্টা করা প্রথম শ্রেণীর কার্য। তাহার বিশেষ তাৎপর্য পূর্বক্ষণেই বলা গিয়াছে, সুতরাং পৌনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্যও অতি গুরুতর; অর্থাৎ এক মেলার সময় হইতে অপর মেলার দিন পর্যন্ত সম্বৎসর মধ্যে হিন্দু সমাজের যে কিছু উন্নতি বা দুর্গতি হইয়াছে, বিশেষ পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করিয়া মেলার দিবসে এই শ্রেণীর অধ্যক্ষগণ তাহা সর্বসাধারণ সমক্ষে বিজ্ঞাপন করিবেন।

তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যক্ষ মহাশয়েরা পবিত্র বিদ্যোৎসাহ কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ যে সমস্ত দেশস্থ মহাশয়েরা স্বজাতীয় ও স্বাবলম্বিত শিক্ষাদানে ব্রতী হইয়াছেন বা হইবেন, তাঁহাদিগকে সমুচিত উৎসাহ প্রদান করাই এই বিভাগের বিশেষ কার্য হইবেক।

চতুর্থ শ্রেণীর নাম "প্রদর্শন বিভাগ।" তাঁহারা মেলায় প্রদর্শয়িতব্য দ্রব্যজাতসমূহ সংগ্রহ করিবেন।

পঞ্চম, সঙ্গীত বিভাগ। যাহাতে মেলাস্থলে বিবিধপ্রকার সংগীতজ্ঞ গুণিমণ্ডলীর গুণ প্রকাশ, যন্ত্রাদির প্রদর্শন ও সংগীত সম্বন্ধে দেশে সুধারার প্রবর্তনা হয়, এই শ্রেণীর তাহাই মুখ্য কর্ম হইবেক।

মেলার উদ্দেশ্য ছয়টি ভাগে বিভক্ত ও ইহার কার্যভার বিভিন্ন মণ্ডলীর উপর অর্পিত হয়। মনোমোহন উক্ত বক্তৃতায় এ সম্বন্ধে আরও বলেনঃ—

"ষষ্ঠ শ্রেণীস্থ অধ্যক্ষগণ মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি শারীরিক বল-কৌশল-নিষ্পন্ন বিষয় প্রদর্শনে বিশেষ মনোযোগী হইবেন, এবং যথাসাধ্য পুরস্কারাদি দানপূর্বক যাহাতে দেশমধ্যে ব্যায়াম শিক্ষার প্রারম্ভ হয়—যাহাতে "ভেতো বাঙ্গালী" আর "ভীরু বাঙ্গালী" বলিয়া অপর দেশের লোকেরা ঘৃণা ও বিদ্রূপ করিতে আর না পারে, তৎসাধন পক্ষে যত্নশীল হইবেন।"

নাট্যজীবন

হিন্দুমেলার ন্যায় নাট্যকলার উন্নতিকল্পেও মনোমোহনের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। সেকালে কবি, যাত্রা, পাঁচালি প্রভৃতি চিত্তবিনোদনের বস্তু ছিল। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর রুচিরও পরিবর্তন দেখা দিল। ইংরেজীশিক্ষিত নব্য বাঙালী ইংরেজী নাটক অভিনয়ে মাতিয়া উঠিলেন। কিন্তু ইংরেজী নাটকের অভিনয় জনপ্রিয় হইবার সম্ভাবনা খুব কম ছিল। ইংরেজী নাট্যসাহিত্য যতই উচ্চাঙ্গের হউক না কেন, বাঙালী জনসাধারণের কথা দূরে থাকুক, ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালীর পক্ষেও সহজ ও স্বাভাবিকভাবে তাহার রসগ্রহণ একটু আয়াস-সাধ্য ব্যাপার ছিল। সুতরাং নাটকাভিনয়ের উৎসাহ ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত কৃত্রিমই ছিল। কিন্তু ঠিক এই সময়েই বাংলা দেশে নাটকাভিনয় ও নাটক-রচনার ধারায় একটা নূতনত্ব দেখা দিল। কয়েক জন অভিজাত বাঙালী নাটকাদি রচনা করাইয়া নিজ ভবনে বা উদ্যানবাটিকায় তাহার অভিনয়ের ব্যবস্থা করিলেন। বাংলা নাটকের অভিনয় সহরের ন্যায় মফঃস্বলেও ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু অভিনয়োপযোগী বাংলা নাটকের অভাব দিন দিন অনুভূত হইতে লাগিল। এই অভাব যাঁহারা তৎকালে মোচন করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, মনোমোহন তাঁহাদের অন্যতম, তাঁহার রচিত 'রামাভিষেক নাটক', 'সতী নাটক', 'হরিশ্চন্দ্র নাটক' সে-যুগে বিলক্ষণ প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। এগুলি তিনি বৌবাজার বঙ্গনাট্যালয়ের জন্য রচনা করিলেও, মফঃস্বলে অনেক সখের থিয়েটারে বহু বার অভিনীত হইয়াছিল।

কিন্তু ধনিগৃহে অনুষ্ঠিত সখের থিয়েটারে সাধারণের অবাধ গতি ছিল না। নাটকাভিনয় দর্শনে সাধারণে যাহাতে বিশুদ্ধ আনন্দ ও শিক্ষালাভ করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে কলিকাতায় একটি সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত হইল (ডিসেম্বর ১৮৭২)। হিন্দুমেলা তখন বাঙালীর মনে জাতীয় ভাবের সঞ্চার করিয়াছিল। এই জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই সাধারণ রঙ্গালয়ের উদ্যোক্তারা কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং রঙ্গালয়ের নাম দিয়াছিলেন—ন্যাশনাল থিয়েটার বা জাতীয় নাট্যশালা। এই জাতীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির মূলে মনোমোহনের কৃতিত্ব বড় কম ছিল না। তিনি ইহার কর্তৃপক্ষকে নানাভাবে কখন মৌখিক, কখন বা 'মধ্যস্থ' মারফৎ লিখিত পরামর্শ দিতেন। তাঁহাদের মধ্যে মতানৈক্য উপস্থিত হইলে তিনি মধ্যস্থের কাজ করিতেন। নাট্যাভিনয় সম্পর্কে মনোমোহন যে মত পোষণ করিতেন, এ যুগেও তাহা প্রণিধানযোগ্য। জাতীয় নাট্যশালার প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব-সভায় তিনি একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতায় তিনি বলেনঃ—

......"দুইটী বিষয়ের উল্লেখ করা আপাততঃ অত্যন্ত আবশ্যক বোধ করিতেছি। তাহার প্রথমটি গীতের প্রসঙ্গ। আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, নাট্যাভিনয়ে গানের বড় আবশ্যক করে না। ইউরোপীয় রঙ্গ-ভূমিতে নাটকাভিনয়কালে গানের অভাব দেখিয়াই তাঁহারা এই সংস্কারের বশতাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ যে ইউরোপ নয়, ইউরোপীয় সমাজ আর স্বদেশীয় সমাজ যে বিস্তর বিভিন্ন, ইউরোপীয় রুচি ও দেশীয় রুচি যে সম্যক্ স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। যে দেশে সকল সময়ে সকল স্থানে সকল কার্যেই গান নইলে চলে না—আনন্দের কার্য দূরে থাকুক, মুমূর্ষু ব্যক্তিকে গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাইবার সময়েও সুস্বরের সঙ্গে হরিনাম সংকীর্তন যে দেশে বহুকালের প্রথা—যে দেশে কালোয়াতি গান সকলে বুঝিতে পারে না বলিয়া অপর সাধারণের তৃপ্তির নিমিত্ত যাত্রা, কবি, পাঁচালি, মরিচা, তর্জা, ভজন, কীর্তন, ঢব, আখড়াই, হাফ আখড়াই, পদাবলী, বাউলের গান প্রভৃতি বহু বহু প্রকার গীতি-কাব্যের প্রচলন— অধিক কি, যে দেশে দিন-ভিখারী ও রাত্‌ভিখারীরাও গান না গাইলে বেশী ভিক্ষা পায় না, সে দেশের হাড়ে হাড়ে যে সংগীতের রস প্রবিষ্ট হইয়া আছে, তাহাও কি আবার অন্য উপায়ে বুঝাইয়া দিতে হইবে? যাত্রাওয়ালারা স্বভাবের ঘাড় ভাঙ্গিয়া অপ্রাকৃত সং, রং, ঢং ইত্যাদি তামাসা দেখাইবার পরেও সহস্র সহস্র লোকের যে এতদূর চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়, সে কি সুদ্ধ দেশস্থ লোকের অনভিজ্ঞতা ও গুণ গ্রহণের অক্ষমতা প্রযুক্ত? কদাচ নহে। স্বভাবের বৈপরীত্যে মনুষ্যলোকে যে যাহা করিবে, তাহা সভ্য, অসভ্য, শিক্ষিত, অশিক্ষিত মনুষ্য মাত্রেরই ভাল লাগিবে না; তবে যে যাত্রাওয়ালারা সুসিদ্ধ হয়, তাহার কারণ কেবল তাহাদের গান ভিন্ন আর কিছুই নয়! যাত্রার দোষের মধ্যে স্থান, কাল ও চরিত্র সম্বন্ধে স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি না রাখা; ও পক্ষে আবার বর্তমান অনেক নাট্যাভিনয়ের মধ্যেও গানের অসংগতি বা অপকর্ষতাই একটি মহদ্দোষ। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় এই বোধ হয় যে, অভিনেতৃগণ অধুনা যেরূপে অভিনয়ের নিমিত্ত যত্ন পান, তৎসঙ্গে গানের পারিপাট্য সাধনার্থ যদি তদ্রূপ মনোযোগী হইতে পারেন, তবে

তাঁহাদের অভিনয় দর্শন সময়ে শ্রোতা দর্শকমণ্ডলী এককালে মোহে অভিভূত হইয়া গলিয়া যাইবেন। আমি এমন বলিতেছি না যে, যাত্রাওয়ালারা যেমন কথায় কথায়, অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্তৃতার পর কেবলই গানের আধিক্য করিয়া থাকে, নাটকেও তদ্রূপ হউক। আমার অভিপ্রায় এই যে, স্বভাবোক্তির পর যেখানে যেখানে গান খাটিতে পারে, তাহা উক্ত স্বাভাবিক নিয়মে সংখ্যায় যতই কেন হউক না, ফলতঃ যে কয়টী গান হইবে, সে কয়টী যেন উত্তমরূপে গাওয়া হয়। ফল কথা, আমরা মধ্যস্থ মানুষ; আমরা চাই, দেশে পূর্বে যাহা ছিল, তাহার ধ্বংস না করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও। আমরা চাই, সেই যাত্রার গান সংখ্যায় কমাইয়া ও গাইবার প্রণালীকে শোধিত করিয়া নাটকের স্বভাবানুযায়ী কথোপকথনাদি বিবৃত হউক! এরূপে কোনো কোনো অভিনেতৃ সম্প্রদায় যে কৃতকার্য হইয়াছেন তাহাও দেখা গিয়াছে। ভরসা করি, জাতীয় নাট্যসমাজ সর্বাগ্রে এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া যে মীমাংসায় উপনীত হইবেন, সেই মীমাংসানুসারে অনুষ্ঠান করিয়া এ বিষয়ের অঙ্গরাগ বাড়াইয়া তুলেন!

আমার বক্তব্য দ্বিতীয় বিষয় এই যে, উক্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন এক শ্রেণীও আছেন, যাঁহারা ভাবিয়া থাকেন, রঙ্গ-ভূমিতে সত্যকার স্ত্রী অভিনেত্রী ব্যতীত স্ত্রীলোকের অভিনয়ার্হ অংশগুলি কোনোমতেই প্রকৃত প্রস্তাবে অভিনীত হইতে পারে না। একথা আমরা আংশিকরূপে স্বীকার করি। কি আকৃতি, কি প্রকৃতি, কি স্বর, কিছুতেই কর্কশ ও রুক্ষস্বভাবী পুরুষেরা কোমলাঙ্গী, কোমল-হৃদয়া ও মধুরভাষিণী কামিনীগণের ন্যায় হইতে পারে না। সত্যকার রমণীকে রমণী সাজাইলে দেখিতে শুনিতে সর্বপ্রকারেই ভাল হয়। কিন্তু এ বিষয়ে যেমন উত্তম হইল, অন্যান্য বিচার্য যে বিষয় আছে, তাহাতেও উপেক্ষা করা উচিত নয়। দৃশ্য-মনোহারিত্ব ও আমোদ-সুখ প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু সমাজের ধর্মনীতি সর্বাপেক্ষা অধিক প্রার্থনীয় কি না তাহা কি আর বহু বাক্যে বুঝাইয়া দিতে হইবে? এ দেশে কুলজা কামিনীকে অভিনেত্রীরূপে প্রাপ্ত হওয়া এককালেই অসম্ভব, স্ত্রী অভিনেত্রী সংগ্রহ করিতে গেলে কুলটা বেশ্যাপল্লী হইতেই আনিতে হইবে। ভদ্র যুবকগণ আপনাদের মধ্যে বেশ্যাকে লইয়া আমোদ করিবেন, বেশ্যার সঙ্গে একত্র সাজিয়া রঙ্গ-ভূমিতে রঙ্গ করিবেন, বেশ্যার সঙ্গে নৃত্য করিবেন, ইহাও কি কর্ণে শুনা যায়? ইহাও কি সহ্য হয়? ইহাও যে এই রাজধানীতে—এত সুশিক্ষা সদুপদেশ ও সভ্যতার মধ্যে কোনো সম্প্রদায় কর্তৃক অনায়াসে অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইহার অপেক্ষা বিস্ময় ও আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? শতবর্ষ নাটক না দেখিতে হয়, যুগযুগান্তরে এ দেশে নাটকাভিনয়রূপ সুখ-দৃশ্য না ঘটে, চিরকাল স্বভাবের বিরোধী যাত্রাওয়ালারা জঘন্য অভিনয় প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত থাকে, সেও ভাল, তবু যেন এমন দুষ্প্রবৃত্তিসাধন ধর্মনীতিঘাতক ঘোর লজ্জাজনক প্রথাকে আমাদিগের এই জাতীয় নাট্যসমাজ অথবা অন্যান্য অভিনেতৃ-সমাজ অবলম্বন না করেন! অধিক আর বলিতে চাহি না।"

রচনাবলী

মনোমোহন অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে নাটকের সংখ্যাই অধিক। সর্বপ্রকার গান রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, ইহার নিদর্শন 'মনোমোহন-গীতাবলী'তে বিদ্যমান। তাঁহার রচিত শিশুপাঠ্য সরল 'পদ্যমালা' আজিও শিশুদের আনন্দ বর্ধন করে। আমরা মনোমোহনের রচিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছিঃ—

১। **রামাভিষেক নাটক।** ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৪ (ইং ১৮৬৭)।

২। **প্রণয়পরীক্ষা নাটক।** ভাদ্র ১২৭৬ (ইং সেপ্টেম্বর, ১৮৬৯)।

৩। **পদ্যমালা**

১ম ভাগ। অগ্রহায়ণ ১২৭৭ (ইং ১৮৭০)

২য় ভাগ। অগ্রহায়ণ ১২৮৯ (ইং ১৮৮২)

৩য় ভাগ। ১৩৩০ সাল (ইং জানুয়ারী ১৮৯৪) শিশুপাঠ্য সরল পদ্যগ্রন্থ।

৪। **সতী নাটক।** ১৮ মাঘ ১২৭৯ (ইং ১৮৭৩)।

৫। **হিন্দু আচার ব্যবহার,** ১ম ভাগ—পারিবারিক। ফাল্গুন ১৭৯৪ শক (ইং ১৮৭৩)।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই পুস্তক পরিবর্ধিত আকারে 'হিন্দু-আচার-ব্যবহার—পারিবারিক ও সামাজিক' নামে প্রকাশিত হয়।

৬। **বক্তৃতামালা।** বৈশাখ ১২৮০ (ইং ১৮৭৩)।

সূচীঃ—দ্বিতীয় বার্ষিক চৈত্রমেলায় বক্তৃতা (চৈত্র-সংক্রান্তি, শনিবার ১৭৮৯ শক)। তৃতীয় বার্ষিক চৈত্রমেলায় মেলার কর্তব্য-বিষয়ক ও উৎসাহ-সূচক বক্তৃতা (৩০শে চৈত্র ১৭৯০ শক)। হিন্দু-মেলার উৎসাহসূচক বক্তৃতা (৩০শে মাঘ, ১২৭৮ সাল)। বারুইপুর মেলার বক্তৃতা (১২৭৮ সাল, ফাল্গুন-সংক্রান্তি)। বিদ্যালয়ের ছাত্র; ছাত্রের প্রতি কর্তব্য (ছোট-জাগুলিয়া-হিতৈষী সভায় বিবৃত, পৌষ ১৭৮৮ শক)।

৭। **নাগাশ্রমের অভিনয়** (প্রহসন)। ১৭৯৬ শক (ইং জানুয়ারি ১৮৭৫)। ইহার আখ্যা-পত্রে গ্রন্থকার হিসাবে "কেঁড়েলচন্দ্র ঢাকেন্দ্র" এই নাম আছে।

৮। **হরিশ্চন্দ্র** (নাটক)। পৌষ ১২৮১ (ইং ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫)।

৯। **পার্থ-পরাজয় নাটক।** অর্থাৎ বভ্রু-বাহনের যুদ্ধে অর্জুনের পরাভব। ফাল্গুন ১৮০২ শক (ইং মার্চ ১৮৮১)।

১০। **মনোমোহন-গীতাবলী।** অর্থাৎ বাবু মনোমোহন বসু কৃত হাফ্-আখ্ড়াই, কবি, নাটক, গীতাভিনয়, পাঁচালি প্রভৃতি বিবিধ গান। মাঘ ১২৯৩ (ইং ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭)।

১১। **রাসলীলা নাটক।** জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬ (ইং ১৮৮৯)।

১২। **আনন্দময় নাটক।** আষাঢ় ১২৯৭ (ইং ১৮৯০)।

১৩। **দুলীন** (ঐতিহাসিক নবন্যাস)। ভাদ্র ১৮১৩ শক (ইং ১৮৯১)।

১৪। **সত্যনারায়ণ-কথা।** কার্তিক ১৩২৮ (ইং ১৯২১)।

শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু ইহার ভূমিকায় লিখিয়াছেনঃ—"আমার পূজ্যপাদ পিতামহ কবি-নাট্যকার স্বর্গীয় মনোমোহন বসু মহাশয় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এই সত্যনারায়ণ-কথা রচনা করেন।"

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা

'সংবাদ প্রভাকর', 'মধ্যস্থ', 'গান ও গল্প', 'অনুসন্ধান' প্রভৃতি পত্রে মনোমোহনের বহু গদ্য-পদ্য রচনা প্রকাশিত হইয়াছে; ইহার অনেকগুলি এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। 'নাট্য-মন্দির' পত্রে (১৩১৭-১৮) ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত তাঁহার রচিত "সতীর অভিমান" নাটকখানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত।

অপ্রকাশিত ডায়ারি

শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রনাথ বসুর সৌজন্যে তদীয় পিতামহ মনোমোহনের একখানি অপ্রকাশিত ডায়ারি বা দিনলিপি আমার হস্তগত হইয়াছে। ইহাতে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কয়েক বৎসরের ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। আমরা এই দিনলিপি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

২৩শে কার্তিক—১২৯৩। সোমবার

অদ্য সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী ষ্টেট্‌সম্যান সংবাদপত্রে প্রকাশ নিমিত্ত M. স্বাক্ষরিত একখানি প্রেরিত পত্র পাঠাইলাম। তাহার বিষয় ও উদ্দেশ্য এই;—"ধর্মবীর মহম্মদ" নামে একখানি বাঙ্গালা নাটক (অতুলকৃষ্ণ মিত্র লিখিত) বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশ করেন। মুসলমানদের আপত্তি হেতু সেই দুই ভাগ বিশিষ্ট পুস্তকের অবিক্রীত তাবত খণ্ড গুরুদাস বাবু নবাব আবদুল লতিব খাঁ বাহাদুরের নিকট ধ্বংশাভিপ্রায়ে প্রেরণ করেন। নবাব বাহাদুর তদ্বিষয় ইংরাজী সংবাদপত্রে প্রকাশ করাতে কোনো কোনো বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র সম্পাদক ও ইংরাজী কাগজের কতিপয় পত্রপ্রেরক এতদুপলক্ষে তুমুল কাণ্ড বাঁধাইয়া তুলেন। যৎকালে গুরুদাস বাবু নবাবের বাড়ীতে যান, তখন আমার বন্ধুতম (রুদ্র) বেণীবাবুর সহিত আমিও তথায় উপস্থিত ছিলাম এবং মদাত্মীয় গুরুদাস বাবুর এতদ্বিষয়ক তাবদ্ব্যাপারেই সংশিলষ্ট ছিলাম। সুতরাং বিগত শনিবারের ষ্টেট্‌সম্যান কাগজে একজন পত্রপ্রেরক ঐ সাক্ষাত সম্বন্ধে কতকগুলি কাল্পনিক অযথা কথা যাহা ছাপাইয়াছিল, সত্যের অনুরোধে তাহার প্রতিবাদ অত্যাবশ্যক বিবেচনায় ঐ প্রেরিত পত্র পাঠাইলাম।

কি হইবে। আপনি ঈশ্বরানুগ্রহে এক্ষণে কলিকাতায় একজন গণ্যমান্য লোক, তথায় বড় বড় লোকের সাহায্যে মুন্সি প্যারীলালের অনুকরণে যদি কিছু করিয়া উঠিতে পারেন তো

২৩শে মাঘ, রবিবার—১২৯৪

......প্রথমবার যখন কাশীতে আসি, সে ৩৮ বৎসরের কথা, তখন ইঁহার [শীতলপ্রসাদ গুপ্ত] সহিত খুব আত্মীয়তা ও প্রণয় হইয়াছিল। পরে তিনি এলাহাবাদে গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক কর্ম্মে নিযুক্ত থাকাতে বহুকাল তথায় সপরিবারে বাস করিতেছেন।......ইনি কয় বৎসর পূর্ব্বে এলাহাবাদ হইতে আমাকে এতন্মর্ম্মে এক পত্র লিখেন যে, "বাঙ্গালী ভদ্রলোকের পক্ষে কন্যাদায় এখন মহাবিপদ হইয়া উঠিয়াছে, সর্বস্বান্ত ও অসম্ভবরূপে ঋণগ্রস্ত না হইলে আর মেয়ে পার করা ঘটে না, ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করা শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই উচিত। আমি এলাহাবাদে তজ্জন্য একটি সভা স্থাপনের যত্ন করিতেছি। কিন্তু রাজধানী কলিকাতায় একটি মহা উদ্যোগ না হইলে নিম্নতর স্থাপনের চেষ্টায় কি হইবে। আপনি ঈশ্বরানুগ্রহে এক্ষণে কলিকাতায় একজন গণ্যমান্য লোক, তথায় বড় বড় লোকের সাহায্যে মুন্সি প্যারীলালের অনুকরণে যদি কিছু করিয়া উঠিতে পারেন তো স্বীয় সমাজের অশেষ মঙ্গল করা হয়।" ইত্যাদি ইংরাজীতে পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তখন আমি পীড়িত অবস্থায় প্রায়ই স্বীয় গ্রামে থাকিতাম। এ যদি আরও কয়েক বৎসর পূর্বে, যখন আমার মধ্যস্থ কাগজের প্রাদুর্ভাব ছিল এবং যখন জাতীয় সভায় আমি একজন প্রধান বক্তা ও সাহায্যকারীরূপে গণ্য হইতাম এবং যখন প্রায় সকল বড় লোকের সহিত সদ্ভাব ও তাঁহাদের নিকট যাতায়াত ছিল, তখন এই মহৎ বিষয়ের এরূপ মহৎ প্রস্তাব হইত, তাহা হইলে হয় তো কতকটা করিয়া ফেলা যাইত। তাহাও সন্দেহের বিষয়, কেননা আমি অনেক দেখিয়া শুনিয়া ঠেকিয়া এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, বাঙ্গালীর দ্বারা বচন বৈ প্রকৃত কোনো ভাল কার্য সিদ্ধ হওয়া এখনও বহুদূরবর্তী কালসাপেক্ষ। বহু বহু পুরুষানুক্রমিক জাড্য, ঔদাস্য ও স্বার্থপরায়ণতা চলিয়া আসিয়া হাড়ে হাড়ে স্বদেশহিতৈষিতায় বিপরীত ভাব ঘুন ধরার ন্যায় লাগিয়া রহিয়াছে, এখন কি দুই চারি পাতা ইংরাজী পড়িয়া সেই সব পৈতৃক রোগ একদিনে সারিতে পারে। তবে এইরূপ চেষ্টা ও শিক্ষা ও অভ্যাস ক্রমশঃ হইতে হইতে দেশের ধাতু পরিবর্তিত হইয়া ভালর দিগে দাঁড়াইতে পারে। অপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু তা বলিয়া বসিয়া থাকা উচিত নয়, চেষ্টা চাই চেষ্টা করিলে ধাতু সংশোধন হইবে না কেন?...

[সন ১২৯৮ সাল ১৪ই পৌষ স্ত্রী-বিয়োগরূপ নিদারুণ ঘটনা হইবার কয়দিন পরে নিম্নস্থ গান স্বেচ্ছায় হয়।]

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল ঠেকা।

কোথা গেলে, আমায় একা ফেলে, সংসার
তুফানে ঘোরে?
বিলম্ব ক'রো না প্রিয়ে সাথে নে যেতে আমারে!

১

তোমা ভিন্ন শূন্য দেহে, রহিতে এই শূন্য গেহে,
কিছুতে প্রাণ না চাহে, পুত্রস্নেহে কিবা করে?*

[তাহার কিছুদিন পরে রাত্রে এক ঘুমের পর উঠিয়া বারাণ্ডায় বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ এই গানটি হইল।]

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ তেতালা।

ছি ছি রে, স্মরণ! তোর্ স্বভাব কেমন!
দোষ নাহি ধর, শুধু গুণে তার কর হৃদে উদ্দীপন?

১

তুমি বল দোষ কৈ?—আমি বলি দোষ তো ঐ,†
অন্য দোষ পেলে কি হই, এরূপে শোকে মগন্?

২

সাথী রেখে পলাইল, ইথে কি দোষ্ না হইল?
কারে স'পে দিয়ে গেল, যারে বলিত আপন?
তেজিবে মন ছিল যদি, তবে কেন বাল্যকালাবধি
নিরবধি প্রেম-নিধি, দিয়ে করিল যতন?

৩

সে কি সামান্য প্রণয়, যাহাতে পতি হৃদয়,
চাঞ্চল্য ত্যজি তন্ময় হ'য়ে সমর্পিল মন্।
সে পতিরে এ অকালে, কি ব'লে সে গেল ফেলে,
সাথে নিয়ে যেতে চ'লে, ভার কি হ'লো এমন্?

৪

কাঁদিয়া কাটাই নিশা, দিবসে হারাই দিশা,
শান্তি, শক্তি, বুদ্ধি কৃশা, জীবনে যেন মরণ!
বটে নিজ কর্মফলে, এ অনলে মর্ম জ্বলে,
কিন্তু সতী ধর্ম বলে, করে না কেন মোচন?

মনোমোহন লাইব্রেরি

আনুমানিক ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে মনোমোহন কলিকাতায় 'মনোমোহন লাইব্রেরি' নামে একটি পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পুস্তকালয় জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ১৭ই এপ্রিল ১৯০৩ তারিখের 'এডুকেশন গেজেট' হইতে একটি বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

মনোমোহন লাইব্রেরী

বিশ বৎসরের অধিক হইল ঈশ্বরের কৃপায় আমরা বরাবর অতি সুলভ মূল্যে স্কুল, কলেজ পাঠ্য পুস্তক, ম্যাপ, নাটক, নভেল, শাস্ত্র, বটতলার গ্রন্থ প্রভৃতি সরবরাহ করিতেছি। কিণ্ডার গার্টেন প্রণালীতে লিখিত ইংরাজী ও বাঙ্গালা পাঠ্য ও ব্যাখ্যা সকল ছাপা হইয়াছে। আমরা সর্বোচ্চ কমিশনে গ্রাহকগণকে দিয়া থাকি। যাহার যেরূপে সুবিধা তাহাতে পাঠাই। মনোমোহন বসু— ২০৩।২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

জীবন-সায়াহ্নে মনোমোহন কিছুদিন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৩০২, ১৩০৫ ও ১৩০৬ সালে তিনি পরিষদের কার্যনির্বাহক সভার একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন। ১৩০৩ সালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

মৃত্যু

মনোমোহনের আয়ুঃসূর্য অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িল। তিনি ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১২ (২১ মাঘ ১৩১৮) রবিবার তারিখে ৮১ বৎসর বয়সে ডাল্লুকপাড়ার (বর্তমানে মনোমোহন বসু ষ্ট্রীট) বাটীতে পরলোকগমন করেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ৫ই আশ্বিন ১৩২৫ তারিখে পরিষৎ-মন্দিরে তাঁহার একখানি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

* সমগ্র কবিতাটি উদ্ধৃত করিলাম না। ইহা "শোক-সঙ্গীত" নামে ২৫শে ভাদ্র ১৩০১ তারিখের 'অনুসন্ধান' পত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

† দোষ যে নাই, ছিল না, বলিতেছ, তাহাই আমার নিকট দোষ। কেননা দোষ থাকিলে বা পাইলে এত পাগল হইতাম না।

যুদ্ধোত্তরে





যুদ্ধ মিটিয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে শান্তির সুবাতাস।

ঘরে ভাত আছে, পরনে কাপড় আছে, পথে আলো আছে, বাস ট্রামে ঠাঁই আছে, আছে—সবই। না-ই শুধু মুখে হাসি।

অবশ্য প্রাক্ যুদ্ধকালের সেই অনাবিল প্রাণখোলা হাসির কথা তুলি নাই; যুদ্ধকালীন যেসব—"চাপাহাসি" "মুচকি হাসি" "তীক্ষ্ণ-হাসি" "ব্যঙ্গহাসি" "উপেক্ষার হাসি" "অবজ্ঞার হাসি" প্রভৃতি বিচিত্র উচ্চাঙ্গীয় হাসি এতদিন মানুষের বাঁকাঠোঁটের কোণে কোণে চরিয়া বেড়াইত সে হাসি কোথায় গেল?

যে সর্বগ্রাসী সমস্যা এতদিন যবনিকার অন্তরালে কোণঠাসা হইয়া বসিয়াছিল—হঠাৎ রঙ্গমঞ্চে তাহার পুনরাবির্ভাবে বুনো ওলের মত মুখ করিয়া বসিয়া আছে মানুষ।

বসিয়া থাকা ছাড়া গতি কি?

যুদ্ধ যে তাহাদের বসাইয়া দিয়া গিয়াছে।

পুরনো সমস্যা।—শুধু দেখা দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে কি? দেখা দিয়াছে নূতন ভঙ্গীতে। যেন রাক্ষসের নিদ্রা ভাঙিয়াছে।

কিন্তু এই সদ্য নিদ্রোত্থিত কুম্ভকর্ণ আজ খায় কি?

সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের অক্ষয় স্বর্গের আশায় একদা যাহারা বিবাহ করিয়া বসিয়াছে এবং যাহারা না করিয়া বসিয়া আছে সেই রাশি রাশি বেকার বেকারীর তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে আজ আকাশ বাতাস ভারাক্রান্ত।

না, 'সূর্য বেকারি' বা 'কৃষ্ণা বেকারি' নয়, এ বাংলা ভাষায় একটি নবাগত শব্দ অভিধানের ভবিষ্যৎ সংস্করণে যোগ করা হইবে আশা করা যায়।

বেশী বড় সংখ্যাকে সহজে ধারণা করিতে চাহিলে—ছোট সংখ্যায় ভাঙিয়া নেওয়া অংকশাস্ত্রের একটা সাধারণ নিয়ম, কাজেই এই দেশ জোড়া হৃদয় বেদনা বুঝিতে চান তো আমাদের পাড়ায় আসুন। ছোট স্কেলে বুঝইয়া দিতেছি।

কয়েক সন আগের কথা—'বোমা পালানিরা' যখন সবেমাত্র বন জঙ্গল হইতে ফিরিয়া বন্যার জলের মত হুড়মুড় শব্দে সহরে 'ঠ্যাল' মারিয়াছে—তখন আমাদের "নন্দিতা" একদিন আমার পড়ার ঘরে হানা দিয়া বিনা ভূমিকায় কহিল—"ছোটকা সাপ্লাইতে একটা চাকরী নিলাম।"

এরকম আকস্মিক আঘাতের সঙ্গে হোঁচট খাওয়ার তুলনা করা যায়—কাজেই বলা চলে যে, রীতিমত একটি হোঁচট খাইলাম। নন্দিতা আমার ভাই-ঝি—এতদিন—আমাকেই তাহার অভিভাবক মনে করিতাম, হঠাৎ যেন চাকরীটা গেল।

'নেব' নয় 'নিচ্ছি' নয় একেবারে 'নিলাম'। অনুমতি প্রার্থনার প্রশ্নই ওঠে না। তবু—হোঁচট খাওয়ার আর্তনাদ হিসাবে কহিলাম—

—'চাকরী নিলাম?' চাকরী নিলাম মানে কি? কিসের চাকরী? কে দিলে?

—বললাম তো সাপ্লাইতে। দিলে আবার কে—দিলে সরকার।

—তা তুই চাকরী নিতে যাবি কি দুঃখে?

—দুঃখ আবার কি? নন্দিতা হাসিয়া ওঠে—হাত পা থাকতে বসে খাবোই বা কোন্ দুঃখে?

—মেয়েমানুষ তো বসেই খায় চিরকাল, তাছাড়া হাত পা খাটাবার জন্যে বাইরে যাবার দরকার কি? ঘরেও তো কাজের অভাব নেই।

—অভাব নিশ্চয়ই নেই, কিন্তু তার গলদটা তো তোমার প্রথম কথাতেই ধরা পড়লো ছোটকা, মেয়েমানুষ বসে খায় এই তোমাদের, পুরুষের বদ্ধমূল ধারণা।

—ওটা বললাম একটা কথার কথা—মেয়েমানুষ একেবারেই খায় কি না সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণাই আমার নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে—তোর এখন বিয়ের কথাবার্তা চলছে—মেয়ে চাকরী নিয়েছে শুনলে বলবে কি?

—বিয়ে? নন্দিতা আর একবার এমন হাসিয়া উঠিল যে মনে ভাবিলাম—কি বলিতে কি বলিয়া ফেলি নাই তো?

—বিয়ে করতে যাবো কি দুঃখে তাই বল?

এমন একটা অভাবনীয় প্রশ্নের উত্তর কখনো দিতে হইবে—একথা কোনদিন ভাবিয়া দেখি নাই—কাজেই উত্তর দিতে দেরী হইল।

—এই যে তুমি—নন্দিতা আমায় কোণঠাসা করিয়া ধরে—তুমিও তো বিয়ে করোনি ছোটকা?

—আমার কথা বাদ দে—আমরা ব্যাটাছেলে।

—ইয়ে আর কি পুরুষ মানুষ।

—কাজেই সাত খুন মাপ কেমন? মেয়েমানুষের ওই 'মেয়ে'ত্বটা ঘোচানোই এবার দরকার হয়েছে বুঝলে?

—এদিকে যে মানসম্ভ্রম সভ্যতা ভব্যতা সবই ঘুচবে?

—ওসব তোমাদের পচা সমাজের ভুল ধারণা। ওকে যেতে দাও। তবে তোমার ওই

হয় না পিসিমা, চাকরীই মানুষ খুঁজে বেড়ায়। তার সাক্ষী তোমার বাড়ীতেই দেখ এই এক মাস এসেছ—এসে পযন্ত চাকর পাচ্ছো একটা?

—ওসব তুলনা মুলনা বুঝিনে সতু, মেয়ের আপিস যাওয়া বন্ধ কর; বিয়ের ঠিক করে-দে।

—নন্দির জেদ তো জানো? বন্ধ করবো বলবো কোন্ সাহসে পিসিমা?

—শোনো কথা ছেলের? মেয়েমানুষের জেদ বজায় থাকবে?

—তাইতো থাকে দেখি।

—ধন্যি শিক্ষে দিয়েছিলে বটে। আস্কারা পেয়ে মাথায় উঠেছে একেবারে।

—শিক্ষে কি আর আমি দিয়েছি পিসিমা, নিয়েই জন্মেছে। তোমারই ঝাড়ের বাঁশ তো?

—ও তাহলে আমারই অপরাধ? যখন মেয়েকে একটার ওপর দুটো পাশ করাতে গেলে তখন বলিনি আমি? বাপের জন্মে কেউ শুনেছে—এবংশের মেয়ে জুতো খট্‌খটিয়ে কলেজে গেছ?

—আকাশ থেকে বোমা পড়ে তাই কি কেউ কখনো শুনেছে পিসিমা?

—আবার তুলনা! মেয়ে যখন পড়াচ্ছিলি তখন তো বোমা পড়ার খবর হাত গুনিসনি। বোমা না পড়লে আরো পাঁচটা পাশ করাতিস আর কি? মেয়ে একবোরে স্বাধীন জেনানা হয়ে গিয়েছেন। আমি বলছি—এসব ওই বিদ্যে করার প্রতিফল!

অথচ এই কয়েকদিন আগেই গুপ্তিপাড়া হইতে ফিরিয়া—নাতিনীর বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধি-মত্তার অশেষবিধ সুখ্যাতি করিয়া সনিশ্বাসে বলিয়াছিলেন—"মানুষ ওরাই হয়েছে সতু, আমরা তো সব না মানুষ, না গরু হয়ে বসে আছি। সেই যে বলে না—'ধন হলাম না আগড়া হলাম—কুলের আগায় নেচে মলাম' আমরা তাই।

—অজ এই কথা।

বৌদি আসিয়াও একই অনুযোগ করিলেন। এমন 'হিন্ট' দিতেও ছাড়িলেন না যে, সময়ে বিবাহ না দেওয়াতেই অভিমানাহত কন্যা মনের খেদে আপন পথ বাছিয়া লইয়াছে।

সত্য কথা বলিতে কি বিবাহের বয়স যথার্থই অনেক আগে হইয়াছে—কিন্তু এতদিন বিবাহ না দেওয়ার মধ্যে বৌদির নিজের কি কোনো হাত ছিল না?

পাত্র আর পছন্দ হয় না তাঁহার। যে সম্বন্ধই আনি ঠোঁট উল্টাইয়া শুধু বলেন—'এই! আমি ভেবেছি, না জানি কি।'

দাদা নাই, জোর করিতে বাধে।

ঠিক এইরকম আবহাওয়ার মাঝখানে পড়িল বোমা। পরবর্তী ইতিহাস লিখিতে গেলে অষ্টাদশ পর্বেও কুলাইবে না। লিখিবার প্রয়োজনও নাই—মাতালকে মদের আস্বাদ বুঝাইতে বসার মত বাহুল্যশ্রম। মোটের মাথায় আবার যখন তোড়জোড় চালাইতেছি—নন্দিতা হাতে ভ্যানিটিব্যাগ ঝুলাইয়া আমাদের হাত-ছাড়া হইয়া গেল।

পরের ব্যাপারটা আবার অন্য একরকম মজার।

নন্দিতার 'অফিসের ভাতের" ভাবনায় পিসিমার শেষরাত হইতে ঘুম নাই......অফিস আমরাও চিরকাল যাইতেছি—ইত্যবসরে কমল-কেণ্ট আমার ভাগ্নে 'মিলিটারি'তে কাজ জোগাড় করিয়া বুশ সার্ট ও হাফপ্যাণ্ট পরিয়া যাতায়াত করিতেছে—কিন্তু নন্দিতার দাম যেন লাফাইয়া তিন ডিগ্রী চড়িয়া বসিয়াছে।

স্নানের ঘরে সে যত খুসি এবং যখন খুসি ওই 'আহার' জ্বালায় পলাইতে পথ পায় না। "সারাদিন চাকরী করে সায়েবের খাটুনী খাটবি, আবার এসব করবি তো বাঁচবি কি করে?... আহা..."

সন্ধ্যাবেলায় তাহার শুকনো মুখ দেখিয়া পিসিমার 'আহার' মাত্রা এত বাড়ে যে—দুইজনের আহার্য একলা না খাইলে নিস্তার নাই বেচারার।.........

বৌদি লইয়াছেন পরার ভার।

বসনভূষণের কমতি দেখিলে পাছে কেহ ভাবে অভাবে পড়িয়া চাকরীতে ঢুকিয়াছে তাই মেয়ের পোষাক পারিপাট্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ত্রুটিও বরদাস্ত করিতে পারেন না।

অতএব—বা অতঃপর নন্দিতা পাড়ার সেই সব...বন্দিতা বৈকালি মাধবী সিপ্রা বেলা অবন্তী নতুনখুড়ি ইত্যাদির দলবর্তিণী হইয়া দরজীর দোকান ও ষ্টেশনারী ষ্টোর্সের জীবন্ত বিজ্ঞাপনের বেশে...বাড়ী ট্রাম অফিস... অফিস ট্রাম বাড়ী......করিতেছিল।

বেশীর মধ্যে একলা সিনেমা যাওয়া বা খেলা দেখিতে যাওয়ার ছাড়পত্রটা কেমন করিয়া না জানি জোগাড় করিয়া ফেলিয়াছে।

ফিরিতে দেরী হইলে আজকাল আর ভাবি না—জানি—কোথায় না কোথায় গিয়াছে।

এদিকে কমলকেণ্টর ইতিহাস বিপরীত।

'বিবাহ' কথাটার সংগে তাহাকে কোনদিন একত্রে ভাবিয়া দেখি নাই বা দেখিবার অবসর হয় নাই। বাপ নাই মাও গেল, ম্যাট্রিক ফেল করিয়া 'দাগা ষাঁড়'র ভংগীতে ঘুরিয়া বেড়াইত...এবং নন্দিতার বিদ্যাবুদ্ধির কথা উঠিলেই জ্বলন্ত মন্তব্য প্রকাশ করিত...'দিদি আর পাশ করবে না কেন হ্যাঁঃ। একজামিনাররা মেয়েমানুষের নাম দেখলেই নম্বর বেশী দিয়ে দেয়।'

ইউনিভার্সিটি যে অত কাঁচাছেলে নয়, সে কথা বোঝানো কঠিন।

কিন্তু সেও যখন মিলিটারিতে একটা কাজ জোগাড় করিয়া ফেলিল, তখন আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলাম—"হুন্ধরে। ধন্য তুই, আর ধন্য তোর মহিমা।"

মহিমাই বটে!

একদিন শুনিলাম—পিসিমা কমলের জন্য কনে খুঁজিতেছেন। বলিলাম—এখনো কি ... নী খেতে তুমি কি ক্ষেপলে?

পিসিমা বিরক্তিপূর্ণ স্বরে ... ক্ষেপবো কেন শুনি? ক্ষেপার কথা শুনিয়া আহা বেটাছেলে—রোজগারপাতি ... নিশ্চিত সংসার করাতে মন যায়না ওর চাকরী যাওয়ার ... বিদ্যেবতী মেয়ের মতন যদি না যাওয়ার খবরটা

—কিন্তু ওই ইডিয়টটাকে অস্বীকার করিবার ...

—না দেবে না। বলে— ...

জোয়ান ছেলে পয়সা আনছে ... গেল কে বলছে না এরচেয়ে সুপাত্র পবে ... বাগড়া দিতে এসো না, মেয়ে আ... ভাইটাও ছিল ঠিক করেছি।

বৌদির মারফৎ শুনিলাম—কমলকেণ্ট নাকি আজকাল 'বাঁচিয়া থাকার মধ্যে কোনো মানে খুঁজিয়া পাইতেছে না!'

কাজেই আর বাগড়া দিলাম না।

পিসিমা "সংগ্রাহিত" কন্যাটীকে নিজেই গিয়া একদিন একজোড়া কাণপাশা দিয়া 'আশীর্বাদ' করিয়া আসিলাম এবং 'বৌভাতের যজ্ঞি' হিসাবে লোকজনও খাওয়াইলাম মন্দ-নয়, এমন কি সানাইও বাজিল।

খুতের মধ্যে নিমন্ত্রিতেরা সাদা ময়দার অভাবে আটার লুচি ও চিনির অপ্রচুর্যে জোলো পান্তুয়া খাইয়া গেল।

দেখিলাম পিসিমার হিসাবই ঠিক।

কমলকেণ্ট মানুষ গড়াইয়া গিয়াছে। ভালো জামা কাপড় পরে, যখন তখন বৌ লইয়া বেড়াইতে যায়, আমার সামনেই সিগারেট ধরায় সময়ে চা না পাইলে বাড়ী মাথায় করে...... অফিসের অবিশ্বাস্য সুলভ মূল্যের 'রেশন' আনিয়া পিসিমা ও বৌদিকে 'তাক' লাগাইয়া দেয়।

মোট কথা আমি প্রায় গৌণ হইয়াই আছি।

ওদের 'টাইমের ভাতের' ভিতর হইতে ফাউ হিসাবে একমুঠা খাইয়া লইয়া ছুটি।

কিন্তু যাক্ এই সব পুরানো গল্প।

কয়েক সন আগের ব্যাপার।

এখনকার খবর এই—

নন্দিতা বন্দিতা বৈকালি আকালির দল ঘরে বসিয়া আছে......কারণ চাকরী যাওয়ার মরশুম পড়িয়াছে। আছে শুধু শাখাচ্যুত পক্ষীদের আতঙ্কিত কলরব।

অক্ষয় স্বর্গ যে এত শীঘ্র এমন করিয়া পথে বসাইবে একথা—কে কবে ভাবিয়াছে?

কমলকেণ্ট? তারও টলমল করিতেছে।

হেমন্ত উকিল বেড়াইয়া ফিরিবার মুখে আমার ঘরে উঁকি মারিলেন......প্রায়ই একবার ঢু মারিয়া যান। বলিলাম—আসুন।

—এই যে—বলিয়া চেয়ারে বেশ জুৎ করিয়া বসিয়া বলিলেন—তা'পর শুনেছ তো?

—কি?

—চাকরীর গঙ্গাপ্রাপ্তি? শুনবে না কেন তোমার ভাইঝিটিও তো—সে যা রগর হয়েছে আজকাল। দ্বিতীয়পক্ষটী তো অফিসের বাবু হয়ে পর্যন্ত আকাশের চাঁদ হয়ে উঠেছিলেন... তাকিয়ে দেখা ছাড়া—যাক গে তোমরা ব্যাচিলার মানুষ বুঝবে না সে সব দুঃখের কথা—মোট কথা ধরাকে সরা দেখছিলেন আর কি। আমার কথা ছেড়ে দাও—বুড়োহাবড়া মানুষ, দিনরাত খোঁটা খাচ্ছি, এই বয়সে কোন মুখে বিয়ে করেছি। আর দুদিন আগে যুদ্ধু বললে—এমন সোণার অফিস খুললে বিয়ে করতো কোন্—'ইয়ে'। যাকগে চাকরীর গরমে সংসার দেখেন না, ছেলেটার দিকে গ্রাহ্য নেই......ওপক্ষের দুটোকে তা'দের মামার বাড়ীতে রেখে দিয়েছি জানো বোধ হয়? ...

জানিতাম না, কারণ ওপক্ষের ওই 'দুটো'র ছুতোতেই এপক্ষ করা—এমন কি যেন একটা শোনা ছিল। কিছু একটা বলার জন্যই বলি—ও। তা বেশ করেছেন—যত্নে থাকবে।

—তাই দেখলাম ভেবে। যাক্ এটাও—সময়ে খেতে পায় না, ময়লা জামা পরে বেড়ায়, অসুখ করলে একলা পড়ে থাকে—দেখে কিছু বলতে গেলেই আর রক্ষে নেই। রেগে অগ্নি শর্মা—'তোমাদের কাজ আছে আমার নেই? মুখ দেখে মাইনে দেবে আমাদের?' এই সব—আরে ভাই মুখ দেখে যদি না দেবে, তবে মুখের অত বাহার করা কেন? নাও এইবার—হাঁড়ি ঠেলো—আর ছেলে ঠ্যাঙাও। উড়ে ব্যাটাকে ছাড়িয়ে দিচ্ছি এবার, রোসোনা।

ক'দিন রাত্রে ঘুমটা কম হইতেছিল ভাবিলাম যাই একবার কবরেজ মশাইয়ের কাছে, দুপুরিয়া "সুখসুষুপ্তি" বা দুবটি "অনিদ্রাহর" খাইয়া আসি।

দু'খানা বাড়ী যাইতেই নীলাম্বরবাবু ডাক দিলেন—সতুবাবু যে— আজ ছুটি নাকি?

—না এমনিই যাইনি শরীরটা তেমন—

—আসুন আসুন দুটো গাল গল্প করা যাক—তা'পর আছেন কেমন?

—আমাদের আর কি—যথা পূর্বং।

—যা বলেছেন। মরতে আমরাই মরলুম। ভেবেছিলাম—এইবার একটু গুছিয়ে বসবো—তা' একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেলাম মশাই।

কথাটা অবশ্য খুব খাঁটি নয়—যুদ্ধের বাজারে নীলাম্বরবাবু যা গুছাইয়া লইয়াছেন তাহাতে যথার্থ গুছাইয়া চলিলে তিনপুরুষ বসিয়া খাইবে। কিন্তু বাহ্যিক প্রকাশটা তাঁহার খুব কম এবং লোক দেখিলেই ডাকিয়া অভাবের বার্তা শোনানো এক রোগ।

—আর আমাদের প্রভাংশুবাবুর খবর জানেন তো? জানেন না?......আপনি মশাই একের নম্বর ইয়ে—দু'দিন মিলিটারি অর্ডার নিয়ে বাবুর কী লবাবি! দেখছেন তো? গিন্নিতো পাড়ার লোকের ওপর নাক বেঁকিয়েই আছেন। শাড়ীর ওপর গয়না, গয়নার ওপর শাড়ী মোটর নইলে এক পা চলে না, ছেলে-মেয়েদের তো সাহেব করে তুলেছিলেন একেবারে—নাও এখন বোঝো কত ধানে কত চাল। সেদিন দেখি হন্যেমুখো হয়ে শেয়ার বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সাহেব। দারুণ লোকসান দিয়েছে লোকটা।

মুখের ভাবে মনে হইল প্রভাংশুবাবুর লোকসানের অঙ্কটা বুঝি বা নীলাম্বরবাবুর লাভের খাতাতেই উঠিয়াছে।......

চঞ্চল হইয়া বলি—একবার কবরেজ মশাইয়ের ওখানে যাবো—

—কেন কার অসুখ?

—নিজেরই

কবরেজমশাই কলস্বরে সংবর্ধনা করিলেন—এই যে কার্তিক ঠাকুর, কি খবর?

—খবর—ঘুম হচ্ছে না।

ঘুম কার হচ্ছে বলতে পার হে? ঘুম! ঘুম পৃথিবী থেকে পালিয়েছে—

এই যে আমার বাড়ীতেই দেখ না দুটো ছেলে চাকরী খুইয়ে বসে আছে—বৌমাদের কলহ কাকলিতে তাদের ঘুম তো দূরের কথা পাশের ঘরে থেকে আমারই ভায়া, আজ দীর্ঘ-কাল ঘুম নেই।......মা জননীরা দিবসে অবসর পান না, বাচ্চা কাচ্চা সামলাতে হয়—তা'ছাড়া বামুন চাকর দুটো ছাড়াতে হ'ল—আমার এই 'বড়ি গুড়োয়' আর কতই হবে? —তা সেই বড়িগুড়ো আমায় কিছু দিন দিকি।

—দিচ্ছি দিচ্ছি বোসোনা হে। কার্তিকের আবার অনিদ্রে, পৃথিবীতে তোমরাই সত্যিকার বুদ্ধিমান ভায়া, হাত পা ছড়িয়ে খেয়ে ঘুমিয়ে বাঁচলে।......হ্যাঁ, দোষের মধ্যে ছোট বৌমাকে সে দিন বলেছি,—'মা জননী, রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হয়ে হয়ে পেটে বায়ুর প্রকোপটা বড় প্রবল হয়ে উঠছে, আর তোমাদেরও গলা খাটো করে ঝগড়াটা আসটা করা কষ্ট, তা আমার বিছানাটা আজ থেকে নিচের ঘরে কোরো।—ব্যস্ মা জননী যেন মহিষমর্দিনী হয়ে উঠলেন। ......আচ্ছা ভায়া এতে অপমানের কি হ'ল? ওনার সোয়ামীর যদি 'ভেন্ন' হবার মুরোদ থাকতো তা'হলে যে এ রকম দাঁড়িয়ে অপমান হতেন না এ কথা বুঝিয়ে দিতে 'কিন্তু' করলেন না।......শেষপর্যন্ত ছোঁড়াটার সমস্ত-রাত ঘুম নেই।......বড় বৌমার আবার উল্টো-ধারা—রবঘড়ি শোনাচ্ছেন দিন থাকতে হিসেবি হলে তাঁর আর এ দুর্দশা হত না।'......তোমার ভাগ্নেটারওতো চাকরী গেল...মা লক্ষ্মী ক্ষি মূর্তি ধরেন দেখ।......কাচ্চা বাচ্চা এখনো হয়নি তাই রক্ষে, নইলে অন্তর্টিপুনী খেতে খেতে প্রাণ যেত বাছাদের।

ভাগ্নেটার চাকরী যাওয়ার কথা শুনিয়া ঈষৎ চমকাইলাম, জানা থাকিলেও নিশ্চিত শুনি নাই। অন্যের ছেলের চাকরী যাওয়ার খবরের চাইতে ঘরের ছেলের যাওয়ার খবরটা যে অনেক গুরুতর সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বলিলাম—কেষ্টর চাকরী গেল কে বললে আপনাকে?

—ওই যে আমাদের ফণীর ভাইটাও ছিল ওই সঙ্গে—তারও গেল।

'সুখ সুষুপ্তি'র মোড়ক দুইটা পকেটে ফেলিয়া ফিরিবার পথে ভাবিলাম ফণীর কাছে নীট্ খবরটা জানিয়া যাই।......ফণী ছিল না, ফণীর মা ডাকিয়া বসাইলেন।......দুই চারি কথার পর কথা উঠিল মেয়েদের বিয়ের।...... ভাইঝির বিবাহ দিব কি না।......বলিলাম দেখি—না দিলেই বা কি করবে—

—তাতো কথা, কিন্তু কোন ভদ্দরলোকের ছেলে ওই সব ছক্কা পাঞ্জা মেয়েকে বে করবে বাবা? এইতো—আমার ঘরেই রয়েছেন তিন অবতার। ঘর সংসারের কাজ শেখেননি এক কড়া, জামা জুতোর লম্বা চাল শিখেছেন—এখন চাল খাটো করে ডাঁটা চচ্চড়ি রাঁধতে হলে ধনীরা মুচ্ছো যাবেন না? এদিকে বে'র বয়স গেল গড়িয়ে। কত আর হেজলিন পমেটম মেখে আটকে রাখবে তাই বল বাবা? যুদ্ধু ছিল সে তো 'পদে' ছিল এখন নানা জ্বালা।......এমনিই দেখ—ঘরে পয়সা ছিল বাজারে মাল ছিল না, এখন বাজারে মাল আছে, ঘরে পয়সা নেই। পোড়া ইংরেজের সব বিচ্ছিরি।

বাড়ী ঢুকিতেই ফণীর মার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই আমার পিসিমার মুখে—পোড়া সংসারের সবই বিচ্ছিরি, জোয়ান মেয়েছেলে ডলিপুতুল সেজে ঈজি চেয়ারে বসে থাকবে আর বুড়িরা মরবে খেটে। আমার যেমন মরণ নেই তাই এখনো তোদের কন্না করি। হ্যাঁরে নন্দি এই যে বিকেল থেকে মুখে পাউডার মেখে আর ছবি আঁকা কাপড় পরে গায়ে হাওয়া দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস, আক্কেল কি জাগে না? গেরস্থর কিছু না পারো দু'বেলা কুটনোটাও তো কুটে দিতে পারো বাছা? এখন তো আর সায়েবের আপিসের দোহাই নেই?......সংসারের কুটোটি ভেঙে দুটোটি করতে শিখলে না—তোমাদের গতি হবে কি? এদিকে তো রোদে রোদে রং হয়েছে তাঁবার মত, পোড়াকাঠের মত গড়ন, গালদুটো চড়িয়ে ভেঙে গেছে—এ রূপের পিতিমেকে নেবে কে তাই বল বৌমা?

বৌমাও সঙ্গে সঙ্গে সায় দেন,—আমিও তো তাই বলি পিসিমা, যে আর কি সহজে যুদ্ধ বাধবে যে শাড়ী ঘুরিয়ে হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে আপিসে যাবি? এখনো চেষ্টা চরিত্তির করলে বিয়েটা হ'তে পারে।

—মা তোমরা দয়া করে চুপ করবে একটু? দোহাই তোমাদের—বেশীদিন গলগ্রহ হয়ে থাকবো না। উঃ।

—ওইতো স্বাধীন হয়ে ওই উন্নতি হয়েছে, মেয়েমানুষ—এতটুকু কথার ভর সয় না!

আর শুনিতে প্রবৃত্তি হইল না।

তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দোরে আসিয়া বলি—পিসিমা খাবার দেবে?

—এই যে বাবা, ষাঠ্ ষাঠ্ খিদে পেয়েছে আহা।

আহারে বসিয়া প্রশ্ন করিলাম—বৌমাকে দেখছিনা যে?

—চলে গেছে খিদিরপুরে।

—হঠাৎ? কারুর অসুখ টসুখ?

—অসুখ কেন হতে যাবে? রাগ রাগ। কেষ্টার চাকরী গেছে শুনে রেগে ফরফর করে গাড়ী ডাকিয়ে চলে গেল।

তাজ্জব বনিয়া যাই।

—এতে রাগের কি আছে?

—কেন? আমরা 'ঠকিয়ে বিয়ে দিয়েছি,' 'টেম্পুরী' চাকরীর ভরসায় নাকি ভদ্দরলোকে বিয়ে করে না—একখানা সাবান কিনতে মামাশ্বশুরের কাছে হাত পাতার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া ভালো'—এই সব। বলে 'ক্ষ্যামতা হলে তবে যেন কেষ্টা ওমুখো হয়'। নি-রোজগেরে গোয়ামীর পরিবার হয়ে মামাশ্বশুর বাড়ী বাঁদীগিরি করতে পারবেন না তিনি।

মনে মনে হাসি।

কালই বৌমার বাবা আসিয়াছিলেন আমার অফিসে, একটি চাকরীর চেষ্টায়।

রাত্রে ঘুমাইতে যাইতেছি। পকেটে 'সুখ সুষুপ্তি' আছে তাই বুকেও বল আছে। ......জানালা খুলিতেই দেখি বারান্দার ধারে রেলিঙে হাত রাখিয়া অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়াইয়া আছে নন্দিনী।

দেখিয়া কেমন মমতা বোধ হয়।......বরাবর ও সব আগে বিছানায় আশ্রয় লয়।

কাছে আসিয়া প্রশ্ন করি—এখনো জেগে আছিস যে?

—এমনি। ঘুম আসছে না।

আমার কাছে ঘুমের ওষুধ আছে, খাবি?

—না।

—তবে যা শুতে যা। শুলেই ঘুম আসবে।

—বেশ আছি। দেখছি—

হাসিয়া উঠি,—অন্ধকারে আবার দেখছিস কি?

—দেখছি ভবিষ্যৎ।......আচ্ছা ছোটকা বলতে পারো আবার কবে বোমা পড়বে?

ডাকিনী

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

চতুর্বর্গের মধ্যে জ্ঞানের উল্লেখ না থাকায় হলদেকলসির চৌধুরিগণ কখনো তাহার চর্চা করে নাই এমন কি চতুর্বর্গের সারাংশ মাত্র রাখিয়া বাকিটুকু তাহারা বরাবর বর্জন করিয়া আসিতেছিল। এহেন কালে এবং এহেন ক্ষেত্রে কিভাবে চতুর্বর্গাতীত সরস্বতীর উদয় হইল তাহা বিস্ময়কর হইলেও একেবারে অপ্রত্যাশিত নহে। সংসারে অপ্রত্যাশিতের অবকাশ সর্বদাই রহিয়াছে।

হলদেকলসির বর্তমান জমিদার শশাঙ্ক চৌধুরী পিতৃহীন। বয়স হওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত মাতাই তাহার অভিভাবক। এখনো সে বিবাহ করে নাই। তবে ভাবে গতিকে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, এই অসহায় যুবকটি বিবাহ করিবামাত্র মাতার অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া পত্নীর অঞ্চল অবলম্বন করিবে। কোন কোন পুরুষ চিরকাল স্ত্রীলোকের অঞ্চল ছায়ায় করদ-রাজারূপে জীবন কাটাইতে অভ্যস্ত। শশাঙ্ক চৌধুরী সেই দলের।

পূজার ছুটিতে শশাঙ্ক ও তাহার মাতা অম্বাময়ী দেওঘরে আসিয়াছেন। দেওঘরে শশাঙ্কর পিতা একটি বাড়ী তৈয়ারী করিয়াছিলেন। সেই একতলা বাড়ীর উপরে আরো তিনটে তালা চড়াইয়া দিয়া অম্বাময়ী বাড়ীটাকে পাড়ার মধ্যে উদ্ধত করিয়া তুলিয়াছেন। এই বাড়ীটি তাঁহার পরম গৌরবের বস্তু। তাঁহাদের বহু পুরুষের পাণ্ডাঠাকুর হঠাৎ একদিন কোন কারণে বাড়ীটির একটি খুঁৎ প্রদর্শন করাতে অম্বাময়ীর মুখ অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। তারপরে অনেক কয়েকদিন তিনি দেবদর্শন করিতে যাওয়া বন্ধ রাখিয়াছিলেন। অম্বাময়ী জানিতেন দেবদর্শনে পাণ্ডার যেমন লাভ দেবতার তেমন নহে। এত বড় দেওঘর সহরে একটিমাত্র পথ তাঁহার পরিচিত—মন্দির হইতে তাঁহার বাড়ীর পথ। এই দুটি স্থান ছাড়া কদাচিৎ অন্যত্র তিনি যাইতেন। একদিন মন্দির হইতে ফিরিবার পথে বাড়ীর কাছে আসিয়া শশাঙ্ক বলিয়া উঠিল—মা, তোমার বাড়ীটা যেন মন্দিরের চেয়েও উঁচু। দেবমন্দিরের উচ্চতা কল্পনাতে লঙ্ঘন করাও পাপ—কাজেই মাতা পুত্রকে তিরস্কার করিলেন বটে—কিন্তু মনে মনে তেমন দুঃখিত হইলেন না। সেদিন চাহিবা-মাত্র শশাঙ্ক মাতার নিকট হইতে অপ্রত্যাশিত অর্থলাভ করিল। বলা বাহুল্য শশাঙ্কর পড়াশুনা বেশিদূর অগ্রসর হয় নাই, সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে। তাহার মা সগর্বে সকলের কাছে বলিয়া বেড়ান—আমার ছেলে ম্যাট্রিকুলেশন ফেল—যেন ধনীর ছেলের পক্ষে পাশ হওয়ার চেয়ে ফেল হওয়ার গৌরব বেশি।

যদুনাথবাবু সদাগরী অফিসের পেন্সন-প্রাপ্ত কেরাণী। তিনি পূজার ছুটিতে দেওঘরে হাওয়া বদল করিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে তাঁহার মেয়ে মল্লিকা। মল্লিকাই তাঁহার একমাত্র সন্তান। যদুনাথবাবু বিপত্নীক। মেয়েকে দিবার মতো অন্য কিছু তাঁহার নাই বলিয়া তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। মল্লিকা এম-এ পাশ করিয়াছে। সেদিন পিতা-পুত্রী বেড়াইতে বাহির হইয়া অনেকটা ঘুরিবার পরে ক্লান্ত হইয়া 'হলদেকলসি কটীরের' গেটের পাশে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। এমন সময়ে অম্বাময়ী মন্দির যাইবার উদ্দেশ্যে বাহিরে আসিতেছিলেন। একটি অপরিচিত মেয়েকে বাড়ীর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি শুধাইলেন—কি দেখ্‌ছ মা? মল্লিকা ঠিক যে কি দেখিতেছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সহজ নহে। এরকম ক্ষেত্রে সহজতম উত্তরটাই সে দিল—বাড়ীটা বেশ বাড়ী। আপনার বুঝি?

অম্বাময়ীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হাঁ মেয়েটি সমজদার বটে। কই এমন করিয়া কোন অপরিচিত ব্যক্তি অযাচিতভাবে তো তাঁহার 'হলদেকলসি কুটীরের' প্রশংসা করে নাই।

তিনি বলিলেন হাঁ মা আমাদেরই বাড়ী। তা এখানে ব'সে কেন? এসো না ভিতরে। তারপরে গলা একটু খাটো করিয়া বলিলেন—উনি বুঝি তোমার বাবা?

মল্লিকা বলিল—হাঁ, বাবা।

যদুনাথবাবু বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অম্বাময়ী মল্লিকাকে লইয়া বাড়ীর ভিতর বিশ্রামের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করিলেন।

কিন্তু পথের লোক টানিয়া আনিয়া বিশ্রামের সুযোগ দান তো অম্বাময়ীর অভিপ্রায় নয়—তিনি ঘণ্টাখানেক ধরিয়া মল্লিকাকে বাড়ীর অন্ধি সন্ধি সব দেখাইলেন। মল্লিকা কতকটা বা ভদ্রতার খাতিরে কতকটা বা সত্যের খাতিরে বাড়ীটার অনর্গল প্রশংসা করিয়া গেল। অম্বাময়ীর মন গলিয়া গেল।

বিদায় লইবার সময়ে তিনি মল্লিকার নাম, ধাম পুছিয়া লইলেন এবং পরদিন মধ্যাহ্নে আহার করিবার জন্যে পিতা-পুত্রীকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

মল্লিকা অম্বাময়ীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া প্রত্যহ বিকালে পিতাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে আসে। কয়েকদিন পরে একদিন অম্বাময়ী মল্লিকাকে বাগান দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়া নিজে চিকের আড়ালে থাকিয়া যদুবাবুর কাছে কর্মচারীর মারফৎ মল্লিকার সঙ্গে শশাঙ্কর বিবাহ প্রস্তাব করিলেন।



মল্লিকার বিবাহ... সম্পন্ন হইয়া গেল।

যদুবাবু ঠিক এ জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাই কি বলিবেন ভাবিয়া না পাইয়া বলিলেন—আমরা গরীব।

অম্বাময়ীর ইঙ্গিতে কর্মচারী বলিলেন—আমরা তো টাকাকড়ি চাই না—ভালো মেয়ে চাই। ঘর বর যদি আপনার অপছন্দ না হয়।

যদুবাবু বলিলেন—বিলক্ষণ!

তারপরে শশাঙ্কর সঙ্গে মল্লিকার বিবাহ স্থির হইয়া গেল। এম-এ পাশরূপে কেবল যে একটি খুৎ মেয়ের ছিল তাহা প্রকাশ পাইল না—প্রকাশ পাইলে কি হইত নিশ্চয় করিয়া বলা সহজ নহে।

অঘ্রাণ মাসেই শশাঙ্কর সঙ্গে মল্লিকার বিবাহ দেওঘরে সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের কিছুদিন পরেই আরও দূরবর্তী স্থানের হাওয়া বদল করিয়া দেখিবার জন্য যদুনাথবাবু পরলোকে প্রস্থান করিলেন। মল্লিকা কিছুদিন খুব কান্নাকাটি করিল। কিন্তু যে কাল দুঃখের কালো স্রোত ডাকিয়া আনে সেই কালই হাসির শুভ্র পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনারও বাহন। কালক্রমে তাহার চোখের জল শুকাইল এবং মুখে হাসি দেখা দিল। দেওঘরে কয়েকমাস কাটাইয়া ফাল্গুনের প্রথমে অম্বাময়ী পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া হলুদেকলসি গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

২

গড়ুনদীর তীরে আম কাঁটাল জাম নারিকেলের গাছের মধ্যে হলুদেকলসি গ্রাম। বাংলাদেশের হাজার হাজার গ্রামের সঙ্গে এই গ্রামখানির প্রভেদ নাই। এপারে মানুষের বাস, ওপারে বিস্তীর্ণ চাষের ক্ষেত। তার মধ্যে আখের ক্ষেতটাই বেশি নজরে পড়ে। শরৎকালে বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রৌঢ় আখের সারি সঙীন-তোলা ব্যূহবদ্ধ সৈন্যবাহিনীর মতো নিশ্চল দাঁড়াইয়া থাকে। শরৎকালের মধ্যেই এই উদ্ভিজ্জ বাহিনী আততায়ীর কাটারির আঘাতে ভূমিশায়ী হইয়া গাড়ী বোঝাই হইয়া দূরবর্তী চিনির কলের দিকে প্রস্থান করে। শীতের শেষে এখন আখের ক্ষেত শূন্য। রবিশস্য পরুপ্রায়। ধান-কাটা মাঠে আগুন ধরাইয়া দিয়া ধানের গোড়া পোড়ানো চলিতেছে। ওপারের নিস্তব্ধতার মধ্যে নানা রকম শস্যের পরিণতি লাভের প্রয়াস; এপারে শত রকমের শব্দে তরুরাজি আচ্ছাদিত মানুষের বসতির লক্ষণ। মাঝখানে গড়ুনদী দুই দিকের শৈবালের পাড় দেওয়া গঙ্গাজলী শাড়িখানি পরিয়া শীর্ণ স্রোতে চলমানা। সে না মানুষের, না প্রকৃতির।

মল্লিকা সহরের মেয়ে, গ্রামে আসিয়া নিজেকে বড়ই অসহায় অনুভব করিল। এখানকার নিস্তব্ধতা কেমন যেন বুক চাপিয়া ধরে—এখানকার নির্জনতা কেমন যেন অস্বস্তিকর। সহরের মেয়ে গ্রামের মধ্যে কোথাও অবলম্বন পায় না। নূতন আত্মীয়স্বজন এখনও তাহাকে প্রসারিত মনে গ্রহণ করে নাই—নূতন বধূর প্রতি সব শ্বশুরকুলেই প্রথমে একটা প্রতিকূলতার ভাব থাকে। মল্লিকার প্রতি প্রতিকূলতা কিছু বেশি ছিল। অম্বাময়ী কাহারও সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া, কাহাকেও ভাল করিয়া না জানাইয়া তাহাকে ঘরে আনিয়াছেন। সে দোষ যেন মল্লিকারই—কাজেই মল্লিকার উপরে সকলের রাগটা কিছু বেশি। কারণ, অম্বাময়ীর উপরে রাগ করা চলে, কিন্তু রাগ প্রকাশ করা চলে না। মল্লিকা একা বসিয়া থাকিলেও দোষ—দেখো সহরের মেয়ের অহংকার। আবার সকলের সঙ্গে মিশিতে গেলেও দোষ—দেখো সহরের মেয়ের নির্লজ্জতা। মল্লিকার সঙ্গে সকলের সম্বন্ধ ক্রমেই যখন সংকটের মুখে—তখন তাহার এক জ্ঞাতি ননদ হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল—মল্লিকা ইংরাজি পড়িতেছে। সে তখনি দৌড়াইয়া গিয়া প্রচার করিয়া দিল—বৌদি ইংরাজি পড়ে। দেখিতে দেখিতে কথাটা গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল—চৌধুরীদের নূতন বউ ইংরাজি পড়ে! সংবাদটা নানা মুখ ঘুরিয়া অবশেষে শশাঙ্কর কানে আসিয়া পৌঁছিল। সে রাত্রিবেলা মল্লিকাকে পুছিল—মল্লি, তুমি নাকি ইংরাজি পড়ো।

মল্লিকা বলিল—হাঁ।

কিন্তু মল্লিকা যেমন আশংকা করিয়াছিল শশাঙ্ক রাগ করিল না—বরঞ্চ যেন খুশি হইল।

শশাঙ্ক বলিল—কি বই? ফার্স্ট বুক? আমিও ওই বই দিয়ে পড়া সুরু করেছিলাম। তুমি কি বই পড়ছিলে?

মল্লিকার বইয়ের নাম প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল না—কিন্তু স্বামীর পীড়াপীড়িতে বইখানা বাহির করিতে হইল। শশাঙ্ক দেখিল—ফার্স্ট বুক নয় ছোট ছোট অক্ষরে ঠাসা পাতা—বেশ মোটা বই—ডিকেন্সের 'ডেভিড কপারফিল্ড।' শশাঙ্ক গিন্নীর ইংরাজি জ্ঞানে চমৎকৃত হইয়া গেল—এবং পরদিনই বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের কাছে গিয়া নিজে পত্নীর লেখাপড়া প্রচার করিবার ভার লইল। ইহার ফলে মল্লিকার অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল। একে তো চৌধুরী বাড়ীর বউয়ের পক্ষে ইংরাজি পড়া প্রথাবিরুদ্ধ—তার উপরে তাহার স্বামী এই কাজের সহায়। শশাঙ্ক যদি মল্লিকাকে তিরস্কার করিত—তবে সকলে খুসি হইত—কিন্তু ইহাতে হিতে বিপরীত ঘটিল।

শশাঙ্ক সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মল্লিকা একা বসিয়া কাঁদিতেছে। শশাঙ্ক তাহাকে কত সাধ্য সাধনা করিল—কান্নার কারণ মল্লিকা বলিল না। কি বলিবে কেন এই কান্না নিজেই ভাল করিয়া জানে না। কোন উত্তর না পাইয়া শশাঙ্ক বলিল—মল্লি তোমার কি এখানে মন টিঁকছে না!

মল্লিকা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। শশাঙ্ক বলিল—চলো আমরা কোথাও বেড়াতে যাই। মল্লিকা খুশি হইয়া উঠিল। শশাঙ্ক বলিল—এখন বেশ গরম পড়েছে, চলো দার্জিলিং যাওয়া যাক্। এবারে মল্লিকার মুখে হাসি ফুটিল।



মল্লি, তুমি নাকি ইংরাজি পড়ো?



আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল, আমলা তৈল এবং স্নো ও পাউডার ব্যবহারে [illegible] আভিজাত্যের সূচনা করে। কেশ ও অঙ্গের শ্রী বৃদ্ধি সাধনে ইহারা অদ্বিতীয়।

দত্ত কেমিক্যাল ওয়ার্কস : কলিকাতা

অম্লশূল ও পিত্তশূল

কষ্ট হতে মুক্ত হউন
একমাত্র রমেশ ব্র্যাণ্ড

ষ্টম্যাক পাউডারেই

আপনাকে মুক্তি দিতে সক্ষম সতর্কীরণ, রমেশ ব্র্যাণ্ড ষ্টম্যাক পাউডার তিন প্রকার। ৩নং পাউডার, সামার ডাইরিয়া, আমাশয়, রক্তামাশয়, অতিসার, গ্রহণী ক্রিমি, শূল, সূতিকাজনিত অতিসার এবং বালক বালিকাদিগের পেটের পীড়া, নানাবর্ণের তরল দাস্ত সহ জ্বর (Infantile Liver প্রভৃতিতে মন্ত্রশক্তির ন্যায় ফলপ্রদ। ২নং পাউডার অগ্নিমান্দ্য, অম্ল, অজীর্ণে। ১নং পাউডার অম্লশূল, পিত্তশূল, প্লীহা, যকৃত শূল, বুক কামড়ান, কোষ্ঠকাঠিন্যজনিত সকল প্রকার পেটের বেদনা, গ্যাসট্রিক ও ডিওডোনাল আলসারে বিদ্যুতের ন্যায় কাজ করে। বেদনার সময় একমাত্র সেবন মাত্রই পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনার বেদনা বন্ধ করিবে। আজই পরীক্ষা করুন, বিফলে দ্বিগুণ মূল্য ফেরৎ দিব। সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে না পাইলে অফিসে লিখুন।

নারায়ণ কুটীর, রংপুর (বেঙ্গল)

কলিকাতা অফিস—২১২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট
ষ্টকিষ্ট:—এম, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং, শঙ্কর ফার্মেসী, ৭৯নং শ্যামবাজার।

—হাওড়া—
কুষ্ঠ-কুটীর

অর্দ্ধশতাব্দীর বিরাট সাধনায়

এই চিকিৎসালয়ের খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি
দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত



ভীষণ

অসাড় কুষ্ঠ

বাতরক্ত ও গলিত কুষ্ঠ ৪৫ দিন হইতে ৬ মাস মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য। একজিমা, রক্তবিকৃতি জনিত গাত্রে নানা বর্ণের দাগ, বাত ও ১৮০ প্রকার চর্ম্মকুষ্ঠ রোগ অল্প দিবসের মধ্যে আরোগ্যের গ্যারাণ্টি।

ধবল

বা শ্বেতি অত্যাশ্চর্য সেবনীয় ও বাহ্যিক ঔষধ ব্যবহারের অল্প দিবসের মধ্যেই স্থায়ী বিলুপ্ত হয়। রোগ লক্ষণ পাঠাইলে বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও চিকিৎসা পুস্তক দেওয়া হয়।

নকল চিকিৎসা হইতে সতর্ক হইবেন।

ঠিকানা : **হাওড়া কুষ্ঠকুটীর**

প্রতিষ্ঠাতা : **লব্ধপ্রতিষ্ঠ কুষ্ঠ-চিকিৎসক পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা**

১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া (ফোন—হাওড়া ৩৫৯)

শাখা : ৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

(মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের মোড়)

পরদিন শশাঙ্ক মাতার কাছে প্রস্তাব করিল যে সে দার্জিলিং যাইতে চায়। অম্বাময়ী পরম্পরায় শুনিয়াছিলেন ধনীর ছেলেরা দার্জিলিং-এ যায় কাজেই তিনি বলিলেন, বেশ তো ষ্টেশন থেকে ঘোড়ার গাড়ী আনিয়ে নিয়ে যাওনা বাবা।

শশাঙ্ক বলিল—পাল্কীও লাগবে যে।

বিস্মিত অম্বাময়ী বলিল—পাল্কী লাগবে কেন?

শশাঙ্ক বলিল—মল্লিকাও যাবে।

অম্বাময়ীর মাথায় বিস্ময়ের আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। মল্লিকার ইংরাজি পড়ার কথায় তিনি রাগ করেন নাই—কারণ যে বধূকে তিনি একার দায়িত্বে নির্বাচন করিয়াছেন, সে যে আর পাঁচজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ—ইহাতে তাঁহারি গৌরব। কিন্তু চৌধুরী বাড়ীর বধূ স্বামীর সঙ্গে দার্জিলিং যাইবে। অম্বাময়ী নির্বোধ নন। তিনি বুঝিলেন হাসি মুখে অনুমতি না দিলে শুষ্কমুখে পুত্র ও পুত্রবধূর দার্জিলিং যাত্রার অসম্মত সাক্ষ্য বহন করিয়া তাঁহাকে অপমান সহ্য করিতে হইবে। কাজেই তিনি বলিলেন—বেশ তো বউমাও ঘুরে আসুক না কেন। অম্বাময়ী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বুঝিতে পারিলেন—এতদিনে মাতার অঞ্চল হইতে বধূর অঞ্চলে শশাঙ্কর সংক্রান্তি ঘটিয়াছে। তিনি দাঁতে দাঁতে চাপিয়া মুখ বুজিয়া রহিলেন। পুত্রস্নেহচোর বধূর প্রতি তিনি হাড়ে চটিয়া গেলেন।

দার্জিলিং-এর স্নিগ্ধ শুশ্রূষার মধ্যে আসিয়া মল্লিকার সমস্ত গ্লানি মুছিয়া গেল। সংসারের সব গ্লানির উপরে সুধার প্রলেপ দিবার জন্যেই তো দিকে দিকে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গের সুধার তুলি উদ্যত করিয়া গিরিরাজ এত আড়ম্বর করিয়াছেন। কুয়াশার সিক্ত অঞ্চলখানা সেই জন্যেই মানুষের মনের উপর দিয়া তিনি এতবার করিয়া বুলাইয়া দেন—মুছিয়া যাক সব তাপ, ঘুচিয়া যাক্ সব দাহ। এখানেও যে সান্ত্বনা না পায়—সে সত্যই দুর্ভাগা। মল্লিকা আর শশাঙ্ক সারাদিন ঘুরিয়া বেড়ায়। ধাপে ধাপে পাহাড় নামিয়া গিয়াছে—যাহার নিম্নতম প্রান্তে প্রবল স্রোতস্বিনী—গর্জনের দ্বারা মাত্র অনুমানগম্য। থাকে থাকে বলিষ্ঠ বৃক্ষরাজি উঠিতে উঠিতে আকাশকে প্রায় ছুঁইয়া দিয়াছে আর কি—যেখানে পরীদের খেলার ঘুড়ির মতো পান্ডু চাঁদখানা ঝুলিয়া আছে! সর্পিল পথ, গভীর উপত্যকা, উচ্চ শৃঙ্গ,—এসব কি কল্পনায় পাইবার? এমন ঘন শ্যামলতা আর এমন ফুলের বৈচিত্র্য! আর এই স্বর্গীয় রঙ্গমঞ্চে আলো-ছায়ার অর্ধনারীশ্বরের যে অন্তহীন অভিনয় চলিতেছে, কুয়াশার মলমল তাহার উপরে অঙ্কে অঙ্কে যবনিকা টানিয়া দেয়! মল্লিকা ভাবে এই রহস্য, এই সৌন্দর্য, এ কি এই জগতেরই অন্তর্গত, না তাহারা এমন এক স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে—যেখান হইতে আভাসে অন্য এক জগতের এই সব ছবি দৃশ্যমান? মল্লিকা মুগ্ধ হইয়া গেল। শশাঙ্ক খুশি হইল। দুইমাস কাটাইয়া তাহারা আবার দেশে ফিরিয়া আসিল।

৩

শশাঙ্ক ও মল্লিকা ফিরিয়া আসিলে প্রথমেই সকলের চোখে যে পরিবর্তনটা ধরা পড়িল—শশাঙ্কর শরীর খারাপ। সে কৃশ ও কেমন যেন রক্তশূন্য! তবে নাকি দার্জিলিঙে গেলে শরীর ভালো হয়! যাহারা কখনো দার্জিলিঙে যায় নাই—আর যাইবারও যাহাদের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই—তাহারা শশাঙ্কর দৃষ্টান্তে দার্জিলিং না যাইবার স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিল। অথচ ইহার ঠিক বিপরীত প্রমাণ মল্লিকা গালে ও দেহে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহা কেহ দেখিয়াও দেখিল না।

অম্বাময়ী কাতর হইয়া বলিলেন—এ কি বাবা, তোর শরীর এত খারাপ হ'ল কেন?

শশাঙ্ক বলিল—ওখানে পাহাড়ে ওঠা-নামা করতে গেলে শরীর একটু খারাপ হয়। ও কিছু নয়।

অম্বাময়ী বলিলেন—সে আবার কি কথা। দেওঘরের বাড়ীতে চারতলা থেকে একতলায় দিনের মধ্যে কতবার ওঠানামা করেছিস্ কই তোর শরীর তো খারাপ হয়নি!

যাই হোক অম্বাময়ী চিন্তিত হইয়া পুত্রের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন—কিন্তু তাহার শরীরের বিশেষ উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল না। ওই সঙ্গে মল্লিকার শরীরটাও যদি সমান খারাপ হইত তবে হয়তো এ পরিবর্তন তেমন করিয়া কাহারো চোখে পড়িত না—কিম্বা পড়িলেও কেহ কিছু মনে করিত না। এখন শশাঙ্কর পরিজন বিশেষ করিয়া তাহার মাতা বধূর উপরে ক্রুদ্ধ হইলেন। পৃথিবীর মধ্যে এক বাংলাদেশেই বোধ করি শরীর ভালো হওয়াটা অমার্জনীয় অপরাধ।

পূজার পরে অম্বাময়ী স্থির করিলেন এবারে দেওঘরে না গিয়া কাশী যাইবেন। তিনি শশাঙ্ককে বলিলেন—বাবা এবার আমাকে কাশী নিয়ে চল্।

শশাঙ্ক কি যেন বলিতে যাইতেছিল, অম্বাময়ী বলিলেন—না, না, বিদেশে বৌমাকে নিয়ে গিয়ে কষ্ট দিতে চাইনে। সে থাকুক। আর আমরা তো বেশি দিন ওখানে থাক্‌বো না।

আসলে বৌমার কষ্টটা নিতান্তই অবান্তর। বধূ যে পুত্রকে টানিয়া লইয়া দার্জিলিং গিয়াছিল—ইহা তাহারই উত্তর। অম্বাময়ী দেখাইয়া দিতে চান—পুত্রের উপরে এখনো তাঁহার পূর্ববৎ অধিকার আছে। বধূ যদি তাহাকে মার কাছ হইতে টানিয়া লইয়া দার্জিলিং যাইতে পারে—তবে মাতাও তাহাকে বধূর কাছে হইতে টানিয়া কাশী লইয়া যাইতে সক্ষম। শশাঙ্ক তাহার সঙ্গে যাইবে, মল্লিকা যাইবে না, এই চিন্তাতেই তিনি উৎফুল্ল বোধ করিলেন—এমন কি পুত্রবধূর সঙ্গে অনেক দিন পরে এক আধটা কথাও বলিয়া ফেলিলেন।

অম্বাময়ী ও শশাঙ্ক কাশী পেঁৗছিলে পরিচিত আত্মীয়স্বজন দেখা করিতে আসিল। তাহারা আসিয়া সকলেই একবাক্যে জানাইল অম্বাময়ীর শরীর বিশেষ খারাপ হইয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ, কথাটা সত্য নয়, দ্বিতীয়তঃ, ওটা একটা অভ্যর্থনার অর্থহীন প্রথামাত্র। উভয় পক্ষই জানে কথা অমূলক তবু বলিতে হয়—ওটা ভদ্রতা। কিন্তু ভদ্রতাটাও তাহাদের চোখ এড়াইল না। শশাঙ্কর শরীর যে অতিশয় কৃশ হইয়া পড়িয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া সকলেই উদ্বেগ অনুভব করিল।

এই সব আত্মীয়স্বজনের মধ্যে একজন নিস্তারিণী দেবী। ইনি শশাঙ্কর দূর-সম্পর্কিত পিসি। এক সময়ে নিস্তারিণী দেবী শশাঙ্কদের সংসারেই থাকিতেন—এখন তাহাদেরই প্রদত্ত মাসোহারায় কাশী বাস করেন। তিনি শশাঙ্কর কৃশতা দেখিয়া একপ্রকার ডুকরিয়া উঠিলেন—ও বৌদি এ কি সর্বনাশ তুমি করেছ। সোনার চাঁদ যে শেষ হ'য়ে গিয়েছে।

নিস্তারিণীর প্রতিকূলে সমালোচকগণ বলিতে পারেন যে তাঁহার স্বরের উচ্চতার উপরে মাসোহারার স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে—কিন্তু তাহা ছাড়া কিছু আন্তরিকতা থাকাও অসম্ভব নয়।

নিস্তারিণী পুছিলেন—কবে থেকে এমন হ'ল? অম্বাময়ী বলিলেন, বিয়ের পর থেকেই তো চোখে পড়ছে।

বলা বাহুল্য কথাটা মিথ্যা। কিন্তু যে পুত্রবধূর উপরে তিনি রুষ্ট তাহার উপরে স্বভাবতঃই দোষটা চাপাইয়া দিলেন। নিস্তারিণীরও কথাটা মনে লাগিল। কারণ শশাঙ্কর বিবাহে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াও যাইবার রাহা খরচ পান নাই—সেজন্য গোড়া হইতেই তিনি বধূকে দোষী করিয়া রাখিয়াছিলেন। কাজেই এখন অম্বাময়ীর কথা শুনিবামাত্র তাঁহার মনে হইল শশাঙ্কর যে শরীর খারাপ তাহার জন্য মল্লিকাই দায়ী।

অম্বাময়ী বলিলেন, সেইজন্যেই তো শশাঙ্ককে নিয়ে পশ্চিমে এসেছি, দেখি যদি তাহার শরীরটা সারে। নিস্তারিণী সেদিন আর কোন কথা বলিলেন না—সেদিনের মতো উঠিয়া পড়িলেন।

দু'চার দিন পরে আবার নিস্তারিণী আসিলেন। বিশ্বনাথের মহিমা, ব্যাসকাশীর ইতিহাস, বাজার দর প্রভৃতি যে কয়েকটি অত্যাবশ্যক আলোচ্য বিষয় আছে তাহার সমালোচনা অন্তে নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—হাঁ, বৌদি, এ কয়দিন আমি শশাঙ্কর কথা


গানের সুরের আসনখানি
পাতার আগে, প্রত্যেক সংগীত-বিলাসী যেটি সবার আগে যাচাই করে নিতে চান সেটি হচ্ছে আনুষংগিক বাদ্যযন্ত্রটি নিখুঁৎ কি না।
যাঁরা হারমোনিয়ামের সংগে গান গাইবার পক্ষপাতি, তাঁদের বাদ্যযন্ত্রটি ডোয়ার্কিনের হ'লে আর ভাবনার কারণ থাকে না। কারণ তাঁরা জানেন,
ডোয়ার্কিনের সব রকম বাদ্যযন্ত্রের মতই তাঁদের প্রত্যেকটি অর্গান ও হারমোনিয়ম উৎকৃষ্ট উপাদানে বিশেষজ্ঞের হাতে নিখুঁৎভাবে তৈরী। তাই গানের আসরে আদরে ও আভিজাত্যে ডোয়ার্কিনের জুড়ি নেই।
ডোয়ার্কিন এণ্ড সন লিঃ
১১, এসপ্লানেড (ই৺)
কলিকাতা

ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারিনি। সোনার চাঁদের শরীর যে এমন কাহিল হ'য়ে গেল এর তো একটা বিহিত করতে হবে।

অম্বাময়ী বলিলেন—সেইজন্যেই তো, বোন, পশ্চিমে আসা!

নিস্তারিণী বলিলেন—পশ্চিমে এসেছ ভালই করেছ। কিন্তু এত জায়গা থাকতে বাবা বিশ্বনাথ নিজ ক্ষেত্রে টেনে আনলেন কেন? এ বাবার দয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

বাবার দয়াতে অম্বাময়ীর কিছুমাত্র সংশয় ছিল না, কিন্তু ঠিক কি আকারে সে দয়া প্রকাশিত হইবে না বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসু-ভাবে তিনি নীরব হইয়া রহিলেন।

তখন নিস্তারিণী গলা খাটো করিয়া সুরু করিলেন, চৌষট্টিঘাটের কাছে এক ব্রহ্মচারী মাতা থাকেন—একেবারে ভূতভবিষ্যৎ-বর্তমান ত্রিকালদর্শী। কত লোক যে তাঁহার প্রসাদে বিপদোত্তীর্ণ হইয়াছে তার সীমা সংখ্যা নাই—এই বলিয়া কয়েকটি দৃষ্টান্তেরও উল্লেখ করিলেন। এবং অবশেষে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—একবার তাঁহার কাছে গেলে হয় না—কারণ চিকিৎসাশাস্ত্র ও পশ্চিমের জল হাওয়া স্বাস্থ্যদায়ক বটে, কিন্তু বাবার দয়া ও ব্রহ্মচারী মাতার শক্তির কাছে কিছুই কিছু নয়।

অম্বাময়ীর এরূপ আধিদৈবিক চিকিৎসায় আপত্তি হইবার কথা নয়, বিশেষ পুত্রের মঙ্গল কামনা করিয়া তিনি অবিলম্বে রাজি হইলেন। স্থির হইল পরদিন উভয়ে ব্রহ্মচারী মাতার কাছে যাইবেন।

চৌষট্টিঘাটের কাছে এক ভাঙা দোতালা বাড়ীতে ব্রহ্মচারী মাতা থাকেন। পরদিন অম্বাময়ী ও নিস্তারিণী যখন তাঁহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন তাঁহার সন্ধ্যাহ্নিক শেষ হইয়াছে বটে, কিন্তু তখনও আসন ছাড়িয়া ওঠেন নাই। দুজনে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন—অম্বাময়ী পায়ের কাছে মোটা প্রণামীর টাকা রাখিলেন। অম্বাময়ী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখিলেন—হাঁ প্রকৃতই ব্রহ্মচারিণী বটেন—মাথার জটা হইতে পা পর্যন্ত আধিদৈবিক ক্ষমতায় দেদীপ্যমান। মাতার যেমন বিরাট চেহারা, তেমনি বিশাল মুখমণ্ডলে ভাঁটার মতো দুটি চোখ, মাথার জটা পিঠ ঢাকিয়া মাটিতে লুণ্ঠিত, গলায় থাকে থাকে ছোট বড় রুদ্রাক্ষের একরাশ মালা, কপালে সিঁদুরের ছাপ, পরিধানে গেরুয়া, পাশে রক্ষিত রক্তবর্ণ ত্রিশূল—সম্মুখে রক্তজবার এবং রক্তচন্দনের পূজার উপকরণ—পাশে নরকপালে কারণ-বারি।

তিনি বলিলেন—শুভমস্তু।

হাঁ—দেহের অনুরূপ কণ্ঠস্বর। মনে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকিলে তাঁহার কণ্ঠ চাপিয়া মুহূর্তে বিনাশ করিবার মতো তাঁহার প্রবল প্রচণ্ডতা।

অম্বাময়ী চুপ করিয়া থাকিলেন আর নিস্তারিণী তাঁহাদের আগমনের কারণ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া গেলেন। সব শুনিয়া ব্রহ্মচারী মাতা তাহাদিগকে আগামী শনিবারে পুনরায় আসিতে বলিলেন—ইতিমধ্যে তিনি সমস্ত সমস্যার নাকি মীমাংসা করিয়া রাখিবেন।

শনিবারের পরে মঙ্গলবার, মঙ্গলবারের পরে অমাবস্যা—এমনি করিয়া বিশেষ বিশেষ তিথিতে ও বারে দুইজনে ব্রহ্মচারী মাতার কাছে যাতায়াত করিতে লাগিলেন এবং প্রতিবারেই অম্বাময়ী মাতাকে মোটা প্রণামী দিতে লাগিলেন। অবশেষে মাতা তপস্যার্জিত বুদ্ধিবলে বুঝিলেন—অতঃপর নীরব হইয়া থাকিলে ভক্তের সরিয়া পড়িবার সম্ভাবনা—কাজেই একদিন শনিবার অমাবস্যা তিথিতে তিনি অম্বাময়ীর সমস্যার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়া দিলেন।

ব্রহ্মচারী মাতা অম্বাময়ীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—বাছা, তোমার পুত্রবধূর ডাকিনীর অংশে জন্ম। ডাকিনীর অংশে যে-সব স্ত্রীলোকের জন্ম তাহারা স্বামীহন্ত্রী হয়। তাহাদের প্রভাবে স্বামীরা ধীরে ধীরে শুকাইয়া মারা যায়। স্বামী যতই শুকাইয়া আসিতে থাকে ডাকিনী ততই স্বাস্থ্যবতী ও সুন্দরী হইয়া ওঠে।

অম্বাময়ী মনে মনে লক্ষণ মিলাইয়া লইতে লাগিলেন—সবই তো সত্য বটে। শশাঙ্ক কৃশ হইতে কৃশতর হইতেছে—মল্লিকার স্বাস্থ্য ও রূপ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। পুত্রের অবস্থা স্মরণ করিয়া তাহার চোখ ছল ছল করিয়া আসিল।

ডাকিনীর অংশে জন্ম বলিতে কি বুঝায় ব্রহ্মচারী মাতা তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। শনি মঙ্গলবারে, অমাবস্যা তিথিতে কামরূপ কামাখ্যা হইতে ডাকিনীর হাড় গভীর রাত্রে আকাশপথে উড়িয়া শ্রীক্ষেত্রে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে তাহার গতিপথের নীচে কোন কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে ডাকিনী তাহাকে ভর করে। তাহার মধ্যে ডাকিনীর অংশ আসিয়া বর্তায়। এরূপ কন্যার মাতা প্রায়ই জীবিত থাকে না।

অম্বাময়ী দেখিলেন—কথা ঠিক। মল্লিকার মাতা তাহার জন্মের কিছুদিন পরেই মারা গিয়াছিল। অম্বাময়ী কাঁদিয়া ফেলিয়া



হাঁ প্রকৃতই ব্রহ্মচারিণী বটেন—

বলিলেন—মাতাজী, এখন তুমি উপায় করিয়া দাও।

মাতাজী হাসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—বাছা তোমার ভয় নাই। আমার কাছে ডাকিনী যোগিনী সবাই জব্দ—কারণ আমি কামরূপে কামাখ্যায় গিয়া দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া ডাকিনী সিদ্ধ হইয়াছি। আমি এমন মন্ত্রপূত আধিদৈবিক ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিব যাহাতে তোমার পুত্রবধূকে পরিত্যাগ করিয়া ডাকিনীর অংশ পলায়ন করিবে, তোমার পুত্রের পুনরায় স্বাস্থ্যোদ্ধার ঘটিবে। কিন্তু তার জন্যে তোমার পুত্রকে একবার এখানে লইয়া আসা দরকার—কারণ তাহাকে সজ্ঞানে স্বয়ং এই ঔষধ পুত্রবধূর হাতে বাঁধিয়া দিতে হইবে।

অম্বাময়ী এই প্রস্তাবে প্রমাদ গণিলেন। শশাঙ্ক নিশ্চয় এসব কথা বিশ্বাস করিবে না—আর একটা গণ্ডগোল করিয়া মহা অনর্থের সৃষ্টি করিবে।

অম্বাময়ী বলিলেন—মাতাজী—আজকালকার ছেলেদের মতিগতি বুঝিয়া ওঠা দুষ্কর, তাহাদের নাস্তিক বলিলেই চলে। তাহারা কি এসব দৈব ব্যাপার বিশ্বাস করিবে?

মাতাজী নরকপাল হইতে খানিকটা পানীয় গলাধঃকরণ করিয়া বলিলেন—বাছা সেজন্য তুমি ভাবিও না। মহাশক্তির কৃপায় আমি এমন ক্ষমতা লাভ করিয়াছি যে মহা-নাস্তিকেও আমার প্রভাব লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নয়। তোমার পুত্রকে আনিও, আমি যাহা বলিব—তাহাই সে বিশ্বাস করিবে।

বাস্তবিক ঘটিলও তাই। মাতার সঙ্গে কয়েকদিন ব্রহ্মচারিণীর কাছে যাতায়াতের পরে শশাঙ্কও বিশ্বাস করিয়া ফেলিল যে, তাহার পত্নীর ডাকিনীর অংশে জন্ম—সেইজন্যই তাহার শরীর খারাপ হইয়া যাইতেছে। ব্রহ্মচারী মাতার প্রদত্ত ঔষধ পত্নীর হাতে বাঁধিয়া দিলে তাহাদের উভয়েরই মঙ্গল। শশাঙ্ক এই কাজে সম্মত হইল—কতকটা বা পত্নীর মঙ্গল কামনায়, কতকটা বা নিজের ইষ্ট চিন্তায়, কতকটা মায়ের কান্নাকাটিতে, কতকটা ব্রহ্মচারিণীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে।

মানুষ একান্তই ঘটনাচক্রের দাস। কে কি বিশ্বাস করিবে, কে কি কাজ করিবে তাহার খুব সামান্য অংশই নিজের ব্যক্তিত্বের উপরে নির্ভর করে। ঘটনার ব্যক্তিত্বের কাছে তাহার নিজের ব্যক্তিত্ব অতিশয় দুর্বল। তার উপরে আবার শশাঙ্ক চিরদিন দুর্বল প্রকৃতির জীব—মাতার আশ্রয়ে থাকায় তাহার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা সাবালকত্ব লাভ করিতে পারে নাই।

ব্রহ্মচারিণী মন্ত্রপূত সিন্দুরলুপ্ত মটর-দানার মতো একটি বস্তু দিলেন। ইহা বধূর বামহস্তে বাঁধিয়া দিতে হইবে। মাতাপুত্রে যুক্তি করিয়া স্থির করিল, মল্লিকার জন্য এক জোড়া অনন্ত গড়িয়া লইয়া যাইবে, যাহার বাম হাতেরটির মধ্যে মটরদানাটি ভরিয়া দেওয়া থাকিবে। কাজেই মল্লিকার জানিবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না—অথচ কাজ উদ্ধার হইয়া যাইবে।

মাতাপুত্র ও নিস্তারিণী দেবী তিনজনে এইরূপ পরামর্শ করিলেন। নির্দেশমতো অনন্ত গড়া হইল—এবং তন্মধ্যে ব্রহ্মচারিণীর ঔষধ ভরিয়া দেওয়া হইল। এইবার তাঁহারা প্রফুল্লচিত্তে দেশে রওনা হইলন—সঙ্গে নিস্তারিণী দেবীও চলিলেন।

৪

মাঝ রাত্রে শশাঙ্ক ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া দেখিল শুভ্র কোমল শয্যার একান্তে মল্লিকা পড়িয়া ঘুমাইতেছে—জানলা দিয়া অবারিত জ্যোৎস্নার ধারা আসিয়া তাহার সর্বাঙ্গে পড়িয়াছে—শুভ্র শয্যায় শুভ্রতরা রমণী—যেন রজনীগন্ধার বনে মূর্ছিত জ্যোৎস্না। এই মল্লিকাই কি ডাকিনী? তাহার বিশ্বাস হইল না। সেদিন ব্রহ্মচারিণীর কাছে যাহা বিশ্বাস করিতে দ্বিধা হয় নাই—আজ তাহা মিথ্যার চেয়েও মিথ্যা মনে হইল। না এ হইতেই পারে না। কিন্তু তবু তো সে এই বিশ্বাসের বশেই কাজ করিয়াছে—এই বিশ্বাসের বশেই ঔষধভরা অনন্ত জোড়া তাহাকে পরাইয়া দিয়াছে।

কাশী হইতে ফিরিয়া অনন্ত জোড়া মল্লিকার হাতে দিয়া শশাঙ্ক বলিয়াছিল—পরো, নূতন ডিজাইনের অলঙ্কার।

মল্লিকা পুছিয়াছিল—আচ্ছা এর নাম 'অনন্ত' কেন?

শশাঙ্ক বলিয়াছিল—দেখছ সাপের আকারে গড়া—সাপের নাম যে অনন্ত। তারপর বলিয়াছিল—এ যে আমার অনন্ত ভালবাসার প্রতীক।

মল্লিকা বলিল—অনন্ত তবু অন্ত আছে। তারপরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিল—কোন্ ভালবাসার বা অন্ত নাই!

সে কি তখন স্বপ্নেও জানিত ওই অনন্ত কি বিষম বিষ বহন করিয়া তাহার বাহু-যুগলকে জড়িত করিল?

শশাঙ্কর চোখে সেই অনন্ত জোড়া পড়িল। ইচ্ছা করিল টান মারিয়া তাহা খুলিয়া ফেলে—ইচ্ছা করিল সকল কথা তাহাকে বলিয়া মার্জনা চায়। কিন্তু দুর্বল প্রকৃতির পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হইল না—বধূর পাশে শুইয়া পড়িল। তাহাকে নিকটে টানিতে গেলে ঘুমের মধ্যে মল্লিকার বাহু তাহাকে আঘাত করিল—বাম হাতের অনন্ত অতর্কিতে তাহাকে জোরে লাগিল। শশাঙ্ক তাকাইয়া দেখিল অনন্তের লাল পাথর বসানো চোখ জ্যোৎস্নায় সাপের চোখের মতো জ্বলিতেছে। শশাঙ্ক দূরে সরিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

শশাঙ্কদের সংসারে তাহাদের দূর-সম্পর্কিত এক পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ বালিকা প্রতিপালিত হইত। কালো মোটাসোটা মেয়েটি, মুখ কৌতুক-কৌতূহলে ভরা। তাহার সঙ্গে মল্লিকার সবচেয়ে বেশি স্নেহের সম্পর্ক ছিল। সে যে নিজে ওর মতই পিতৃমাতৃহীন। মেয়েটির নাম ফড়িং। মল্লিকা তাহাকে আদর করিয়া ডাকিত—কুমড়ো। সন্ধ্যা হইলেই কুমড়ো তাহার শয্যায় আসিয়া আশ্রয় লইত—বলিত মল্লিকা মাসি একটা গল্প বলো।

সেদিন কুমড়ো আসিয়া বলিল—মল্লিকা মাসি একটা গল্প বলো—তোমাদের দেশের গল্প। মল্লিকা কলিকাতার গল্প বলিতে উদ্যত হইলে কুমড়ো বলিল—ও গল্প নয়, তোমার দেশের গল্প।

মল্লিকা হাসিয়া বলিল—কেন কলকাতাই তো আমার দেশ।

কুমড়ো মাথা নাড়িয়া বলিল—না, আমি শুনেছি তোমার দেশ অন্যখানে।

বিস্মিত মল্লিকা বলিল—অন্যখানে কোথায় আবার?

কুমড়ো বলিল—হুঁ, ফাঁকি দিলে চলবে না—তোমার দেশ কামরূপ কামিখ্যে!

এবারে মল্লিকা হাসিয়া ফেলিল—বলিল ও-কথা আবার কে বললে?

কুমড়ো বলিল—কেন সবাই তো জানে—সবাই তো বলে। তোমার বাড়ী কামরূপ কামিখ্যে—তুমি ডাকিনী! তারপরে থামিয়া বলিল—আচ্ছা মাসি ডাকিনীরা নাকি আকাশ দিয়ে চলে? তুমি আকাশ দিয়ে যদি উড়ে যেতে পারো তবে দার্জিলিং যাবার সময়ে পাল্কী ক'রে গেলে কেন?

মল্লিকা বলিল—দূরে পাগলি আমি ডাকিনী হ'তে যাবো কেন?

কুমড়ো বুঝিল মাসির এখনো তাহাকে ফাঁকি দিবার ইচ্ছা। ডাকিনী-জীবনের পরম লোভনীয় গল্পগুলি না শুনিতে পারিলে আর মাসির প্রিয়পাত্র হইয়া লাভ কি?

সে বলিল—কাশী থেকে ওই যে বুড়ি এসেছে সে সব কথা বলেছে। তুমি ডাকিনী—মানুষের রূপ ধরে আছো। রাতের বেলায় সকলে ঘুমোলে ছাদ ফুটো ক'রে একখানা হাড় হ'য়ে আকাশ দিয়ে শ্রীক্ষেত্রে চলে যাও—আবার ভোরবেলা ফিরে এসে মানুষ হ'য়ে ঘুমিয়ে থাকো।

ইহা শুনিয়া মল্লিকা হাসিবে কি কাঁদিবে স্থির করিতে না পারিয়া বলিল—ছি কুমড়ো—ও কথা বলতে নেই। তোমার মেসো মশাই শুনলে রাগ করবেন।

কুমড়ো বলিল—রাগ করবেন না ছাই। তুমি ভাবছো মেসো মশাই জানেন না। তিনিও জানেন। তিনিই তো তোমাকে ওষুধ পরিয়ে দিয়েছেন!

মল্লিকা বলিল—ওষুধ আবার কই?

—কেন ওই অনন্ত জোড়া—ওরই বাঁ হাতেরটিতে বাবা বিশ্বনাথের ওষুধ ভরা আছে।' পাছে তুমি জানতে পারো ব'লে অনন্তের মধ্যে ভ'রে দেওয়া হ'য়েছে।

মল্লিকা বিস্ময়ে, ক্রোধে, হতাশায় চুপ করিয়া রহিল। গল্প জমিবার আশা নাই দেখিয়া ক্ষুণ্ণ মনে কুমড়ো প্রস্থান করিল।

মল্লিকা ডাকিনী—শশাঙ্ক একথা বিশ্বাস করে—অনন্তের মধ্যে ওষুধ ভরা—সব কেমন বিপর্যয়কর ঘটনা। একমুহূর্তে চিরদিনের চেনা-পৃথিবী যেন ওলট-পালট হইয়া গেল!

কাশী হইতে শশাঙ্কদের প্রত্যাবর্তনের পরে যে-সব ঘটনা ঘটিয়াছে এতক্ষণে সে-সব নূতন অর্থে তাহার চোখে নূতন আকার ধারণ করিল।

তাহার মনে পড়িল নিস্তারিণী বুড়ি গোড়া হইতেই তাহাকে ভাল চোখে দেখে নাই। সে পারৎপক্ষে মল্লিকার সঙ্গে কথা বলিত না। কিন্তু অন্যদের সঙ্গে মল্লিকার কথা যে বলিত তাহাতে সন্দেহ নাই—কারণ মল্লিকা আসিয়া পড়িলেই চুপ করিয়া যাইত—সকলের সঙ্গে একটা অর্থভরা ইসারার বিনিময় হইত। বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েদের তাহার কাছে আসা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পাশের বাড়ীর ছোট ছেলেটিকে একবার সে কোলে লইয়াছিল অমনি তাহার মা ছুটিয়া আসিয়া কোন কথা না বলিয়া ছেলেটাকে ছিনাইয়া লইয়া চলিয়া গেল—অথচ কাশী হইতে ইহারা ফিরিবার আগে ছেলেটা সারাদিন মল্লিকার কাছেই থাকিত। ঠাকুর ঘরে মল্লিকার প্রবেশ একপ্রকার নিষেধ হইয়া গিয়াছিল—ঢুকিতে গেলেই অম্বাময়ীর সতত-সতর্ক চোখ তাহা ধরিয়া ফেলিত—অমনি হুকুম হইত—বৌমা ওদিকে আবার কেন? কিম্বা ওখানে তোমার কি দরকার বৌমা!

সে স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিল—এ আবার কি রকম বিপদ? কিসে ইহার সমাধান, কোথায় ইহার সান্ত্বনা? শশাঙ্কও নাকি তাহার ডাকিনীত্বে বিশ্বাসী!

বাড়ীর মধ্যে প্রাচীর ঘেরা একটি ফুল বাগান ছিল, কেহ যত্ন লইত না বলিয়া জঙ্গল হইয়া গিয়াছিল—কোন গাছে বা ফুল ধরিত, কখনো ধরিত না। শশাঙ্ক কাশী বেড়াইতে গেলে সময় কাটাইবার জন্য মল্লিকা সেই বাগানের যত্ন লইত। বাগানের একান্তে একটা জবা গাছ ছিল। গাছটায় ফুল ধরিত না। মল্লিকার যত্ন ও জল পাইয়া গাছটা অজস্র ফুলে ভরিয়া গেল। মল্লিকা বলিল—ভালই হ'ল মা কাশী থেকে ফিরলে জবাফুলের অভাব হবে না। কিন্তু অম্বাময়ী ফিরিবার পরেও সে ফুল পূজার জন্য সংগৃহীত হইত না। মল্লিকা একদিন শাশুড়ীকে ওই ফুল লইবার জন্য বলিয়াছিল—শাশুড়ী কোন উত্তর দেন নাই—তার পরিবর্তে নিস্তারিণী বুড়ি উত্তর দিয়াছিল—ও ফুল অশুচি—পূজোয় দিতে নেই। তখন মল্লিকা ভাবিয়াছিল কাশীবাসিনী হয়তো পূজার পুষ্প নির্বাচনের এমন কোন গূঢ় রহস্য জানে—যাহা তাহার জানা নাই। কিন্তু আজ সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল ডাকিনীর যত্নে-ফোটা ফুল দেবপূজায় নিষিদ্ধ!

কিন্তু শশাঙ্কও যে এই নিদারুণ মিথ্যায় বিশ্বাসী। এই কথাটা তাহার মর্মে নিরন্তর খোঁচা দিতে লাগিল।......কিন্তু সত্যই কি সে তাহাকে ডাকিনী বলিয়া বিশ্বাস করে? ...... দূর ছাই, এত চিন্তায় কাজ কি? হাতেই তো প্রমাণ আছে। কুমড়ো বলিল—বাম হাতের অনন্তের মধ্যে ডাকিনী তাড়াইবার ঔষধ বর্তমান। কুমড়ো এসব কথা কাণা-ঘুষায় না শুনিলে বলিবে কেমন করিয়া?

মল্লিকা একটা নোড়া সংগ্রহ করিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তারপরে অনন্ত জোড়া খুলিয়া বাম হাতেরটিতে সবলে আঘাত করিল—এক আঘাতেই অনন্ত ফাটিয়া গিয়া ভিতর হইতে সিন্দুর লিপ্ত একটা মটরদানার মতো বস্তু বাহির হইয়া আসিল। সেই বস্তুটিকে হাতে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সে দেখিল—চিনিতে পারিল না কি। তবু সে ভাবিল—ইহা স্যাঁকরার অনবধানতাপ্রযুক্ত কোন বাজে জিনিষ হইলেও হইতে পারে—দেখা যাক্ ডান হাতেরটিতে কি আছে? তখনি সে আর এক আঘাতে ডান হাতের অনন্তখানা ভাঙিয়া ফেলিল—কিছুই বাহির হইল না—সব শূন্য। সেই রুদ্ধ নির্জন ঘরে, শূন্য মেঝের উপরে, জ্যোৎস্নার আলোয় সেই ঔষধটি হাতে করিয়া সে মূঢ়ের মতো বসিয়া রহিল। কেবলি মনে হইতে লাগিল—সে ডাকিনী, সে ডাকিনী, তাহাকে তাড়াইবার জন্য এত ঔষধ, এত ষড়যন্ত্র, এত আয়োজন। সে-ও তবে দুর্বল নহে, তাহারও বিষম শক্তি আছে! হঠাৎ সে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল—তার পরেই মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। শশাঙ্ক কয়েক দিনের জন্য কলিকাতায় গিয়াছিল বলিয়া রাত্রে দরজা খুলিতে হইল না। ডাকিনী আহার করিল কি না করিল, সে সন্ধান করিবার প্রয়োজনও কেহ অনুভব না করাতে সারারাত্রির মধ্যে কেহ তাহাকে ডাকিল না। পরদিন প্রত্যূষে মল্লিকা এক নূতন জগতে এক নূতন জীবনে জাগিয়া উঠিল।

৫

মল্লিকা বাড়ীর লোকেব সঙ্গে মিশিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিল। আগে সে মিশিতে চেষ্টা করিত—লোকে এড়াইয়া চলিত। এবারে চেষ্টাও পরিত্যাগ করিল, স্বামী থাকিলে তাহার সঙ্গে মিশিত—কিন্তু এখন তাহার মনে পড়িল ইদানীং স্বামীও যেন তাহাকে এড়াইয়া চলে। কয়েকদিন আগে শশাঙ্ক কাজের নাম করিয়া কলিকাতা গিয়াছে—অনেক কয়েকদিন হইয়া গেল, আসিবার নাম নাই। ইহাও কি তাহাকে এড়াইয়া চলিবার একটা পন্থা নয়। মল্লিকা জানিত না বটে, কিন্তু কথাটা সত্য নিস্তারিণী আসিয়াই অম্বাময়ীকে বুঝাইয়াছিল যে ছেলেকে যতটা সম্ভব মল্লিকার হইতে দূরে রাখিতে হইবে। অবশ্য হাতে ঔষধ থাকা পর্যন্ত কোন ভয় নাই—তবু সাবধান হইতে দোষ কি? তাহার পরামর্শেই অম্বাময়ী পুত্রকে কাজের অছিলায় কলিকাতা পাঠাইয়াছেন—এবং নিত্য নূতন কাজের ফরমাস পাঠাইয়া তাহার প্রত্যাবর্তনে বিঘ্ন ঘটাইতেছেন। মল্লিকা এত খবর রাখিত না কিন্তু স্বাভাবিক স্ত্রীবুদ্ধির বলে তাহার অনুমান প্রায় ঠিক জায়গায় পেঁৗছিয়াছিল।

বাড়ীতে স্বামী নাই—অন্যান্য কাহারো সঙ্গে সে মেশেনা কাজেই মল্লিকা যেন লোক-সমাজে থাকিয়াও লোকসমাজের বাহিরে গিয়া পড়িল। প্রেততাত্ত্বিকেরা বলেন- লোকের ভিড়ের মধ্যেই ছায়া শরীরীরা বিচরণ করিতেছে—মানুষে তাহাদের অস্তিত্ব জানিতে পারিতেছে না—কিন্তু উভয়পক্ষই যে আছে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। মল্লিকা ও বাড়ীর সকলের মধ্যে যেন সেই সম্বন্ধ। সে কাছে থাকিয়াও দূরে, ঘরের বধূ হইয়াও ঘরের নয়, মানুষ হইয়াও ডাকিনী। কেবল একটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিল—লম্বা হাতার জামা পরিয়া অনন্তশূন্য বাহুদ্বয় ঢাকিয়া রাখিয়াছিল।

একবার সে ভাবিল শশাঙ্ককে চিঠি লিখিয়া জানাইবে। কিন্তু কি লিখিবে? তিনিও তো এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছেন। তবে সেই কথাই সে না লেখে কেন? কিন্তু ইহার তো কোন প্রমাণ নাই, ছোট একটা মেয়ে কি বলিয়াছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া লিখিলে তিনি তো হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন। ব্যাপারটা যদি হাসিয়া উড়িয়াই যায় তবে ক্ষতি কি? সংসারের এই তো বিপদ্! অনুমানের সত্যকে প্রমাণের সত্য করিয়া তোলা যায় না বলিয়াই কি অনুমানের সত্য তুচ্ছ? এইভাবে দিন যায় এবং রাত্রিও যায়। মল্লিকা ক্রমাগত মনে মনে জপিতে থাকে সে নাকি ডাকিনী। যতই সে এই কথা ভাবে ততই বাড়ীর সকলের প্রতি তাহার ধিক্কারের ভাব গভীরতর হয়—একসঙ্গে ধিক্কার, ক্রোধ, বিরক্তি নৈরাশ্য, দুঃখ আরো কত কি? তাহার ইচ্ছা করে সকলের কাছে প্রমাণ করিয়া দেয় সে তাহাদের আর দশজনের মতোই সাধারণ মানুষ! কিন্তু প্রমাণ করিবে কি করিয়া? তাহাদের অনুমানের সত্যকে কি করিয়া সে অপ্রমাণ করিবে?

একদিন দুপুরবেলা নির্জন ঘরে আয়নায় নিজের ছায়া দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। একি তাহার এ কেমন চেহারা হইয়া গিয়াছে? ওই আয়নাখানা যেন একটা সুড়ঙ্গ পথের একটা মুখ তাহার মধ্য দিয়া আর এক দিকের, আর এক জগতের কোন্ ছায়াময়ী দৃশ্যমান? বাস্তবিক ছায়াময়ীই বটে। মল্লিকা কৃশ হইয়া গিয়াছে, মল্লিকার মতো স্নিগ্ধ রঙের উপরে একটা তীক্ষ্ণতা নামিয়াছে, বসনের শুভ্রতা আর গায়ের রঙের শুভ্রতা, সবশুদ্ধ মিলিয়া কেমন যেন একটা শাণিত অসির ভাব! চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি, মুখে এমন একটা হাসির রেখা—যাহাতে তরবারির দীপ্তি ও তরবারির শীতলতা দুই-ই মিশ্রিত আছে। নিজের ছায়া দেখিয়া সে নিজেই চমকিয়া উঠিল। সামান্য কয়দিন সে আয়নায় প্রসাধন করে নাই—এরই মধ্যে তাহার একি পরিবর্তন! সে হাসিয়া ভাবিল—একেই তো ডাকিনীতে পাওয়া বলে। আমি তো আর মানুষ নই।

ইতিমধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটিল, যাহাতে নিতান্ত নাস্তিকেও বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইল যে, মল্লিকা ডাকিনী ছাড়া আর কিছু নয়। গ্রামের বদি হাড়ীর ছোট ছেলেটার তড়কা হইল। লোকে বলিল, ছেলেটাকে ডাইনিতে পাইয়াছে—এখন চৌধুরী বাড়ীর বৌমার দয়া ছাড়া আর রক্ষা নাই। বদি ছেলেটাকে লইয়া এক দৌড়ে চৌধুরী বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া নিজের ঘরের বারান্দায় যেখানে মল্লিকা একা বসিয়াছিল—সেখানে গিয়া ছেলেটাকে তাহার কোলে ফেলিয়া দিয়া একেবারে তাহার পা জড়াইয়া ধরিল।

মল্লিকা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—একি! একি!

বদি পা না ছাড়িয়া বলিল—বৌমা এবার তোমার দয়া ছাড়া উদ্ধার নাই। ছেলেটাকে রক্ষা করো।

মল্লিকা বলিল—ওর যে গা গরম দেখছি। ইস খুব জ্বর। তড়কা হয়েছে।

বদি বলিল—তড়কা নয় বৌমা! ডাকিনীর কৃপা হয়েছে—তুমি ছাড়া আর কে রক্ষা করবে?

মল্লিকা বুঝিল তাহার নূতন পরিচয় সারা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। সে ভাবিল, এই ছেলেটার পরিবর্তে তাহার মৃত্যু হয় না! ইতিমধ্যে দুচারজন করিয়া লোক জড়ো হইতে লাগিল। তাহাদের দৃষ্টি এড়াইবার জন্যও বটে, ছেলেটাকে বাঁচানো যায় কি না দেখিবার জন্যও বটে, সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে উঠিয়া গেল এবং জল ও ইউ ডি কলোন মিশাইয়া ছেলেটার মুখে মাথায় দিতে লাগিল।



অল্পেই ছেলেটা তড়কা ভাঙিয়া সুস্থ হইল। তখন সে ছেলেটাকে আনিয়া তাহার মায়ের কোলে ফিরাইয়া দিল। বদি আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিয়া গলার রূপার মাদুলিটা এক টানে ছিঁড়িয়া মল্লিকার পায়ের উপরে রাখিল—বলিল বৌমা দয়া করে এটা তুমি নাও।

বদি আর কোন কথা না বলিয়া ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া সবেগে প্রস্থান করিল। কিন্তু দর্শকের ভিড় সরিল না। অম্বাময়ী ও নিস্তারিণীও এই ভিড়ের মধ্যে ছিলেন। দুইজনে দম্পতির দিকে চাহিয়া অর্থপূর্ণ হাসি হাসিলেন। এমন সময়ে নিস্তারিণীর ইঙ্গিতে অম্বাময়ী বলিয়া

উঠিলেন—বৌমা তোমার অনন্ত কোথায়? মল্লিকা দেখিল ব্যস্ততায় জামার হাতা সরিয়া গিয়াছে। সে বলিল—খুলে রেখেছি।

অম্বাময়ী কঠোর স্বরে বলিলেন—খুললে কেন? আবার পরো।

মল্লিকা বলিল—খুলে ফেলে দিয়েছি—আর পরবো না। নিজের স্বরের কঠোরতায় সে বিস্মিত হইয়া গেল। সাধারণ বধূ হইলে এমন অবাধ্যতার জন্য দণ্ডের অন্ত থাকিত না। কিন্তু ডাকিনীর উপরে ক্রোধ প্রকাশ করিতে অত্যন্ত দুর্দান্ত শাশুড়ীরও ভয় হয়। ডাকিনী হইবার কিছু সুবিধাও আছে। এই ঘটনায় সকলেই বিস্মিত হইল যে, মল্লিকা ডাকিনী ছাড়া আর কিছু নয়।

অম্বাময়ী ও নিস্তারিণী নিভৃতে বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অম্বাময়ী পুছিলেন—এখন কি করা যায়?

নিস্তারিণী বলিলেন—যতদিন ওষুধ ছিল ভয়ের কিছু ছিল না। ওষুধ ফেলে দেবার পরেই তো প্রকোপ সুরু হয়েছে।

চিন্তিত অম্বময়ী বলিলেন—কিন্তু এখন উপায় কি?

নিস্তারিণী বলিলেন—উপায় আর কি? ও'রা সব দেব-অংশী। বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করা কিছু নয়। এখন উনি নিজ ইচ্ছায় গেলেই মঙ্গল।

অম্বাময়ী কাঁদো কাঁদো স্বরে বলিলেন—যত তাড়াতাড়ি যায় ততই ভালো। বাছার আমার ফিরে আসবার আগে যায় না!

নিস্তারিণী বলিলেন—জোর করা তো যায় না দিদি। উনি ক্রুদ্ধ হলে বাছার ক্ষতি করতে পারেন।

পুত্রের ক্ষতি হইবার আশংকায় অম্বময়ী শিহরিয়া উঠিয়া ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিলেন।

মল্লিকার সঙ্গে কেহ মিশিত না—ইহা আগেই বলিয়াছি, কেবল ওই অনাথ বালকটি মিশিত। কুমড়ো আসিয়া মল্লিকাকে বলিল—মাসি, সবাই তোমাকে ভয় করে, কেবল আমিই ভয় করিনু।

[illegible] বলিল—ভয় করবো কেন? তুমি [illegible] আমাদের মতো মানুষ। ওরা বলে তুমি [illegible]ডাকিনী। হও না কেন ডাকিনী, আমার মাসি [illegible] বটে তো! তুমি আমার ডাকিনী মাসি [illegible]

[illegible]কা কহিল—ওরা আর কি বলে রে?

[illegible]ড়ো বলিল—একদিন কর্তা দিদি আর [illegible] দি বলাবলি করছিল—আমি সব শু[illegible] ফেলেছি। শীগ্‌গীরই নাকি তুমি উড়ে [illegible] যাবে—ওরা কালীর থানে পুজো দিবে [illegible]...আচ্ছা মাসি তুমি আমাকেও নিয়ে যাও না কেন? আমার তো কেউ নাই—ওরা আমাকে কেউ দেখতে পারে না।

মল্লিকা হাসিয়া বলিল—যাবি আমার সঙ্গে?

কুমড়ো সাগ্রহে বলিল—যাবো বইকি। ছাদ ফুটো করে দুজনে উড়ে চলে যাবো। প্রথমে যাবো কামরূপ কামিখ্যে—তারপরে যাবো শ্রীক্ষেত্রে! সে বেশ হবে মাসি। যাবার সময়ে এই বাড়ীর উপর দিয়ে উড়ে যেতে হবে—দেখবো ওরা কি করে?......আবার একটু থামিয়া বলিল—

হাঁ মাসি কবে যাবে?

মল্লিকা বলিল—শীগ্‌গীরই।

'সে বেশ হবে' বলিতে বলিতে কুমড়ো আনন্দে প্রস্থান করিল—বোধহয় জিনিষপত্র বাঁধিবার জন্যেই।

মল্লিকা বুঝিল—এবার তাহার যাওয়াই ভালো। কিন্তু কোথায় যাইবে? কোনখানে তো তাহার কেহ নাই—পৃথিবীর কোথাও তাহার তিলমাত্র আশ্রয় নাই! অবশ্যই যাইতে হইবে এবং শীঘ্রই......কিন্তু কোথায়? চিন্তা করিয়া করিয়া মল্লিকা এ প্রশ্নের কোন কিনারা পাইল না।

ডাকিনী হইবার অসুবিধার মধ্যেও একটা সুবিধা মল্লিকা পাইয়াছিল—নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে অবাধ স্বাধীনতা। সে যখন খুসি ঘুমাইত, যখন খুসি আহার করিত—আর সবচেয়ে সুবিধা ছিল রাত্রিবেলায় চৌধুরী বাড়ীর ছাদে ছাদে একাকী ঘুরিয়া বেড়াইত। কেহ বাধা দিত না, নিষেধ করিত না। গভীর রাত্রে এক ছাদ হইতে অন্য ছাদে ঘুরিতে ঘুরিতে তেতলার যে-ছাদটা গুড়নদীর ঠিক উপরেই তাহার উপরে আসিয়া দাঁড়াইত। দেখিত অনেক নীচে গুড়নদীর কালো জলে তারার ছায়া,—দেখিত নদীর ধারে দূরে চিতার আলো নির্বাপিতপ্রায়, দেখিত নদীর ওপরে পুঞ্জিত অন্ধকারে জোনাকীর ঝলমলানি; কান পাতিয়া শুনিত, দিনের বেলার অশ্রুত গুড়নদীর ছল ছল ধ্বনি, আর শুনিতে পাইত প্রহর-গোনা যামঘোষের দিগন্তজোড়া ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত রব। তারপরে এক সময়ে নিশান্তের শীতল বাতাসে সচকিত হইয়া ক্লান্ত শরীরটাকে টানিয়া আনিয়া শূন্য শয্যায় ফেলিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িত। ছাদে বেড়াইবার সময়ে সে জানিত, জানালা দরজা আলিসার আড়াল হইতে অনেকগুলি কৌতূহলী চক্ষু তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে।

৬

এমন সময়ে হঠাৎ একদিন শশাংক ফিরিয়া আসিল। রাত্রি তখন অনেক। ষ্টেশনেই সে আহারাদি সারিয়া আসিয়াছিল—কাজেই আসিয়াই সে নিজের শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। মল্লিকা অকস্মাৎ স্বামীকে ফিরিতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। শশাংকও তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মল্লিকা, তোমার হাতের অনন্ত গেল কোথায়?

মল্লিকা একবার রিক্তবাহুর দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলিল,—ভেঙে ফেলে দিয়েছি। ভীত-বিস্ময়ে শশাংক বলিল, কেন?

মল্লিকা এবার হাসিল, বলিল—বুঝতে পারো না! তুমি যে ডাকিনী।

শশাংকর অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল—একি পরিহাস, না সত্য?

এবার সে ভালো করিয়া মল্লিকাকে লক্ষ্য করিল। জানালা দিয়া নির্গলিত জ্যোৎস্নার ধারাতে সে দাঁড়াইয়া; শাড়ীর শাদা জমিনে আপাদকণ্ঠ আবৃত; চুল এলায়িত: কালো চুলের দ্বন্দ্বে বসনের শাদা, রঙের শাদা, জ্যোৎস্নার শাদা, হাসির শাদা—সবশুদ্ধ মিলিয়া কেমন যেন একটা অতীন্দ্রিয় শুভ্রতা। সেই ঋজুশুভ্র অনতিদীর্ঘ নারীমূর্তি যেন কোন দুষ্ট অদৃষ্টের একখানি শাণিত তরবারি! সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল।

মল্লিকা বলিল—বসো।

কিন্তু নিজের শয্যায় আসিয়া বসিবার সাহস শশাংকর হইল না। কিছু দিন আগে যে মল্লিকাকে সে ছাড়িয়া দিয়াছিল, এ যেন সে মল্লিকা নয়। সংসারের ধূমে মলিন ম্লান চিরপরিচিত নারীকে অলৌকিকের শানপাথরে ঘসিয়া কে যেন অন্তর্নিহিত দীপ্তিময়ী লোকোত্তরাকে বাহির করিয়াছে? এত কথা হয়তো তাহার মনে হইত না, কিন্তু যতদিন সে কলিকাতায় ছিল প্রায় প্রতিদিনই মার পত্র পাইত যাহাতে থাকিত এই ডাকিনীর নিত্য নব কার্যকলাপের পরিচয়—তার কতক সত্য, কতক মিথ্যা। সবই কল্পনার তুলিতে জ্বলন্ত বর্ণে অংকিত। সেই সব ঘটনার সঙ্গে জড়িত করিয়া আজ যাহাকে সে দেখিল সে আর তাহার পত্নী নহে—পত্নীরূপিনী ডাকিনী।

শশাংক অস্ফুটস্বরে বলিল—তুমি কে?

মল্লিকা স্থির কণ্ঠে বলিল—আমি ডাকিনী। আমার দেশ কামরূপ কামিখ্যে। আমি গভীর রাত্রে ছাদ ফুটো করে কঙ্কাল হয়ে আকাশপথে উড়ে যাই—কামরূপ থেকে শ্রীক্ষেত্রে কত পাহাড় পর্বত, নদনদীর উপর দিয়ে, কত দেশ বিদেশ পার হয়ে। ওঃ সে কি আনন্দ। তারপরে ভোর হবার আগে মানুষ হয়ে তোমার পাশে আবার শুয়ে ঘুমোই।

শশাংক কাঠের মতো দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। মল্লিকা বলিল—চলো না একদিন আমার সঙ্গে। যাবে?

শশাংক আর সহ্য করিতে পারিল না—সে 'মাগো' শব্দ করিয়া ছুটিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার সেই সংকুচিত

পলায়নের দৃশ্যে মল্লিকা হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সেই হাসি যেন কঙ্কালের শীর্ণ শুভ্র হাত বাড়াইয়া শশাঙ্ককে ধরিবার জন্য পিছনে পিছনে ছুটিতেছে। শশাঙ্ক একেবারে তাহার মায়ের শয্যাপার্শ্বে গিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িল।

অম্বময়ী চমকিয়া উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার পুত্র—সারা গায়ে ঘাম ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। তাহাকে শান্ত করিয়া শুধাইলেন—এসেই বুঝি ঘরে গিয়েছিলি? আমাদের একবার পুছতে হয়। হাতে ওষুধ বেঁধে দিতাম, তবে ঢুকতিস। বল্, বল্, কি হয়েছে।

শশাঙ্ক সব খুলিয়া বলিয়া শেষে বলিল—মা ওযে আমাকেও সঙ্গে যেতে বলে। শঙ্কিত অম্বাময়ী 'ষাট ষাট' বলিয়া পুত্রের মাথায় ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া দিলেন এবং অবশেষে ইহার একটা বিহিত করিবার জন্য মল্লিকার ঘরের দিকে চলিলেন। তিনি একেবারে গলবস্ত্র হইয়া মল্লিকার কাছে গিয়া বলিলেন ওগো, তুমি দেবী দানবী ডাকিনী যোগিনী যেই হও, আমরা তোমার কোন ক্ষতি করি নাই। তুমি স্বেচ্ছায় এ বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলে আবার স্বেচ্ছায় এখান থেকে নিজের দেশে প্রস্থান করো।

এই বলিয়া তিনি গললগ্নীকৃতবাস হইয়া জোড় হাতে দাঁড়াইয়া রহিলেন, মাতার পিছনে দাঁড়াইয়া পুত্র কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ। মল্লিকা মাতাপুত্রের এই স্থানুভাব দেখিয়া একবার হাসিল—বলিল—তাই যাবো। এই বলিয়া সে উভয়ের পাশ দিয়া বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময়ে একবার স্বামীর দিকে কটাক্ষ করিল। তাহার দিক হইতে কোন সাড়া আসিল না—কাঠের পুতুল কি সাড়া দিবে?

মল্লিকা ঘর হইতে বাহির হইয়া অকম্পিত পায়ে তর্ তর্ করিয়া ছাদে গিয়া উঠিল। এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করিল না—নিজের কর্তব্যের ছক যেন সম্মুখে বিস্তারিত।

মল্লিকা ছাদ হইতে অন্য ছাদে, নিম্নতর হইতে উচ্চতর ছাদে গিয়া উঠিল এবং শেষ চারতলার চিলে কোঠার পাশে গিয়া দাঁড়াইল। মল্লিকা ঊর্ধ্বে তাকাইয়া দেখিল চৈত্র পূর্ণিমার জ্যোৎস্না দিগ্‌দিগন্তব্যাপিয়া শুভ্র-নৈরাশ্যের তাঁবু কানাৎ টাঙাইয়া দিয়াছে—তাহারি উচ্চতম প্রান্তে জাদুকরের মেয়ে চাঁদ শূন্যে ঝুলিতেছে; আরও না জানি কি বিস্ময় সঞ্চিত আছে। নীচে যতদূরে চোখে চলে সুপারি নারিকেলের মাথাগুলি তালে তালে দোলাদুলি করিতেছে। বাতাস উঠিয়াছে। মল্লিকার মনে হইল বাতাস উঠিয়াছে। পাল খুলিয়াছে, কাছিতে টান পড়িয়াছে। আর দেরী নয়। তাহার মনে হইল যে, বাতাসে এখানকার সুপারি নারিকেলের মাথা দুলিতেছে সমুদ্রের ঢেউয়ে সে বাতাস কি কাণ্ডই না জানি করিতেছে। সুদূর সমুদ্রে জোয়ারের জল এতক্ষণ পূর্ণতার রেখা ছাড়াইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর তীরে তীরে যত গুহা কন্দর আছে লবণাম্বুতে পূর্ণ হইয়া এতক্ষণে গদ্ গদ্ ভাষায় বেদনার কি স্তবোচ্চারণই না করিতেছে। সেই ব্যথার টান কি এই শুষ্কপ্রায় গুড় নদীর নাড়ীতেও আজ রাত্রে লাগে নাই? মল্লিকার মনে হইল আজ ব্যথার জোয়ার, নৈরাশ্যের হোলি। নিম্নে ঊর্ধ্বে কোথাও আজ পরিত্রাণ নাই, পরিচিত দিগন্ত, আশ্রয়ের তীর ধুইয়া মুছিয়া কোথায় সব অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মল্লিকা দেখিল এই সর্বপ্লাবী বন্যার মুখে কোথাও তাহার কোন আশ্রয় নাই, না পতিকূলে, না পিতৃকূলে, সংসারের সব দিগন্ত কোন সর্বনাশের তলায় নিশ্চিহ্ন। এই প্রলয় পয়োধির মুখে কোন্ বটপত্রকে অবলম্বন করিয়া সে বাঁচিবে? কোথাও যে তাহার কোন আশ্রয় নাই। আর সর্বনাশের মুখে একটুখানি বাঁচাইয়া রাখিয়া কি লাভ? মল্লিকা তাকাইয়া দেখিল, অতি নিম্নে গুড়নদীর রুপোর পাত—জ্যোৎস্না-চিক্কণ শীতল একটি বটপাতার মতো বাতাসে কাঁদিতেছে।

আবার বাতাস উঠিয়াছে, সুপারি-নারিকেলের মাথাগুলির কি হায় হায় হাহাকার। দূরের গাছের মাথা, অদূরের গাছের মাথা, নিকটের গাছের মাথা, পায়ের তলাকার গাছের মাথা এবং শেষে মল্লিকার আঁচল বাতাসে উড়িতে লাগিল। দূরের বাতাস কাছে আসিয়া পড়িয়াছে—আর বিলম্ব নয়। তাঁবুর উচ্চতম প্রান্তে জাদুকরের মেয়েটা অনেকক্ষণ হইল দুলিতেছে—এবারে লাফাইয়া পড়িবে—আর বিলম্ব নয়......ওর আগেই......

মল্লিকা চিলে-কোঠার ছাদে উঠিয়া একবার পৃথিবীটা নিরীক্ষণ করিয়া লইল এবং পরক্ষণেই 'মাগো' রব করিয়া অতি নিম্নে গুড়নদী লক্ষ্য করিয়া ঝাঁপ দিল।

জানলা দরজার আড়াল হইতে একদল কৌতূহলী চক্ষু দেখিল ডাকিনী চিলে কোঠার ছাদে উঠিয়া স্বমূর্তি ধরিয়া কামরূপ কামিখ্যের অভিমুখে উড়িয়া চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে যখন মল্লিকার মৃতদেহ নদীর জলে পাওয়া গেল, তখনো তাহাদের মতপরিবর্তন ঘটিল না। সবাই বলিল, ডাকিনী মানব দেহটা ফেলিয়া কঙ্কাল হইয়া উড়িয়া গিয়াছে—কামরূপ কামিখ্যের নরদেহে যাইবার উপায় নাই; মানুষের ঘরে মানুষের রূপে আসিয়াছিল—এবার স্বরূপ ধরিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। যাই হোক, বাড়ীর ডাকিনী দূর হওয়াতে সবাই নিশ্চিন্ত বোধ করিল এবং

প্রমথ চৌধুরীর গল্প

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

১৩৪৮ সনের ভাদ্র মাসে বাঙলাদেশের বিভিন্ন সাহিত্যিক গোষ্ঠী ও প্রমথবাবুর অনুরাগী পাঠকবৃন্দ তাঁকে সংবর্ধনা জানাই; বেশী আড়ম্বরে নয়, তবে সেই সংবর্ধনার মধ্যে যে আন্তরিকতা ছিল আশা করি তাঁর ও উপস্থিত সকলের হৃদয় তা স্পর্শ করে থাকবে। প্রমথবাবুর লেখার মধ্যে, বিশেষ করে তাঁর গল্পগুলির মধ্যে, আমরা এমন কি পাই যে সংবর্ধনার সময় তার সংগ্রহ প্রকাশ করা দরকার ছিল, সেকথা ভেবে দেখা প্রয়োজন। গল্পসংগ্রহের' ভূমিকায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রমথবাবুর কাছে ঋণস্বীকার করে গেছেন— "সবুজপত্র" মারফত তিনি রবীন্দ্রনাথের আত্ম-প্রকাশের সুযোগ দিয়েছিলেন, এ সুযোগ আর কারো পক্ষে দেওয়া সম্ভব হোত না। প্রমথ-বাবুর লেখার আর যদি কোন গুণ না-ও থাকতো, তাহলেও রবীন্দ্রনাথের আত্মবিকাশে কোনও এক বিশিষ্ট যুগে, বলাকার যুগে, তিনি নতুন পথের আয়োজন করে দিয়েছিলেন বলেই যে তাঁর নাম আমাদের সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকতো, তা কি আর বলবার! তাঁর গদ্য লেখার অভিনব শৈলী আমাদের মধ্যে কেউ অনুরাগভরে কেউবা বিরাগভরে স্মরণ করছেন; তাঁর প্রবন্ধ যে বিষয়গুণে ও বৈশদ্যগুণেও উৎকৃষ্ট ও উপাদেয়, সে কথাও মনে রাখা উচিত, কিন্তু এখানে তাঁর গল্প-গুলি সম্বন্ধেই কিছু বলব। দু-তিন বৎসর পূর্বেও তাঁর গল্প বলার চমৎকার ভঙ্গী দেখা দিয়েছে। ...

কোটালপুত্র এদের পুরাতন কাঠামোর ভিতর দিয়েও বটে, আবার সীতাপতি রায়ের রোমাণ্টিক উৎপত্তি ও চরিত্রের মধ্য দিয়েও। আশা করি, বাঙ্গালী পাঠক দীর্ঘদিন ধরে তাঁর এইসব অভিনব গল্পরূপ আস্বাদ করতে পারবে।

প্রমথবাবুর প্রথম গল্প ১৩০৫ সনে বেরিয়েছিল, আর গল্পসংগ্রহ ১৩৪৮ সালে বেরোয়; এই প্রায় অর্ধশতাব্দী (৪৪ বৎসর) গল্প সাহিত্যের রচনায় লেগে থাকা, খুবই একটা বৃহৎ ব্যাপার বলে মনে রাখতে হবে। তবে এর মধ্যে খুব বড় বড় ফাঁক আছে। প্রথম



গল্পটি ১৩০৫; চার-ইয়ারি কথা ১৩২৩, মাঝের ১৮ বৎসরে তাঁর গল্প রচনার কোনও নিদর্শন আমরা পাইনি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে, এই সময়টা তাঁর কি করে কেটেছিল। "সবুজপত্র" নিশ্চিত শুধু রবীন্দ্রনাথের জন্য তিনি করেননি, তাঁর নিজেরও ছিল বিশেষ প্রয়োজন—আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন, এবং ও জিনিষটাই ছিল তখনকার হাওয়ায় হাওয়ায়। তারপর ২৫ বৎসরের মধ্যে ৩৭টে গল্প কি ৪০টে গল্প—যদি চার-ইয়ারিকে এক না ধরে চারই ধরি—ত্রৈরাশিক ...

লিখিয়েরা লেখেন না নিশ্চয়) বছরে দুটোও হয় না, এই যে মাঝে মাঝে মাঝে বড় বড় ফাঁক গেছে—এই সাহিত্যিক বসে যাওয়া বা depression-এর হেতুটা কি, তাও জানতে ইচ্ছে হয়। রকম সকম দেখে মনে হয়, চৌধুরী মশায় হেঁচকাটানের কখনই পক্ষপাতী নন, গদাই-লস্করি চাল তাঁর লেখার ও চরিত্রের অনুরূপ। তাঁর লেখার বাঁধুনীর একটা বিশেষ কারণ নিশ্চয় যে গল্প ভাল করে বলতেই তিনি চান—জাহির করতে তিনি কোনও দিন চাননি। আর একটা সন্দেহ আমার মনে হয় যে, তাঁর লেখা খুলেছে দেরীতে, যাকে বলে একটু late growth—এবং টিঁকছে ও টিঁকবে বহুদিন।

'প্রবাস-স্মৃতি' একেবারে গল্প-সংগ্রহ বইখানি থেকে আলাদা হয়ে রয়েছে; শুধু লেখার ঢংএর জন্য নয়, ওটা গল্পই হয়নি, ওটা নিছক ছবি-চিত্র। তরুণীর রূপের বর্ণনার একটা পংক্তিতে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কুশলতা ফুটে উঠেছেঃ—"তাহার গ্রীবার ডৌলটুকু, কপালের টোলটুকু, চিবুকের গোলটুকু, কর্ণ-রেখার অতি সুকুমার আবর্তনটুকু, তাহার মুখশ্রীর যেখানে সরল-রেখা অতি ধীরে বক্রতায় এবং বক্র-রেখা অতি যত্নে গোলত্বে পরিণত হইয়াছে, সেই রেখা-ভঙ্গের মধ্যে প্রকৃতির একটি উচ্ছ্বসিত বিস্ময় যেন সম্পূর্ণ অবাক হইয়া আছে।" আর ওর মধ্যে লক্ষণীয় হল ফরাসী লেখকদের মত একটা কথার মারপ্যাঁচের ওপর সমস্ত জিনিষটাকে ঘোরানো—যাকে বলা যায় ইংরেজিতে wit—তার বাহাদুরি। প্রভাত-বাবুর মত প্রমথবাবুও বিদেশের স্মৃতি ভুলতে পারেন নি, গল্পে তার ছাপ রেখে দিয়েছেন।

বিলেতফেরতদের কাছ থেকে বিলেতের গল্প; সৌরভ, স্মৃতি, ছবি—এসব তো পাওয়া যাওয়ারই কথা; সুতরাং প্রমথবাবুর চার-ইয়ারি-কথার নায়িকা চারজনই যে বিদেশিনী, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বিলেত থেকে, বিলেতি গল্প আসবেই—ঘোষালের হেঁয়ালিতে 'রায়মশায়' তো বলেছিলেন: এর পর কিন্তু প্রমথবাবু গল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে পুরো 'স্বদেশী' ...

কয়েকটি গল্প প্রমথবাবু বলেছেন, জমিদারদের কথা, তাদের শক্তি, তার অপপ্রয়োগ, ফলে ধ্বংস—তার কথা। বাংলা দেশের সমাজের ইতিহাসে এক বিশেষ অধ্যায়। **আহুতি, পূজার বলি, সহযাত্রী, দিদিমার গল্প, অবনীভূষণের সাধনা ও সিদ্ধি এরা এই পর্যায়ের। ঘোষালের হেঁয়ালি ও বীণাবাঈও** বাদ যায় না একেবারে। আবার জমিদারের **লেঠেল** বা ঐ ধরণের চরিত্র নিয়ে তিনি এক-একটা গল্প চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন—**ঝাঁপান খেলা, মন্ত্রশক্তি, ঝোট্টন ও লোট্টন।** তিনটি আজগুবি চরিত্র নিয়ে তিনি তিনটি গল্প-চক্রের সৃষ্টি করেছেন—**নীললোহিত** (চারটি গল্প), **ঘোষাল** (চারটি), **সারদা দাদা** (দুইটি)। বাকি রইল তেরটি গল্প—তারও তিনটিতে ছোট গল্পের মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে চমৎকার আলোচনা আছে; সুতরাং সেগুলি স্বতন্ত্র পর্যায়ে রাখা যেতে পারে। বাকি দশটারই অধিকাংশ হল প্রগতির কথা, বিভিন্ন ধাতুর লোকের চিত্র ও চরিত্র এবং কাল-মাহাত্ম্যে লোকের যে কী ভীষণ পরিবর্তন হতে পারে তার আভাষ।

প্রমথবাবু যে গল্প বলতে গিয়ে এক কথা দুইবার বলেন নি, এক ছবি দুইবার দেখান নি, নিজেকে repeat করেন নি, একথা বলতে পারি না। সে রকম আশা করা একেবারে দুরাশা। লেখকেরা repeat করবেনই; তাঁরা যে তাঁদের অভিজ্ঞতাকে নানারূপ "বাস্তব" আকার (অবশ্য কল্পলোকের বাস্তব) দেবেন, সেটা স্বাভাবিক। এই repetition-এর, এক কথা বার বার বলার, এক ছবি বার বার দেখানোর একটা সুফলও আছে, তাতে তাঁদের যে-দাগ পাঠকের হৃদয়ে এঁকে দেওয়ার ইচ্ছা, সে-দাগ হয় আরও গভীর। প্রমথবাবুর কাছ থেকে আমরা জমিদারের যে ছবি পাই—উত্তর বা মধ্য বাংলার জমিদার অথবা সেকালের জমিদার পুত্র, হকিম বাহাদুরের বাড়ির ছবি—adventure 'এডভেঞ্চার' নেই তা নয়, তবে গণ্ডির মধ্যে—ঘোষালের ত্রিকথাতে তারই পট-ভূমিকাই রয়েছে। এর জন্য তাঁর গল্পকে "দরবারি সাহিত্য" বলে চিহ্নিত করে সরিয়ে দেবার কথা দুই একজন পাঠক বলেছেন। অবশ্য আখিরি বিচারের ভার মহাকালের ওপর। তার আগে যাঁরা 'বুর্জোয়া' দেখে নাক সেঁটকান, ও প্রোলেটারিয়েটের কোনও ছবি মনে বা বাহিরে না দেখে শুধু প্রোলেটারিয়েটের ধুয়োয় সব ভুলে যান, তাঁদের রেখাতে কিছুই যে বের হবে না, সেকথা বোঝা দরকার। প্রমথবাবু যে 'রায়তের কথা' লেখা সত্ত্বেও, তাদের দুঃখ-দুর্দশার জন্য আন্তরিক সহানুভূতি সত্ত্বেও গল্প তাদের না ফুটিয়ে, ফুটিয়েছেন সেই সব চরিত্র যার কিছুটা পরিচয় শৈশবে কৈশোরে পেয়েছেন—তাই তিনি গল্পসাহিত্যে স্থায়ী কিছু এঁকেও রেখে যেতে পারবেন। আমরা এ পর্যন্ত বলতে রাজি আছি যে, লেখক কিছুতেই ভুলতে পারেন না যে, তিনি ব্রাহ্মণ ও জমিদার; আভিজাত্যের জ্ঞান তাঁর পুরো-পুরি আছে; তবে সেটা পাঠককে আঘাত করে না। অবশ্য পাঠক ব্রাহ্মণ ও জমিদার না হলে পুলকিতও করে না। কিন্তু এই ঝোঁকটুকু থাকার জন্য রসোপভোগ বাড়ে, কমে না।

এই সংগ্রহের একটা নিজস্ব ভূমিকা—প্রশস্তি নয়, তা আমরা লিখব, ঋণ-স্বীকৃতি নয়, তা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—চৌধুরী মশাই নিজেই লিখে গেছেন এই বইয়েরই ভিতর। তিনি সেকেলে শাস্ত্রী নন, যদিও তাঁদের দোষ-গুণের ফর্দ দেখে নিজে সাবধান হতে শিখেছেন; তিনি একেলে শাস্ত্রী তো বটেই, অর্থাৎ ব্যাখ্যা করেছেন—ছোট গল্প কেমন হওয়া উচিত। ছোট গল্প ছোট তো হবেই, গল্পও হওয়া চাই—চৌধুরী মশাই এদিকে কোথাও ভুলের ফাঁক রাখেন নি। অনেকে জেনে শুনেও কাজকর্মে আলগা হয়ে যান, তাই একথা বলা হয়তো দরকার ছিল—গল্প তিনি বলতে ভালবাসেন এবং জানেনও; আর উপন্যাস বা বড় গল্প লিখতে চান না বা "আয়েষি" বলে পেরে ওঠেন না অথবা তাঁর গল্পের টেকনিক তাঁর কথারই অনুরূপ, দীর্ঘ ছাঁদের নয়; এসব আলোচনা চলতে পারে। কিন্তু তাতে আমাদের কোনও সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। পরবর্তীকালে 'চাহার দরবেশে' তিনি 'চার-ইয়ারি-কথার' সাহিত্য রূপের অনুসরণ করেছেন, কিন্তু তা তেমনভাবে জমে নি।

ছোট গল্প লেখায় চৌধুরী মশায়কে কারো কাছে শিক্ষানবিশী করতে হয়নি; এতে তাঁর একেবারে অশিক্ষিতপটুত্ব। তাঁর গল্প ভালো লাগে বিশেষ করে এই জন্য যে, তাঁর রচনা উজ্জ্বলে মধুরে মিলিয়ে অর্থাৎ তা জীবনে যেমন সাহিত্যেও তেমনি ট্রাজেডিকে কমেডি হতে পৃথক করে দেখে না—ও-দুই এক জিনিসেরই এপিঠ-ওপিঠ মনে করে গল্পের মধ্যে ভর দেয়, আর তার মধ্যে আসল দামী বস্তু হল 'স্ফূর্তি' (এর ব্যাখ্যা করতে আমি অপারগ, অনুরূপ কথা বলা যায় 'elan vital'), বর্ণনা নয়, যদিও আমার বিবেচনায় চার-ইয়ারি কথার বর্ণনাগুলো হীরের টুকরো—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তা দীর্ঘকাল জ্বল্ জ্বল্ করতে থাকবে।

সেই বর্ণনার এক-আধটু নমুনা না দিলে গল্প-সংগ্রহের কথা বলা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। "...... অপূর্ব সুন্দরী! এমন রূপ মানুষের হয় না; সে যেন মূর্তিমতী পূর্ণিমা! আমি তার সম্মুখে থমকে দাঁড়িয়ে নির্ণিমেষে তার দিকে চেয়ে রইলুম। দেখি সেও এক দৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। যখন তার চোখের উপর আমার চোখ পড়ল, তখন দেখি তার চোখ দুটি আলোয় জ্বল জ্বল করছে; মানুষের চোখে এমন জ্যোতি আমি জীবনে আর কখনও দেখি নি! সে আলো তারার নয়, চন্দ্রের নয়, সূর্যের নয়—বিদ্যুতের। সে আলো জ্যোৎস্নাকে আরও উজ্জ্বল করে তুললে। চন্দ্রলোকের বুকের ভিতর যেন তড়িৎ সঞ্চারিত হল।" (চার-ইয়ারি—সেনের কথা)........."ভাল করে নিরীক্ষণ করে দেখলুম যে এ-হাসি তার মুখের নয়—চোখের। ইস্পাতের মত নীল, ইস্পাতের মত কঠিন দুটি চোখের কোণ থেকে সে-হাসি ছুরির ধারার মত চিকমিক করছে! শুনতে পাই, কোন কোন সাপের চোখে এমন আকর্ষণী শক্তি আছে, যার টানে গাছের পাখী মাটিতে নেমে আসে—হাজার পাখা ঝাপটা দিয়েও উড়ে যেতে পারে না। আমার মনের অবস্থা ঐ পাখীর মতই হয়েছিল।" (চার-ইয়ারি—সীতেশের কথা) ...... "তার মত বড় চোখ ইউরোপে লাখে একটি স্ত্রীলোকের মুখে দেখা যায় না—সে চোখ যেমন বড়, তেমনি জলো তেমনি নিশ্চল তেমনি নিস্তেজ। এ-চোখ দেখলে সীতেশ ভালবাসায় পড়ে যেত আর সেন কবিতা লিখতে বসত। তোমাদের ভাষায় এ-নয়ন বিশাল, তরল, করুণ, প্রশান্ত। তোমরা এরকম চোখে মায়া, মমতা, স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি কত কি মনের ভাব দেখতে পাও—কিন্তু আমি যা দেখতে পাই, সে হচ্ছে পোষা জানোয়ারের ভাব; গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতির সব ঐ জাতের চোখ—তাতে অন্তরের দীপ্তিও নেই, প্রাণের স্ফূর্তিও নেই।" (চার-ইয়ারি-সোমনাথের কথা) ...... "আমি নিরীক্ষণ করে দেখলুম যে, সে চোখ দুটি "লউসনিয়া" দিয়ে গড়া। "লউসনিয়া" কি পদার্থ জান? এক রকম রত্ন—ইংরেজিতে যাকে বলে Cat's-eye—তার উপর আলোর "সূত্ত" পড়ে, আর প্রতি মুহূর্তে রং বদলে যায়।" (ঐ)

এক চোখেরই কত চমৎকার বর্ণনা।

প্রমথবাবুর গল্পের মধ্যে কতকগুলি শব্দ আছে, যাতে তাঁর বর্ণনার 'নূন জুগিয়েছে। যেমন "তার হাতের ঘুড়ি কখন কান্নি মারত না।" "পিঠ পিঠ" ইত্যাদি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক অভিধান খুলে বসবেন কি না জানি না। আর আছে লাগসইভাবে বৈষ্ণব পদের টুকরো-টাকরার প্রয়োগ; যথা, "জনু আঁচরে উজোর সোনা;" কখনও বা ইংরেজি শব্দ বসিয়ে জিনিষটাকে আরও জীবন্ত করা হয়েছে।

গল্প বলার যে কৌশল, যে সংযম, যে ভঙ্গী থাকলে দশজন আগ্রহ করে তা শোনে প্রমথবাবুর তা যে কতখানি আয়ত্ত, তাঁর পাঠকেরা তার প্রমাণ পেয়েছেন। তাঁরা একথায় নিশ্চয় সায় দেবেন যে, প্রমথবাবু গল্প বলতে জানেন বলেই তাঁর গল্প পড়তে ভাল লাগে, এবং তাঁর কৃতিত্ব একত্র করে দেখিয়ে গল্প-সংগ্রহ পাঠকের হিতসাধনই করেছে নইলে তাঁর রচনাপটুতার সম্বন্ধে পাঠকের স্পষ্ট ধারণা করা কঠিন হোত।

নাটকীয় কথা

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

(১)

গতবারে নাটক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। আলোচনাটি এমন একটি দিক হইতে করা হইয়াছিল যে, তাহা সকলের পক্ষে সমান উপাদেয় না হইবারই কথা। ইহাও সত্য যে, নাটক সম্বন্ধে সব কথা এক নিঃশ্বাসে বলাও যায় না, বিশেষতঃ আমাদের সমাজে—যেখানে সকল সাহিত্যিক সমালোচনার নীতি বা রীতি সুপ্রচলিত হয় নাই; সেজন্য আমাকে দুই একটি মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছিল, শাখা-প্রশাখায় পৌঁছিবার অবকাশ হয় নাই। তথাপি শাখা-প্রশাখা অপেক্ষা মূলতত্ত্বেরই বিশদ বিচারণা অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। এবারে আমি সেই মূলতত্ত্বেরই সূত্র ধরিয়া নাটকের আসল রূপটির আরও কিছু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। তাহাতে পূর্বকথার পুনরুক্তিও থাকিবে, তত্ত্বকে তথ্যের দ্বারা সুগোচর করা হইবে।

তথাপি একটা কথা পাঠকগণকে স্মরণ রাখিতে বলি; নাটকই হোক আর কাব্যই হোক, আমার এই ব্যাখ্যা শেষ পর্যন্ত একই দৃষ্টির অধীন। আমার আদর্শ খাঁটি সাহিত্যিক আদর্শ; অর্থাৎ, আমার নিকটে সকলই কবিকর্ম। এই কবিকর্মের নানা করণ-উপকরণ আছে; তথাপি সকলের ফলশ্রুতি এক,—মানুষ এ সকলেরই মধ্য দিয়া একপ্রকার আত্ম-পরিচয় লাভ করে, আপনাকে দেখে, তেমন দেখা আর কিছুতে সম্ভব নয়। ধ্যানে বসিয়া আত্মদর্শন নয়, সূক্ষ্ম দার্শনিক চিন্তা দ্বারা জীবন ও জগৎ-রহস্যের সমাধান নয়, নানা আধি-ব্যাধি ও অভাব-পীড়িত জীবনে দুঃখনিবৃত্তি বা সুখলাভের উদ্দেশ্যে মানুষমাত্রেই সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা লাভ করে তাহাও নহে—এ যেন আর এক পথে, আর এক চেতনার সাহায্যে এক অপূর্ব কৌশলে চকিতে আপনাকে দেখিয়া লওয়া! সেই দেখার নাম—রসাস্বাদ। কাব্য নাটক গল্প উপন্যাস পাঠকালে আমরা যে একটি গভীর অনুভূতির দ্বারা আবিষ্ট হই, তখনই সেই রসাস্বাদ হইয়া থাকে; কি যে হয়, কেন হয়—সে চিন্তার অবকাশও থাকে না; পরে যখন চিন্তার অবস্থায় ফিরিয়া আসি, তখন সেই চিত্ত-চমৎকারের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া বিপন্ন হই, প্রত্যেকেই নিজ নিজ সংস্কার অনুযায়ী তর্ক করি, নানা মতের সৃষ্টি হয়। কিন্তু যাঁহারা ঐ রসাস্বাদ-কালেই একটু সজ্ঞানতা বজায় রাখিতে পারেন, সেই শক্তিমান রসিকেরা ঐ রহস্য কিছু কিছু ভেদ করিতে পারিয়াছেন; সে যেন স্বপ্নেও জাগিয়া থাকা, তাই জাগরণেও স্বপ্ন-রহস্যকে কিঞ্চিৎ বোধগম্য করা সম্ভব হয়। ইঁহাদের দ্বারাই সেই রস সম্বন্ধে আমাদের কিছু জ্ঞানলাভ হয়। সেই রসবিচারের নামই সাহিত্য-সমালোচনা; সেইরূপ সমালোচনার যোগ্য হইতে হইলে রচনার রীতি যেমনই হোক, তাহা ঐরূপ আস্বাদনীয় হওয়া চাই, যদি না হয়, তবে সে রচনা যেমন বিচারযোগ্য নয়, তেমনই সাহিত্যপদবাচ্যও নয়। আমি পূর্ব প্রবন্ধে এই সূত্র ধরিয়াই নাটকের আলোচনা করিয়াছিলাম; সে আলোচনা সাধারণ নাট্যামোদী রসিকগণের কৌতূহল তৃপ্ত করিতে পারিবে না; না পারুক, তথাপি উৎকৃষ্ট কাব্যহিসাবেও নাটকের মহিমা যে কত বড় অন্ততঃ সেই কথাটা একটু বুঝাইতে পারিলেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু তাহাও যে হইয়াছে তাহার নিশ্চয়তা কি? বিষয় যতই গভীর বা সূক্ষ্ম হোক, পাঠকের বোধগম্য করিতে পারাই লেখকের একমাত্র কাজ। একথা সত্য যে, সকল বিষয় সমান সুখবোধ্য নয়; আবার পাঠক বা শ্রোতার সে বিষয়ে একটি সশ্রদ্ধ জিজ্ঞাসা বা চিন্তার অভ্যাস থাকা চাই, নতুবা সকল চেষ্টাই নিষ্ফল। যেহেতু ইহাও জানি যে, "বক্তুরেব হি তজ্জাড্যং শ্রোতা যত্র না বুধ্যতে", অতএব আমি আমার সেই বক্তব্য আর একবার আর এক প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিব—আশা করি, তাহাতে বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের জাড্য কিছু ঘুচিবে।

নাটকের এমন কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ আছে, তাহার প্রযোজনায় এমন সকল কল-কৌশল আবশ্যক হয়, এমন কতকগুলি বহির্গত বাধাকে জয় করিতে হয় যে, কাব্য-উপন্যাসের সহিত এক শ্রেণীতে ফেলিয়া তাহার সাহিত্যিক বিচার করিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুবিচার হয় না; সেই সকল লক্ষণ এবং বাধার কথা আমি পূর্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি। তথাপি ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, নাটকও একটা কবিকর্ম, এমন কি, শ্রেষ্ঠ কবি-কর্ম হইবার যোগ্যতা তাহার আছে। রঙ্গমঞ্চে নাটকহিসাবে তাহার যে সাফল্য আমরা নিত্য চক্ষুগোচর করি এবং তাহার কারণ সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি যাহা নির্দেশ করিতে পারি, তাহার কথা পরে বলিব; উপস্থিত, আর একবার কবিকর্ম হিসাবেই তাহার যে গভীরতর রস-প্রেরণা, সে সম্বন্ধে একটু আভাস দিবার চেষ্টা করিব; যদি তাহাও পারি, সেও যথেষ্ট।

সকলেই জানেন আমাদের দেশে ভারতীয় নাট্য-শাস্ত্র নামে একটি প্রাচীন শাস্ত্র আছে। এই নাট্যশাস্ত্র হইতেই কাব্যবিচার বা অলংকারশাস্ত্রের উদ্ভব

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণ হয়, অতি প্রাচীনকালেই নাটকের 'অভিনয়দর্শনে দর্শক-চিত্তে যে অনুভূতির উদ্রেক হইত, তাহাই সর্ববিধ কবিকর্মের মূলীভূত অভিপ্রায় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল; নাটক ও কাব্যের আকৃতি-প্রকৃতি যতই ভিন্ন হউক, সকলই যে সমান কবিকর্ম, ইহা স্বীকৃত হইয়াছিল। আধুনিক কাব্য-জিজ্ঞাসাও বহু বিশ্লেষণের পর প্রায় সেই তত্ত্বেই পেঁছিয়াছে; কাব্যে আমরা যে বস্তুটির আস্বাদনে তৃপ্ত হইয়া থাকি, নাটকেও সেই কারণে সেই অবস্থা ঘটে, বরং ট্র্যাজেডি নামক য়ুরোপ-জাত শ্রেষ্ঠ নাট্যকলায় অতিশয় দুঃখকর ঘটনাও যে কারণে দর্শকের অতিশয় হৃদ্য হইয়া থাকে, তাহাও ওই এক বস্তুর আস্বাদন। সেই অনুভূতি বা আস্বাদনকে আমাদের অলঙ্কার-শাস্ত্রে 'রস' বলে; এই রসবোধ যাহার আছে সেই রসিক, এবং যে শুধু এই রস আস্বাদন নয়, তাহার মাত্রা নিরূপণ করিতেও পারে—তাহার নাম 'রস-প্রমাতা' বা Critic। ইংরাজীতে এই 'রস'কে sentiment বলে, কিন্তু রসবোধকে 'taste' এবং রসিককে 'man of taste' বলা হয়। Sentiment'এর আমরা বাঙলা করিয়াছি ভাব', কিন্তু পারিভাষিক অর্থ তাহা নয়; ইংরাজীতে ঐ শব্দটি সাধারণ অর্থে ভাবই বটে; কিন্তু পারিভাষিক অর্থে উহাই 'রস'—যদিও সে ভাষায় feeling, emotion ও sentiment সাধারণ অর্থেও এক বস্তু নয়। অতি সূক্ষ্ম মানসিক অবস্থাগুলিকে ভাষায় খুব স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে পারা সম্ভব নয়; তথাপি সদা-ব্যবহৃত শব্দগুলির মধ্যেও অর্থের যে তারতম্য আছে, তাহা খুবই শিক্ষাপ্রদ। আমাদের হৃদয়বৃত্তিঘটিত যাহা কিছু তাহাই feeling বা emotion, তাহাতে বাস্তবের সম্পর্ক কিছু বেশী; সেইরূপ ভাব যদি বাস্তব জীবন-সম্পর্কিত না হইয়া কতকটা কল্পনা-প্রণোদিত হয়, তবেই তাহার ইংরাজী নাম হইবে sentiment; কিন্তু এই সাধারণ অর্থের sentimentও একপ্রকার 'ভাব'—তাহা ঐ 'রস' নয়। অতএব ইংরাজীতে ভাবের বিভিন্ন স্তর বুঝাইবার জন্য যতগুলি শব্দ আছে, আমাদের ভাষায় তাহা নাই; তাই আমরা দুইটি মাত্র শব্দের দ্বারা অনুভূতির প্রধান ভেদটি নির্দেশ করিব। মনেই হোক (sentiment) আর প্রাণেই হোক (feeling) যে অনুভূতি প্রত্যক্ষচেতনাপ্রসূত তাহাই 'ভাব', এবং যে অনুভূতি ওই ভাবকে আশ্রয় করিয়াই তাহাকে অতিক্রম করে—ওই ভাবেরই যেন একটা পরিপক্ক অবস্থা—ভাব যাহার একরূপ কাঁচা উপাদান মাত্র—তাহারই নাম 'রস'। ইহাকেই ইংরাজীতে পারিভাষিক অর্থে sentiment বলে, তাই কাব্য নাটক প্রভৃতি নানা কবিকর্মের দ্বারা আমাদের চিত্তে সঞ্চারিত হয়; ইহাকে আর একটি শব্দের দ্বারা ইঙ্গিতে বুঝানো যায়—সেই শব্দ ঐ 'আস্বাদন'। নাটকে বা কবিতায় যে বস্তুটির আস্বাদন' হইয়া থাকে তাহাই 'রস', সে একটা অনুভূতি, একটা অবস্থা; সে সম্বন্ধে আর কিছু বলা যায় না। আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রে যেমন, আধুনিক কাব্য-সমালোচনাতেও তেমনই, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার মতই এই 'রস'-জিজ্ঞাসার অন্ত নাই। আধুনিক সমালোচকেরা কিন্তু 'রসকে' ব্রহ্মলোকে স্থাপন করিয়া তাহার metaphysic রচনা করিতে রাজী নহেন; কাব্যের সহিত জীবনের গূঢ়তর সম্পর্ক স্বীকার করিয়া তাঁহারা 'রসের'ও একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ নির্ণয় করিতে যত্নবান হইয়াছেন; কাব্যকে শুধু রসসৃষ্টি নয়, জীবনেরই সর্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণতম রূপসৃষ্টি বলিয়া স্থিরনিশ্চয় করিয়াছেন। সেই অনুভূতি জীবনকেই দেখিবার একটা ভঙ্গি—একটা পূর্ণতর দৃষ্টি। তাহাকে একরূপ 'আস্বাদন' বলিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহা একটা কিছুর আস্বাদন বটে, তাহা না হইলে জিজ্ঞাসার কোন মূল্যে থাকে না। তথাপি এই 'রস' কথাটি ব্যবহার করিলে ক্ষতি নাই, বরং সুবিধা আছে; আমাদের বাংলা ভাষাতেও ইহা একাধিক অর্থে প্রচলিত আছে; অতএব আবশ্যকমত ইহাকে স্থূল বা সূক্ষ্ম অর্থে ব্যবহার করা চলিবে। আমি সেই শাস্ত্রীয় কূটতত্ত্বের বিচার-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইব না—আপনারা সে ভয় করিবেন না: আমি সেই 'রসের' বা সেই অনুভূতির কিঞ্চিৎ বিশেষ পরিচয়ের চেষ্টা করিব—সেই আস্বাদন কিরূপ বা কিসের আস্বাদন, তাহাই বলিবার চেষ্টা করিব। তাহাতে আশা করি, 'রস'কে বোধগম্য করিলেও, ছোট করা হইবে না।

কাব্য-উপন্যাস প্রভৃতি পাঠকালে এবং পাঠ শেষ হইলে (রচনা যদি উৎকৃট হয়), আমাদের কিরূপ অনুভূতির উদ্রেক হয়? একরূপ তৃপ্তিবোধ করি কি না?—কেন করি? আমাদের জীবন সম্বন্ধেই আমাদের যে একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল,—অনেক বিষয়ে যে অসঙ্গতি-বোধ আছে, তাহা যেন ঐ কবিকর্মের মারফতে আমাদের চিত্তে অতিশয় উজ্জ্বল ও অর্থপূর্ণ হইয়া উঠে, তৃপ্তির কারণ তাহাই। ঐ অর্থপূর্ণতা কোনরূপ চিন্তাসাপেক্ষ নয়, সে একটা অনুভূতি মাত্র, তাহাতে জীবনের সর্বকিছুই একটা তালমানযুক্ত বলিয়া মনে হয়—ক্ষুদ্র বৃহৎ, তুচ্ছ মহৎ, সুন্দর কুৎসিত, কোমল কঠোর, সকলই—জীবনরূপ একখানি বসনের যে-কোন অংশে এমন বিচিত্র অথচ সুচ্ছন্দ নক্সার আকার ধারণ করে, এমন কি, আমাদের নিজেদেরই বাসনা কামনা সুখ-দুঃখের মূলে যে একটি ব্যর্থতা বোধ আছে, তাহাও একটি সুগভীর সম্মতির আনন্দে আমাদিগকে এমনই আশ্বস্ত করে যে, তখন সকল প্রশ্ন যেন নিরস্ত হইয়া যায়। অবশ্য পরে আমাদের মন তাহার ধর্ম পালন করে—সেই বস্তুকে বিশ্লেষণ করিতে চায়; গল্পটির বুনানি পরীক্ষা করে: কোন্ চরিত্রটি কতখানি স্বাভাবিক হইয়াছে, কোন্‌টি ভাল ফুটিয়া উঠে নাই, ঘটনাগুলির কার্যকারণ-সূত্র ঠিক আছে কি না—এ সকল বিচার তখন আরম্ভ হয়। তখন সেই কাব্য সম্বন্ধে আমরা মত প্রকাশ করি, এবং রসাস্বাদন যথার্থ হইয়াছে কি না, সে বিষয়ে নিঃসংশয় হই। কিন্তু আসলে এ সকল কর্ম রসাস্বাদনের পক্ষে আদৌ আবশ্যক হয় না—যাহার যেমন রুচি বা রসবোধ সে অনুপাতে কাব্যের রস-আস্বাদন পূর্বেই হইয়া গিয়াছে। কাব্যের রস-কল্পনা যদি সত্য বা উৎকৃষ্ট হয়, তবে ঐরূপ বিচারে আমাদের বিস্ময় বাড়িয়া যায়, যতই বিশ্লেষণ করি ততই সেই অনুভূতি বিস্তার লাভ করে। আবার এমনও দেখা যায় যে, কাব্যের সেই রস যত গভীর ভাবে আমাদের চিত্তকে স্পর্শ করে, আমাদের সেই হিসাবী মন ততই বিদ্রোহী হইয়া উঠে, কারণ, হয়ত সেই উপন্যাসে যে রসোদ্রেক হয় তাহাতে আমাদের কতকগুলি প্রবল সংস্কার সে সময়ে স্তম্ভিত হইয়া থাকিলেও, পরে বড়ই চীৎকার করিতে থাকে; তখন সেই মুগ্ধ করার অপরাধেই যেন তাহার উপরে খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। সমসাময়িক সাহিত্যে এমন দৃষ্টান্ত আছে; ইহার কারণ আর কিছুই নয়—আমাদের অভ্যস্ত রুচি ও রসবোধের অতিশয় বিরোধী কোন অভিনব কবি-কল্পনাকে আমরা সহসা গ্রহণ করিতে পারি না, প্রাণের সঙ্গে মনের বিরোধ হয়। যাহাদের রসবোধ উদার ও বলিষ্ঠ তাহাদের এরূপ দুর্গতি হয় না; যাহারা সে বিষয়ে ক্ষীণপ্রাণ, তাহারাই মাত্রা বেশী হইলে সহ্য করিতে পারে না—পান করিতেও যেমন উৎসুক, গালি দিতেও তেমনই পঞ্চমুখ; এমন কৌতুককর ঘটনা প্রায়ই ঘটে। অতএব, আমরা কাব্য প্রভৃতির সম্পর্কে যে 'রস' কথাটি প্রায় ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা এমন একটা কিছু গুরুতর দার্শনিক হেঁয়ালি নয়; আমরা সকলেই তাহা অল্প-বিস্তর আস্বাদন করিয়াছি; বরং কোনরূপ যুক্তি-বিচারের চিন্তা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়াই আমরা তাহাকে জানিয়াও না-জানা করিয়া রাখি।

উপরে রসের যে পরিচয় দিয়াছি, তাহাই যদি সকল কবিকর্মের ফলশ্রুতি হয়, তবে এমন কথা বলা যাইতে পারে যে, কাব্য উপন্যাস প্রভৃতিতে জীবনেরই এমন একটি ব্যাখ্যা থাকে যাহা আমাদের মনোবৃত্তির অজ্ঞাতসারে আমাদিগকে আশ্বস্ত ও উৎফুল্ল করে, আমাদের চক্ষে যেন আর একটা দৃষ্টি পরাইয়া দেয়—সে দৃষ্টি জীবনের এমন একটি স্থানে কেন্দ্রস্থ হয় যে, কিছুই আর অসঙ্গত বোধ হয় না—সকল ন্যায় অন্যায়, কু ও সু এমন একটি মালায় গাঁথা হইয়া যায় যে, একটির অভাবে আর একটির কোন মূল্যই যেন থাকে না, সমস্ত মালাটাই শ্রীহীন হইয়া পড়ে। পাঠক-পাঠিকারা বলিয়া উঠিবেন, সে কি? বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল, কিম্বা শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' পড়িয়া কাহার চিত্ত অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ না হয়? জীবনের নানা অসঙ্গতি, তথা সমাজের অন্যায় ও অনিয়ম কাহার হৃদয়ে আঘাত না করে? সত্য, কিন্তু তবু ঐ উপন্যাস এত ভাল লাগে কেন? ঐরূপ উপন্যাস রচনা করিয়াই তাঁহারা এমন খ্যাতিলাভ করিয়াছেন কেন? সে কি কেবল অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করা এবং মহাপাষণ্ডগণকে লোকচক্ষে ধিক্কৃত করার জন্য? হৃদয়ে আঘাত লাগে নিশ্চয়—না লাগিলে ত কিছুই হইত না! সেই আঘাতের উপযুক্ত উপকরণ প্রচুর পরিমাণে মিলাইয়া তবে ত কাব্যের গোড়াপত্তন হইয়াছে; ঝাল হউক, আর কটু হউক, সেই মশলাগুলিকে যিনি ভাল করিয়া পাক করিতে পারেন তিনিই কবি, কারণ ওই কাঁচা 'ভাব' গুলি হইতে পাকা 'রসের' ভিয়ান হয়। আমাদের চিত্তের একটা স্তরে ঐ কাঁচা ভাবগুলির—ক্ষোভ, ক্রোধ, দুঃখ প্রভৃতির উদ্রেক হয়, আর একটা স্তরে তাহাই এমন একটি অনুভূতির সৃষ্টি করে যে, আমরা সেসব ভুলিয়া গিয়া একটি অপূর্ব 'বোধ'এর অধিকারী হই, তখন আর কোন আপত্তি, অভিযোগ থাকে না—ইহার ব্যাখ্যা পূর্বেই করিয়াছি। যতক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকি ততক্ষণ সত্যই সকল সংস্কার যেন নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে; যদি না থাকে তবে তাহার কারণ দুইটি; প্রথম—রচনাটির দোষ, মশলার পরিমাণ ও পাক ঠিক হয় নাই; দ্বিতীয়—পাঠকের

রসবোধ ততখানি জাগ্রত না হইতেও পারে। সকলের সংস্কার সমান নয়—অনেকের সাধারণ রসবোধও না থাকিতে পারে। মোটের উপর ইহাই সত্য যে, মাত্রানুসারে ঐ বোধ প্রায় সকলেরই ভিতরে জাগে নহিলে কাব্য-উপন্যাসের এমন আদর হইত না, কবিকর্মের কোন মূল্যই থাকিত না। আমরা সত্যই মুগ্ধ হই এবং কেন হই—সে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন বোধ করি না। নিশ্চয় ইহার একমাত্র কারণ, আমরা সকল অসঙ্গতির মধ্যেও কোন এক-প্রকার সঙ্গতির আভাস পাই, তখন জীবনের কাহিনী একটা পরমসুন্দর রহস্যের মতই আমাদের মনের নিম্নস্তরের জ্বালা জুড়াইয়া দেয়। সাধারণ পাঠক আমরা—এই কারণ জানি না, জানিতেও চাহি না; কবি যেন আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমাদিগকে জীবনের সেই মহত্তর রূপটি দেখাইয়া দেন। শিশু দুধ খাইতে যেমন ঘোরতর আপত্তি করে, ঐ দুধই যে তাহার ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবে তাহা সে বোঝে না—কিন্তু খাওয়ার পর সে যেমন তৃপ্তি অনুভব করে, ইহাও সেইরূপ; খাইবার সময়েও সে হাত পা ছুড়িয়া মহা হাঙ্গামা করে কিন্তু তার পরেই সে গভীর আরামে ঘুমাইয়া পড়ে। কবিকর্মের যাদুশক্তির ক্ষুদ্রতর দৃষ্টান্তও আছে; বাস্তব জীবনে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-দর্শনে যে সকল বস্তু অতিশয় বিরক্তি, এমন কি ঘৃণার উদ্রেক করে, কাব্যে তাহাদের বর্ণনাই আমাদের মনোহরণ করে; অতিশয় দুর্বৃত্ত, নীচ ও কদাচারী বলিয়া আমরা যাহাদের সান্নিধ্য পর্যন্ত বর্জন করি, নাটকে সেই 'নিমচাঁদ বা নদের চাঁদ'কে পরম আদরে অভ্যর্থনা করিয়া থাকি—তাহারাই তখন কবির দৃষ্টিতে রূপান্তরিত হইয়া আমাদের সাতিশয় প্রীতির পাত্র হয়। কেন হয়? মানুষকে বা মানুষের জীবনকে আমরাও তখন সেই দৃষ্টিতে দেখি—সকল ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, নীচ তখন একটা বৃহত্তর সত্তার অঙ্গীভূত হইয়া সর্ববিধ ক্ষুদ্রতা ত্যাগ করে। সকল সত্যকার কবিকর্মে আমরা জীবনসম্বন্ধে এমনই একটা উদার দৃষ্টি লাভ করি—জীবনকে সম্পূর্ণরূপে দেখি।

এই দেখা ত মানুষকেই দেখা! সে মানুষ কোন্ মানুষ? সর্বদেশের সর্বকালের মানুষ নয় কি? দেশ কাল ও পাত্রের বিচিত্র সাজসজ্জা, বিভিন্ন সমাজ ও ধর্মনীতি, সদসৎ সংস্কার, রাষ্ট্র, সমাজ ও প্রকৃতির পীড়ন, এই সকলের দ্বারা শোভিত, সজ্জিত, আবৃত ও বিড়ম্বিত হইয়াও মানুষ যে সেই একই মানুষ—যতই তাহা উপলব্ধি করি, ততই আমরা যেন আশ্বস্ত হই। এ আশ্বাস আমরা আর কোথাও পাই না। এই কবিকর্মের মধ্য দিয়াই আমরা সর্বদেশের ও সর্বযুগের, এবং সর্ববিধ চরিত্রের—সেই অসংখ্য মানুষের—মুখ চিনিতে পারি; ইহা কি কম আশ্চর্যের বিষয়! যদি তাহা না পারিতাম তবে ঐ রচনা ব্যর্থ হইত। চিনিতে পারার কারণ কি? তাহারা সকলেই যে আমারই প্রতিচ্ছবি—তাহাদের সহিত আমার একটি অতিশয় গূঢ় আত্মীয়-সম্পর্ক আছে বলিয়াই ঐরূপ চিনিতে কোন বাধা ঘটে না। এই কথাটি খুব ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে—ইহাই সবচেয়ে বড় কথা। ইয়াগো যেমন আমারই একটা দিক, ওথেলো-ও তেমনই; আমার মধ্যে ম্যাকবেথও আছে, হ্যামলেটও আছে; সেই আমিই কখনো আমাকে হত্যা করিতেছে, কখনো আমার জন্য প্রাণ দিতেছে; আমিই রাজা, আমিই ভিখারী; আমিই দাতা হইয়া দান করিতেছি, আমিই দস্যু-তস্কর হইয়া অপহরণ করিতেছি; আমিই মাতাল বা লম্পট হইয়া সমাজে কলঙ্ক লেপন করিতেছি, আমিই সাধু ও মহাত্মারূপে সর্বজনবরেণ্য হইতেছি। তাই নাটকের অভিনয় দর্শনে আমরা ভূমিকা-গৌরব অপেক্ষা অভিনয়-নৈপুণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হই—নাটকই আমাদের এই অনুভূতিকে আরও সহজে ও প্রত্যক্ষভাবে জাগ্রত করিয়া দেয়। অভিনয়-কলাকে আমরা একটা পৃথক আর্ট বলিয়াই তারিফ করি বটে, সেই আর্টের আবরণে যেন সকল তুচ্ছতা বা বিরূপতা ঢাকা পড়ে; কিন্তু আসলে শুধু তাহাই নয়, কবির সেই রস-দৃষ্টিই জীবনের ভিতরকার রূপটি আবিষ্কার করে। তাহারই প্রসাদে আমরা এমন একটি বোধের অধিকারী হই, যাহা জ্ঞান-বিচার বা দার্শনিক চিন্তার স্পর্শমাত্রে মিলাইয়া যায়; কারণ, তাহা তো আমরা বুদ্ধিগোচর করি না, সাক্ষাৎ দর্শন করি। তাই আমি এই যে ব্যাখ্যা ও বিচার-বিশ্লেষণ করিতেছি; ইহাতেও সেই বোধকে জাগ্রত করা যাইবে না, বরং ইহার দ্বারা যাহা সহজ তাহাই দুর্বোধ্য হইয়া উঠিবে; যে বস্তু আপনারা নিত্য আস্বাদন করিয়া থাকেন, তাহাই সন্দেহের বিষয় হইবে, তর্ক-বুদ্ধিকেই উদ্যত করিয়া তুলিবে। ইহার পর আমি যদি ওই "আমি"টার গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য এইরূপ শ্লোক আবৃত্তি করি—

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্
আশ্চর্যবৎ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥

তাহা হইলে, আমার আর রক্ষা নাই, তাহা জানি; তথাপি ওই শ্লোকটি বড় সত্য কথাই বলিয়াছে—"কেহ বা শুনিয়া থাকেন মাত্র যে, ওই 'আমি'টা একটা আশ্চর্য বস্তু, কিন্তু শুনিয়া তাহার অধিক কিছু ফল লাভ হয় না।" তাহাই যদি হইবে, তবে কবিকর্মের গৌরব কি? সেই কথাই তো আমিও বলিতেছি,—যাহা জ্ঞান-বুদ্ধির অগোচর তাহাকে এমনই করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়; সে অবস্থা হয়তো স্থায়ী নয় এবং তাহা সেই বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানও নয় যাহাতে মোক্ষলাভ হয়। তথাপি উহা দ্বারা একটি কাজ হইবে; আপনারা কবিকর্মের 'আমি' এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রের 'আমি'—এই দুইয়ের ঠিকানা যে এক নয় তাহা বুঝিতে পারিবেন; একটিকে মেধা ও বহুশ্রুতের দ্বারা বুঝিয়া লইতে হয়, কিন্তু তাহাতেও সেই বস্তুকে লাভ করা যায় না; আর একটিকে বুঝিবার প্রয়োজনই হয় না, একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়—ওই দেখানোর নামই কবিকর্ম—কোনটা বড়? জ্ঞানী হওয়া, না রসিক হওয়া? ইহার উত্তর আপনারাই স্থির করিবেন।

কিন্তু কথাটাকে আর একটু আগাইয়া লইলে বর্তমান প্রসঙ্গের পক্ষে সুবিধা হয়। কবিকর্মের মারফতে জীবনকে যে আর এক দৃষ্টিতে দেখিবার কথা বলিয়াছি, আশা করি, তাহা খুব দুর্বোধ্য হয় নাই। ওই যে 'আমি'র সর্বাত্মীয়তা—সর্বত্র সেই এক 'আমি'র নানা ছদ্মবেশের কথা বলিয়াছি, তাহাও সম্পূর্ণ না হোক, কিছু বুঝিতে পারা যাইবে। এখন সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে 'রস' নামে যাহার নামকরণ হইয়াছে, তাহাকে যদি একেবারে 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' না বলিয়া আর একটু ছোট করিয়া লই, আধুনিক সাহিত্যবিচারের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট হইবে। যদি বলি, সেই আস্বাদনটা একেবারে ব্রহ্ম-সমাধির মত নয়, অর্থাৎ একটা শূন্যানন্দে বুঁদ হওয়ার মত নয়,—শেষ পর্যন্ত একটা কিছুর চেতনা থাকে; এবং সেই আস্বাদনের বস্তুকে 'ব্রহ্ম' না বলিয়া এই আমার 'আমি' বলি, যদি বলি, ওই 'বোধ' আর কিছু নয় আমারই গভীরতর আত্মপরিচয়—যেন সকলের ভিতরে আমাকেই সর্বপ্রকারে অনুভব করিতেছি; সেই যে সহানুভূতি, সেই চিনিতে-পারা, সে আর কিছু নয়, আমার আমিটা প্রসারিত হইয়া সকলকে আলিঙ্গন করিতেছে,—সে যেন আমারই প্রবুদ্ধ আত্মচেতনা, তাহা হইলে বোধ হয়, কথাটা কতক পরিমাণে বোধগম্য হইবে। ব্রহ্মাস্বাদ নয় এই জন্য যে, সে আমার এই দেহ-চৈতন্যময় সত্তার আস্বাদ; সর্ববস্তুতে আমাকেই আস্বাদন করি বলিয়া—বস্তুর পৃথক বাধা আর থাকে না বলিয়া—তাহাতে একটি পরম তৃপ্তিবোধ হয়; কিন্তু তাই বলিয়া বস্তু একেবারে নস্যাৎ হইয়া যায় না, বরং তাহার পূর্ণ রূপটিই প্রকাশ পায়। ইহাকেই কেহ কেহ 'Perfection of Experience' বলিয়াছেন। ইহা ব্রহ্মাস্বাদের তুল্য কিনা বলিতে পারি না, কারণ ব্রহ্মকে সাধারণ মানুষ কখনও আস্বাদন করে নাই। আমি পূর্ব প্রবন্ধে আদর্শ-নাটকের প্রেরণা ও দর্শকচিত্তে তাহার প্রতিক্রিয়ার কথা বলিয়াছি—শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সৃষ্টিহিসাবেই নাটকের লক্ষণ বিচার করিয়াছি; সেই আদর্শ-নাটক রচনা ও তাহার অভিনয়-সাফল্য কি কারণে দুরূহ, তাহাও বলিয়াছি; এবার সকল কবিকর্মের মূলীভূত অভিপ্রায় যে এক, এবং সেই অভিপ্রায় যে কি, তাহাই পুনরায় যথাসাধ্য সবিস্তারে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। কারণ, সাধারণ নাটক সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলেও এই আদর্শকে সর্বদা সম্মুখে রাখিলে ভাল হয়—তাহাতেও মাত্রাভেদে ঐ লক্ষণ কিছু থাকা আবশ্যক।

অতঃপর আমি নিজেই নাটকের দুইটি শ্রেণী নির্দিষ্ট করিয়া লইতেছি—আদর্শ নাটক ও সাধারণ নাটক। এইবার সাধারণ নাটক সম্বন্ধে কিছু বলিব। এই সাধারণ নাটক যে সর্বকালীন বা সার্বভৌমিক সাহিত্য-সৃষ্টি নয়, তাহা বলাই বাহুল্য—তাহাতে সময়বিশেষে সমাজবিশেষের মনোরঞ্জন হইয়া থাকে, সেই প্রত্যক্ষ ফললাভই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। তথাপি সেইরূপ নাটকেও যে ভাবোদ্দীপনা থাকে, তাহাতেই এক ধরণের রসোদ্রেক হয়। কাঁচা ভাবই যে পাকা হইলে রসে পরিণত হয়, সেকথা পূর্বে বলিয়াছি, অতঃপর তাহাই সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। সাধারণ নাটকে ঐ ভাবোদ্দীপনা নিম্নস্তরেই থাকিয়া যায়, চিত্তকে ততটা গভীরভাবে নাড়া দেয় না, ধাক্কা দেয়—একটা উত্তেজনাপ্রসূত নেশার সৃষ্টি করে মাত্র। তথাপি সেই নেশারও দাম আছে। মানুষের নিতান্ত বাস্তব-পীড়িত মন উহাতেই কিছুক্ষণের জন্য বাস্তব-মুক্তির একটা সুখ অনুভব করে; বাস্তবকে খুব গভীররূপে রূপান্তরিত করিবারও প্রয়োজন হয় না, কেবল তাহাকে জীবনের মঞ্চ হইতে

ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিসঃ
৬নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
পোষ্ট বক্স—কলিঃ ২২৫৫
ফোন—কলিঃ ১২০৯
সাউথ ৫৩৩

শাখাসমূহঃ

দক্ষিণ কলিকাতা, কটক, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বেনারস, ক্যানিং টাউন, ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ), আগরতলা, খোয়াই, বিলোনিয়া (ত্রিপুরা রাজ্য), জামালপুর, নান্দীনা, সরিষাবাড়ী, আঠারবাড়ী, গোপালপুর, মোহনগঞ্জ, সেরপুর, সুসঙ্গ, ময়মনসিংহ, ফান্দক।

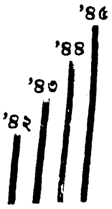
সর্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

পি সি রায় চৌধুরী,
জমিদার, আঠারবাড়ী ষ্টেট,
চেয়ারম্যান।

জি, চৌধুরী,
জেনারেল ম্যানেজার।

Gram:—Picomby

পূজায় আমাদের অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।



পাইওনিয়ার কমার্শিয়াল

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯৮।৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস ও ভিটামিন সংযুক্ত

বিশুদ্ধ তাল মিছরী

ভিটা-ফুড

নবজাত শিশুর আদর্শ খাদ্য গ্লুকোজের পরিবর্তে অবাধে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ভড় রিসার্চ

ল্যাবরেটরী

অফিস :
১৬৯, বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কলিকাতা এজেণ্ট :
বি, কে, পাল এণ্ড কোং

আমাদের গ্যারাণ্টিড ডবল বেনিফিট স্কীমে যোগদান করিয়া লাভবান হউন।

নিম্নলিখিত সুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়।

১	বৎসরের জন্য শতকরা	৫৲
২	" " "	৫॥০
৩	" " "	৬৲

আমরা আমাদের উক্ত স্কীমে সাধারণতঃ ৫০০৲ বা ততোধিক টাকা উপরোক্ত সুদের হারে গ্রহণ করিয়া ঐ টাকা শেয়ারে খাটাইয়া লাভের শতকরা ৫০৲ টাকা দিয়া থাকি।

পত্র লিখিলে আমাদের মাসিক শেয়ার মার্কেট রিভিউ পাঠান হয়।

আমরা ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জের সর্বপ্রকার শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয় করিয়া থাকি।

কমার্শিয়াল শেয়ার ডিলার্স

সিণ্ডিকেট লিঃ

গ্রাম—"কমারশিল্ড" ৩০।১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন—বি বি ৫৪৪১

সুপারভাইজিং ডাইরেক্টর—**মিঃ টি, দে, এম-এ, এফ্-আর-জি-এস্ (লণ্ডন)**

রঙ্গমঞ্চে তুলিয়া অভিনয়ের দ্বারা একটু শোধন করিয়া লইলেই হইল। তখন যাহাকে দেখিলে বিরক্ত হইতাম, যাহা অসহ্য বোধ হইত, যাহা ঘৃণা ও ভয় উদ্রেক করিত, তাহারই সেই অনুকৃতিমূলক অভিনয় সে সকলকে যেন নির্বিষ করিয়া তোলে—বাস্তবে যাহা বন্ধনের মত পীড়াদায়ক, তাহাই এক্ষণে মুক্তির মত প্রীতিকর হইয়া উঠে। আবার মানুষের মনে যে নিষ্ফল ক্ষোভ, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, সত্যভাষণের অক্ষমতা সঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যে সকল অভিযোগ প্রকাশের পথও পায় না, নাটক যখন সাক্ষাৎ ঘটনারূপে সেই সকল অভাব পূরণ করে, তখন ক্ষণেকের জন্যও সেই ভানকে সত্য মনে করিয়া আমাদের প্রাণ যেন ভারমুক্ত হয়; ইহাও একপ্রকার মুক্তি। কিন্তু সেখানেও ওই অভিনয়কে যে সত্য বলিয়া ভ্রম হয়, তার কারণ, আমরা যেন ইচ্ছা করিয়াই মনের চোখ বুজিয়া থাকি; তাহাতে প্রমাণ হয়, আমরা সে সময়ে একরূপ কল্পনার বশীভূত হই—সে কল্পনা কাব্য-উপভোগের কল্পনা নয়, অর্থাৎ নিছক ভাবমূলক নয়; জীবনকে খুব বড় করিয়া দেখিবার যে কল্পনা—তাহাও নয়; কারণ, এসকল নাটকে নিত্য-পরিচিত স্থূল বাস্তবের অনুকরণ থাকা চাই,—আমাদের অতি স্থূল রাগ-বিরাগের এবং কতকগুলি অভ্যস্ত ধারণার অনুকূলে না হইলে, আমরা এই ভানমূলক অভিনয়কে বরদাস্ত করিতে পারি না। তথাপি ইহাতেও আমরা যে একটা রস উপভোগ করি তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি যে আদর্শ-নাটকের কথা বলিয়াছি তেমন নাটকেও যে অতি-উচ্চ কল্পনার লীলা আছে, যে-কল্পনা —বাস্তব যাহাকে আড়াল করিয়া আছে, অথবা বাস্তব যাহার ইঙ্গিতমাত্র, সেই গভীরতর ও বৃহত্তর বাস্তবকে আমাদের চিত্তে প্রকাশিত করে,—সে কল্পনা এই সকল দর্শকের পক্ষেও দুরূহ নয়। কারণ, তাহাও কাব্যের নয়—নাটকের; অর্থাৎ সে কল্পনাও প্রত্যক্ষ অনুভূতিমূলক, বাস্তব না হইলেও বাস্তবের অনুকৃতিমূলক; নাটক যতই উচ্চাঙ্গের হউক, তাহার কারবার সুন্দর ভাষা ও সুন্দর ভাব লইয়াই নয়—প্রত্যক্ষ-দর্শন লইয়া; সেই প্রত্যক্ষ-দর্শনে যে ভাবের উদ্দীপনা হয় সেই ভাবই দর্শককে আবিষ্ট করে। সেইরূপ আবিষ্ট হওয়াকেই আমি একরূপ কল্পনার ক্রিয়া বলিয়াছি। অতএব উৎকৃষ্ট, অর্থাৎ আদর্শ-নাটক বা শ্রেষ্ঠ কবিকর্মের জন্য দর্শকমণ্ডলীর ঐ কল্পনাশক্তিকেই অধিকতর উদ্বুদ্ধ করিবার মত কবিপ্রতিভার প্রয়োজন, একদিকে দেশ কাল ও সমাজের কতকগুলি সাধারণ সংস্কারের অনুবর্তন করিতে হইবে, অপরদিকে সেই সকলকে অতিক্রম করিয়া, মনুষ্যসুলভ ভাবানুভূতির সাহায্যে জীবনের গভীরতর রহস্য চিত্তগোচর করাইতে হইবে—সাধারণ মানুষের অতি সাধারণ রঙ্গ-পিপাসাকেই উৎকৃষ্ট রস-পিপাসায় পরিণত করিতে হইবে। অতএব, এরূপ নাট্যকারকে শুধুই কবি হইলে চলিবে না,—তাহাতে উৎকৃষ্ট কাব্যরচনা হইতে পারে, বিদগ্ধ রসিকমণ্ডলীর চিত্তবিনোদন হইতে পারে, কিন্তু মানব-সাধারণকে সেই দৃষ্টির অধিকারী করা যাইবে না, যাহা নাটকের দ্বারাই সম্ভব। সে শক্তি অতিশয় দুর্লভ, একাধারে নাটক ও শ্রেষ্ঠ কাব্য জগৎ-সাহিত্যেও বিরল; তাই সাধারণ নাটকগুলি লইয়াই বিচার করিতে হয়।

(২)

তথাপি, পূর্ণ না হইলেও মাত্রাহিসাবে রসের উদ্রেক ঐ সাধারণ নাটকেও হইয়া থাকে, বা হওয়া সম্ভব—কেমন করিয়া, তাহারই একটু বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক। তৎপূর্বে একটি কথা আবার বলিয়া রাখি, উৎকৃষ্ট কাব্যরসে সকলের অধিকার না থাকিলেও মানুষমাত্রেরই একটা ভাব-জীবন আছে, সেই জীবনের উপযোগী কাব্যও চিরদিন রচিত হইতেছে—অশিক্ষিত গ্রাম্যসমাজেরও কবি আছে, তাহাদের রচিত লোকগাথা বা গীতিকথা যুগে যুগে সেই ভাবজীবন পুষ্ট করিয়া আসিতেছে। সেই কাব্য, আর কিছু না হোক, একটা বিষয়ের সাক্ষ্য দিতেছে—জনগণের চিত্তেও একরূপ রস-পিপাসা আছে। এইরূপ কাব্যপিপাসু যাহারা, তাহাদিগকে আমরা আমাদের কাব্যবৈঠকে প্রবেশের অধিকার না দিতে পারি, কিন্তু রঙ্গালয়ে নাটকের অভিনয়দর্শনে তাহাদের অধিকার অগ্রাহ্য করিতে পারি না; সেখানে আমাদের ভাবোদ্দীপনকালে তাহাদের সহানুভূতিও প্রত্যাশা করি। অতএব কাব্যরসাস্বাদনে যে জাতিভেদ আছে, নাট্যরস-আস্বাদনে তাহা নাই। এককালে আমাদের যাত্রা প্রভৃতির আসরে এই জাতিভেদ যে কিরূপ লুপ্ত হইত তাহা আমরা জানি; একালেও রঙ্গালয়গুলি বিদগ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলী বা কালচার-অভিমানী বিদ্বৎসমাজের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাহা হইলে সে ব্যবসায়ই লোপ পাইত। অতএব নাটক নামক এই যে বিশিষ্ট বাণীশিল্প, ইহার বিচারক অধিকাংশে সেই অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত জনগণ—যাহাদের কাব্যরসবোধকে আমরা শ্রদ্ধা করি না, আমাদের কবিগণও যাহাদের মুখাপেক্ষী নহেন; এমন কি, সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া তাহারাই নাটকের ভাগ্যবিধাতা। তবে কি, এইজন্যই নাটক কখনও উৎকৃষ্ট কবিকর্মের গৌরব দাবী করিতে পারে না? ঐ সাধারণত্বের উপরে সে উঠিতে পারে না? এই প্রশ্ন মীমাংসার জন্যই আমি মানুষমাত্রেরই স্বাভাবিক কাব্যরসপিপাসার উল্লেখ করিয়াছি; সেই কাব্যরসবোধ ও এই নাট্যরসবোধের মধ্যে একটা যোগ নিশ্চয়ই আছে; সে যোগ আর কিছুই নয়—অতি সহজ ও সুস্থ মানবসুলভ ভাবাকুলতা বা ভাবগ্রাহিতা। যে ভাবানুভূতি তাহাদের সেই কাব্যে অতিশয় সরল উচ্ছ্বাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহাই নাটকের কলাকৌশলে অতি গভীর তলদেশ পর্যন্ত আলোড়িত হয়। ঐ সরল স্বাভাবিক ভাবগ্রাহিতাই উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সকল নাটকের উপজীব্য, এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় সমাজেরই উহা সাধারণ সম্পদ—দুইয়ের পার্থক্য নানাবিধ সংস্কার বা মানস অভিমান লইয়া। নাটক যে পরিমাণে ওই ভাবগ্রাহিতার অনুকূলে হয়, সেই পরিমাণেই তাহা রসসমৃদ্ধ হইয়া থাকে; আদর্শ না হইলেও আদর্শের নিকটবর্তী হয়।

আদর্শ নাটকের সহিত সাধারণ নাটকের এই সম্পর্কে বুঝিয়া লইলে নাটক-বিচারে আর বাধা থাকে না। আদর্শ আদর্শই,—তাহার পূর্ণ লক্ষণ নাটকমাত্রেই না থাকিতে পারে, কিন্তু ওই একটা লক্ষণ যেখানে যতটুকু বিদ্যমান ততটুকুই নাটকের সার্থকতা। মানুষের সর্ববিধ সংস্কার—তাহার সেই স্থূল আত্ম-সন্তোষ এবং স্থূলতর বাস্তবাভিমান—সত্ত্বেও, সেই মানবসুলভ রসপিপাসা ও ভাবগ্রাহিতাকে উদ্ধার বা জাগ্রত করিয়া, একবারও চকিতে তাহাকে তাহার সেই স্বরূপ-আমিটার মুখোমুখি করিয়া দেওয়া যে অসম্ভব নয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি; ইহাও বুঝি যে, একমাত্র নাটকেই তাহা সম্ভব। আধুনিক নাট্যকার যদি তাহা না পারেন বা না করেন, তবে তাহার কারণ নিশ্চয় স্বতন্ত্র। আধুনিক জীবনে মানুষ সেই আমিটাকে মোহাচ্ছন্নের মত ভুলিয়া থাকিতে চায়—বিরোধী সংস্কার এতই প্রবল যে, তেমন অনুভূতির অবকাশমাত্র নাই। এজন্য সেই বিরোধী সংস্কার-গুলাকেই প্রশ্রয় দিয়া, তাহারই অনুরূপ আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়-ভাবনাকে—ভাব নয়, চিন্তার আকারে—উজ্জ্বল করিয়া তোলাই চতুর নাট্যকারগণের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া স্বাভাবিক। সকল যুগের নাট্যকারকেই সমসাময়িক প্রবৃত্তির অনুবর্তন করিতে হয়। কিন্তু এ যুগে তাহারই উপর আর একটা প্রবৃত্তি প্রবল হইয়াছে; পূর্বে যেমন ঐ স্থূল বাস্তব-সংস্কারের ফাঁকে ফাঁকেই—যাহার যেমন শক্তি—ভাবও মিশাইবার চেষ্টা থাকিত এবং তাহাতে নাটকের স্বধর্ম কিছুও বজায় থাকিত, এখন তৎপরিবর্তে ঐ সজ্ঞান ও উদ্ধত সংস্কারের সুযোগ লইয়াই রীতিমত মত-প্রচার-কর্ম চলিতেছে। নাট্যকারেরও সুবিধা হইয়াছে—দর্শকচিত্ত আকর্ষণ করা সহজ হইয়াছে বলিয়াই সেই চিত্ত উদ্বোধন করার যে দুরূহ কবিকর্ম, তাহা আর প্রয়োজন নাই; মনের উপরিতলের সর্বপ্রকার উত্তেজনাকে আশ্রয় করিয়া নাটকগুলিকে অতি সহজে সফল করা যায়।

এই জন্য জনগণমনোরঞ্জনের যে কঠিন দায়িত্ব এক অর্থে নাটকের উৎকর্ষের নিদান ছিল, তাহাই এক্ষণে তাহার অপকর্ষের হেতু হইয়াছে। এইজনাই আধুনিক সমালোচকের মুখে এমন কথাও শোনা যায় যে,—

—"A great success is a bad play; and—rarer but not inconceivable case—that a dismal failure is a masterpiece".

অর্থাৎ, যে-নাটক অতিশয় জনপ্রিয় হয়, তাহাই অতি নিকৃষ্ট, এবং যে-নাটক কিছুমাত্র অভিনয়সাফল্য লাভ করে নাই, তাহাও নাটকহিসাবে উৎকৃষ্ট হওয়া আদৌ অসম্ভব নয়। অতএব এই অতি আধুনিক নাটকের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমার পূর্বের সেই বক্তব্য অনুসরণ করি,—সাধারণ নাটকেও রসোদ্রেক হয় কেমন করিয়া? সে কেমন রস? সেই সহজ ভাবানুভূতির সহিত তাহার সম্পর্ক কি?

আমি পূর্বে বলিয়াছি,—সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তিঘটিত কতকগুলি নিত্য-অভিজ্ঞতার একটা প্রতিরূপ বা ভান—বাস্তবেরই একরূপ অনুকৃতি আমাদের চিত্তে রসসঞ্চার করে। এই বাস্তব-অনুকৃতিই নাটকের প্রাথমিক কবিকর্ম,—ইহাও যেমন সত্য, তেমনই বাস্তবকে বিস্মৃত হইবার যে একটা অবুঝ বাসনা আমাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা চরিতার্থ করাও নাটকের একটি বৈধ কর্ম। আমরা জীবনে যাহার স্বপ্ন দেখি,—সেই সবলের শাস্তি, দুর্বলের পুরস্কার, আত্মঘাতীর মহত্ত্ব, অহেতুক প্রেম, দৈবের লীলা প্রভৃতির মূল্যও

কম নয়, এমনকি, কোন কোন সমালোচকের মতে উৎকৃষ্ট নাটকও এইরূপ মেলোড্রামা (melodrama) মিশ্রিত থাকে বলিয়াই তাহা এমন উপাদেয় হয়। আসল কথা, এইরূপ ভাবোদ্দীপনা যদিও মাত্রাতিরিক্ত হয়, তথাপি তাহা মানুষের ভাব-জীবনের বিরোধী নয়—তাহাতে মানুষের একটা সত্যকার পিপাসা চরিতার্থ হয়; অনেক সময়ে তাহা দ্বারাই আমাদের চিত্তের ভাবাধিক্য প্রশমিত হইয়া থাকে। এইরূপ মেলোড্রামাই যদি কোন নাটকের সর্বস্ব হয়, তবে সে নাটক নিকৃষ্ট বটে, তথাপি তাহাও মানুষের স্বভাবসুলভ চিত্তবৃত্তিকে অবাধ প্রশয় দিয়া, নাট্যকলা না হউক, তাহার ভাবজীবনের পুষ্টি সাধন করে; শুধু তাহাই নয়, সেই ভাবাতিরেকের কারণে, নাটকবিশেষের মাহেন্দ্রক্ষণে, এমন গভীর অনুভূতির উদয় হইতে পারে, যাহাতে সে আপনাতে আপনি মগ্ন হইয়া যায়—সজ্ঞান আমিটাকে হারাইয়া আসল আমিটাকে মুহূর্তের জন্যও ফিরিয়া পায়। সমগ্র নাটকখানিতে পূর্ণ রস-রূপের বিকাশ না হইলেও, এইটুকু কম কি?

আমাদের বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এককালে এরূপ বহু নাটকের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। প্রথমে পৌরাণিক নাটক,—তাহাতে সেই পুরাতন যাত্রারই একটু জীর্ণ-সংস্কার করিয়া আমরা জীবনের একটা প্রাকৃত আদর্শের ভাব-রস পান করিতাম। বাংলা অপেরা বা গীতিনাট্যও আমাদের সেই পিপাসা আর একরূপে তৃপ্ত করিত। অন্যদেশে এরূপ নাট্যকলায় গীতিরসই মুখ্য, আমাদের তত্টা নয়; তথাপি ওই পৌরাণিক নাটক ও এই জাতীয় নাটকে প্রভেদ এই যে, একটিতে একটি বিশেষ আদর্শের বন্ধন আছে, অপরটিতে অতিশয় হাল্কা ভাব ও স্বাধীন কল্পনারই আধিপত্য। আমাদের নাটকের প্রথম অবস্থা ছিল এইরূপ, তখনকার জনপ্রিয় নাটক ছিল—সতী-নাটক, প্রহ্লাদ-চরিত্র; পরে চৈতন্যলীলা, বিল্বমঙ্গল; গীতিনাট্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—আলিবাবা, আবুহোসেন।

পরে এই ভাব-রস-পিপাসাকেই সম্বল করিয়া আমাদের রঙ্গমঞ্চে রীতিমত নাটকের প্রবর্তন হইয়াছিল; ফল মন্দ হয় নাই, বাঙালী এক নূতন অভিনয়-কলা ও নূতনতর রসের আস্বাদনে মাতিয়া উঠিয়াছিল। যে ইমোশন বা ভাবোচ্ছ্বাস আমাদের জাতিগত চরিত্র-লক্ষণ, তাহাকেই পৌরাণিক ভক্তি-রস এবং কাল্পনিক আখ্যান-রস হইতে ফিরাইয়া, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখ, ভয়-ভাবনার অভিমুখী করিয়া, যেটুকু বাস্তবের স্পর্শ লাভ সম্ভব হইয়াছিল, তাহাতেই রীতিমত নাটকের সূত্রপাত হয়। 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' বা 'নীলদর্পণ' সে বাস্তবকে রসলোকে স্থাপন করিতে না পারিলেও, আমাদের রঙ্গমঞ্চে একটা নূতন হাওয়া বহাইতে পারিয়াছিল, শেষে সামাজিক নাটকের নিয়োগান্ত আখ্যান বস্তুটাই রসোদ্রেকের বড় সহায় হইয়াছিল। আর একপ্রকার নাটক আমাদের রঙ্গমঞ্চে একটি বিশেষ মর্যাদা লাভ করিয়াছিল, ইহাকে রোমাণ্টিক বা কাব্যপ্রধান নাটক বলা যাইতে পারে,—বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য রোমান্স ও শেকস্‌পীয়ারের নাটক ইহার সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ জন্মহেতু; ইহাই আমাদের কল্পনা-প্রধান বা কাব্যপন্থী নাটক; ইহাতে সামাজিক গদ্যনাটকের মেলোড্রামা কতকটা ঢাকা পড়িত। বাংলা নাটকের এই কাহিনী হইতে দুইটি বিষয় স্পষ্ট হইয়া উঠিবে, প্রথম—জাতির ভাবজীবনের উপরেই নাটকের ভিত্তিস্থাপন হয়; দ্বিতীয়—মানবচিত্তের সহজ ভাবাকুলতা উৎকৃষ্ট নাটকীয় কল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলেই উৎকৃষ্ট নাটকের জন্ম হয়; সে পক্ষে বাধা থাকিলেই নাটক উচ্চস্তরে উঠিতে পারে না, সাধারণ স্তরেই থাকিয়া যায়; মঞ্চ হিসাবে সাফল্যলাভ করে বটে, কিন্তু স্থায়ী সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে না। আমাদের নাটক যে উৎকৃষ্ট কবিকর্ম বা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যপদবাচ্য হইতে পারে নাই, সে কথা বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচকেরাও বলিয়াছেন, আমিও তাহাই বলিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া, আমাদের দেশের আপামর-সাধারণ এতদিন ধরিয়া যে বস্তুকে প্রাণের সহিত উপভোগ করিয়াছে, তাহা যে অভিনয়যোগ্য কোন একজাতীয় নাটক, তাহাতে সন্দেহ কি? আদর্শের কথা ছাড়িয়া দিলেও সাধারণ নাটক হিসাবে তাহাদের নিশ্চয় কিছু কৃতিত্ব আছে। ইহাও সত্য যে, হাস্যরসাত্মক প্রহসন প্রভৃতিতে এবং গীতিনাট্যে আমরা কিছু সাফল্যলাভ করিয়াছি; তাহাতে প্রমাণ হয়, আমরা বাস্তব ও কল্পনা এ দুইয়েরই রস পৃথক্‌ভাবে আস্বাদন করিবার সামর্থ্য রাখি; কিন্তু কল্পনা

ও বাস্তবের উম্বাহে যে বৃহত্তর রস-সত্যের জন্ম হয়, তাহার আস্বাদন আমাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। জীবনের বাস্তবকে মন্থন করিয়া তাহার রস আস্বাদন করিবার যে শক্তি, তাহার জন্য জীবন-চেতনাও খুব গভীর হওয়া চাই—জীবনযাত্রার পরিধি যেমন বিস্তৃত, তাহার ভাব ও অভাব তেমনই জটিল হওয়া আবশ্যক। আমরা জীবনকে যতদূর সম্ভব ফাঁকি দিয়া, কোন রকমে তাহার সহিত আপোস করিয়া, নির্বিঘ্ন শান্তিসুখ ভোগ করিতে চাই,—তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাহার অসীম ভাণ্ডার লুঠ করিবার প্রবৃত্তি বা সাহস আমাদের নাই। এই জন্য আমাদের কল্পনাও যেমন সঙ্কীর্ণ, ভাবানুভূতিও তেমনই অগভীর ও অসংযত; এজন্য রোমাণ্টিক কমেডিই হোক আর ট্র্যাজেডিই হোক, কোনটাই সুসম্পন্ন হইতে পারে না—সকলই মেলোড্রামায় পর্যবসিত হয়।

কিন্তু ঐ মেলোড্রামাও মূল্যহীন নয়, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি; উহা দ্বারাও আমাদের চিত্তে যে ভাব-স্ফুরণ হয়, তাহার কল্পনা সুস্থ বা সংযত না হইলেও, তাহা যে বাস্তবাতিরিক্ত একটা কিছুর পিপাসা বহন করে, ইহাও সুলক্ষণ; কারণ, উহাতে রসাস্বাদন না থাকিলেও রস-পিপাসা আছে, অর্থাৎ বাস্তব-আমিটার ক্ষুদ্র গণ্ডি পার হইবার আকাঙ্ক্ষা আছে। আমাদের সেই নাটকগুলিতে অন্তত সেটুকুর কাজ হইত। কাঁচা ভাবগুলো পাক হইয়া রসে পরিণত হইত না সত্য, কিন্তু সেই ভাবের বাড়াবাড়িতে চিত্তের কিছু কর্ষণ হয়, নিতান্ত দেনা-পাওনার জগৎ হইতে মন একটু মুক্তিলাভ করে, ভাবের আবেগে 'আমি'টার গৌরব বৃদ্ধি হয়। সে যুগে আমাদের সমাজে যে অতিরিক্ত ভাব-স্বপ্ন, আশা ও উল্লাসের স্রোত বহিয়াছিল, এবং শেষে যে নূতন ভাবধারা—স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তার আবেগ—অতিমাত্রায় প্রবল হইয়াছিল, বাংলা রঙ্গমঞ্চেও তাহার প্রভাব নিষ্ফল হয় নাই; সে দিক দিয়া নাটকের প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছিল, সাধারণ নাটকের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

ইহাই সাধারণ নাটক। ন্যায়ের, ধর্মের, মহত্ত্বের, সত্যের যে নানা সংস্কার বা আদর্শ বাস্তবজীবনে মিথ্যা হইয়া থাকে, তাহাকে জয়ী করিয়া, অথবা তাহার বিপরীতকে ধিক্কৃত করিয়া একটি সুগভীর আত্মপ্রসাদের সুযোগ আমরা এই সকল নাটকে পাইয়া থাকি,—এক কথায়, যে poetic justice-এর প্রতি আমাদের একটা প্রাণগত আকর্ষণ আছে, তাহারই সুনিপুণ সংঘটন সাধারণ নাটকের উচ্চতর বা গুরুতর কৃতিত্ব। ইহাতে আমাদের ভাবপ্রবণতার তৃপ্তিসাধন হয়। ঐ ভাবপ্রবণতা আমাদের প্রকৃতিগত; আমরা কিছুতেই বুঝিতে চাহি না যে, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, সত্য-মিথ্যা, এ সকলের মূলে আমাদেরই মনের সংকীর্ণতা আছে—অতিসূক্ষ্ম স্বার্থ-সংস্কার আছে; জীবন বা জগতের গভীরতর সত্য তাহা অপেক্ষা অনেক বড়। সেখানে পাপী ও সাধুর মধ্যে কোন ভেদ নাই; মানুষ সাধুও নয় অসাধুও নয়, মানুষ মানুষ। আমাদের সেই সংস্কারকে দূর করিয়া মানুষের সেই রূপটি দেখাইতে পারা সাধারণ কবিকর্ম নয়। তাই সাধারণ নাটকে আমরা যে poetic justice চাই তাহার জন্য ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্যকে স্পষ্ট পৃথক্‌রূপে চিত্রিত করিতে হয়, আমাদের ভাবানুভূতিকে একটা নিম্ন ভূমিতেই জাগাইয়া রাখিতে হয়। যদি তাহা না করিয়া নাট্যকার সেই ভাবপ্রবণতাকেই অন্যমার্গে প্রবর্তিত করিতে পারিতেন, তবে আমরা দেখিতাম, সকল মানুষের মূলে সেই এক মানুষ—বহুবিচিত্র তার রূপ; কিন্তু কাহাকেও পাপী বা কাহাকেও পুণ্যাত্মা বলিয়া লেবেল মারিয়া দেওয়া অসম্ভব। এই জন্যই বাস্তব সমাজে আমরা মানুষকে যে চক্ষে দেখি, উৎকৃষ্ট নাটকের পাত্রপাত্রীকে সে চক্ষে দেখি না,—মনের সংস্কার দূর হয় না বটে, কিন্তু ভিতরে একটা অপূর্ব অনুভূতি হয়; যেন বাহিরের 'আমি'টাকে ফাঁকি দিয়া, তাহাকে লুকাইয়া, ভিতরে একটা সদাজাগ্রত অদ্ভুত 'আমি' সেই রস আস্বাদন করিতে থাকে—বাহিরের আমিটা লুপ্ত হয় না বলিয়াই বাস্তব-চেতনাও লোপ পায় না। রস-আস্বাদনকালে চর্বিত বস্তুটাকেও অনুভব করি, এই জন্যই সে রস এমন অপূর্ব বোধ হয়। এই জীবন ও এই জগৎকেই আমি তখন আর এক রূপে ভোগ করি; একটু সূক্ষ্ম করিয়া বুঝিতে গেলেই দেখিতে পাইব—আমার 'আমি'টাই বড় হইয়া গিয়াছে; ঐ রসাস্বাদ আর কিছু নয়, জগৎ ও জীবনকে উপলক্ষ্য করিয়া আমারই আত্মানুভূতি; সে অনুভূতি একেবারে ব্রহ্মে লীন হইবার প্রয়োজন নাই—হয়ও না, কারণ সেও একটা experience' তাহাতে জীবনের ছায়াও যেমন আছে, তেমনই

সেই ভিতরের 'আমি'র সংগে বাহিরের 'আমি'র লুকোচুরীও আছে; কেবল, সেটা সাধারণ Experience নয়—Perfection of Experience.

কিন্তু ঐ রসের উৎপত্তি বাস্তব ভাবানুভূতি হইতেই হইয়া থাকে—জ্ঞান, চিন্তা বা বিতর্ক-বুদ্ধি হইতে নয়; ঐ ভাবগুলিই নাট্যকারের প্রধান অবলম্বন; কেবল শক্তির অভাবে তাহা সাধারণ নাটকের বা মেলোড্রামার একমাত্র উপজীব্য হইয়া থাকে। তথাপি, বরং ঐ ভাবের আধিক্যও ভাল, তাহাতে আর কিছু না হোক, রসোদ্রেকের সম্ভাবনাও থাকে; এই কারণে, উৎকৃষ্ট কবিকর্ম বা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যপদবাচ্য না হইলেও, এই সকল নাটকেরও একটা মূল্য আছে। অনেক সময়ে—এবং তাহাও প্রয়োজন—নাটকের সাফল্য নাট্যকার অপেক্ষা অভিনেতার উপরে অধিকতর নির্ভর করে। বস্তুতঃ অভিনয় নাটকলার একটি প্রধান অংগ, অভিনয়ের গুণেও নাটকের অসম্পূর্ণতা অনেক পরিমাণে দূর হয়। কিন্তু অভিনয়পটুতা অভিনেতার ব্যক্তিগত সম্পদ, তাই তাহার স্থায়িত্ব নাই; তেমন নাটক অভিনেতার সংগে সংগেই রংগমঞ্চ হইতে অন্তর্ধান করে। কিন্তু নাটক যদি উৎকৃষ্ট হয়, তবে তাহা যেমন অভিনয়যোগ্য তেমনই পাঠযোগ্যও হয়; সেই নাটকই সাহিত্যে স্থান পায়, তাহাকেই 'Literary Drama' বলে।

(৩)

আমার এই আলোচনায় আমি সাধারণ নাটক সম্পর্কে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে একটা কথার বড়ই পুনরুক্তি করিয়াছি—কথাটা অতি সহজ ও সামান্য, তথাপি এ প্রসংগে আমি তাহাকেই বিশেষ মূল্যবান মনে করি। নাটকের আদি ও মূল আশ্রয় কতকগুলি ভাব; এই ভাব বলিতে কি বুঝি তাহাও বার বার বলিয়াছি। এই ভাব কোনরূপ মানস-বৃত্তি নয়—যদিও সংস্কাররূপে সর্বদা আমাদের মধ্যে রহিয়াছে। ইহা আদৌ প্রত্যক্ষ অনুভূতি-সাপেক্ষ,—নানারূপ আঘাতে আমাদের চিত্তে সমুৎপন্ন হয়; ইহা হইতে যে সূক্ষ্মতর ভাবের সৃষ্টি হয়, তাহারই নাম 'সেণ্টিমেণ্ট'; এই সেণ্টিমেণ্টই শেষে রস-পরিণতি লাভ করে। অতএব মূলে ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়; নাটক এই প্রত্যক্ষ অনুভূতির সেবা করিয়া থাকে। অতএব যাহা হৃদয়ে ধাক্কা না দিয়া মস্তিষ্কে হানা দেয়, তাহা খাঁটি নাটকীয় বস্তু নয়। ন্যায়, সত্য, নীতি (কর্তব্যাকর্তব্যের সমস্যা) নাটকের উপজীব্য বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা দর্শকের চিত্তে সেই সমস্যা-সমাধানের একটা মানসিক আগ্রহ সৃষ্টি এবং তাহারই কোনরূপ তৃপ্তি সাধন হইবে না; সেই সমস্যাও সংকটের আকারে আমাদের হৃদয়ে কেবলমাত্র কোন-না-কোন ভাবের উদ্দীপন করিবে, এবং সেই ভাবোদ্দীপনাই আমাদের চিত্তকে ভাব হইতে রসে পৌঁছাইয়া দিবে। ভাব হইতে ভাবেই নাটকের উৎপত্তি, বিকাশ ও লয়; সকল চিন্তা সকল সমস্যা ভাবের আকারেই হৃদয়ে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে,—হয় বলিয়াই, যেখানে মানুষে মানুষে বিদ্যাবুদ্ধি বা মতবাদের ভেদ বা বিরোধ নাই, সেইখানেই নাটকের অবাধ গতি ও পরিণতি। আধুনিক নাটকে ওই বুদ্ধি এবং মানসিক সূক্ষ্মতার দিকটাই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে, মানুষ সেখানে দর্শক নয়—শ্রোতা, রংগমঞ্চও বক্তৃতামঞ্চ হইয়া উঠে। এই সকল নাটকে ঘটনা অপেক্ষা রটনাই বেশি থাকে,—আধুনিক কালের তত্ত্ববিলাসী কৃত্রিম-জীবন-জীবী যন্ত্রসদৃশ মানুষ তাহা যে কারণে ও যে প্রকারে উপভোগ করে, তাহাতে নাট্যকলার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন হয় না। পাঠ্যনাটক হিসাবে এ সকলের মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু সেই সংগে খাঁটি দৃশ্যকাব্য হইবার যোগ্যতা ইহাদের নাই। আমাদের দেশে এখনও এইরূপ খাঁটি 'আধুনিক' নাটকের প্রসার হয় নাই,—চিন্তার যেটুকু খোরাক তাহাতে থাকে, তাহা অপেক্ষা মেলোড্রামার উপাদান বেশি মিশাইতে হয়। অতিশয় বর্তমানে, "economic problem of love in a cottage" অথবা, ধনী-দরিদ্রের উৎকট অবস্থা-বৈষম্য এবং তজ্জনিত গভীর চিত্ত-বিক্ষোভ—বিদ্রোহ ও নৈরাশ্য—অধিকাংশ নাটকের উপজীব্য হইয়াছে; কিন্তু স্পষ্ট উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া—মেলোড্রামাতেও যাহা থাকে, ইহাতে তাহাও সব সময়ে থাকে না, বরং "utter lack of truth and nature" লক্ষিত হয়; তথাপি ক্ষুব্ধ, অসুস্থ, বাস্তব-পীড়িত জনমণ্ডলী তদ্দ্বারা তাহাদের রুদ্ধ নিরাশার আক্রোশ কতকটা প্রশমিত করিবার সুযোগ পায়। একদিক দিয়া দেখিলে ইহাও ভাল, কারণ, ইতি-পূর্বে, আমাদের রংগমঞ্চের আবহাওয়া অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িয়াছিল—ইংরাজী রংগমঞ্চ সম্বন্ধে একজন সমসাময়িক নাট্য-সমালোচক যাহা বলিয়া-


"শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও...
জননী এসেছে দ্বারে" ---
বাতায়ন পথে শরতের সোনালি আলো। কাশের বনে ঢেউ তুলে উড়ে যায় বলাকা-শ্রেণী। উৎসবের আমন্ত্রণ লিপি বয়ে নিয়ে আসে প্রস্ফুটিত কুমুদ কহ্লার। হাসিভরা মুখে উদ্বেল হয়ে ওঠে নতুন জীবনের আলো আর আকাশে বাতাসে উচ্চকিত হয়ে ওঠে শরতের আগমনী। শ্রীকল্যাণ ও ভৃঙ্গসার তৈলে দেহমন স্নিগ্ধ ও সুরভিত করবার এই ত সময়।
শ্রীকল্যাণ এবং ভৃঙ্গসার
কেশ তৈল
CONARTS
জেম কেমিক্যাল ঃঃ কলিকাতা

ছিলেন, এখানেও তাহা সত্য হইয়া উঠিয়াছিল, যথা—

"The theatre is supported by the most Philistine section of the middle class, and by the worse than Philistine, the utterly frivolous section of the upper class."

এখন জাতি ও সমাজের অবস্থার পরিবর্তনে রঙ্গালয়ে আর ঠিক সেই ধরণের আমোদ-পিপাসুর জনতা হয় না—শ্রোতৃবর্গের মনোভাব পূর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধাপূর্ণ হইয়াছে। তথাপি—

"Pleasure, and that of the least elevating sort is all that the public expects or will accept at even our best theatres."

—ইহা সব দেশে সব কালে সত্য; সেই অলস প্রমোদ-পিপাসাকে শ্রেষ্ঠ রস-পিপাসায় উদ্বুদ্ধ করাই ত' প্রতিভাবান নাট্যশিল্পীর কাজ। আধুনিক কালে সিনেমা-শিল্প তাহার ঘোরতর অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে, মানুষের অতি স্থূল মানস-লালসা নিবৃত্তি করিবার—তাহার স্বাভাবিক ভাবজীবন ত' নহেই—তাহার মানস-জীবনকেও পঙ্গু করিবার—এমন উপায় আর নাই।

ইংরাজীতে যাহাকে 'Literay Drama' বলে, আমাদের সাহিত্যে ও রঙ্গমঞ্চে এখনও তাহার যুগপৎ আবির্ভাব ঘটে নাই; 'Nature and truth,' অথবা অতি উচ্চ 'poetic truth' কোনটাই আমাদের নাটকে সুসম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে নাই, তাই আমাদের সাহিত্যে নাটকের স্থান অতিশয় সংকীর্ণ। আমি যাহাকে উৎকৃষ্ট কবিকর্ম বলিয়াছি তাহাই 'Literary Drama' বা সাহিত্যিক লক্ষণাক্রান্ত নাটক; সেরূপ নাটকে কেবল বাস্তবভেদী কবিকল্পনাই যে আধিপত্য করিবে, তাহা নয়; আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের গুরুতর দিকটিও তাহাতে প্রতিফলিত হইবে; তেমন নাটকে সামাজিক প্রসঙ্গ বা নীতি-ঘটিত সমস্যা—রঙ্গমঞ্চ ও পাঠগৃহ, উভয়ত্র—সমান রসবৎ হইয়া উঠিবে। আমাদের অধিকাংশ নাটক যেমন অভিনীত হয় তেমন পঠিত হয় না; কিন্তু তদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, তাহাই খাঁটি নাটক, কারণ—অভিনয় ব্যতীত তাহার রসাস্বাদন অসম্ভব। যে-নাটক অতিশয় সুপাঠ্য তাহা অভিনয়-সাফল্য লাভ করিতে না পারে, কিন্তু যে-নাটক অভিনয়-সাফল্য লাভ করিয়াছে, অথচ পাঠ্য হিসাবে অচল, তাহার ভিতরকার বস্তু খাঁটি না হওয়াই সম্ভব। আবার, নাটক সুপাঠ্য হইলেই তাহা যে অভিনয়যোগ্য হইবে না, এমন নয়; দোষ রঙ্গমঞ্চের হইতে পারে, দর্শকমণ্ডলীরও হইতে পারে—অনেক সময়ে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। একখানি বাংলা নাটকের কথা স্মরণ হইতেছে—কিছুকাল পূর্বের কথা; নাটকখানির নাম 'শুভ-যাত্রা'—লেখকের নাম, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মজুমদার। ঐ নাটক তখনও মুদ্রিত বা অভিনীত হয় নাই—পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়াই মুগ্ধ হইয়াছিলাম; তাহার রচনানৈপুণ্যও যেমন, নাটকীয় কলা-কৌশলও তেমনই। ঠিক ঐ ধরণের নাটক আমাদের সাহিত্যে দেখি নাই; গঠনে ও পরিকল্পনায় অষ্টাদশ শতাব্দীর নব্য ক্লাসিক্যাল জার্মাণ নাটকের মত। উহাতে একটি অতিশয় বাস্তব জীবনের অবস্থা-সঙ্কটকে ধাপে ধাপে এমন একটি নাটকীয় পরিস্থিতিতে পরিণত করা হইয়াছে—অতিশয় অল্পকালের মধ্যে এবং স্বল্পতর উপ-করণের সাহায্যে, এমন জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে যে, পাঠকালে সারা চিত্ত উন্মুখ ও একাগ্র হইয়া উঠে। শুনিয়াছি ঐ নাটক রঙ্গালয়ে অভিনয়-সাফল্য লাভ করে নাই। ইহার কারণ দুইটি হইতে পারে—(১)"A frivolous public calls for frivolous plays, and frivolous plays breed a frivolous public"; (২) ঐ নাটকের কবিকর্ম যতই উচ্চাঙ্গের হউক, উহার সেই অবস্থাসঙ্কট যতই নাটকীয় হউক, তাহাতে নীতিঘটিত প্রশ্নই প্রবল, তাই দর্শকের হৃদয়-বৃত্তিকে তেমন উত্তেজিত করে না; যেটুকু ভাবা-বেগের সৃষ্টি হয় তাহাও ঘটনার অন্তিম বিস্ফোরণে তেমন মুক্তিলাভ করে না। তথাপি, এই বিচার হয় ত' ঠিক হইল না, আমি 'literary drama'র দৃষ্টান্তস্বরূপ এই নাটকখানির উল্লেখ করিলাম; হয়ত ইহার রং আর একটু ঘোরালো হইলে এই নাটকও একখানি খাঁটি—অর্থাৎ সর্বাংশে উৎকৃষ্ট অভিনয়যোগ্য—নাটক হইতে পারিত; কিন্তু তাহাতে কি উহার নিজস্ব রসপ্রেরণা ক্ষুণ্ণ হইত না? সত্যই এ বড় কঠিন সমস্যা।

এই প্রবন্ধে আমি যে অন্য নানাজাতীয় নাটকের উল্লেখ করি নাই, তাহারা নাট্যকলার বিভিন্ন বিকাশ বলিয়া স্বীকৃত হইলেও, আমার সংজ্ঞা অনুযায়ী খাঁটি নাটক নহে। নরনারীর প্রেমও আজিকার সাহিত্যে (হয়ত জীবনেও) একটা সূক্ষ্ম মানসবস্তু হইয়া উঠিয়াছে,—তাহাও যে কিরূপ সাহিত্যকলার বিষয় হইতে পারে—রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' তাহার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তাহাতে যেমন দেহ-আত্মার সেই পরম রহস্যময় মিলনোৎকণ্ঠার অবকাশ নাই, এবং সেই প্রেমও যেমন সত্যকার প্রেম নয়,—তাহাতে যেমন স্বাভাবিক জীবন-চেতনার একান্ত দুর্বলতা লক্ষিত হয়,—তেমনই, সূক্ষ্ম মানস-পিপাসা নিবৃত্তির জন্য যে ধরণের নাটক রচিত হইয়া থাকে, কেবল বিচিত্র রূপকর্ম হিসাবে যাহা মূল্যবান—সেই সকল 'নৃত্য-নাটক', 'সঙ্গীত-নাটক' বা 'চিত্র-নাটক' সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। আবার যাহার নাম 'রূপক'-নাটক তাহাও ভাবস্বপ্নমূলক, অতএব খাঁটি নাটক নয়, এজন্য আমি বর্তমান প্রসঙ্গে তাহাদের উল্লেখ করি নাই।

এই দীর্ঘ আলোচনা এইবার শেষ করিব। নাটক সম্বন্ধে এমন বহু প্রশ্ন আছে যাহার মীমাংসা বাদাবিতর্কসঙ্কুল। কেবল দুইটি প্রশ্ন বড়ই সঙ্গত ও প্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হয়, দুইটিই সাহিত্যিক প্রশ্ন—ঠিক নাট্য-জিজ্ঞাসা নয়। একটি, —সকলে মিলিয়া নাটক দেখিবার তাৎপর্য কি? রঙ্গমঞ্চে তাহার অভিনয়ের প্রয়োজনীয়তা যেমনই হোক, নাটক কি একা উপভোগ করিবার বস্তু নয়? এখানে একটা যে প্রশ্ন উঁকি দিতেছে তাহা নূতন নয়; একদা এক বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক বলিয়াছিলেন, রঙ্গমঞ্চে শেকস্‌পীয়ারের নাটকের অভিনয়দর্শনকালে তিনি কখনও তৃপ্তিবোধ করিতেন না; সে অভিনয় যতই উৎকৃষ্ট হোক, তথাপি মূল নাটকপাঠে তাঁহার মনশ্চক্ষে যে জগৎ উদ্ঘাটিত হইত তাহার তুলনায় ঐ অভিনয়ের জগৎ নিতান্তই সঙ্কীর্ণ—তাহাতে শেকস্‌পীয়ারের কল্পনার যেন পক্ষচ্ছেদ হয়। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, উক্ত সাহিত্যিক নিজস্ব রুচি ও রসবোধের স্বাধীনতা দাবী করিতেন। কারণ, যাহা সকলকে মুগ্ধ করে তাহাই যে তাঁহাকেও মুগ্ধ করিবে, তিনি ইহা সঙ্গত মনে করিতেন না। ইহার আরও অর্থ এই যে, নাটক যত উৎকৃষ্ট হইবে ততই তাহার অভিনয় দুরূহ হওয়াই স্বাভাবিক। ইহা যে কেন ঠিক নয়, তাহা আমি যথাসাধ্য বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এই উক্তির মূলে যে মনোভাব আছে, তাহারই নাম ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। আধুনিক-কালে এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অভিমান এমনই দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে যে, নাটকের পক্ষেও, রঙ্গমঞ্চে অভিনয়-দর্শনের প্রয়োজনীয়তা একটা বিতর্কের বিষয় হইয়াছে। এক্ষণে সহজ ও সার্ব-ভৌমিক মানবতার ক্ষেত্র হইতে নাটককে তুলিয়া লওয়া হইতেছে বলিয়া নাটককেও নাট্যরসাত্মক না হইয়া লিরিক্যাল হইতে হইবে, এবং এইজন্য নাটকের নানা রূপান্তর দেখা দিতেছে; উপরে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। তথাপি এ প্রশ্নেরও একটা প্রাসঙ্গিক মূল্য আছে। দ্বিতীয় একটি প্রশ্ন এই—গদ্য ও পদ্য এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি খাঁটি নাট্যরস-সৃষ্টির অধিকতর উপযোগী? এ প্রশ্নের বিচারও সাধারণ পাঠক-পাঠিকার চিত্তাকর্ষক হইবে না, তথাপি প্রশ্নটি গুরুতর; একজন খ্যাতনামা আধুনিক ইংরাজ সমালোচকের মতে পদ্য নাটকই (poetical drama) অধিকতর উপযোগী,—ইহাও বুঝিতে হইলে সাহিত্য-সমালোচনার গভীরতর গহনে প্রবেশ করিতে হয়; এবার অন্ততঃ সে আলোচনা স্থগিত রহিল।



"শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও... জননী এসেছে দ্বারে" ---
বাতায়ন পথে শরতের সোনালি আলো। কাশের বনে ঢেউ তুলে উড়ে যায় বলাকা-শ্রেণী। উৎসবের আমন্ত্রণ লিপি বয়ে নিয়ে আসে প্রস্ফুটিত কুমুদ কহ্লার। হাসিভরা মুখে উদ্বেল হয়ে ওঠে নতুন জীবনের আলো আর আকাশে বাতাসে উচ্চকিত হয়ে ওঠে শরতের আগমনী। শ্রীকল্যাণ ও ভৃঙ্গসার তৈলে দেহমন স্নিগ্ধ ও সুরভিত করবার এই ত সময়।
শ্রীকল্যাণ
এবং
ভৃঙ্গসার
কেশ তৈল
COMARTS
জেম কেমিক্যাল ঃঃ কলিকাতা

ছিলেন, এখানেও তাহা সত্য হইয়া উঠিয়াছিল, যথা—

"The theatre is supported by the most Philistine section of the middle class, and by the worse than Philistine, the utterly frivolous section of the upper class."

এখন জাতি ও সমাজের অবস্থার পরিবর্তনে রঙ্গালয়ে আর ঠিক সেই ধরণের আমোদ-পিপাসুর জনতা হয় না—শ্রোতৃবর্গের মনোভাব পূর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধাপূর্ণ হইয়াছে। তথাপি—

"Pleasure, and that of the least elevating sort is all that the public expects or will accept at even our best theatres."

—ইহা সব দেশে সব কালে সত্য; সেই অলস প্রমোদ-পিপাসাকে শ্রেষ্ঠ রস-পিপাসায় উদ্বুদ্ধ করাই ত' প্রতিভাবান নাট্যশিল্পীর কাজ। আধুনিক কালে সিনেমা-শিল্প তাহার ঘোরতর অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে, মানুষের অতি স্থূল মানস-লালসা নিবৃত্তি করিবার—তাহার স্বাভাবিক ভাবজীবন ত' নহেই—তাহার মানস-জীবনকেও পঙ্গু করিবার—এমন উপায় আর নাই।

ইংরাজীতে যাহাকে 'Literay Drama' বলে, আমাদের সাহিত্যে ও রঙ্গমঞ্চে এখনও তাহার যুগপৎ আবির্ভাব ঘটে নাই; 'Nature and truth,' অথবা অতি উচ্চ 'poetic truth' কোনটাই আমাদের নাটকে সুসম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে নাই, তাই আমাদের সাহিত্যে নাটকের স্থান অতিশয় সংকীর্ণ। আমি যাহাকে উৎকৃষ্ট কবিকর্ম বলিয়াছি তাহাই 'Literary Drama' বা সাহিত্যিক লক্ষণাক্রান্ত নাটক; সেরূপ নাটকে কেবল বাস্তবভেদী কবিকল্পনাই যে আধিপত্য করিবে, তাহা নয়; আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের গুরুতর দিকটিও তাহাতে প্রতিফলিত হইবে; তেমন নাটকে সামাজিক প্রসঙ্গ বা নীতি-ঘটিত সমস্যা—রঙ্গমঞ্চ ও পাঠগৃহ, উভয়ত্র—সমান রসবৎ হইয়া উঠিবে। আমাদের অধিকাংশ নাটক যেমন অভিনীত হয় তেমন পঠিত হয় না; কিন্তু তদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, তাহাই খাঁটি নাটক, কারণ—অভিনয় ব্যতীত তাহার রসাস্বাদন অসম্ভব। যে-নাটক অতিশয় সুপাঠ্য তাহা অভিনয়-সাফল্য লাভ করিতে না পারে, কিন্তু যে-নাটক অভিনয়-সাফল্য লাভ করিয়াছে, অথচ পাঠ্য হিসাবে অচল, তাহার ভিতরকার বস্তু খাঁটি না হওয়াই সম্ভব। আবার, নাটক সুপাঠ্য হইলেই তাহা যে অভিনয়যোগ্য হইবে না, এমন নয়; দোষ রঙ্গমঞ্চের হইতে পারে, দর্শকমণ্ডলীরও হইতে পারে—অনেক সময়ে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। একখানি বাংলা নাটকের কথা স্মরণ হইতেছে—কিছুকাল পূর্বের কথা; নাটকখানির নাম 'শুভ-যাত্রা'—লেখকের নাম, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মজুমদার। ঐ নাটক তখনও মুদ্রিত বা অভিনীত হয় নাই—পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়াই মুগ্ধ হইয়াছিলাম; তাহার রচনানৈপুণ্যও যেমন, নাটকীয় কলা-কৌশলও তেমনই। ঠিক ঐ ধরণের নাটক আমাদের সাহিত্যে দেখি নাই; গঠনে ও পরিকল্পনায় অষ্টাদশ শতাব্দীর নব্য ক্লাসিক্যাল জার্মাণ নাটকের মত। উহাতে একটি অতিশয় বাস্তব জীবনের অবস্থা-সঙ্কটকে ধাপে ধাপে এমন একটি নাটকীয় পরিস্থিতিতে পরিণত করা হইয়াছে—অতিশয় অল্পকালের মধ্যে এবং স্বল্পতর উপ-করণের সাহায্যে, এমন জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে যে, পাঠকালে সারা চিত্ত উন্মুখ ও একাগ্র হইয়া উঠে। শুনিয়াছি ঐ নাটক রঙ্গালয়ে অভিনয়-সাফল্য লাভ করে নাই। ইহার কারণ দুইটি হইতে পারে—(১)"A frivolous public calls for frivolous plays, and frivolous plays breed a frivolous public"; (২) ঐ নাটকের কবিকর্ম যতই উচ্চাঙ্গের হউক, উহার সেই অবস্থাসঙ্কট যতই নাটকীয় হউক, তাহাতে নীতিঘটিত প্রশ্নই প্রবল, তাই দর্শকের হৃদয়-বৃত্তিকে তেমন উত্তেজিত করে না; যেটুকু ভাবা-বেগের সৃষ্টি হয় তাহাও ঘটনার অন্তিম বিস্ফোরণে তেমন মুক্তিলাভ করে না। তথাপি, এই বিচার হয় ত' ঠিক হইল না, আমি 'literary drama'র দৃষ্টান্তস্বরূপ এই নাটকখানির উল্লেখ করিলাম; হয়ত ইহার রং আর একটু ঘোরালো হইলে এই নাটকও একখানি খাঁটি—অর্থাৎ সর্বাংশে উৎকৃষ্ট অভিনয়যোগ্য—নাটক হইতে পারিত; কিন্তু তাহাতে কি উহার নিজস্ব রসপ্রেরণা ক্ষুণ্ণ হইত না? সত্যই এ বড় কঠিন সমস্যা।

এই প্রবন্ধে আমি যে অন্য নানাজাতীয় নাটকের উল্লেখ করি নাই, তাহারা নাট্যকলার বিচিত্র বিকাশ বলিয়া স্বীকৃত হইলেও, আমার সংজ্ঞা অনুযায়ী খাঁটি নাটক নহে। নরনারীর প্রেমও আজিকার সাহিত্যে (হয়ত জীবনেও) একটা সূক্ষ্ম মানসবস্তু হইয়া উঠিয়াছে,—তাহাও যে কিরূপ সাহিত্যকলার বিষয় হইতে পারে—রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' তাহার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তাহাতে যেমন দেহ-আত্মার সেই পরম রহস্যময় মিলনোৎকণ্ঠার অবকাশ নাই, এবং সেই প্রেমও যেমন সত্যকার প্রেম নয়,—তাহাতে যেমন স্বাভাবিক জীবন-চেতনার একান্ত দুর্বলতা লক্ষিত হয়,—তেমনই, সূক্ষ্ম মানস-পিপাসা নিবৃত্তির জন্য যে ধরণের নাটক রচিত হইয়া থাকে, কেবল বিচিত্র রূপকর্ম হিসাবে যাহা মূল্যবান—সেই সকল 'নৃত্য-নাটক', 'সঙ্গীত-নাটক' বা 'চিত্র-নাটক' সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। আবার যাহার নাম 'রূপক'-নাটক তাহাও ভাবস্বপ্নমূলক, অতএব খাঁটি নাটক নয়, এজন্য আমি বর্তমান প্রসঙ্গে তাহাদের উল্লেখ করি নাই।

এই দীর্ঘ আলোচনা এইবার শেষ করিব। নাটক সম্বন্ধে এমন বহু প্রশ্ন আছে যাহার মীমাংসা বাদবিতর্কসঙ্কুল। কেবল দুইটি প্রশ্ন বড়ই সঙ্গত ও প্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হয়, দুইটিই সাহিত্যিক প্রশ্ন—ঠিক নাট্যজিজ্ঞাস্য নয়। একটি, —সকলে মিলিয়া নাটক দেখিবার তাৎপর্য কি? রঙ্গমঞ্চে তাহার অভিনয়ের প্রয়োজনীয়তা যেমনই হোক, নাটক কি একা উপভোগ করিবার বস্তু নয়? এখানে একটা যে প্রশ্ন উঁকি দিতেছে তাহা নূতন নয়; একদা এক বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক বলিয়াছিলেন, রঙ্গমঞ্চে শেকস্‌পীয়ারের নাটকের অভিনয়দর্শনকালে তিনি কখনও তৃপ্তিবোধ করিতেন না; সে অভিনয় যতই উৎকৃষ্ট হোক, তথাপি মূল নাটকপাঠে তাঁহার মনশ্চক্ষে যে জগৎ উদ্ঘাটিত হইত তাহার তুলনায় ঐ অভিনয়ের জগৎ নিতান্তই সংকীর্ণ—তাহাতে শেকস্‌পীয়ারের কল্পনার যেন পক্ষচ্ছেদ হয়। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, উক্ত সাহিত্যিক নিজস্ব রুচি ও রসবোধের স্বাধীনতা দাবী করিতেন। কারণ, যাহা সকলকে মুগ্ধ করে তাহাই যে তাঁহাকেও মুগ্ধ করিবে, তিনি ইহা সঙ্গত মনে করিতেন না। ইহার আরও অর্থ এই যে, নাটক যত উৎকৃষ্ট হইবে ততই তাহার অভিনয় দুরূহ হওয়াই স্বাভাবিক। ইহা যে কেন ঠিক নয়, তাহা আমি যথাসাধ্য বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এই উক্তির মূলে যে মনোভাব আছে, তাহারই নাম ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। আধুনিক-কালে এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অভিমান এমনই দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে যে, নাটকের পক্ষেও, রঙ্গমঞ্চে অভিনয়-দর্শনের প্রয়োজনীয়তা একটা বিতর্কের বিষয় হইয়াছে। এক্ষণে সহজ ও সার্ব-ভৌমিক মানবতার ক্ষেত্র হইতে নাটককে তুলিয়া লওয়া হইতেছে বলিয়া নাটককেও নাট্যরসাত্মক না হইয়া লিরিক্যাল হইতে হইবে, এবং এইজন্য নাটকের নানা রূপান্তর দেখা দিতেছে; উপরে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। তথাপি এ প্রশ্নেরও একটা প্রাসঙ্গিক মূল্য আছে। দ্বিতীয় একটি প্রশ্ন এই—গদ্য ও পদ্য এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি খাঁটি নাট্যরস-সৃষ্টির অধিকতর উপযোগী? এ প্রশ্নের বিচারও সাধারণ পাঠক-পাঠিকার চিত্তাকর্ষক হইবে না, তথাপি প্রশ্নটি গুরুতর; একজন খ্যাতনামা আধুনিক ইংরাজ সমালোচকের মতে পদ্য নাটকই (poetical drama) অধিকতর উপযোগী,—ইহাও বুঝিতে হইলে সাহিত্য-সমালোচনার গভীরতর গহনে প্রবেশ করিতে হয়; এবার অন্ততঃ সে আলোচনা স্থগিত রহিল।



"একবার বিদায় দাও মা"

মনোজ বসু

ফুলশয্যা আজকে। আত্মীয়-কুটুম্বে বাড়ী ভরতি। আমোদ-স্ফূর্তিতে পুরানো বাড়ীটা ভেঙে পড়ে বুঝি বা!

সিঁড়ির মুখে দিদিমা মহীনকে গ্রেপ্তার করলেন।

কেমন জব্দ, ভাই? ছ'টা মাস এক সঙ্গে কক্ষণো তো ঘরে আটকাতে পারিনি। না পেরেছি গায়ের জোরে, না পেরেছি গায়ের জৌলসে। হার মেনে তাই নতুন বয়সের সতীন নিয়ে এলাম। এতক্ষণে ছুটি দিল বুঝি! সে মহারাণী কোথায়—ঘুমুচ্ছেন?

মুখ লাল হল মহীনের, জবাবে একটা কথা জোগায় না। বাসন্তী কি কাজে যাচ্ছিল, যেতে যেতে সকৌতুকে ঘরের দিকে চাইল। মনে পড়ে গেল, বকুলগাছের ঐখানটায় জ্যোৎস্নামগ্ন এক রাত্রির কথা। নিশ্বাস পড়ল। ছাব্বিশ বছর আগে, কোথায় তখন মহীন? বকুলগাছটাই বা ছিল কতটুকু?

যূথী নামছে। মহারাণীই সত্যি। এ বাড়ীতে পা দিয়েছে পরশু। নেমে আসছে, তা যেন ভূমিকম্পে কাঁপিয়ে তুলেছে সিঁড়িটা। জানিয়ে দিচ্ছে, বউ এসেছে বটে একটি।

কলেজে-পড়া মেয়ে, তবু লাবণ্যবতী। সবুজ শাড়ি পড়েছে, কপালে সিঁদুরের টিপ, দু-কাণে ঝুমকো। অপরূপ দেখাচ্ছে।

মুগ্ধ চোখে এক মুহূর্ত চেয়ে দিদিমা বললেন, এই সাজ হল নতুন বউয়ের?

আবার কি?

গয়নাগাঁটি না-ই পরলি দিদিভাই, নিতান্ত এক পোঁচ আলতা পরে আয় পা-দুটিতে।

যূথী ঘাড় নাড়ল।

অত দেমাক ভাল নয়, বুঝলি? বর কেড়ে নিয়ে ডুব দেব বলে দিচ্ছি।

যূথী বলে, আমিও আপনার বর কাড়ব তা হলে। আমার জিত। অত বড় নামকরা লোক, রায় বাহাদুর—

দিদিমা বলেন, হুঁ—মজা টের পাবি। মকরধ্বজ মেড়ে খাওয়াতে হবে। গলায় কম্ফর্টার আর পায়ে মোজা পরিয়ে চেয়ারের উপর ধরে বসিয়ে দিতে হবে দু-বেলা।

তা দেব। সে ভালো—

নূতন বউয়ের গলাটা ধরে আসে হঠাৎ। ম্লান হেসে বলতে লাগল, সে অনেক ভালো দিদিমা। যেমন বসিয়ে দেব, চুপচাপ তিনি সেইরকম বসে রইবেন। ছুটোছুটি করবেন না এদের মতো। ঝগড়া করব আবার ভাব করব দু'টিতে ঘরের মধ্যে বসে—যখন আমাদের যে রকম খুশি।

দিদিমা বিচলিত হলেন। কতদিন ধরে চলছে এই বিয়ের কথা। মেয়েটাও তেমনি—বাপ-মা কারো কথা না শুনে এত বছর গোঁ ধরে পড়েছিল—জেলখাটা, চরকা কাটা, গ্রাম-উন্নয়ন ইত্যাদির ফাঁকে কখন মহীনের ফুরসৎ হবে দুটো বিয়ের মন্ত্র পড়ে চলে যাবার। চলে যে যাবেই, তাতে সন্দেহ নেই। বিয়ে মানে বাহু-পাশে বন্দী হয়ে পড়ে থাকা নয় আজকালকার এই ছোঁড়াগুলোর কাছে।

দিদিমা কথায় না পেরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন। বকে বকে মাথা খারাপ করে দিচ্ছে দেখ। আলতা পরবি কিনা, তাই শুনি।

যূথী কাতর হয়ে বলে, জুতোর সঙ্গে আলতা—সে বড্ড বিশ্রী দেখাবে দিদিমা। পায়ে পড়ি আপনার—

নিজের চেহারা আয়নায় দেখেছিস কোন দিন চেয়ে? দিদিমা বলতে লাগলেন, দেখাবে ঠিক যেন লক্ষ্মীঠাকরুণ পদ্মফুল থেকে সদ্য নেমে এলেন, দুটি পায়ে পদ্মর রং লেগে রয়েছে।

যূথী হেসে উঠে বলে, উঃ—কবিত্ব দেখ দিদিমার!

মহীন বলল, তখনকার দিনে বামা-বোধিনীতে পদ্য লিখতেন, তা শোনেনি বুঝি?

দিদিমা বলতে লাগলেন, সে এক কাণ্ড। দুপুরবেলা দরজায় খিল এঁটে বসে বসে লিখতুম। উনি টের পেয়ে গেছেন—কোন্ ফাঁকে গোটা দুই নকল করে পাঠিয়ে দিয়েছেন. কিচ্ছু জানিনে ভাই। ছাপা হয়ে গেলে তখন এনে দেখালেন। তবু রক্ষা, বেনামিতে পাঠিয়ে-ছিলেন বুদ্ধি করে। সৌদামিনীর জায়গায় জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী নামে বেরুল।

যূথী রাজী হল শেষে। বেশ, পরব আলতা, কিন্তু একা নয়, আপনাকেও পরতে হবে।

দিদিমা বলেন, শোন কথা। কাকে খুশি করতে আলতা পরব লো এই বয়সে? কাকে দেখাব?

আর কাউকে না হোক, দেখাবেন দাদা-মশায়কে। তখনকার দিনের সবচেয়ে আধুনিক —চুরি করে যিনি বউয়ের পদ্য ছাপিয়েছিলেন।

দেখবার কি চোখ আছে? চশমাতেও আজকাল আর কুলোয় না রে ভাই—

ডাকাডাকি এই সময়।

লবঙ্গ কোথা রেখে গেছেন, ও দিদিমা? পান সাজা যাচ্ছে না।

রেখেছি আমার গালের মধ্যে পুরে।

বলে দিদিমা হাসতে হাসতে লবঙ্গ বের করতে ছুটলেন।

মহীন চুপি-চুপি বলে, দিদিমাকে কক্ষণো ও-সব বোলো না যূথী—

কি?

এই আলতা পরার কথা-টথা। কত কষ্ট হয় ওঁর জানো না।

যূথী সভয়ে বলে, কেন—কি হয়েছে?

আমার মা হলেন দিদিমার একমাত্র মেয়ে। সেই মেয়ের এই দশা—বাবা নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন—

যূথী বলে, ছি—ছি, বড্ড অন্যায় করেছি তো! এসে অবধি দেখছি কিনা দিদিমার আমোদস্ফূর্তি—

তুমি পা দিয়েছ, সেই থেকে বাড়ীর ভোল বদলেছে। সবাই আমরা অবাক হয়ে গেছি, দিদিমা আমাদের এত আমুদে—

সৌদামিনী আসছেন দেখে মহীন চক্ষের পলকে সরে পড়ল।

কি বলছিল? আমার নামে লাগালাগি করছিল যেন তোর কাছে? ঢাকছিস কেন, বল্—

বলছিল যে—

কি? বলে ভ্রূকুটি করলেন দিদিমা।

যূথীর মুখে মিথ্যাকথা জোগায় না। বলে, আলতা পরার কথা আপনাকে বলতে মানা করে দিল।

বটে! সাধ-আহ্লাদ নেই দিদিমার? ইচ্ছে করে না আমার বুঝি?

যূথীর হাত ধরে বললেন, চল্—আলতা পরাবি আমায়। পরবই। দু-বোনে আজ আলতা পরে সারা বাড়ি ঘুর-ঘুর করে বেড়াব।

আজ যেন একশখানা হাত হয়েছে সৌদামিনীর, একশটা চোখ। ক্রিয়াকর্মের বাড়ি, হাজার রকম ফাই-ফরমাস। সবাই ডাকে—দিদিমা, দিদিমা গো—। কতবার উপর-নিচে করছেন তার অবধি নেই। কে বলবে, বুড়ো-মানুষ—যেন যাত্রা-থিয়েটারের মতো এক মাথা নকল পাকা চুল পরে বাড়িময় দিদিমা মোড়লি করে বেড়াচ্ছেন।

একবার দেখতে পেলেন, রান্নাঘরের দাওয়ায় রুনু আলুর ধামা নিয়ে বসেছে। তাড়া দিয়ে উঠলেন, ওঠ্—উঠে আয় বলছি।

কাকীমা বললেন যে—

কাকীমার মা বলছেন উঠে আসতে।

রুনুর রাঙা মুখে ঘাম ফুটেছে রোদে বসে কাজ করতে করতে। আঁচলে মুখ মুছিয়ে দিয়ে সৌদামিনী বললেন, আলু কুটবার জন্য এনেছি নাকি রেল-স্টিমারের হাঙ্গামা করে, নাতজামায়ের অত খোশামুদি করে? উপরে যা, বউটা একা আছে। শহুরে মেয়ে, নতুন পাড়াগাঁয়ে এসেছে—

গলা নামিয়ে মুচকি হেসে বললেন, বসে বসে ঝিমুচ্ছে দেখে এলাম। জিজ্ঞাসা কর গিয়ে তো রুনু, কি হয়েছে? মশা না আরশোলা—কিসে কামড়েছে কাল সমস্ত রাত্রি?

বেলা পড়ে এল। রোয়াকের ধারে পেট্রোম্যাক্সগুলো জেবলে জেবলে সারবন্দি রাখা হচ্ছে। নূতন চূণকাম করা বাড়ি ঝলমল করছে গোধূলি আলোয়। তিন ডালা ফুল নিয়ে এসেছে। পদ্ম অল্পই পাওয়া গেছে; গোলাপ, গন্ধরাজ, স্থলপদ্ম, দোপাটি। বেল-ফুলের মালা দুলছে যূথীর গলায়। মালার ভয়ে মহীন কোথা পালিয়ে আছে, খুঁজে পাওয়া যায় নি এখনো।

চোখ ইসারায় সৌদামিনী রুনুকে এক পাশে ডেকে নিলেন।

এই, পাতান দিবি নে? কেমন মেয়ে তোরা?

না দিদিমা, যা শীত পড়েছে—

এখনি বুড়িয়ে গেলি? তোদের ঐ বয়সে আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে ঘড়ার পর ঘড়া জল বয়েছি পুকুরঘাট থেকে। পুরোহাতা পশমী জামা এটেঁছিস, তবু বলছিস শীত?

হেসে রহস্যভরা চোখে চেয়ে বললেন, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি শীত যাতে না লাগে। উঁহু ঘাড় নাড়লে শুনছি নে—

টানতে টানতে সৌদামিনী তাকে নিয়ে গেলেন মাঝের ঘরে। ঢুকেছেন কি না ঢুকেছেন—যেন ডাকাত পড়ল। যূথী বাইরে থেকে দুয়োর ঝাঁকাচ্ছে।

সৌদামিনী সাড়া দিলেন, ঘুমিয়ে নেই রে বাপু। তোদেরই বিছানা করছি।

যূথী বলে, তা দুয়োর এঁটেছেন কেন? শুনুন—বরণকুলোয় হর্তুকী না থাকলে নাকি হবে না, ওঁরা বলছেন।

দুয়োর খুলে সৌদামিনী বলেন, না হল তো বয়ে গেল। মাগো মা, কি রকম বেহায়া বউ দেখ্ রুনু। নিজে এসেছে বরণকুলোর তত্ত্ব নিয়ে। গাছকোমর বেঁধেছিস যে বড়? ঝাঁট দেওয়া হচ্ছে? ধুলোয় ভূত সেজেছিস—বর মাথায় ঘোল ঢেলে বিদেয় করে দেবে, টের পাবি তখন—

যূথী ভিতরে উঁকি দিয়ে সন্দিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করে, দুয়োর দিয়ে কি হচ্ছিল আপনাদের?

তোকে তা বলতে ... এসে বলল, একজন বউ কৈফিয়ৎ চাইছে—ওরে ... হয়েছেন। একবারটি দিন?

... তালে যেতে বলো।

রাত হয়েছে। মহীনের ... নাকি খেয়াঘাটে গিয়ে বসে ...ন। কে বলো তো তার জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এ... তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য। মে... সে খবরে জন্য যূথীকে ধরাধরি করছে, সৌদা...ই খুন-টেনে এনে বসিয়েছে আসরের মাঝ... উপরে বাসন্তী যাচ্ছিল. উঁকি দিয়ে এদের এক নং দেখে দোতলায় উঠে গেল বাপকে দুধ আর রসগোল্লা খাওয়াতে। ঠিক আটটায় রায়-বাহাদুরের খাবার চাই, ধরিত্রী রসাতলে গেলেও এক মিনিট এদিক-ওদিক হবে না। বাতে পঙ্গু, শুয়ে শুয়ে তিনি খাচ্ছেন। বাসন্তী একটু দূরে বাঁ-হাতের উপর থুতনী রেখে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। উৎসব-বাড়িতে আজ তার কি হয়েছে, বিদ্যুৎ-রেখার মতো মনের উপর ঝিকমিকিয়ে যাচ্ছে কতদিনের কত কথা।

ঐ ঘরেই তো,—মেয়েরা যেখানে হাসাহাসি হৈ-হল্লা করছে। রায়বাহাদুর অত্যন্ত চটা ছিলেন জামাইয়ের উপর। ঘরে বাইরে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন, মেয়ে আমার বিধবা। আইনে আটকায়, নয় তো বিয়ে দিতাম আবার। বাসন্তীকে নির্জনে ডেকে কতদিন বলেছেন, সবই তো দেখেশুনে দিয়েছিলাম—স্বামী-সুখ তোর ভাগ্যে নেই মা। মনে করিস, বিধবা হয়েছিস। আর কোন দিক দিয়ে কষ্ট পেতে না হয়, সে ব্যবস্থা করে তবে আমি মরব।

ঐ ঘরে—ঐ মাঝের ঘরেই হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা অরিজিত এল। বাবা-মা কেউ বাড়ি ছিলেন না; মেজমাসীর ছেলের অন্নপ্রাশনে গিয়েছিলেন। বাসন্তী যায় নি, আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে কথায় কথায় তার প্রসঙ্গ উঠে পড়ে, দরদীরা আহা-হা করেন, সেই লজ্জায় কোথাও সে যায় না। একলা রান্নাঘরে বসে ভাত খাচ্ছিল, এমনি সময় ধনুক থেকে ছোড়া তীরের মতো মানুষটি ঘরে ঢুকে দরজা দিল। ভাত ফেলে উঠে এল বাসন্তী। তারই সমবয়সী এক সখী—প্রভাসনলিনী নাম, নূতন বিয়ে হয়েছে—বাসন্তী ভেবেছে সে-ই। প্রভাসের বর খুব প্রেমপত্র লেখে, তারই কখানা বাসন্তী এনে লুকিয়ে রেখেছে—সে ভাবল, ফাঁক বুঝে প্রভাস বুঝি ডাকাতি করতে এসেছে সেই চিঠিগুলো।

কে হে লাটসাহেব, দরজা দিয়েছ? খোল —দুয়োর খোল বলছি—

দুয়োর খুলে অরিজিত বলে, ভাত খাব চাট্টি—

সর্বাঙ্গ রি-রি করে জ্বলে উঠল বাসন্তীর। বলে, ভাত রেঁধে থালা সাজিয়ে

কে বসে আছে কার জন্যে? কার দায় পড়েছে?

তবে একটু ঘুমিয়ে নিই। তিন দিন দু'চোখ এক করতে পারিনি।

অপমান গায়ে মাখে না, এরা এমনি। পরম আরামে অরিজিত মাদুরের উপর গড়িয়ে পড়ল। চোখ বুজল সঙ্গে সঙ্গে। এক মুহূর্ত বাসন্তী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। চোখ বুজে আছে তাই তাকিয়ে থাকতে পারল। তারপর চিঁড়ে নলেনগুড় আর আমসত্ব বাটিতে করে এনে ডাকল, ওঠ—শুনছ? উঠে খেয়ে নাও—

ভেবেছিল, স্বামীর গায়ে হাত ছোঁয়াবে না আর কোন দিন। কিন্তু গাঢ় ঘুম—মুখের ডাকে ঘুম ভাঙে না, আর বেশি চীৎকার করতেও সাহস হয় না। অনেক নাড়ানাড়ি করে বিস্তর কষ্টে তাকে জাগিয়ে তুলল।

খেতে খেতে অরিজিত বলে, পরশু রাত্রে ভাত খেয়েছিলাম গোয়ালন্দর এক হোটেলে—

আর জোটে নি? জুটবে কি করে, মানুষ কাজ না থাকলে এ'দিনের মধ্যে আসতাম না একবার দেখতে?

তিক্তকণ্ঠে বাসন্তী বলে, দয়া করে দেখে যাবে বলে পথ তাকিয়ে থাকে না কেউ। তোমাদের জানি তো! পথের কুকুরের মতো তাড়া খেয়ে খেয়ে এ-দরজা সে-দরজায় ঘুরে বেড়াও। লম্বা-লম্বা কথা বলে পশার বাড়িও না।

শেষ দিকটায় গলা কেমন ভারি হয়ে আসে। দ্রুত সে বেরিয়ে গেল। যখন ফিরে এল, অরিজিত খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছে।

তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

এত দয়া?

স্নিগ্ধ হাসিভরা মুখে অরিজিত বলে, যাই তা'হলে?

আমি যে ভাত চাপিয়ে দিয়ে এলাম।

আজ নয়—

শোন, ভাত ফুটছে, আর মিনিট দশেক বড় জোর—

উহু। ছুটি নেই বাসন্তী, কড়া মনিব। এক বিদেশী ছেলে এসে বলল, একজন আমাদের মধ্যে আহত হয়েছেন। একবারটি দেখা করতে চান।

বাসন্তী বলে, হাসপাতালে যেতে বলো। নার্স-ডাক্তার নই আমরা।

সৌদামিনী এগিয়ে এলেন। কে বলো তো মানুষটি?

ক্রুদ্ধস্বরে বাসন্তী বলে, সে খবরে আমাদের গরজ কি মা? কত মানুষই খুন-জখম হচ্ছে। ঐ যে—বাবা ডাকছেন যেন। উপরে চলো।

সৌদামিনী নড়লেন না দেখে অগ্নিদৃষ্টি হেনে একাই সে চলে গেল।

উদ্বিগ্নকণ্ঠে সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করেন, কোথায় আছে সে এখন? কেমন আছে?

আছেন নিকটেই—

এদিক-ওদিক চেয়ে ছোকরা ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, আছেন কদমতলার ঘাটে ডিঙি-নৌকোয়।

আমায় নিয়ে চলো।



হোগলা বনে মাথা ঢুকিয়ে ছোট্ট ডিঙি।

তো নও? পাখীও পারে না এমন উড়ে বেড়াতে।

কত কাজ!

কাজ নয়, বলো, অকাজ—

ছুটি মিলেছিল অভাবিতভাবে এর বছর-খানেক পরে।

রায় বাহাদুরকে বাতে ধরেছে। তাঁকে নিয়ে দিবারাত্রি কাটে। সেই সময় সন্ধ্যার পর কদমতলায় ছায়ান্ধকারে হোগলাবনে মাথা ঢুকিয়ে ছোট্ট ডিঙি। ছইয়ের ভিতর অরিজিত নিস্পন্দ হয়ে আছে। ছোকরা গিয়ে ডাক দিল, চোখ মেলুন, ও দাদা। দেখুন, কে এসেছে।


নব শক্তি ঔষধালয়
কয়েকটি প্রয়োজনীয় ঔষধ
শক্তিসিন্ধু রসায়ন
(Regd)
জীবন যুদ্ধে চাই শক্তি, বুদ্ধি, তেজ। অনিয়মিত অত্যাচার ও উশৃঙ্খলতার ফলে শরীরের সপ্ত ধাতু (রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র) বিকৃত ও দূষিত হইয়া মানুষকে যখন ধ্বংসের পথে লইয়া যায়, তখন "শক্তি সিন্ধু রসায়নই" তাঁর একমাত্র নির্ভরযোগ্য বন্ধু। মূল্য ১ শিশি ২৲ টাকা।
পদ্মমধু
ছানি রোগে অস্ত্রের প্রয়োজন নাই। চক্ষু রোগে আমাদের "পদ্মমধুই" অব্যর্থ ঔষধ। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা।
অমৃতবিন্দু সালসা
(Regd)
রক্তে দূষিত বীজাণু প্রবেশ করিলেই রক্তের তেজ কমিয়া যায় এবং শরীর নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। সে তেজ আর জ্যোতি থাকে না। "অমৃত বিন্দু সালসা" সেবনের সঙ্গে আবার রক্ত বিশুদ্ধ হইয়া সেই তেজ জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়। নিয়মিত সেবনে রক্তাল্পতা, চর্ম্মরোগ, বাত, ঋতুগত দোষ ও অকাল বার্দ্ধক্য বিদায় গ্রহণ করে। মূল্য ১ শিশি ১৲
মহাশক্তি সুধা
আজ ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গলাদেশ নিপীড়িত। কুইনাইন সেবনের প্রয়োজন নাই। "মহাশক্তি সুধা" ম্যালেরিয়া, প্লীহা-যকৃত সংযুক্ত জ্বর ও সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অমোঘ অস্ত্র। মূল্য এক কৌটা ।৹ আনা।
গৃহ চিকিৎসাবাক্স
সুনির্ব্বাচিত ২৬ প্রকার ঔষধ সমন্বিত একটি বাক্স গৃহে থাকিলে চিকিৎসকের সাহায্যের দরকার হয় না। প্রতি গৃহে ইহা রাখা কর্ত্তব্য। মূল্য ১ বাক্স ১০৲ টাকা।
অতিরিক্ত শারীরিক বা অতিরিক্ত অধিক পরিশ্রমে অবসাদগ্রস্ত হইলেই 'পনার শরীর সেবন করিবেন, তবেইশ্বর রসায়ন" মেধা, বলবীর্য্য ও স্মৃতিশক্তি, উদ্ভাসিত হইবে। ইহ কার্য্যশক্তি এবং ছাত্র জীবনের পুষ্টিকারক মূল্য ১ শিশি ২৲ টাকা।
কবিরাজ
শ্রী শিশির কুমার সেনগুপ্ত কবির
২১৬এ, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাত

অরিজিত তাকাল। হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে, ঘাড় উঁচু করে এদিক-ওদিক চায়, খুঁজছে আর যেন কাকে। যেন হতাশ হয়ে বলল, আপনি একা এসেছেন মা?

নিয়ে যেতে এলাম। দল বেঁধে এসে কি করব বাবা?

একটু ভেবে বললেন, হেঁটে যেতে পারবে কি আস্তে আস্তে আমাদের কাঁধ ধরে? ওই দিকি—

অরিজিত জিজ্ঞাসা করে, আপনি নিয়ে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ। অমন করে তাকাচ্ছ—ধরিয়ে দেব ভাবছ নাকি?

ভাবছি, কোথায় নিয়ে তুলবেন। আপনাদের বাড়ি?

সৌদামিনী বললেন, সে-ই ভাল সকলের চেয়ে। নিরাপদ দুর্গ। জীবনভোর খোশামুদি করে রায়বাহাদুর হয়েছেন—কেউ সন্দেহ করবে না, কোন খোঁজখবর হবে না আমাদের বাড়ি থাকলে।

বাসন্তী রাগারাগি করে, কেন তুমি নিয়ে এলে মা?

সৌদামিনীও রেগে বলেন, আনব না তো কি মারা পড়বে বিনি-চিকিচ্ছের? অষুধ নেই, ডাক্তার-বদ্যি নেই, এক বাটি বার্লি রেঁধে দেবার মানুষ অবধি নেই—

বাসন্তী বলে, ত্রি-সংসারে যাদের কেউ নেই, মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই এত বড় পৃথিবীতে, পথে-ঘাটেই মরে তারা। নিয়ে এসেছ মা, বাবা দেখতে পেলে অপমান করবেন, দূর করে দেবেন গলাধাক্কা দিয়ে।

দেখবেন কি করে? উঠতে পারেন না তো! আর এ-ও কিছু উপরতলায় পায়চারি করতে উঠছে না।

একটু স্তব্ধ থেকে সৌদামিনী বললেন, বাপের উপর বড্ড রেগে আছিস। কিন্তু ভেবে দেখ্, যে নিয়মের মধ্যে ওঁরা মানুষ—তার মাপে কিছুতে যে ফেলা যায় না এদের। তাই অরিজিতেরা বাউণ্ডুলে মাথাপাগলা সৃষ্টি-ছাড়া ওঁদের কাছে।

মাসখানেক কেটে গেল, একটানা প্রায় একটা মাস।

খুশিমুখে সৌদামিনী বললেন, ঘা বেশ পুরে এসেছে দেখতে দেখতে—

অরিজিত বলে, অষুধ পড়েছে ভাল। আর এমন সেবাযত্ন হচ্ছে।

স্নিগ্ধ চোখে সে বাসন্তীর দিকে তাকাল। তখনকার সেই উনিশ বছর বয়সের বাসন্তীর দিকে।

বাসন্তী বলে, ওষুধ তবে বন্ধ করে দেওয়া যাক, মা—

কেন?

ছুটির মেয়াদ বাড়বে—

অরিজিত বলল, তার চেয়ে ওষুধের বদলে এক পুরিয়া বিষ খাইয়ে দাও। ছুটি অনন্তব্যাপী হবে—কড়া মনিব নাগাল পাবে না আর—

সৌদামিনী হেসে বলেন, মনিবটা কে শুনি?

অরিজিত বলে, এত বই পড়েন, এত খবর রাখেন, আপনি কি আর জানেন না মা? আমার দেশের কোটি কোটি মানুষ। এত দাবী আর কার হতে পারে? সৈন্যরা লড়াই করে, তার একটা সময়ের আন্দাজ থাকে—দু-বছর না হয় পাঁচ বছর চলবে। কিন্তু এ সমুদ্র হতে কবে যে কূলে উঠব, কেউ আমরা জানিনে। পুরুষ-পুরুষান্তর ধরে চলছে পারে উঠবার এই চেষ্টা। আর এমন নিষ্ঠুর ভুলো-মন মনিব আমাদের, মারা গেলে পায়ে ঠেলে সরিয়ে দেয়, দশ বছর বাদে আমাদের হয়তো ভুলেও ভাববে না একটাবার।

বলতে বলতে যেন কত বড় রসিকতার কথা—অরিজিত হো-হো করে হেসে উঠল।

সেই রাত্রি। একটা বাজল দেয়াল-ঘড়িতে। ঘুম আসে না। বাসন্তী বিছানায় আইঢাই করছে। আলো জ্বালল, বইটই কিছু পড়া যাক। চমকে ওঠে হঠাৎ—দেয়ালের আয়নায় নিজের অঙ্গের প্রতিবিম্ব পড়েছে। নিটোল সর্বাঙ্গে উনিশ বছর বয়সের ভরা যৌবন। সরু হার চিক-চিক করছে বুকের উপর। কপালে হাত দিয়ে বাসন্তী শিউরে ওঠে, জ্বর হয়েছে নাকি? নিশ্বাস পড়ছে, তা-ও গরম। অস্বস্তি লাগছে, কত সব বিক্ষিপ্ত ভাবনা।

নিচে নেমে চুপি চুপি বকুলতলায় গিয়ে দাঁড়ায়। নিচে আসতে মানা, তবু বাসন্তী নেমে এল।

মাঝের ঘরে আলো নিভিয়ে দিয়ে গূঢ় কথাবার্তা হচ্ছে। ক'জন এসেছে কোথা থেকে সন্ধ্যের পর। গলার আওয়াজ পাওয়া যায় না, তবু নিঃসন্দেহ ওদের তুমুল আলোচনা চলছে এই গভীর রাত্রি অবধি।

শুকনো পাতা বাসন্তীর পায়ের তলে খড়মড়িয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন—কে?

অপ্রতিভ বাসন্তী স্খলিত কণ্ঠে বলে, আমি—আমি গো। বাইরে এসেছিলাম। চলে যাচ্ছি।

জানলা খুলে গেল। অরিজিত জিজ্ঞাসা করে, বাইরে কেন? কি ওখানে?

কাছে গিয়ে বাসন্তী বলে, জেগে উঠে হঠাৎ নিচের দিকে নজর পড়ল। মানুষ বলে মনে হ'ল। যেন গাছের তলায় চুপটি করে কে দাঁড়িয়ে আছে। তাই দেখতে এসেছিলাম।

মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, কিছু নয়—মনের ভুল।

অরিজিত বলে, তা হোক। খানিকক্ষণ তুমি একটু ঘুরে ঘুরে বেড়াও। না-ই বা ঘুমুলে—

একটু আগে দশমীর চাঁদ উঠেছে। নিঃশব্দ—নিঃসীম শান্তি চারিদিকে। স্বপ্ন যেন উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে এই ঘুমের রাজ্য জুড়ে। এ হেন সময়ে তরুণী বউয়ের উপর ভার পড়ল ঘুরে ঘুরে পাহারা দিয়ে বেড়াবার; কোন চর এসে গোপন কথা শুনে না যায়।

আরও অনেকক্ষণ পরে অরিজিত বেরিয়ে এল। বাসন্তী তখনো উঠানে—বকুলতলায়।

ওদিকে কোথা?

প্রণাম করে মাকে বলে কয়ে আসি।

আর আমাকে—। কথা বলতে গিয়ে ওষ্ঠ থর-থর করে কেঁপে উঠল বাসন্তীর। আমাকে বলবে না কিছু?

অরিজিত থমকে দাঁড়াল। বলব বই কি—

কিন্তু ঘা-টা ভাল করে শুকোয় নি যে এখনো।

হাসিমুখে অরিজিত চেয়ে রইল।

চলে যাচ্ছ?

স্বামীর মুখে দুটি চোখের দৃষ্টি পুঞ্জিত করে বাসন্তী প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছে, যাচ্ছ এখনই? কোথা যাচ্ছ? আবার ফিরবে, কবে?

তবু অরিজিত কথা বলে না। এমন শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, রাগ করা যায় না। সে যে কত ভালবাসে, নির্বাক চোখের কথায় বলা হয়ে যাচ্ছে।

কবে ফিরবে, আমায় বলে যাও—

ফিরে আসব। বলে অরিজিত মাথায় হাত রাখল বাসন্তীর।

মহীন তখন গর্ভে এসেছে। ছেলে বাপের মুখ দেখেনি। ফিরে আসব বলে চলে গেল, ছাব্বিশ বছর কেটেছে তারপর।

রায়বাহাদুরের কণ্ঠস্বরে বাসন্তীর চমক ওঠে। ভাবনা ভেসে গেল। খেয়েদেয়ে তোয়ালেয় পরিপাটি করে মুখ মুছে তিনি বলছেন, চেয়ারটা ঠেলে দে তো মা, জানলার ধার। দেখি—

তাকিয়ে তাকিয়ে রায়বাহাদুর দেখতে লাগলেন। আলো—আলোময় হয়েছে বাড়িখানা। ভাবলেশহীন তাঁর যে-মুখ সবাই দেখে এসেছে, আজকে সে-মুখে হাসি ঢল-ঢল করছে।.........বেহালা বেজে উঠল। বাসন্তী উঠে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখে। সেই লোকটা—পাড়ায় পাড়ায় বেহালা কাঁধে যে গান গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায়। ঝাঁকড়া চুল, গলায় কাঠের মালা, অস্থি-সর্বস্ব চেহারা। কোথাও খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার থাকলে আপনি এসে জোটে, গেয়ে বাজিয়ে সকলের মনোরঞ্জন করে শেষে নিজেই একখানা পাতা করে বসে যায় ভোজসভা থেকে দূরে—একপাশে



স্বর্ণ ঘটিত

অমৃত সালসা

গভর্ণমেন্ট রেজিষ্টার্ড

নিরোগ দেহ ও নিটোল স্বাস্থ্য নির্ভর করে সতেজ ও বিশুদ্ধ রক্তের উপর।

আয়ুর্ব্বেদ সাগর মন্থন করিয়া এই দুর্লভ রসায়নের সৃষ্টি। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ আধি ব্যাধি পীড়িত মানব সমাজের ইহা অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া আসিতেছে। রক্তদুষ্টিতে, রক্তাম্লতায়, বাত ও চর্ম্মরোগে এবং মেয়েদের ঋতুগত জটিল অসুখে অমৃত সালসা একটি মহৌষধ। সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যও ইহা একটি উৎকৃষ্ট টনিক। মূল্য — ১ শিশি — ১৲, ডাক মাশুল ৷৶৹। ৩ শিশি —২৸৹, ডাক মাশুল ১৷৴৹। ডজন — ১০৲, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

মধুপর্ণা



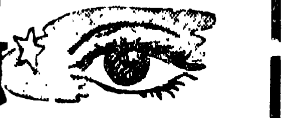
সাধারণতঃ মেয়েদের অসুখের খুব বেশী যত্ন লওয়া হয় না এবং স্বাভাবিক লজ্জাবশতঃ মেয়েরা মুখে তাহাদের অসুখের কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়া থাকেন। অথচ ইহার ফলে গৃহলক্ষ্মীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের হানি হইয়া থাকে। "মধুপর্ণা" মেয়েদের যাবতীয় শ্বেত ও রক্তপ্রদর, বাধক, শারীরিক যন্ত্রণা, হৃদরোগ প্রভৃতি অসুখে মন্ত্রৌষধির ন্যায় কার্য্য করে—ইহা নিয়মিত সেবনে নারীর স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য দুইই অটুট থাকে। মূল্য—১ শিশি—২৷৹, ডাঃ মাঃ ১৵৹।



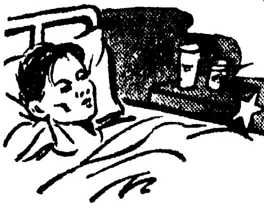
মহাশ্বাসারিষ্ট

শ্বাস ও হাঁপানী এমনই অসুখ যে ইহা মানুষকে পঙ্গু করিয়া দেয়। ইহার মত যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি আর নাই। এই কঠিন অসুখ হইতে চিরদিনের মত আরোগ্য লাভ করিবার পক্ষে "মহাশ্বাসারিষ্ট" সত্যই একটি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ। মূল্য—১ শিশি ১৷৹, ডাঃ মাঃ ১৵৹।

পদ্মমধু



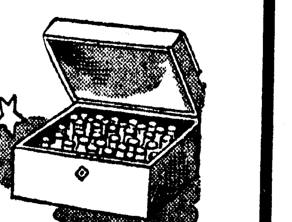
অতি সযত্নে সমাহৃত এই পদ্মমধু যাবতীয় চক্ষু রোগের ফলপ্রদ ঔষধ। ছানি কাটিবার জন্য অস্ত্রোপচার অপেক্ষা আমাদের পদ্মমধু অধিক উপকারী। মূল্য—১ শিশি ১৲, ডাক মাশুল ৷৶৹ আনা। ৩ শিশি ২৸৹, ডাক মাশুল ৷৶৹ আনা।



শিবশক্তি বটিকা

ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে আমরা আজ মৃতপ্রায়। লক্ষ লক্ষ লোকের অকাল মৃত্যুর কারণই ম্যালেরিয়া। আর কুইনাইনের দরকার নাই। বহু গবেষণা-লব্ধ এবং দুষ্প্রাপ্য ঔষধিতে তৈরী এই "শিবশক্তি বটিকা" সকল প্রকার জ্বর, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, প্রভৃতি অসুখে আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। নিজের গুণেই ইহা প্রতিগৃহে ব্যবহৃত হইতেছে। মূল্য — ১ নং ১ কৌটা ৷৶৹, ২ নং ১ কৌটা ৷৷৴৹, ৩ নং ১ কৌটা ৸৹। ডাক মাশুল ৷৶৹ আনা।

গৃহচিকিৎসার বাক্স



২৬ প্রকার ঔষধ (প্রত্যেকটি ৩৫ বটী) সম্বলিত এরূপ একটি বাক্স প্রতিগৃহে থাকা একান্ত প্রয়োজন। সঙ্গে ব্যবস্থাপত্র ও "কবিরাজী চিকিৎসাশিক্ষা" নামক ১ খানা পুস্তক থাকে। মূল্য একবাক্স ১০৲, ডাঃ মাঃ ১৷৶৹।

মকরধ্বজ—প্রতি তোলা ৫৲
ষড়গুণ বলিজারিত মকরধ্বজ —প্রতি তোলা ২০৲
সিদ্ধমকরধ্বজ— প্রতি তোলা ৩০৲
চ্যবনপ্রাশ — ১ শিশি ২৲
মৃগনাভি— আসামের ১ তোলা ৫০৲, নেপালের ১ তোলা ৪০৲
স্বর্ণভস্ম—১ তোলা ১২৫৲
বসন্তকুসুমাকর রস, সপ্তাহ ৬৲
ভীমসেনী কর্পূর ১ তোলা ১০৲

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরত্নের

মহৎ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

☆ সর্ব্বত্র বিশ্বস্ত এজেন্ট চাই।

১৪৪।১, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। ফোন বি, বি, ৬০৫২।

কলাটি। গায় ভারি চমৎকার। বাসন্তী কছে, বাবাজী, ও বাবাজী—

গন্ডগোলে লোকটা শুনতে পায় না। সন্তী দ্রুত নেমে এল। এসে বলে, গান ও বাবাজী। সেই যে—সেই গানটা গাবে কি?

মাঝের ঘরে ওদিকে নূতন বউকে সেধে ধে মেয়েরা হয়রান হচ্ছে। সৌদামিনী লেন, বয়ে গেল না গাইল তো। আমি চ্ছি, তোরা শোন্—

ছুটোছুটি করে সবাই সৌদামিনীকে রে বসে। আর যারা এদিকে-ওদিকে ছে, তাদেরও ডাক দেয়, ওরে, দিদিমা ন গাবেন। কলকণ্ঠে বলে, সেই ভাল, দিমা। গলা মিষ্টি বলে বড্ড দেমাক য়ের। কেউ আমরা ওর গান শুনব না। নে আঙুল দেব, ও যদি গাইতে বসে।

সৌদামিনী বলেন, গোপাল উড়ের গান কিন্তু—উনি এটা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। য়ার দিয়ে সেকালে দুজনে আমরা চুপিচুপি ইতাম।

উঠে গিয়ে নিজেই সৌদামিনী ঝপাঝপ নলা-খড়খড়ি এঁটে দিচ্ছেন। একটা কিছু বেনই আজ। এমনি সময় বেহালা। র বাসন্তী ফরমায়েস করছে বাবাজীকে—

সৌদামিনী মেয়েদের ধমক দিয়ে উঠলেন, হা থাম্ দিকি তোরা, শুনতে দে শুনতে । সঙ্গে সঙ্গে ঘর নিস্তব্ধ। সেই পুরোনো ক স্বর—যে কণ্ঠের শাসনে মেয়েদের বুকের তর অবধি গুরগুর করে ওঠে।

থাকতে পারলেন না সৌদামিনী, য়ে পায়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। মেয়েরা ছনে। যূথীও এসেছে। বারান্দা ভরে গেছে। নে বকুলগাছের গুঁড়িতে একটা পা টু তুলে দিয়ে কাঁধে বেহালা রেখে বাবাজি চ্ছে. আর চোখ বুঁজে গাইছে—

একবার বিদায় দাও মা, ঘুরে আসি—
হাসি' হাসি' পরব ফাঁসি—
দেখবে ভারতবাসী।

সবাই আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। কোথায় কে গেল তারা এই মায়ামতী ধরিত্রীর ল থেকে? গৌতম-বুদ্ধের মতো সকল ভন উত্তীর্ণ হয়ে গেল—তাদের নিয়ে বেঁধেছে এই গান? ছন্দের নিপুণতা নেই, আছে সুরের বাহার। নিরলঙ্কার ন্ত সাদাসিধে কতকগুলো কথা ঠেলে-স দাঁড় করানো। তবু দূরতম গ্রাম ধি ছড়িয়ে গেছে গানের কথা—কিসের ণে?

রুণু নিশ্বাস ফেলে বলল, আহা—ফিরবে কি আর তারা? ফিরেব সত্যি?

সৌদামিনী কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। রুণু চুপ করল ভয় পেয়ে।



গান থেমেছে। মেয়েরা ঘরে ঢুকল, আসর আবার জমছে। সৌদামিনীও যাচ্ছেন—দেখতে পেলেন, থাম ঠেশ দিয়ে একলাটি দাঁড়িয়ে আছে বাসন্তী। মাকে দেখে তাড়াতাড়ি বাসন্তী চোখে আঁচল দিল।

সৌদামিনী বললেন ছিঃ ছিঃ—

তারপর আস্তে আস্তে মাঝের ঘরে গিয়ে জমজমাট আসরে বসে পড়লেন। আবার সেই এক-মাথা পাকা চুল নবীনা দিদিমা-টি। যূথী এবার গান ধরেছে। আলো আর উল্লাসদীপ্ত ফুল-শয্যার রাত্রি।

তারপর উৎসব মিটে গেল। শুয়ে পড়েছে সবাই। কুলুঙ্গিতে মিট-মিটে বরণ-দীপ জ্বলছে, আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশি প্রকট হয়েছে তাতে।

মহীনের কোলের উপর ঝুপ করে যূথী বসে পড়ল। হাসির আভায় ঝলসিত মুখখানা। কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ডাকে, ওগো—

খাটের তল থেকে খুক—

বিপন্ন মহীন বলে, লাগছে গো। কম ভার নও তো তুমি।

যাও—বলে কৃত্রিম কোপে যূথী তাড়া দিয়ে উঠল। বিজলী-দীপ্তির মতো তীক্ষ্ম দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিল ঘরের চারিদিকে। সুঠাম বাহু দুটিতে মহীনের গলা জড়িয়ে কৌতুক-ভরা মৃদুকণ্ঠে ডাকে, প্রাণেশ্বর—

খুক-খুক-খুক—

হাসি হচ্ছে রুণুর একটা রোগ। এই নবেলি কান্ড দেখে কতক্ষণ সে থাকবে না হেসে? খাটের নিচে সামনেটায় বাসনপত্র উপুড় করা। তার ওদিকে কম্বল পেতে দিব্যি আয়েশ করে শুয়েছেন রুণু আর সৌদামিনী। কি করা যায়—একা রুণু কিছুতে রাজি হল না যে! তার ভয় করে। কিন্তু সমস্ত মাটি করে বুঝি হেসে! সৌদামিনী তাড়াতাড়ি তার মুখ চেপে ধরলেন।

আর ওদিকে খাটের উপরে মাটি করল বেরসিক মহীনটা। চমৎকার জমে এসেছিল নূতন বউকে সে ধমকে উঠল হঠাৎ। তোমার পায়ে কাদা—কাদা লাগালে কোত্থেকে বলো তো? পা ধুয়ে এসো—।

জলের ঘটি নিয়ে পা ধুতে গিয়ে—ওমা, এমন বজ্জাত যূথীটা, আর মহীনও আছে ষড়যন্ত্রের মধ্যে—হুড়হুড় করে যূথী এই মাঘের


সবচেয়ে
সুন্দর
উপহার...
... হ'ল আসল গিনি স্বর্ণের তৈরী একটি পরিচ্ছন্ন আভরণ, যার ভাস্বর দ্যুতির ভেতর দিয়েই অভিব্যক্ত হয় প্রীতি ও আন্তরিকতা। উপহারে সোনার জিনিষ নির্ব্বাচনের সময় আমাদের অভিজ্ঞতার ওপর আপনি নিশ্চিন্তভাবেই নির্ভর করতে পারেন।
এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স
সন এণ্ড গ্র্যাণ্ডসনস্ অফ লেট্ বি, সরকার
প্রখ্যাত গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মাতা ও হীরক ব্যবসায়ী
১২৪, ১২৪।১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন বি, বি, ১৭৬১
COMARTS

রাত্রে জল ঢেলে দিল খাটের নিচে। কম্বল কাপড়চোপড় ভিজে জবজবে। জল না ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিত যদি, সে শাস্তি বেশি আরামের হত। দুয়োর খুলে হি-হি করতে করতে বারান্দা দিয়ে তাঁরা পালাচ্ছেন, একহাতে জলের ঘটি আর এক হাতে টর্চ জেলে যূথী তাড়া করেছে পিছনে। শিয়রের জানলার বাইরে আর একটি ছায়ামূর্তি—আরও একজন বাইরে থেকে দেখছিল লুকিয়ে লুকিয়ে। একেবারে সামনা-সামনি পড়ে গেছে, পালাবার চেষ্টা করছে,—যূথী টর্চ ফেলল মুখে। বাসন্তী। অশ্রুর ধারা বয়ে যাচ্ছে মুখের উপর দিয়ে।

আপনি কাঁদছেন? যূথী বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে যায়। কেন কাঁদছেন আপনি মা?

কই, না—কাঁদছি না তো আমি—

ধরাগলায় জবাব দিয়ে বাসন্তী পাশ কাটিয়ে চলে গেল। সৌদামিনী গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন মেয়েকে। স্থির পাষাণমূর্তির মতো খানিক দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে যূথী ঘরে ঢুকল। মা-বাপের কত গালিগালাজ খেয়ে কত প্রতীক্ষার পর এই বিয়ে। খুশিতে যূথী এতক্ষণ ঝলমল করছিল; হাওয়ায় উড়ছিল যেন তার মন। শাশুড়ির দুঃখ হয়েছে তাতে? জানলা অল্প একটু ফাঁক করে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন, এদের আনন্দে চোখে তাঁর জল এসে গেল? অভিমানে নববধূর মুখ থমথম করতে লাগল।

বারান্দায় বসে পড়েছেন সৌদামিনী। মায়ের কোলে মুখ গুঁজে বাসন্তী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ছাব্বিশ বছরের পুরানো শোক আজ উচ্ছ্বসিত হয়েছে। সৌদামিনী ভর্ৎসনার সুরে বলছেন, ছিঃ, বাসন্তী—কাঁদছিস তুই সেই থেকে? তারাই সব—আজকে এই তো আমাদের ঘরে ঘরে—

চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললেন, ওঠ্। ফিরে এসেছে সেই তারাই তো—

চোখ বুঁজে সত্যিই সৌদামিনী উপলব্ধি করছেন, এই মহীনের দল তারাই—যারা বিদায় নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল পথে-প্রান্তরে, দেশলাইয়ের এক একটা কাঠির মতো অবহেলায় নিজেদের পুড়িয়ে দিয়ে গেল। স্নেহোচ্ছল বাংলার বাউলেরা যাদের ফিরে আসবার গান গেয়ে গেয়ে বেড়ায়, গান শুনে চোখ মোছেন মায়েরা। তারাই দেশের কোল জুড়ে ফিরে এসেছে—এই হাসিমুখ তরুণ-তরুণীদের মধ্যে, প্রাণ-হিল্লোলের মধ্যে, এই আলো-ভালবাসা আর আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে। বড় দুঃখের মধ্যেও সৌদামিনীর মনে ফুলের মতো ফুটে থাকত অরিজিতের মুখখানা, চিত্ত-ভূমে গন্ধ ছড়াত, সে গন্ধে মধুর হয়ে উঠত চারি-দিককার এত নৈরাশ্য। খেটেছেন, তিনি খেটে চলেছেন এতটা বয়স অবধি, বার্ধক্য ও জরাকে আমল দেননি। পাখী যেমন একটা একটা করে একটু একটু করে খড়কুটো সঞ্চয় করে, নীড় বাঁধবে বলে। আজকে মহীন বড় হয়েছে, ঠিক বাপের ছেলেই হয়েছে সে। হিংস্র ভয়াল মূর্তিতে নয়—চোখে এদের নূতন আলো, মনে বিচিত্র স্বপ্নাবেশ। খাণ্ডবদাহী আগুন এরা ঢেকে রেখেছে শ্বেত শুভ্র খদ্দরের নিচে। আত্মার প্রদীপ্ত আলোয় কোটি কোটি দুঃখীকে উদ্বুদ্ধ করে গ্রামে গ্রামে, সত্যের আগ্রহে বেয়নেট ভোঁতা করে দিয়েছে। এক অস্ত্র বের করেছে—অ্যাটম বোমার চেয়েও ভীষণতর। এ অস্ত্র দিয়ে মানুষ মারে না, মানুষের হিংসা মেরে মেরে ফেলছে। কটিবাস দ্রোণগুরুর কাছে রণজর্জর পৃথিবী এগিয়ে আসছে নতজানু হয়ে এই মহাঅস্ত্রে দীক্ষা নেবার জন্য।



কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদ

শ্রীবিমল মিত্র

শেষ রাত্রের দিকে সদানন্দ রায়ের একটু তন্দ্রা এল।

শীতের রাত। কাশতে কাশতে সমস্ত শরীর ব্যথা হয়ে গেছে। শেষ রাত্রের চাঁদের আলো ফেটে পড়ছে পৃথিবীতে—সদানন্দ রায়ের দেউড়ীতে, অন্দর মহলের উঠোনে—আর তাঁর শোবার ঘরের মেঝেয়। তাঁর মনে হোল—পাশের হল্ ঘর যেন অনেক নারী আর অনেক পুরুষের কণ্ঠে সচকিত হয়ে উঠেছে। সেই মাঝখানে ওস্তাদজীর সারেঙ্গী, ঢিমে আর মিঠে লয়ের তবলা, আর আসর জুড়ে নাচ। একটা মেয়ে নেচে ক্লান্ত হয় আর একটা আসে! অফুরন্ত নাচ—অফুরন্ত হাসি—সদানন্দ রায়ের বাগান বাড়ীতে ছিল জীবনের সম্পূর্ণ পূর্ণতা!

ঘুমের মধ্যেই সদানন্দ চীৎকার করে উঠলেন—কে—কে—কে—

তা'র মনে হোল যেন হঠাৎ যোগমায়া এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল। সেই আগেকার মতন প্রতিদিন সকাল বেলায়—স্নান করে উঠে ভিজে চুলে! সারারাত্রি জেগে অত্যাচার করে সকালের দিকে ঘুমুতে সুরু করতেন সদানন্দ, তারপর ঘুম ভাঙতো দশটার সময়! যোগমায়া পাশে এসে ডাকতো না—শুধু পাশে এলেই সদানন্দর ঘুম ভেঙে যেতো! এক একদিন যোগমায়ার চোখ দিয়ে জল পড়তো—আড়ালে, গোপনে! পিতৃ-পুরুষের সমস্ত গৌরব, সমস্ত সম্মান, মর্যাদা, শিক্ষা সব তুমি নষ্ট করলে? চোখে বোধ হয় তার ভাষা ছিল।

ওই যে ওই ছ'শো বাড়ী—ওগুলো এক এক করে সদানন্দর চোখের সামনে উঠলো। যেন উইএর ঢিবি-দেখতে দেখতে গাছপালা বন, মাঠ সব ঢেকে ফেললে! উইয়ের ঢিবি না তো কী! সদানন্দ রায়ের বিরাট বাড়ীর পাশে ওগুলো তো উই ঢিবিই! হো হো করে হাসতে ইচ্ছে করে! ওরা বলে পোর্টিকো, ওরা বলে গ্যারাজ, ওরা বলে ব্যালকনি—কন্‌ক্রীট আর জয়েণ্ট, সিমেণ্ট আর লোহা! সামার-হাউস, কিচেন গার্ডেন, বাবুর্চি, খানসামা আউট-হাউস! সদানন্দ রায়ের আস্তাবল বাড়ীর সঙ্গেই তুলনা হয় না কি!

তিনশো বিঘে জমি! জমি নয়—জমিদারী!

কলকাতার উপকণ্ঠে এতখানি জমি! একতাল হীরে! ঘোড়ার গাড়ী টগ্‌বগ্ করে' আসতো সকালবেলা! দু'পাশ থেকে দু'জন সহিস্ এসে ঘোড়ার লাগাম ধরতো! তখন আস্তাবল বাড়ীর চারপাশে ছিল লিচুগাছের জঙ্গল। ঘোড়া দু'টোকে নিয়ে যেতো ডলাই-মলাই করতে—আর সদানন্দ রায় আসতেন এই হলঘরে! এই ঘরের দরজা দিয়ে তখন দিগন্তসীমা পর্যন্ত দেখা যেত চারদিকে। উত্তরে ছিল মস্ত দশ বিঘে আয়তনের এক ঝিল। আর চারিদিকে ছিল বাগান—ফলের, ফুলের, পাতার, লতার আর পাখীর আর পাখীর গানের! তত পাখীও বোধ হয় আজ-কাল নেই আর! ফুলের নেই সুবাস, ফলের নেই সেই স্বাদ! তখন এখানে সন্ধ্যার পর শেয়াল ডাকতো। কিন্তু সেদিন আর নেই—

সেদিন বিকেল বেলা।

—সদানন্দ বাবু আছেন?

লোকটিকে একেবারে বৈঠকখানার ভেতরে ডেকে আনা হোল।

—কিছু জমি কিনতে চাই আমি—বসবাস করবো—

—কতখানি চাই?

—এই বিঘে খানেক—

পাঁচশো করে কাঠা পড়বে—

তা'তেই রাজি। একখানা বাড়ী হলো। সন্ধেবেলা একটা তবু প্রতিবেশী পাওয়া গেল।

তারপর আর একদিন—

—হাজার করে কাঠা পড়বে—

তা'তেই রাজি! তারপর আর একদিন—

দু'হাজার করে পড়বে—

এমনি করে আঙ্কিক গতি লাফিয়ে লাফিয়ে পাঁচ হাজার, ছ' হাজার, সাত হাজারে দাঁড়ালো। আর একতিল জমি নেই। দেখতে দেখতে বন বাগান হলো শহর—আর সঙ্গে সঙ্গে এল পাওয়ার হাউস, ওয়াটার পাম্প্, মিউনিসিপ্যালিটি, ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট! চেহারা গেল বদলে! ব্যারিষ্টার সেন এল, এল নৃত্য-কুশলী প্রমীলা মৈত্র, এল গবর্ণমেণ্ট অফিসার প্রশান্ত মিত্তির—সিনেমা ষ্টার উৎপল দাশ—শেয়ার ব্রোকার পরিমল চ্যাটার্জি—ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সুশীল সেন—ইংরেজির



চোখে সান-গ্লাস লাগিয়ে......

প্রফেসর মিহির ভট্‌চায্—ইত্যাদি ইত্যাদি! সকলকে রায়-জ্যাঠা চিনতে পারেন না! এ-যুগের ছেলেদের মুখ চিনে রাখা কত শক্ত!

কত বিচিত্র পাঞ্জাবী, পায়জামা, সালোয়ার, সেরোয়ানী, স্যুট্ আর টুপী! তেজ যেন সব ফেটে পড়ছে! গাড়ী, বাড়ী, টেলিফোন, ফ্যান, রেডিও, জর্জেট আর সিল্কের তেজ! দু'চোখ জ্বলে যায়!

—কে?

প্রদীপ্তকে রায়-জ্যাঠা চিনতে পারেন নি! দুপুর রোদে চোখে 'সান্‌গ্লাস' লাগিয়ে গেলে চিনতে না পারারই কথা!

—আমি জ্যাঠামশাই—আমি—প্রদীপ্ত নত হ'য়ে বললে।

—তা', এই রোদে ছাতা নাও না কেন—ওই তোমাদের দোষ, আজকালকার ছেলেরা কী যে হয়েছে—শুকনো একটু সহানুভূতি মেশানো উপদেশাত্মক হাসি হাসলেন। আজ-কালকার ছেলে বুক ফুলিয়ে চলে—কিছুকেই কেয়ার নেই! বিশ বছর বয়েসের ছোকরা—তেজ দেখ না! ওই বিশ থেকে বত্রিশ হবে—বত্রিশ থেকে বেয়াল্লিশ—বেয়াল্লিশ থেকে বাহান্ন—বাহান্ন থেকে বাষট্টি—তারপরেই ব্যস্!

সন্ধ্যাবেলা হলঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সদানন্দ রায়ের চোখ জ্বলে ওঠে! সমস্ত "ইন্দ্রানী পার্ক"এ যেন দাউ দাউ করে' আগুন জ্বলছে! অর্থের আর ঐশ্বর্যের, যৌবনের আর জয়োল্লাসের আগুন। সদানন্দ রায়ের চোখে ধাঁধা লাগে! ওই জমি, ওই ঐশ্বর্য, ওই গর্ব—ও তো সদানন্দ রায়েরই জন্যে! নিজেরই সৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে যেন লজ্জায় মরে যেতে লাগলেন তিনি! এক একটি বাড়ী উঠেছে তাঁরই জমির ওপর, আর তাঁর বুকখানা ফুলে উঠেছে! একদিন তো সবাই তাঁরই বিজয় ঘোষণা করবে! বাছাই করা বড়লোক—আর বাছাই করা আধুনিক শিক্ষিত লোক দিয়ে গড়া তাঁর এই ইন্দ্রানী পার্ক।

কিন্তু তা তো হয়নি। চারিদিকে যখন দীপ জ্বলে উঠতে লাগলো, কোন্ অদৃশ্য ইঙ্গিতে তাঁর ঘরে ঘনিয়ে উঠলো অন্ধকার! যোগমায়া আজ নেই! দুঃখের শেষ হয়েছে একদিন! একটার পর একটা ছেলে জন্মেছে আর মরেছে।

—খোকা আছিস্—খোকা—?

প্রতিধ্বনি ঘর থেকে ঘরে আঘাত করে ফিরলো। চামচিকে পায়রা আজ সারা বাড়ীটায় অখণ্ড আধিপত্য চালিয়েছে! খোকাও কি মানুষ হলো! কোথায় যে থাকে সারাদিন—কী যে করে—কখন যে আসে—কখন যায় কে বলতে পারে।

ফাটা সিমেণ্টের মেঝের ওপর কার যেন পায়ের শব্দ হলো! সদানন্দ রায় পেছনে ফিরলেন—বিশু—বিশু সামনে এসে দাঁড়াল।

—ঝাঁট্ দিচ্ছিস? ভাল ক'রে ঝাঁট দে, বড্ড ধুলো হয় ঘরে—আর সরকারবাবুকে একবার ডাক তো—

সদানন্দ দম নিতে লাগলেন। এক সঙ্গে বেশী কথা বলতে পারেন না, দম আটকে আসে। সামনের দেয়ালটা জল লেগে লেগে স্যাঁত্‌সেঁতে দাগে ভরা—তারই পাশে একটা বিরাট ছবি। বহুকালের আগেকার অয়েল-পেণ্টিং। সোনালী ফ্রেম—আর চেন দিয়ে ঝোলান! সারা দেয়ালের গায়ে সারি সারি ছবি টানান—নগ্ন নরনারীর বিচিত্র প্রদর্শনী। এইটিই ছিল নাচঘর। এখানে কারুরই আসবার অধিকার ছিল না। এমনকি যোগমায়া পর্যন্ত না! রাতের পর রাত কাটতো সদানন্দের এই নাচঘরে—আলমারীতে থাকতো সুরা—আ[র] সামনে থাকতো নারী। কত বিচিত্র নারী—ক[ত] বিচিত্র সুরা—কত বিচিত্র ইতিহাস! সদান[ন্দ] রায়ের হাসি আসে—হাসি আসে ওদের তে[জ] দেখে। কী নিয়ে তেজ করে! তার যা ছিল-ওদের তা' কারুরই নেই! এক পেগ হুইস্কি খেয়ে যা'রা তাল সামলাতে পারে না—তাদে[র] আবার গর্ব!

—আমায় ডাকছিলেন আপনি—

সরকার সন্ত্রস্তপদে এসে দাঁড়িয়েছে।

—হ্যাঁ বলছিলুম কি, সেই মাড়োয়ার[ী] বাচ্ছা আর এসেছিল?

—আজ্ঞে, এখনও এসে বসে' আছে?

—কী চায়?

—আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

—বলে' দাও—দেখা হবে না। আমার শরীর খারাপ, আর শোন—

সদানন্দ রায় একটু দ্বিধা করলেন। দ্বিধা হওয়া স্বাভাবিক। তাঁরই জমিতে বাস করে তাঁকেই তারা উৎখাত করতে চায়! বললেন—তারা এসেছিল? সেই তারা?

ইঙ্গিতটা অস্পষ্ট হ'লেও সরকার বুঝতে পারলে—আজ্ঞে এসেছিল—

কে, কে—সদানন্দ রায় জিগ্যেস করলেন।

—ওরা সবাই। ব্যারিষ্টার সেন, প্রশান্ত মিত্তির, এখানকার সবাই এসেছিল। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিল। বললে, —একটা হাই ইস্কুল করতে চায় এ-বাড়ীতে—আর কোথাও জায়গা পাচ্ছে না, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার বড় কষ্ট হচ্ছে—বললে পাঁচশো টাকা ভাড়া দেবে মাসে—

থাম, থাম, শুনেছি—চীৎকার করে উঠলেন সদানন্দ। অর্থাৎ তাঁকে ছাড়তে হবে তাঁর এই বাড়ী!

ছোটলোকের স্পর্ধা আজ সীমা ছাড়িয়ে উঠেছে।

সদানন্দ রায় বললেন—এদিকে এস স'রে—ওই দেখ—

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে হাত বাড়িয়ে সদানন্দ বলতে লাগলেন—ওই আস্তাবল বাড়ী দেখছ—ওইখানে ছিল লিচুবন,—তুমি দেখনি—তোমার বাবা সব জানতো—আর ওই উত্তর কোণে ছিল দশ বিঘে একটা ঝিল—আর যত সব উইঢিবির মত বাড়ী দেখছ—ওগুলো ছিল বাগান, একশো আট রকমের আমগাছ ছিল—পুব দিকে ছিল কমলা লেবুর বাগান—আর—আর—

সদানন্দ রায় হাঁফিয়ে উঠলেন। খানিক দম নিয়ে বললেন—আর আজ ওরা আমাকে এ-বাড়ী থেকে হটিয়ে দিতে চায়! আমার নিজের বাড়ীতেও আমার অধিকার নেই? তুমি কি বললে তাদের?

—বললাম, হুজুরের শরীর খারাপ, এখন দেখা হবে না!...



—আমি আপনার এই তের বিঘা জমিটা কিনতে চাই হুজুর।

—এর পরে যেদিন আসবে, চৌধুরীকে ব'লে দিও যেন লাঠিপেটা ক'রে তাড়ায়। জিগ্যেস করলে বলো আমার হুকুম!...

সরকার দাঁড়িয়েছিল।

সদানন্দ বললেন—যাও—আর শোন, মাড়োয়ারী বাচ্ছাকে আজ বিকেলে আমার সংগে দেখা করতে বলো—বিকেল পাঁচটায়।

সরকার চলে গেল। একলা বসে বসে সদানন্দ রায়ের মনে হলো—আর বোধ হয় তিনি নিজেকে রাখতে পারলেন না। বোধ হয় সব যাবে। সুদে আসলে দেনা যে তাঁর অভ্রভেদী হ'য়ে উঠেছে! যাক্—কার তোয়াক্কা তিনি করেন? যোগমায়া মরে বেঁচেছে—আর খোকা? সে তো এ-বাড়ীর ছেলে নয়! হাই স্কুল করে কি হবে! মাড়োয়ারীরাই পারবে—ওরাই পারবে!

• •

বিকেলবেলা সদানন্দ রায় বসেছিলেন নাচঘরের ভেতর। সতর্কপদে খোকা এসে দাঁড়াল।

সদানন্দ রায় বুঝতে পারলেন। বললেন—কি চাই? টাকা?

খোকা কোন কথা বললে না।

—তা আমি বুঝেছি—কিন্তু হাতে আমার টাকা নেই—

সদানন্দ রায়ের চোখের সামনে যোগমায়ার ছবিটা ফুটে উঠলো। তুমি তো জানো—খোকা আমাদের কত সাধের ছেলে। কত সাধনা করে' কত তপস্যা করে' ওকে বাঁচিয়েছি। কিন্তু আমি কি করবো! তুমিই বা কি করতে? আমি আর কিছু রাখতে পারবো না যোগমায়া, সব যাবে! বোধ হয় এককণা জমিও রাখতে পারলাম না। মাথা গোঁজবার আশ্রয়টুকুও বোধ হয় হারাতে হয় এবার। আমাদের বংশের রক্তে যে ঘুণ ধরেছে!

সদানন্দ আবার বলতে লাগলেন—মানুষ তো তুমি হ'লে না খোকা, আমিও হইনি। এর জন্যে একদিন আমারই মতন তোমাকেও অনুতাপ করতে হবে—কিন্তু আমি আর তোমাকে সাহায্য করতে পারবো না!...

খোকা যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। সদানন্দ তাকে আর ডাকলেন না। সামনের দিকে দেয়ালের গায়ে বিরাট ছবিখানার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। কোন্ নিলেম থেকে কেনা বিলিতী ছবি একটাঃ একটা বিরাট গ্লোবের ওপর একটা লোক উঁচু দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দু'টি পা তার লোহার চেন্ দিয়ে গ্লোবের সংগে বাঁধা; গ্লোবে আগুন লেগেছে—দাউ দাউ করে' আগুন জ্বলছে।—আর মাথার ওপর শকুনির দল তাকে ছেঁকে ধরেছে—তার সেই অসহায় আর্ত কাতর অবস্থা দেখে সদানন্দ আজ কেমন আচ্ছন্ন হ'য়ে রইলেন। ছবিটা অনেকবার দেখা —কিন্তু আজ যেন ওটাকে নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন। দূরে বোধ হয় সূর্য উঠছে—কে জানে কোন্ আশার বাণী ও বয়ে আনবে—কিন্তু পৃথিবীতে তার কোনও আশ্রয়ই নেই। অনেকবার দেখা সেই ছবিটার দিকে চেয়ে চেয়ে সদানন্দ রায়ের চোখ দুটো জ্বল্‌জ্বল্ করে' উঠলো।



—একটা দুধে গোখ্‌রো মাথার ওপর এক হাত ফণা তুলে দুলছে

সরকার এসে জানালে—সেই মাড়োয়ারী এসেছে—

—এখানে নিয়ে এস—সদানন্দ রায় ইঙ্গিতে জানালেন।

খানিকক্ষণ পরেই মারোয়াড়ীটা এল। কাছে আসতেই সদানন্দ রায়ের সামনে ছাদ থেকে একটা টিকটিকি থপ করে' মেঝেতে পড়েই কিলবিল করে দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠে গেল। কী আশ্চর্য! সদানন্দ রায়ের সমস্ত শরীরটা শিরশির করে উঠলো।

বললেন—আসুন শেঠ জি!

শেঠজি বিরাট ভুঁড়ি আর পাগড়ী নিয়ে সামনের স্প্রিংএর চেয়ারে স্থির হ'য়ে বসল।

সদানন্দ বললেন—কী চাই আপনার, গুছিয়ে বলুন তো—

শেঠজি বললে,—হুজুরের সরকারকে আমি সবই বলেছি—আমি আপনার এই তের বিঘে জমিটা কিনতে চাই—আপনি যা দাম চান দেব—হুজুরের কৃপায় আমি চারটে মিলের মালিক—দু'টো জুট আর দুটো কাপড়ের মিল—এখন আপনার মেহেরবানি—

সদানন্দ রায় স্থির দৃষ্টিতে বাইরের জানালা দিয়ে দূর দিগন্তবলয়ের দিকে চেয়ে রইলেন—যেন বিনিদ্র শ্মশানপাল দয়ামায়ালেশ-হীন দৃষ্টিতে আপনার রাজ্য-সীমা নিরীক্ষণ করছেন। বহু দূরে রেল লাইনের ওপারে মন্দা তালগাছের বন, ফল হয় না, এক কাঁড়ি জটায় আচ্ছন্ন স্থির হয়ে আছে। তার পাশে খাড়ি গঙ্গার দুধার দিয়ে পিপুল আর পিটুলি গাছের ছাড়া ছাড়া সারি—প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে প্রহর গুণছে অনাদিকাল ধরে। অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের মত নির্বাক সব—সদানন্দ রায় যেন তাদেরই একজন। তাদেরই মত অধিকারহীন—কিন্তু অভিযোগশূন্যে নয়!

সদানন্দ রায়ের গলা থর থর করে কাঁপতে লাগলো। বললেন—এ জমিটা আপনি কি কাজে লাগাতে চান?

শেঠজি বললে—আমি বাবুজি এখানে একটা ময়দার কল—আর ভেজিটেবল ঘিয়ের কারখানা করবো মনে করেছি...কাছাকাছি রেল লাইন আছে, গঙ্গা আছে—আমার ভারী সুবিধে হয়—

সদানন্দ রায় হঠাৎ একটা আচমকা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। ইন্দ্রাণী পার্ক'এর লাল লাল রাস্তা দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে মোটরের আসা-যাওয়া...কনক্রীটের স্ট্রীমলাইন বাড়ীর ভেতর স্ট্রীমলাইন মানুষের চলা-ফেরা—আর সবার ওপর অর্থ আর স্বাচ্ছন্দ্যের ঔজ্জ্বল্য...সদানন্দ রায়ের জরাজীর্ণ চোখ আর মনের ওপর কি অপরিসীম অত্যাচার!

দুটো চোখ শ্বাপদের মত তীক্ষ্ণ করে বললেন—এক কাজ করতে পারবেন শেঠজি? তাহলে খুব সস্তায় আমি সমস্ত জমিটা ছেড়ে দিতে পারি—পারবেন?

শেঠজি নিকটতর হয়ে বললে—ফরমাজ করুন হুজুর!

সদানন্দ রায় বললেন—সমস্ত ব্যাপারটা খুলেই বলি—শেঠজি, এই যে জমিদারী

দেখছেন—তিনশো বিঘের জমিদারী—এটা সাতশো লাটের একটা। হরিপালের মহারাজ গৌরীকান্তের নাম শুনেছেন—আমাদের আদি পূর্বপুরুষ গৌরীকান্ত, তাঁর শেষ বংশধর আমি আজ এই তেরো বিঘে জমির মালিক।......আজ পৈত্রিক ভিটে বেচতে বসেছি—আমরা বাঙালী নই—কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ—বাঙলাদেশে এসে বাঙালী হ'য়ে গেছি...আমি সেই বংশের শেষ কলঙ্ক...

সদানন্দর গলাটা দম আটকে আড়ষ্ট হয়ে এল। খানিকক্ষণ জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানতে লাগলেন—চোখ দুটো তীক্ষ্ম হয়ে উঠলো দুঃখে আর অপমানে আর আত্ম-অনুশোচনায়—

শেঠজি বললে—আমি সব শুনেছি আপনার সরকারবাবুর কাছে—

তারপর সদানন্দ রায় বলতে লাগলেন পূর্বপুরুষের ইতিহাস।

মহারাজ গৌরীকান্ত ছিলেন মেষপালক। গরু মোষ আর ভেড়া নিয়ে মাঠে মাঠে ঘুরতেন—আর আড় বাঁশী বাজাতেন। হিন্দুস্থানী ছেলে—পরনে নেংটি—খালি গা—খালি পা—বিদেশে এসেছিলেন ভাগ্য-পরীক্ষায়! তেষ্টা পেলে পুকুরের জল খেতেন—আর রোদবৃষ্টিতে গাছের তলায় আশ্রয় নিতেন! সাতশো বছর আগেকার কথা! চালের মণ ছিল চার আনা—কিন্তু সেই সস্তা ভাতের জন্যে দাসত্ব করতে হোত এক গয়লার। সন্ধ্যাবেলা গাছতলায় কাঠের আগুনে চাপাটি পুড়িয়ে নিতে হোত নিজের হাতে—ব্রাহ্মণের ছেলে তো আর নিচু জাতের ছোঁয়া খেতে পারেন না—

তারপর একদিন কৃপা হোল দেবতার। এক অশত্থ গাছতলায় শুয়ে আছেন—এমন সময় ফোঁস্ ফোঁস্ আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে গেল—চোখ চেয়ে দেখলেন একটা দুধে গোখ্‌রো মাথার ওপর এক হাত উঁচু হ'য়ে ফণা তুলে দুলছে—আর মুখ দিয়ে ওই শব্দ বার করছে! কী আশ্চর্য! কিন্তু বুদ্ধি হারালেন না তিনি—নিঃশব্দে বাঁশীটা তুলে নিয়ে বাজাতে আরম্ভ করলেন—; তিনি বাজান্—আর সাপও তত দোলে—! কতক্ষণ বাজালেন মনে নেই—শেষে সেই পথ দিয়ে এক সন্ন্যাসী যাচ্ছিল—সন্ন্যাসী সিদ্ধপুরুষ—তিনি ওই দেখেই থম্‌কে দাঁড়ালেন—তারপর মন্ত্রবলে সাপটাকে ধরতেই সাপটা কে'চোর মতন নরম হ'য়ে গেল। সন্ন্যাসী সাপটাকে নিয়ে মাঠের মধ্যে ছেড়ে দিলেন। তারপর সন্ন্যাসী গৌরীকান্তর কাছে এসে বললেন—তুই বেটা রাজা হবি—বলে' তাঁর ঝুলি থেকে একটা শালগ্রাম শিলা বার করে' বললেন—রত্ন রেখে দে—এর সেবা করিস—রাজা হবি—

গৌরীকান্ত রাজা হ'লেন—মহারাজা হ'লেন। যা'তে হাত দেন সোনা ফলে—লাটে ওঠা জমিদারী কেনেন—আর মাটির জমিদারী সোনা ফলায়। দুর্গোৎসব প্রতিষ্ঠা করলেন—মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন—বারো মাসে বিয়াল্লিশ পার্বন—অতিথশালা করলেন—অন্নসত্র করলেন—পুকুর করলেন—সেই বংশ বাড়তে বাড়তে এসে প্রথম হোঁচট্ খেল দু'শো বছর আগে—অন্নদাকান্তর সময়ে—প্রথম ইংরেজ আমলে—! অন্নদাকান্ত বাপের এক ছেলে—তিনি মদ ধরলেন—আর আনুষঙ্গিক সব কিছু! ম্লেচ্ছদের সঙ্গে মিশে পুরো ম্লেচ্ছ হ'য়ে গেলেন—অতিথশালায় অতিথ এসে ফিরে যায়—পুকুর শ্যাওলা পড়ে মজে যায়—শালগ্রাম শিলার নিত্য পূজো হয় না—সহরে এসে বাগানবাড়ী করলেন—ইয়ারের দল জুটলো—ইংরেজী-নবীশ ম্যানেজার এল—গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী বাড়ীতে ভিক্ষে করতে এলে তা'কে ধরে' গোঁফ দাড়ী মাথা কামিয়ে দিয়ে গরুর মাংস জিভে ছুঁইয়ে দেন—তারপর চাকা আর ঘোরে না—জের চললো বহুদিন—তারপর জমি গেল—জমিদারী গেল—থাকলো শুধু এই বাগান-বাড়ীর তিনশো বিঘে জমি—সেই ভাঙনের শেষ ধাপে জন্ম হোল আমার—সেই মহারাজ গৌরীকান্তের বংশের ঘুণ ধরা রক্তে যেটুকু ঘুণ ধরতে বাকী ছিল—তা' সম্পূর্ণ করলুম আমি—সদানন্দ রায়—আজ তেরো বিঘে বাগানবাড়ীর মালিক—

শেঠজি বললে—বাবুজি আমি এখানে আবার মন্দির প্রতিষ্ঠা করবো—আবার এখানে সোনা ফলবে—আপনি দেখে নেবেন—

সদানন্দ কথা বলে' হাঁফাচ্ছিলেন। বললেন—ওই সামনে চেয়ে দেখুন—ওই যে আস্তাবল বাড়ী দেখছেন—ওইখানে ছিল লিচু বন—সেসব কেউ দেখেনি—যারা দেখেছে তা'রা আজ কেউ বে'চে নেই—আর ওই উত্তর কোণে ছিল ঝিল্—দশ বিঘে একটা ঝিল—আর ওই যত উই ঢিবির মত বাড়ী দেখছেন—ওইখানে ছিল বাগান—একশো আট রকমের আমগাছ ছিল—পুব দিকে ছিল কমলালেবুর বাগান—আর—আর—

সদানন্দ রায়ের দেয়ালের দিকে নজর পড়লো ঃ যে-টিক্‌টিকিটা খানিক আগেই তাঁর সামনে মেঝের ওপর থপ্ করে' পড়ে' গিয়েছিল সেটা এখন নিচু মুখো হ'য়ে তাঁর দিকে তীক্ষ্মদৃষ্টিতে চেয়ে আছে...আর গলার নলিটা ধুক্ ধুক্ করে' উঠছে পড়ছে...সদানন্দ রায় ভয়ে সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

শেঠজি বললে—আপনি দেখে নেবেন বাবুজি—আমি সোনা ফলিয়ে দেব এখানে—ভেজিটেবল্ ঘি—আর ময়দার কল বসাবো—আমি বিলেত থেকে কেমিষ্ট আনাবো—সমস্ত জমি আপনার সোনা দিয়ে মুড়ে দেব—আর আপনি যদি চান আমি আমার ব্যবসার মুনাফা দেব—

সদানন্দ রায় শেঠজির দিকে ভাল করে' চেয়ে দেখলেন। গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ের ওপর এ'টে বসেছে—মিলের ফুলপাড় ধুতি ফুড়ে দেহের চর্বি বেরুচ্ছে—মাথায় হলদে পাগড়ী পাকে পাকে মাথায় কেশবিরলতা ঢেকে দিয়েছে। হঠাৎ তাঁর মনে হোল—এ যেন সদানন্দ রায়ের পরমাত্মীয়।

সদানন্দ বললেন—এক সর্তে আমি আপনাকে দিতে পারি জমিটা—এখানে আপনি কারখানা খুলুন—খুলে ধোঁয়া আর ধুলো—কয়লার আর স্টীম্—রোগ আর জীবাণু—সীসে গলান বিষ আর কয়লা জ্বালান কালিতে ভরে তুলতে পারবেন? পারবেন—কল আর কুলিতে ছেয়ে ফেলতে—মড়কে আর মহামারীতে ভরে ফেলতে? পারবেন—ওদের মেরুদণ্ড বাঁকা করে দিতে—ওই বাড়ীগুলোকে করতে পারবেন ব্যারাক—কুলি আর মজুরের ব্যারাক—আলো আর আগুন দেখে পোকার মতন ছুটে আসবে আর মরবে! পারবেন—ওদের তেজ ভাঙতে! বড় তেজ ওদের! তেজে ওরা ফেটে পড়ছে—পারবেন—পারবেন?

সদানন্দ রায় আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে শেঠজির হাত দুটো চেপে ধরলেন।

শেঠজি বিস্মিত হয়ে সদানন্দর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

সদানন্দ আবার হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন—এমন কারখানা করুন যেন মানুষ একেবারে মেসিন হয়ে যায়। রোজ সকাল বেলা কারখানায় আসবে আর সন্ধ্যের সময় কুঁজো হয়ে বাড়ী ফিরে যাবে—রক্তের লাল রং কালো করে দিতে পারবেন—মুখ দিয়ে বেরুবে সাদা ফেনা আর মাথা দিয়ে ঝরবে কালো ঘাম! অবসর থাকবে না ভাববার—হাসবার—গান গাইবার—আর তেজ দেখাবার—পারবেন—পারবেন?

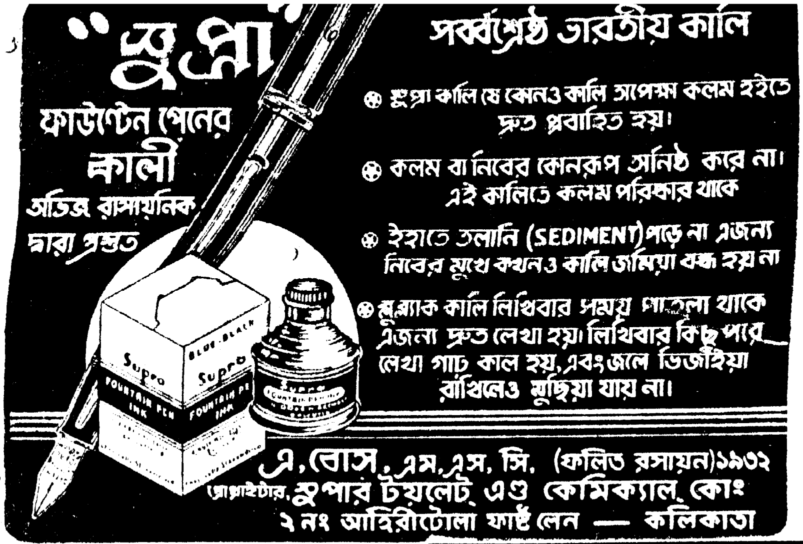
শেঠজি এক মুহূর্তে সব বুঝে নিলে। বললে—এ আর এমন শক্ত কথা কি?

সদানন্দ রায় কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে বললেন—আপনিও বিদেশী, আমিও বিদেশী—বাঙলাদেশ কারুরই ঘর নয়—আমার এ জমি আমি আপনাকে দিয়েই নিশ্চিন্ত হলাম—আমি এর জন্যে এক পয়সা নেব না! এমনিই দিয়ে দিলাম—

শেঠজির চোখ দুটো বিস্ময়ে বিস্ফারিত হোয়ে গেল!

—তবে একটা কথা, সদানন্দ বললেন—মহারাজ গৌরীকান্ত যে ভুল করেছিলেন, সে ভুল আর করবেন না শেঠজি—বাঙলা আপনারও ঘর নয়, আমারও ঘর নয়—এখানকার আয় করা টাকা—এখানে ব্যয় করবেন না—আর যেখানে ইচ্ছে খরচ করুন—

শেঠজি বললে—ঠিক কথা বলেছেন বাবুজি—


"সুপ্রা"
ফাউণ্টেন পেনের
কালী
অভিজ্ঞ রাসায়নিক
দ্বারা প্রস্তুত
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় কালি
সুপ্রা কালি যে কোনও কালি অপেক্ষা কলম হইতে দ্রুত প্রবাহিত হয়।
কলম বা নিবের কোনরূপ অনিষ্ঠ করে না। এই কালিতে কলম পরিষ্কার থাকে
ইহাতে তলানি (SEDIMENT) পড়ে না এজন্য নিবের মুখে কখনও কালি জমিয়া বন্ধ হয় না
ব্লু ব্ল্যাক কালি লিখিবার সময় পাতলা থাকে এজন্য দ্রুত লেখা হয়। লিখিবার কিছু পরে লেখা গাঢ় কাল হয়, এবং জলে ভিজাইয়া রাখিলেও মুছিয়া যায় না।
Supro
BLUE-BLACK
FOUNTAIN PEN INK
এ, বোস, এম, এস, সি, (ফলিত রসায়ন) ১৯৩২
প্রোপ্রাইটার, সুপার টয়লেট এণ্ড কেমিক্যাল কোং
২ নং আহিরীটোলা ফার্ষ্ট লেন — কলিকাতা


সুপ্রা
সুবাসিত
নারিকেল তৈল
তিল তৈল
আমলা তৈল
ও
ক্যাষ্টর অয়েল
প্রসাধনে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
সুপার টয়লেট ও কেমিক্যাল কোং
প্রোঃ এ, বোস, এম, এস সি,
পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা

পাশের ঘরে বিশুর পায়ের শব্দ হোল। সদানন্দ রায় বললেন—বিশু, সরকারবাবুকে একবার ডেকে দে তো এখানে—

তারপর শেঠজির দিকে ফিরে বললেন—এখনি তা'হলে একটা দলিলের মুসাবিদে করে ফেলা যাক্—

শেঠজি বললে—কি দরকার বাবুজি, কালই আমি আমার এটর্ণী নিয়ে আসবো—পাকা কাজ হয়ে যাবে।

সদানন্দ রায় বললেন—সেই ভাল।

শেঠজি বিদায় নিলে। সদানন্দ রায় কেমন আচ্ছন্নের মত দেয়ালের দিকে চাইলেন। চাইতেই নজরে পড়লো সেই ছবিটা। পৃথিবীতে আগুন লেগেছে—পা দুটো বাঁধা। ওপরে মাংস-লোলুপ শকুনের দল তাকে ছিঁড়ে খাবে—কোথাও আশ্রয় নেই তার! দূরে সূর্য উঠবে, তারই লাল আভা পূর্বদিগন্তে উদ্ভাসিত, সদানন্দ রায় আতঙ্কে দু'চোখ মুদ্রিত করলেন।

রাত না পোহাতেই আসবে মাড়োয়াড়ীর লোকজন। কুলি, মিস্ত্রি, মজুর।

আজ রাতে কি আর ঘুম হয় সদানন্দর! আর কেউ জানে না। ইন্দ্রাণী পার্কের লোক-জন কেউই তো জানে না। সরকারের হিসেব মিটিয়ে দিয়ে তাকে বিদেয় করা হয়েছে। এ বাড়ী আর তার নিজের বলা চলে না। এ ক'দিন বাস করতে দিয়েছে এই-ই যথেষ্ট! আজ অনেকদিন পরে খোকা এসেছে বাড়ীতে! পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছে। সদানন্দ রায় বিছানা ছেড়ে উঠলেন। দেশলাই দিয়ে মোমবাতিটা জ্বাললেন, রবারের চটিটা খাটের পাশেই ছিল—পায়ে গলালেন সেটা! নিজের বাড়ীর বহু পরিচিত আবেষ্টনী আজ তাঁর কাছে যেন নতুন ঠেকলো। ওইখানে পুবদেয়ালে টাঙান আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে যোগমায়া প্রসাধন করতো! পশ্চিম দেয়ালে ছিল সিংহবাহিনীর একটি পট! প্রত্যেকদিন ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে চুল আঁচড়ে কপালে সিঁদুরের ছোট একটি টিপ পরে গলায় আঁচল দিয়ে ঐ ছবিটাকে প্রণাম করত যোগমায়া।

সদানন্দ একদিন বলেছিলেন—কেন প্রণাম কর ওটাকে?

যোগমায়া বলেছিল—তোমার কল্যাণের জন্যে, খোকার কল্যাণের জন্যে—আমার আর কি আছে বল?

গোরীবেড়ের ঘোষাল বাড়ী থেকে যোগ-মায়াকে বউ করে আনা হয়েছিল। মহামানী বংশ ঘোষালদের! যে বংশের মেয়েরা কখনও অন্দরমহলের বাইরে পা বাড়ায়নি, সেই বংশের মেয়ে যোগমায়া! সংসারের নানা কর্তব্যের মধ্যে যোগমায়াকে যখনি দেখেছেন সদানন্দ, তখনি তাঁর অনুশোচনায় বুক ভরে উঠেছে—তাই এদানি সদানন্দ তাঁর মুখ দেখাই ছেড়ে দিয়েছিলেন—ঐ নাচ ঘরের ভেতরেই তাঁর দিনরাত কাটতো! আজ যোগ-মায়ার কথা মনে পড়তেই সদানন্দ কেমন বিচলিত হয়ে উঠলেন।

এক একটা ঘর পার হয়ে আসেন আর ঘরগুলোর ভেতর চাপা চাপা দীর্ঘশ্বাস যেন ঘরের ভিত্তিমূল পর্যন্ত নাড়িয়ে দেয়! সারি সারি ঘর পেরিয়ে এসে একটা ছোট বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন—এখান থেকে একটা কাঠের সিঁড়ি তেতলার ছাদে গিয়ে পৌঁছেছে। আর তারই দক্ষিণ দিকে একটা ছোট দরজা। দরজাটা খুলতেই একটা সিঁড়ি ধাপে ধাপে একেবারে নীচে একতলায় গিয়ে মিশেছে। এক হাতে মোমবাতিটা নিয়ে ধীরে ধীরে সদানন্দ রায় সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলেন। ছোট একটা কুঠুরী...ওপারে ফরাসদের ঘর—আর এপারে বিশুর শোবার ঘর—মাঝখানে এই চোর কুঠুরী। ঘরের কোণে একটা লোহার ডবল পাতের সিন্দুক। সদানন্দ রায় কুলুঙ্গীতে মোমবাতিটা রেখে সিন্দুকের ডালা খুলতে লাগলেন।

জীবনে অনেক অপব্যয় করেছেন সদানন্দ, কিন্তু যোগমায়ার গয়নাগুলো সব ওই সিন্দুকের মধ্যে রাখা আছে। যোগমায়ার একটা গয়নাতেও সদানন্দ রায় হাত দেননি। বাপের বাড়ী থেকে আনা বিশ ভরির নেকলেসটা এখনও আছে; জড়োয়ার চুড় আর মানতাসা, বিছে আর সিঁথি—আর মার দেওয়া হীরের কান—সব ওর মধ্যেই আছে। কাল সকাল হতেই তাঁকে এ বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে! পথে দাঁড়াতে হবে একেবারে নিরাশ্রয় হয়ে! ইন্দ্রাণী পার্কের সব লোক বিস্ফারিত চোখে দেখবে তাঁর এই নিঃস্বতার দৃশ্য! মহারাজ গোরীকান্তের বংশধর শেষ জমি-কণাটুকু পর্যন্ত নিঃশেষ করে একটা ভাড়াটে বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নেবে!

তিনটে চাবি খোলার পর তবে বড় ডালাটা খুললো! খুলতেই চকচক করে উঠলো সোনা আর জড়োয়ার গয়নাগুলো! পাশের ডালাটাও খুলে ফেললেন সদানন্দ! সেখানে ছিল মোহর—নবাবী আমলের মোহর আর রুপোর টাকা! বহু পুরুষের সঞ্চিত সব ধন—আজ বহুদিন পরে রাত্রির অন্ধকারে মোমবাতির ক্ষীণ আলোতে আবার ঝলমল করে উঠলো।

একবার মনে হোল থাক এসব! এদের বহুদিনের ঘুম আর ভাঙিয়ে নিজের কলঙ্ক বাড়াবেন না। কিন্তু কেন জানিনা তাঁর ভারি লোভ হোল! ওরা যেন যাদু জানে। সেই মধ্য রাত্রির অন্ধকারে সদানন্দ রায়ের মনে হোল যেন বহু যুগ-যুগান্তের ঘুমন্ত আত্মারা তার মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখছে! ওদের চাপা হাসির ঝিলিক যেন তাঁর সর্বাঙ্গে ঠিকরে পড়ছে! মনে হোল তাঁর স্পর্শ পেলেই আবার যেন সব প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে! অহল্যার মত পাষাণ হয়ে আছে শুধু তার স্পর্শের অপেক্ষায়।

হাত বাড়িয়ে সদানন্দ রায় সমস্ত স্পর্শ করলেন! ঠান্ডা মৃত প্রাণহীন ধাতু—মৃত মমির মত শুধু কঙ্কালের স্তূপ! মহেঞ্জো-দাড়োর অন্ধকূপ গুহায় যেন শত সহস্র বছরের অনাবিষ্কৃত স্মৃতি চিহ্ন!

হঠাৎ একটা কঠিন শক্ত জিনিষের স্পর্শে সদানন্দ রায় চমকে উঠলেন। কী ওটা! দৃঢ় মুষ্ঠিতে আঁকড়ে ধরলেন সেটাকে। অবধারিত মৃত্যুর মুখে একটা ছোট কুটিকে যেমন করে আঁকড়ে ধরে নিমজ্জমান লোক। সেটাকে বার করে আনতেই ঝনঝন করে উঠলো সোনার গয়না আর মোহরগুলো। বহুদিনের বন্দুক—কাঠের বাট—তবু অব্যবহারে ধুলো আর ময়লা জমে আছে গায়ে। পাশেই ছিল টোটার বাক্স। সদানন্দ রায় একবার পরীক্ষা করে দেখলেন। বহু শিকারের সঙ্গী আজ আবার যেন নিতান্ত পরিচিত বন্ধুর মত তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। যেন হাত তুলে তাঁকে বরাভয় বাণী শোনাবে।

সিন্ধুকের চাবি বন্ধ করতে ভুল হয়ে গেল। সদানন্দ সোজা বন্দুক নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত পায়ে ওপরে উঠে এলেন।

ওপরে উঠে দুটো টোটা পুরলেন বন্দুকে—নিঃশ্বাস বন্ধ করে সারি সারি ঘর পার হয়ে সোজা চলে এলেন খোকার ঘরে। অন্নদাকান্তর সময় থেকে যে পতন সুরু হয়েছে আজ বুঝি তার পূর্ণচ্ছেদ হবে।

খোকার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ হচ্ছে, সদানন্দ রায় কান পেতে রইলেন। সমস্ত ইন্দ্রানী পার্ক নিঃস্তব্ধ। হঠাৎ মুহূর্তগুলো যেন সশস্ত্র প্রহরীর মত নিথর নিশ্চল হয়ে গেল। সময়ের পাখা নিঃসীম আকাশের নীচে অচল হয়ে গেছে। প্রাণস্পন্দনের ক্ষীণতম শব্দ যেন তীক্ষ্ন অস্ত্রের মত সদানন্দর কানে এসে আঘাত করতে লাগলো। তিনি চোখ বুজলেন—তারপর ঝড়ের বেগে এল একরাশ ঢেউ—সমুদ্রের লোনা ঢেউ আর তার সঙ্গে পালকের মত সাদা ফেনা। তাঁর মনে হলো পৃথিবীতে এবার আর আগুন নয়—বন্যা। মৃত্যুর বন্যা! সেই বন্যার খরপ্রবাহে রায় বংশের সম্মানসম্ভ্রম সব একাকার হয়ে গেল। কিন্তু সেই নিনীরীক্ষ্য অন্ধকারে এখন তাঁর মনে হোল যেন কোথায় ভোঁ বেজে উঠেছে—ধোঁয়া আর ধুলো—বয়লার আর স্টীম—রোগ আর জীবাণু—সীসে গলানো বিষ আর কয়লা জ্বালানো কালি—কল আর কুলি—মড়ক আর মহামারী—

হঠাৎ দুবার দুম দুম দুটি শব্দে সমস্ত ইন্দ্রানী পার্ক সচকিত হয়ে উঠলো।

পরদিন সকালে কুলি আর মজুর আর রাজমিস্ত্রি এসে ইন্দ্রানী পার্কে সদানন্দ রায়ের বাড়ীতে হাজির, কিন্তু পুলিশ আর দারোগা তারও আগে সেখানে এসে হাজির হয়েছে।

বাংলা ছন্দ ও ছন্দশাস্ত্র

(১)

অতি প্রাচীনকাল থেকেই ছন্দোবৈচিত্র্য ও ছন্দশাস্ত্রের প্রতি ভারতবর্ষের আকর্ষণ দেখা যায়। সুদূর বৈদিক যুগেই পদ্যরচনার ছন্দোবৈশিষ্ট্যের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল, ফলে ছন্দ অন্যতম বেদাঙ্গ বলে গণ্য হয়েছে। পরবর্তীকালে সংস্কৃত কাব্যে ব্যবহৃত ছন্দ সংখ্যা ও বৈচিত্র্যগত অজস্রতায় বৈদেশিক পণ্ডিতদেরও বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। আরও পরবর্তী যুগে প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্যে ছন্দের ধারা আরও বহু শাখায়িত হয়েছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে হিন্দি সাহিত্যেও দেখি ছন্দের বৈচিত্র্য বেড়েই চলেছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, যুগে যুগে এই ছন্দোবৃদ্ধির ধারা সরল রেখায় চলেনি, কালক্রমে অনেক নূতন ছন্দ আবির্ভূত হয়েছে এবং অনেক প্রাচীন ছন্দ লুপ্ত হয়েছে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়, এই দীর্ঘকালের বিবর্তনে বর্ণবৃত্ত জাতীয় সমস্ত ছন্দই প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং মাত্রাবৃত্তবর্গীয় ছন্দোধারাই প্রায় সমগ্রভাবে সাহিত্যকে অধিকার করেছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের পক্ষে স্মরণীয় কথা এই যে, সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ এবং হিন্দি সাহিত্যে ছন্দোবিবর্তনের সঙ্গে ছন্দশাস্ত্রও মোটামুটিভাবে তাল রেখে চলেছে, বস্তুতঃ ওসব সাহিত্যে কখনও ছন্দশাস্ত্রের অভাব ঘটেছে বলে মনে হয় না। ফলে যখন যে নূতন ছন্দ দেখা দিয়েছে তখন তার বিশিষ্ট নামেরও অভাব হয়নি। বলে রাখা ভালো যে, এই মন্তব্যগুলি সাধারণভাবেই গ্রহণীয়; কোনো কোনো বিষয়ের কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখানো অসম্ভব নয়।

বাংলা ছন্দের ইতিহাস কিন্তু অন্য রকম। মোটের উপর একথা বলা চলে যে, বাংলা ছন্দ উত্তর ভারতীয় প্রাকৃত ও অপভ্রংশ যুগের ছন্দ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে, কিন্তু তার গতি অন্য দিকে। ফলে মধ্যযুগের বাংলা ছন্দ ওই যুগের হিন্দি ছন্দ থেকে স্বতন্ত্র পথে চলেছে। বাংলা ছন্দও উত্তর ভারতীয় ছন্দের ন্যায় যুগে যুগে নানা শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, ছন্দোবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে কোনো ছন্দশাস্ত্র গড়ে ওঠেনি। তাই নব নব ছন্দ উদ্ভাবনের সঙ্গে নূতন নূতন নামকরণও হয়নি। অবশ্য অপেক্ষাকৃত প্রাচীনকালেই পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, লাচাড়ি, ধামালি প্রভৃতি কতকগুলি নামের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু এসব নামের পরিচয়জ্ঞাপক কোনো ছন্দশাস্ত্রের বই পাওয়া যায়নি। অবশ্য অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত নরহরি চক্রবর্তীর 'ছন্দঃসমুদ্র' নামে একখানি প্রাচীন গ্রন্থের কথা জানা গিয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থখানির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিশদভাবে কিছুই জানা যায় না। নাম থেকে অনুমান হয় এটিতে বহু ছন্দের পরিচয় ছিল। কিন্তু উত্তর ভারতে 'প্রাকৃত পৈঙ্গলম্' গ্রন্থের যে স্থান বাংলাদেশে 'ছন্দঃসমুদ্র' সে স্থান অধিকার করতে পারেনি। তাই এই পুস্তকখানি সুপ্রচলিত হয়নি এবং কালক্রমে একেবারেই লোপ পেয়েছে। এই ছন্দঃসমুদ্র ছাড়া প্রাক্-আধুনিককালে রচিত দ্বিতীয় ছন্দগ্রন্থের নামও শোনা যায় না। যাহোক, পূর্বোক্ত পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি নাম কখন কিভাবে প্রচলিত হলো বলা কঠিন। তাছাড়া প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে পয়ার প্রভৃতি নামের বহির্ভুক্ত বহু অকৃতনামা ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়। আধুনিককালের পূর্বে ওসব ছন্দের যথার্থ পরিচয় দূরে থাক, ব্যবহারযোগ্য কোনো প্রচলিত নামেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এই প্রবন্ধে যথাস্থানে ওরকম কয়েকটি অকৃতনাম ছন্দের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে।

প্রাক্তুর্কি যুগে বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন হচ্ছে চর্যাচর্য বিনিশ্চয়। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যও মোটামুটিভাবে চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের সমকালীন বলেই গণ্য হতে পারে। এই উভয় প্রকার রচনার ছন্দোগত তুলনা করলে বাংলা ছন্দের একটি মূল বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে। এই দুই ছন্দের সাদৃশ্য ও পার্থক্য উভয়ই সমভাবে লক্ষণীয়। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

মুহুরব। লোকিত। মণ্ডন। লীলা।
মধুরিপু। রহমিত। ভাবন। শীলা॥

—জয়দেব

কাআ। তরুবর। পঞ্চ বি। ডাল।
চঞ্চল। চীএ। পইঠো। কাল॥

—লুইপাদ

উভয় ছন্দ অবিকল এক, উভয়ত্রই দীর্ঘস্বর এবং যুগ্মধ্বনি দ্বিমাত্রক। গীতগোবিন্দে এই রীতির ব্যতিক্রম নেই, চর্যাপদে প্রচুর ব্যতিক্রম দেখা যায়। যথা—

সসুরা। নীদ গেল। বহূড়ী। জাগই।
কানেট। চোরে নিল। কা গই। মাগই॥

—কুক্কুরীপাদ

জই তুহ্মে। লোঅ হে। হোইব পার। গামী।
পুচ্ছ তু। চাটিল। অনুত্তর। সামী॥

—চাটিল্লপাদ

দেখা যাচ্ছে অনেকস্থলেই দীর্ঘস্বর এবং যুগ্মধ্বনি সংকুচিত ও একমাত্রক বলে গণ্য হয়েছে। প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্যেই এরকম ধ্বনিসংকোচের সূচনা হয়। বাংলায় এই সংকোচনের রীতি ক্রমবর্ধমান গতিতে অগ্রসর হয়েছে। ফলে আধুনিক বাংলা ছন্দে দীর্ঘস্বরের দ্বিমাত্রকতা সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে এবং যুগ্মধ্বনির দ্বিমাত্রকতা অবস্থাবিশেষে স্বীকৃত ও অন্যত্র অস্বীকৃত হচ্ছে।

উপরে গীতগোবিন্দ ও চর্যাপদ থেকে যে দৃষ্টান্তগুলি উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলিই হলো পয়ার বন্ধের পূর্বরূপ। এবার ত্রিপদী বন্ধের পূর্বরূপের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

প্রবোধচন্দ্র সেন



আনবিক বোমার ঘায়ে..
আণবিক বোমার ঘায়ে জাপানের শিল্পশক্তি লুপ্ত হয়েছে, আর সেখান থেকে সুন্দর ও নূতন ধরণের গেঞ্জী আস্‌বে না।
যুদ্ধান্তে এরজন্য আপনি অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু আপনি হতাশ হবেন না।
ডাক হোয়াইটের শক্তি ক্রমবর্দ্ধিত হইতেছে
নূতন পরিকল্পনার সাহায্যে আমরা আপনাদের সম্মুখে "Duckwhite" উপস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছি
ডাকহোয়াইট
গাত্রের সুখাবরণ
ইণ্ডাষ্ট্রীজ্‌ কর্পোরেশন অফ্‌ বেঙ্গল লিমিটেড
৬০/১ হাজরা রোড, বালীগঞ্জ
ডাক হোয়াইট
আপনার সৌখীন পছন্দ মিটাইবে

চন্দনচর্চিত॥ নীল কলেবর॥
পীতবসন বন॥ মালী।
—জয়দেব

হই সো মুঢ়া ॥ অচ্ছসি ভান্তী ॥
পুচ্ছ তু সদ্‌গুরু॥ পাঅ-।
—ভুসুকুপাদ

পরবর্তী বাংলা, মৈথিলী, ব্রজবুলি প্রভৃতি ছন্দের উপর জয়দেবের প্রভাব অসাধারণ। বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, শশিশেখর প্রভৃতি কবিদের উপরে গীতগোবিন্দের ছন্দপ্রভাব সুস্পষ্ট। আধুনিককালেও রবীন্দ্রনাথ-বিজয়চন্দ্রপ্রমুখ বহু কবি জয়দেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে।

বদসি যদি। কিঞ্চিদপি॥ দন্তরুচি।কৌমুদী॥
হরতি দর। তিমিরমতি॥ ঘোরম্।
—জয়দেব

তরে তুয়া। চরণ যুগ ॥ রেঢ়ি ভুজ। পল্লবে॥
নাহ নিজ। শপতি বহু ॥ দেল-।
—চন্দ্রশেখর

রাজকুল। সম্ভবা॥ ষোড়শী নব। গৌরবা॥
যোগ্য জনে। মিলয়ে যেন॥ যোগ্যা।
—শশিশেখর

পঞ্চশরে। দগ্ধ করে॥ করেছ একি। সন্ন্যাসী॥
বিশ্বময়। দিয়েছ তারে॥ ছড়ায়ে-।
—রবীন্দ্রনাথ

স্নিগ্ধ কম। পরশ লভি॥ আজি সুখ। অম্বুধি॥
উচ্ছ্বসিত। শান্তমন॥ মাঝে।
—বিজয়চন্দ্র

লক্ষ্য করার বিষয়, প্রথম ও পঞ্চম দৃষ্টান্তে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের নিয়ম অনুসারে দীর্ঘস্বর দ্বিমাত্রক বলেই গণ্য হয়েছে। চতুর্থ দৃষ্টান্তে আধুনিক বাংলা রীতি অনুসারে দীর্ঘস্বরের দ্বিমাত্রকতা অস্বীকৃত হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃষ্টান্তে মধ্য পন্থা; ছন্দের প্রয়োজন অনুসারে দীর্ঘস্বর কোথাও দ্বিমাত্রক, কোথাও একমাত্রক। অথচ জয়দেবের আদর্শের অনুকৃতি সর্বত্র সুস্পষ্ট।

উপরে গীতগোবিন্দ থেকে যে তিনটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয়েছে তার মধ্যে প্রথমটি 'মাত্রাসমক' বর্গীয় পাদাকুলক ছন্দে রচিত, এই পাদাকুলকই হচ্ছে সুপরিচিত পয়ার ছন্দের আদিরূপ। কিন্তু বাকি দুটি ছন্দের কোনো শাস্ত্রীয় নাম নেই। পিঙ্গল-ছন্দঃসূত্রে বলা হয়েছে, উক্ত গ্রন্থে যেসব ছন্দ নামনির্দেশপূর্বক উল্লিখিত হয়নি সেসব ছন্দ 'গাথা' নামে জ্ঞাতব্য (অত্রানুক্তং গাথা, ছন্দঃসূত্রম্ ৮।১)। প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রমতে কিন্তু এক শ্রেণীর ছন্দের নামই 'গাথা'। সংস্কৃত পিঙ্গল-ছন্দঃসূত্রে উল্লিখিত হয়নি প্রাকৃত সাহিত্যে স্বভাবতঃই এমন বহু ছন্দ উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত হয়েছে, প্রাকৃতপৈঙ্গলম্ গ্রন্থে বহু নূতন ছন্দের নাম দেখা যায়। দুএকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

ফুলিঅ মহু। ভ্রমর বহু॥ রঅণি পহু।
কিরণ লহু॥
উঅঅরু ব। সংত-।
মলঅগিরি। কুহর ধরি॥ পবণ বহ। সহর কহ॥
সুণু সহি। ণিঅল ণহি। বংত-॥

এ ছন্দটির নাম 'শিখা'। আমাদের



কৃষকের স্বপ্নের গুচ্ছ

ফটোশিল্পী—প্রভাস বসু

পক্ষে এ ছন্দের প্রকৃতি বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। জয়দেবের 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' রচনাটির সঙ্গে এই শিখা ছন্দের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা প্রয়োজন। শিখা ছন্দের প্রথম পংক্তিতে জয়দেবের ছন্দ থেকে এক পর্ব (পঞ্চম) কম। শিখার দ্বিতীয় পংক্তি জয়দেবী আদর্শের প্রায় সম্পূর্ণরূপেই অনুরূপ, কেবল পঞ্চম পর্বে একমাত্রা কম। এবার 'ঝুল্লণা' ছন্দের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করি।

পঢ়ম দহ। দিজ্জিআ॥ পুণবি তহ। কিজ্জিআ॥
পুণবি দহ। মত্ত তহ॥ বিরই জা। আ।
এম পরি। বিবিহু দল॥ মত্ত সত। তীস পল॥
এহু কহ। ঝুল্লণা। ণাঅরা। আ॥

এটিও অনেকাংশে জয়দেবের আদর্শের অনুরূপ। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিকে যদি ঝুল্লণা ছন্দে রূপান্তরিত করা যায় তাহলে দাঁড়াবে এরকম—

পঞ্চশর। দগ্ধ করে॥ করেছ একি। সন্ন্যাসী॥
বিশ্বময়। দিয়েছ তারে॥ অযুত নব। প্রাণ।

আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক বিষয় এই যে, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে গীতগোবিন্দের বহু ছন্দেরই নাম পাওয়া যায় না। এসব ছন্দকে পিঙ্গলসূত্র অনুসারে শুধু 'গাথা' নামে অভিহিত করারও কোনো সার্থকতা নেই। পূর্বেই বলেছি গীতগোবিন্দের ছন্দ উত্তরকালে বহুলভাবেই অনুকৃত হয়েছিল এবং এসব ছন্দ ভেঙে অনেক নূতন ছন্দ দেখা দিয়েছিল। তাছড়া, কালক্রমে বাংলা সাহিত্যে, বিশেষভাবে বৈষ্ণব পদাবলীতে, অনেক নূতন নূতন ছন্দের উদ্ভব ঘটে। বাংলা সাহিত্যে কখন কিভাবে ছন্দের নব নব রূপ দেখা দিয়েছে তা বিশেষ ঔৎসুক্যের বিষয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়,

শরদচন্দ পবন মন্দ
বিপিন ভরল কুসুম-গন্ধ
ফুল্ল মল্লি মালতী যূথী
মত্ত মধুপ ভোরণী। —গোবিন্দদাস

এ ছন্দটি কিভাবে আবির্ভূত হল এবং কালে কালে এটির কি কি রূপান্তর ঘটেছে, এ আলোচনার বিশেষ সার্থকতা আছে। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে সেকথা আমাদের বিবেচ্য নয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বাংলা ছন্দ-শাস্ত্রের কথা।

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে দেখি ছন্দ-প্রাচুর্যের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দশাস্ত্রও গড়ে উঠেছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও ছন্দোবৈচিত্র্যের অভাব নেই; অথচ পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি কয়েকটি নাম ছাড়া অন্য কোনো নামেরও সাক্ষাৎ পাই না, আর 'ছন্দঃসমুদ্র' ছাড়া অন্য কোনো ছন্দশাস্ত্রের নামও জানা যায় না। এই অভাবের কারণ অনুসন্ধানের যোগ্য। বাঙালিরা তৎকালে ছন্দশাস্ত্র সম্বন্ধেই উদাসীন ছিলেন, একথা মনে করার কারণ নেই। ছন্দোবৈচিত্র্যের প্রতি যাদের অনুরাগ প্রবল, ছন্দশাস্ত্রের প্রতি তাদের ঔদাসীন্য থাকার কথা নয়। বস্তুতঃ সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্র রচনায় বাঙালির কৃতিত্ব কম

নয়। সংস্কৃত ছন্দ সম্বন্ধে যতগুলি বই আছে তার মধ্যে সব চেয়ে বেশী খ্যাত হচ্ছে, দুখানি, পিঙ্গল-ছন্দঃসূত্র এবং ছন্দোমঞ্জরী। ছন্দঃসূত্র বইখানি দুর্বোধ্য, টীকার সাহায্য ছাড়া সহজে বোঝা যায় না। গ্রন্থখানির টীকাও আছে অনেকগুলি, এগুলির মধ্যে হলায়ুধ ভট্টের 'মৃতসঞ্জীবনী-বৃত্তি' নামক টীকাই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, ভারতবর্ষের সর্বত্র এই টীকার আদর। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতা কীথ সাহেবের মতে ছন্দঃসূত্রের টীকাকার হলায়ুধ খ্রীস্টীয় দশম শতকের লোক। কিন্তু অনেকের মতে মৃতসঞ্জীবনীকার হলায়ুধ ও লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত 'ব্রাহ্মণ সর্বস্ব' রচয়িতা হলায়ুধ একই ব্যক্তি। যদি এই দ্বিতীয় মত সত্য হয় তাহলে তাঁকে বাঙালি বলে এবং জয়দেবের সমকালীন অর্থাৎ দ্বাদশ শতকের লোক বলেই মনে করা সংগত। আর, ছন্দোমঞ্জরী-রচয়িতা বৈদ্যবংশীয় গঙ্গাদাসও বাঙালি ছিলেন বলেই মনে হয়। যাহোক, সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও বাংলা ছন্দ-শাস্ত্রের প্রতি বাঙালির কিছুটা ঔদাসীন্য ছিল, একথা বোধ করি অস্বীকার করা যায় না।

বাংলার ছন্দশাস্ত্র রচনার ধারাবাহিক সূচনা হয় অষ্টাদশ শতকে। নরহরি চক্রবর্তীর 'ছন্দঃসমুদ্র' রচিত হয় এই শতকের প্রথমভাগে। গ্রন্থখানি সম্ভবতঃ কখনও সুপ্রচলিত হয়নি এবং কালক্রমে একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে বাংলা ছন্দশাস্ত্র রচনার যে নূতন ধারা প্রবর্তিত হয়, তা আজও লুপ্ত হয়নি। আমরা জানি বাংলা ব্যাকরণ রচনারও সূত্রপাত হয় অষ্টাদশ শতকে। পোর্তুগীজ পাদ্রি মানোএল-দা-আস্‌সুম্পসাঁও প্রণীত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ-খানি রচিত হয় ১৭৩৪ সালে এবং ১৭৪৩ সালে লিসবন সহরে রোমান হরফে মুদ্রিত হয়। প্রায় সমকালে রচিত ছন্দঃসমুদ্রের ন্যায় এই গ্রন্থটিরও ধারা রক্ষিত হয়নি। ১৭৭৮ সালে ওয়ারেন হেস্‌টিংস-এর শাসনকালে নাথানিএল ব্রাসি হালহেড সাহেবের বাংলা ব্যাকরণখানি হুগলী সহরে মুদ্রিত হয়। এটিকেই বাংলা ব্যাকরণ তথা ছন্দশাস্ত্রের আদি উৎস বলে গণ্য করা যায়। ভারতীয় সংস্কৃতির বহু বিভাগেই নবযুগের সূচনা হয়েছে ইউরোপীয় মনীষীদের প্রচেষ্টায়। বাংলা ছন্দশাস্ত্রের বেলাতেও তাই হয়েছে। ভারতীয় আদর্শে ব্যাকরণ ও ছন্দ স্বতন্ত্র শাস্ত্র, কিন্তু পাশ্চাত্য আদর্শে ছন্দ ব্যাকরণের অঙ্গ। তাই হালহেড সাহেব তাঁর বাংলা ব্যাকরণে ছন্দের স্থান করেছিলেন। তাঁর আদর্শের অনুসরণ করেই বাংলা ব্যাকরণে একটি করে ছন্দের অধ্যায় দেবার রীতি চলে আসছে। যাহোক, হালহেড তাঁর ব্যাকরণে ছন্দের বিস্তৃত


জীবনের জয়যাত্রার
পথে ঈগলের জুতা
অপরিহার্য্য
কারণ
সৌষ্ঠবে
সৌন্দর্য্যে
উপযোগিতায়
স্থায়ীত্বে
মিতব্যয়ীতায়
ইহা অপরাজেয়
ঈগল চপ্পল
লাটুস রোড
কানপুর

আলোচনা করেননি। প্রথমে অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ প্রভৃতি কয়েকটি সংস্কৃত ছন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন, তার পরে একপদী, ত্রিপদী, তোটক ও পয়ার ছন্দের দৃষ্টান্ত দিয়ে ছন্দের প্রসঙ্গ সমাপ্ত করেছেন। হালহেডের পর কেরি (১৮০১) এবং কীথ (১৮২০) সাহেব বাংলা ব্যাকরণ লেখেন; তাঁরাও ব্যাকরণের অধ্যায় হিসাবে কয়েকটি বাংলা ছন্দের পরিচয় দেন। রাজা রামমোহন রায় বাংলা সংস্কৃতির বহু বিভাগেই অগ্রণী বলে পরিচিত। বাঙালি ছান্দসিকদের মধ্যেও প্রথম স্থান তাঁরই, একথা সুবিদিত নয়। রামমোহন রায় তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' রচনা করেছিলেন বিলাত যাত্রার (১৮৩০) প্রাক্কালে। বইখানি প্রকাশিত হয় ১৮৩৩ সালে। এই পুস্তকের একেবারে শেষ দুই পৃষ্ঠায় বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। এই সংক্ষিপ্ততার কৈফিয়তস্বরূপ তিনি যে উক্তি করেছেন তা এস্থলে উদ্ধৃতিযোগ্য।

"গৌড়দেশে, না গীতের শৃংখলা আছে, না গৌড়দেশীয় ভাষাতে কবিতার পারিপাট্য উত্তমরূপে আছে, সুতরাং ইহার ছন্দঃপ্রকরণ জানিবার কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই; এনিমিত্ত কেবল দুই তিন ছন্দ যাহা কবিতাতে ভূরি ব্যবহার্য হয় তাহাই এস্থলে লিখিলাম, অতএব ছন্দবিষয়ে পৃথক পরিচ্ছেদ করিলাম না।"

আরও দুএকটি উক্তি থেকে অনুমান হয়, সংস্কৃত কাব্যের ছন্দোগত ঐশ্বর্যের তুলনায় বাংলা ছন্দের দৈন্য অনুভব করেছিলেন বলেই তিনি বাংলা "ছন্দঃপ্রকরণ জানিবার কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই" এই মন্তব্য করেছেন। আমার মনে হয় বাঙালি পণ্ডিতসমাজের এই মনোভাবের ফলেই মধ্য যুগে বাংলা ছন্দশাস্ত্র গড়ে উঠতে পারেনি। ভারতচন্দ্রের ছন্দোবৈচিত্র্যও রামমোহনের মনকে প্রসন্ন করতে পারেনি। বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে তাঁর কতখানি পরিচয় ছিল জানি না। তবে একথা বোধ করি বলা যায় যে, উক্ত পদাবলী সাহিত্যের ছন্দবৈচিত্র্যও মধ্যযুগের পণ্ডিত-সমাজের মনকে প্রসন্ন করতে পারেনি এবং তারই ফলে বাংলা ছন্দশাস্ত্রের অভাব ঘটেছে।

যাহোক, বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে এই ঔদাসীন্য থাকা সত্ত্বেও রামমোহন স্বল্প পরিসরের মধ্যেই বাংলা ছন্দের বিশ্লেষণে যে স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন (বিশেষতঃ সেই যুগে), তাতে বিস্মিত হতে হয়। এবিষয়ে রামমোহনের কৃতিত্বের বিষয় আমাদের আলোচ্য নয়। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট যে, তিনি ঠিক প্রাচীন ছান্দসিকদের রীতিতে ছন্দ-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হননি। 'অক্ষর' এবং সিলেবল্ (তাঁর পরিভাষায় 'ধ্বন্যাঘাত') যে এক নয়, একথা তিনি তখনই ধরতে পেরে-ছিলেন, এটা কম কথা নয়। যাহোক, রামমোহন পয়ার, দুই রকম ত্রিপদী (আট আট-দশ ও ছয়-ছয়-আট মাত্রার) এবং তোটক ছন্দের পরিচয় ও দৃষ্টান্ত দিয়েই ছন্দের আলোচনা সমাপ্ত করেছেন। যে চারটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, সেগুলি সবই ভারতচন্দ্রের রচনা থেকে সংগৃহীত।

১৮৬২ সালে (১২৬৯ শ্রাবণ) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণের একটি মুখবন্ধ লিখে দেন। বাংলা ছন্দশাস্ত্রের ইতিহাসে এটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ওই ভূমিকায় হেমচন্দ্র মধুসূদন প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের যে নিপুণ বিশ্লেষণ করেন তা আজও আমাদের প্রণিধানযোগ্য। এই বৎসরই (১২৬৯ কার্তিক) পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি তাঁর সুবিখ্যাত "কাব্যনির্ণয়" প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদে তৎকাল-প্রচলিত ছন্দসমূহের বিস্তৃত বিবরণ আছে। বাংলায় রূপান্তরিত অনেক সংস্কৃত ছন্দের পরিচয়ও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রাপ্ত মাত্রাবৃত্তবর্গীয় বহু ছন্দ এবং লোকসাহিত্যের প্রধান বাহন স্বরবৃত্ত-বর্গীয় ছন্দের কোন উল্লেখ নেই। কাব্য নির্ণয়ের এই পরিচ্ছেদটি দীর্ঘকাল পর্যন্ত পরবর্তী লেখকদের কাছে আদর্শস্থানীয় বলে গণ্য ছিল। কোন কোন বিষয়ে কাব্য নির্ণয়ের ছন্দ পরিচ্ছেদটিতে যুক্তিসংগত বিশ্লেষণের প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু আজকাল যাকে বলা হয় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এ গ্রন্থে তার সূচনা-মাত্রও হয়নি। শুধু বিশ্লেষণে নয়, নামকরণেও প্রাচীন অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিরই পরিচয় পাই। মালিনী, শিখরিণী, মন্দাক্রান্তা, শিখা, হরিগীতা, ঝুল্লণা প্রভৃতি সংস্কৃত ও প্রাকৃত নাম ছন্দের প্রকৃতিপরিচায়ক নয়, একান্তই কাল্পনিক। কাব্য নির্ণয়ের গৌরবিনী, হংসমালা, কুসুমমালিকা, মালতী প্রভৃতি নাম সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। এসব নাম কখন কি ভাবে উদ্ভাবিত হলো এ আলোচনা বাংলা ছন্দের ইতিহাসে বিশেষভাবে বিচার্য বিষয়।

১৮৬৪ সালে ভুবনেমোহন রায়চৌধুরী "সংস্কৃত ছন্দসমূহ ভাষাতে প্রচলিত করণের" উদ্দেশ্যে 'ছন্দঃকুসুম' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি প্রবন্ধে (সবুজপত্র ১৩২৪ চৈত্র, পৃ ৬৯৮ ও ৭০২) এই বই থেকে দুটি অংশ উদ্ধৃত করেছেন। আরও কেউ কেউ সাময়িক পত্রে এই পুস্তকটি

সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। গ্রন্থকার বিভিন্ন ছন্দের দৃষ্টান্তচ্ছলে 'শ্রীকৃষ্ণ-লীলা, মানভিক্ষোপন্যাস' নামে একখানি কাব্য রচনা করে এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, বইখানি প্রকাশ্যত বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ প্রচলনের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও গ্রন্থের শেষভাগে তেরোটি ফারসি ছন্দের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু নিয়ম প্রণয়ন ও নামকরণ করা হয়েছে সংস্কৃত পদ্ধতিতে এবং দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে বৃন্দাবনের শোভা বর্ণনাচ্ছলে। ফারসি ছন্দের অপূর্বশ্রী, মহানন্দা, সন্তোষিণী, মনোহারী প্রভৃতি নামকরণ ঔৎসুক্যের বিষয় নয় কি? একটা দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে। আরবি ও ফারসি সাহিত্যে 'হজয্' ছন্দটি বিশেষভাবে খ্যাত। হাফেজের রচনা থেকে হজয্ ছন্দের একটি সুপরিচিত দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

অ গর্ আঁ তুর্ | কে শীরাজী
বেদস্ত্ আরদ্ | দিলে মারা।

বখালে হিন্ | দু য়শ্ বখশম্
সমর্ খন্দ্ ও | বো খা রা রা॥

ছন্দঃ কুসুমে হজয্ ছন্দের নাম হয়েছে "মনোহারী" এবং তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এরকম—

ফলে সে বৃ- | ক্ষ ভক্তেরা |
স দা পুষ্পা- | ঞ্জ লি ব্য হে |

নিরাকাঙ্ক্ষে | অ সং কল্পে |
র মা না থে | করে পুজা॥ (১)

বলা বাহুল্য হজয্ বা মনোহারী ছন্দ হচ্ছে আসলে আদি লঘু চতুঃস্বরপার্বিক চৌপার্বিক ছন্দ। পূর্বে বলেছি গীত-গোবিন্দের 'চন্দনচর্চিত' ইত্যাদি রচনার ছন্দ অকৃতনামা; সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের মতে এটি 'গাথা' নামে জ্ঞাতব্য। 'ছন্দঃকুসুম' রচয়িতা এ ছন্দটির নাম দিয়েছেন 'করকাগতি'। বলা বাহুল্য এরকম নামকরণের কোন সার্থকতা নেই।

১৮৬৮ সালে মধুসূদন বাচস্পতি প্রণীত 'ছন্দোমালা' (প্রথম ভাগ) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে পঁচাত্তরটি সংস্কৃত ও বাংলা ছন্দের বিবরণ দেওয়া হয়। এটির একটি বিশেষত্ব এই যে, সংস্কৃত শ্রুতবোধ এবং ছন্দোমঞ্জরীর

১। মজার কথা এই যে, ইদানীং পণ্ডিত মথুরানাথ শাস্ত্রী তাঁর "সাহিত্য বৈভবম্" কাব্যে অনেক হিন্দি ও উর্দু ছন্দকে সংস্কৃতে রূপান্তরিত করেছেন। হজয্ ছন্দের দৃষ্টান্ত ৩৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।



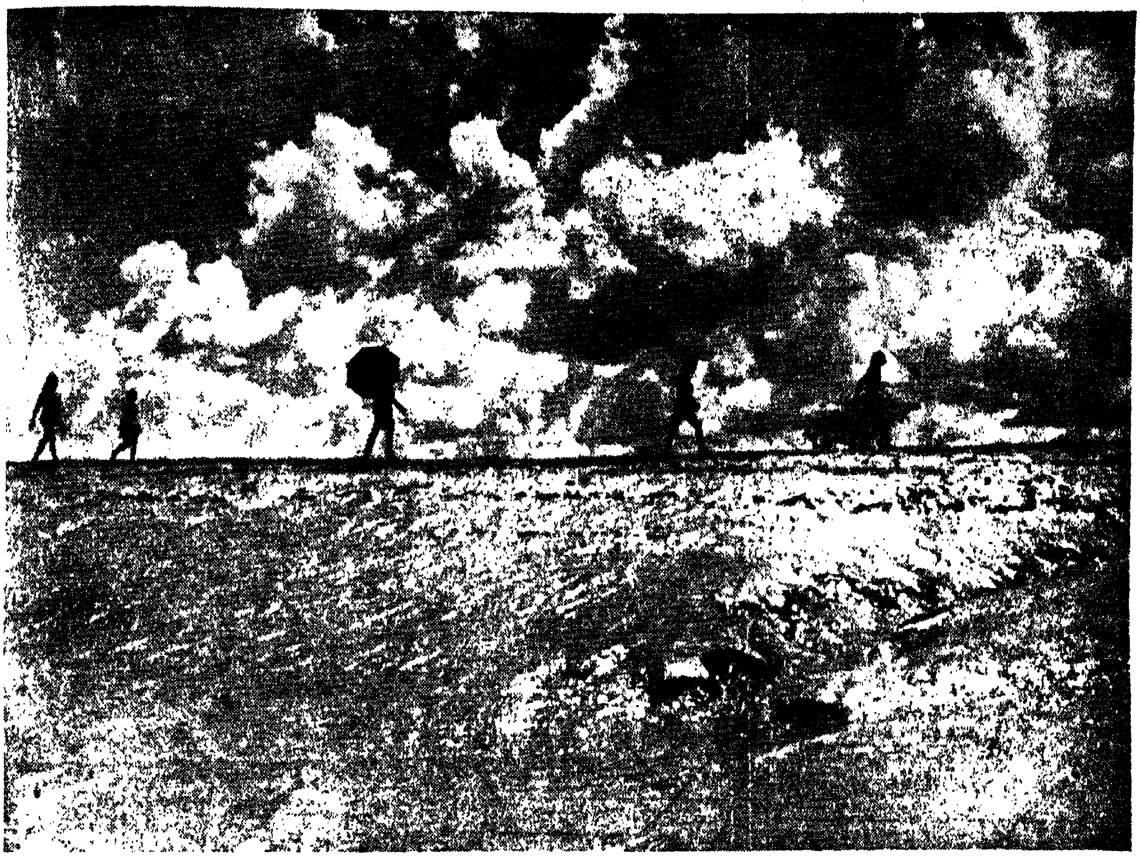
ায় প্রত্যেকটি ছন্দের বিবরণ সেই ছন্দেই রচিত হয়েছে। ছন্দঃকুসুম, ছন্দঃপ্রকাশ প্রভৃতি পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থসমূহকেও এই পুস্তকে কাজে লাগানো হয়েছে। বস্তুত এই ছন্দোমালা দীর্ঘকাল বাংলা ছন্দের উপর প্রামাণিক গ্রন্থ বলে গণ্য ছিল এবং এই গ্রন্থের জন্য রচিত দৃষ্টান্তসমূহ বহুলভাবে উদ্ধৃত হতো। পূর্বোক্ত কাব্যনির্ণয়ের ছন্দ-পরিচ্ছেদটিও পরবর্তী সংস্করণে ছন্দঃকুসুম এবং ছন্দোমালার সাহায্যে পরিবর্ধিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি স্মরণীয় বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই ছন্দোমালার প্রণেতা মধুসূদন বাচস্পতির প্রিয় ছাত্র এবং একবার তিনি একখানা ছন্দোমালা বই পুরস্কার পেয়েছিলেন (জীবনস্মৃতি, ১৩৫০ সং, পৃ ২ ও ৭৬)। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-স্মৃতিতে লিখেছেন, তিনি ঐ পুরস্কার পেয়েছিলেন সচ্চরিত্রের জন্য (পৃ ৭৬)। কিন্তু জীবন-স্মৃতিরই অন্য একটি বিবরণ (পৃ ২২) থেকে মনে হয়, পুরস্কারটি তিনি পেয়েছিলেন সম্ভবতঃ বাৎসরিক পরীক্ষায় বাংলায় সকলের চেয়ে বেশী নম্বর পাওয়ার জন্য। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, বাচস্পতি মহাশয় ছিলেন কলকাতা নর্মাল বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ওই বিদ্যালয়েরই ছাত্র।

অতঃপর বাংলা ছন্দশাস্ত্রের ইতিহাসে নূতন যুগের সূচনা হয় বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিদের চেষ্টায় বাংলা ছন্দেও এক বিপ্লব সংঘটিত হয়। ঔৎসুক্যের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ এবং সত্যেন্দ্রনাথই আধুনিক ছন্দশাস্ত্রেরও স্রষ্টা। পূর্বে বলেছি বাংলা ছন্দশাস্ত্রের প্রথম প্রবর্তক হচ্ছেন একজন ইউরোপীয়, হালহেড সাহেব। বিংশ শতকেও একজন ইংরেজের প্রবর্তনাতেই বাংলা ছন্দশাস্ত্রের নবপর্যায়ের সূচনা হয়। কেম্ব্রিজের বাংলা অধ্যাপক জে ডি এণ্ডারসনের প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দুখানি পত্র লেখেন। পত্র দুখানি সবুজপত্রে প্রকাশিত হয় (১৩২১ জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ)। এই দুটি পত্রকেই ছন্দ-আলোচনার নূতন ধারার অগ্রদূত বলে গণ্য করা যায়। ইতিমধ্যে প্রবাসীতে (১৩২১ আষাঢ়) শশাঙ্কমোহন সেনের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, পরে এটি তাঁর 'বঙ্গবাণী' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (পৃ ২৩২—৮৫)। এই প্রবন্ধে বাংলা ছন্দের বিচিত্র প্রাচুর্য খুব সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে, কিন্তু ছন্দের বিশ্লেষণ এবং শ্রেণীবিভাগে নৈপুণ্য নেই। ১৩২৩ সালে রাখালরাজ রায় বাংলা ছন্দের উপর একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি আমি দেখিনি। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের বাংলা ছন্দের মূলসূত্রে (২য় সং, পৃ ৭৫) যে অংশটুকু উদ্ধৃত হয়েছে তাতে তাঁর বিশ্লেষণ প্রণালী বোঝা যায় না। তবে দেখা যাচ্ছে তিনি বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগটা বেশ ভালো করেই ধরতে পেরেছিলেন। ১৩২৪ সালের সবুজপত্রে রবীন্দ্রনাথের দুটি প্রবন্ধ (সঙ্গীতের মুক্তি—ভাদ্র, ছন্দ—চৈত্র) প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধ দুটিতে ছন্দের কতকগুলি আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বেশ সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু বাংলা ছন্দের আসল প্রকৃতির বিশ্লেষণ নেই। এই সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে সত্যেন্দ্রনাথের 'ছন্দ-সরস্বতী' (রচিত ফাল্গুন ১৩২৪, প্রকাশিত 'ভারতী' বৈশাখ ১৩২৫, ২৪-২৮)। এই রচনাটিতে স্পষ্টতই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রয়াস নেই, কিন্তু বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আছে। অতঃপর বাংলা ছন্দের উপর বর্তমান লেখকের কতকগুলি প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় (প্রবাসী ১৩২৯ পৌষ-চৈত্র, ১৩৩০ বৈশাখ)। এইরূপে ছন্দ সম্বন্ধে সাহিত্য সমাজে গভীর ঔৎসুক্য দেখা দেয়। ফলে অনেকেই ছন্দ আলোচনায় অগ্রসর হন। এঁদের মধ্যে কালিদাস রায়, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, আবদুল কাদির ও মোহিতলাল মজুমদার, এই কয়জনের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছন্দের আলোচনা নিয়ে এক সময়ে বাংলা সাহিত্যে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিতর্কের ফলে ছন্দের বিচারটা অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিল, যদিও তাতে মতপার্থক্যের অবসান ঘটে নি।

ইদানীং বাংলা ছন্দের উপর পাঁচখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। (১) ছন্দ (১৩৪৩)—রবীন্দ্রনাথ, (২) বাংলা ছন্দের মূল-সূত্র (১৩৪৬)—অমূল্যধন, (৩) ছান্দসিকী (১৩৪৭)—দিলীপকুমার, (৪) ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ (১৩৫২ আষাঢ়)—বর্তমান লেখক, এবং (৫) বাংলা কবিতার ছন্দ (১৩৫২ শ্রাবণ)—মোহিতলাল মজুমদার। পরিভাষা প্রয়োগ ও ছন্দের বিশ্লেষণ ব্যাপারে গ্রন্থকারদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ দেখা যায়। বাংলা ছন্দশাস্ত্র এখনও সর্বস্বীকৃত ও সুনির্দিষ্ট প্রণালীর উপরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি।

আধুনিক ছান্দসিকদের মধ্যে পরিভাষা ও বিশ্লেষণ বিষয়ে মতভেদের কিছু দৃষ্টান্ত দিয়েই প্রবন্ধ সমাপ্ত করব। যে কোনও বৈজ্ঞানিক আলোচনায় দ্ব্যর্থক শব্দের প্রয়োগ (বিশেষত পরিভাষা হিসাবে) সর্বতোভাবে বর্জনীয়। দ্ব্যর্থক পরিভাষা ব্যবহারে অকারণ


একটি সুন্দর ডিজাইন
রেখায় রেখায় ফুটে ওঠে শিল্পীর তুলির টানে। এর ভেতর কথা নেই কিন্তু ভাষা আছে। যা বলান সেই ভাষার ভেতর দিয়ে বলতে পারার মধ্যেই ডিজাইনের সার্থকতা। কিন্তু
সেই ডিজাইনের ব্লক
যদি নিখুঁত না হয় তবে তার আবেদনের অনেকটাই নেপথ্যে থেকে যায়। তাই যথার্থ ভালো ব্লকেই ডিজাইনের সার্থকতা। মেসিনের কাজ হলেও ব্লকের পেছনে থাকে শিল্পী মনের পরিচয়। সেই সঙ্গে
ম্যাট্রিক্স ও ষ্টিরিও
জিনিষ দুটোর কথাও মনে রাখতে হবে। আসল ব্লকেই যদি খুঁত থাকে, সেটা তার ম্যাট কিম্বা ষ্টিরিওর মধ্যে থেকে যাবেই। সবশেষে
পরিপাটি মুদ্রণের জন্য
শিল্পীর রেখা, মেসিনের কাজ আর ব্যবসায়ীর ভবিষ্যৎ একসঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে। ছাপা ভাল না হ'লে কিছুই হ'ল না জানবেন। এই সমস্ত দিকে দৃষ্টি রেখেই কাজ করে সুনাম কিনেছে
গয়া আর্ট প্রেস
ডিজাইনার্স, প্রিণ্টার্স, ব্লক এণ্ড ষ্টিরিও মেকার্স
৫০সি, কেশব চন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন: বি. বি, ২৯৬৬
ress



মেঘলোক নয়, মেঘলা দিন

ফটোশিল্পী—শ্রীঅমিল ঘোষ

টিলতা ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বাংলা ছন্দের আলোচনাক্ষেত্রেও এই জটিলতা ও বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এস্থলে ওরকম কয়েকটি দ্ব্যর্থক পরিভাষা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন।

বাংলা ছন্দের আলোচনায় একটি বহুপ্রচলিত পারিভাষিক শব্দ হচ্ছে 'অক্ষর'। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রেও এই শব্দটির ব্যবহার আছে এবং 'অক্ষর' শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে 'বর্ণ' শব্দটিরও বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। ওশাস্ত্রে এই দুটি কথাই লিপিবদ্ধ শব্দের একেকটি অংশকে বোঝায়। যেমন 'ছন্দ' শব্দে দুই অক্ষর, ছ এবং ন্দ। অনেকের ধারণা সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের 'অক্ষর' শব্দের মানে সিলেবল্ অর্থাৎ উচ্চারিত (লিখিত নয়) শব্দের একাংশকে বোঝায়, কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। 'ছন্দ' শব্দের উচ্চারণ অনুযায়ী সিলেবল্-ভাগ হচ্ছে ছন্ এবং দ, কিন্তু অক্ষর বিভাগ হচ্ছে ছ এবং ন্দ। সুতরাং অক্ষর এবং সিলেবল্ এক নয়। সংস্কৃত মতে অবশ্য কোনো কোনো সময় সিলেবলকেও অক্ষর বলতে হয়। যেমন—পত্র ও উৎস শব্দের অক্ষরবিভাগ হচ্ছে প-ত্র ও উ-ৎস, কিন্তু শরৎ ও অসৎ শব্দের অক্ষর-বিভাগ হচ্ছে শ-রৎ ও অ-সৎ। পত্র ও উৎস সিলেবল্ অনুসারে পৎ-র ও উৎ-স এভাবে বিভাজ্য। সংস্কৃতমতে অক্ষর ও বর্ণ শব্দের দ্বারা যেমন লিপিবিভাগ বোঝায়, তেমনি আবার হরফ (letter)—বিভাগও বোঝায়। তবে একই প্রসঙ্গে এই দুই অর্থের একত্র ব্যবহার হয় না। বাংলায় (হিন্দিতেও) কিন্তু এই দুই অর্থের একত্র সমাবেশই সাধারণ রীতি। বাংলায় তথা হিন্দিতে হলন্ত, স্বরান্ত এবং যুক্ত এই তিন রকম লিপিভাগকেই অক্ষর বলা হয়। যেমন ক, কা এবং ক্র এই তিনটিই একেক অক্ষর বলে গণ্য। 'পুণ্যবান্' শব্দে পুণ্-ণ্য-বান্ এরকম সিলেবলভাগ অনুসারে তিন অক্ষর গণনার রীতি নেই। লিপিভাগ অনুসারে পু-ণ্য-বা-ন্ এই চার অক্ষর গণনা করাই রীতি। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই এই রীতির অনুসরণ করেছেন। রামমোহন কিন্তু অক্ষর ও সিলেবল-এর পার্থক্য উপলব্ধি করেছিলেন, তাই সিলেবল-বোধক একটি নূতন শব্দ উদ্ভাবনের প্রয়োজনও অনুভব করেছিলেন। তাঁর একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি। তিনি বলছেন, পয়ারের "প্রত্যেক চরণে চতুর্দশ অক্ষর হয়, তাহাতে সপ্ত হইতে ন্যূন নহে চতুর্দশের অধিক নহে ধ্বন্যাঘাত হইয়া থাকে। যথা—

ডাক হাক ঢাক ঢোল মাল সাট সার
বাক্যেতে পর্বত কিন্তু কার্যে তিলাকার॥"

তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন উভয় চরণেই চোদ্দো 'অক্ষর', কিন্তু প্রথম চরণে 'ধ্বন্যাঘাত' সাত ও দ্বিতীয় চরণে বারো। সুতরাং তাঁর মতেও ধ্বন্যাঘাত অর্থাৎ সিলেবল্ এবং অক্ষর এক বস্তু নয়। রামমোহন সিলেবল-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'ধ্বন্যাঘাত' শব্দটি তৈরি করেছেন। আমি ব্যবহার করি 'ধ্বনিব্যষ্টি' বা শুধু 'ধ্বনি'। এই শব্দ দুটিও দ্ব্যর্থকতা-হীন নয়, তবে সিলেবল্ অর্থের অক্ষর শব্দের ব্যবহারে যত জটিলতার সৃষ্টি হয়, 'ধ্বনি' শব্দে তা হয় না। রবীন্দ্রনাথও বহু স্থলে সিলেবল্ অর্থে 'ধ্বনি' শব্দ ব্যবহার করেছেন। পুণ্যবান শব্দে তিন অক্ষর বললে খটকা লাগে, কিন্তু তিনটি ধ্বনি আছে বললে তা হয় না। যাহোক, সিলেবল শব্দের আরও নির্দোষ প্রতিশব্দ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আরেকটি দ্ব্যর্থবোধক পারিভাষিক শব্দ হচ্ছে 'মাত্রা'। মাত্রা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'যার দ্বারা পরিমাপ করা যায়' অর্থাৎ পরিমাপ

করার য়ুনিট বা একক। বলাবাহুল্য বস্তুভেদে মাত্রার প্রকৃতিভেদ ঘটে। যেমন কোনো বস্তুর পরিমাপক মাত্রা হচ্ছে সের, আবার কোনো বস্তুর মাত্রা হচ্ছে গজ। তাছাড়া কোন বস্তুর আয়তন বা প্রয়োজন-ভেদেও মাত্রাভেদ ঘটে। যেমন অবস্থাবিশেষে দুধের পরিমাপ করি 'মণ'এর হিসাবে, কখনও করি 'সের'এর হিসাবে। অর্থাৎ অবস্থাবিশেষে দুধের পরিমাণ নির্ণয়ের মাত্রা হচ্ছে 'মণ' অবস্থাবিশেষে 'সের'। এ্যালোপ্যাথ ডাক্তার ওষুধের ব্যবস্থা করে বলে গেলেন দশ ফোঁটায় বা এক ড্রামে একমাত্রা। হোমিওপ্যাথ যদি তর্ক করে বলেন দশ ফোঁটায় তো দশ মাত্রা, এক ড্রামে ষাট মাত্রা তাহলে সেটা হবে কুতর্ক। হোমিওপ্যাথের পক্ষে এক ফোঁটায় এক মাত্রা হলেও এ্যালোপ্যাথের পক্ষে তা নাও হতে পারে। বোঝা গেল মাত্রা হচ্ছে কোনো বস্তুর পরিমাপক একক বা য়ুনিট, কোনো য়ুনিটের নাম নয়। অর্থাৎ মাত্রা আর মাত্রার নাম স্বতন্ত্র। অবস্থাভেদে মাত্রার ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহৃত হয়, যেমন—ফোঁটা, ড্রাম, আউন্স, সের, মণ। অন্যত্র ইঞ্চি, গজ, মাইল কিংবা সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন।

এখন দেখা যাক্ ছন্দের মাত্রা নির্ণয় হয় কিরূপে। প্রথমেই বলা ভালো যে, অন্যান্য বহু বস্তুর ন্যায় ছন্দেও অবস্থাবিশেষে এবং প্রয়োজন মতো নানা আয়তনের মাত্রা ব্যবহৃত হয়। যখন বলি কোনো কবিতার ছন্দ 'ত্রিপদী' তখনই বোঝা যায় তার প্রত্যেক পংক্তিতে তিন 'পদ'। এখানে পদকেই পংক্তির পরিমাপক মাত্রা বলে স্বীকার করা হলো। আরেকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

সব যেন । বিচ্ছিরি ॥ সব যেন্ । খালি ।
গিন্নির । মুখ যেন ॥ চিমনির । কালি ॥
—সুকুমার রায়

বলা বাহুল্য এটি হচ্ছে সুপরিচিত পয়ার বা দ্বিপদী ছন্দের দৃষ্টান্ত। এর প্রতি পংক্তিতে দুই পদ, প্রতি পদে দুই পর্ব। যদি বলি এটি দ্বিপদী তখন পদই এর মাত্রা, যদি বলি চৌপর্বিক তখন তার মাত্রা হয় পর্ব। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে 'মাত্রা' কথাটি উহ্য থাকে।

যখন স্পষ্টভাবে মাত্রা শব্দের ব্যবহার হয়, তখন তার দ্বারা কি বোঝায় দেখা যাক। প্রথমেই বলা উচিত যে, সাধারণত পর্বের পরিমাপক অর্থেই মাত্রা শব্দের প্রয়োগ হয়। উপরের দৃষ্টান্তটিতে প্রত্যেক পর্বে চার মাত্রা, শেষ পর্বে দুই।

ঘুমের দেশে । ভাঙিল ঘুম ॥ উঠিল
কল । -স্বর।
গাছের শাখে । জাগিল পাখি ॥ কুসুমে
মধু । -কর ॥
—রবীন্দ্রনাথ

এখানে প্রতি পূর্ণ পর্বে পাঁচ মাত্রা, অপূর্ণ পর্বে দুই। সাধারণত পর্বের পরিমাপক অর্থে মাত্রা শব্দের ব্যবহার হলেও কখনও কখনও পংক্তির পরিমাপক হিসাবেও ওশব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, চোদ্দো মাত্রার বা আঠারো মাত্রার পয়ার।

এখন প্রশ্ন মাত্রা মানে পর্বের পরিমাপক, কিন্তু এই মাত্রা বা পরিমাপকের নাম কি? সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে এই মাত্রার নাম হচ্ছে 'কলা'। মাত্রা মানে unit, আর কলা মানে mora। উপরের দৃষ্টান্ত দুটিতে একেক কলায় একেক মাত্রা। সুতরাং এসব ছন্দকে বলতে পারি কলামাত্রিক বা কলাবৃত্ত ছন্দ (Moric Metre)।

এবার অন্য রকম দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

ভেঙে-পড়া । ডিঙির মতো ॥ হেলে-পড়া । দিন
তারা-ভাসা । আঁধার-তলায় ॥ কোথায় হবে । লীন
—রবীন্দ্রনাথ

এর প্রতিপর্বে কয় মাত্রা? যদি ছড়ার মতো টেনে টেনে পড়া যায় (ভেঙে—পড়া—এরকম করে) তাহলে প্রতিপর্বে পাওয়া যাবে ছয় কলা। কিন্তু স্বাভাবিক কথোপকথনের ভঙ্গিতে পড়লে ছয় কলা পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথ এ ছন্দের পর্বে ছয় কলা গণনা করেন। অমূল্যধন করেন চার কলা এবং সত্যেন্দ্রনাথ পাঁচ কলা। কিন্তু এই তিন রকম হিসাবেই অসুবিধা আছে। সে তর্কে আমাদের প্রয়োজন নেই। কলার হিসাবটাই এ ছন্দের পক্ষে গৌণ। কেননা এ ছন্দের মাত্রা কলা নয়, এ ছন্দের মাত্রা হচ্ছে সিলেবল্। অর্থাৎ এ ছন্দটা moric নয়, syllabic। প্রতি সিলেবল্এ অনধিক একটি করে পূর্ণস্বর থাকে বলে syllabic শব্দের বাংলা করা যায় স্বরবৃত্ত বা স্বরমাত্রিক। উপরের দৃষ্টান্তে প্রতি পূর্ণ পর্বে চারটি করে সিলবেল্ বা স্বরধ্বনি পাওয়া যাবে।

মন বলে । সংসারে ॥ আর কেন । থাকি,
বিলকুল । সব যেন ॥ ভেলকির । ফাঁকি ।
—সুকুমার রায়

জন্মেছি যে। মর্ত্যকোলে ॥ ঘৃণা করি। তারে
ছুটিব না । স্বর্গ আর ॥ মুক্তি খুঁজি । -বারে ।
—রবীন্দ্রনাথ

পরের অধীন । দাসের জাতি ॥ নেশন
আবার । তারা,
তাদের আবার । এজিটেশন, ॥ নয়ন
উঁচু । করা!
—হেমচন্দ্র

তিনটিই পয়ার বা দ্বিপদী। প্রথমটি কলামাত্রিক (moric) এবং তৃতীয়টি স্বরমাত্রিক (syllabic)। কিন্তু দ্বিতীয়টি? এটিও কলামাত্রিক, কিন্তু এর বিশ্লেষণ প্রথমটির মতো সরল নয়। এর বিশ্লেষণে কিছু জটিলতা আছে; তাই এটিকে বলা যায় জটিল কলামাত্রিক বা যৌগিক ছন্দ।

আরও এক রকম ছন্দের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

তুহিন-লীন । কোন্ মুনির ।
ছিলাম কোন্ । স্বপ্নেতে ।
জন্ম মোর কোন্ চোখের
কটাক্ষের সংকেতে ॥
—সত্যেন্দ্রনাথ

উগ্র তুমি । বাহির হতে । ব্যগ্র তুমি । অহর্নিশি,
অন্তরেতে শান্ত তুমি আত্মরতি মৌনী ঋষি।
তোমায় কবি বর্ণিবে কি? নও হে তুমি বর্ণনীয়,
আকাশ-গলা প্রকাশ তুমি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়॥
—সত্যেন্দ্রনাথ

দুটি দৃষ্টান্তেই প্রতি পর্বে পাঁচ কলা। কিন্তু এইটুকু পরিচয়ই যথেষ্ট নয়। প্রতি পর্বের কলাসংখ্যার সমতা থাকা সত্ত্বেও দুই ছন্দে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। প্রথমটির প্রত্যেক পর্বে আছে তিনটি করে সিলেবল বা স্বর, এবং দ্বিতীয়টিতে আছে চারটি করে। কলার সমতা সত্ত্বেও এই সিলেবল সংখ্যার পার্থক্য বশতই ছন্দের পার্থক্য ঘটেছে। প্রথমটির পূর্ণ পরিচয় এই যে, এটি হচ্ছে ত্রিস্বর-পঞ্চকল-পর্বিক ছন্দ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে চতুঃস্বর-পঞ্চকল-পর্বিক। এ রকম যে সব ছন্দের পর্বে স্বর সংখ্যা ও কলা সংখ্যার সমতা স্থির থাকে তাকে বলা যায় স্বরকলা মাত্রিক (syllabic-moric) ছন্দ। সংস্কৃতে (তথা ফারসী প্রভৃতি প্রাচীন ভাষাতেও) এই স্বরকলা মাত্রিক ছন্দেরই প্রাধান্য। প্রাকৃত ও আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে এই ছন্দের ব্যবহার ক্রমেই কমে আসছে। বাঙ্গলায় এ রকম ছন্দের প্রয়োগ ছিল না বললেই চলে। আধুনিককালে সত্যেন্দ্রনাথ এই ছন্দ-রীতির প্রবর্তন করেছেন।

যা হোক, দেখা গেল বাঙ্গলা ছন্দের মাত্রা দুরকম, কলা (mora) এবং ধ্বনি (syllable)। এই দুরকম মাত্রার ভিত্তিতে বাংলা ছন্দকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) সরল কলা-মাত্রিক (প্রচলিত নাম মাত্রাবৃত্ত), (২) জটিল কলামাত্রিক বা যৌগিক (প্রচলিত নাম অক্ষরবৃত্ত), (৩) স্বরমাত্রিক (প্রচলিত নাম স্বরবৃত্ত, লৌকিক বা ছড়ার ছন্দ), (৪) স্বরকলা মাত্রিক (কোনো বিশেষ নাম প্রচলিত নেই)। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই নামগুলি নূতন কিন্তু আমার বিবেচনায় এই নামই যুক্তিসঙ্গত এবং 'ছন্দ পরিচয়' নামে একখানি অচিরপ্রকাশিতব্য পুস্তকে এই নামই ব্যবহার করেছি।

আরেকটি দ্ব্যর্থক পারিভাষিক শব্দের কথা বলেই প্রবন্ধ শেষ করব। সেটি হচ্ছে 'পদ'। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দ-শাস্ত্র মতে পদ হচ্ছে ছন্দের বৃহত্তম বিভাগ, অর্থাৎ পূর্ণ যতি পর্যন্ত ছন্দের ভাগ। পদের অপর অর্থ চতুর্থাংশ (তুলনীয় পোয়া, সওয়া)। সংস্কৃতে শ্লোকের চতুর্থাংশ বলেই উক্ত বিভাগের নাম হয়েছে পদ। পদ শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে 'পাদ' এবং 'চরণ' কথারও প্রয়োগ হয়। বাংলায় চার পদে শ্লোক সম্পূর্ণ হয় না, তবু অনেক সময় পূর্ণ যতির বিভাগকে পদ বলা হয়। যেমন চতুর্দশপদী কবিতা, পদাবলী। কিন্তু পদ শব্দের আরেকটি অর্থ আছে। ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি নামের দ্বারাই তা সুস্পষ্ট।

চলে নীল শাড়ি। নিঙাড়ি নিঙাড়ি।
পরাণ সহিত মোর। —চণ্ডীদাস

এটি হচ্ছে একটি চরণ বা পদ। এর অন্য পরিচয় হচ্ছে এটি ত্রিপদী। অর্থাৎ এটি একটি 'ত্রিপদী পদ'। সমগ্রের যা নাম অংশেরও সেই নাম। স্পষ্টতই এ নামকরণ অযৌক্তিক। সুতরাং হয় অংশের জন্য না হয় সমগ্রের জন্য নূতন নাম চাই। পদ শব্দের অংশার্থই অধিকতর প্রচলিত; বিশেষত ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি পারিভাষিক নামগুলি অচল বলে স্বীকৃত হবার কোন সম্ভাবনা নেই। অতএব সমগ্রের জন্য নূতন নাম করাই বাঞ্ছনীয়। দীর্ঘকাল যাবৎ ওরকম একটি নাম চলেও আসছে। সেটি হচ্ছে 'পংক্তি'। এনামটি প্রথম কখন ব্যবহৃত হয় জানি না। তবে দেখতে পাই মেঘনাদ বধ কাব্যের ভূমিকায় (১৮৬২ বা ১৮৬৭) হেমচন্দ্র এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন; 'আলেখ্য' কাব্যের (১৯০৭) ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল এবং 'ছন্দ সরস্বতী' (১৯১৭) প্রবন্ধে সত্যেন্দ্রনাথও 'পংক্তি' নাম স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথও 'পংক্তি' ব্যবহার করতে দ্বিধা বোধ করেন নি (তুলনীয় পংক্তি লঙ্ঘক ছন্দ ইত্যাদি)। কিন্তু ইদানীং দিলীপকুমার এই নামটিকে 'সুশ্রাব্য নয়' অপবাদ দিয়ে অপাংক্তেয় করেছেন এবং সেই প্রাচীন 'চরণ'-এর আশ্রয় নিয়েছেন (ছান্দসিকী পৃ ২৫)। যা হোক আমার বিবেচনায় 'পংক্তি' শব্দ ব্যবহারের বিশেষ সার্থকতা আছে। পংক্তি মানে 'সারি' বা শ্রেণী। বিশেষ প্রণালীতে সজ্জিত ধ্বনি বা পর্বের শ্রেণীকে পংক্তি বলা পদ বা চরণ বলার চেয়ে অধিকতর সংগত বলেই বোধ হয়।

পদ বা চরণ শব্দের মতো দ্ব্যর্থক পরিভাষা ব্যবহারে যে বিভ্রান্তি ঘটবার সম্ভাবনা আছে তা বহুকাল পূর্বেই অনুভূত হয়েছিল। ১৮৬২ সালে প্রকাশিত 'কাব্যনির্ণয়' গ্রন্থ থেকে একটু অংশ উদ্ধৃত করছি।

"এক একটি কবিতায় পদ অর্থাৎ যত চরণ (প্রধান বিভাগ) থাকে, তাহা ধরিয়া বঙ্গ ভাষায় ছন্দঃ গণনা করা হয়। যথা ত্রিপদী, চৌপদী, বিষমপদী ইত্যাদি। এই নিয়মানুসারে পয়ারকে দ্বিপদী বলা যাইতে পারে। চারি চরণের ন্যূনে একটি শ্লোক হয় না। ঐ চরণ ও পদ এক নহে। পদ শব্দে প্রধান বিভাগ।"

রামমোহন পংক্তি অর্থেই 'চরণ' ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কাব্য নির্ণয়ে পদ বা চরণ শব্দের দ্বারা প্রধানত পংক্তি বিভাগকেই বোঝানো হয়েছে। যেমন "পয়ারের প্রথমার্ধে দুই পদ এবং শেষার্ধে দুই পদ," ত্রিপদী "ছন্দের প্রথমার্ধে তিন চরণ ও দ্বিতীয়ার্ধে তিন চরণ।" কিন্তু পংক্তি অর্থেও স্থলে স্থলে চরণ শব্দ ব্যবহার করতে হয়েছে বলে অনেক ক্ষেত্রেই সংশয় দেখা দেয়। পংক্তি শব্দের প্রয়োগ থাকলে— ওরকম হতে পারতনা। সব

প্রসঙ্গক্রমে পয়ার সম্বন্ধে দু-একটি কানদিন বলা প্রয়োজন। আমরা জানি পয়ারের প্রআবার পংক্তিতে দুই পদ, প্রথম পদে আট এবং দ্বিত না— পদে ছয় মাত্রা। অতএব পয়ার হচ্ছে আসকে? দ্বিপদী। কাব্যনির্ণয়েও পয়ারকে স্পষ্টতাপনা. দ্বিপদী বলা হয়েছে। কিন্তু প্রাচীনকানি। পয়ারের দ্বিপদীত্ব (অর্থাৎ আট মাত্রার পরের যতিটি) সচেতনভাবে স্বীকৃত হতো কিনা সন্দেহ। রামমোহন তাঁর গৌড়ীয় ব্যাকরণে ত্রিপদীর প্রতি 'চরণে' তিন বিভাগ বা অংশের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু পয়ারের পরিচয়ে চরণের বিভাগ বা অংশের কথা বলেন নি। শুধু বলেছেন পয়ারের "দুই চরণ......প্রত্যেক চরণে চতুর্দশ অক্ষর হয়।" ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল থেকে পয়ারের যে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছেন তাতেও পয়ারের পদবিভাগ নেই। দৃষ্টান্তটি এই—

রাজা বলে গোসাই বাসায় আজি চল।
করা যাবে উপযুক্ত কালি যেবা বল॥

অন্নদা মঙ্গলে এ-রকম আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে। ভারতচন্দ্রের ছন্দপ্রতিভা অসাধারণ। তাঁরই হাতে পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি বাংলা ছন্দের 'অক্ষর'-সংখ্যাগত রূপ সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে। কিন্তু তাঁর হাতেও পয়ারের দ্বিপদী প্রকৃতি ধরা পড়েনি, অর্থাৎ প্রতি পংক্তিতে আট মাত্রার পরের যতটি তাঁর কাছে স্বীকৃতি পায় নি। রামমোহনের সময়েও পয়ারের পদবিভাগ সুস্পষ্ট হয় নি। আমরা দেখেছি লাল মোহন বিদ্যানিধির কাব্যনির্ণয়ে পয়ারকে দ্বিপদী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এ অনুমান করা অসংগত হবে না যে, গৌড়ীয় ব্যাকরণের (১৮৩৩) পরে এবং কাব্যনির্ণয়ের (১৮৬২) পূর্বে কোন সময়ে পয়ারের দ্বিপদী প্রকৃতি অর্থাৎ আট মাত্রার যতি বিভাগটি স্বীকৃত হয়েছে। কার হাতে পয়ারের এই বিশিষ্ট রূপটি গড়ে উঠেছে তার অনু ধান করা বাঞ্ছনীয়। প্রসঙ্গক্রমে বল নন,—দে. জয়গোপাল তর্কালংকারের স বাও কত সুন্দর! (১৮৩০-৩৪) ও মহাভা করা দামী পোষাকের ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তে ক যাওয়া—সাবানে কাচা পয়ারের পদবি রের জামাটা লজ্জায় যেন আরও পয়ার ছন্দের ছল।

এই যতি ন আর দুটি ভদ্রলোক,—সাধারণ করেন, মর পাঞ্জাবী আর জিনের কোট পরা— ঔৎসুপো বাড়ি কাচানো, ফর্সা—তবে নতুন নয়।

একটু পরেই এলেন এক মহিলা,—বর্ষীয়সী.— লাল পেড়ে গরদের শাড়ী পরে;—সঙ্গে একটি ছেলে রঙিন ছিটের জামা পরা,—নতুনই। আর একটু পরে দুজন মারোয়াড়ী ভদ্রলোক এলেন,—গায়ে লম্বা কোট মিহি সুরু পেড়ে ধুতি পরা। আর কয়েকজন সাধারণ পোষাকে আসতে আসতে গাড়ি ছেড়ে দিলে।

মার্কিণ সাহেব মেম সবার দিকেই একবার চোখ বুলিয়ে হেসে হেসে কি যেন সব বলাবলি করত লাগলেন।

পরের স্টপেজে গাড়ি থামলে—এক সঙ্গে উঠলেন দশ বারোজন মেয়ে পুরুষ। হাঁ,— পোষাক বটে!—তিনজন বাঙালী সুট পরে এসেছেন,—সে সুটের কাপড় আর টেলরিং-এর কাছে মার্কিণ সাহেব মেমের কাপড় প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে না। মনে হ'ল এইবার কাঁপতে

এস, আর, দাশ

ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোগী

৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন—সাউথ ২০৮১, টেলিগ্রাম—'ASARDAS'

কর্ম্ম তালিকা

প্রোপ্রাইটার

বিজলী প্রেস
কলিকাতা

মেসার্স এস, আর, দাশ
ইলেকট্রিকের সরঞ্জাম বিক্রেতা ও কণ্ট্রাক্টর
কলিকাতা

ম্যানেজিং এজেণ্ট

চাঁদপুর ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ
চাঁদপুর

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ম্যাচ ফ্যাক্টরী, লিঃ
চাঁদপুর

...ল কটন এণ্ড ষ্টোরস
...ন্ডিকেট লিঃ
...তা

...নেজিং ডিরেক্টর

...াদপুর মডেল
... লিঃ
... ও কলিকাতা

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ধুবড়ী ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ
ধুবড়ী, আসাম

শান্তিনিকেতন ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ
শান্তিনিকেতন

ষ্টীল এণ্ড ইলেক্‌ট্রিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ
কলিকাতা

চ্যাটার্জি, দাশ এণ্ড কোং, লিঃ
কলিকাতা

ওরিয়েণ্টাল ক্লথ প্রডাক্টস্, লিঃ
কলিকাতা

মডেল গ্লাস ওয়ার্কস, লিঃ
বেলগাছিয়া, হাওড়া

চাঁদপুর গ্লাস ওয়ার্কস, লিঃ
চাঁদপুর

টেকনো ট্রেডার্স, লিঃ
যন্ত্রপাতি ও ইলেক্‌ট্রিকের সরঞ্জাম আমদানীকারক
কলিকাতা

...সমৃদ্ধ করে তোলার কাজে ব্রতী

বীমা...
কাজেই ...
রেন্সের একথ...
প্রিয় পরিজনদের
ব্যবস্থা ক...

প্রিমিয়াম বাবদ আয় ৯,১১,৫৩

মোট আয় ১০,৪২,৯৬৯৲

জীবনবীমা তহবিল ৩২,০৬,৪০৯৲ টাকা

মোট তহবিল ৪৪,৭১,৫১৭৲ টাকা

মিটানো দাবীর পরিমাণ প্রায় ১২,৫০,০০০৲ টাকা

ব্যয়ের হার ১৪·৭

গবর্ণমেণ্ট এবং অন্যান্য অনুমোদিত সিকিউরিটিসমূহে ও পলিসি লোনে কোম্পানীর লগ্নী করা অর্থের পরিমাণ মোট জীবনবীমা তহবিলেরও অধিক।

মিঃ জে সি দাশ,
বি, এস্‌সি (ইউ এস এ), আর এ,
ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান।

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিমিটেড

হেড অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

SDB-2



নির্বাসার বাসব্য মন

শ্রীতারাপদ রাহা

পূজার আগেই বই বেরুবে। পাবলিশার্সের তাড়াতে প্রেসে গিয়েই রোজ প্রুফ দেখে আসি,—বিকেলে। গড়িয়াহাটার মোড়ে গিয়েও অবশ্য ট্রাম ধরা যায়,—কিন্তু তার চেয়ে 'টারমিনাস'ই আমার ভাল। দূরে সমানই।

খালি ট্রাম একের পর আরেকটা এসে দাঁড়ায়। তারই একটায় স্বেচ্ছামত পছন্দমত সীটে গিয়ে ব'সে—একটা সিগারেট বের করে ধরানোয় নিশ্চয়ই কিছু রোমাঞ্চ আছে,—বিশেষ করে আমার মত নির্ঝঞ্ঝাট আয়েসী লোকের!—তারপর নবাগত যাত্রীর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখা।

আর সকলের কেমন লাগে জানি না,—কিন্তু আমার বেশ লাগে।

বালীগঞ্জের 'টারমিনাসে' আমার পরেই ট্রামে এসে উঠলেন—এক বিদেশী ও এক বিদেশিনী। বিদেশীর গায়ে মিলিটারী অফিসারের পোষাক। বিদেশিনী হয় তাঁর স্ত্রী, না হয় বান্ধবী। এদিকটায় ওরা বোধ হয় নতুন এসেছেন ঃ এদিক ওদিক চেয়ে দেখছেন,—তারপর কথা আর হাসি। কথাবার্তার দু'একটা আমার কানে এসেও লাগছিল। উচ্চারণে বুঝলাম—এরা অ্যামেরিকান্। চেহারায়ও তারই মালুম পাচ্ছি।

এদের চিনতে বড় ভুল হয় না আমার ঃ দার্জিলিং—'ল্যাংগোয়েজ স্কুলে'—অ্যামেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড থেকে আরম্ভ করে—ইংলণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড—সকল দেশের ধুরন্ধরদের উচ্চারণ শুনে আর চেহারা দেখে কান আর চোখ এদের সম্পর্কে একেবারে পাকা হয়ে গেছে আমার। অনভিজ্ঞের কাছে সব কাকই এক,—অভিজ্ঞের কাছে নয়।

ওরা আমার দিকে তাকিয়ে—কি যেন সব বলাবলি করতে লাগলেন।

খদ্দরের পাঞ্জাবী পরে এসেছি আমি,—বাড়িতে কাচা,—রিপুকরা। কি করব, উপায় নেই! জামা করব বলে খদ্দর কিনতে গিয়েছিলাম,—দোকানদার জিজ্ঞাসা করলেন,—সুতো এনেছেন?

ভুলে গিয়েছিলাম—খদ্দর কিনতে হ'লে টাকায় দু-আনার করে সুতো দিতে হবে।—কার্টবো তার সময় কই?—সৎকাজে মন দেবার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছি।

ডাইং ক্লিনিং-এ জামা কাপড় কাচানোও অনেকদিন হ'ল ছেড়েছি,—কারণ,—দিলে বোকা বনতে হয় ঃ ওরা প্রায়ই বলে বসে,—কাপড় হারিয়ে গেছে,—দাম নিন!—আর দাম ত ভারি, পুরো দামের সিকি। আর দাম দিলেই বা কাপড় পাচ্ছি কোথা?

কেউ হয়ত বলে বসবেন,—ডা'ইং ক্লিনিংএ জামা কাপড় দিলেই যে হারিয়ে বসবে—এ কথা-ই কি ঠিক হ'ল?—আমি বলব, হাঁ ঠিক,—না হারাতে পারলে ওদের হবে আহাম্মকি।

আকবরের সভার বীরবলের কথা মনে পড়ে।

আকবর একদিন জিজ্ঞাসা করলেন,—বীরবল,—আচ্ছা বল ত,—দুনিয়ার মাঝে সব চেয়ে বড় আহাম্মক কে?—বীরবল তিনদিন সময় চাইলেন। তিনদিন পরে আকবর আবার জিজ্ঞাসা করলেন,—বীরবল,—বললে না—দুনিয়ার মাঝে সব চেয়ে বড় আহাম্মক কে?

বীরবল অমনি বলে উঠলেন,—জাহাঁপনা.—দুনিয়ায় সব চেয়ে বড় আহাম্মক আপনি।

আকবর কথা শুনে—রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন,—তোমার—এ ধারণার কারণ?

জাহাঁপনা,—এই ত সেদিন—ইরাণ দেশ থেকে কয়েকজন অশ্ব-বিক্রেতা এল,—আপনি নতুন ভাল ঘোড়া আনবার জন্য দুই লক্ষ আসরফি তাদের আগাম দিয়ে দিলেন।—ওরা কি আর ফিরে ঘোড়া নিয়ে আসবে?

আকবর বললেন,—আর যদি ওরা ঘোড়া নিয়ে আসে,—তা হ'লে?

বীরবর বললেন,—তা'লে আমার কথা ফিরিয়ে নিয়ে আমি ফের বলব,—দুনিয়ার মাঝে সব চেয়ে বড় আহাম্মক ওরা।

কথাটা বেশ বলেছিলেন বীরবল। কাপড় কাচতে দেওয়া সম্বন্ধে আমিও আজকাল—ঐ মত পোষণ করি।

তবুও মনের মাঝে খচ্‌খচ্ করে বিঁধতে লাগলো যেন ঃ হ'ত সাবেক দিন,—দেখিয়ে দিতাম বাঙালীর ধুতি পাঞ্জাবীও কত সুন্দর! ওদের ইস্ত্রি-পালিশ করা দামী পোষাকের কাছে—আমার কুচকে যাওয়া—সাবানে কাচা রিপুকরা খদ্দরের জামাটা লজ্জায় যেন আরও কুচকে যাচ্ছিল।

এলেন আর দুটি ভদ্রলোক,—সাধারণ রকমের পাঞ্জাবী আর জিনের কোট পরা—ধোপা বাড়ি কাচানো, ফর্সা—তবে নতুন নয়। একটু পরেই এলেন এক মহিলা,—বর্ষীয়সী.—লাল পেড়ে গরদের শাড়ী পরে:—সঙ্গে একটি ছেলে রঙিন ছিটের জামা পরা,—নতুনই। আর একটু পরে দু'জন মারোয়াড়ী ভদ্রলোক এলেন,—গায়ে লম্বা কোট মিহি সরু পেড়ে ধুতি পরা। আর কয়েকজন সাধারণ পোষাকে আসতে আসতে গাড়ি ছেড়ে দিলে।

. মার্কিণ সাহেব মেম সবার দিকেই একবার চোখ বুলিয়ে হেসে হেসে কি যেন সব বলাবলি করত লাগলেন।

পরের স্টপেজে গাড়ি থামলে—এক সঙ্গে উঠলেন দশ বারোজন মেয়ে পুরুষ। হাঁ,—পোষাক বটে!—তিনজন বাঙালী সুট পরে এসেছেন,—সে সুটের কাপড় আর টেলারিং-এর কাছে মার্কিণ সাহেব মেমের কাপড় প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে না। মনে হ'ল এইবার

সাহেবের মুখ চুণ হয়ে যাবে।—কিন্তু সাহেবটা এদের দিকে চেয়ে হাসছেই। সুট পরা বাঙালী ভদ্রলোকদের সঙ্গে এসেছেন তিনটি তরুণী। একজনের জামরঙের টাঙাইলের শাড়ী পরা, গায়ে ঐ রঙেরই এক সিল্কের ব্লাউজ। আর একজনের ফিনফিনে ছাপানো শাড়ী,—আর একজনের পরণে সিল্ক,—সঙ্গে একজন বর্ষীয়সী,—বোধ হয় এদের মা,—কালো নক্সা পেড়ে—শান্তিপুরী পরে এসেছেন। হিংস্র আনন্দ হচ্ছিল মনেঃ দেখুক মেম সাহেব—বাঙালী মেয়েদের পোষাক কেমন!—বাঙলা দেশের গরীব সাহিত্যিকের জামা দেখে ব্যঙ্গের হাসি—হাসার জন্য অনুতাপ করতে হবে এবার!

ট্রাম গড়িয়াহাটার মোড়ে এসে থামলো। উঠলেন—জন পনেরো। একটি মেয়ের দিক থেকে আমি নিজেও চোখ ফিরাতে পারছিলাম না। বয়স ছাব্বিশ সাতাশ হবে,—রঙ অস্বাভাবিক ফরসা। বিয়ে হয়নি নিশ্চয় ঃ মাথার চুল বরের কায়দায় বাঁধা। ধবধবে সাদা ভইলের শাড়ী পরেছে,—কিনারায় সাদা লেস লাগানো পাড়। পায়ে হাঁইলতোলা জুতো,—হাতে প্যারাসোল আর সচেল। এসেই টিকেট চাইলে মেয়েটা ঃ দাঁতগুলিও তার পরণের ভইলের মত সাদা।

মেম সাহেব একদৃষ্টে চেয়ে আছে তার দিকে। মনে মনে বললাম আমি,—কেমন!... সাহেবটাও চেয়ে আছে।



লাল পেড়ে গরদের শাড়ী পরে



মারমুখো হয়ে উঠেছে

পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের একটি ছেলেও এসেছিল এই দলে;—গায়ে আদ্দির চুড়িদার পাঞ্জাবী,—পরণের ফিন ফিনে ধুতির প্রান্ত জুতোর কিনারায় গিয়ে মিশেছে। সাহেব মেম তার দিকেও একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে ইসারায় কি যেন একবার বলাবলি করে নিলেন। বাকি তেরজনের কারো পোষাকেই দৈন্যের লেশ নেই।

গাড়ি মোড় ঘুরে পার্ক সার্কাসের দিকে ছুটলো। সাহেব মেম সবার দিকে বারবার করে তাকিয়ে—ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলে চলেছেন। চোখ মুখের রেখা পরিবর্তিত হয়ে উঠেছে তাদের। আমার মনে হতে লাগলো—বাঙলার বস্ত্র-সঙ্কট সম্বন্ধেই একটা ধারণা নিয়ে হয়ত তারা পর্যবেক্ষণে বেরিয়েছিলেন,—ধারণা তাদের বদলে গেছে।

এবার আর সকলের দিকে তাকানো ছেড়ে—ঐ দু-টির চোখের দিকেই চেয়ে রইলাম আমি। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—ওদের অক্ষি-মসুরিকায় বাঙলার নরনারীর বস্ত্র নিদর্শনের ছবি উঠছে,—তারপর 'ডেভেলপড্' হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে আমেরিকা আর ইউরোপের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রগুলিতে। পাঠকেরা ইজিচেয়ারে বসে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বাঙলার বস্ত্রহীনতার নিদর্শন দেখে হাসছে।

মনে পড়লো—আজই সকালে—কাগজে বস্ত্রের অভাবে পাঁচটি নারীর আত্মহত্যার কথা পড়েছি। মনে পড়লো আমাদের গাঁয়ের পটলের মার কাঁথা পরা মূর্তি। মনে পড়লো—দু'মাস আগে যখন গ্রা[মে] গিয়েছিলাম,—দত্ত বাড়ির [মে]বৌদি আমায় দেখে কেমন ক[রে] ঘরে—পালিয়ে গিয়েছিলেন। বার বার আমার কেবলি ম[নে] পড়তে লাগলো—বাঙলাদেশে[র] কোটি কোটি নরনারীর নগ্ন অর্ধনগ্ন মূর্তি[র] ছবি কেউই বিদেশে পাঠাবে না। ভাবে[ত] লাগলাম,—হয়ত এই সাহেব মেমের দেও[য়া] ছবি দেখে বিদেশের সহৃদয় পাঠকেরা বাঙলার সংবাদপত্রগুলিকে ভাববে—মিথ্যাবাদী।

কিন্তু তাদের মিথ্যাবাদী বানালে কারা—আমারই সামনে পিছনে অশেপাশে ব[সে] সুবেশ নর আর বিচিত্র বসনা নারী—সাহে[ব] মেমের গর্ব চূর্ণ করেছে বলে—একটু আ[গে] আমার মনে যে গর্বের সৌধ গড়ে উঠেছিল, মুহূর্তে তা ভূমিসাৎ হয়ে গেল।

পরের ষ্টপেজে উঠলেন—কয়েকজ[ন] শিক্ষয়িত্রী। পোষাকে সমারোহ না থাকলে[ও] দৈন্য নেই। আমার কেবলি মনে হতে লাগ[লো] —জীর্ণ দীন বসন পরে অন্ততঃ দু'[এক] লোকও আজকার এই ট্রামে উঠুক! বাঙলা[র] বস্ত্রদুর্ভিক্ষের একটুখানি আভাস পে[য়ে] যাক—আমেরিকা।

বিদেশী বিদেশিনী নেমে গেলেন 'সা[র্কাস] পার্কের' সামনে। চলল্লো গা[ড়ি।] অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। ভ[াবছি-] ছিলাম কলকাতার নগরবাসীদের কথা। দেশের নাড়ির সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন করে এ[রা] কেমন যেন আলাদা হয়ে পড়েছে। দেশের এ[রা] কেউ না,—এরা যেন এক ভিন্ন জগৎবাস[ী।] কোন দেশই এদেরকে সন্তান বলে দাবী করে পারে নাঃ এরা নাগরিক।......

অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে ভাবতে চলেছি গাড়ি কোন সময় পার্ক সার্কাস ডিপো [ছাড়িয়ে] হয়ে পার্ক ষ্ট্রীট ছাড়িয়ে কবরখানার সাম[নে] এসে পড়েছে,—কিছুরই খেয়াল ছিল [না] হঠাৎ ট্রামের ভেতরকার লোকগুলি একসা[থে] চীৎকার করে উঠতে গাড়ি থেমে গেল।

সে কি—'অ্যাকসিডেণ্ট' হচ্ছিল না!

এদিকে ওদিকে চাইতেই দেখি—অ্যাকসিডেণ্টই বটে!—ট্রামের ভেতরকার তাক লাগানো জামা কাপড় পরা মেয়ে পুরুষগুলো একেবারে মার-মুখো হয়ে উঠেছে ঃ তাদের অমন সুন্দর জামা কাপড়গুলি কালিতে একেবারে বীভৎস হয়ে উঠেছে।...ছি, ছি এমন কাজ করলে কে?

বাইরে চেয়ে দেখি কতকগুলি—ছেলে—দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।—ট্রামের পাশেই কয়েকটা মাটির আর কয়েকটা সস্তা কাঁচের দোয়াত ভাঙা।

ছেলেগুলি অবশ্য পালিয়েই গেল,—কেউ আর তাদের ধরতে পারলে না,—চেষ্টাও করলে না।

যাদের কাপড়ে কালি লাগে নি—তাদের একজন বললেন,—দেখলেন কাণ্ড,—হোলীর সময় নয়, কিছু নয়, এ সব কি বলুন ত!

আরেকজন বললেন,—আরে মশায়,—'বয়েজ আর বয়েজ'।

আরেকজন মুরুব্বিয়ানার সুরে বললেন, পরীক্ষা দিয়ে আসছিল বুঝি সব,—একটু দুষ্টুমী করে গেল।

কালি মাখা কাপড় নিয়ে অনেক ট্রাম থেকে নেমে পড়লেন,—ফেরতা ট্রামে বাড়ি ফিরবেন বলে ঃ যেখানে চলেছিলেন তারা এমন কাপড় নিয়ে সেখানে আর যাওয়া চলে না। অনেকে বসেই রইলেন।

রাত্রে বাড়ী ফিরে ব্যাপারটা পাড়ায় বলতে বাসুদা বললেন, দিন চারেক আগে তিনিও ঠিক এই ব্যাপারই দেখেছেন,—তিনি দেখেছেন—এণ্টালী বাজারের কাছে। যদু খুড়ো বললেন,—আরে, এ যে আমিও দেখেছি—জগুবাবুর বাজারের কাছে!



আরে, এ যে আমিও দেখেছি

সবাই তখন বলাবলি করতে লাগলেন,—সত্যিই এ সব কি 'ভিসাস হ্যাবিট' বলুন ত!

দিন তিনেক পরে বালীগঞ্জের এক স্কুলে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। স্কুলের বাইরে দেখি কয়েকখানা পোষ্টার লাগানো। কয়েকখানা কারা—আধা আধি ছিঁড়ে ফেলেছে। একখানা তখনও আস্ত আছে। কৌতূহলী হয়ে পড়লাম—বস্ত্রাভাবে দেশবাসী আজ নগ্ন—অর্ধনগ্ন। পাড়া গাঁ থেকে আসা লোকের মুখে শুনি, খবরের কাগজে দেখি—প্রতিদিন কত নারী বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যা করছে। জেলা ও মহকুমার হাকিমের কাছে বস্ত্রপ্রার্থী নির্বাসের মিছিল চলেছে। দেশের সত্যিকার রূপ এই।



কৌতূহলী হয়ে পড়লাম

এই নিদারুণ দুর্দিনে দেশের সে সব নরনারী বহুমূল্যে সূক্ষ্ম বসনে ভূষিত হয়ে দেশ-বিদেশের নানা লোকের বিস্ময় উৎপাদন করতে চান, তাদের ঐশ্বর্য আছে স্বীকার করি, কিন্তু তাদের প্রাণ নাই,—দেশাত্মবোধ নাই,—দেশের তারা পরম শত্রু।

দেশের শবদেহের এরা পুষ্পাচ্ছাদন। এ আচ্ছাদন অপসারিত করে দেশের সত্যরূপ দেখানোর ভার ছাত্রদের নিতে হবে,—স্কুলের ছাত্রদের।

বিদেশীরা—এদের বস্ত্র-বিলাসে বিভ্রান্ত হয়ে নিজের দেশে খবর পাঠাচ্ছেন—বাঙলায় বস্ত্রাভাব নেই। এ সংবাদের উপর নির্ভর করে বিদেশে থেকে আমাদের দেশে বস্ত্র বণ্টনের ব্যবস্থা হচ্ছে।

দেশকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করছে যে, বাসব্যাসন—তার প্রতি আমাদের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই।

এ ব্যাসন ঘুচোবার ভার নিতে হবে নগরের ছাত্র সমাজের।

অস্ত্র তাদের অসি নয়,—মসী। নিদারুণ বস্ত্র সংকটের দিনে বসনবিলাসী বাসবিলাসিনীদের বিচিত্র বসন মসী রঞ্জিত করে তাদের মুখে চুন কালী দিবার জন্য আমরা প্রত্যেক স্কুলের ছাত্রবৃন্দকে আহ্বান করেছি।

নিখিল কলিকাতা ছাত্র সঙ্ঘ।

ওয়েল গড়িয়াহাটার ট্রামে যেতে সেদিন বসন বিলাসীদের যে দুর্দশা দেখেছি,—তার কারণ এখন আর আমার অজানা রইল না। বস্ত্র দুর্ভিক্ষের দিনে বসনবিলাসী ও বাসবিলাসিনীদের মুখে ওরা যা করে চুনকালী দিতে চায়,—দিক,—কিন্তু আমি ভাবছি আমার কথা ঃ জামা কাপড় সব ত হয়ে এল,—সভা-সমিতি আর নিমন্ত্রণে যাবার জন্য একখানা ভাল কাপড় আর একটা মটকার জামা অনেক কষ্টে তুলে রেখেছিলাম আমি। সম্বল ত ঐ,—কিন্তু তা পরে আমি বাইরে বেরুব কি করে?

সংস্কার



অণিমার চোখের জলের বিরাম নেই।

ভবেশের জুতোর শব্দে চোখ মুছে উঠে বসে অণিমা।

"বৌদি।"

"আসুন।"

"শচীনবাবু কোথায়?"

"এইত' কোথায় গেলেন।" শচীনের নামে আবার বুঝি চোখে জল নামে। তাহাদের আট বৎসরের বিবাহিত জীবন।

মণ্টু, সাত বছরের সুদর্শন বালক মণ্টু ছুটে আসে। "ভবেশ কাকা, বাবা আজ মাকে ব'কেছে। মা তাই কেঁদেছে আজ।" না বলে থাকতে পারে না মণ্টু। মায়ের কান্না-ভরা মুখ তার খেলায় বাধা দেয় যে কেবলি। ভবেশ কাকা অত বড় মানুষ, মার কান্না ভোলাতে পারবে নিশ্চয়ই। মণ্টু যে বড্ড ছেলে মানুষ তাই তাকে কেউ মানে না।

'বৌদি',

"বলুন, মনে মনে বললে, না বললেই বাঁচি!

"কি হ'য়েছে? শচীনবাবু কেন ব'কেছেন?"

নিঃসঙ্কোচ নির্ম্মম প্রশ্ন।

"ও এম্নি একটু," ঠোঁট উল্টিয়ে বকুনির গুরুত্ব কমিয়ে, কথা পাল্টাতে চায় অণিমা। বুকের বোঝা কিন্তু অত সোজায় নামে না।

শিশুর করুণ আর্ত্তনাদে অণিমা জানালা দিয়ে চোখ মেলে দেয় বাহিরে—একটি রিক্সা-ওয়ালা। ময়লা ধুতি আঁট করিয়া পরিহিত একটি রিক্সাওয়ালা—তার পেশী বহুল হাত ক্রমাগত চল্‌তে থাকে একটি শিশুর পিঠে। জানালায় দাঁড়াম সুন্দরী অণিমা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, প্রভুত্ব দেখাবার লোভ তার বেড়ে ওঠে। "জান্ লেকে তব্ ছোড়্ দেঙ্গে।"

"বৌদি, আপনি না সরে এলে ওর বীরত্ব বেড়ে যাবে।" প্রৌঢ় ভবেশ নিজের বয়েস ভুলতে চায়। তাই শচীন তার পনর বছরের ছোট হলেও বন্ধু সে। আর কন্যা-স্থানীয়া অণিমা ভবেশের বন্ধুপত্নী—বৌদি।

পুরুষ রিক্সাওয়ালা। নারীর সাম্‌ পৌরুষ তারা অনাদিকাল থেকেই দেখি আসছে। সবার পিছনেই আছে প্রিয়া—রা ধনুক ভেঙেছেন, অর্জুন, পৃথ্বীরাজ হ করেছেন,—আপন আপন প্রিয়া। তাতেই তাঁ লাভ করেছেন তাঁদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা—ত পৌরুষ ছিল পুরুষকারে ভরা। রিক্সাওয়াল পৌরুষ কামনার বিকৃত রূপ।

"বৌদি, কি ভাব্‌ছেন?"

"কিছু না ত'!" পরম উৎসাহে ব অণিমা—"যেই না মণ্টু আজ তার কাঠের ঘো থেকে পড়ে গেছে আর টমি ছুটে এসে ত গা চেটে দিলে হিঃ হিঃ কি মজা! আর ঐ টুনু তার বর নাকি বড় খারাপ। সত্যি কি হবে।" এত বড় সমস্যা সাম্‌নে ধরেও ভবে মুখে তার সমাধানের চেষ্টা দেখে না অণিম

সাম্যবাদী বীরেন, মাত্র আঠার বছরে তরুণ; দমকা হাওয়ার মতই আসে সে।

"বৌদি, চা।"

"বীরু ঠাকুরপো জন্মেই চা বল্‌তে শিখে বুঝি?"

"না বৌদি, প্রথমে ম্যা, তারপর চ বড্ড দেরী করে ফেলেছি।" অকৃত্রিম দু মাথা নাড়ে বীরেন।

চেষ্টা না ক'রেও অণিমার মনের মে কেটে যায়। মৃদু হাসি নিয়ে বেরিয়ে আ অণিমা।

চায়ের জলে চিনি মিশায়।

শচীন বলেছে—'আমায় রেহাই দিলে আমি বাঁচি? তার মানে অণিমা মর্‌লেই ত শান্তি। হ্যাঁ, তা হলেই ত একটি শ্যামলী মত চটপটে ইংরেজী বলা মেয়ে বিয়ে ক আন্‌তে পারে। আর সেই বৌ যখন শ্যামলী মত হেসে পুরুষের গায়ে গড়িয়ে পড় তখন ভয়েই হয়ত' সেই বৌকে ভালবাস আরও বেশী। মণ্টুটাই হ'য়েছে তার পা

বড়ী। না হ'লে সে রেহাই দিয়েই যেতো। অণিমার মনে পড়ে তার মাকে, 'আমার আশীর্বাদে তোর চিরকাল শান্তি থাক্‌বে।' হাই! দুই চোখের অশ্রু মোছে দুই হাতে। দুই কাপ্‌ নিয়ে বেরিয়ে যায়।

বীরেন কেমন এক সন্দিগ্ধ প্রশ্ন ভরা চোখে চায় অণিমার দিকে। "বৌদি—"

অণিমা বিব্রত বিরক্ত হ'য়ে উঠে "কি ভাববে বল না—বৌদির কান আছে।" উষ্মায় ঢাকা দিতে চায় সব।

"বীরেনবাবুকে যেন আজ রিক্সা strike organise করতে দেখলাম না?" ভবেশের কণ্ঠস্বর গম্ভীর। ভঙ্গী তরুণের। বাম দিকের স্বল্প কেশে প্রশস্ত টাক ঢাকা পড়ে না। তথাপি সব চুলগুলোকে ডান দিকে এক-মুখী করবার কঠোর প্রয়াসও চলে।

"হ্যাঁ তাই • ক'রেছিলাম। দেখুন ভবেশবাবু, ওদের অনেক প্রভু। অনেক নির্যাতন সয় ওরা। তাই বল্‌ছিলাম, দুদিন উপোষ দিয়ে ও আধপেটা খাওয়ার ব্যবস্থা করো। কারণ ইউরোপেট ওরা খায় না কখনও।"

ধীরে অভ্যাসবশতঃ মাথার বামে থেকে ডানে হাত চালায় ভবেশ। "সকলের সমান অধিকার পাওয়া উচিত বলে ত' আপনারা সমবেত কণ্ঠে চীৎকার করেন। কিন্তু সবাই সমান হ'লে শাসন করবে কে? রাজা প্রজার প্রধান থাকতেই হবে। আদ্দির পাঞ্জাবী পরে দামী সিগারেট ফুঁকে জনগণের কল্যাণ করা যায় না।"

"আমাদের কটাক্ষ করছেন ত'? খদ্দর পরে চিরকাল পরবার ব্যবস্থা করলেই কি স্বাধীনতা আসবে? যে জাতির কর্মঠ দিকটা করে রাখা হ'য়েছে পঙ্গু—সে জাত কি ক'রে রক্ষা পাবে? যে জাতের মাথায় বিষাক্ত ক্ষত—তাকে ছানা মাখন খাওয়ালে তার মেদ বাড়বে না। যে দেশে মানুষ না খেয়ে মরলেও কেউ খোঁজ রাখে না—অথচ সম্পত্তি রক্ষার হাজার রকমের বজ্র বাঁধন আছে সে দেশকে অন্য কিভাবে বাঁচাবেন?" উত্তেজিত তরুণ মুখ হয়ে ওঠে রক্ত-রাঙা।

যৌবনাতীত ভবেশের সহ্য হয় না—বীরেনের মুখে পতিত অণিমার সপ্রশংস দৃষ্টি। "বীরেনবাবু, জাতির দুস্থ লোকদের জন্যে আপনাদের দুঃশ্চিন্তার সীমা নেই বুঝলাম। কিন্তু তাদের ভালোর জন্যে কি করেছেন আপনারা? ক'টা ধরমশালা, ক'টা লঙ্গরখানা গড়েছেন? মুখেই শুধু ব'লে বেড়ান 'basis ধরে ভাল করছি আমরা'; পুস্তকগুলো শেখান বুলি কপচান বইত নয়—"

"শেখান বুলি সবাই বলে—তবে যার যে পথ সে সেটা বেছে নেয়। গরীবদের একদিন এক মুঠো ভাত দিয়ে বা একরাত থাকবার জায়গা দিয়ে তাদের বোবা মনের ধন্যবাদ পেতে পারেন। কিন্তু ভবেশবাবু, কার অন্নবস্ত্র কাকে দেন আপনারা? কারা ওদের সর্বহারা ক'রেছে? কারা ওদের নিজেদের চিনতে দিচ্ছে না। কতো আর আত্মপ্রবঞ্চনা করবেন?"

"কতকগুলো মেয়ে ভুলোক কথা শিখেছেন—কারণ ওদের না দলে টানলে দলে লোক আসবে কেন? প্রলোভনের প্রয়োজন আছে ত?" মাথার বামে ডানে হাত চালিয়ে খুব দুলে দুলে হাসে ভবেশ।

ঘৃণা অবজ্ঞা ভেসে ওঠে বীরেনের চোখে। কিছু বলে না। "বৌদি, চা।" হাসে বীরেন।

বীরেনের কথা যতটুকু বুঝে অণিমা, বড় ভাল লাগে। সত্যি কতো জানে বীরু ঠাকুরপো। সপ্ত ধারায় নাম্‌ছে সে জল।

শচীন আসে—সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা—

সুকুমারী চৌধুরী

টানা দুটি চোখ, মুখে মৃদু হাসি, "কি খবর ভবেশবাবু? বীরেন কতক্ষণ?"

এইত! আচ্ছা শচীনদা মণ্টুকে দেখ্‌ছি না যে, কোথায় গ্যাছে সে?"

"এ্যাঁ—মণ্টু নেই? কোথায় গেল সে?" প্রশ্ন-ব্যাকুল দুটি চোখ অণিমার মুখে গিয়ে স্থির হয়।

"বাজারে গ্যাছে মণিরামের সংগে।" অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলে ফেলে অণিমা।

"আমি ত' কাল বম্বে যাচ্ছি।"

"হঠাৎ?" একটা কথা বল্‌তে পারে ভবেশ হাঁফ ছাড়ে।

"এই কর্তাদের হুকুমে আর কি?" পরে অণিমার দিকে চেয়ে বলে "ন'টা বেজে গ্যাছে, খাবার দিতে বলো।" উঠে যাওয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত। নত মস্তকে "রাশিয়ার সাম্যবাদ"খানা পড়তে পড়তেই ওঠে বীরেন। বইখানা হাতে নিয়েই বেরিয়ে যায় সে। ভবেশ তার আগেই যায়।

ঠাকুর টেবিলে ভাত দিয়ে আসে—"আপনি খাবেন না মা?" তার পাঁচ বছরের চাকুরী জীবনে এমন হয়নি কখনও।

"না—শরীর খারাপ।" সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে শোবার ঘরে চলে যায় অণিমা। শুয়ে পড়ে। রাগ করে যে বম্বে যাওয়া হচ্ছে অণিমা তা বেশ বোঝে। একা নিশ্চয়ই যাবে না শচীন। এক্ষুণি মণিরাম আসবে তাকে ডাক্‌তে।

শচীন খেয়ে এসে অণিমার পাশে শুয়ে পড়ে। দুজনে দুদিকে মুখ ফিরিয়ে শোয়। দুজনেই আশা করে অপর পক্ষ এখুনি ডাক্‌বে। কেউ ডাকে না। শচীনের কানে বাজতে থাকে—"তোমার সংগে বিয়ে হ'য়ে অবধি হাড় জ্বলে গেল, একদিনও শান্তি পাইনি"। "তা ত পাবেই না, পাড়ার বখাটে হরেনের সংগে বিয়ে হ'লে পেতে শান্তি!" রূপ দেখে শচীন ভোলেনি মোটেই!! রূপের উপর শিক্ষার জৌলুস না পড়লে সেরূপে মুটে মজুর ভুলতে পারে। কোনও শিক্ষিত ভদ্রলোককে মুগ্ধ করে না তা'। শুধু করুণা ক'রে অণিমাকে হরেনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে এ উদারতা মহত্ব দেখিয়েছে শচীন। কিন্তু অশিক্ষিতা অণিমা। আরও নির্মম হ'তে ইচ্ছে হয় শচীনের।

পরদিন অণিমার কাছে বিদায় না নিয়েই চলে যায় শচীন। দুঃসহ ব্যথায় বিছানায় লুটিয়ে পড়ে অণিমা। কি এমন তার অপরাধ? শিক্ষাহীনা গ্রাম্য মেয়ে মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার কোনও ভাষাই খুঁজে পায় না। ফুঁপিয়ে কাঁদে শুধু। না—অণিমা ম'রেই যাবে। থাক্‌ মণ্টু! তার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে—তাই বলে এত নির্যাতন সইবে না সে। শিশুকালে বাবা ম'রে গেছেন। মা অতি স্নেহে বড় ক'রেছেন অণিমাকে। মার কথা মনে হ'তেই বুক ফেটে কান্না আসে। বালিশে মুখ চেপে ধরে কেবল কাঁদে অণিমা। যদি সে ইংরেজী জানা মেয়ে হ'তো—তবে এমন ভাবে অবজ্ঞা ক'রে কখনও যেতে পারতো না শচীন। নিজের অক্ষমতার লজ্জায় এবং স্বামীর অবহেলার জ্বালায় লুটিয়ে কাঁদে অণিমা।

মাথায় যেন কার হাতের স্পর্শে চমকে উঠে সে। শচীন কি আবার ফিরে এলো?

অনিমার বিস্মিত চোখে আরও কি দেখে ভবেশ। একটু কেঁপে ওঠে। গদ গদ কণ্ঠে অণিমার হাতখানা টেনে নিয়ে বলে—"বৌদি, না অণিমা, তুমি ত'জান না তোমায় আমি কত





ভালবাসি! তোমার চোখে জল আমার মনে যে কি দারুণ ঝড় আনে তা ত' তুমি জান না। শচীনবাবুকে ষ্টেশনমুখো হতে দেখেই বুকের মধ্যে আমার কেমন ক'রে উঠলো। তাই ছুটে এলাম আমি।" ভবেশের মুখ কান্নায় বিকৃত হয়ে যায়—স্থূল মাংসল গণ্ডে অণিমার নরম কোমল হাতখানা চেপে ধরে।

অণিমাকে ভালবাসে ভবেশ! তার জন্যে কাঁদে সে! শচীনের নির্মমতা কাঁটার মত বিঁধে যেন। যদি অণিমা অন্য পুরুষদের সঙ্গে 'ঢলাঢলি' করতে পারতো তবে শচীন তাকে আদরে যত্নে রাখতে চেষ্টা করতো। ভবেশকে অবলম্বন মনে হয় তার। দুই হাতে ভবেশের একখানা হাত জড়িয়ে ধরে অণিমা।

বয়সে বুদ্ধিতে প্রবীণ ভবেশ এ সুযোগ ত্যাগ করে না। ধীরে অণিমার গালে নিজের প্রৌঢ় মুখখানা চেপে ধরে।

একটা তীব্র ঘৃণায় অণিমা সংকুচিত হ'য়ে সরে বসে। গালের চুম্বনের স্থানটা সজোরে কাপড়ে ঘসে।

ভবেশের বয়সের রেখায় কুঞ্চিত মুখে আনে যৌবনের ভাব-বিহ্বল দৃষ্টি, স্বল্প ভ্রূ স্তিমিত হয়ে আরও নেমে আসে চোখের উপরে। "অণিমা, না কৃষ্ণা তুমি আজ থেকে। আমি তোমায় বুকে করে রাখবো দেবী। সংসারে তোমার বড় অনাদর। এরা কেউ চেনে না তোমায়। মা আমার চোখ ফুটিয়েছেন তাই চিনেছি তোমায় কৃষ্ণা, আমার কৃষ্ণা!"

ভাল লাগে। অণিমার বড় ভাল লাগে। শচীনের স্নায়ের কাছেও লাগে না রূপে—কিন্তু আহা! মা কালী চিনিয়েছেন অণিমাকে! মা যে সব বোঝেন। দেবী। কৃষ্ণা—কৃষ্ণের স্ত্রী বলে ডাকবে ভবেশ! শচীনের তুলনায় বড় কুৎসিত মনে হয়। তাই বড় মায়া হয়। কেমন কাঁদছে। অণিমার জন্যেই ত! কাঁদলে ভবেশের মুখখানা বড় বিশ্রী হয়। কিন্তু আহা! অণিমার জন্যেই ত!

ভবেশ মিট্‌মিট্‌ ক'রে চায়। অণিমাকে দেখে শুধু! "দেবী, কৃষ্ণা, তোমায় নামাব না আমি বুক থেকে। গলিত কুষ্ঠে যদি ভরে যায় তোমার শরীর আমি বুকে নিয়ে থাকবো তোমায়!"

এ কি ভালবাসা? শচীন কখনও এমন সব কথা বলতে পারতো না। শচীন যে অনেক পাশ করেছে তাই জানে! ভবেশের ওপর বড় মায়া হয়! কি বলতে নেই তাও জানে না।

সেবার বসন্তে যখন অণিমার শরীর গলেই গিয়েছিল তখনকার কথা মনে পড়ে। কেউ অণিমার কাছে যেতো না ভয়ে ঘৃণায়। শচীনের কি অক্লান্ত সেবা! কি মায়া করুণা ছিল তখন শচীনের! রাতে একটুও ঘুমুতো না সে।

"ভবেশবাবু, ক'টা বেজেছে?"

"ছ'টা হবে বোধ হয়! তোমাকে পেয়ে কি আমার সময়ের হিসাব আছে?" সাদরে আবার একটু হাতে চাপ দেয়। না—একে ভবেশ হারাবে না। অনেক পেয়েছে সে আবার হারিয়েছেও ত' কম নয়। তাড়াতাড়ি বাড়াবাড়ি করতে গিয়েই হারিয়েছে কতো। এমন বিশ্বাসে ভরা কালো দুটি চোখ। এমন নির্বোধ দৃষ্টি। চঞ্চল বিদ্যুৎ খেলাতে পারে না এর চোখে। এ তার শেষের অবলম্বন। একে সে হারাবে না।

"মণিরাম চা দিয়ে যা।" অণিমা বলে। মণিরাম বৃদ্ধ চাকর। চা নিয়ে আসে। তীব্র দৃষ্টিতে একবার চায় ভবেশের দিকে। এসব সে ঠিক "পসন্‌" করতে পারে না। বাবুর কাছে বাবুর 'দোস্তলোগ' অন্‌সুক। কিন্তু 'মাইজী'র কাছে আসা। তার হাত ধরে বসা। থাক্‌ 'মালকিনির' বেচারা 'মালিক' বুঝুক। মণিরাম চলে যায়।

"কৃষ্ণা, তোমায় পড়াব আমি। তুমি কতো বিষয় জানবে। অনেক আনন্দ পাবে তাতে। সব শেখাব আমি তোমায়।"

ধীরে আকর্ষণ করবে ভবেশ তাকে। অণিমা যেন সত্যি তাকে ভালবাসে। এ প্রকৃতির মেয়ে। এর কাছেই প্রকৃত ভালবাসা নেবে ভবেশ। এর জন্যে যদি তাকে অভিনয়ও করতে হয় তাতেও সে পিছুবে না। অণিমার দিকে তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধিত মন যত দ্রুতই এগুতে চায় ভবেশ চেপে ধরবে তার গলা।

রাত হয়; মণিরাম এসে বাইরের দরজা বন্ধ করতে হবে বলে তাগিদ দেয়। তখন উঠে যায় ভবেশ। ক্লান্তপদে অণিমা এসে মণ্টুর কাছে শোওয়ার সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ে। কিছু ভাবতে পারে না। কিছু ভাবা হয় না তার!

মাটিতে হাঁটু পেতে বসে খাটে শোওয়া অণিমার মুখে গালে হাত বুলায় ভবেশ—"ওঠ কৃষ্ণা, সাতটা বেজে গ্যাছে সেই কখন। আমি ত' কাল সারারাত ঘুমুতে পারিনি।" উঠে বসে অণিমা। মনে পড়ে সব। কেমন যেন দুঃস্বপ্ন মনে হয় তার। চায়ের টেবিলে বসে। "আমাকে রেহাই দিলেই আমি বাঁচি।" তা ত' বাঁচই। কিন্তু অণিমা কি নিয়ে বাঁচবে একবারও ত ভাবনি। অণিমারও ত' বাঁচতে হবে। তার উপায় সে ক'রে নিয়েছে।

চায়ের কাপ নিয়ে মণিরাম আসে। তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে ভবেশের দিকে চেয়ে চায়ের কাপ নামিয়ে দিয়ে যায়। কাতরকণ্ঠে বলে ভবেশ, "কৃষ্ণা মণিরাম আমায় পছন্দ করে না।"

"না করুক্‌। জানুক মণিরাম। তার প্রভু ছাড়াও অণিমার ভক্ত আছে।"

"না রাণী, শচীনবাবু যেন না জানতে পারেন।"

"সে কি, তুমি যে বললে কাউকে ভয় করো না তুমি!" খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হেসে ওঠে অণিমা।

মুগ্ধ চোখে দেখে ভবেশ। এমন সত্যিকারের হাসি সে আর দেখেনি। ধনী গৃহের তৈরি পরীর মুখের ফোয়ারা এ নয়। পাহাড়ে ঝর্ণা এ।

তিনদিন পর। ভবেশ আর অণিমা সামনা সামনি বসে। সামনে বই খোলা। সব বই থেকে তর্জমা ক'রে বোঝাবে। যত আঘাতই আসুক তাদের এ প্রেম তত উজ্জ্বল দীপ্ত হ'য়ে উঠবে। অণিমার সংস্কার বড় কঠিন। সহজে যা পেয়েছে তা হারিয়েছেও তেমনি সহজে। হোক দুষ্প্রাপ্য। "আজ একটু কাজ আছে। এখনিই উঠতে হবে।" ভবেশ বলে।

"না গো না—যেয়ো না তুমি। একা আমি কি ক'রে থাকবো।" নির্জনতার মধ্যে নিজেকে সে দেখবে কি করে? সে যে একা নয়। দুজনে যে মিশে এক হ'য়ে আছে। মণ্টু আসবে। তার আর শচীনের নিভৃত গোপন প্রেমের মূর্ত রূপের প্রতীক সে।

"চিঠি আছে।" পিওন আসে। নীল পুরু খাম। অণিমার বুকের স্পন্দন হাতে এসে লাগে। হাত কাঁপে। সংক্ষিপ্ত চিঠি—শচীন কাল আসবে। আনন্দ কৈ? ভয় হ'চ্ছে কেন?

"ওঃ হো! তোমায় বলতে ভুলে গেছি। আমি যে আজ রাতেই দেশে যাচ্ছি কৃষ্ণা।" ভবেশের হঠাৎ মনে পড়ে যায়।

ব্যাকুল কাতরতায় ভরে যায় অণিমার

R C/2-UPS.

দৃষ্টি। "তুমিও যাবে? কোথায় তোমার দেশ? কে আছে?" আশ্চর্য। এ ক'দিনের মধ্যে ত' এসব কথা মনে পড়েনি।

"সিমলা পাহাড়ের কাছে থাকেন আমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা। সেখানেই যাব আমি।"

ভবেশের স্ত্রী! তার সন্তান! অণিমার স্বামী! তার মণ্টু! ভবেশ! কেমন এক সর্বহারা বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকায় অণিমা।

"বৌদি, শচীনদা কবে আসবে?" বীরেনের কণ্ঠে চঞ্চল সজীবতা। ভুতুড়ে বাড়ীতে যেন সঙ্গী পায় অণিমা। সরে যায় বীরেনের দিকে। বীরেনের চেয়ার ধরে দাঁড়ায়। তার মাথায় একটু হাত রাখে। স্পর্শ করে। না এটা হাওয়া নয়, সত্যিকারের বীরেন।

'বৌদি'

'উঁ'।

"শচীদা, কবে আসবে জিজ্ঞেস করলাম যে।" বীরেনের চোখে অতলস্পর্শী দৃষ্টি।

"কাল।"

"শচীদা ভাল আছেন ত' বৌদি?"

"হুঁ", নিতান্ত বাধ্য মেয়ের নম্র সুর।

"তবে--" বীরেনের চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি!

"বীরু, বীরু ঠাকুরপো! তুমি আসনি কেন? আমার কি যে হ'য়ে......"

"ছিঃ বৌদি! কি হয়েছে তোমার? শচীনবাবু নেই কিনা--তাই বৌদির মনটা আর শরীরও বড় খারাপ।" বীরেনের দিকে চেয়ে কথা সমাপ্ত করে ভবেশ। মাথার বাঁয়ে ডানে হাত চালায়।

অণিমা তাকায়--। ভবেশের কৃষ্ণচর্ম স্নোয়ের আড়ালে গোপন থাকতে চায় না--দম্ভভরে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে তাই। সিল্কের পাঞ্জাবীতে সেণ্টের তীব্র গন্ধ অণিমার বিভ্রম জাগায়। চোখ জ্বালা করে যেন।

"আচ্ছা--আমার ট্রেণের সময় নেই। চলি তবে", দ্রুতপদে পালিয়ে যায় ভবেশ।

"আরে রাম! শচীদা মাত্র দুটি দিনের জন্যে বিদেশ গ্যাছে--আর কেঁদে রসাতল! মাথা খারাপ হ'য়ে গ্যাছে।" হাঃ হাঃ শব্দে হেসে ওঠে বীরেন।

নিজেকে আবিষ্কার করে অণিমা। সত্যি ক'টা দিনের জন্যে বিদেশ গ্যাছেন মাত্র তাই ভীষণ মন খারাপ হয়েছে বলেই না--

"কৃষ্ণা মানে কি।"

"কৃষ্ণা মানে দ্রৌপদী।"

"যার পাঁচ স্বামী?" আর্তকণ্ঠে বলেই ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় অণিমা। এ তীব্র অপমানের জ্বালা সে ভুলবে কেমন ক'রে!

রবিবার বেলা আটটা। শচীন আসে। ক্লান্ত দুটি চোখ, রুক্ষ চুল কপালের নীচে পর্যন্ত উড়ে আসছে।

"রাগ গ্যাছে ত' অণু?" সপ্রেম দৃষ্টি। হাত বাড়িয়ে ধরতে যায়। অণিমা ছুটে বেরিয়ে যায়। সব বলবে সে তার স্বামীকে। তার সাময়িক পাগলামী যদি তিনি ক্ষমা করতে না পারেন সে চলে যাবে। প্রতারণা করতে পারবে না সে। ভাগবান জানেন এ অণিমার স্বভাব নয়। এ কি ক'রে সম্ভব হলো! এ অসম্ভব! অণিমা স্বীকার করতে পারে না কিছুতে।

"মণ্টু, বাবা আমার, এ ক'দিন তোর মাকে কেন এমনি ক'রে আঁকড়ে ধরে ছিলি না বাবা! তোকে ছেড়ে যে থাকতে পারবো না বাবা! তোকে ছেড়ে যে থাকতে পারবো না সোনা।" মণ্টু আরও সজোরে জড়িয়ে ধরে তার মাকে।

রাতে বিছানায় শচীনের আলিঙ্গনের মধ্যে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে নিজেকে যথার্থ আবিষ্কার করে অণিমা। অশ্রুতে স্বামীর বুক ভাসায়। কিছু বলে না। বলতে পারে না। মিথ্যা প্রবঞ্চনার পাপ তাকে স্পর্শ করুক। আত্মসংশয়ী-সংস্কার তাকে দগ্ধে মারুক। তবু পারবে না সে তার স্বামীকে হারাতে। দুখানি হাতে নিবিড়ভাবে পরম নির্ভরে জড়িয়ে ধরে তার সারাজীবনের আশ্রয়দায়িতের কণ্ঠ।

নিবন্ত প্রদীপের শেষ দীপ্তশিখার অণিমার আত্মবিসর্জিত সুপ্ত মুখে গভীর প্রশান্ত প্রেমে নিজের মুখ চেপে ধরে শচীন।





শিল্প ও ইতিহাস

শিল্পের উদ্দেশ্য বা আদর্শ নানা প্রকারের হইতে পারে; যেমন, অদৃষ্ট এবং অদৃশ্য সত্তার প্রকাশভূমি অথবা প্রতীকরূপে শিল্প-বিবেচিত হইতে পারে, শিল্প সৌন্দর্যবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত অনুভূতির বা উপলব্ধির আভাস আনিয়া দিতে পারে, শিল্প দ্বারা আমরা আধিমানসিক অথবা নৈতিক প্রসন্নতা অর্জন করিতে পারি; কিংবা শিল্প গভীর-উদ্দেশ্যবিহীন অনুকৃতিমাত্রও হইতে পারে। কোনও নৈতিক বা আধিভৌতিক সংকল্প বা আকাঙ্ক্ষা লইয়া শিল্প উদ্দেশ্যমূলক এবং সাকাঙ্ক্ষই হউক—অথবা আমাদের আভ্যন্তর সৌন্দর্যবোধ-শক্তির স্বাভাবিক বাহ্যপ্রকাশভূমি রূপে শিল্প উদ্দেশ্যবিহীন এবং আত্মকেন্দ্রীই হউক, সত্যকার শিল্প হইতে হইলে তাহাতে দেশ-কাল-পাত্র-নিবন্ধ বিশেষ গুণ থাকিবেই; এবং তদুপরি এইরূপ শিল্প, দেশকালপাত্রের সীমার ঊর্ধ্বেও অবস্থান করিবে। অর্থাৎ মহৎ বা শ্রেষ্ঠ বা চিরন্তন পর্যায়ের শিল্পের মধ্যে, যুগপৎ যুগানুগতা ও যুগাতিগতা, এই দুইটি গুণই থাকা চাই। শ্রেষ্ঠ দরের শিল্প সম্বন্ধে একটি সংজ্ঞা বিশেষভাবে প্রযোজ্য—ইহা একটি possession for ever—ইহা চিরকাল ধরিয়া নিখিল মানবের পক্ষে সযত্নে রক্ষিতব্য রসবস্তুরূপে মানুষের কৃতির ভাণ্ডারে স্থান পাইবার যোগ্য হয়। শিল্পের মধ্যে নিহিত রস—ইহা কেবল রসিক জনেরই জন্য; সকলেই শিল্পবস্তুর অন্তর্নিহিত আহ্বান শুনিতে পায় না, সকলেই ইহার আহ্বানে সাড়া দিতে পারে না; পারিসের Trocadero ত্রোকাদেরোর শিল্প-সংগ্রহশালার নূতন প্রাসাদের একদিকে, শিল্প সঙ্গীত ও জ্ঞানের দেবতা Apollon আপোল্লোন্-এর বিরাট্ এক রঞ্জ মূর্তির মাথায় শিল্পের যে আহ্বান-বাণী উৎকীর্ণ আছে তাহা এই সম্পর্কে স্মরণীয়—

IL DEPEND DE CELUI QUI PASSE
QUE JE SOIS TOMBE OU TRESOR
QUE JE PARLE OU JE ME TAISE
CECI NE TIEN QU'A TOI
AMI N'ENTRE PAS SANS DESIR

"যে এখান দিয়ে যায়
তারই উপর নির্ভর করে যে,
আমি সমাধিরূপে থাক্‌বো,
কি রত্ন-ভাণ্ডার রূপে,
আমি কথা কইবো, কি চুপ ক'রে থাক্‌বো।
এটা কেবল তোকেই নিয়ে হয়;
বন্ধু, বিনা কামনায় ভিতরে আসিস্ না।"

সাহিত্য-রসকে 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর' বলিয়া আধ্যাত্মিক জগতে তার চরম স্থান আমাদের মনীষীরা নির্ধারণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সঙ্গীতকে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকেরা the most divine of the arts বলিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক, যাঁহারা সঙ্গীতের রসিক, তেমনি যাঁহারা রূপশিল্পের বা রূপের রসিক, তাঁহারা সাহিত্য রসের মত রসবস্তুরূপে সঙ্গীতকে আর রূপশিল্পকেও ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর বলিতে দ্বিধা করিবেন না।

এই তো গেল শিল্পের আধ্যাত্মিক আবেদন বা আকর্ষণের কথা। ইহা ছাড়া শিল্পের একটা নিম্ন বা স্থূল দিক্‌ও আছে। এই স্থূল দিকের সংযোগ বা সম্বন্ধ হইতেছে ইহার দেশ-কালপাত্র-নিবন্ধ পার্থিব বা বাস্তব পারি-পার্শ্বিককে লইয়া। কোনও শিল্পবস্তুর মধ্যে শাশ্বত সৌন্দর্যের অধিষ্ঠান দেখিয়া, তাহাকে আমরা দিব্য বিভূতির পরিচায়ক রসবস্তু বলিয়া তাহা হইতে অপার্থিব আনন্দের অধিকারী হইতে পারি; আবার সেই শিল্প-বস্তুকে আমরা তাহার স্রষ্টার চিত্তের এবং তাহার যুগধর্মের, সৃজন-কালের সাংস্কৃতিক পারিপার্শ্বিক বা বাতাবরণের পরিচায়ক বলিয়াও বিচার করিতে পারি। এই দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে, আলোচ্য কোনও শিল্পবস্তুকে মানব সংস্কৃতিজাত এবং সেই সংস্কৃতির প্রকাশক document অর্থাৎ প্রমাণপত্র রূপে ধরা যায়; এবং এইরূপ প্রমাণপত্রকে তখন দার্শনিক বিচারের মধ্যে না ফেলিয়া, কেবল কার্যকারণাত্মক বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিতে আলোচনা করিতে পারা যায়। শিল্পের চর্চাকে তখন সৌন্দর্য-বিচারের দার্শনিক ভূমি হইতে ইতিহাসের ও মানব-সভ্যতার কোঠায় আনা যায়; Study of Art বা শিল্পালোচনা তখন Anthropology বা নৃতত্ত্ব, Linguistics বা ভাষাতত্ত্ব, Religiology বা ধর্মতত্ত্ব, Economics বা অর্থশাস্ত্র, Sociology বা সমাজতত্ত্ব প্রভৃতির ন্যায় একটি Human Science অর্থাৎ নরাশ্রয়ী বা মানবনিষ্ঠ বিদ্যা হইয়া দাঁড়ায়। তখন ইহার বাহ্য রূপ এবং অভ্যন্তর বস্তু, ইহার ভাব এবং অলংকার প্রভৃতি লইয়া, শিল্প মানব-ইতিহাসের প্রসাধিকা হইয়া দাঁড়ায়। এবং তখন শিল্প অনপেক্ষিত-ভাবে তাহার একটি অতি উপযোগী এবং অতি কার্যকর ব্যাপারে, নিজ সার্থকতা প্রকাশ করে—শিল্প তখন ইতিহাস ও জীবনচরিত, ধর্ম ও সংস্কৃতি, নৃসমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে, আমাদের নেত্রগ্রাহ্য রূপময়-ব্যাখ্যান-ভাণ্ডার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। অতীতকালে কেহ বোধ হয় অতটা ভাবিয়া দেখে নাই যে, ভবিষ্যতে শিল্পকে তাহার নিজ যুগের ইতিহাসের পক্ষে এরূপভাবে অধিবক্তা এবং অভিবক্তার আসন গ্রহণ করিতে হইবে। কোনও দেশের এবং কোনও বিশিষ্ট

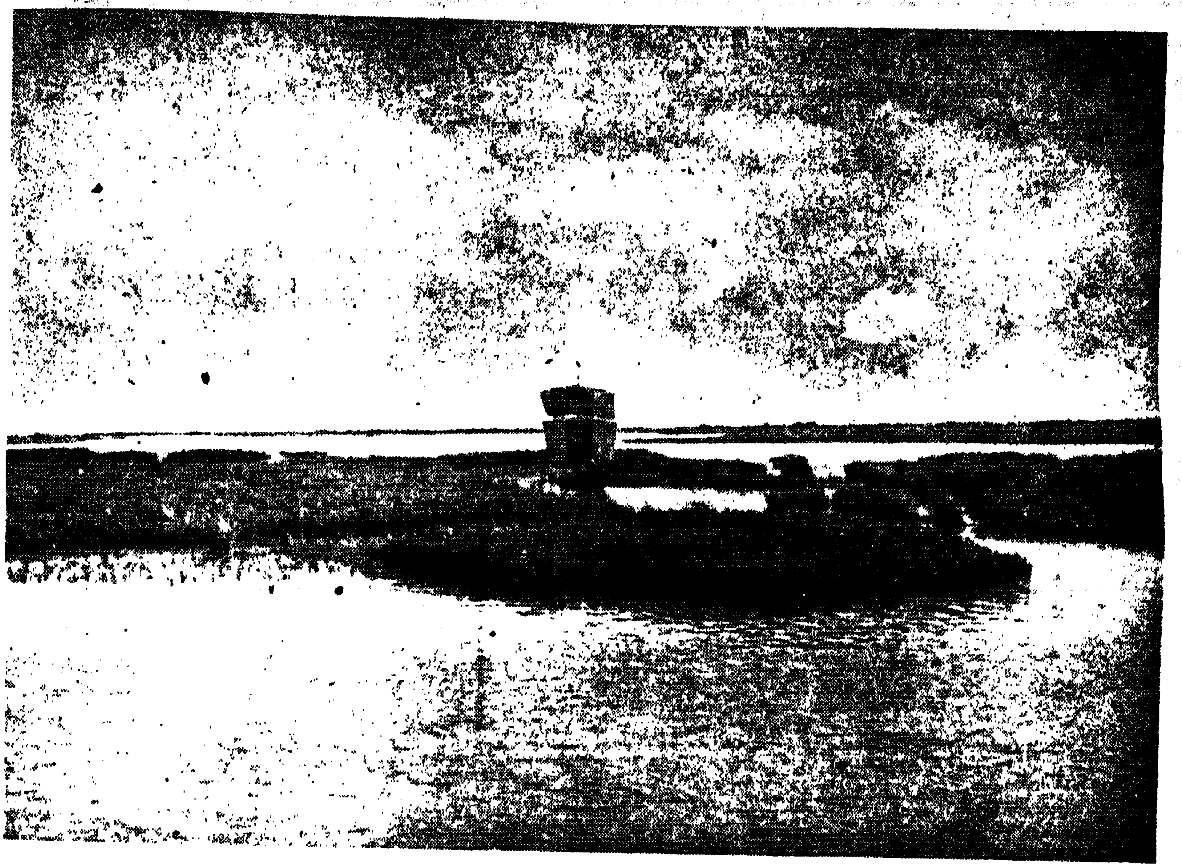
শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

যুগের শিল্প হইতে সেই দেশ ও যুগের তৎকালীন জীবনের বাস্তব চিত্র এই ভাবে পুনর্নির্মিত বা পুনর্গঠিত হইতে পারে। যেমন, প্রাচীন মিসরীয়, বাবিলীয় অথবা যবন বা গ্রীক শিল্প, মিসর বাবিলু ও গ্রীস দেশের প্রাচীন জীবনকে চাক্ষুষ করিয়া দেখিতে সাহায্য করে। মিসরীয় বাবিলীয় বা গ্রীক শিল্পের কোনও শ্রেষ্ঠ রচনা হইতে, তাহার শাশ্বত সৌন্দর্যের কারণ আমরা তাহা হইতে যে বিশুদ্ধ রস বা রসাভাস লাভ করি, তাহা অবশ্য এই ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিকের জ্ঞান হইতে পৃথক্ বস্তু। খ্রীষ্ট-জন্মের পরের প্রথম বর্ষসহস্রকের মধ্যভাগের ভারতীয় বাস্তব-জীবনের যে পূর্ণ ও নিখুঁত চিত্র আমরা অজণ্টার ভিত্তিচিত্রসমূহ হইতে পাই, তাহা ভারতের অন্যত্র, এমন কি সারা পৃথিবীতে দুর্লভ; আবার অজণ্টা শিল্পের মধ্যে দুই-একটি এমন বিরাট রচনা আছে, যেগুলির আধ্যাত্মিক মূল্য এই ঐতিহাসিক মূল্য হইতে সম্পূর্ণ অন্য ধরণের বস্তু। জীবনের বাহ্য উপকরণ ও সজ্জা যাহা অজণ্টার মত ভিত্তি-চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা অতি সহজভাবেই আসিয়া গিয়াছে—শিল্পীকে সে বিষয়ে বিশেষ করিয়া অবহিত হইতে হয় নাই; এবং এইজন্যই শিল্পী যেন অজ্ঞাতসারে নিজেকে ও নিজের যুগকে ধরিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সারল্যের জন্য, "সততা"র জন্য, তাঁহার যুগের জীবন প্রণালীর এই বাহ্য-অলঙ্করণের মূল্য অসাধারণ, কারণ ইহা নিছক্ সত্য; ইহাতে কোথাও ভাণ বা আত্মগোপন অথবা সজ্ঞানে আত্মপ্রকটতার চেষ্টা নাই।

এইভাবে দেখিলে একথা স্বীকার করিতে হয় যে, প্রচীন ও মধ্যযুগের শিল্পের চর্চা ঐতিহাসিকের পক্ষে একটি অত্যন্ত আবশ্যক কার্য হইয়া উঠে, এবং নেত্রগ্রাহ্য রূপশিল্পের নিদর্শন বা অবশেষ যাহা পাওয়া যায় তাহা লিখিত গ্রন্থের মতই—ক্ষেত্রবিশেষে লিখিত গ্রন্থের চেয়েও—মূল্যবান্ সাধন হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুতঃ, জীবনের কথা ধরিলে, শিল্প ও সাহিত্যকে পরস্পরের পরিপূরক, পরস্পরের ব্যাখ্যাতা বলিতে হয়। প্রাচীন কালের, মধ্য-যুগের অথবা আধুনিক কালের ইতিহাসের আলোচনা সম্পূর্ণাঙ্গ হইতে হইলে, সমসাময়িক শিল্পকে বাদ দিতে পারা যায় না। চীনও মধ্য-যুগে তাহার প্রাচীন সভ্যতা, প্রাচীন শিল্পের নিদর্শনের সাহায্যে চর্চা করিবার প্রয়াস করিয়া আসিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহা সর্ববাদিসম্মতি-ক্রমে স্বীকৃত হইয়াছে—এখন ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে প্রাচীন, মধ্যযুগের বা আধুনিক গ্রীক লাতীন, ইংরেজী ফরাসী জরমান স্পেনীয় প্রভৃতি সাহিত্যের পঠন-পাঠনের সঙ্গে সঙ্গে তত্তৎসাহিত্যের সম্পৃক্ত শিল্পকথাও শিখানো হইয়া থাকে। পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে যিনি প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভাষা সাহিত্য প্রভৃতি আলোচনা করেন, তিনি যে যুগের সম্বন্ধে

বিশেষ অধ্যয়ন করেন সেই যুগের শিল্পেতিহাসও যত্নসহকারে অধ্যয়ন করিতে বাধ্য হন। শিল্প ও শিল্পেতিহাসে তিনি নিজেকে বিশেষজ্ঞ বলিতে না পারেন বা না চাহেন, কিন্তু শিল্পের মুখ্য ধারা এবং প্রধান প্রধান কথাগুলির সম্বন্ধে তাঁহার একটু জ্ঞান না রাখিলে চলে না।

সাহিত্যের কথা দূরে থাক, ইতিহাসের চর্চায় যে শিল্পেরও একটা প্রধান স্থান আছে, অন্ততঃ ইতিহাসের বাহ্য জীবনচিত্রাত্মক রূপটির চর্চার জন্য যে এই স্থান আছে—একথা ভারতবর্ষে আমরা এখনও পুরাপুরি গ্রহণ করিতে পারি নাই। যাঁহারা ইতিহাস লইয়া গবেষণায় ব্যাপৃত, ইতিহাসের আলোচনায় যাঁহারা বিশেষ অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে অবশ্য একথা বুঝিয়াছেন যে, শিল্পের স্থান ইতিহাসের চর্চায় কোথায়; কিন্তু তরুণদের বেলায়, কি স্বদেশের কি বিদেশের ইতিহাস অধ্যয়নকালে যে শিল্পের সঙ্গে পরিচয় অপেক্ষিত, সেকথা আমরা স্বীকার করি না, বা স্বীকার করিলেও ভুলিয়া যাই। শিল্পবস্তুর "প্রমাণ-পত্র"র সাহায্যে আমাদের ইস্কুলের ও কলেজের ছাত্রদের কাছে প্রাচীন সংস্কৃতির পরিচয় প্রদান করার আবশ্যকতা আমরা কেহ ভাবিয়াও দেখি না; ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতার বর্ণনামূলক বা ব্যাখ্যাত্মক শিল্পবস্তুর চিত্রাবলী প্রস্তুত করিয়া সহজ ব্যবহার্য পুস্তকের আকারে তরুণদের সমক্ষ আনিয়া ধরিয়া দিবার কথা কেহ চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। অবশ্য আমাদের শিক্ষার পরিচালকগণ এবং শিক্ষকগণ সকলেই ইতিহাস ও সভ্যতার কথার আলোচনায় শিল্পের চর্চার আবশ্যকতা তর্কের খাতিরেও অন্ততঃ মানিয়া লইবেন। কিন্তু কাজে এতাবৎ এদিকে কিছুই হয় নাই। শিল্পবস্তুর সাহায্যে প্রাচীন সভ্যতার বর্ণনা বা আলোচনার কার্যে খুব অল্পসংখ্যক পণ্ডিতই অবহিত হইয়াছেন। বহু বৎসর পূর্বে, গত খৃষ্টীয় শতকের সত্তর আশীর কোঠায় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এ বিষয়ে একটু চেষ্টা করিয়াছিলেন—তিনি তাঁহার Antiquities of Orissa নামে বিরাট বইয়ের সাহায্যে, এবং Indo-Aryans নামে বইয়ের কতকগুলি প্রবন্ধে, শিল্প-নিদর্শনের সহায়তায় প্রাচীন ভারতীয় বাস্তব সভ্যতার একটি রূপ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। Griffith গ্রিফিথ্ সাহেবের অজন্টা (১৮৯৬-১৮৯৭) এইপ্রকার আরেকটি প্রশংসনীয় চেষ্টার ফল; এবং লণ্ডন হইতে প্রকাশিত অধুনা-লুপ্ত Journal of Indian Art and Industry পত্রিকায় Hendley হেণ্ডলে প্রমুখ কয়েকজন ইংরেজ ইতিহাসানুরাগীর সচিত্র প্রবন্ধাবলীর উল্লেখ করিতে হয়। শ্রীযুক্ত L. D. Barnett বারনেট্ ১৯১৩ সালে তাঁহার বিশেষ উপযোগী বই Antiquities of India প্রকাশিত করেন। শিল্পের ও অন্য প্রাচীন প্রমাণের সাহায্যে ভারতীয় সংস্কৃতির বাস্তব দিকের আলোচনার সার্থক চেষ্টা ইহাতে মিলিবে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে ভারতের প্রাচীন শিল্পের যেটুকু আলোচনা সম্প্রতি হইয়াছে, আনন্দ কুমারস্বামীর কৃতিত্বকে তন্মধ্যে বিশেষ গৌরবের স্থান দিতে হয়; শ্রীযুক্ত কুমারস্বামী আমেরিকান পত্র-পত্রিকায় ও পৃথক্ গ্রন্থাকারে মুদ্রিত তাঁহার কতকগুলি সচিত্র প্রবন্ধে, প্রাচীন সাহিত্য (সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত) ও প্রাচীন শিল্পবস্তু, এই দুই মিলাইয়া চর্চা করিয়া, প্রাচীন ভারতের বাস্তব সংস্কৃতির ও তাহার অন্তর্নিহিত ভাব বা চিন্তাধারার নির্ণয় অতি সুন্দর এবং বৈজ্ঞানিক (অর্থাৎ যুক্তি-তর্কানুমোদিত) রীতিতে করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত Hermann Goetz হের্মান্ গ্যোট্স্ ১৬শ—১৮শ শতকের ভারতীয় ('রাজপুত' ও 'মোগল') চিত্রের সাহায্যে আমাদের দেশের পোষাক ইত্যাদি সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাও বিশেষ লক্ষণীয়। কি করিয়া শিল্পবস্তুর মধ্যে নিহিত রস উপভোগ করা যায়, তাহার শিক্ষা, আমাদের সাধারণ শিক্ষার একটা অঙ্গ হওয়া উচিত। কাব্য, সঙ্গীত ইত্যাদির অমৃত-আস্বাদনের মত শিল্পাস্বাদনও আমাদিগকে জীবনে অপূর্ব আনন্দের অধিকারী করিতে পারিবে, সংসারবিষবৃক্ষে আমরা নূতন অমৃতফলের অধিকারী হইব, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দীনতার মধ্যে নূতন সম্পদ্ আমরা পাইব। কিন্তু আমরা কখনও এ-সব কথা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাই না। এ কাজ মুখ্যতর রাষ্ট্রীয় শিক্ষা পরিচালনা বিভাগেরই গ্রহণ করা উচিত। আমাদের দেশে, peace and order (শান্তি ও শৃঙ্খলা) রক্ষার বাহিরে, শাসকদের আর কোনও দায়িত্ব বা কর্তব্য নাই, এই ধারণা অপদেবতার মত সমস্ত সরকারী কার্যক্রমের উপর ভর করিয়া আছে। এই অপদেবতার হাত হইতে আমাদের নিষ্কৃতি পাইতে হইবে। বিভিন্ন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, এবং কলেজ, ইস্কুল প্রভৃতি শিক্ষায়তন, রাষ্ট্রীয় শিক্ষা-বিভাগের সহিত মিলিতভাবে এই কার্য করিবে। এসব হইতেছে আজকাল যাহার কথা সকলেরই মুখে শুনা যায়—ভবিষ্যৎ planning বা 'পরিকল্পনা'-র কথা। কিন্তু এখনই আমাদের ইতিহাসের অধ্যাপকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মিলিতভাবে একটি কাজ হাতে লইতে পারেন—ইতি-



'ভরা পালে চলে যায়'

ফটোশিল্পী—শ্রীবীরেন্দ্র সিংহ

হাসের বইয়ের মারফৎ, প্রচুর ছবির সাহায্যে, ছাত্রদের মধ্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিল্পের সঙ্গে একটু পরিচয় ঘটাইয়া দেওয়া—বাস্তু-শিল্প, ভাস্কর্য, চিত্রবিদ্যা, তৈজসাদি দৈনন্দিন ব্যবহারের বস্তু প্রভৃতির মধ্যে যে শিল্পধারা দেখা দিয়াছিল, তাহাকে একটু উদ্ঘাটিত করিয়া দেওয়া। প্রায় ৩৮ বৎসর পূর্বে, Smith সাহেবের প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস, যাহা এখন আমাদের I. A. পরীক্ষার পাঠ্যরূপে পড়িতে হয়, তাহার কতকগুলি অতি মোটা রকমের কাঠে-খোদা ছবি হইতে আমি অবিনশ্বর গ্রীক শিল্পের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই, Bury সাহেবের গ্রীক ইতিহাসের বড় বই, যেখানি B. A. Honours-এর ছাত্রদের পাঠ্য ছিল, তাহাতে প্রকাশিত গ্রীক মুদ্রার কলমে-আঁকা ছবি হইতে গ্রীক মুদ্রার সৌন্দর্যে প্রথম আকৃষ্ট হই। ভারতের ইতিহাস বিষয়ে ঐ দুই বইয়ের মত চিত্রময় বই তখন আমাদের কালে দুর্লভ কেন, অলভ্য ছিল; প্রাচীন ভারতীয় গৃহাদি, মুদ্রা, ভাস্কর্য চিত্র প্রভৃতির নিদর্শন-সমেত যদি কোনও সচিত্র বই তখন পাইতাম, কত না খুশী হইতাম! ইতিহাসের মধ্যে বাস্তব-সভ্যতার চর্চার পথ চিত্র-সহযোগে এইভাবে যদি খুলিয়া দিতে পারা যায়, তাহা হইলে অতি সহজে প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান তো বাড়েই, উপরন্তু আমাদের তরুণদের মনে শিল্প সম্বন্ধে একটু কৌতূহল জাগাইয়া তোলা যায়; এবং বহু ক্ষেত্রেই যে এই কৌতূহল হইতে সত্যকার শিল্পানুরাগ উৎপন্ন হইতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—এইভাবে আমরা সহজেই শিল্পসংস্কৃতিপূত-চিত্ত শিক্ষিত জনসংগঠনে সমর্থ হইতে পারি। শিল্পানুরাগ মানুষের জীবনে এক অতি উপযোগী পাথেয়রূপে দেখা যায়, তাহার মনের মধ্যে শাশ্বতের আভাস আনিয়া দিয়া মানবের সদাবিদ্যমান পার্থিব দুঃখ কষ্ট অনেকটাই লাঘব করিতে পারে।

বিভিন্ন যুগের সংস্কৃতির প্রকাশক হিসাবে বিচার করিলে, শিল্প দ্বারা পর পর কত না চিত্র আমাদের চক্ষের সামনে উদ্ঘাটিত হয়! এই চিত্র-পরম্পরায় মানবের নিরবচ্ছিন্ন গতির কি মনোহর প্রকাশ আমরা ধরিতে পারি! "পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী;" শিল্পের রথ এই পন্থা দিয়া আমাদের যেন আবার নূতন করিয়া লইয়া যায়। শিল্প-চর্চার আনুষঙ্গিক চিত্তপ্রসাদের আধ্যাত্মিক আনন্দের কথা ধরিতেছি না; Historic Consciousness বা ঐতিহাসিক বোধকে জাগাইয়া তুলিবার কথাই বলিতেছি। ভারতের শিল্প-ধারার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক্। মোহেন-জো-দড়ো আর হড়প্পার শিল্পের পুরা চর্চা হয় নাই, কিন্তু তাহার মধ্যে ভারতের শাশ্বত মনের পরিচয় আমরা পাইতেছি। তার পরে খৃষ্ট-পূর্ব তৃতীয় বর্ষ-সহস্রক হইতে একেবারে আসিয়া পৌঁছিতে হয় খৃষ্ট-পূর্ব তৃতীয় ও দ্বিতীয় বর্ষশতকে—মৌর্য ও শুঙ্গ যুগের আদিমগন্ধী শক্তিশালী বাস্তবানুকারিতায়; তারপরে পাই মথুরার (কুষাণ) এবং অমরাবতীর (অন্ধ্র) ভাস্কর্যের সুকুমার রমন্যাস, তাহার গীতি কবিতার মত মনোহারিতা; তারপরে আসে গুপ্ত শিল্পের অজন্টার সর্বগ্রাহী মানবিকতা ও তাহার পটভূমিকাস্বরূপ অবস্থিত ভারতীয় আদর্শবাদ; ইহার পরিণতি যেন পল্লব ভাস্কর্যের—মহাবলিপুরম্-এর এবং চালুক্য ভাস্কর্যের—বেলুর বা এলোরার ও এলিফাণ্টা বা ধারাপুরীর বিরাট্ মহাভারত-কাব্যে, যে ভাস্কর্যের সাহায্যে অদ্ভুতভাবে আমাদের মহনীয় পৌরাণিক উপাখ্যান, শিব উমা ও বিষ্ণুর চরিত্র, চিত্রিত হইয়াছে; ও তাহার পর্যবসান যেন তমিল দেশের চোল যুগের পিত্তল মূর্তির ও প্রস্তর মূর্তির সুললিত শক্তিশালিতায় ও আধ্যাত্মিকতায়; ওদিকে পাই গৌড়-মগধের পাল ও সেনযুগের দেবতা মূর্তির স্থির-দামিনীবৎ সৌন্দর্য; কানাড়ী দেশের পোয়সাল

বা হোয়সাল যুগের ভাস্কর্যের অরণ্যানীসুলভ অলংকার-জটিলতা; মোগল বাস্তুশিল্পে ও চিত্রবিদ্যায় মধ্যযুগের ভারতীয় ও ঈরানীয় শিল্পের হরগৌরী মিলন; ষোড়শ শতকে মহামহিম সম্রাট্ আকবরের অনুপ্রাণনায় হিন্দু-শিল্পের পুনর্জাগৃতি, হিন্দুর মনে ঐতিহাসিক বোধের জাগরণ, ফলে আকবরের দরবারে সংস্কৃত মহাভারতের ফারসী অনুবাদ "রজম্‌নামা"র চিত্রাবলীতে অতীত হিন্দু-গৌরবের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা; রাজস্থানের, কাঙড়ার ও পাঞ্জাবের পাহাড়ী অঞ্চলের, বাঙলা দেশের, উড়িষ্যার, দাক্ষিণাত্যের ও তেলুগু দেশের চিত্রশিল্প—বিশেষতঃ রাজস্থান ও কাঙড়ার চিত্রের অপূর্ব মধুরতা ও কোমলতা; নেপালের নেবার জাতির শিল্পীদের সৃষ্টি, নেপালী মন্দির ও প্রাসাদসমূহের বাস্তুরীতি, নেপালী পিত্তল-মূর্তি, নেপালী চিত্র; এই সমস্ত, এবং ভারতীয় শিল্পের আর আর যত বিভিন্ন প্রান্তিক প্রকাশ, এ-সমস্তই ইতিহাসের বইয়ের মাধ্যমে ধীরে ধীরে ছাত্রদের সামনে ধরিয়া দেওয়া যায়, এদিকে তাহাদের চোখ ও চিন্তা উভয়কেই উদ্বুদ্ধ করিয়া দেওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর ভারতের শিল্প ও মোসলেম শিল্প, এবং পরে এশিয়ার (চীন ও জাপানের) শিল্প, ইউরোপের শিল্প এবং অন্যান্য মহাদেশের শিল্প সম্বন্ধেও, ছাত্রদের অবহিত করা যায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার অধুনা প্রচলিত নূতন পাঠক্রমে মেয়েদের জন্য ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে 'অঙ্কন ও চিত্রবিদ্যা এবং শিল্প-চর্চা বিষয়টিকে অনুভুক্ত করিয়াছেন। কলিকাতায় সাধারণভাবে শিল্প-শিক্ষার জন্য যাহা হউক একটা কিছু ব্যবস্থা হইয়াছে—যে-সব ছাত্রী আর্ট স্কুলে গিয়া বিশেষভাবে ছবি আঁকিতে শিখিবে না, শিল্প-চর্চা বিষয়ে তাহাদের এই একটা সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যতটা হওয়া দরকার তাহার কিছুই হয় নাই। পরীক্ষার জন্য নূতন একটি বিষয়রূপে ধরিয়া শিল্পচর্চা শিখাইতে গেলে, ছাত্রছাত্রীদের উপর জুলুম করা হইবে; এখন অবশ্য-পঠনীয় বিষয় যতগুলি আছে, তাহা সাধারণ ছেলেদের পক্ষে যথেষ্ট। ইতিহাসের মধ্য দিয়া খুব বেশী ছবি দেখাইয়া, শস্তায় ভাল ভাল ছবির বইয়ের ব্যবস্থা করিয়া, যাহাতে বিনাশ্রমে ছাত্রছাত্রীগণ একটু শিল্পালোচনার দিকে আকৃষ্ট হয়, সে দিকে চেষ্টা হওয়া উচিত। ঐতিহাসিক ভূচিত্রাবলীর মত, ঐতিহাসিক চিত্রাবলীর প্রচুর প্রয়োগ হওয়া উচিত। চলচ্চিত্র-সহযোগে ইতিহাসকে ও ভূগোলকে দৃষ্টিগোচর করাইবার ব্যবস্থা, চিত্র-চর্চারই সহায়ক হইবে। আশা করি এই কার্য ঐতিহাসিক ও শিল্পাশ্রয়ী উভয়ের সহ-যোগিতায় সহজসাধ্য হইবে—তখন যুগধর্মের এবং মানুষের আধ্যাত্মিক প্রেরণার প্রকাশক-রূপে, শিল্পের আলোচনা আরও ব্যাপক করিয়া, জীবনে আরও কার্যকর



কাঁসি বাজাতে বলো, আকালুর তাতে ভারী উৎসাহ। কিন্তু সে বাজানোও সত্যিকার বাজানো হ'লে হারুর হয়ত আফশোষ কিছুটা কম হ'তো। আকালু কাঁসিটা যে বাজায়, তাও একেবারে গা ছেড়ে দিয়ে। বাঁহাতে কাঁসিটার দড়ি ধ'রে ডান হাতের কাঠি দিয়ে সুধু পিটতে থাকে। বাঁহাতের ক'টা আঙ্গুলেরও এর মধ্যে একটু যে কাজ করার আছে, আলু-গোছে কাঁসির কিনারে চাপ দেওয়া—সে হুঁস আকালুর হয় না। হারু ঢাকীর বেটা, ঢাক দূরের কথা, কাঁসিও বাজাতে জানেনা, এ কি হারুর কম লজ্জার কথা ! বিশ্বকর্মার বেটা কি শেষটায় চামচিকেই হবে !

হারু ঢাকী একজন যেমন তেমন ঢাকী নয়। নামকরা ঢাকী। তার দু'টো হাতে যেন যাদু মাখানো আছে। চামড়ার ওপর কাঠির বাড়ি দিয়ে কি করে যে ঢাককে দিয়ে কথা বলায়, গান গাওয়ায়—এটা এক রহস্য। হারুর বাপ ছিলো ডোম, শ্মশানে মড়া পোড়ানোই ছিল তার জীবিকা। শহরে পাগ্‌লা কুকুরের উৎপাত হ'লে হারুর বাপের ওপর মিউনিসিপ্যালিটির আদেশ আসতো কুকুর মারার। কুকুর পিছু চার আনা উপরি পাওনা ছিলো তার। ক্ষ্যাপা কুকুরের মাথায় নির্বিবাদে হারুর বাপ বাঁশের ডান্ডা বসিয়ে পথঘাট রক্তাক্ত ক'রে দিতো। মোড়ে মোড়ে সে ওঁৎ পেতে থাকতো চার আনা পয়সার লোভে। যেই সামনে কোনো কুকুর এসে হাজির হতো, হারুর বাপ দিতো বসিয়ে মাথায় সই ক'রে এক বাঁশের বাড়ি। বিকট চীৎকারের সঙ্গেই পাগলা কুকুরের জীবন শেষ হ'য়ে যেত। তার-পর তার পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে সে বীরদর্পে নিয়ে যেতো মিউনিসিপ্যালিটির হেডক্লার্কের কাছে। প্রাপ্য চুকিয়ে নিয়ে সমাধির জন্যে আবার সেটাকে টানতে টানতে পদ্মার দিকে নিয়ে যেত হারুর বাপ। হারুর মা বানাতো ধামা আর চুবড়ি, কুলো আর বারুন। অবস্থা খুব খারাপ ছিলোনা। এমনি এক সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারের একমাত্র উত্তরাধিকারী হারু। কিন্তু কী ক'রে সে কুকুরের লোভ ছেড়ে ঢাকের মায়ায় আবদ্ধ হ'লো তার কোনো ইতি-হাস জানা যায় না। সে-ও বুঝি বিশ্বকর্মার বেটা হ'য়ে চামচিকে ব'নে গেছে।

হারুর বৌও চুবড়ি বানাতে পোক্ত নয়, মেয়েটা শুকনো ডালপাতা কুড়িয়েই দিন কাটায়। আর ছেলেটা ? তার জন্যেই হারুর সব চেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা।

তীর ধনুক বানিয়ে পাখী মারে। ছট্‌ফট্ করতে করতে পাখী যখন মাটিতে পড়ে। আকালুর তখন কী উল্লাস। হাতের তীর দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আধমরা পাখীর প্রাণ নিয়ে টানাটানি করে। একটানে মাথাটা ছিঁড়ে ফে‍
গায়ের পালক ওপড়ায় টেনে টেনে, তারপর হয় বোনের শরণাপন্ন। তার কুড়ানো
শুক্‌নো ডালপালা দিয়ে আগুন ক
পাখী পুড়িয়ে নুন লঙ্কা মে
চিবোয়। কী আনন্দ
তখন তার! এমন
আনন্দ বুঝি কুকুর
মেরেও পায়নি তার বাপের বাপ!

শ্রী সু

পদ্মার এমব্যাঙ্কমেণ্টের গায়েই
পাড়া, তার গায়েই হারুর ঘর।
নিত্য নিয়মিত পাঁঠা জ
ছিলো তার নিয়
পাঁঠাল
চা

লাগতো জবাই করার ঠিক পরের সময়টা, য
মাথাটা একপাশে অসহায়ের মত প'ড়ে থাক
আর ধড়টা চারপায়ে ছট্‌ফট্ করতো। নিজে
মনেই আকালু বলতো,, 'কেমন জব্দ।'

হয়ত তার গলা দিয়ে শব্দটা বেরিয়েই পড়তো কখনো কখনো, কানাই পাঁঠার ছাল ছাড়াতে ছাড়াতে ব'লতো, 'কি বললি ?'

'কিছু না। তবে, আজ একটু চাই, কানাই-কাকা। ঘুগনি বানাবে।' —মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বলতো আকালু।

পাঁঠার নাড়িভুঁড়ির
লোভ। দেখলেই
থেমে আকালু
একটু টু
কিন্তু।'
ছ

অজিত

...ায়

ধরতেও পারবে না, অমন করে হাত কাঁপাতেও পারবে না। সাধেই কি তার বাপের এত নাম-ডাক, এত সম্মান।

হারু সত্যি একজন সম্মানী লোক। রায় বাহাদুর অম্বিকা মৈত্রের বাড়ির সে বাঁধা ঢাকী। সব পুজোয় পার্বণে, বিশেষ ক'রে দুর্গাপুজোয়, হারুকে তাঁর চাই-ই। পুরোহিত না হ'লেও পুজো হবে, কিন্তু হারু না হ'লে যেন পুজোই বন্ধ হ'য়ে যাবে। হারুকে নিয়ে অনেক টানাটানি হয় দুর্গাপুজোর সময়টা। মোটা মোটা টাকাও অনেকে হাঁকে হারুকে হাত করার জন্যে। যাদের পুজোয় সে বাজাবে, স্বভাবতঃই লোকসমাগম হবে সেখানে বেশি, পুজোর ঘটাটাও তাই হবে বেশ জোরালো। অন্যান্য খরচ কমিয়ে, হারুকে দু'টাকা বেশি দিয়েও যদি তাকে কেউ আনতে পারে, তবে পুজো-প্রতিযোগিতায় তার নিশ্চয় জয়। হারু ঢাক বাজিয়েই বাজি মাৎ ক'রে দিতে পারে। ঢাকের পিঠের উদ্ধত পালক দুলিয়ে, নিজের মাথার ঝাঁকড়া চুল উড়িয়ে নাচতে নাচতে যখন হারু মেতে ওঠে, তখন তার হাতে দিয়ে খই ফোটে। ঢাক তখন হারুর মতই কাঠির মৃদু আঘাতে আঘাতে উল্লাসে উতরোল হ'য়ে ওঠে।

অম্বিকা মৈত্রের সঙ্গে কিন্তু কেউ পেরে ওঠে না। হারু বলে, মিত্তিরবাবু আমাকে অ্যাদ্দিন লাগারে পুষলো, তার ঘর ছেড়ে কোথাও আমি যাবো নি। না হয় দু'টাকা কমই মিলবে।

তবু তারা নাছোড়বান্দা, হয়ত ভাবে হারুর এটা মোচড় দেবার প্যাঁচ বুঝি, আরো বেশি চায়। আরো কয়েকটা টাকা হারুকে দেখায়।

হারু বলে, টাকা দেখিওনি মেলা। আমি মিত্তিরবাবু ছাড়া কাউকে চিনি না। পঁচিশ বছর লাগারে যার ঘরে বাজাচ্ছি, তার ঘর ছাড়বো তোমার টাকার লোভে!

অম্বিকা মৈত্রের বাপের আমলের ঢাকী হারু। অম্বিকা মৈত্র রায় বাহাদুর হবার পর হারুর আনন্দ বুঝি স্বয়ং অম্বিকা মৈত্রের চেয়েও বেশি হ'য়েছিলো। সেদিনের উৎসবে হারু বাজিয়েছিল ঢোল। সবাই অবাক, ঢোলেও তার হাত এত পাকা।

হারু রীতিমত সাধনা করে ঢাক নিয়ে। প্রত্যহ তার রেওয়াজটি করা চাই। রোজ সকালে, সকালে না পেরে উঠলে বিকালে, তার ঢাক নিয়ে বসা চাই। নতুন গৎ, নতুন বোল বোলার চেষ্টা করে। পারেও। হারুর প্রতিভা এইখানেই। আগমনী গান বাজাবার সময় তার ঢাক নতুন সুরে আবাহনীর আওয়াজ করতে থাকে, কিন্তু বিজয়ার দিন তার ঢাকের আওয়াজ যায় ষোলআনা বদলে। তার ঢাক যেন বিনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে ওঠে সেদিন।

আকালুও সাধনা করে, কিন্তু সেটা শব-সাধনা। মড়া ঘাঁটায় তার খুব আনন্দ। বেওয়ারিশ মড়া শ্মশান থেকে টেনে নিয়ে সে চ'লে যায় পদ্মার চরে। সেখানে গিয়ে সে মড়া সম্মুখে রেখে ধ্যান করে না অবশ্য। তার সাধনার ধারা আলাদা। মড়ার বোজা চোখ টেনে টেনে সে খোঁজ করে চোখের মধ্যে কি আছে, কেন ম'রে গেলে মানুষ দেখতে পায় না। চামড়ার নীচে কি আছে, মড়ার বুক দুদ্দুর করে না কেন! এই অনুসন্ধিৎসা যখন চরমে পেঁছয়, আকালু তখন বেপরোয়া হ'য়ে মড়া ছিঁড়তে আরম্ভ করে। যেমন ক'রে কানাই পাঁঠার ছাল ছাড়ায়, সেইভাবে সে মানুষের চামড়া ছাড়াবার চেষ্টা করে। খুঁজে পেতে সে কি পায়, তা অবশ্য বলে না, কিন্তু সেই শতচ্ছিন্ন বীভৎস নরমূর্তিটির দিকে তাকিয়ে সে বড় গম্ভীর হ'য়ে যায়। তারপর মাটি খুঁড়ে সেটাকে সমাধিস্থ ক'রে চর থেকে ফিরে এসে সোজা শ্মশানে গিয়ে খবরটা দিয়ে আসে। বলে, 'কি খাওয়াবি বল বিল্লু! তোর কাজ সাফ ক'রে এলাম। পুড়িয়ে দিয়েছি।'

বিল্লু রসিকতা ক'রে গাঁজার কল্কেটা দেখাতে আকালু নাক সিঁটকিয়ে বলে, 'ছোঃ, গাঁজা খায় ভদ্রলোকে। তাড়ি-ফাড়ি থাকে তো চ'।'

দু'বন্ধুতে বেদম তাড়ি খেয়ে বেহুঁস হ'য়ে যায়।

বেওয়ারিশ লাশ হাসপাতাল থেকে প্রায়ই শ্মশানে আসে। আকালুও এইভাবে প্রায়ই শব-সাধনার ও তার পরে তাড়িপানের সুযোগ পায়।

হারুর কানে এ-খবর অল্পই পেঁছয়। কিন্তু যেটুকু পেঁছয়, তাই তার দুশ্চিন্তা বাড়াবার পক্ষে যথেষ্ট। সত্যি, সে কি ছেলেটাকে এমনি অমানুষ রেখেই চোখ বুজবে! মেয়েটাও সোমত্ত হ'য়ে উঠলো, তারও বিয়ে-সাদির ব্যবস্থা করতে হবে। বুড়ো হাড়ে হারুর আর কত সহ্য হয়। পিছনে যদি ছেলেটা একটু শক্ত হ'য়ে দাঁড়ায়, তবে কি তার কম ভরসা! কিন্তু ছেলেকে সে কিছুতেই বাগাতে পারছে না।

হারু সেদিন সকালে উঠে ঢাকের পিঠে তেল দিচ্ছিলো। আকালুর সুবুদ্ধি বুঝি হ'য়েছে, না ডাকতেই পাশে এসে বসলো। তেল দেওয়া শেষ হ'লে কাঠি দু'টো নিয়ে হারু বেহাগের সুরের সঙ্গে বাজাবার মত একটা তাল মক্স করতে আরম্ভ করলো। ঢাক এমন কাঁদে কী ক'রে? আকালু বড় আশ্চর্য হ'য়ে যেতে লাগলো। হঠাৎ আবেগের মুখে বাপের ডান হাতটা চেপে ধ'রে ব'লে উঠলো, 'আর যদি কিছু না দিতে পারিস, তোর এই হাতখানা আমাকে তুই দিয়ে যাস্ কিন্তু।'

তার ছেলে তবে বুঝেছে তার কদর! আনন্দে হারু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে রইলো, তারপর বললো, 'দিতে তো চাই-ই রে, তুই যে নিতে চাসনে।'

'তুই দে, ঠিক নেবো।' আকালু হাত পাতলো।

হারু হাসলো, বললো, 'দিনের মধ্যে একবার ঢাকটা নিয়ে বসিস্, ঠিক হ'য়ে যাবে। বাপের হাত ব্যাটায় পাবে না তো, পাবে কি—'

ঢাক নিয়ে বসার কথা শোনামাত্র আকালুর মত্ বুঝি বদলে গেলো, হঠাৎ উঠে সে উধাও হ'য়ে গেলো। হারু হতবুদ্ধি হ'য়ে বসে রইলো।

সন্ধ্যার মুখে হারুই তার ছেলেকে পাকড়াও ক'রে বললো, 'কিছু তো একটা ক'রে খেতে হবে! একটু শেখ্ বাজাতে!'

আকালু বললো, 'দুনিয়ার সবাই ঢাক বাজিয়ে খায় না। কানাই কাকা বিল্লু—ওরা জানে বাজাতে? ওরা কি খায় না? অনেক কাজ আছে আমারো—আর গতিক যদি মন্দ দেখি, যুদ্ধে চ'লে যাবো, সেপাই হব।'

হারু কথাটা ফিরিয়ে নিয়ে বললো, 'তা বলিনি রে! বলছি, বাজাতে জানলে কী আনন্দ তা তো তুই জানলি নে! এ-রস বুঝলে তুই খাওয়ার কথা ভুলে যাবি।'

আকালু বাপের কথা হেসেই উড়িয়ে দিলো। তার বাপের এত গরজ কেন, একটু একটু সে বুঝতে পারছে অবশ্য। যুদ্ধের ধাক্কায় চাল, নুন তেলের দাম চড়ছে, কিন্তু সংসারের রোজগার বাড়ছে না। আকালুকে দিয়ে ভুলিয়ে ভাগিয়ে তার বাপ কিছু রোজগার করিয়ে নিতে চায়। যে আকালু তীরধনুকে পাখী শিকার করে, চরে গিয়ে শব-সাধনা করে, নদীতে মড়া গরু ভাসতে দেখলে সাঁতরে গিয়ে তার পিঠে চেপে বসে, সেই আকালু করবে টাকা রোজগার! বেড়াল দিয়ে লাঙ্গল বওয়াবার মতলব আর কি।

বিল্লুর সঙ্গে আকালু পরামর্শ করে, বিল্লু তার বন্ধু হ'য়েও তার বাপের দিক টেনে কথা বলে, তাকে রোজগার করতেই বলে। ভারী আশ্চর্য লাগে আকালুর। কানাই কাকারও তাই মত। সবাই দল বেঁধে আকালুর পিছনে লেগেছে তাহ'লে। রোজগার তাকে করতেই হবে? বেশ!

আকালু সেপাই হ'য়ে চ'লে গেলো। খাওয়া পাবে, পোষাক পাবে, তার ওপর আবার মাইনে। তার বাপ সারাজীবনের চেষ্টায় যা পারেনি, এক তুড়িতে আকালু তার ডবল রোজগার আরম্ভ ক'রে দিলো। এবার আর তীর-ধনুক নয়, বন্দুক কামান।

আকালুর অভাবে বাড়িটা খাঁখাঁ করে। বাপ মা আর তার বোন মাঝে মাঝে জড়ো হ'য়ে বসে আকালুর সম্বন্ধে আলোচনা করে। তিন-চার মাস পরে বর্মার কাছ থেকে তার একটা চিঠি এলো। আকালু তো আর লিখতে পড়তে জানে না, কে-না-কে লিখে দিয়েছে। কানাই এসে চিঠি প'ড়ে দিয়ে গেলো। আকালু নাকি


Touch of Experience
এমন কয়েকজন আছেন, যাঁহাদের ধাতব পদার্থের বিষয়ে অদ্ভুত দক্ষতা........ ধাতুর অন্তর্নিহিত গুণাবলী উদ্ঘাটিত করিবার কৌশল তাঁহারা জানেন। ঢালাই লোহার ব্যবসাক্ষেত্রে ডি, এন, সিংহ এন্ড কোম্পানী এমনই একটি প্রতিষ্ঠান। প্রায় অর্ধ শতাব্দীর মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও শ্রেষ্ঠ উপাদানের সমন্বয় এই প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যগুলিকে চরম উৎকর্ষতা দান করিয়াছে।
ধীরেন কড়াই
সর্বত্র ঘরে ঘরে সুপরিচিত। বিশেষ টেকসই। পরিমাণে বেশী ধরে। বিভিন্ন সাইজে পাওয়া যায়।
ধীরেন
GOURI Pump
গৌরী পাম্প
গভর্ণমেণ্ট, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও জনসাধারণ কর্তৃক বহুল ব্যবহৃত ও প্রশংসিত।
SINGHA'S OWN 555
DNS
অপরাপর দ্রব্যসমূহ
জিগ্ ঘোরানো সিঁড়ি, রেলিং, গথিক ও আধুনিক আর্চেস, ব্র্যাকেটস্, ঝিলিমিলি প্রভৃতি। ম্যানহোল ও সেফটি ট্যাঙ্ক কভার, সিষ্টার্ণ (৫৫৫), সাইফুন, পাইপ, 'ডিপেন' ভালব প্রভৃতি।
D.N. SINGHA & CO
Head Office & Works:—61, SITANATH BOSE LANE, SALKIA, Phone: Howrah 348.
Showroom :—89/1, COLLEGE STREET, CALCUTTA. PHONE B. B. 4757.
A.A.S.

বেশ সুখে আছে, তাদের থাকার তাঁবুটা নাকি খাসা। খাওয়া-দাওয়াও খুব জুতের।

কিন্তু এদিকের খাওয়া-দাওয়া যে কি রকম, খুঁটিনাটি ক'রে আকালুকে তা জানানো তো যায় না। ইনিয়ে-বিনিয়ে কে অত লিখে দেবে! চালের দাম হুহু করে বেড়ে চ'লেছে, তরিতরকারির কথা বাদ, তেল নুনেও আগুন। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে সহরের চেহারাই বদলে গেছে। আশেপাশের গ্রাম থেকে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে অনেক লোক এসে ভিড় ক'রেছে সহরে। যাই হোক্, আকালুটা যে খেয়ে প'ড়ে সুখে আছে—এও সুখের কথা!

সুখে তো আছে, কিন্তু এ-সুখ বেশিদিন সইবে কি? পুরো একটা বোমার দরকার হবে না, বোমার একটা টুকরো ছিট্‌কে এলেই—। ছিটকে এলেই যে কী, তা আর ভাবতে ইচ্ছে করে না হারুর, হারুর বৌ-এর, হারুর মেয়ের।

আকালুর খবর পেতে কিছু দেরী হ'লেই কসাইপাড়ায় চ'লে যায় হারু। কানাই, বলাই ইত্যাদি কয়েকজন কসাই-এর কাছে মনের আশঙ্কা জানায়। তারা সহানুভূতি তেমন দেখায় না, বলে, 'অমন ছেলে যাওয়াই ভাল।'

হারু ভাবে, এরা কসাই-ই বটে! কিন্তু কসাইকেও সে মুখ ফুটে কসাই ব'লে সম্বোধন করতে ভয় পায়। ঘরে ব'সে আকালুর কথা ভাবা চলে, আলোচনা করা চলে না। মা-মেয়েতে একেই পাগল হ'য়ে আছে, সে পাগলামিতে ইন্ধন জোগাতে তার ইচ্ছে হয় না।,

মড়াকান্নায় পৃথিবীর আকাশ আচ্ছন্ন হ'য়ে যেতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু হারুর জান্ বড় শক্ত। তাকে কাঁদাতে পারছে না কেউ। হারুর বৌ কাঁদছে, হারুর মেয়ে কাঁদছে—এমন কি কানাই-এর মত কসাইও সেদিন কেঁদে ফেলেছে। তাদের এ কান্না অবশ্য আকালুর জন্যে নয়, এ-কান্না আকালের জন্যে। চারদিকে দুর্ভিক্ষের ভীষণ মূর্ত্তি। কানাই কসাইয়ের ছুরির ধার প'ড়ে গেছে, মানুষের প্রাণে টান পড়ায়, পাঁঠার প্রাণের দাম বেড়েছে। এখন আর অত পাইকারী হিসাবে পাঁঠা বলি হ'চ্ছে না। পেটে ভাত নেই, মাংস খাবে কে? তবু কানাইরা তাদের থেকে অনেক আরামে আছে। কী ক'রে, তা বুঝতে পারে না হারু।

বিল্লুর খাট্‌নী প'ড়েছে খুব। আর পারে না সে। এক চিতাতে একসঙ্গে আট-দশটা মড়া তুলে দিয়েও সে পেরে উঠ্‌ছে না। বিল্লু এখন আকালুর অভাব বোধ করছে খুব। ও-শালাটা থাকলে দু'চারটে লাশ তাকে দিয়েও খতম করা যেত। বেশ হ'য়েছে আজকাল, হরিবোল দিয়ে আর কেউ মড়া আনে না। বেশির ভাগই মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ী ভরতি হ'য়ে লাশ আসে শ্মশানে। ছিট্‌কে দু'চার জন যদি কাঁধে চেপে আসে, সেও নিঃশব্দে এসে যায়। হারু ভাবে, দুনিয়াটা হরিহীন হ'য়ে গেলো নাকি?

বহুদিন বাদে আজ হারু ঢাক কাঁধে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লো। আর উপায় নেই তার। কাঁসার একটা থালা ছিলো, পেতলের একটা ঘড়া ছিলো, সব বিক্রী হ'য়ে গেছে। আজ সে ঢাকটা বেঁচবে। আজকের দিন তার জীবনের চরম দিন। আজ আকালুর কথা খুব বেশি ক'রে মনে পড়ছে তার। ছেলেটা আজ থাকলে একটু তবু ভরসা ছিলো বুঝি। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার ভাবে, সে কি আর আছে?

ঢাক নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো হারু। ঢাক কেনার লোক নেই। ফিরে এসে শুন্‌লো, ছেলে তার আছে। একটা চিঠি এসেছে সরকার বাহাদুরের দপ্তর থেকে। বেতারে তার ছেলে নাকি তার বাপ মায়ের কাছে কথা বলবে। কে কথা বলবে? আকালু? আকালুর গলার স্বর শুনবে তার বাপ-মা, তার বোন, কানাই বিল্লু?

ভারী পা দু'টো টানতে টানতে আকালুর মা রক থেকে উঠোনে নেমে গিয়ে বসলো। তার বোনও উঠে গিয়ে বস্‌লো মায়ের পাশে। আজ চারদিনেই এত কাবু হ'য়ে পড়লো? আশ্চর্য! চারদিনের অনাহারে এতটা কাবু হবে আগে তো ভাবে নি। পরশু দিন আকালু কথা বলবে, পরশু পর্যন্ত প্রাণে বেঁচে থাকবে তো তারা?

কলের গানের দোকান সেই সহরে, দু'মাইল পথ। তারা রওনা হ'লো। সেখানে গিয়ে ছেলের গলার স্বর শুন্‌তে চললো তিনটি প্রাণী। নির্জন অন্ধকার পথ। হারু ডোমের নাকেও গন্ধ যায়, চারদিকে চিমসে গন্ধ। অন্ধকারের মধ্যে গুমরানি শুনে হারু ডোমও ভয় পায়। ডোমের আবার ভূতের ভয়, শুনলে হাসি পায়। গুটিগুটি পায়ে পাশা-পাশি চ'লেছে তিনটি প্রাণী। তিনটি প্রাণী সারাটা রাস্তা এ ওকে গুঁতোতে গুঁতোতে চ'লেছে। কারোই পায়ের রগে জোর নেই। তাই সারাপথ গায়ে গায়ে ঠোকাঠুকি লেগে যায়।

কলের গানের দোকানের সাম্‌নে পৌঁছে তিনটি প্রাণী ধুঁকতে লাগলো। আটটা বাজতে কত দেরী? আটটার সময় আকালু কথা বলবে। অনেকক্ষণ প্রতীক্ষার পর দোকান-দারকে হারু অনুনয় ক'রে বললো, একটু তার ছেলের কথা শোনাতে। সে একটা কল টিপে দিতে নানা রকমের গান বেজে উঠলো। কিন্তু আকালু কই—

এইবার আকালুদের আবির্ভাব হ'চ্ছে একে একে। আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের কাছে কতজন কত কথা বলছে। তা দিয়ে হারুদের দরকার নেই, তবু উৎকর্ণ হ'য়ে তাই শুনতে লাগলো। এইবার আকালু এক নিশ্বাসে ব'লে গেলো 'বাবা, আমি ভাল আছি। মা, আমি ভাল আছি। মিমু, আমি ভাল আছি। কানাই কাকা, বলাই কাকা, বিল্লুভাই, আমি ভাল আছি। বেশ সুখে আছি। ছুটি পেলেই আমি তোমাদের কাছে যাব। আজ আসি।' ব্যস্! হ'য়ে গেলো আকালুর কথা। গলার স্বর তো চেনা গেলো না! এত শীগগির তার বলার কথা শেষ হয়ে গেলো? আর কি কিছু বলার নাই তার। আকালু কি জানে, তার বাপ-মা, তার বোন সব না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। এখানকার দুর্ভিক্ষের খবর সে নিশ্চয় জানে না। তা না হ'লে, ছুটি নিয়ে আসতে চাইল কেন?

ছুটি পেলেই আসবে আকালু। ছুটির জন্যে তবে চেষ্টা করছে সে। আকালু তবে সুখে আছে। আকালু তবে খাচ্ছে দাচ্ছে।

সবারই আশা দুর্ভিক্ষ নিশ্চয় কমবে। কিন্তু কমে কই, বেড়েই চ'লেছে দিন দিন। দৈনিক কত লোক যে মরছে, তার হিসাব বিল্লু নিশ্চয় দিতে পারবে।

আর না পেরে হারুর বৌ বললো, 'মত্তির-বাবুর কাছে একবার—'

হারু বললো, 'মত্তিরবাবু চিনতে পারলো না আমাকে। সেদিন গিয়েছিলাম।'

'কবে?'

'ঢাক বেচতে।'

মত্তিরবাবু চিনলো না হারু ঢাকীকে? হারুর বৌ বিশ্বাসই করে না, বলে, 'তুই ভারী মিথ্যুক। মত্তিরবাবু চিনবে না তোকে। কি যে বলিস্। পুজো এলো বলে, তোর দরজায় আবার তাকে আসতে হবে না।'

হারু অনেকক্ষণ গুম হ'য়ে থাকে, বলে, 'হাতের রগে আর জোর নেই। এ-হাত আর চলবে না, মত্তিরবাবু টের পেয়েছে বুঝি। তাই আর ফিরেও তাকালো না।'

'কি বললো?'

হারু এবার রুখে উঠলো, 'তা দিয়ে তো দরকার কি? মেয়ে মানুষের সব দরকার?'

রুখে ওঠাও

এর পর প'

থাকতে থাকতে

হ'য়ে গেলো হ

বুঝি, মত্তিরব

পাঠাবার জন্যে

তা তো বো

বুঝি সে

হারু

কাঁদলোই

বিল্লু এ

এর

আকালু

গেলো।

খাকির

বাজারে

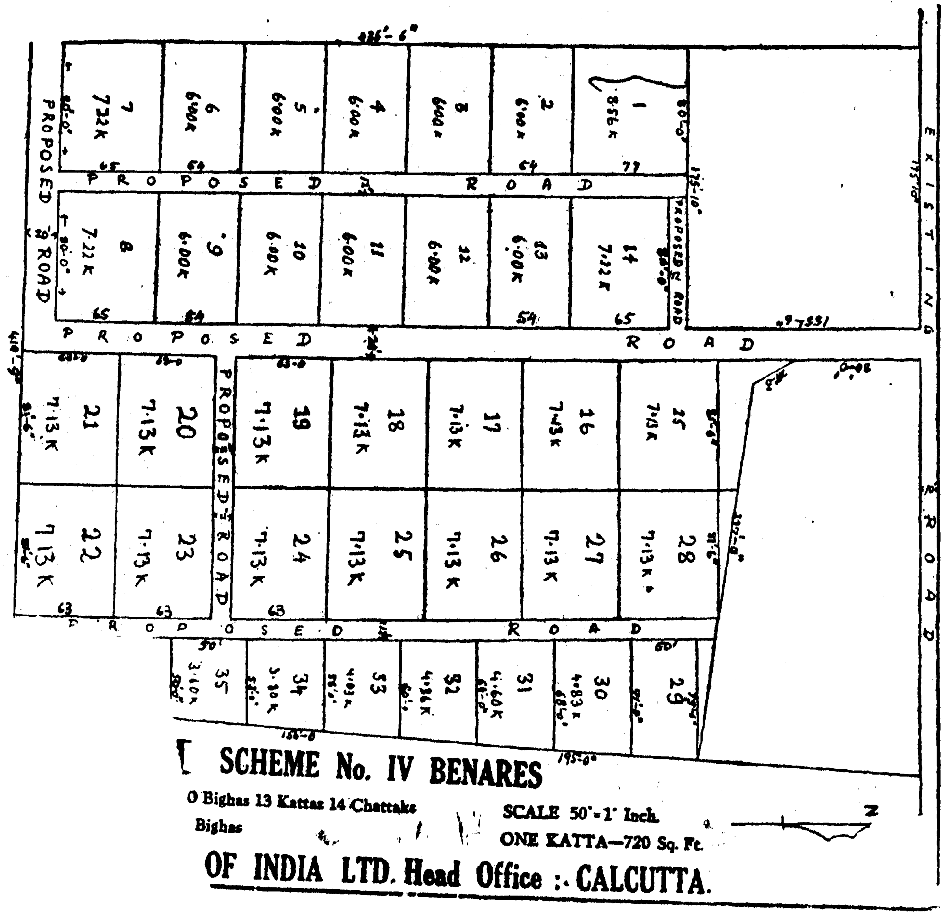
—জমি বিক্রয়—

পবিত্র বারাণসীধামে

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মাত্র ২।৩ মিনিটের পথে

পাকা ইমারতাদি নির্মাণের স্বত্ব সমন্বিত

মনোরম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্লট; জমির কাছেই স্কুল ও বাজার
এবং কেবল পাশেই গঙ্গা। নিম্নে প্লটগুলির নক্সা দেওয়া হইল।



—বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন—

...াষ্ট অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

"শেয়ার্স্ ডিলার্স হাউস", কলিকাতা

ফোনঃ—ক্যালঃ ১৪৬৪ ও ১৪৬৫

বরাবর সে উঠে এলো এমব্যাংকমেণ্টে। এম-ব্যাংকমেণ্ট পিছল। আকালুর ভারী বুটও পিছলে যেতে লাগলো। এমব্যাংকমেণ্টের ডানে ধু ধু মাঠ, বাঁয়ে বর্ষার উচ্ছল পদ্মা। চর ডুবে গেছে। আকালুর এত সাধনার জায়গা, আজ তা জলের স্রোতে অদৃশ্য। ইণ্ডির ঘাটের সেই মস্ত বট গাছটা আছে তো এখনো। তার এই এক বছরের অনুপস্থিতির তলে তলেও বুড়ো বট গাছটা টিকে আছে! অযথাই আশ্চর্য লাগলো আকালুর!

কিন্তু শুধু বট গাছট তো নয়, হারুও এখনো টিকে আছে। আকালু চতুর্গুণ আশ্চর্য হ'লো হারুর টিকে থাকা দেখে অবশ্য নয়—হারুর এই অস্থি ও চামড়া সর্বস্ব হ'য়ে



এইভাবে একা একা টিকে থাকা দেখে। মা কই, মিন্নু কই?

কত উৎসাহ নিয়ে ফিরেছিলো আকালু। এত উদ্দাম ইচ্ছা হ'য়েছিলো ঘরে ফিরতে তার কেন, তা তো সে জানে না। ছুটি মঞ্জুর হ'লো না, আকালু তাই পালিয়ে এলো। কত দুর্গম, কত বিপদময় তার এই পলায়ন। কিন্তু বাড়ীর উঠোনে পা দিয়ে যখন সে তার বাবা ও মাকে চেঁচিয়ে ডেকেও সাড়া পেলো না, তখনই তার সমস্ত উৎসাহ নিমেষের মধ্যে গেলো ক'মে। অন্ধকার ঘর, উন্মুক্ত দরজা। ঘরে ঢুকে অনেক কষ্টে সে জ্বালালো ভিজে দেশলাই। সম্মুখে আর কেউ নেই, অস্থি ও চামড়া সর্বস্ব তার বাপ ভিজে মাটির ওপর উপুড় হ'য়ে শুয়ে। তার বাপই তো এ? দেশলাই-এর কাঠি মুখের কাছে নিয়ে গেলো আকালু। হ্যাঁ, এ তো হারু ঢাকীই বটে! পকেট থেকে মোমবাতি বা'র ক'রে আকালু জ্বালালো। বাপের গায়ে ধাক্কা দিতে সাহস পেলো না, কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকলো। সাড়া পেলো না। হারু ঢাকী বড় শক্ত লোক, সাড়া দেবার শক্তি না থাকলেও ফ্যাল ফ্যাল ক'রে সে তাকাতে লাগলো আকালুর দিকে।

ঘরের আর কোথাও কিছু নেই, ঢাকটা এক কোণে কাৎ হ'য় প'ড়ে আছে। তার পালঙ্কের সে উদ্ধত গৌরব আর নেই, মাটির সঙ্গে মিশে এক হ'য়ে গেছে। পুজোর তো আর দেরী নেই, অম্বিকা মস্তিরের বাড়ীতে এবার ঢাক বাজাবে কে? কিন্তু মা কই, মিন্নু কই?

আকালু ছুটে বেরুলো কানাই কাকার খোঁজে। দরজা ধাক্কা দিয়ে জাগালো তাদের। কানাই আর বলাই দু'হাতে দুটো ছুরি নিয়ে বেরুলো! বলা যায় না, রাত বেরাতে ডাকাত আসতেও তো পারে! আকালুকে দেখে তারা চমকালো। আকালু চমকালো এদের দেখে। সারা রাস্তা সে দুর্ভিক্ষ মাড়িয়ে মাড়িয়ে এত-দূর এসেছে, কিন্তু কানাই বলাইকে দেখে তো বোঝা যায় না এরা দুর্ভিক্ষের দেশের লোক। কসাইদের কি দুর্ভিক্ষ ছোঁয় না? দুনিয়ার সব কসাই বুঝি দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বেঁচে গেছে!

কানাইদের কাছে যা শুনলো তা মর্মান্তিক। আকালুর মা ম'রেছে। আর মিন্নু নেমে চলে গেছে অনেক দূরে। স্বচক্ষে তারা নাকি দেখেছে মিন্নুকে অনেক দূরে চ'লে যেতে। ঠিক ক্ষিদের মুখেই রাণী হবার প্রলোভন মিন্নু সামলাতে না পেরে—

আর শুনতে পারলো না আকালু। ছুটে পালিয়ে এলো। তার মা ম'রে গেছে, তাতে তার দুঃখ নেই। কিন্তু মিন্নু একি করলো। তার বুড়ো বাপকে ফেলে সে কি ক'রে চ'লে গেলো, ভাবতেই পারে না আকালু।

বাপের মুখে অযথাই জল দিতে চেষ্টা করলো আকালু। আর কিছু নেই তার সঙ্গে। পকেটে আছে শ-খানেক কাগজের টাকা।

সকাল হ'লে আকালু ঘর থেকে বেরুতে পারছিলো না। বার বার মনে হচ্ছিলো মিন্নুর কথা। মিন্নুটা এমনি ক'রে তাদের মুখে কালী মেখে দিয়ে গেলো। মুখ দেখাবে কি ক'রে আকালু।

আর যে পাঁচ সাত দিন হারু বেঁচে ছিলো, আকালু প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেছে তাকে কিছু খাওয়াতে। কিছুতেই সে পারেনি। গলা দিয়ে তার নামলোই না কিছু।

হারুর মরা দেখে আকালু একটুও বিচলিত হ'লো না। এ-মৃত্যুটা সে নীরবে মেনে নিলে। কিন্তু হারু মারা যাওয়ার পরই আকালুর অনুতাপ হ'লো ঢাকের দিকে তাকিয়ে। এত ইচ্ছে ছিলো তার বাপের, তবু আকালু একদিন ধরলো না ঢাকের কাঠি! চেষ্টা করলে সে কি পারবে না বাজাতে। তা-ও কি কখনো সম্ভব? আকালু পারবে বাজাতে। এটুকু বিশ্বাস তার আছে। তার বাপের হাত সে পাবে না তো পাবে কি—

প'ড়ে রইলো মড়া। আকালু ঢাক নিয়ে বসলো, তার মৃত বাপের কানের মধ্যে একটু ঢাকের আওয়াজ দিয়ে দিতে চায় বুঝি। কিন্তু কাঠি কই? কাঠি দুটো নেই তো!

বাইরে অনর্গল বৃষ্টি। কালো রাত্রি যেন গ'লে গ'লে পড়ছে। আকালু তার বাপের পাশে গিয়ে বসলো। সে আজ বুঝি সব-সাধনা করবে। তার মতলব দেখে তাই যেন মনে হয়।



পাঁঠা যে ...ঠা, তার চামড়াও বাজে। কিন্তু মানুষ ... এতই অপদার্থ যে, তার চামড়ায় বাড়ি ...লে জুতসই শব্দই হবে না! ...ু চেষ্টার ... নেই আকালুর। এত বড় একজন ঢাকী ...র বাপ, তার রক্তে-রক্তে শিরা-শিরায় হাড়ে ...ও যদি বেজে ওঠে ঢাকের আওয়াজ, ত... ...না সে আসল ঢাকী।

সংবাদ... সহর সুদ্ধু ছড়িয়ে পড়লো ...গুনের ...। রায় বাহাদুরের দুর্গা পুজোয় ...ক অদ্ভু... ঢাকী এসেছে মিলিটারী পোষাক ...রা। তা... ঢাকের কাঠি বাঁশের নয়—হাড়ের। ...হর সুদ্ধ ...লোক ভেঙ্গে পড়লো অম্বিকা-বাবুর পুজোমণ্ডপে। হারু যখন নেচে নেচে ঢাকের পালক দুলিয়ে বোধন বাজাতো, সে বাজনা শোনার জন্যে এমনিভাবেই সহরের লোক ভিড় ক'রে আসতো অম্বিকাবাবুর বাড়ীতে। বিশ্বকর্মার ব্যাটা কি কখনো চামচিকে হয়! হারুর ব্যাটা লোক টানবে, এ আর বিচিত্র কি!

পায়ের মোটা বুট ঠককে ঠুকে ঢাকীটা নেচে নেঁচে ঢাকের চামড়ার ওপর হাড় পিটছে। এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে জনতা ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে।

অম্বিকাবাবু এতক্ষণে নেমে এলেন। দূর থেকে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তোমাকে এখানে ডেকেছে কে?'

'নিজেই এসেছি আমি। আমার বাপ বরাবর বাজাতো, সে ম'রে গেলো। তাই আমি এলাম।' আকালু সসম্ভ্রমে জবাব দিলো।

'তুই হারু ডোমের ছেলে? হাতে হাড় কেন? ও কিসের হাড়।' বড় বিরক্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন অম্বিকাবাবু।

'এ হাড় বাবু—' আকালু বুঝি কেঁদে ফেললো, 'এ-হাড় বাবু আমার বাপের হাতে এই হাত দিয়ে সে অনেক বাজিয়ে গেছে, তাই—'

উত্তেজিত জনতা আকালুকে ... এলো।

জ্যান্ত বাপের হাত সে পায়নি হাতখানা তাই সে ধড় থেকে ... এসেছে।

ভারী বুট দু'টো ঠুকছে আকালু বেপরোয়া। পুজো মণ্ডপের সামনের পাকা উঠোনে ঠক্‌ঠক্‌ ক'রে বেজে উঠছে বুটের শব্দ। সেই তালে তালে একখণ্ড হাড় দিয়ে সে পিটে চ'লেছে ঢাকের চামড়া, ড্যাব ড্যাব আওয়াজ হ'চ্ছে সুধু তাতে। হারু ঢাকীর হাতে আজ আর যাদু মাখানো নেই—ঢাক কাঁদেও না, কথাও বলে না।

হতাশ হ'য়ে পড়লো আকালু, জনতা সেই সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠতে লাগলো।

অম্বিকাবাবু এতক্ষণে অধৈর্য হ'য়ে পড়লেন, উঁচু রোয়াকের ওপর নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে হিন্দিতে আদেশ করলেন, 'পাকড়াও উস্‌কো. উল্লুকো—'

জনতা এক ঝাঁক শকুনির মত আকালুর ওপর ছোঁ মেরে পড়তেই আকালু হাতের হাড় ছুঁড়ে মারলো। ভিড়ের মাঝে একখণ্ড ঢিলের মত পড়লো হাড়। পচা পুকুরের পানার মত স'রে গেলো জনতা। যে রকম উন্মত্ত চেহারা লোকটার, কেউ আর এগোতে সাহস পেলো না। ভীরু জনতা দাঁড়িয়ে রইলো ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে। আকালুর হাসি পাচ্ছিলো, সে তো নিরীহ নিরস্ত্র হাড়সর্বস্ব মাত্র, তাকে দেখে সবাই ডরায় কেন? কাঁধের ঢাক নামিয়ে রাখলো আকালু।

অম্বিকাবাবু হন্‌ হন্‌ ক'রে নেমে এলেন এবার। কাছে এসে বললেন, 'পাকড়ো উস্‌কো।'

দারোয়ান লাঠি হাতে দাঁড়িয়েছিলো, এবার সে গিয়ে আকালুকে ধ'রে ফেললো।

অম্বিকাবাবু বললেন, 'থানায় নিয়ে যাও। ব্যাটা খুনী।'

খুনী? বলে কি এরা? আকালু আশ্চর্য হ'য়ে গেলো। খুন তো সে করেনি। তার বাপ তো নিজে নিজেই ম'রে গেছে। মড়া মানুষ কেটে তো কত পরীক্ষা হয়, সে তো এক পচা মড়ার শরীর থেকে হাডটা খুলে নিয়েছে।

তার আপত্তি কেউ শুনলো না. হিড় হিড় ক'রে টান্‌তে টান্‌তে তাকে নিয়ে যেতে লাগলো থানায়। আকালু চেঁচিয়ে বললো, 'থানায় নিয়ে যেয়ো না। ওরা আমাকে গুলী ক'রে মেরে ফেলবে।'

জনতা পিছন পিছন যাচ্ছিলো, বললো, 'কেন, কেন?'

'আমি পালিয়ে এসেছি। ছুটি দিলো না, কিছুতে ছুটি দিলো না। আমি যুদ্ধ করতে করতে পালিয়ে এসেছি—তাই।'

জনতা ব'লে উঠলো, 'গুলী করাই দরকা'র তোমাকে—তুমি ডাকু। কেন, মরতে এত ভয় কেন বাছাধনের? তোমাকে ছাড়া হবে না। চলো, নিয়ে চলো।'

আকালু ভয়ে আর্তনাদ ক'রে উঠলো, 'না না না, গুলী করবেন না, বাবু, গুলী না। ভীষণ ভয় করে। সত্যি, বাবু মরতে ভয় নেই। তবে, গুলী করে নয়; আমাকে ফাঁসী দেওয়াবেন বলুন।'

উৎকট উল্লাসে জনতা হেসে উঠলো, লোকটা তো বদ্ধ পাগল. ফাঁসী চায়!

জনতার ধাক্কা খেতে খেতে আকালু থানার দিকেই চললো।

ভারী বুট দু'টো ঠুকছে আকালু বেপরোয়া। পুজো মণ্ডপের সামনের পাকা উঠোনে ঠকঠক্ ক'রে বেজে উঠছে বুটের শব্দ। সেই তালে তালে একখণ্ড হাড় দিয়ে সে পিটে চ'লেছে ঢাকের চামড়া, ড্যাব ড্যাব আওয়াজ হ'চ্ছে সুধু তাতে। হারু ঢাকীর হাতে আজ আর যাদু মাখানো নেই—ঢাক কাঁদেও না, কথাও বলে না।

হতাশ হ'য়ে পড়লো আকালু, জনতা সেই সংগে সংগে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠতে লাগলো।

অম্বিকাবাবু এতক্ষণে অধৈর্য হ'য়ে প'ড়লেন, উঁচু রোয়াকের ওপর নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে হিন্দিতে আদেশ করলেন, 'পাকড়াও উস্‌কো, উল্লুকো—'

জনতা এক ঝাঁক শকুনির মত আকালুর ওপর ছোঁ মেরে পড়তেই আকালু হাতের হাড় ছুঁড়ে মারলো। ভিড়ের মাঝে একখণ্ড ঢিলের মত পড়লো হাড়। পচা পুকুরের পানার মত স'রে গেলো জনতা। যে রকম উন্মত্ত চেহারা লোকটার, কেউ আর এগোতে সাহস পেলো না। ভীরু জনতা দাঁড়িয়ে রইলো ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে। আকালুর হাসি পাচ্ছিলো, সে তো নিরীহ নিরস্ত্র হাড়সর্বস্ব মাত্র, তাকে দেখে সবাই ডরায় কেন? কাঁধের ঢাক নামিয়ে রাখলো আকালু।

অম্বিকাবাবু হন্ হন্ ক'রে নেমে এলেন এবার। কাছে এসে বললেন, 'পাকড়ো উস্‌কো।'

দারোয়ান লাঠি হাতে দাঁড়িয়েছিলো, এবার সে গিয়ে আকালুকে ধ'রে ফেললো।

অম্বিকাবাবু বললেন, 'থানায় নিয়ে যাও। ব্যাটা খুনী।'

খুনী? বলে কি এরা? আকালু আশ্চর্য হ'য়ে গেলো। খুন তো সে করেনি। তার বাপ তো নিজে নিজেই ম'রে গেছে। মড়া মানুষ কেটে তো কত পরীক্ষা হয়, সে তো এক পচা মড়ার শরীর থেকে হাতটা খুলে নিয়েছে।

তার আপত্তি কেউ শুনলো না, হিড় হিড় ক'রে টানতে টানতে তাকে নিয়ে যেতে লাগলো থানায়। আকালু চেঁচিয়ে বললো, 'থানায় নিয়ে যেয়ো না। ওরা আমাকে গুলী ক'রে মেরে ফেলবে।'

জনতা পিছন পিছন যাচ্ছিলো, বললো, 'কেন, কেন?'

'আমি পালিয়ে এসেছি। ছুটি দিলো না, কিছুতে ছুটি দিলো না। আমি যুদ্ধ করতে করতে পালিয়ে এসেছি—তাই।'

জনতা ব'লে উঠলো, 'গুলী করাই দরকার তোমাকে—তুমি ডাকু। কেন, মরতে এত ভয় কেন বাছাধনের? তোমাকে ছাড়া হবে না। চলো, নিয়ে চলো।'

আকালু ভয়ে আর্তনাদ ক'রে উঠলো, 'না না না, গুলী করবেন না, বাবু, গুলী না। ভীষণ ভয় করে। সত্যি, বাবু মরতে ভয় নেই। তবে, গুলী করে নয়; আমাকে ফাঁসী দেওয়াবেন বলুন।'

উৎকট উল্লাসে জনতা হেসে উঠলো, লোকটা তো বদ্ধ পাগল, ফাঁসী চায়!

জনতার ধাক্কা খেতে খেতে আকালু থানার দিকেই চললো।

বাস্তু পূজা

ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সেন

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের কথা ইতিহাসের আলোচনার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যাহা ছিল, এখন তাহা থাকিতেও পারে না থাকিতেও পারে। বিগত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গলার পল্লী গ্রামে অনেক দিকে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। কি আছে, কি নাই, তাহা পল্লীবাসীরাই বলিতে পারেন। প্রবাসী প্রৌঢ়েরা কেবল অতীতের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে পারেন।

পল্লী গ্রামে সন্ধ্যার পরেই নিশুতি রাত হইত। সাধারণ লোকেরা নয়টার মধ্যেই শয্যা গ্রহণ করিত। কেবল যাঁহারা বড়মানুষ অথবা বড়মানুষের সম্ভ্রমলিপ্সু তাঁহারাই তেল পুড়াইয়া অধিক রাত্রি পর্যন্ত আড্ডা জমাইতেন। আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের গ্রামে তেমন বড়মানুষ কেহ ছিলেন বলিয়া মনে পড়ে না। শীতকালে কিন্তু পল্লীর রাত্রি একেবারে নিঝুম থাকিত না। ঠাকুরমার গা ঘেঁসিয়া লেপ মুড়ি দিয়া বেশ আরাম করিয়া শুইয়াছি—ঘুমে চোখের পাতা বুজি বুজি করিতেছে, এমন সময় এক এক রাত্রে শুনিতাম—কাঁসর-ঘণ্টার তীব্র বাদ্যের সঙ্গে বহু কণ্ঠের সমবেত আর্ত ধ্বনিতে নিশীথের স্তব্ধ নীরবতা আহত করিয়া ডাক ভাসিল—,

"ও তোরা দেখ আসি, নগর বাসী,
সোণার মানুষ যায় পথে।
ছেঁড়া কাঁথা, মুড়ো মাথা
করঙ্গ লয়ে হাতে।"

বহু শতাব্দী পূর্বে যে সোণার মানুষটি মুণ্ডিত মস্তকে ছিন্ন কন্থা ও করঙ্গ মাত্র সম্বল করিয়া নদীয়ার পথে বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহাকে হয়ত ভয় করিবার কোন হেতু ছিল না। কিন্তু এই আহ্বানে সাড়া দেওয়া দূরে থাকুক, ভীতি কণ্টকিত দেহে আমরা ছোট ছেলেরা ঠাকুরমার কাছে আরও একটু সরিয়া আসিতাম। কারণ ঐ নগর কীর্তন যে সংক্রামক ব্যাধির বার্তা বহন করিয়া আনিত, তাহা বাস্তবিকই ভয়াবহ। প্রাচীনেরা গান শুনিয়া বলিতেন, গাঁয়ে "মতঙ্গ" আরম্ভ হইয়াছে। মতঙ্গ শব্দের আভিধানিক অর্থ যাহাই হউক, আমরা জানিতাম ওটা বিসূচিকার (কলেরা) ভদ্র আখ্যা। তখনকার দিনে এই রোগটাকে সকলেই ভয় করিত। নগর কীর্তনিয়ারা প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট হইতেই চাউল, ডাইল, লবণ, তেল প্রভৃতি পূজার উপকরণ লইয়া যাইতেন, কিন্তু মহাপ্রভু বা তাঁহার পার্ষদ প্রভুপাদেরা সেই পূজা পাইতেন মনে করিলে ভুল হইবে। আহরিত দ্রব্যে পূজা হইত বিসূচিকার দেবী শ্মশান-কালীর। দেবীর পূজাদ্রব্য মহাপ্রভুর নামে কেন সংগ্রহ হইত এ এক সমস্যা। বিপদে পড়িলে ছোট-বড় সকল ঠাকুরকে খুসী করার চেষ্টা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। মহামারীর আতঙ্কে বোধহয় শাক্ত ও বৈষ্ণবেরা তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক বিসম্বাদের কথা সাময়িকভাবে ভুলিয়া যাইতেন অথবা সুদূর পল্লীগ্রামের সরল অধিবাসীরা বোধহয় সত্য সত্যই কালা ও কালীর প্রভেদ জানিত না।

কিন্তু শীতের রাত্রে এমন গীতের দলও আসিত, যাহাদের সাড়া পাইলেই আমরা শিশুর দল লেপের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া দরজার কাছে ছুটিয়া আসিতাম। আমাদের অঞ্চলে শীতকালে বাস্তুপূজার প্রথা আছে। সম্পন্ন গৃহস্থেরা নিজেদের বাড়ীতেই সাধারণভাবে বাস্তুপূজা করিতেন। কিন্তু গ্রামে গ্রামে একাধিক বারোয়ারী পূজার ব্যবস্থা ছিল। পূজা হইত খালের ধারের এক একটা খোলায়। বাস্তুপূজার উদ্যোক্তারা বিসূচিকা ভিক্ষা সংগ্রহ করিত। তাহাদের ছড়াগুলি আমাদের খুবই ভাল লাগিত। যাহা মনে আছে তাহা নীচে উদ্ধৃত করিলাম।

আইলামরে শরণে
লক্ষ্মদেবীর বরণে
লক্ষ্মীদেবী দিলেন বর
ধানে চাউলে ভরুক ঘর
ধান না দিয়া দিলেন কড়ি
তাইতে হইল রূপার লড়ি
রূপার লড়ি সোণার থালা
মাঝ খাটালে টাকার জালা,
একটি টাকা পাইরে
বানিয়া বাড়ী যাইরে
বানিয়া বাড়ী ধূপের মোচা
টাকা ভাঙ্গাই নন্দবাসা
নন্দ বাসা নন্দ ধন
কুলাইরে দেবী কত ধন
ঠাকুর কুলাই ভো!

এ ছাড়া নলিয়ার গান ছিলঃ—

আয়রে নলিয়া,
হস্তী ঘোড়ায় চড়িয়া;
হস্তী ঘোড়া কি কাজ করে?
রাজার মায়না খাইয়া লড়ে।
রাজার বাড়ী হাজার বাঁশ
তা দেখিয়া ওড়ে হাঁস
হাঁস ওড়ে দিয়া মোড়া
পায়রা ওড়ে বত্রিশ জোড়া
ও পায়রা তরালিয়া
লোহার বেগুণ তরালিয়া
লোহার বেগুণ সরল পথে
ডিম দেও আনিয়া লক্ষ্মীর হাতে
ঠাকুর কুলাই ভো!

সবচেয়ে যে গান আমাদের বেশী ভাল লাগিত তাহার বিষয় হইতেছে ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুলের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর পরাক্রম কাহিনী। নলিয়ার হস্তী ঘোড়া যতই যুদ্ধ করুক, বন্য হংস ও গৃহ পারাবতের উৎপতন ভঙ্গি যতই মনোরম হউক না কেন, "বারো বাঘের লেখা পড়ি" না শুনিয়া শয্যায় ফিরিয়া যাইতে পৌষ মাসের শীতের রাত্রেও আমাদের ইচ্ছা হইত না। তখন আমাদের ওদিকে শীতকালে প্রায় প্রত্যেক বৎসরই বাঘ আসিত। গরু-বাছুর বাঘে লইয়া যাইবার খবরও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যাইত। সেই ভয়ানক

ভয়গ্রস্ত শ্মশানকালীর উপাসকদিগের মত রাত্রিকালে গান গাহিয়া অথবা ছড়া কাটিয়া

জীবরাই যে আবার মানুষের সঙ্গে নামানুপ রসিকতা করিতে পারে, ইহা শুনিয়া আমাদের

অত্যন্ত কৌতূহল বোধ হইত। অবশ্য মানুষের সঙ্গে বাঘের ঘনিষ্ঠতা হওয়া যে অসম্ভব তাহা আমরা মনে করিতাম না। ঠাকুরমা'র মুখে শুনিয়াছিলাম, একদা একটা নিরীহ বাঘ এক ব্রাহ্মণীর কিছু কাজ করিয়া দিয়া তাহার কন্যার পাণিপীড়নের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিল, কিন্তু মনুষ্যকন্যার সঙ্গ বাঘের ভাগ্যে বেশীদিন সহিল না. সে অচিরে কর্মগুণে শ্যালক হস্তে নিহত হইল। স্বাদশ শার্দুলের শৌর্যের বিবরণ শুনিবার জন্য আপনারা নিশ্চয়ই ধ্যাস্ত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় ব্যাঘ্রবিক্রম বর্ণনা করিতে পল্লীকবি শার্দুল বিক্রীড়িত ছন্দের ব্যবহার করেন নাই।

হাটিয়া ওঠে রে হাটিয়া ওঠে চাপিল পায়
যাবত গিরিরে যাবত গিরি চেতন পায়
চেতন পাইয়ারে চেতন পাইয়া না করে রাও
সুন্দর বুনিয়ারে সুন্দর বুনিয়া বাঘের ছাও
হাম্মুর হাম্মুররে রে হাম্মুর হুম্মুর করে রাও
আর বাঘরে আর বাঘ (রাঙ্গিয়া) রাইঙ্গা
ঘর ফেলাইলরে ঘর ফেলাইল (ভাঙ্গিয়া) ভাইঙ্গা
আর বাঘরে আর বাঘ চৈতা
বাওনের নিলরে বাওনের নিল পৈতা
আর বাঘরে আর বাঘ হৈচৈ
গোয়াল মারিয়ারে গোয়াল মারিয়া খাইল দৈ
আর বাঘেররে আর বাঘের হাতে পিঠা
মোরে এট্টুরে মোরে এট্টু চিতৈ পিঠা
আর বাঘেররে আর বাঘের চক্ষে কেতর
গাং দিঘালরে গাং দিঘাল দিল সাতর
আর বাঘেররে আর বাঘের গলায় ব্যাত
পোলা বিয়ায়রে পোলা বিয়ায় ক্যাত ক্যাত
আর বাঘরে আর বাঘ হিজল গাছে
মুতিয়া দিলরে মুতিয়া দিল ভাজার মাছে
আর বাঘেররে আর বাঘের পাছায় গু
মোরে এট্টুরে মোরে এট্টু তামাখু
আর বাঘরে আর বাঘ মদনা
সেখের নিলরে সেখের নিল বদনা
আর বাঘেররে আর বাঘের কপালে সিন্দুর
পোলা বিয়ায় রে পোলা বিয়ায় বামিয়া ইন্দুর
আর বাঘরে আর বাঘের হাতে খড়ি
শোন সবেরে বারো বাঘের লেখাপড়ি।

এগারটি বাঘের হিসাব পাওয়া গেল! একটির কথা এখন আর মনে পড়িতেছে না। সেকালে ইহাদের পৈতা, বদনা প্রভৃতি অপহরণ-মূলক নির্দোষ ও অহিংস রসিকতার কথা শুনিতে খুবই ভাল লাগিত; বিশেষতঃ ভাজার মাছ নষ্ট করিবার প্রসঙ্গে হাস্য সম্বরণ করিতে বোধ হয় ছোট-বড় কোন শ্রোতাই পারিত না। আর ব্যাঘ্রের নেংটি ইন্দুর প্রসবের চেয়ে কৌতুককর ব্যাপার কি হইতে পারে?

আমাদের ছেলেবেলায় একবার শুনিয়াছিলাম দেশে একটা মানুষ বাঘ আসিয়াছে। মন্ত্রবলে সে নাকি আপনার নরদেহ ব্যাঘ্রদেহে পরিণত করিতে পারিত এবং অবয়বের পরিবর্তন হইলেও সে মনুষ্যের বুদ্ধি ও মনোভাব হারাইত না। স্ত্রীর নিকট এই গুহ্য কথা প্রকাশ করিয়াই তাহার বিপদ ঘটিল। স্বামীর ব্যাঘ্ররূপ দর্শনের জন্য মহিলাটি বিশেষ আগ্রহ থাকিলেও যে মন্ত্রপূত বা সিঞ্চনে আবার নরদেহ লাভের কথা, সেই জলপ

তাহার ভীতি-কম্পিত হাত হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল, তিনিও ঊর্ধশ্বাসে স্থান ত্যাগ করিলেন। স্বামী বেচারা কয়েক দিন উপবাসী থাকিয়া শেষে নিষিদ্ধ মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে বাধ্য হইল। সুতরাং তাহার গুরুদেব আসিয়াও আর তাহাকে মানুষ করিতে পারিলেন না। এই গল্প সত্য কি না জানি না, তবে আমাদের গ্রামের এক রসিক কবি যে পরে বাঘের লেখাপড়ির মধ্যে স্বগ্রামবাসী গুটিকয়েক মানুষকেও স্থান দিয়াছিলেন, তাহা আমার মনে আছে। তাহার গান এখানে উদ্ধৃত করিলাম না। কারণ, এতদিন পরে কতকগুলি বিস্মৃত কুৎসার পুনরাবৃত্তি করা সংগত বোধ করি না। মোট কথা, বারো বাঘের গানের মধ্যে কেবল পশুর কু-কীর্তি নহ, মানুষের স্খলন-পতনের কথাও স্থান পাইত। নাবালকদিগের সম্পত্তিতে এইরূপে পরিণত বয়স্কেরা অনধিকার প্রবেশ করিতেন।

এইবার গান ও ভিক্ষার প্রসংগ ছাড়িয়া পূজার ব্যাপার আরম্ভ করা যাউক। ভিক্ষালব্ধ সামগ্রীতে বাস্তু দেবীর পূজা হইত পৌষ সংক্রান্তির দিন। গৃহস্থবাড়ীর পূজার জন্য একটি মাটির বেদী নির্মাণ করিয়া তাহার উপর কয়েকখানা কাফুলার কচা (জিওল গাছের ডাল) পোতা হইত। প্রত্যেক কচার নীচে থাকিত তণ্ডুল চূর্ণমণ্ডিত এক-একটি মৃৎ-গোলক। পুরোহিত কি মন্ত্র পাঠ করিতেন, তাহা তিনিই জানেন। আমরা ছুটিতাম খালের ধারে বারোয়ারী পূজার খোলায়। সেখানে পূজার বেদীতে জিওলের ডাল ও মৃৎ-গোলকের সম্মুখে এক দেবী মূর্তি থাকিতেন। তিনি হেমাঙ্গিনী, চতুর্ভুজা। কিন্তু ব্যাঘ্র বলিয়া পরিচিত তাহার বাহনটি যে কোন্ জীব, তাহা জীবতত্ত্ববিদেরা জানিলেও জানিতে পারেন। দেহ তাহার কৃশ, মুখাকৃতিতে ব্যাঘ্র ও হায়েনার প্রকৃতিবিরুদ্ধ মিশ্রণ, গায়ের রঙ গাঢ় চকোলেট বর্ণ—তাহাতে হলুদ বর্ণের ফোঁটা। হয়ত কোন বিস্মৃত যুগে আমাদের আদিম পূর্বপুরুষগণের আমলে বরিশালের বনে-জংগলে এই জাতীয় একপ্রকার বাঘ ছিল, এখন সভ্যতার প্রসারের সংগে তাহাদের বংশ লোপ হইয়াছে। দেবী মূর্তি আসিতেন কুমারের বাড়ী হইতে। দেবীর উভয় পার্শ্বে বিরাট ব্যাঘ্র-দম্পতির মৃন্ময় মূর্তি পল্লীবাসীদিগের অশিক্ষিত শিল্পকৌশলের পরিচয় দিত। নিকটস্থ খালের মাটি দিয়াই বাঘ ও বাঘিনী নির্মাণ করা হইত। উভয়েই থাবা পাতিয়া করাল দংষ্ট্রা বিকশিত করিয়া আমাদের ভীতির সঞ্চার করিত। বাঘিনীর পশ্চাতে থাকিত সদ্য প্রসূত এক শাবক। তাহারই অদূরে খাল হইতে অর্ধোত্থিত এক বিকট কুম্ভীরের মূর্তি। হোগলার পাতা দিয়া তাহার গায়ের কাটা রচনা করা হইয়াছে।

একবারের পূজার কথা আমার বেশ মনে আছে। পূজা শেষ হইয়াছে। আরতির বাদ্য বাজিয়া উঠিল। আর সেই বাজনার তালে তালে ধুনুচি হাতে করিয়া নাচিতে লাগিল। আর সেই সময় দশ-বারজনে মিলিয়া আরম্ভ করিল অদ্ভুতনামা দেবদেবীগণের আবাহন গীতি,—

ওমা হড়ক ডালালো
বারো দেবতা লইয়া মা তুই খেইরে ওলালো
গাভুর ওলন লইয়া মা তুই খেইরে ওলালো।
মোচরা সিংগ লইয়া মা তুই খেইরে ওলালো।

তারপর স্বর্গের হাড়িকে নির্দেশ—

স্বর্গের হাড়িয়া হাড়িয়া হাড়িয়ারে
মণ্ডে লামিয়া খোলা ঝাট দে
গাভুর ডলন খাইবেন পূজা খোলা ঝাট দে।

গান ও বাজনার সংগে হারাণ ভদ্র নাচিতেছিল। হঠাৎ দেখিলাম তাহার তাল ভংগ হইতেছে, মানুষের নৃত্য ব্যাঘ্র-ঝম্পনে পরিণত হইয়াছে। জনতার মধ্য হইতে হঠাৎ একজন অগ্রসর হইয়া বার বার তাহার মাথায় হয়ত-বা মন্ত্রপূত ধূলি নিক্ষেপই করিল। কিছুক্ষণ পরেই তাহার ক্লান্তদেহ মাটিতে এলাইয়া পড়িল। হারাণের দেহে দেবতার ভর হইয়াছে। বর্ষীয়ানেরা তাহাকে বৎসরের ফলাফল জিজ্ঞাসা করিলেন, জড়িত কণ্ঠের উত্তর আমাদের কর্ণগোচর হয় নাই; সুতরাং তাহার কথা বলিতে পারিব না। হারাণের মোহনিদ্রা ভংগের পর পূজা শেষ হইল। সকলে বাতাসা প্রসাদ পাইয়া ঘরে ফিরিলাম।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই বাস্তু দেবী কে? ইহার ধ্যান-মন্ত্র আমার জানা নাই। কিন্তু হড়ক ডালী নাম্নী যে মহাদেবীকে বারোটি অনুচর লইয়া খোলায় নামিতে অনুরোধ করা হইল, তিনি যে ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু, রুদ্রের সমগোত্রীয় নহেন তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমরা শ্রদ্ধে বাস্তু পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন করি। পৌষে সংক্রান্তির অপরাহ্ণে অন্যান্য উৎসবের মধ্যে যে অস্মদেরই পরিকল্পিত এক বাস্তু দেবীর আরাধনা করিব, তাহাতে আর বিচিত্র কি? বরিশালে এক সময় জলে কুমীর ও ডাঙ্গায় বাঘ থাকিত। ব্যাঘ্র ও নক্রসংকুল অরণ্য দেশে মানুষের বসতি স্থাপনে দেবতার অনুগ্রহ প্রয়োজন হইয়াছিল বই কি? তাই এই দেবী শ্বাপদ বাহিনী, শার্দূল ও কুম্ভীর সংগিনী এতটুকু অনুমান করিতে ক্লেশ হয় না। কিন্তু ঐ হড়ক ডালি, ঐ গাভুর ডলন, মোচরা সিংহ ডলন, (বারো দেবতার মধ্যে এই দুইজনেরই কথা স্মরণ আছে অপর নামগুলি মনে নাই) ইহারা কাহারা? বেদে পুরাণে



"অন্তরে মোর বৈরাগী গায়"

ফটোশিল্পী—বি কে সিংহ

হাদের নাম পাওয়া যাইবে না, এখনকার হ্মণেরা হয়ত প্রয়োজনের খাতিরে ইহাদের পূজামন্ত্র রচনা করিয়া থাকিবেন, কিন্তু সেই ন্ত্রের দ্বারা কি ইহাদের জাতি-গোত্র নির্ণয় রা যাইবে। ছেলেবেলায় পত্রাবলী পূজার কথা শুনিতাম। পূজা হইত গভীর রাত্রে, সাধারণের উপস্থিতি সেখানে একান্তই নিষিদ্ধ ছিল। পূজার উপচারও ছিল একটু অন্য রকমের—হাঁসপোড়া, শোলপোড়া দিয়া এই দেবী ও তাহার অনুচর-অনুচরীদিগকে ভোগ দেওয়া হইত। ভোগ দিতেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত নহে,—অন্ত্যজ অস্পৃশ্য ভুঁইমালীরা। এই পূজা উপলক্ষে নৃত্যের ব্যবস্থা ছিল। নর্তকেরা সর্বদেহে তণ্ডুল-চূর্ণ মাখিত, তাহাদের অঙ্গ-ভঙ্গী, নৃত্যরীতি সর্বদা শ্লীলতাসম্মত হইত না বলিয়া আমরা, বালকের দল সেই নৃত্যসভায় (ঢঙের জায়গা) স্থান পাইতাম না। শুনিয়াছি পত্রাবলীর সঙ্গে যাহারা হাঁস-পোড়া খাইবার নিমন্ত্রণ পাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে গাম্ভুর ডলন ও মোচরা সিংহ অন্যতম। বাস্তু দেবীর সঙ্গে হডক ডালির ও পত্রাবলীর সম্বন্ধ কি? বাস্তু দেবী ও পত্রাবলী সংস্কৃত নাম, কিন্তু হডক ডালির সংস্কৃত রূপ আবিষ্কারের চেষ্টা নিতান্তই দুঃসাহসের কাজ হইবে। ছেলেবেলায় ঘূর্ণীবায়ু উঠিলে আমাদিগকে ভয় দেখান হইত ঐ গাভুর ডলন আসিতেছে, সব ডলিয়া মলিয়া একাকার করিয়া দিবে, পালা, পালা!

গাভুর ডলন তাহা হইলে ঘূর্ণী বাতাসের দেবতা অথবা দানব, কারণ তাহার আচরণে, আহারে-বিহারে দেব-ভাবের একান্ত অভাব। মোচরা সিংহও তাহারই দোসর। একটি হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত মেয়ের চিকিৎসা করিতে

আসিয়া এক মুসলমান রোজা বলিয়াছিলেন, ইহার উপর মোচরা সিংহের ভর হইয়াছে। বাঘের গানের সঙ্গে অপর যে দুইটি গান গাওয়া হইত, তাহাতে কুলাইর নাম পাই। ব্রাহ্মণেরা ইহাকেও চণ্ডীরই রূপান্তর বলিয়া থাকেন। মেয়েরা এখন করেন কিনা জানি না, আমাদের ছেলে বেলায় খাড়া কুলাই, বৈঠা কুলাইর ব্রত করিতেন, তখন মাটিতে চাউল গোলা, কালি ও সিন্দুর দিয়া আলপনার পদ্ধতিতে দুইটি বাঘ আঁকা হইত। এই বাঘেদের গায়ে সাদা চতুষ্কোণ রেখার মধ্যে লাল ও কালো ফোটা থাকিত। তাহা হইলে কি মনে করা অসঙ্গত হইবে যে, বাঙ্গলা দেশে প্রথম বসতি স্থাপনের সময় বাঘ, কুমীর, ঝড় বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমাদের ভীতি-বিহ্বল পূর্বপুরুষেরা পোড়া মাছ ও পোড়া মাংসের উপচারে যে অপদেবী ও অপদেবতা-দিগের আরাধনা করিতেন, আজিও তাহারা পল্লীবাসীদিগের নিকট হইতে পূজা আদায় করিয়া আসিতেছেন। সাধারণ পূজকের স্থান আজ ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা অধিকার করিয়াছেন, কিন্তু সংস্কৃত মন্ত্র এখনও প্রাকৃতকে একেবারে বেদখল করিতে পারে নাই। তাই ব্রাহ্মণের পূজামন্ত্র শেষ হইলেই অব্রাহ্মণের আবাহন সঙ্গীত আরম্ভ হয়—হুডক ডালী, গাভুর ডলন ও মোচরা সিংহের উদ্দেশে। তাই ভিক্ষার গানে লক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে সঙ্গে কুলাইর নাম শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারিত হয়। কেননা একদা যিনি ছিলেন হুডক ডালী বা কুলাই তিনিই আজ বাস্তুদেবী ও পদ্মবলী! দেবীর বাহনকে আদিম মানুষের অপটু হাত যে রূপ যে বর্ণ দিয়াছিল আধুনিক কুম্ভকার তাহার অন্যথা করিতে পারে নাই। ব্রাহ্মণ প্রদত্ত আত-পান্নের সহিত দেবীর পরিচয় ছিল না বলিয়াই আজিও অন্ত্যজ পূজারী তাহাকে শূলদগ্ধ মৎস্য মাংসের ভোগ দিয়া থাকে, কারণ যে যুগে দেবীর মাহাত্ম্য প্রথম প্রচারিত হয়, সে যুগের প্রাক প্রণালী এ যুগের মত উন্নতি ও বৈচিত্র্য লাভ করে নাই।

হয়ত ইন্দ্র ও রুদ্রের মত বাস্তুদেবীরূপিণী হুডক ডালীও আমাদের পূজামণ্ডপ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন, হয়ত গাভুর ডলন এখন আর শিশুচিত্তে বিস্ময়মিশ্রিত আতঙ্কের সঞ্চার করিতে পারে না, হয়ত বহু চেষ্টায়ও মোচরা সিংহ কোন কিশোর বা কিশোরীর দেহে আশ্রয় পাইবে না। তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু পল্লীগ্রামে যদি পৌষের রাত্রে কুলাইর আবাহন, নলিয়ার গান ও "বারো বাঘের লেখা-পড়ি" আর শোনা না যায়, তাহা হইলে কি কোন দিক দিয়াই বিন্দুমাত্রও লোকসান হইবে না?

ভারতীয় চিত্রে নারী

শ্রীভবানীচরণ লাহা



আদি হিন্দু সমাজে নারী যে উন্নত স্থান অধিকার করতেন, ভারতের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদের স্তোত্রের মধ্যেই তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। অত্রিবংশীয়া অভিজাত মহিলা বিশ্বম্ভরা যখন অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে দাঁড়িয়ে অগ্নির স্তব করছেন তখন কি সুন্দর ছবিই আমাদের কল্পনার চক্ষে ভেসে উঠে। তিনি স্বরচিত স্তোত্রে অগ্নিদেবকে সম্বোধন করে বলেন, "হে অগ্নি! পারস্পরিক হৃদয়ের মিলন ও সংযমের দ্বারা তুমি স্বামী-স্ত্রীর বিবাহিত জীবন সুখময় কর এবং আমাদের প্রতি যাহারা বৈরভাবাপন্ন তাহাদের শক্তি ও উদ্যম দমন কর।"

রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্যে সেই যুগের গার্হস্থ্য জীবনের চরম সুখ ও পারস্পরিক মনের মিলনের যে সুন্দর চিত্র আমরা দেখতে পাই, তাহা অপেক্ষা অধিক মনোরম বা প্রাণস্পর্শী আর কোন কিছু হতে পারে না। মিসেস্ বেসাণ্টের ভাষায় বলতে হয় যে, "ভারতের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য দুইটিতে নারীত্বের যে সুন্দর রূপ ফুটে উঠেছে, অন্য কোন সাহিত্যে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, শক্তি, সৌন্দর্য ও যাহা কিছু মানবপ্রকৃতির অনুরক্ত তাহা একত্রিত করে সুনিপুণ হস্তে অঙ্কিত কয়েকটি নির্ভীক ও উদার রমণীমূর্তিতে ইহা আত্মপ্রকাশ করেছে।" স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে এইরূপ উচ্চ ধারণা পোষণ ক'রে, ভারতের



মাতা ও শিশু (অজন্তার ১৭ নং গুহার ভিত্তিচিত্র। ভগবান বুদ্ধের প্রতি শিশুর মৃত্তিকা অঞ্জলি বলিয়া মসিও ফুসে কর্তৃক সনাক্ত।)

ভাস্করেরা ও চিত্রশিল্পীরা নারীত্বের সঠিক রূপ প্রদর্শন করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। আদি ভারতীয় ভাস্কর্যে নারীকে বিভিন্ন চরিত্রে মহান্ রূপে অঙ্কিত করা হয়েছে। ভারহুত, সাঁচী, অমরাবতী, মথুরা, সারনাথ এবং পরবর্তীকালের বহুসংখ্যক ক্ষোদিত মূর্তিতে প্রকৃতির পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি, সৌন্দর্যের প্রতীক, মানুষের প্রেয়সী, স্ত্রী ও মাতৃরূপে এবং জীবন-নাট্যের বিভিন্ন কার্যে নিয়োজিত নারীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। নারীর প্রতি ভারতের আদি শিল্পীদের শ্রদ্ধা-নিবেদনের নিদর্শন খুব অল্পই দেখতে পাওয়া যায়। অজন্তা গুহার বৌদ্ধ মন্দিরের প্রতিভাসম্পন্ন প্রাচীর চিত্রের পূর্বের কয়েকটি আদিম প্রাগৈতিহাসিক চিত্র ভিন্ন, মৌর্য ও সুঙ্গরাজগণের পূর্ববর্তীকালের চিত্রশিল্পের সকল চিহ্নই কালের ধ্বংসের স্রোতে লোপ পেয়েছে।

অজন্তার চিত্রকলাকে স্ত্রী জাতির একটি সম্পূর্ণ মহাকাব্য বলে অভিহিত করা যায়। শিল্পী এখানে অসামান্য জ্ঞান ও সমবেদনার সহিত পার্থিব জগতের জীবনযাত্রা প্রণালী নিখুঁতভাবে অঙ্কিত করেছেন। এই সকল চিত্রে নারীর বাহ্যিক গঠন সৌন্দর্য ও তাহার পরমাত্মিক মনোভাব উভয়ই সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে। আমরা এখানে নারীকে সকল প্রকার অঙ্গভঙ্গীতে ও পরম রমণীয় অলঙ্কারে ভূষিত দেখতে পাই, তথাপি তার নিজ দেহসৌন্দর্যের নিকট আর সকল সৌন্দর্যই ম্লান হয়ে গেছে। কোথাও বা তাকে দেখি গল্পগুজবে রত, কোথাও বা প্রেমালিঙ্গনে রোমাঞ্চিত, কখনও দেখি হাস্য-রঞ্জিত মুখ কখনও বা বিরহে শোকাতুরা। কখনও বিশ্রামে শায়িত আবার কখনও নৃত্যের ভঙ্গীতে, কোথাও বা উদাসীন দর্শক-মাত্র, আবার কখনও কোন দৃশ্যে উত্তেজিত





শ্রীরাগ (আদিম রাজপুত চিত্র)

অভিনেত্রীর ভূমিকায় তাকে দেখা যায়। কোথাও বা নিস্তেজ রমণী মূর্তি, কোথাও মানসিক উচ্ছ্বাসে কম্পিত, আবার কখনও আমরা তাকে তার দুর্বলতার শাস্তি ভোগ করতেও দেখতে পাই। কখনও তাকে দেখি, তাহ গৃহের নিভৃত কোণে বেশবিন্যাসে নিযুক্ত, আবার কখনও দেখি তার উপস্থিতিতে রাজসভা, উৎসব অথবা রাজকীয় শোভাযাত্রার সৌন্দর্যবৃদ্ধি হয়েছে। কোথাও তাকে পণ্ডিতদের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করতে অথবা দেবতার আরাধনায় মগ্ন থাকতে দেখি। কখনও পতিব্রতা স্ত্রী আবার কখনও স্নেহময়ী মাতৃরূপে তাকে দেখে আমরা সত্যই মুগ্ধ হই। অজন্তার অসামান্য রসজ্ঞ চিত্রশিল্পীরা গুহাগাত্রে নারীর যে সুন্দর রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন, তার তুলনা নেই বললে অত্যুক্তি হবে না। আর কোথায় নারীকে মন্ত্র-মুগ্ধকারক ভঙ্গী ও ভাবের অসীম বিভিন্নতায় এরূপ সুন্দরভাবে অঙ্কিত করা হয়েছে? অজন্তাতেই আমরা নারীত্বের পূর্ণ গৌরবের বিকাশ দেখতে পাই যা এর পূর্বে বা পরবর্তীকালে কোন শিল্পীর তুলিকাতে ফুটে ওঠেনি। সাঁচীর ন্যায় অজন্তা থেকেও আমরা তৎকালীন যুগসভ্যতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাই, এ বিষয় আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তৎকালীন সমাজজীবন এবং সামাজিক ক্রিয়াকর্মে নারী যে অংশ গ্রহণ করতো তার পূর্ণাঙ্গ চিত্র এখানে আমরা দেখতে পাই। সমাজের সর্বোচ্চ স্তর থেকে নিম্নতর স্তরের জীবন এই চিত্রগুলিতে নিখুঁতভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। সামাজিক পদমর্যাদা অনুযায়ী পুরুষ ও নারী মূর্তি উভয়ই বিভিন্ন আয়তনে অঙ্কিত করা হয়েছে। উপরন্তু জাতিভেদ এবং মানবচরিত্র, বুদ্ধি-বৃত্তি অথবা সামাজিক পদের পার্থক্য বিভিন্ন বর্ণে সাঙ্কেতিক উপায়ে চিহ্নিত হয়েছে, এইরূপে ভৃত্যকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণে এবং বিদেশীয়দের বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত করা হয়েছে। চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিতে নারীর সম্বন্ধেও এই একই প্রথা অবলম্বন করা হয়েছে।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য হতে আমরা জানতে পারি যে, চিত্রকলা চৌষট্টি কলার অগ্রণী বলে সেকালে শ্রদ্ধা লাভ করতো এবং যুবক যুবতীদের চিত্রশিল্পের দক্ষতাকে শিক্ষার উপযুক্ত মহৎ বিদ্যা ব'লে বিবেচিত হত। আমি পূর্বেই বলেছি যে, সম্ভ্রান্ত বংশীয়া নারী কেবলমাত্র নিজের চিত্ত-বিনোদনের জন্য চিত্রশিল্পের চর্চা করতেন, কিন্তু গণিকারা নিছক পুরুষের মন ভোলাবার উদ্দেশ্যে নৃত্যগীত প্রভৃতি অন্যান্য কলায় পারদর্শিতা লাভ করতো ও সেই একই উদ্দেশ্যে চিত্রাঙ্কন বিদ্যা শিক্ষা করতো। প্রতিকৃতিঅঙ্কনে রাজকুমারীগণ ও তাঁহাদের সঙ্গিণীদের দক্ষতা সম্বন্ধে আমরা অনেকবার পড়েছি। সংস্কৃত সাহিত্যের কয়েকটি অমর উপন্যাসে এইরূপ প্রতিকৃতি একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে। পুরাতন গ্রন্থে চিত্রকলার অসংখ্য উল্লেখ দেখে মনে হয় যে, প্রথম যুগে নিশ্চয় বহু চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল। কিন্তু অজন্তা, বাগ্, এলোরা প্রভৃতি কয়েকটি গুহাচিত্রের ধ্বংসাবশেষ ভিন্ন আর সকল চিত্রই কালে লোপ পেয়েছে। দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি মধ্যযুগীয় মন্দিরের প্রাচীর চিত্রের ধ্বংসাবশেষ এখনও রক্ষিত আছে, এর মধ্যে সমসাময়িক সামাজিক জীবনে নারী কত বড় অংশ গ্রহণ করত এবং তারা কিরূপে শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করতো তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

ভারতের অমর কাব্যসমূহ, যথা, কালি-দাসের নাটক, নিশ্চয় অনেক শিল্পীর অনুপ্রেরণার উৎস ছিল। আমরা এখন কাঙ্গড়া শিল্পীদের অঙ্কিত কুমারসম্ভবের একটি চিত্র সংগ্রহ এবং অন্যান্য কাব্য ও নাটকের বহু চিত্রের অধিকারী, কিন্তু যদি বাগ্‌গুহার সুনিপুণ শিল্পীদের অথবা মোল্লারামের ন্যায় শিল্পীর অঙ্কিত শকুন্তলা নাটকের অধিকারী হতাম তাহা হ'লে কি হ'ত? কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেরূপ কোন চিত্রই আজ পাওয়া যায় না। বাঙ্গলার আধুনিক চিত্র-শিল্পীরা শকুন্তলাকে চিত্রে রূপায়িত করতে প্রয়াস পেয়েছেন এবং এ'দের মধ্যে ক্ষিতীন্দ্র-

নাথ মজুমদার মহাশয়ের অঙ্কিত কালিদাসের প্রখ্যাত নায়িকার চিত্রটি বিশেষ আনন্দের সঙ্গে আমাদের মনে আসে।

মোগল চিত্রকরগণ যদিও রাজদরবার এবং বাদশাহ ও যোদ্ধাদের যুদ্ধক্ষেত্রের বীরত্বকে মহিমান্বিত করার জন্যই নিযুক্ত ছিলেন, তথাপি আমরা তাঁদের নিকট হ'তে বাদশাহ ও দরবারের অভিজাত ব্যক্তিদের বহুসংখ্যক প্রতিকৃতি সম্পত্তিরূপে লাভ করেছি। কিন্তু ইতিহাসের নায়িকাদের যে চিত্রগুলি মোগল শিল্পীরা অঙ্কিত করেছেন তাকে বাস্তব প্রতিকৃতি বললে ভুল হয়, এমন কি নুরজাহান বা মমতাজমহলের ন্যায় সাম্রাজ্ঞীর প্রতিকৃতি নিছক কল্পনাপ্রসূত কারণ ইহা বাস্তব জীবন হ'তে গৃহীত নয়। সম্রাট আকবরের জন্য তাঁর দরবারের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা সম্পূর্ণ মহাভারতটিকে চিত্রিত করেন, ইহাই রজমনামা নামে খ্যাত। বর্তমানে ইহা জয়পুরের মহারাজের সম্পত্তি। ইহার মধ্যে মহাকাব্যের নায়িকাদের অনেকগুলি সুদৃশ্য ও উৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত আছে।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, ভারতীয় চিত্রকলা নারীকে প্রেয়সী কুমারী, স্ত্রী ও মাতৃরূপে অঙ্কিত করে। শৃঙ্গার কাব্য অনুযায়ী নায়িকাদের অষ্টনায়িকা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় এবং শিল্পীরা রেখা ও বর্ণের সাহায্যে এই অষ্টনায়িকাদের রূপ দান করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। কাঙড়া শিল্পীদের নিকট নায়িকাদের চিত্রঅঙ্কন বিশেষ প্রিয় ছিল এবং তাঁদের চিত্রে নারীকে স্ত্রীসুলভ সৌন্দর্যের আদর্শরূপে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেইজন্যই কাঙড়া চিত্র এত বেশী চিত্তাকর্ষক। গাড়োয়ালের শিল্পী মোল্লারামের অঙ্কিত অষ্টনায়িকাদের একটি উৎকৃষ্ট চিত্র-সমষ্টি পাওয়া যায়। অন্যদিকে রাজস্থানী চিত্রশিল্পীরাও নারীকে কেন্দ্র করে তাঁদের চিত্র অঙ্কন করতেন। রাগমালার চিত্রগুলি নারীকে কেন্দ্র করেই অঙ্কিত হয়েছে, এতে নারীই সুরের ছন্দকে আশ্চর্যরূপে একত্রে সন্নিবিষ্ট করেছেন। রাজস্থানী শিল্পী-অঙ্কিত রাগ-রাগিণীর বহুসংখ্যক চিত্র পাওয়া যায়, এমন কি মোগল চিত্রকর-অঙ্কিত তদ্রূপ কয়েকটি রাগ-রাগিণীও দেখা যায়। কিন্তু শিল্পনৈপুণ্যে প্রাচীন রাজস্থানী রাগিণী চিত্রগুলিই সর্বাপেক্ষা সজীব, সুন্দর ও মর্মস্পর্শী।

নারীজীবনের সকল ক্রিয়াকর্মই রাজপুত শিল্পীদের দ্বারা চিত্রিত হয়েছে; এতে নারীকে রন্ধন প্রভৃতি গৃহস্থালীর কার্যে নিযুক্ত এবং বিশ্রাম সময়ে বিচ্ছেদের শূন্যতাকে জয় করার জন্য অনুপস্থিত দূরে প্রণয়ীকে পত্র লেখায় নিয়োজিত থাকতে দেখি। অনেক



মোল্লারাম অঙ্কিত শিব-পার্বতী (বস্টন মিউজিয়মের সৌজন্যে)

চিত্রে নারীকে খেলাধুলায় মত্ত, এমন কি নৃত্যে মগ্ন অবস্থাতেও দেখি, আবার কখনও দেখি তাঁর দাসীরা তাঁর অবসর সময়টি সঙ্গীতমুখর করে তুলেছে। চিত্রকলা হচ্ছে সংগীত ও উপকথার অনুরূপ এবং ইহা কবির কাল্পনিক দৃষ্টিশক্তিকে অনবচ্ছিন্ন রূপ দান করে। জয়দেব হতে আরম্ভ ক'রে পরবর্তীকালের বৈষ্ণব কবিরাও শিল্পীদের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। হিমালয় উপত্যকার বাশোলীর শিল্পীরা গীত-গোবিন্দের বহু মনোরম চিত্র অঙ্কন করেছেন এবং বাশোলী শিল্পীদের অঙ্কিত ভানু দত্তের রসমঞ্জরীর একটি সুন্দর চিত্র-সমষ্টিও আমরা পাই।

রামায়ণ, মহাভারত ও রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক শিল্পীকে অনুপ্রেরণা দান করেছিল। নল ও দময়ন্তীর উপন্যাস একটি সুন্দর ধারাবাহিক কাঙড়া চিত্র-সমষ্টিকে অনুপ্রাণিত করেছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঔপন্যাসিক রূপকথা ও জনপ্রিয় গাথাগুলি চিত্রিত হয়েছিল। মোগল শিল্পীরা রাজবাহাদুর ও রূপমতীর ঐতিহাসিক কিংবদন্তীকে চিত্রে রূপ দেন। মধু মালতীর, সোহনী ও মাইওয়ালের, হীর ও রণজার এবং আরও অন্যান্য পুরাতন প্রণয়-কাহিনী রাজপুত চিত্রকলার বিষয় বস্তু ছিল। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী কাঙড়া শিল্পীদের

একটি অতি প্রিয় পুস্তক ছিল এবং দেবীর বীরত্বের অনেকগুলি অতীব সুন্দর চিত্রও তাঁরা অঙ্কিত করেন। মোল্লারাম অঙ্কিত 'শিব ও পার্বতী' এবং 'পাবতীর যোগ সাধনা' হচ্ছে তাঁর সৃষ্ট উৎকৃষ্ট চিত্রগুলির অন্তর্গত। সতীর দেহত্যাগের জনপ্রিয় গল্প হতে বাঙলার পটুয়ারা তাদের চিত্রাঙ্কনের অনুপ্রেরণা লাভ করতো এবং এই গল্পটিই আমাদের প্রিয় নন্দলাল বসু মহাশয়ের একটি অমর চিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে। রাজপুত শিল্পীদের চিত্রে গঙ্গার মর্ত্যে অবতরণ একটি প্রিয় বিষয়বস্তু ছিল, তাঁরা মহাবল্লীপুরমের বিরাট প্রাতমূর্তি অপেক্ষা এই চিত্রগুলি অনেক সরল ও স্বাভাবিকরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। মহাবল্লীপুরম, পৃথিবীর ভাস্কর্যে একটি বিস্ময়জনক অবদান।

কালীঘাটের লোকশিল্পীরা অনেক সুন্দর রেখাচিত্র রেখে গেছেন এবং ইহার মধ্যে নারী চিত্রগুলিই বিশেষ মনোরম। এই লোকশিল্পীরা প্রকৃত বঙ্গ নারীর চিত্রই অঙ্কিত করেছেন, যাঁদের আমরা দেখতে পাই।



অভিসারিকা (বস্টন মিউজিয়মের সৌজন্যে)

কাঙগড়া চিত্রের নারীর ন্যায় এ কাল্পনিক নয়। কালীঘাটের পটুয়াদের অঙ্কিত সামাজিক ব্যাঙ্গচিত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ তারা অতি চমৎকারভাবে তৎকালীন সমাজে চরিত্রের দুর্বলতা ও দুর্বৃত্ততাকে বিদ্রূপ ও উপহাস করেছে।



গীত-গোবিন্দের দৃশ্যপট (বাসোলি চিত্র)





রেলের গুদামের যিনি চার্জে ছিলেন, তাঁর বদলির হুকুম এল হঠাৎ। জরুরি হুকুম, টেলিগ্রামে। এক্ষুনি যেতে র. এই অবস্থায়। যেতে হবে বর্মায় না ফ্রিকায় বা আর কোনো দিগন্তরে। বলা বারণ।

নীচেকার লোক হচ্ছে পরিতোষ সরকার। কা চাকরির লোক। অন্য জায়গায় তলাকার রিতে কাজ করত, সেখানে 'লিয়েন' রেলে চাকরিতে ঢুকেছে। একটু বেশি টাকার স্বাদ বার জন্যে। কে না চায়! কে না চায় জীবনে তি করতে? আর, জীবনে উন্নতি করার নেই হচ্ছে অঙ্কের পিঠে শুধু শূন্য বাড়ানো।

পশ্চিমী না দক্ষিণী বোঝা যায় না। বুঝে কারও নেই।

নির্ভীক, বলিষ্ঠ, ত্বরান্বিত।

বললে, 'চার্জসিট নিয়ে এস।'

পরিতোষ কাঁচুমাচু মুখে বললে, 'তার আগে কটা মিলিয়ে নিলে হত।'

অত সময় নেই। গুমটি-ঘরে বসে চুপচাপ হারা দেবার কাজ নয় তার। তার কাজ আরো নেক বেশি বড়, অনেক বেশি জরুরি। আগে ঠ না রক্ষা পেলে ধান ফলবে কি করে?

হিসাবকিতাব বুঝসমুঝ করে যোগ-য়োগের পর ঠিকঠাক চার্জ নিতে গেলে ন্ততঃ তিন দিন। এক মুহূর্ত দেরি করবার র সময় নেই।

'যা হয় লিখে নিয়ে এস। আমি সই করে ব।'

পরিতোষ ফাঁপরে পড়ল। বললে, 'কত ন্তা—ক মণ—'

'যা আছে তাই ঠিক লিখে নিয়ে আসবে।' য় ধমকের মত শোনাল: 'এতে ভাববার কী াছে?'

পরিতোষ আপিসে এল। খাতা খুলে খলে, হাতে আছে কত। ঝড়তিপড়তি বাদ য়ে কত থাকবার কথা।

'এ তো এক ফ্যাসাদ হল।' হেডক্লার্ককে ডাকাল পরিতোষ। বললে, 'বলছে স্টক ভেরিফাই করবে না। অত সব গোনা-গাঁথার সময় নেই। বলছে, বসিয়ে নিয়ে এস ফিগার, সই করে দি। শেষকালে কি—'

হেডক্লার্ক রাখাল দাস। যাকে বলে, বেঁটে খেঁটে, গুরগুটে। চশমার সাঁকোটা ঠিক নাকের ডগার উপর এসে বসেছে। তাকায় চশমার রেলিঙ টপকে।

চশমার রেলিঙ টপকে রাখাল দাস অনেকক্ষণ শ্যেনদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

বললে, 'তা আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কেন?'

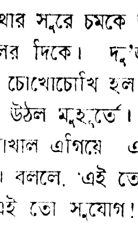
কথার সুরে চমকে উঠল পরিতোষ। তাকাল রাখালের দিকে। দু'জনের ক্ষুদ্র ও তীক্ষ্ন একটা চোখোচোখি হল। পরস্পরের মনের কথা জ্বলে উঠল মুহূর্তে।

রাখাল এগিয়ে এল পরিতোষের কানের কাছে। বললে, 'এই তো সুযোগ।'

এই তো সুযোগ! পরিতোষের বুকের ভিতরটা দুরদুর করতে লাগল।

এমনি একটা সুযোগের জন্যে দৈবের ণ। প্রার্থনা করেছে পরিতোষ। যাতে এ অঙ্ক এক ঘুমের পর, চক্ষের এক পলকে র করতে হয়ে যেতে পারে। এমনি কত লো রাতারাতি। সংগ্রাম করেনি, স র হবে না।' শুধু সুযোগ মিলে গিয়ে আকাশফুটো। ছিল আঙুল, যাবে কি তাই

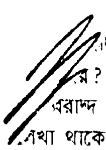
ছেড়ে দিলেই তো
.ব. লোকটার চলে
বাড়ানো চলবে না।
া। উঠানভরা জঙ্গল,
হাতল-ভাঙা চায়ের
ক দিন দাড়ি কামানো।'
স। দশ আনা ছ' আনা।
-কলমে। হাতে-হেতেরে
কার চালকে টাকায় নিয়ে



ট্যাঁক থেকে চলে এসেছে গেঁজেতে। ছিল তল ফুটো, হয়েছে আণ্ডিল। রই

সেই সুযোগ এসেছে পরিতোষের। ও বড় পুরুষেও যা আসে না। ই, ছত্রি-

চুরি করছে? কে না করছে জি ঠকাচ্ছে? কে না ঠকাচ্ছে এই বেপারীরা। যে পারছে সেই হাতাচ্ছে। ডেকে নিয়ে হাতাবার জন্যে। যার যে একবারে এত মাল সরহদ্দ। যে চোর নয় না। আস্তে-আস্তে, ত-কিস্তিতে নিতে হবে।



ধু।'

র? তেরপল আছে ঢাকা থাকবে। বরাদ্দ মাল, তার পরিমাণ পারমিটে লেখা থাকে লেখা থাকবে তেমনি। যারা আটকাবার, তারা পারমিট দেখেই ছেড়ে দেবে বেমালুম। কাঁটা নেই যে ওজন নেবে রাস্তায়। বস্তা ধরে যে গুণবে তার মজুরি দেবে কে? সিধে চলে যাবে আড়তে, তাদের গঞ্জ-গোলায়। খিড়কির দরজাতেই কালোবাজার বসবে। খালের মুখে ভিড়বে আবার হাটুরে নৌকা। মোটা দরে কিনে নেবে দালালেরা।'

না, ভয়ের কোনোই কারণ নেই। কোমল ও মসৃণ তাদের রাস্তা।

'কিন্তু,' সর্দার-মাঝি গলা নামিয়ে বললে, 'টাকা নিয়ে আসিনি যে সঙ্গে করে।'

গরম-গরম নগদ টাকা ছাড়া চলতে পারে না এ কারবার। এ হচ্ছে বাঁ হাত ডান হাত। ফেল কড়ি, মাখ তেল।

দু' হপ্তা পর আরেক শুক্কুরবার যখন মাঝিরা আসবে, তখন নিয়ে আসবে নোটের কেতা। প্রথম কিস্তি।

বেকড়ার দিনে মাল নেবার হুকুম নেই। রিভার-পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যাবে। পারমিটের আড়ালে তেরপলের নীচে রসিদের রক্ষাকবচ এঁটে ব্যূহভেদ করে বেরিয়ে যাওয়াই নিরাপদ।



চালের গুদামের যিনি চার্জে ছিলেন, তাঁর বদলির হুকুম এল হঠাৎ। জরুরি হুকুম, টেলিগ্রামে। এক্ষুনি যেতে হবে, এই অবস্থায়। যেতে হবে বর্মায় না আফ্রিকায় বা আর কোনো দিগন্তরে। বলা বারণ।

নীচেকার লোক হচ্ছে পরিতোষ সরকার। পাকা চাকরির লোক। অন্য জায়গায় তলাকার কুঠুরিতে কাজ করত, সেখানে 'লিয়েন' রেলে এ-চাকরিতে ঢুকেছে। একটু বেশি টাকার স্বাদ পাবার জন্যে। কে না চায়! কে না চায় জীবনে উন্নতি করতে? আর, জীবনে উন্নতি করার মানেই হচ্ছে অঙ্কের পিঠে শুধু শূন্য বাড়ানো।

পশ্চিমী না দক্ষিণী বোঝা যায় না। বুঝে দরকারও নেই।

নির্ভীক, বলিষ্ঠ, ত্বরান্বিত।

বললে, 'চার্জসিট নিয়ে এস।'

পরিতোষ কাঁচুমাচু মুখে বললে, 'তার আগে স্টকটা মিলিয়ে নিলে হত।'

অত সময় নেই। গুমটি-ঘরে বসে চুপচাপ পাহারা দেবার কাজ নয় তার। তার কাজ আরো অনেক বেশি বড়, অনেক বেশি জরুরি। আগে মাঠ না রক্ষা পেলে ধান ফলবে কি করে?

হিসাবকিতাব বুঝসমঝ করে যোগ-বিয়োগের পর ঠিকঠাক চার্জ নিতে গেলে অন্ততঃ তিন দিন। এক মুহূর্ত দেরি করবার তার সময় নেই।

'যা হয় লিখে নিয়ে এস। আমি সই করে দেব।'

পরিতোষ ফাঁপরে পড়ল। বললে, 'কত বস্তা—ক মণ—'

'যা আছে তাই ঠিক লিখে নিয়ে আসবে।' প্রায় ধমকের মত শোনাল: 'এতে ভাববার কী আছে?'

পরিতোষ আপিসে এল। খাতা খুলে দেখলে, হাতে আছে কত। ঝড়তিপড়তি বাদ দিয়ে কত থাকবার কথা।

'এ তো এক ফ্যাসাদ হল।' হেডক্লার্ককে ডাকাল পরিতোষ। বললে, 'বলছে স্টক ভেরিফাই করবে না। অত সব গোনা-গাঁথার সময় নেই। বলছে, বসিয়ে নিয়ে এস ফিগার, সই করে দি। শেষকালে কি—'

হেডক্লার্ক রাখাল দাস। যাকে বলে, বেঁটে খেঁটে গুরগুটে। চশমার সাঁকোটা ঠিক নাকের ডগার উপর এসে বসেছে। তাকায় চশমার রেলিঙ টপকে।

চশমার রেলিঙ টপকে রাখাল দাস অনেকক্ষণ শোনদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

বললে, 'তা আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কেন?'

কথার সুরে চমকে উঠল পরিতোষ। তাকাল রাখালের দিকে। দু'জনের ক্ষুদ্র ও তীক্ষ্ণ একটা চোখোচোখি হল। পরস্পরের মনের কথা জ্বলে উঠল মুহূর্তে।

রাখাল এগিয়ে এল পরিতোষের কানের কাছে। বললে, 'এই তো সুযোগ।'

এই তো সুযোগ! পরিতোষের বুকের ভিতরটা দুরদুর করতে লাগল।

এমনি একটা সুযোগের জন্যে দৈবের প্রার্থনা করেছে পরিতোষ। যাতে এ
এক ঘুমের পর, চক্ষের এক পলকে
হয়ে যেতে পারে। এমনি কত লো
রাতারাতি। সংগ্রাম করেনি, স
শুধু সুযোগ মিলে গিয়ে
আকাশফুটো। ছিল আঙুল,



ট্যাঁক থেকে চলে এসেছে গেঁজেতে। ছিল তল
ফুটো, হয়েছে আণ্ডিল।

সেই সুযোগ এসেছে পরিতোষের। পুরুষেও যা আসে না।

চুরি করছে? কে না করছে জি
ঠকাচ্ছে? কে না ঠকাচ্ছে এই
যে পারছে সেই হাতাচ্ছে।
হাতাবার জন্যে। যার যে
সরহদ্দ। যে চোর নয়



কি রাজি?

ব্যস্ত হচ্ছে। গাধার ছাপ পড়ছে তার পিঠের পর। টাকা হলেই টেক্কা, সাহেব-গোলাম সব পিছে-পিছে। বাপ-মা আত্মীয়স্বজন সবাই বলবে মানুষ হয়েছে ছেলেটা। সমাজ বলবে উপযুক্ত লোক, ডাকবে সভাপতিত্ব করতে।

যে বলছে, চুরি করছ, সে কী? যে বলছে, কাচ্ছ, এইটেই কি তার ঠকাবার মতলব নয়? যত চুরি করতে পারছে না বলেই তার রাগ আর তম্বি। সে কেন ঠকাতে পারল না তাই তার ঈর্ষা আর অভিশাপ।

পরিতোষ জামার হাতায় কপালের ঘাম মুছল। কোঁচা দিয়ে মুছল গলার ঘাম। আধ-গেলাশ জল খেল। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল ও মধ্যমা দিয়ে টিপে ধরল কপালের রগদুটো। থমটা ব্যথা-ব্যথা লাগল। কিন্তু, না, ছেড়ে গেছে।

না, ধরা পড়বে না। কি করে ধরা পড়বে? খ চার্জসিট।

রাখাল দাস চোখ মটকাল আরেকবার।

কত লোক মরে গেছে এক মুঠো ভাতের অভাবে। দু-একটা তেমনি মৃত্যু পরিতোষ দেখেছে তার চোখের উপর। বুকটা ফেটে গেছে। তখন যদি সাধ্য থাকত, সে খাওয়াত তাদেরকে। খাওয়াতে হলে অনেক উদ্বৃত্ত চাই। বাড়তি মুনাফা না পেলে সে লঙরখানা খুলবে কি করে? অঢেল না থাকলে করবে কি করে খয়রাতি?

কেউ নিচ্ছে ঘুষে, কেউ নিচ্ছে শুষে। কেউ নিচ্ছে হাত পেতে, কেউ কান মলে। কেউ খেয়ে, কেউ ছাঁদা বেঁধে। ডাইনে না পেলে বাঁয়ে। ভেড়ার গোয়ালে তাকে ঘোড়া হতে বলার মানে নেই। আমাকে ধরতে এসেছ? কিন্তু উনি? তিনি? তুমি নিজে?

চার্জসিটে পাঁচ শো বস্তা কম দেখাল পরিতোষ। সরল বিশ্বাসে ম্যানেজার তাতে সই করে দিলেন।

পাঁচ শো বস্তা, প্রায় দেড় হাজার মণ। চলতি দাম কত চালের? একটা বিরাট অঙ্ক করতে গেল পরিতোষ। মাথাটা রি-রি করতে লাগল।

'আর চাকরি করবার দরকার হবে না।' বললে রাখালদাস।

'কিন্তু চাকরি ছেড়ে দেয়া যাবে কি তাই বলে?'

'না, না, পাগল! চাকরি ছেড়ে দিলেই তো লোকে বলাবলি শুরু করবে, লোকটার চলে কিসে? হাল-চালও একটুও বাড়ানো চলবে না। রাখতে হবে সমান দৈন্যদশা। উঠানভরা জঙ্গল, ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়-জামা, হাতল-ভাঙা চায়ের কাপ। আর সাত দিনে এক দিন দাড়ি কামানো।'

বখরা ঠিক হয়ে গেল। দশ আনা ছ' আনা।

এখনো সব কাগজে-কলমে। হাতে-হেতেরে হওয়া দরকার। দরকার চালকে টাকায় নিয়ে যাওয়া।

ভাবনা নেই, এই আসছে শুক্রবারই আসবে চালের বেপারীরা। ভাউলের চেয়েও বড় নৌকো। বলে, পশ্চিমী না। কাছি-গলুই, ছত্রি-জলুই সবই যার জাঁদরেল।

শুক্রবার নৌকো নিয়ে এল বেপারীরা।

সর্দার মাঝিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে রাখালদাস কথা পাড়লে। 'একবারে এত মাল এক সঙ্গে সরানো যাবে না। আস্তে-আস্তে, দফায়-দফায়, কিস্তিতে-কিস্তিতে নিতে হবে। কি, রাজি?'

'ভয় করে বাবু।'

'ভয় কিসের? তেরপল আছে ঢাকা থাকবে। আসল যা বরাদ্দ মাল, তার পরিমাণ পারমিটে যেমন লেখা থাকে, লেখা থাকবে তেমনি। যারা পথ আটকাবার, তারা পারমিট দেখেই ছেড়ে দেবে বেমালুম। কাঁটা নেই যে ওজন নেবে রাস্তায়। বস্তা ধরে যে গুণবে তার মজুরি দেবে কে? সিধে চলে যাবে আড়তে, তাদের গঞ্জ-গোলায়। খিড়কির দরজাতেই কালোবাজার বসবে। খালের মুখে ভিড়বে আবার হাটুরে নৌকা। মোটা দরে কিনে নেবে দালালেরা।'

না, ভয়ের কোনোই কারণ নেই। কোমল ও মসৃণ তাদের রাস্তা।

'কিন্তু,' সর্দার-মাঝি গলা নামিয়ে বললে, 'টাকা নিয়ে আসিনি যে সঙ্গে করে।'

গরম-গরম নগদ টাকা ছাড়া চলতে পারে না এ কারবার। এ হচ্ছে বাঁ হাত ডান হাত। ফেল কড়ি, মাখ তেল।

দু' হপ্তা পর আরেক শুক্রবার যখন মাঝিরা আসবে, তখন নিয়ে আসবে নোটের কেতা। প্রথম কিস্তি।

বেকড়ার দিনে মাল নেবার হুকুম নেই। রিভার-পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যাবে। পারমিটের আড়ালে তেরপলের নীচে রসিদের রক্ষাকবচ এ'টে ব্যূহভেদ করে বেরিয়ে যাওয়াই নিরাপদ।



কি রাজি?

ানাস্ত হচ্ছে। গাধার ছাপ পড়ছে তার পিঠের পের। টাকা হলেই টেক্কা, সাহেব-গোলাম সব পছে-পিছে। বাপ-মা আত্মীয়স্বজন সবাই বলবে নিষ হয়েছে ছেলেটা। সমাজ বলবে উপযুক্ত াক, ডাকবে সভাপতিত্ব করতে।

যে বলছে, চুরি করছ, সে কী? যে বলছে, কাচ্ছ, এইটেই কি তার ঠকাবার মতলব নয়? যত চুরি করতে পারছে না বলেই তার রাগ ার তম্বি। সে কেন ঠকাতে পারল না তাই ার ঈর্ষা আর অভিশাপ।

পরিতোষ জামার হাতায় কপালের ঘাম ছল। কোঁচা দিয়ে মুছল গলার ঘাম। আধ-াশ জল খেল। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল ও ামা দিয়ে টিপে ধরল কপালের রগদুটো। ্মটা ব্যথা-ব্যথা লাগল। কিন্তু, না, ছেড়ে ়ে।

না, ধরা পড়বে না। কি করে ধরা পড়বে? ৰ চার্জসিট।

রাখাল দাস চোখ মটকাল আরেকবার।

কত লোক মরে গেছে এক মুঠো ভাতের ারে। দু-একটা তেমনি মৃত্যু পরিতোষ খেছে তার চোখের উপর। বুকটা ফেটে গেছে। ন যদি সাধ্য থাকত, সে খাওয়াত তাদেরকে। ওয়াতে হলে অনেক উদ্বৃত্ত চাই। বাড়তি ফা না পেলে সে লঙরখানা খুলবে কি র? অঢেল না থাকলে করবে কি করে রাতি?

কেউ নিচ্ছে ঘুষে, কেউ নিচ্ছে শুষে। কেউ নিচ্ছে হাত পেতে, কেউ কান মলে। কেউ খেয়ে, কেউ ছাঁদা বেঁধে। ডাইনে না পেলে বাঁয়ে। ভেড়ার গোয়ালে তাকে ঘোড়া হতে বলার মানে নেই। আমাকে ধরতে এসেছ? কিন্তু উনি? তিনি? তুমি নিজে?

চার্জসিটে পাঁচ শো বস্তা কম দেখাল পরিতোষ। সরল বিশ্বাসে ম্যানেজার তাতে সই করে দিলেন।

পাঁচ শো বস্তা, প্রায় দেড় হাজার মণ। চলতি দাম কত চালের? একটা বিরাট অঙ্ক করতে গেল পরিতোষ। মাথাটা রি-রি করতে লাগল।

'আর চাকরি করবার দরকার হবে না।' বললে রাখালদাস।

'কিন্তু চাকরি ছেড়ে দেয়া যাবে কি তাই বলে?'

'না, না, পাগল! চাকরি ছেড়ে দিলেই তো লোকে বলাবলি শুরু করবে, লোকটার চলে কিসে? হাল-চালও একটুও বাড়ানো চলবে না। রাখতে হবে সমান দৈনদশা। উঠানভরা জঙ্গল, ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়-জামা, হাতল-ভাঙা চায়ের কাপ। আর সাত দিনে এক দিন দাড়ি কামানো।'

বখরা ঠিক হয়ে গেল। দশ আনা ছ' আনা।

এখনো সব কাগজে-কলমে। হাতে-হেতেরে হওয়া দরকার। দরকার চালকে টাকায় নিয়ে যাওয়া।

ভাবনা নেই, এই আসচে শুক্কুরবারই আসবে চালের বেপারীরা। ভাউলের চেয়েও বড় নৌকো। বলে, পশ্চিমী না। কাছি-গলুই, ছত্রি-জলুই সবই যার জাঁদরেল।

শুক্কুরবার নৌকো নিয়ে এল বেপারীরা।

সর্দার মাঝিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে রাখালদাস কথা পাড়লে। 'একবারে এত মাল এক সঙ্গে সরানো যাবে না। আস্তে-আস্তে, দফায়-দফায়, কিস্তিতে-কিস্তিতে নিতে হবে। কি, রাজি?'

'ভয় করে বাবু।'

'ভয় কিসের? তেরপল আছে ঢাকা থাকবে। আসল যা বরাদ্দ মাল, তার পরিমাণ পারমিটে যেমন লেখা থাকে, লেখা থাকবে তেমনি। যারা পথ আটকাবার, তারা পারমিট দেখেই ছেড়ে দেবে বেমালুম। কাঁটা নেই যে ওজন নেবে রাস্তায়। বস্তা ধরে যে গুণবে তার মজুরি দেবে কে? সিধে চলে যাবে আড়তে, তাদের গঞ্জ-গোলায়। খিড়কির দরজাতেই কালোবাজার বসবে। খালের মুখে ভিড়বে আবার হাটুরে নৌকো। মোটা দরে কিনে নেবে দালালেরা।'

না, ভয়ের কোনোই কারণ নেই। কোমল ও মসৃণ তাদের রাস্তা।

'কিন্তু,' সর্দার-মাঝি গলা নামিয়ে বললে, 'টাকা নিয়ে আসিনি যে সঙ্গে করে।'

গরম-গরম নগদ টাকা ছাড়া চলতে পারে না এ কারবার। এ হচ্ছে বাঁ হাত ডান হাত। ফেল কড়ি, মাখ তেল।

দু হপ্তা পর আরেক শুক্কুরবার যখন মাঝিরা আসবে, তখন নিয়ে আসবে নোটের কেতা। প্রথম কিস্তি।

বেকড়ার দিনে মাল নেবার হুকুম নেই। রিভার-পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যাবে। পারমিটের আড়ালে তেরপলের নীচে রসিদের রক্ষাকবচ এঁটে ব্যূহভেদ করে বেরিয়ে যাওয়াই নিরাপদ।



পত্রপাঠ রওনা হতে হবে

'পরিতোষের সেই শুক্রবার আর আসে না। শুয়ে শুয়ে সে স্বপ্ন দেখে। চাল চলে যাচ্ছে টাকায়। টাকা চলে যাচ্ছে ইটে, মোটরে, ...য়ারে। তার নেড়াবোঁচা স্ত্রী চলে যাচ্ছে পটের বিবিতে।

কিন্তু শুক্রবারের আগেই, বলা-কওয়া নেই, পরিতোষের বদলির হুকুম এসে হাজির হল। পত্রপাঠ রওনা হতে হবে। বিনামেঘে বজ্রপাত বইতেই পড়েছিল এত দিন। আজ পড়ল তার মাথার উপর।

সম্প্রতি রাখালদাসকে চার্জ দিয়ে যেতে হবে। পরে লোক আসছে ঠিকঠাক। শোনা যাচ্ছে কে এক কৃষ্ণলাল মালাকর। পাকা-গাঁথনির চাকরি নয়। না হোক, কিন্তু পাকা আম এবার দাঁড়কাকে খাবে।

'একে পাড়ে অন্যে খায়। দুনিয়ার নিয়মই এই।' পরিতোষ বললে, 'কিছু ভাগ দিও রাখাল। কাজ ফুরুলেই একেবারে পাজি করে দিও না।'

উপায় নেই, আগের হিসেবের বনিয়াদেই নতুন চার্জসিট হয়েছে। ফরাকৎ হয়ে গেছে পরিতোষ। আর তার দাবি-দাওয়া নেই কাণাকড়ির। তাই বললে রাখালদাস, 'কিন্তু যদি আসামী চালান হই, তখন কি কাঠগড়ায় পাশে এসে দাঁড়াবেন?'

কৃষ্ণলালের বয়েস কম। নতুন চাকরি। নতুন আশা। দৃষ্টিতে নতুন দিকদেশ। নতুন প্রভাতের আভাতি।

দু' দিন পরেই শুক্রবার। মাঝিরা থাক-থাক নোট নিয়ে আসবে কাপড়ের পরলে।

গুমী মামলায় কৃষ্ণলালকে সামিল করে নিতে হয়! সরা সরিয়ে হাঁড়ির মুখটা খুলতে হয় আস্তে-আস্তে! কৃষ্ণলালকে ছাড়া কিছুই হবে না। হিসাব-নিকাশের মালিক সে, খাতা-পত্রের সেই জিম্মাদার।

বেকার বসে ছিল, দেখতে-দেখতে কপালের পাথর পাতা হয়ে উড়ে গেল। ধুলোমুঠ সোনা-মুঠ হল। একেই বলে অদৃষ্টের খেলা। ভাগ্যের ভোজবাজি।

কানের কাছে মুখ আনল রাখালদাস। বললে ফিসফিসিয়ে। একটি আঁচড়ও কাটতে হবে না কোথাও, যোগসাজসের চিহ্ন নেই এতটুকুও। পরিতোষের চেয়েও তার চেহারা অনেক পরিচ্ছন্ন। সে নতুন এসেছে, আগের হিসাবের সে জানে কি? খাতায় যা আছে তাই সে দেখে নিয়েছে। হিসাবের বাইরে বাড়তি কোনো মাল থাকতে পারে না, থাকলেও তার জানবার কথা নয়। এমনি তার পালানোর পথ আছে পরিষ্কার।

ফল তারা আগেই পাকিয়ে রেখেছে। বোঁটা পর্যন্ত তাকে ছিঁড়তে হবে না। শুধু তলা থেকে তুলে নিয়ে আসা।

সেই বাড়তি মালটা এখন নৌকো বোঝাই করে নিয়ে যাবে বেপারীরা। বিনিময়ে ক' বাণ্ডিল নোট চলে আসবে কৃষ্ণলালের হাতে। ডান হাতও জানতে পারবে না কী নিল সে বাঁ হাতে।

এই সেই চাল! কৃষ্ণলাল ভাবল মনে-মনে। যে চালের জন্যে লোক দোরে-দারে ঘুরে-ঘুরে ধুঁকে-ধুঁকে মরেছে। অন্যায় করেনি, হন্যে হয়নি, শুধু কেঁদে কেঁদে মরেছে। সেই চাল সে সরিয়ে দেবে; দেবে; তার নিজের লোভের হাঁ বোজাবার জন্যে ঠেলে দেবে আরেক লোভের হাঁ-এ। আর, তার ফলে কটা ক্ষুধিত মানুষের অন্নের গ্রাস ছোট হয়ে যাবে, পেট ধরবে না পুরোপুরি। চড়া দরে চাল কিনতে গিয়ে কাপড় কিনতে পারবে না, কিনতে পারবে না ব্যামোপীড়ার ওষুধ। সন্ধ্যেবেলায় জ্বলবে না আর কেরোসিনের টেমি। মার বুকের দুধ যাবে শুকিয়ে।

আজকে প্রথম নিজের লোভের অবসান ঘটিয়ে সেই লোভহীন শুভদিনের সে পত্তন করুক। সে না হলে সেই নতুন প্রভাতের অবতারণা করবে কে? একজনকে তো প্রথমে ত্যাগ করতে হবে। একজনকে তো দেখাতে হবে পথ। অন্ততঃ একজনকে তো শুচি হতে হবে সেই মৃত্যুর অগ্নিস্নানে।

'একটু ভেবে দেখুন।' রাখালদাস তাকাল চশমার রেলিঙ টপকে।

'ভেবে দেখেছি। অফিসরকে আমি টেলিগ্রাম করছি এখুনি।'

তার পেয়ে চলে এলেন অফিসর। ফুলো হাতে কৃষ্ণলালের পিঠে তারিফের চাপড় দিলেন। বাড়তি মাল বাইরে না রেখে নিয়ে এলেন হিসেবের আমলে।

রাখালদাসের সঙ্গে তার একটা ক্ষুদ্র ও তীক্ষ্ণ চোখোচোখি হল। হল বা একটু প্রচ্ছন্ন চোখ টেপাটিপি। যার অর্থ হল এই, এমন মহান্ মূর্খও আছে আজকের পৃথিবীতে। এমন নীরেট!

এল সেই নতুন প্রভাতের ভূমিকা। যুদ্ধ শেষ হল। কৃষ্ণলালের সাময়িক চাকরি, ছাঁট হয়ে গেল। শূন্য হাতে পথে নেমে এল কৃষ্ণলাল।

ভাবল, কোথায় এক মুঠো চাল জুটবে! তার চাল চলেছে কোন্ বেপারীর নৌকায়!



পটক্ষেপ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

রাগে আর অপমানে মুখখানা যেন ফেটে পড়েছে। ও যেন স্টুডিয়োতেই কাজ করছে। অস্থিরভাবে তেমনি পায়চারি করতে করতে শ্রীলতা বলল, তুমি যদি একটু সাহায্য করো তাহলে শোধ আমি এর তুলতে পারি।

বললুম 'সাহায্য করতে আমি রাজী' কিন্তু শোধ সত্যি সত্যি তুমি কতটুকু তুলতে পারবে, সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে।

শ্রীলতা বলল, নিজের সামর্থ্যের ওপর সন্দেহ থাকে তোমার থাক, কিন্তু আমার শক্তিকে অবিশ্বাস করোনা।

মনে মনে হাসলুম, থিয়েটারে সিনেমায় আমার চেয়ে শ্রীলতার নাম ইদানীং একটু বেশিই ছড়িয়েছে। তার কারণ জাতে সে স্ত্রী, রূপ আছে চেহারায়, বয়স যদিও ত্রিশের কাছাকাছি তবু শরীরের বাঁধুনি ভালো থাকায় উনিশ কুড়িতে সে অনায়াসে নামাতে পারে। তাই নায়িকার ভূমিকা সে এখনো পায়, ষোড়শী কিশোরীর অংশে এখনো তাকে বেমানান দেখায় না।

আর এই কিঞ্চিদূর্ধ্ব চল্লিশেই আমি একটু বেশি বুড়িয়ে গেছি। ওর বাপের কি আর কোন অভিভাবকের ভূমিকাতেই নামবার সময় চুলে সামান্য কিছু সাদা রঙ মাখলেই আমার চলে। কিন্তু মনের রঙ তবু মুছতে চায় না। অভিনয়ের মধ্যেও এই অকাল বার্ধক্যকে স্বীকার করে নিতে আমার কষ্ট হয়। ফলে ফাঁকে ফাঁকে অশোভন অসংগত চটুলতা ধরা পড়ে। বিদুর কি যুধিষ্ঠিরের ভূমিকাতেও এক একদিন কীচকের মত্ততা প্রকাশ পেয়ে যায়। কর্তৃপক্ষকে বলি যে, আসলে হয়তো ভালো লোক ব'লেই ভালো লোকের অভিনয় আমার দ্বারা হয় না। কিন্তু সে কথা তাঁরাও বিশ্বাস করেন না, দর্শকেরাও না।

অথচ শ্রীলতাকে আবিষ্কার করেছিলাম আমি। উল্টাডিঙির নিতান্ত অখ্যাত এক পল্লীতে একটা গ্যাস পোস্টের আড়ালে শ্রীলতা সেদিনে দাঁড়িয়েছিল। সেদিনের সেই ম্লান আলোয় প্রতিভা অবশ্য ওর মুখে তখনো দেখিনি, কিন্তু রূপ দেখতে পেয়েছিলাম।

আজ চাকাটা একটু ঘুরেছে। স্বরূপ চিনেছে শ্রীলতা। আমার চেয়ে তাই আত্মবিশ্বাস ওর বেশি।

অপমানটা আমাদের ক'রে গেছে হিতাংশু। আমারই আপন মামাত ভাই, কিন্তু পরিচয়টা আজকাল মামাও দেন না, হিতাংশুও সহজে দিতে চায় না। মামা নামজাদা ডাক্তার। হিতাংশু এতদিন খ্যাতনামা ছাত্র ছিল, সম্প্রতি কি একটা সরকারী অফিসে ভাল চাকরী পেয়েছে। ইদানীং কি একটা সংঘেরও অধিপতি। তাতে ডাক পড়েছে অভিনেতাদের। সেই আমন্ত্রণ নিয়েই হিতাংশু এসেছিল।

স্টুডিয়োতে এই সেদিন বইটা শেষ হয়েছে। মধ্য সাপ্তাহিক প্রোগ্রামে মঞ্চেও আজ আর নামতে হয়নি। দয়া ক'রে বন্ধু বান্ধব অনুপস্থিত। প্রমোদটি বহুকাল পরে শ্রীলতার সংগে আজ জমেছিল।

সেই সময় হিতাংশুর কার্ড নিয়ে এল বেয়ারা, বিস্মিত হলুম। কেননা হিতাংশুর সংগে যা আমার সম্পর্ক তাতে কোন কারণেই এখানে আসবার ওর কথা নয়।

বললুম 'শ্রীলতা, তুমি আড়ালে যাও।'

শ্রীলতার তখন ঘোর লেগেছে, বলল 'পর্দার ওপরে থাকাই আমার অভ্যাস, আড়ালে কেন যাব। আমাকে পর্দানসীন করতে চাও না কি শেষ পর্যন্ত। করতো পরে কোরো। তার আগে দেখি তোমাদের ঋষ্যশৃঙ্গকে।'

হিতাংশু ঘরে ঢুকেই এক পা পিছিয়ে গেল, যেন ভয়ানক একটা খারাপ জায়গায় ঢুকতে যাচ্ছিল। আমি উঠে এগিয়ে গেলাম, 'এসো হিতাংশু।'

নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরেই হিতাংশু হয়তো নাকে রুমাল চাপতে পারল না, কিন্তু মুখটা ঈষৎ বাঁকিয়ে নিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বলল,

'আমি না হয় আরেক দিন আসব সোমনাথ দা।' হেসে বললুম 'আরেকদিন তো আসবেই। কিন্তু আজকের আসাটাকেই বা এমন ব্যর্থ ক'রে দেবে কেন, বছরদশেক পরে দেখাটা যখন আজ হয়েই গেল, তখন একটু না হয় বসেই যাও।'

হাত ধরে টেনে আনলুম হিতাংশুকে, বসিয়ে দিলুম শ্রীলতার সামনের সোফায়, পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললুম 'ইনি শ্রীলতা। কমলাক্ষীর নাম ভূমিকায় দেশীয় অভিনেত্রীদের মধ্যে ইনি তৃতীয় স্থান দখল করেছেন।'

হিতাংশু স্বল্প একটু হাসল, ছোট্ট একটু নমস্কার করল, তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'বেশিক্ষণ বসবার আজ সময় নেই। আপনি শনিবার সাড়ে ছটায় আমাদের সঙ্ঘে উপস্থিত থাকলে খুসি হব। এই নিন কার্ড, আমাদের সঙ্ঘের নাম এবং উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই শুনেছেন। আমি মাথা নেড়ে বললুম "কিছুমাত্র না।"

হিতাংশু মুখ লাল ক'রে বলল 'কেন কাগজ কি আপনারা পড়েন না?'

'মাঝে মাঝে পড়ি।'

'মাঝে মাঝে! দেশের সঙ্গে জীবনের সঙ্গে আপনাদের যোগ এত কম বলেই আমাদের শিল্প এমন পিছিয়ে পড়েছে। মহৎ জীবন না হলে মহৎশিল্প সৃষ্টি কি করে সম্ভব হবে।'

হেসে বললুম, 'তাতো বলতে পারি না, হিতাংশু, কেবল এইটুকু জানি মদ যেদিন বেশি খেয়ে যাই সেদিনই পিতামহ ভীষ্মের ভূমিকায় জমাতে পারি বেশি।'

হিতাংশু হাসল, 'আজও আপনি একটু বেশি জমে রয়েছেন ব'লে মনে হচ্ছে, আচ্ছা এ সম্বন্ধে আলোচনাটা প্রকাশ্য অধিবেশনেই করা যাবে। দয়া করে যাবেন কিন্তু।'

হিতাংশু চলে গেলে শ্রীলতা বলল, 'তোমার ঋষ্যশৃঙ্গ নিশ্চয়ই আমার নামও শোনেনি, অভিনয়ও দেখেনি, না হ'লে তোমার চেয়ে নিমন্ত্রণটা আমারই বোধ হয় বেশি প্রাপ্য ছিল।'

বললুম, 'বাঙলা দেশের কেবল অভিনেতাদেরই ওরা ডেকেছে। নাটকটা বোধ হয় স্ত্রী-ভূমিকা-বর্জিত, তা ছাড়া আমার এই সামান্য সম্মানে তুমি এত ঈর্ষা করছ কেন। তোমার গৌরবভার বয়ে বয়ে আমি অকালে বৃদ্ধ হয়ে গেলাম আর আমার ক্ষীণতম গৌরব তোমার এমন অসহনীয় লাগছে? আমি কি এতই পর?'

শ্রীলতা মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'ঢং কোরোনা, তুমি কি সত্যিই যাবে না কি ওখানে?'

আমি হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বললুম 'রাম বলো।'

অবশ্য কেবল শ্রীলতার নিষেধই নয়। না যাওয়ার ব্যক্তিগত আরও একটু কারণ ছিল।

বাপ মা অল্প বয়সেই মারা গিয়ে রক্ষা পেয়েছিলেন। সাত আট বছর বয়স থেকে মামা বাড়িতেই মানুষ। তখন তিনি কেবল প্র্যাকটিস সুরু ক'রেছেন। বাড়িতে আমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সদ্য বিবাহিত দম্পতির মনে তখনো বাৎসল্যের আবির্ভাব হয়নি। তবু তাঁদের মাঝখানে আমার ভূমিকাও নিতান্ত নগণ্য ছিল না। প্রণয় কলহে পরস্পরের মধ্যে যখন কথা বন্ধ থাকত আমাকে করতেন ট্রানস্মিটার। ওপর থেকে নিচে টুকরো টুকরো চিঠি নিয়ে যেতাম, নির্ভুল বিনিময় করতাম সাংকেতিক শব্দগুলির সেই বয়সেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভাঁজ করা রঙীণ কাগজের টুকরোগুলি দেখতাম খুলে। প্রথম ভাগ পড়া বিদ্যেয় জড়ানো লেখার প্রায় কিছুই পড়ে উঠতে পারতাম না, কিন্তু তার রঙটুকু তখন থেকেই যেন চোখে পড়তে সুরু ক'রেছিল।

তারপর হলো হিতাংশু, ও যত বাড়তে লাগল আমার মধ্যবর্তিতার প্রয়োজন কর্পূরের মত ক্ষয় হ'তে লাগল। তাও সইল কিন্তু একদিন মামী-মা আবিষ্কার করলেন আমি হিতাংশুকে দেখতে পারি না, তাকে হিংসা করি, গলাটিপে তাকে মেরে ফেলতে চাই। ফলে সস্নেহ সতর্ক দৃষ্টির বেড়ায় ও রইল ঘেরা. নিচের ঘর থেকে ওর দোতলার ঘরে আমার যাওয়ার অধিকার রইল না। কেননা চাকরদের সঙ্গে আমাকে একদিন বিড়ি খেতে দেখেছেন মামীমা। অতঃপর এক বাণ্ডিল বিড়ি আর একটি দেশলাই হিতাংশুর বইপত্রের মধ্যে গুঁজে দিয়ে এলাম। সে বিড়ির বাণ্ডিল মামীমার হাত থেকে মামার হাতে এসে পৌঁছল। নিঃশব্দে সহ্য করলাম তিরস্কার আর কাণমলা।

আর একদিন দেখা গেল হিতাংশুর টেবিলের ওপর যে রামকৃষ্ণ আর বিবেকানন্দের ছোট ছোট দুখানি ফটো রয়েছে বাঁধানো, তার পাশে একটি অনাবৃত ফরাসী অভিনেত্রীর প্রতিকৃতি। মৃদু কাণমলা চটি জুতায় উত্তীর্ণ হোল, আমিও চললুম পাল্লা দিয়ে।

তামাক থেকে মদে গিয়ে পৌঁছলাম, মদ থেকে মদিরাক্ষীতে। মামার কনিষ্ঠ কম্পাউণ্ডার বিষ্টুবাবু প্রথম দীক্ষা দিলেন। আমিও ছোট বড় অনেককেই দীক্ষিত করলুম কিন্তু হিতাংশুকে ছুঁতে পারলাম না, ও আমাকে উপদেশ দিল, অনুকম্পা করল, কিছুতেই কাছে ঘেঁষল না।

মামীমা তারস্বরে বলতে লাগলেন, তাড়াও তাড়াও, ও আমার সর্বনাশ করে তবে যাবে, এর পরেও যদি বেশি মায়া থাকে ভাগ্নের ওপর হোস্টেল বোর্ডিংএ দাও কিন্তু আমার বাড়িতে আর নয়। হোস্টেল বোর্ডিংএও টিকতে পারলুম না, সেখানকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মামীমার চেয়েও বেশি পিওরিটান, মামাকে দিনের পর দিন রিপোর্ট ক'রতে লাগলেন। মামা রেগে গিয়ে বললেন, 'তোমার মুখ আর আমি দেখতে চাইনে। এক পয়সাও তোমাকে আর আমি দিতে পারব না।'

মুখ আর দেখালাম না। বার দুয়েক আই-এ ফেল ক'রে তৃতীয়বারের জন্য বিরক্ত এবং নিরাসক্তভাবে বইপত্র নাড়াচাড়া সুরু ক'রেছিলাম, দিলাম ছেড়ে। এক মার্চেণ্ট অফিসে চল্লিশ টাকার চাকরি জোগাড় করা গেল, তারপর চলল অবাধ স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা, চল্লিশ লক্ষ টাকাতেও অন্য কারো পক্ষে যা সম্ভব হোতনা।

কিন্তু হিতাংশুর ওপর লোভ আমার রয়েই গেল। ক্লাসের পর ক্লাস ডিঙিয়ে ডিগ্রীর পর ডিগ্রী নিয়ে চলল। সহর ভরে ছড়িয়ে পড়ল ওর খ্যাতি। বিড়ি আর ফরাসী অভিনেত্রী ওকে ছুঁতেও পারল না।

ট্রামে বাসে পথে পার্কে মাঝে মাঝে দেখা হোত ওর সঙ্গে। কথা বলতে চুপ ক'রে যেতাম, ওর চোখে অনুকম্পা আর কৌতুক। মুখে মোহমুদ্গরের শ্লোক। আমাকে হাসতে দেখে ও আরো গম্ভীর হোত—কঠিন হয়ে উঠত। আমার কিছুই ওকে স্পর্শ করতে পারত না, হিংসা নয়, বিদ্বেষ নয়, স্নেহ পর্যন্ত নয়।

সেই হিতাংশু আজ আমার বাড়িতে নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে এসে হাজির হয়েছে। বাড়ি অবশ্য এখন আর আমার নয়, শ্রীলতার। কিন্তু দিয়েছি তো আমিই, অবশ্য দেওয়ার কৃতিত্বের চেয়ে কৃতার্থতা বেশি। দিতে চেয়েছিল অনেকেই কিন্তু নিয়েছে শ্রীলতা আমার কাছ থেকে।

হিতাংশুর আজ আর ভয় নেই, আমার সংস্পর্শে চরিত্র হারাবার আর আশংকা নেই তার, আমাকে আজ সে উন্নীত করতে এসেছে জনসমাজের সঙ্গে—শিল্পী রসিক গুণীজনের সঙ্গে আমার পরিচয় আর প্রতিষ্ঠা সে আরো ব্যাপকতর ক'রে দেবে। কিন্তু যে আমার স্নেহকে পর্যন্ত ঘৃণায় ফিরিয়ে দিল তার দাক্ষিণ্য আর শুভেচ্ছাকে আমি নিতে যাব কোন লজ্জায়।

শ্রীলতাকে বললুম, 'রাজী আছি তোমাকে সাহায্য করতে'।

হিতাংশুদের প্রকাশ্য অধিবেশনে গেলাম না, শ্রীলতার সঙ্গে গোপন অধিবেশনের আয়োজন চলতে লাগল।

দিন কয়েক বাদে চিঠি গেল হিতাংশুর নামে। শ্রীলতার প্যাডে শ্রীলতারই লতানো হাতের লেখায়। শারীরিক অসুস্থতার জন্য হিতাংশুর দাদা যে যেতে পারেননি সেজন্য শ্রীলতাই লজ্জিত হয়েছে বেশি। হিতাংশু তাতে

যেন ক্ষুব্ধ না হয়। আমাদের দেশে ওই ধরণের সম্মেলনে শ্রীলতাদের উপস্থিত থাকবার ভাগ্য এখনো হয়নি। তার জন্য প্রতীক্ষায় থাকতে হবে। কিন্তু তার আগে গভীর কুণ্ঠায় পরম সঙ্কোচে শ্রীলতা একটি প্রশ্ন করবার স্পর্ধা জানাচ্ছে—তার আগে হিতাংশু কি অনুগ্রহ ক'রে আর একবার এখানে পদধূলি দিতে পারেন না, নির্ধারণের চেষ্টা করা যায় না মহৎ জীবনের সঙ্গে মহৎ শিল্পের সত্যিকারের সম্পর্কটা কি ?

দিন কয়েক নীরবে কাটল। তারপর এক পোস্টকার্ড এল হিতাংশুর। সে আসছে। সন্ধ্যায় নয়, সামনের ছুটির দিনে সকালে।

সময় নির্বাচনের মধ্যে সে দিনের কি একটু ইঙ্গিত যেন ছিল, শ্রীলতার মুখ ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠল দেখতে পেলাম।

সকালেই স্নান সারল শ্রীলতা। আঁচলের ফাঁকে ভেজা চুল ছড়িয়ে রইল পিঠের ওপরে। চওড়া লাল পেড়ে সাধারণ শাড়ী মাত্র পরনে। সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা পড়ল, কপালে ছোট ক'রে ফোঁটা। পায়ে আলতার ক্ষীণ দাগ, যেন সকালের রোদে গলে গেছে, শিশিরে গেছে ধুয়ে।

বললুম, 'বড় বেশী বাড়াবাড়ি হোল। একেবারে উর্বশী থেকে গৃহলক্ষ্মী। আতিশয্যটা আচিরাৎ ধরা পড়বে।'

শ্রীলতা বলল, 'তুমি চুপ করো।'

আমি চুপ করলুম—শ্রীলতাই কথা বলতে লাগল।

নমস্কার বিনিময়ের পর হিতাংশু বলল—সে দিন অমন ক'রে হঠাৎ চ'লে যাওয়ার জন্য সে লজ্জিত। কিন্তু সত্যিই তার বড় তাড়া ছিল।

শ্রীলতা সেদিনের কথা স্মরণ ক'রে লজ্জায় মুখ নামাল, কুণ্ঠিতভাবে বলল—'তাড়া না থাকলেও আপনাকে থাকতে বলবার সেদিন জো ছিল না।'

আরক্ত মুখে হিতাংশু বলল—'সে কথা থাক।'

সে কথা রইল।

শ্রীলতা বলল—'এক কাপ চায়ে আপনি নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না।'

হিতাংশু ইতস্ততঃ ক'রে বলল—'আপত্তির কি আছে। কিন্তু চা তো এইমাত্র খেয়ে এলাম।'

শ্রীলতা স্নিগ্ধ একটু হাসল—'তাতে কি হয়েছে। কেবল একটু চা তো, ওটা খেয়ে সবাই আসেন আবার এসেও সবাই খান।'

উৎকর্ণ হয়ে উঠলুম। অন্যের বানানো কথাই এতদিন শ্রীলতাকে মুখস্থ বলতে শুনেছি। কিন্তু নিজেও যে ও এমন বানিয়ে কথা বলতে পারে তাতো জানা ছিল না।

স্বহস্তে ট্রেতে ক'রে দু কাপ চা নিয়ে এল শ্রীলতা। ফুটন্ত পদ্মের মত বড় বড়



ভেজা চুল ছড়িয়ে রইল পিঠের ওপর

নীল রঙের দুটি কাপ, ভেতরে তরল তামাটে রঙের পানীয়।

একটি কাপ আমার চেয়ারের হাতলে নামিয়ে রাখল শ্রীলতা। দ্বিতীয়টি নিজে তুলে দিল হিতাংশুর হাতে। সামান্য একটু ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেল। আর তাতেই শ্রীলতার সিঁথির সিঁদুর তার সমস্ত মুখে যেন ছড়িয়ে পড়ল।

মনে মনে বললুম—'অপূর্ব'। লজ্জার এমন অভিব্যক্তি কোন চতুর্দশী কিশোরীর পক্ষেও সম্ভব হোত না।' শিল্পে আতিশয্যকে ক্ষমা করি, কেননা অপ্রত্যাশিতকে পাই।

আড় চোখে তাকিয়ে দেখলুম সিঁদুর কেবল নিজের মুখেই শ্রীলতা ছড়ায়নি, তার ছাপও ফেলেছে আরেকজনের ওপর।

হিতাংশু বলল—'বা রে, কেবল আমাদেরই দিলেন, আপনি নিলেন না চা।'

শ্রীলতা হেসে বলল—'না, আমি চায়ের তত ভক্ত নই।'

হিতাংশু বলল—'কেবল অন্যদের বুঝি ভক্ত বানাতে চান।'

এবারো চমৎকৃত হলুম। সেই জ্যামিতি আর জীবনচরিত পড়া মুখচোরা হিতাংশু কথায় এমন ব্যঞ্জনা মাখতে শিখল কবে। ভুলে গেলাম ব্যঞ্জনাটা চেষ্টা ক'রে লাগাতে হয় না, একটা নির্দিষ্ট বয়সে হাসিতে কথায় ওটা আপনিই এসে লাগে।

কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলুম—'তারপর তোমাদের সম্মেলনের খবর কি হিতাংশু। সেদিন জমায়েৎটা বেশ আশানুরূপ হয়েছিল তো ?'

হিতাংশু বলল 'হ্যাঁ, কেন হবে না। চেষ্টার তো আমরা ত্রুটি করিনে।'

হেসে বললুম—'চেষ্টার ত্রুটি না হলেই কি ফলটা সব সময় আশানুরূপ হয় ? তা হ'লে বল আশাটাই তোমাদের ফলের অনুরূপ। ফল দেখে সেটা ওঠে আর নামে।'

হিতাংশু বলল—'তা নয়। ফল আশানুরূপ না হ'লেও আমরা হতাশ হইনে। সময়ের জন্য আমরা অপেক্ষা ক'রতে পারি।'

হঠাৎ হিতাংশু শ্রীলতাকে জিজ্ঞেস করল—'আপনি কি বলেন। তাই কি উচিত নয় ?'

শ্রীলতা যেন একটু ঘাবড়ে গেল, বলল 'নিশ্চয়ই, অপেক্ষা তো ক'রতেই হবে।'

হিতাংশু বলল—'না, শুধু অপেক্ষা করলেই চলবে না। কাজের মধ্য দিয়ে সময়কে এগিয়েও আনতে হবে। আমি ভেবেছি আমাদের পরের অধিবেশনে আপনাদেরও এরপর আমন্ত্রণের ব্যবস্থা করব।'

শ্রীলতা সন্ত্রস্ত হয়ে বলল—'না না, অত ব্যস্ত হবেন না। প্রথমেই অত তাড়াতাড়ি করতে গেলে ফল হয়তো তাতে খারাপ হবে।'

দেখলুম বিষয়গুলি শ্রীলতার অভ্যস্ত অংশের বাইরে চলে যাচ্ছে। সুতরাং আলোচনার মোড়টা ঘুরিয়ে দেওয়া দরকার।

বললুম—'কিন্তু সেখানে গিয়ে এরা করবে কি ?'

হিতাংশু বলল—'যোগ দেবেন আলোচনায়। সকলের কথা শুনবেন, বলবেন নিজেদের কথা।'

হেসে বললুম—'নিজেদের আবার কথা কি আছে। অন্যের কথা মুখস্থ ক'রে, কোন ভঙ্গিতে কোন কৌশলে শ্রোতাদের শোনাতে হয় সে বিদ্যা এরা তো যথাস্থানেই দেখিয়ে থাকে।'

এরকম বিশ্বাসঘাতকতার কথা ছিল না।

দেখলুম শ্রীলতার মুখ লাল হয়ে উঠেছে, বলল—'আমরা কি কেবল অন্যের কথা মুখস্থই বলি?

বললুম—'যখন বলো না, তখনই বিপদে ফেল।'

শ্রীলতা আরো চটে গেল, বলল—'হ্যাঁ, বিপদ এড়াবার জন্যই আমাদের দিয়ে কেবল তোমরা মুখস্থ করাও তা জানি। কিন্তু এটা জেনো, মুখস্থ করা কথা যখন সবাইকে শোনাই তখন তা একান্ত আমারই কথা, আর কারো নয়।'

হিতাংশু খানিকক্ষণ মুগ্ধ হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল তারপর মাথা নেড়ে বলল—'ঠিক বলেছেন।'

জীবন আর শিল্পের আলোচনা সেদিন স্থগিত রইল। অন্যান্য দু' একটি কথাবার্তা

পর হিত
'শাপে ব
ভালো
এনে
পে

কিন্তু শ্রীলতার হোল কি। কি পেল, কি এমন দেখল সে হিতাংশুর মধ্যে। অভিনয় নিয়ে এমন ক'রে মেতে উঠতে ওকে কখনো দেখিনি, আসল অভিনয়ে ওর অন্যমনস্কতা ধরা পড়ছে। ষ্টুডিয়োতে কাজ করতে করতে ওর চাঞ্চল্য মাঝে মাঝে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

একদিন জিজ্ঞাসা করলুম—'সত্যি সত্যিই শেষে প্রেমে প'ড়ে যাবে না কি? খবরদার, খবরদার। শ্রীলতাও হাসে, 'ঘাবড়িয়ো না। তেমন বুঝলে আগেই জানিয়ে রাখব। পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ধ'রে তুলতে পারবে।'

বছর সাতেক যাবৎ শ্রীলতার সঙ্গে আমার পরিচয়। দুজনেই দুজনকে চিনি, কারো কাছেই নির্ভেজাল একনিষ্ঠতা আমরা প্রত্যাশাও করিনে দাবীও করিনে। কিন্তু উল্টো দিক থেকে শ্রীলতা যেন দিনের পর দিন একনিষ্ঠই হয়ে উঠেছে। কি পেয়েছে সে হিতাংশুর মধ্যে? এতদিন শিল্পী জীবনের সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতার আর উচ্ছৃঙ্খলতার সঙ্গে জীবন-রহস্যের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ সম্বন্ধে তার কোন সংশয় ছিল না? আজ কি তার ধারণা বদলেছে, রুচি বদলেছে? জীবনের সমস্ত রস, সমস্ত রহস্য সে খুঁজতে চেষ্টা করছে বিত্তবানের মধ্যে চরিত্রবানের মধ্যে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনের মধ্যে? আমি কি ঠ'কে যাচ্ছি? আমি কি প্রতারিত হচ্ছি?

কিন্তু প্রতারণা ওরা করল না। বছর খানেক পরে হিতাংশু পরিষ্কার ভাষায় বলল—শ্রীলতাকে সে বিয়ে করতে চায়। শ্রীলতার দিকে তাকালুম। সে তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে নিল। ভাবলুম হয়তো হাসি গোপন ক'রে নিচ্ছে শ্রীলতা। হিতাংশুর ওপর দয়া হোল। এবার ওকে রেহাই দেওয়া উচিত।

হেসে বললুম—'কি সব বলছ হিতাংশু! চায়ের সঙ্গে তোমার বউদি বোধ হয় পরিহাস ক'রে কিছু মিশিয়ে টিশিয়ে খাইয়েছেন?'

শ্রীলতা চমকে উঠল, বলল,—'কক্ষণো নয়।'

এবার আমার চমকাবার পালা।

তিক্ত হেসে বললুম—'মদের কথা বলছিনা। তা ছাড়াও তো মেশাবার মত আরো অনেক নেশার জিনিষ তোমাদের আছে। কিন্তু সে নেশাও চিরস্থায়ী নয়, তাও একদিন ভাঙবে। তখন কি উপায় হবে তোমার? তখন কি উপায় হবে হিতাংশুর?'

হিতাংশু বলল—'সে ভাবনা আমরাই ভাবব।'

বললুম—'চমৎকার। কিন্তু সম্প্রতি বোধ হয় আরো কিছু তোমাকে ভাবতে হবে হিতাংশু। তোমার মা বাবার কথা, সমাজের কথা, আত্মীয় স্বজনের কথা।'

চাকা ঘুরেছে। মোহমুদ্গর আওড়াবার ভার এবার আমার ওপর।

হিতাংশু আস্তে আস্তে বলল—'তার আগেও আপনার কথাই আমার ভাবা উচিত ছিল। ভাবিনি যে তাও নয়।'

হেসে উঠলুম—'সত্যি না কি? ভেবে বুঝি শেষ পর্যন্ত এই ঠিক করলে?

হিতাংশু বলল—'হ্যাঁ। আপনার ছেলে মেয়ে আছে, স্ত্রী আছে—'

বললুম—'সুতরাং আমার এই বাড়তি উপস্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার অধিকারও তোমার আছে। চমৎকার যুক্তি। তোমাদের সঙ্গে পার্থক্য আমাদের এই আমরা যখন বদমাস নির্ভেজাল বদমাস তখনো সমাজ সংস্কারের মুখোস আমরা প'রে থাকি না।'

হিতাংশু কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বোধ হয় নিজেকে সংযত করে নিল, তারপর বলল—'আপনি হয়তো প্রকৃতিস্থ নেই।'

বললুম—'হয়তো তোমার চেয়ে অনেক বেশী প্রকৃতিস্থ আছি।'

শ্রীলতা শান্তভাবে আমার দিকে তাকালো—আস্তে আস্তে বলল, 'তর্ক ক'রে কি লাভ।'

জবাবে অনেক কথা মনে এসেছিল, কিন্তু সে কথা তুলে লাভ নেই, তর্ক ক'রে লাভ নেই সত্যিই। একথা শ্রীলতাকে আজ মনে করিয়ে দিতে যাওয়া ভুল যে আমিই তাকে প্রথম রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলাম, প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিলাম দশজনের মধ্যে। তার আজকের এই সমস্ত খ্যাতি সমস্ত প্রতিপত্তির মূলে ছিলাম আমিই। একথা শ্রীলতাকে মনে করিয়ে দিয়ে লাভ নেই। সে কথা থাক। সেই উপকারের কথা না হয় না-ই তুললাম, তার চেয়েও কি বড় কিছু করিনি। এই দীর্ঘ সাত আট বছর ধ'রে তাকে কি একটুও ভালোবাসিনি? সেই ভালোবাসায় সমাজের স্বীকৃতি অবশ্য ছিল না, ভবিষ্যৎকে মজবুত করবার জন্য আইনের বাঁধন কিছু ছিল না, তা সত্ত্বেও এই দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠতার কি কোন মূল্যই নেই? এমন শান্ত নির্বিকারভাবে শ্রীলতা আজ বলতে পারল কোন লাভ নেই তর্ক ক'রে?

লাভ নেই তা ঠিকই। শ্রীলতা একাধিক কোম্পানীর সঙ্গে আজ চুক্তিবদ্ধ রয়েছে। তাতে বিচ্যুতি ঘটলে আইনগত তাতে নানা অসুবিধা আছে; কিন্তু আমার সঙ্গে তার এই অলিখিত চুক্তি নিঃসংশয়ে সে ভাঙতে পারে। সমাজ কিংবা আইন তাকে স্পর্শ করবে না।

খবর পেয়ে মামা-মামী এলেন মোটরে। মামা বললেন, 'যদি এক দিনের অন্নও আমার কাছে তুমি পেয়ে থাক ওকে ফেরাও।'

মামীমা হাসলেন, 'কাকে কি বলছ। ওই তো এসব ক'রেছে। ও তো এই চায়, এই চেয়েছিল।'

বললুম, 'এই চেয়েছিলাম!'

'তাছাড়া কি। ছেলেবেলা থেকে অনুক্ষণ তোমার তো এই চেষ্টাই ছিল। কিসে ওকে নষ্ট করবে। মনে নেই সেকথা? আজ পেরেছ। নিজের নাক কেটে পেরেছ আজ অন্যের যাত্রা-ভঙ্গ করতে।'

মুর্খ মেয়েমানুষ! তোমাদের অনুভূতি আর কতটুকু। এতে কি কেবল নিজের নাকই কেটেছে, হৃদয়ও ফেটে চৌচির হয়ে যায়নি?

হিতাংশুকে ফেরান গেল না। শ্রীলতাকেও না। সাধারণ সহজ ভাবে আমি ওদের ফেরাতে চেষ্টাও করলুম না। শাসন তিরস্কারও নয়, অনুনয়-বিনয়ও নয়। আমি ভেবে রেখেছি আমার পদ্ধতি। শ্রীলতাকে আমি হয়তো ফিরিয়ে নিতে পারব না, কিন্তু অতীতকে, কুশ্রী কলঙ্কমলিন অতীতকে, প্রণয়-মধুর, বেদনা-ভারাতুর অতীতকে বারংবার ওদের মধ্যে বয়ে নিয়ে যেতে পারব।

বিদায় দিলাম শ্রীলতাকে। বললুম, 'অভিনয়ের সময় অভিভাবক বা ব্যর্থপ্রেমিকের বেশে বহুবার তোমার নবপ্রণয়কে আশীর্বাদ ক'রেছি, অভিনন্দন জানিয়েছি। আজ আর তা করব না শ্রীলতা। আমি জানি আমার শুভেচ্ছা তোমার না হ'লেও চলবে।'

শ্রীলতা কথা বলল না, দুটো চোখ আজও ছলছল ক'রে উঠল।

কিন্তু এসব ব্যাপারে ওর অভ্যস্ততা তো দীর্ঘকালের। হেসে বললুম 'যাও, এই মুহূর্তে নাট্যকার আমার মুখে কোন কথা বসিয়ে দেন নি। আমার কিছু বলবারও নেই, করবারও নেই। অদূর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেবল হাসতে হবে।'

শ্রীলতা যেন একটু শিউরে উঠল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তা কেন, তোমার আরো অনেক করবার রইল।'

হেসে বললুম, 'রইলই নাকি?'

শ্রীলতা আমার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামাল। বলল, 'হ্যাঁ, তুমি আমাকে সাহায্য কোরো।'

কি রকম করে উঠল মনের মধ্যে। কিছু বলতে পারলুম না। জানি আজ এই সাহায্যের অর্থটা কি। কিন্তু শ্রীলতার গলার ওই কম্পনটুকুর মধ্যে অর্থাতীত কি আর কিছুই নেই?

ভবিষ্যতের স্বাস্থ্য

ডক্টর পশুপতি ভট্টাচার্য্য

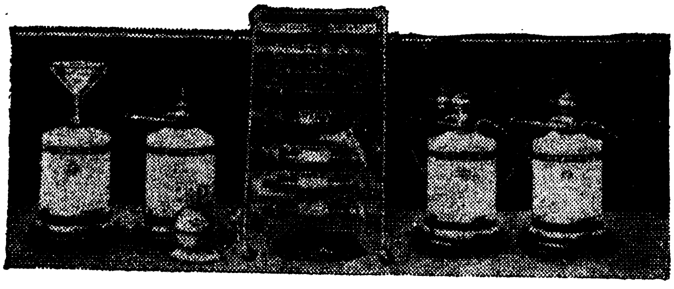
জগতে সম্প্রতি মহাপ্রলয় ঘটে গেল। স্বাভাবিক নিয়মে এর পরেই একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন আসন্ন। লোকে বলে যে, এইবার কলি-যুগের পরে আসবে সত্যযুগ। কিন্তু মানুষের যে পৃথিবী, তার মধ্যে সত্য-যুগের মতো কোনো পরিবর্তন আনা প্রধানতঃ মানুষেরই হাত। সকলে মিলে উন্নতির দিক দিয়ে যা একান্তভাবে কামনা করবে তাই সফল হবে। এখন তাই সকল বিষয়ে কামনা করবার একটা দিন এসেছে। কামনার দ্বারা অসম্ভবও সম্ভব হয়। পৃথিবী এমন মজার জায়গা যে, এখানে অসম্ভব কোনো জিনিষকেই বলা যায় না। বিজ্ঞানের ইতিহাস খুলে পড়লে তার পাতায় পাতায় দেখতে পাবেন যে, কাল যা ছিল অসম্ভব, আজ তা জলের মতো সম্ভব এবং সহজ। বস্তুতঃপক্ষে এমনিভাবেই আমাদের ব্যবহারিক জগৎ গড়ে উঠেছে। কেউ একজন আগে একটা কিছু কল্পনা করেছে, তারপর সেটাকে সে সত্যে পরিণত করেছে, কিংবা তার বহুকাল পরে হয়তো আবার এক ব্যক্তি সেই কল্পনাকে সত্যে দাঁড় করিয়েছে। সুতরাং কল্পনারও একটা দাম আছে। আমি যা আজ কেবল কল্পনাই করছি, তা যে কখনই সত্য হবে না এমন কথা কে বলতে পারে?

অতএব ভবিষ্যৎ পৃথিবী কেমন হবে সে সম্বন্ধে স্বাস্থ্যরক্ষার তরফ থেকে আমরা কিছু কল্পনা করতে চাই। আমাদের সেই কল্পনার প্রথম কথাই হচ্ছে এই যে, সেই ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে আবালবৃদ্ধ সবাই শারীরিক সুস্থ হয়ে থাকবে। সুখ সম্বন্ধে আপনাদের কার কি রকম ধারণা আছে তা জানি না, কিন্তু আমার অন্ততঃ এই বিশ্বাস যে, সুস্থ হয়ে থাকার মতো সুখ জগতে আর কিছুই নেই। অর্থ, সম্পদ বা মান-সম্ভ্রম বা রাজত্ব বা মন্ত্রিত্ব বা কর্তৃত্ব, যিনি যাই বলুন সুস্থ থাকার কাছে সে সব কিছুই নয়। মনে করুন আপনার পেটে অ্যাপেন্‌ডিসাইটিসের ব্যথা উঠেছে, এমন সময়ে খবর পেলেন যে, লটারিতে আপনি এক লাখ টাকা জিতেছেন,—সে আনন্দটা তখন উপভোগ করতে পারবেন কি? উপভোগ করবেন তখনই, যখন ব্যথাটি আপনার সেরে যাবে। সুতরাং আগে আপনার সুস্থ থাকা চাই, তবে উপভোগ করবেন অন্য সব কিছু। অতএব আশা করা যায়, যে, এবার ভবিষ্যতের আদর্শ পৃথিবীতে মানুষ সুস্থ হয়ে থাকার ব্যবস্থাটাই সকলের চেয়ে বেশী করে করবে। অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে সর্বাগ্রে এই বিষয়েই সকল দেশে একান্ত প্রচেষ্টা দেখা যাবে। সরকারী তহবিল থেকে এই বিষয়ে যে বাৎসরিক অর্থ ব্যয়ের বরাদ্দ থাকবে তা হবে অন্যান্য সকল বিষয়ের চেয়েই অনেক বেশী, এমন কি মিলিটারি বিভাগের জন্য বরাদ্দের চেয়েও বেশী। বস্তুতঃ সরকারী অর্থের প্রধান অংশটাই খরচ করা হবে সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগ-পীড়া নিবারণ, আর চিকিৎসার জন্য। রোগ যে একেবারেই থাকবে না এমন কথা বলা চলে না। রোগ অবশ্যই থাকবে, নইলে প্রকৃতির নিয়মই বা কেমন করে রক্ষা হবে, লোকে সুস্থ থাকার মর্যাদাই বা কেমন করে বুঝবে? রোগ না থাকলে মানুষ আরো নিষ্পরোয়া, নিষ্করুণ আর মারাত্মক হয়ে উঠবে, সে আরো মায়ামমতা-বিহীন বর্বর হয়ে উঠবে, রোগের ভয়টুকু না থাকলে তাকে আর কোনো মতেই এঁটে ওঠা যাবে না। তাছাড়া রোগ না থাকলে মৃত্যুই বা আসবে কোন্ সূত্র অবলম্বন করে? সুতরাং রোগ মানুষের থাকবেই। যেখানে কুঁড়েমি আর অবহেলা, যেখানে অত্যাচার বা যথেচ্ছাচার, যেখানে লুব্ধতা, সেখানে অবশ্যই রোগ এসে মানুষকে শাসন করবে। কিন্তু এমন রোগ থাকবে না যা এখনকার মানুষের মতোই যুক্তি-হীন ও নিষ্করুণ, যার পিছনে কোনো ব্যক্তিগত অন্যায়ের হেতু নেই, যা নিরপরাধীকে বেছে বেছে আক্রমণ করে, আর যার বিরুদ্ধে কোনো অস্ত্রই খাটে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে,—এমন একটি রোগ ক্যান্‌সার। এই মারাত্মক রোগকে তখন জয় করতেই হবে, একে সমূলে নির্মূল করতে হবে। ক্যান্‌সারের চিকিৎসার জন্য এখন রেডিয়ম আবিষ্কৃত হয়েছে বটে, কিন্তু সেটা এই রোগের কেবল খুব প্রথম অবস্থাতেই উপকারী। এর চেয়ে আরো এমন উৎকৃষ্ট চিকিৎসা আবিষ্কৃত হবে যাতে ক্যান্‌সার রোগটি অতি সহজে সকল অবস্থাতেই নির্দোষে আরোগ্য হয়ে যায়। তেমনি আরো একটি উদাহরণ থাইসিস যা বেছে বেছে নিরীহ লোকদেরই ধরে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এখনও এর সার্থক রকমের চিকিৎসা অনেক ক্ষেত্রেই করা যায় বটে, কিন্তু সে চিকিৎসা অনেক ব্যয়সাপেক্ষ আর সময়-সাপেক্ষ। তার প্রথম কথাই এই যে, রোগীকে অচল হয়ে বহুকাল চুপচাপ বিছানায় শুয়ে কাটাতে হয়। আমাদের আদর্শ পৃথিবীতে কিন্তু এমন বিলম্বিত চিকিৎসা থাকবে না। তখন এর চিকিৎসা খুবই সহজ হয়ে যাবে। তখন হয়তো গোটা কতক ট্যাবলেট খেতে খেতেই এ রোগ সেরে যাবে। লোকে বলবে,—থাইসিস্ আবার একটা রোগ নাকি? সবাই জানে এটা অমুক ট্যাবলেট খেলেই তো সেরে যায়। অবশ্য ম্যালেরিয়া, কলেরা, টাইফয়েড, ডিসেণ্ট্রি, বসন্ত প্রভৃতি সাধারণ সংক্রামক রোগগুলো তখন একেবারেই থাকবে না। এগুলো নিতান্তই অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন বুদ্ধিহীন বর্বর যুগের রোগ। আজকের দিনেও অনায়াসে এগুলো নিবারণ করা যায়। তবু এখনও যে আমাদের মতো কয়েকটা প্রাচীন দেশে এগুলো টিঁকে রয়েছে, এইটেই আশ্চর্যের কথা। অবশ্য তখনকার দিনে এই সব রোগের একটিও পৃথিবীর কোনো দেশেই থাকবে না। এটা খুব একটা অসম্ভব কথা বলছি না। আমরা সবাই জানি যে, ম্যালেরিয়া হয় মশার কামড়ে, কিন্তু মশাই যদি কোনো দেশে আর না থাকে, তাহ'লে ম্যালেরিয়া হবে কেমন করে? দেশকে মশক রিক্ত করবার জন্যে এখনই প্যারিস্‌গ্রীণ ও ডি, ডি, টি, প্রভৃতি কতো ভালো ভালো কেমিক্যাল পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলো স্প্রে করে দিলে সমস্ত মশাই মরে যায়,—সুতরাং তখনকার দিনে যে আমাদের এই বাংলা দেশেও কোনো মশা কিংবা ম্যালেরিয়া থাকবে না একথা বলাই বাহুল্য। অতএব এখনকার মতো লোকে সহরে পালিয়ে না গিয়ে তখন পাড়াগাঁয়েও স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারবে। তেমনি আবার মাছির দ্বারা কলেরা প্রভৃতি রোগগুলো প্রায়ই আমাদের মধ্যে সংক্রামিত হয়। কিন্তু পৃথিবীতে তখন মাছিও থাকবে না, স্প্রে করে মাছি প্রভৃতি রোগ বাহকের বংশ একেবারে নির্মূল করে দেওয়া হবে। দূষিত জল থেকেও কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগগুলি হয়। কিন্তু তখন এমন বীজাণুর ওষুধ বেরুবে যার এক ফোঁটা মাত্র জলে ফেলে দিলেই সমস্ত জল বীজাণু-মুক্ত হয়ে যাবে। এখনও আমাদের বছরে বছরে অ্যাণ্টি কলেরা আর অ্যাণ্টি টাইফয়েড ইন্‌জেকশন নিয়ে ঐসব রোগকে প্রতিরোধ করতে হয়, টিকা নিয়ে বসন্ত রোগকে প্রতিরোধ করতে হয়। তার কারণ চারিদিকে ঐসব রোগের অজানিত ক্যারিয়ার অর্থাৎ বাহক ঘুরছে,—হাজার সাবধানে থাকলেও কখন্ কার সংস্পর্শে এসে অথবা কার হাতে খেয়ে রোগ জন্মে যাবে,

SPENCE LTD.

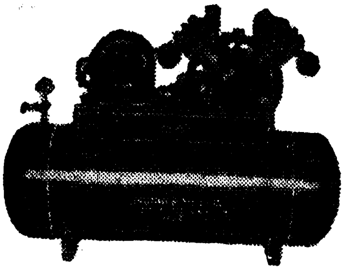
Telephone: Cal. 264 & 265.　　ভারতের সোল এজেণ্টস　　Telegram: "SPENCELIM".

এই ছবিতে আছে (বাম হইতে দক্ষিণে): মডেল ৭৩-জে পোর্টেবল ওয়েষ্ট অয়েল ড্রেন; ২৯৬ মডেলের চেসিস্ লুব্রিক্যাণ্ট গান ভর্তি করার জন্য টাইপ জে ফিলার; মডেল ৭৮ ভিসি—ফ্লাসার, মডেল ২৯৬ "সুপার সার্ভিস" পাওয়ার

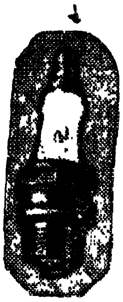


গান সেট; ২৯৬ মডেলের ফ্লুইড লুব্রিক্যাণ্ট গান ভর্তি করার জন্য ফিলার ভ্যালভ সহ মডেল ১২০—জে এফ্ পোর্টেবল মিটারড গীয়ার লিউব ডিস্পেন্সার, মডেল ১২০—জে পোর্টেবল মিটারড গীয়ার লিউব ডিস্পেন্সার।

NEW JUNIOR ARO LUBRICATORS



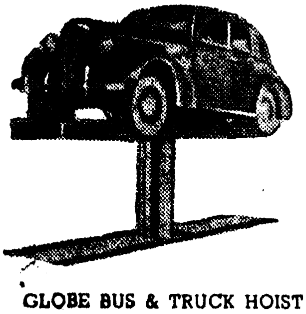
BRUNNER AIR COMPRESSOR



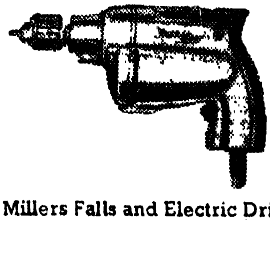
AUTOLITE SPARK PLUG



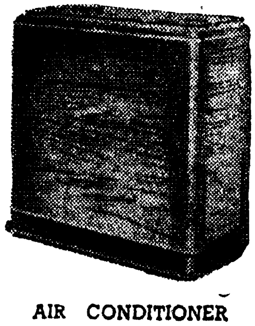
AUTOLITE BATTERY



GLOBE BUS & TRUCK HOIST



Millers Falls and Electric Drills



AIR CONDITIONER

"এ্যাক্মী" পেণ্টস্; 'মিডওয়েষ্ট' এ্যাব্রেসিভস্; কম্পকো' রিটেইনিং বেয়ারিংস; উইভার জ্যাকস; হল হোনস সিলিণ্ডার বোরিং বারস্; ভ্যালভ সীট গ্রাইণ্ডার, ভ্যালভ রিফেসার; 'ইরি' গ্যাসোলিন এবং কেরোসিন পাম্পস্; অটোলাইট ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড ইগনিশন পার্টস্। জেনারেল মোটরস প্রোপ্রাইটরী পার্টস্ এবং গ্যারেজের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদিরও ডিষ্ট্রিবিউটরস্।

23, CONVENT RD. CALCUTTA.

শাখাসমূহ:—বোম্বাই — মাদ্রাজ — লাহোর — লক্ষ্ণৌ।

স কথা কিছুই বলা যায় না। কিন্তু তখন সহজে কারও ঐসব রোগ জন্মাতেই পারবে না, সুতরাং এর কোনো ক্যারিয়ারও থাকবে না, এর বীজাণুও বাস করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র না পেয়ে নিতান্ত বিরল হয়ে যাবে। সুতরাং ঐসব ইনজেকশন আর টিকা নেবারও তেমন দরকার হবে না। তবে মানুষ নিজেকে সুরক্ষিত করবার জন্য নিয়মিত ভাবে ঐসব প্রতিষেধক নিতে থাকবে, আর সেইটেই হবে ডাক্তারদের এক প্রধান কাজ।

তবে কি এপিডেমিক জিনিষটা একেবারেই পৃথিবীতে থাকবে না? এমন কথা অবশ্য বলছি না। আমরা বলতে চাই যে, এখনকার দিনের মতো ঐসব মারাত্মক অথচ অতি সহজে নিবার্য রোগগুলোর এপিডেমিক আর থাকবে না। এপিডেমিক বলতে যা বোঝায় তা হয়তো কিছু থাকবে, কিন্তু সে এমন সোজা-সুজি রোগের নয় যাকে নিবারণ করতে না পেরে মানুষের বুদ্ধিকে লজ্জা পেতে হয়। অনেকগুলো রোগের এপিডেমিক আছে,—যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা, যেমন মেনিঞ্জাইটিস, এগুলোকে নিবারণ করা কঠিন, অন্ততঃ এখনও পর্যন্ত তার উপায় আবিষ্কৃত হয়নি। এই সব রোগের বীজাণু অত্যন্ত সূক্ষ্ম, হাওয়াতে ভেসে এসে নাকের ভিতর দিয়ে ঢোকে,—যদি তখন এরও নিবারণের উপায় আবিষ্কৃত হয়ে যায় তবে অবশ্য এগুলোও বাদ চলে যাবে। কিন্তু এপিডেমিক কোনো না কোনো রোগের থাকবেই। এপিডেমিকের মড়ক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প, বন্যা,—এগুলো হচ্ছে প্রকৃতির লোকক্ষয় করবার অস্ত্র। এগুলোকেও যে আমরা জয় করে ফেলতে পারবো এতটা অসম্ভব কল্পনা করা ঠিক নয়, কিন্তু এমন জিনিষ নিশ্চয়ই থাকবে না যা বুদ্ধিমান মানুষকে আর লজ্জা দিতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক শিশু মৃত্যুর কথা। শিশুরা জন্ম নেবার সঙ্গে সঙ্গেই, কিংবা তার কিছুদিন পরেই নিতান্ত অকালে প্রায় অর্ধেক সংখ্যায় মারা যাবে, এটা কি প্রকৃতির নিয়ম? তা কখনই নয়, এটা হয় নিতান্তই আমাদের অজ্ঞতার দোষে। আমরা ঠিকমতো নিয়মে প্রসূতির যত্ন করতে জানি না, শিশু পালন করতে জানি না, যেমন খুশি তেমনি করে যাই, তাই এমন হয়। ইউরোপ প্রভৃতি দেশে এটা কিছু কম হয়, আমাদের দেশে কিছু বেশী হয়। কিন্তু পশুপক্ষীরা যেভাবে সন্তান পালন করে, আমরাও কি তাই করবো? আমাদের আদর্শ যুগের জগতে একটি শিশুকেও অকালে মরতে দেওয়া হবে না। তখনকার দিনে হয়তো নানা কারণে সন্তান অনেক কম জন্মাবে, কিন্তু যারা জন্ম নেবে তারা সবাই বেঁচে থাকবে। আর তখনকার দিনে সন্তানকে জন্ম দিতেও প্রসূতিকে এত কষ্ট পেতে হবে না। এমন উপায় আবিষ্কৃত হবে যাতে একটুও প্রসব বেদনা সহ্য না করে মেয়েরা হাসতে হাসতে সন্তানের জন্ম দেবে।

সার্জারির সম্বন্ধে তো এখনই অনেক উন্নতি হয়েছে, কিন্তু তখন আরো অনেক হবে। মানুষকে অজ্ঞান করে রেখে তার শরীরের মধ্যে যতক্ষণ খুশি কাটাকাটি আর মেরামতির কাজ করা এখনই কত সহজ হয়ে গেছে। রাশিয়াতে আজকাল ব্রেণের মধ্যে আর হার্টের মধ্যেও অপারেশন করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এসব কাজ তখন আরো বেশী সহজ হয়ে যাবে, সুতরাং তখন হঠাৎ দুর্ঘটনায় শরীরের কল-বিগড়ে গিয়ে, কিংবা হার্টফেল হয়ে কোনো মানুষকেই মরতে দেওয়া হবে না। সার্জারির দ্বারা মেরামত করে তৎক্ষণাৎ তাকে বাঁচিয়ে তোলা হবে। মানুষ তখন কেবল স্বাভাবিক নিয়মেই মরবে, আকস্মিক আঘাতে জলজ্যান্ত মানুষগুলো তখন কেউই মরবে না।

আজকালকার দিনে একটা রোগ আমাদের মধ্যে বেশী মাত্রায় হতে দেখা যাচ্ছে,—যাকে বলে নিউরোসিস্ নিউরাস্থিনিয়া বা নার্ভের দোষ। এগুলো একরকম মনের রোগ, অর্থাৎ মনের দুর্বলতা থেকেই এগুলো জন্মায়। এই সব রোগ আগেকার যুগেও ছিল না, আর পরবর্তী যুগেও থাকবে না, কেবল এই মাঝামাঝি যুগটাতেই এর প্রকোপ। তার একটা কারণও আছে। আগেকার যুগটা ছিল মানুষের পক্ষে অন্ধকার অজ্ঞতার যুগ। মানুষ তখন নির্বিচারে মেনে নিয়েছিল যে সে নিতান্তই অসহায়, প্রকৃতির হাতের খেলার পুতুল মাত্র, সুতরাং কেবল খাওয়া-দাওয়া ছাড়া তার নিজের মাথা ঘামিয়ে অন্য কিছুই করবার নেই। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে তার অনেক রকমের ক্ষমতা আছে, অনেক কিছুই সে করতে পারে। কিন্তু এখনও তার সবটুকু ক্ষমতার পরিচয় সে পায়নি, পরিপূর্ণ আলোর যুগে সে পৌঁছতে পারেনি। এখন সে আধা-আলো আধা-অন্ধকারের মধ্যে বাস করছে, তাই আসে তার অব্যবস্থিতচিত্ততা, আসে মনশ্চাঞ্চল্য, আর সংশয়, আর নানারকম ভয় ভাবনা। এতেই সে বারে বারে চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়ে, তার ফলেই ঘটে মানসিক বিকৃতি। পরিপূর্ণ আলোর যুগ এসে পড়লে এগুলো অবশ্য কিছুই থাকবে না। তখন মানুষ হয়ে উঠবে নিঃসংশয় আর নির্ভীক, সুতরাং সহজ এবং বিকৃতিশূন্য। যাকে চিনি না তার সম্বন্ধে কোনো ভয় জাগে না, যাকে খুবই চিনি তার সম্বন্ধেও কোনো ভয় নেই, কিন্তু যাকে পুরোপুরি না চিনে কারবার করতে হয় তার সম্বন্ধেই নানাবিধ ভয় জাগে, তখনই তার সম্বন্ধে নানাবিধ লুকোচুরি করতে হয়। যেটুকু জানবার আছে সবই যখন জানা হয়ে যাবে, তখন কেউ নিজেকে কিছুমাত্র গোপন করতে যাবে না, তখন সবাই জানবে যে সব মানুষই সমান, কারো কাছে লুকোবার জিনিষ কিছুই নেই। তখন সে জানবে যে নিজের মুখ দেখাতে যেমন কোনো দোষ নেই, নিজের মন দেখাতেও তেমনি কোনো দোষ নেই। তখন মানুষের সমস্ত বিকৃতি আর বিভীষিকা ঘুচে যাবে, মন হয়ে উঠবে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ আর সহজ।

দেহে আর মনে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকাতে মানুষের প্রকৃতিও অনেক বদলে যাবে, তার স্বভাবটা দাঁড়িয়ে যাবে অনেকটা এখনকার ছোট ছেলেদের মতো। এখনকার দিনে দেখা যায় যে, মানুষ কেবল খুব ছোট বেলাতেই হেসে খেলে আনন্দ করে বেড়াতে পারে, বড়ো হয়ে উঠলে আর কিছুতেই তেমন পারে না। জ্ঞান হবার পর থেকে সারা জীবনটাই সে এমন বিশম্ভর হয়ে মুখখানাকে বিকৃত করে থাকে, যেন সারাক্ষণই সে একটা তিক্ত বস্তুকে আস্বাদ করছে। এটা তখন হবে না, মানুষ সারা জীবনই শিশুদের মতো অবলীলাক্রমে হাসতে পারবে, আর সে হাসি এখনকার সভ্যতাজ্ঞাপক শুষ্ক দেঁতোর হাসি নয়, সত্যিকারের খুশি হবার হাসি। এখনকার দিনে অনেকে দেহে মনে অসুস্থ থাকে। অনেকে খেতেই পায় না; আবার অনেকে খেতে পেলেও পাছে দুদিন পরে ফুরিয়ে যায় ভেবে সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকে;—এই সকল কারণেই লোকে হাসতে পারে না। কিন্তু এসব দুঃখ তখন কিছুই থাকবে না। ধনী হোক বা দরিদ্রই হোক, উচিত পরিমাণে সবাই খেতে পাবে। খাবার ব্যবস্থাটা থাকবে খাস কর্তৃপক্ষের তদারকে। খাবার জিনিষ নিয়ে লাভের ব্যবসা করা আর ভেজাল দিয়ে লাভ করে বড়লোক হওয়ার পদ্ধতিটাই একেবারে উঠে যাবে। যে খাবার জিনিষ উৎপন্ন করে প্রকৃতি, মানুষ তাই নিয়ে মধ্যস্থ হ'য়ে কোনো লাভের ব্যবসা চালাবে না। সুতরাং সব জিনিষই হয়ে যাবে খুব সস্তা। যার যা খাওয়া দরকার সবাই তা অক্লেশে কিনে খেতে পারবে। এই খাবার জিনিষ সস্তা এবং সুলভ হওয়ার অবশ্যই একটা সুফল আছে। এখনকার দিনে ভালো জিনিষ সস্তা নয় বলেই যারা কিনতে পারে না তারা না খেয়ে মরে। ফলে একদিকে যেমন অভাবের বিভীষিকা দেখা দিতে থাকে, অন্যদিকে তেমনি তার সম্বন্ধে অতিমাত্রায় লুব্ধতা আসতে থাকে, সুতরাং কোনো দিকের মানুষই সুস্থ অবস্থায় থাকতে পারে না। খাদ্য সুলভ হয়ে গেলে এইটি আর হবে না। তখন গরীবেরা অনাহারে কিংবা বড়লোকেরা অতি-আহারে মরবে না। যার যেটুকু খাবার দরকার, সেইটুকু খেয়েই সে সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকবে, নুন ভাত খেয়ে গরীবদের বেঁচে থাকতে হবে না। ভালো ভালো প্রোটিন জাতীয় খাদ্য তারাও খেতে পাবে। আর জীব হত্যা করে মাছ মাংস খেয়েই যে বাঁচতে হবে তাও নয়। হত্যা মাত্রই

তখন হয়তো উঠে যাবে, মানুষ আর মানুষকেও হত্যা করবে না, কোনো জীবজন্তুকেও নয়। ভালো ভালো প্রোটিন খাদ্য হয়তো শস্যরূপেই উৎপন্ন হবে। এখন থেকেই তার সূচনা দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি যে সোয়াবিন থেকে নানারূপ খাদ্যের আবিষ্কার হয়েছে তার প্রোটিন-মূল্য মাংসের চেয়েও বেশী। এমনি আরো অনেক নতুন জিনিষ খাদ্য হিসাবে আবিষ্কৃত হবে যা খুবই সস্তা, তাই খেয়ে সবাই যথেষ্ট পুষ্টিলাভ করবে।

সুতরাং মানুষ যদি অনবরত রোগেও না ভোগে, আর প্রত্যেকে উচিতমতো ভাবে খেতেও যদি পায়, তাহলে সে যে এখনকার চেয়ে অনেক বেশী দীর্ঘজীবী হবে একথা বলাই বাহুল্য। বস্তুতঃ হবেও তাই। এখনকার দিনেরই রাশিয়ান বৈজ্ঞানিকরা বলতে সুরু করেছেন যে মানুষের অন্ততঃ ১৫০ বৎসর পর্যন্ত পরমায়ু হওয়া উচিত। এটা যে এখন হয় না তা কেবল আমাদের অবস্থাগতিকে। সুতরাং তখনকার দিনে এই প্রকারই হবে। সত্তর বছর বয়সে মানুষের যৌবন হবে, একশো বছর পেরিয়ে গেলে তখন থেকে বুড়ো হতে সুরু করবে, আর এতখানি বয়স হয়ে গেলে দেখতে যে খুব বিশ্রী হয়ে যাবে তা মোটেই নয়। সুস্থ থাকলে মানুষ দেখতে একরকম সুন্দরই থাকে, আর সৌন্দর্য সম্বন্ধে রুচিবোধ থাকলেও সে নিজেকে অনেকটা সুদর্শন আর সুন্দর করে রাখতে পারে। এই রুচিবোধ তখনকার মানুষের আরো অনেক বেড়ে যাবে। কাজে কাজেই পাকা চুলকে কাঁচা করবার, কুদৃশ্য দাঁতকে সুদৃশ্য করবার, লোল চর্মকে মসৃণ করবার, শিথিল অঙ্গকে টাইট্ করবার, মোটা শরীরকে রোগা করবার, আর কালো চামড়াকে ফর্সা করবার অব্যর্থ উপায়গুলো তার সমস্তই জানা থাকবে। কিন্তু কেবল কৃত্রিম উপায়ে নয়, সত্য সত্যই তাদের দেহে এমনি লাবণ্য থাকতে দেখা যাবে। সবাই জানেন যে, দুধে মানুষের লাবণ্য বাড়ায়। দুধ তখন খুবই সস্তা হয়ে যাবে। গরীব ভিখারীদের ঘরেও শিশুরা আর বুড়োরা সবাই খাঁটি দুধ খেতে পাবে। নিয়মই থাকবে এই যে যুবকেরা অন্যান্য প্রোটিন খাদ্য খাবে, কেবল শিশুরা আর প্রসূতিরা আর বুড়োরা খাবে দুধ। শিশুরা পাবে খাঁটি দেড় সের, প্রসূতি আর বৃদ্ধেরা পাবে খাঁটি দু'সের। অবশ্য বৃদ্ধদের এতে মানবে না, দুধ সম্বন্ধে তাদের লোভটা একটু বেশী, তারা আরো কিছু বেশী পরিমাণে হয়তো চুরি করে খাবে। ঐটাই হবে তাদের একমাত্র নেশার জিনিষ, কারণ তখনকার দিনে মদ কিংবা আফিম কিছুই লোকে ব্যবহার করবে না। শুধু তাই নয় চা, কফি আর তামাক এই তিনটি নেশার জিনিষও তখন মনুষ্যসমাজে থাকবে না। সকল মানুষই বুঝে নেবে যে ঐসব জিনিষেই মানুষের মহা অনিষ্ট করে, তাকে নেশার কৃতদাস করে রাখে আর অসুস্থ করে তোলে। সুতরাং ঐসব জিনিষ পৃথিবী থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তখনকার লোকে হয়তো এই কথা শুনে হাসবে যে, এখনকার লোকে আনন্দ পাবার জন্য খাবার জিনিষ ছাড়াও নাকি অন্যান্য অদ্ভুত জিনিষ খেয়ে নেশা করতো, আর যে প্রসন্নতা জীবনে স্বাভাবিক উপায়ে পাওয়া যাচ্ছে না তাকে নেশার দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে টেনে আনবার চেষ্টা করতো।

কিন্তু মানুষ যদি এতটাই সুস্থ আর সুখী হয়ে থাকে, তাহলে ডাক্তারদের দুর্দশা কি হবে? সেদিক দিয়ে কোনো চিন্তা নেই। ডাক্তারদের তখন বরং আরো সুবিধাই হবে, কারণ রোগ তো কিছু থাকবেই, তার জন্যে শিশিতে তিক্ত ওষুধ ভরে রোগীদের গিলিয়ে তাদের তিক্ত মন্তব্য শুনতে হবে না। প্রত্যেক রোগেরই বিশিষ্ট রকমের ট্যাবলেট থাকবে, তাই খেলেই সে রোগ সেরে যাবে। এমন কি টেলিফোনে রোগী বলবে অমুক অসুখটা হয়েছে, ডাক্তার বলবে অমুক ওষুধটা খেয়ে ফেলুন। ফিএর জন্যে ডাক্তারদের আর ভাবতেই হবে না, ফি নেওয়াটাই তখন একরকম উঠে যাবে। ডাক্তার মাত্রই সরকারী তহবিল থেকে নিয়মিত তন্‌খা পাবে। তাছাড়া প্রত্যেক গৃহস্থের কাছ থেকেও কিছু কিছু মাসিক তন্‌খা পাবে, তাতেই তাদের অনেক হয়ে যাবে। কনসালটিং ডাক্তারেরাও গুণ অনুযায়ী মাসিক তন্‌খা পাবে, সুতরাং তারা যে চৌষট্টি টাকা ফি হেঁকে বসবে সেটি আর চলবে না।

ভবিষ্যতের পৃথিবী একদিন সত্য সত্যই এমন হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পৃথিবী যে ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। হয়তো তার সম্পূর্ণ সার্থকতার এখনো অনেক দেরী আছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রজা এই মানুষ, সে চলেছে অন্ধত্ব থেকে দৃষ্টিপ্রাপ্তির পথে, পরম অসহায় অবস্থা থেকে পরিক্রম করে চলেছে চরম পরাকাষ্ঠার পথে। তার সেই সুদীর্ঘ পথযাত্রার ইতিহাসও অতি সুদীর্ঘ। আমরা জন্মেছি তার মধ্যবর্তী পথে, যেখানে জ্যোতির আভাসের সঙ্গে তমসার কালিমা এখনও জড়ীভূত হয়ে আছে, যেখানে আমরা বিজ্ঞানকেও মানি অথচ অনির্দিষ্টের ভয়েও কাঁপি। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে অনেক দুঃখই আমাদের পেতে হয়, যা পূর্ববর্তীরাও পায়নি এবং পরবর্তীরাও পাবে না। কিন্তু এর মধ্যে এইটুকু সান্ত্বনাই আমাদের আছে যে, যতকাল পরেই হোক সুদিন একদিন আসবেই, তখন আমরা যে কষ্টভোগ করছি তা আমাদের বংশধরদের আর ভোগ করতে হবে না। অপটুতায় আমরা যে পীড়া ভোগ করছি, তাতে আমরা ভবিষ্যৎ আগন্তুকদের জীবনোপলব্ধির পথই পরিষ্কার করে দিয়ে যাচ্ছি।



—ঃ লিখেছেন ঃ—

অবনীন্দ্রনাথ, দক্ষিণারঞ্জন, রাধারাণী দেবী, নরেন্দ্র দেব, সুনির্মল বসু, নিশিকান্ত সেন, যামিনীকান্ত সোম, কৃষ্ণদয়াল বসু, জসীম-উদ্দীন, অখিল নিয়োগী, বিমল ঘোষ, ইন্দিরা দেবী, গজেন্দ্র মিত্র, ধীরেন বল, মনোজিৎ বসু, যতীন সাহা, বন্দে আলি মিঞা, পরিতোষ চন্দ্র, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, বুদ্ধু-ভূতুম ও মৌমাছি

—ঃ ছবি এঁকেছেন ঃ—

সমর দে, কান্তি সেন, অমর দে, যতীন সাহা, রেবতী ঘোষ, কামরুল, দেবপ্রসাদ, জয়দেব ঘোষ




কমল সায়র

শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

এক

রাজপুত্র।
তিনটি তাঁর পোষা পাখী।
শুক, সারস আর ময়ূর।

রাজপুত্র যেদিন সরোবরে যান স্নানে, সারস চলে তাঁর আগে আগে। রাজপুত্র যখন বনে যান মৃগয়ায়, পেখম খুলে,' ময়ূর বসে তাঁর রথে। আর শুক, তিন মাস পর পর, তিনটি শুধু কথা, বলে রাজপুত্রের কাছে। শুক বলে, "রাজপুত্র! চলেছ, চল।" শুধু এই তিনটি কথা। আর কিছুই, শুক, বলে না।

সাত বছর রাজপুত্র শুক পোষেন। সাত বছর শুকের একই কথা শোনেন। সব-প্রথম যখন শুনলেন, রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় চলেছি শুক?" শুক আর, কিছুই বললে না। তিন মাস পরও সেই কথা। আরও তিন মাস। রাজপুত্র ভাবলেন, ওকথা, শুকের শুধু, বুলি। রাজপুত্র আর কিছুই বললেন না।

দুই

একদিন, রাজপুত্র চলেছেন মৃগয়ায়। ময়ূর বললে, "রাজপুত্র! শুক কি বলে, আমি জানি।"

রাজপুত্র চেয়ে রইলেন।

ময়ূরের মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে, জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী জান, ময়ূর?"

ময়ূর বললে, "রাজপুত্র, এক দেশে এক রাজকন্যা, ঘুমে। সে ঘুম ভাঙে না। ভাঙবেও না। যদি কেউ ভাঙাবে, তো, সে থাকবে হীরে হয়ে।

কিন্তু রাজকন্যা যে-ঘুমে, সে-ঘুমে। ঘুমে।

"কোন্ দেশে?"

ময়ূর বললে, "তা জানি না।"

রাজপুত্র সাতদিন মৃগয়া করেন। কিন্তু, একদিন মৃগয়া করেই, রাজপুত্র, রথ ফিরালেন।

রাজপুত্র মৃগয়া করে এলে, রাজপুরীতে দামামা বাজে।

দামামা বাজল না।

তিন

রাজপুত্র জিজ্ঞেসা করলেন, "সারস, তুমি কী জান?"

সারস বললে, "জানি। যেখানে রাজকন্যা ঘুমে, সে হল, কমল সায়র।"

সারসের পাখায় হাত রেখে, রাজপুত্র জিজ্ঞেস করলেন, "সে কোথায়?"

সারস বললে, "রাজপুত্র, পৃথিবীর সব সরোবর সায়র আমি জানি। কমল সায়র কোথায়, তা জানি না।"

রাজপুত্র শ্বেত সিঁড়ি দিয়ে আপন ঘরে গেলেন। শুককে সুধালেন, "শুক, সে-কোথায়...কমল সায়র?"

শুক বললে, "রাজপুত্র! চলেছ চল।"

আর শুক, কিছুই বললে না।

তেম্নি দাঁড়িয়ে, তরোয়ালের বাঁটে হাতখানা রেখে, শ্বেতপাথরের দেয়ালে দেয়ালে রাজপুত্র, শুনতে থাকলেন "রাজপুত্র, চলেছ, চল।"

চার

রাজপুত্র তিন বন্ধুকে ডাকলেন। মন্ত্রিপুত্র, কোটালপুত্র, সওদাগর-পুত্র।

এলেন তিনজন।

রাজপুত্র বললেন, "বন্ধু, কমল-সায়র কোথায়, চল, তার খোঁজে।"

তিন বন্ধু পাগড়ীতে চূড়া ভাল করে এঁটে দিয়ে, বললে, চল— —— রাজপুত্র।"

চারটি ঘোড়া ছুটল। মাঠ, বন, পাহাড় পর্বত পার হয়ে, ঘোড়া ছোটে।

কিন্তু, যেখানেই জিজ্ঞেস করেন, সবাই বলে, "হাঁ তো, কমল সায়রের কথা সবাই জানি। কিন্তু, কোথায়, তা তো জানি না।"

যেতে যেতে পৃথিবী ফুরিয়ে যায়। সবার সেই এক কথা। কমল-সায়র চিরদিন জানে; কোথায়, কেউ-ই জানে না।

রাজপুত্র ঘোড়া চালিয়ে দিলেন। বললেন, "বন্ধু, রাত আসছে। ঐ যে পাহাড়ের কোলে বন, চল, ঐখানে বিশ্রাম করি।"

পাঁচ

গহিন রাত। তরোয়াল শিয়রে পেতে, চারবন্ধু ঘুমান।

বাঁশীর সুর।



সারা বনের ফুল, বাঁশীর সুরে ফুটে ওঠে। একটি ফুল, টুপ করে ঝরে' পড়ল সওদাগর পুত্রের চোকের পাতায়। জেগে, সওদাগরপুত্র দেখেন, একটি সাপ। শিয়রের তরোয়াল টানতে না টানতে, সাপের ছোবলে, সওদাগর পুত্র, চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়লেন।

বিষে, সওদাগরপুত্রের দেহ-অঙ্গ নীল হয়ে রইল।

যায় দুদন্ড। আর একটি ফুল। টুপ্ করে পড়ল। কোটালপুত্রের চোকের পাতে। কোটালপুত্র, জেগে দেখেন, একটা নেউল (বেজী)। হাত বাড়িয়ে কোটালপুত্র, নেউলটিকে ধরলেন। নেউলের কামড়ে, কোটাল-পুত্র, চিরদিনের মত ঘুমোলেন। কোটালপুত্রের দেহ-অঙ্গ, লাল হয়ে রইল।

দন্ডকাল গেল।

টুপ্ করে আর একটি ফুল পড়ল, মন্ত্রিপুত্রের ঘুমন্ত চোকে। জেগে উঠে, মন্ত্রিপুত্র দেখেন, পাহাড় নদীর এক কর্কট (কাঁকড়া)। মন্ত্রি-পুত্র, পাগড়ী খুলে, তাকে চেপে দিলেন। কর্কটের দাঁড়া আঙুল কেটে, রক্তে ভাসে পাগড়ী। চিরদিনের মত, মন্ত্রিপুত্র, ঘুমোলেন।

নীরক্ত অঙ্গ, মন্ত্রিপুত্রের, সাদা হয়ে রইল।



বাঁশী।

আবার বাঁশীর সুরে, সমস্ত বন-খানিতে যেন ঘুমের বৃষ্টি নেমে আসে।

কিন্তু ঘুম ভাঙল, রাজপুত্রের।

উঠে বসেই রাজপুত্র দেখেন,—তাঁর তিন বন্ধু কেন, লাল, নীল, শাদা, ! একি! তিনবন্ধু কেন...কালঘুমে ?

দেখেন চেয়ে, সামনে এক, নীল পরী।

আস্তে পাখা দুলিয়ে, নীলপরী বললে, "রাজপুত্র! তুমি কমল সায়রে যাবে? তাই তো। তা তুমি কমল সায়র চাও, না, বন্ধু চাও ?"

রাজপুত্র বললেন, "যে হও সে হও তুমি, কমল সায়র থাক্। আমি বন্ধু চাই।"

মুকুট খুলে, নীলপরী বললে, "রাজপুত্র। ভেবে দেখ।"

তেমনি চেয়ে থেকেই, বললেন রাজপুত্র, "ভেবে আমি, দেখলেম।"

"দেখলে"?

সারা বনে বাঁশী বাজল। মুকুট মাথায় নীলপরী বললে, "রাজপুত্র, সব তুমি পাবে। আমার পাখার শেষ পালকখানি তুমি ছোঁও।"

রাজপুত্র, তরোয়াল তুলে নিয়ে, বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আগে বন্ধু-দের পাই, তো...ছোঁব।"

বাঁশী বাজিয়ে দিয়ে পরী বললে—"রাজপুত্র, এই দেখ।"

ছয়

রাজপুত্র দেখেন, পালক ছুঁতেই তিনি, কোথায় এসেছেন !

কমল সরোবর তো নয়, এ যে সাপের সরোবর! কিল্ কিল্ হিল্ হিল্ করছে সাপ! সোঁ সোঁ রো রো করছে সাপ! সরোবরে এক দ্বীপ, তাতে তাঁর তিন বন্ধু আর চার ঘোড়া, বন্দী। হাতে-পায়ে সাপের শিকল, গায়ে-গলায় সাপের শিকল, মাথার উপরে সাত-সাত সাপের ফণা!

তরোয়াল খুলে রাজপুত্র, সরোবরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

দুভাগ হয়ে গেল জল। কোথায় সাপের সরোবর ?

রাজপুত্র দেখেন, লাল পরী।

তার পায়ের তলে হাড় মুড় মুড় করে ভাঙছে। যোজন যুড়ে নেউলের রাজ্য। নেউলদের লাল, লাল চোক, আর অজগরের হাড়, সাপের হাড়, জীব-জন্তুর হাড়, তিন বন্ধুর, আর চার ঘোড়ার হাড়গোড়, আর গন্ধ!

রাজপুত্র আপন শ্বাস বন্ধ করলেন না; যেদিকে বন্ধুদের আর চার ঘোড়ার হাড়গোড়, এগোলেন সর্‌সর্... তরোয়াল হাতে সেই দিকে।

আঁচল দুলিয়ে লালপরী বললে, "রাজপুত্র! কমল সায়রে যেতে চাও, না, বন্ধুদের হাড়গোড় নিতে যাও ?"

রাজপুত্র এগোতে এগোতে বললেন, "হাড়গোড়।"

লালপরীর বাঁশী উঠল বেজে।

দেখেন রাজপুত্র...কর্কটের দেশ! দুইপাড়ে কাটাকাটি হানাহানি, আর, মাঝখান দিয়ে গল্ গল্ কল্ কল্ করে' রক্তের নদী বয়ে যায়।

হেসে, ঢেউয়ের চূর্ণী-দোলায় দুলছে—শ্বেত পরী।

দেখেন রাজপুত্র, রক্তের বানে তিন বন্ধুর আর চার ঘোড়ার হাড়গোড় ঘূর্ণীসোঁতে ভেসে চলে যায়।

রাজপুত্র, আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন:

যেন সা-ত আকাশের মেঘ ফাটে! বেজে উঠল শাঁখ।

রাজপুত্র দেখেন,

—সবুজ বন!

ফুলে ফুলে, ফুলে ফুলে, বন ছেয়ে আছে। সৌরভে বাতাস ম' ম'। ডাকছে পাখী; কীট-পতঙ্গের গান।

এক সরোবর।

সরোবরে টলু অমল টলু মুক্তোর জল। সেই সরোবরে, কমল।

কমলে অমল-নিশ্বাস রাজকন্যা......

অঘোরে ঘুমান।

সে ঘুম কখ্‌খনো ভাঙে না। কেউ ভাঙতে পারে না। রাজকন্যার কাজল-আলো কেশ, স্বপ্ন হয়ে— পৃথিবী ছেয়ে যাচ্ছে।

রাজপুত্র থমকে' দাঁড়ালেন।

আর, সোণার ঠোঁট এগিয়ে এগিয়ে সাতটি হাঁস বললে, "রাজপুত্র! আমাদের চিনতে পার?"

রাজপুত্র বললেন, "চিনি, তোমরা কমল সায়রের হাঁস।"

"আমরা তোমার চার ঘোড়া আর তিন বন্ধু।"

শুনে, রাজপুত্র পা বাড়ালেন।

"কি চাও?"

রাজপুত্র দেখেন, সবুজ পরী।

কমল তাঁর দুল, হাতে তাঁর শাঁখ। আর, রোদে তাঁর পাখা ঝিক্ মিক্ চিক্ চিক্।

তরোয়াল খাপে রেখে, রাজপুত্র বললেন, "সাত হাঁস।"

খল্ খল্ খল্ হেসে, বললেন সবুজ পরী—

..."অমল সায়র, কমল সায়র,
সেই দেশেতে এলে।
হাঁস নিয়ে যাও, রাজপুত্র,
রাজকন্যা ফেলে?"

রাজপুত্র মাথা নোয়ালেন, বললেন,

"...মাথার মণি রাজকন্যা,
বন্ধু, হীরের মালা।
জ্যোচ্ছনা রাজকন্যা,
বন্ধু, ফুলের ডালা।"

শাঁখ বেজে উঠল।

পরী বললেন,

"...কমল বনের রাজকন্যা,
আপনি কমল ফুল।
তুমি হও, ফুলের বনে,
হীরে
টুল্ টুল্!"

দেখতে দেখতে রাজপুত্র, জন্মের মত হীরে হয়ে রইলেন। সবুজ পরী মিশে গেল হাওয়া-কাঁপন পাতায় পাতায়।

পাখীদের গান বন্ধ হ'ল। কীট-পতঙ্গেরা কেঁদে উঠল।

সাত হাঁস বললে,

"ভাই!!"

"তাই-ই তো!"

জল দর দর চোখ, আস্তে, আস্তে, আস্তে, গিয়ে, সোণার ঠোঁটে করে, সাত হাঁস, হীরেটি, তুলে নিয়ে এল।

আর কী হবে?

কমল পাতায় রাজকন্যার হীরের কৌটো।

হাঁসেরা, সেই কৌটোতে, হীরেটি তুলে রাখলে।

অম্‌নি, দুলে উঠল কমল সায়র।

যে রাজকন্যার, কোন যুগে কখ্‌খনো ঘুম ভাঙবে না, সেই রাজকন্যা, চোক কচলে' উঠে বসলেন...... পদ্মের পাপড়িতে। সরোবরের মুক্তো জল জমে', জমে', জমে', জমে অছিন্‌, অভিন্‌, বিরাট পুরী হয়ে গেল! তার চার দুয়ারে চার পরীর বাঁশী আর শাঁখ। সেই— পুরীর আঙ্গনে ময়ুর, সায়রে সারস। ঘোড়াশালে ঘোড়া। সভায়— জনের মনুষ্যের কল কল কল কল রব, আর মন্ত্রী, আর কোতোয়াল, আর সওদাগর।

কিন্তু, রাজপুত্র?

রাজকন্যা উঠলেন।

ঘুম আর ঘুম, আর ঘুম, আর ঘুম! কতকাল ঘুমিয়েছেন!

অঘুম চোকে পড়ল, সাত মাণিকে চিত্র আঁকা এক কৌটো।

কৌটোর ঢাকন খুলতেই, কি দেখেন?

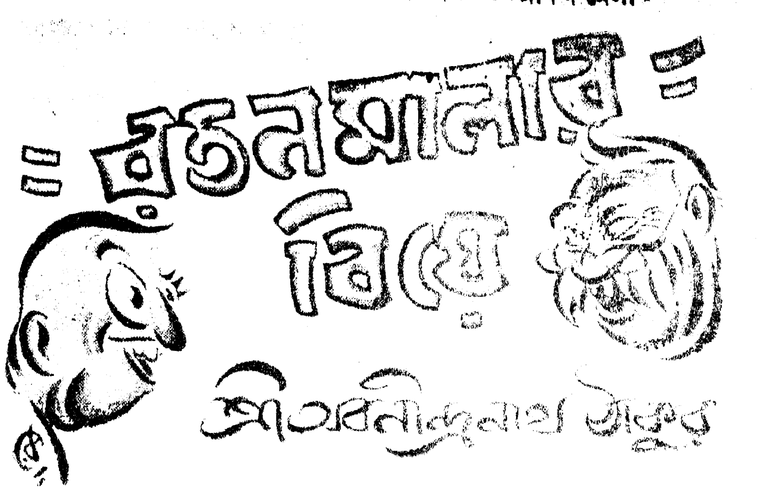
—কমলবরণ রাজপুত্র!

শুক আজ প্রথম কথা বললে—

"রাজপুত্র!

—তিন ভুবনে যেথায় আছে
কমল সায়র,
ফুটবে সেথা, ফুটবে ফুল!
ফুল থরে থর!
রাজকন্যার নিশি যেথা
নিশুত, নিঝুঝুম,
—সে-ও রাত পোহায়,
—পো-হা-য়......নিঃ-সী-ম ঘুম"

—০০—



—আরে এস এস অবুবাবু, গল্প শুনবে। কিছু এনেছ নাকি?

—না চাঁইদাদা, আজ কিছুই পাইনি,—লেবুর লজঞ্জুস্ আছে।

—ও আমার চলে না, তুমি রাখ।—হাই উঠবো উঠবো হলে একটা একটা গালে ফেলো। হাঁ, তারপর বলছিলেম কি চারভাই—উত্তর ডিহি, দক্ষিণ ডিহি, পুব ডিহি, পশ্চিম ডিহি—চার ডিহির মালিক। রাজা বল্লেও হয়, সুখে বসবাস করচেন, আপ্তকুটুম, দাস-দাসী, লোকলস্কর ঢের! কেয়াতলার কালি-বাড়ি, তারই কাছে মস্ত বসত বাড়ি।—সদর বাড়ি, অন্দর বাড়ি, রান্নাবাড়ি, পুজোবাড়ি, এমনি অনেকগুলো ছোটোবড়ো বাড়িঘর নিয়ে একটা সাতমহলা ব্যাপার যাকে বলে,—বুঝেছো?

—বুঝেছি, মাসিমার জয়নগরের বাড়িব মতো।

—আরে নাগো, জয়নগরের বাড়ি বড়ো বড়ো ইঁট দিয়ে গাঁথা, সাহেবমিস্ত্রির তোলা ইমারত, আর সে সাতমহলাবাড়ি পাঁচ ইঁঞ্চি ইঁটের আর কাদার গাঁথুনি—পুরু পুরু দেয়াল, শাবল মারলে শাবল দুমড়ে যায়, একখানি ইট খসে না,—বুঝলে?

—সে বাড়ি এখনো আছে?

—তা কখনো থাকে? শাবল মারলে ভাঙে না সে বাড়ি!! কালের কবলে পড়ে ভূমিসাৎ হয়ে ইষ্টকস্তূপে পরিণত হয়েছে, ঝুড়ি ঝুড়ি সেই ইট কুড়িয়ে কতলোক নতুন দেয়াল তুলে বসে গেছে ঘরবাড়ি ফেঁদে, বড়মানুষি করছে—

—একেই বলে ভাই 'যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দৈ'!

—আচ্ছা চাঁইদাদা, সেই চারভাই—তাদেব আপনার জন কি কেউ বেঁচে নেই এখন?

—কেন থাকবে না—এই আমি আছি বসে জলজ্যান্ত, আর সুন্দরবনের রায়-বাঘিনীর জুড়ি তোমার চাংড়াদিদি—তিনিও হাঁক পাড়ছেন শোন রান্নাঘরের পিছনে, খিড়কি-পুকুরের ঘাটের কাছে।—ছোটো দুভায়ের আমরা দুটি আছি।

—বড়ো দুভায়ের কেউ কোথাও কি আছে!

—আছে শুনেছি, একজন দুজন।—ইস্ফাহানে, ইস্তাম্বুলে, ইজিপ্টে, ইজিচেয়ারে বসে হাবোল-বাবোল্ টানতে আর ধুমা ছাড়তে, আরবীপাসার উজির নাজির হয়ে, কেউবা আছে কাবুলিওয়ালার বেশ ধরে বোগ্‌দাদ বসোরাতে বেদানা আঙুর ফেরি করতে।—ভোল ফিরে গেছে, তাদের চেনাই যায় না আমাদের কেউ ব'লে। বোলও তাদের অন্যরকম। তারা রবাব বাজিয়ে গান গেয়ে দিনে মেওয়া বেচে, রাতে সিন্ধুবাদ জাহাজীর মজলিশে বসে আওড়ায়, 'আলফ্ লয়লা ওয়ালয়লা'!



"পেসোর সে আতা হু"

—তোমার সঙ্গে তাদের কারুর দেখা হয় না চাঁইদাদা?

—কেন হবে দাদা! যদি তাদের কাছে ধার করে গায়ের ধোসা কিনতেম তবেই দেখা হতো।

—কেন!

—ওর মধ্যে কিন্তু কেন নেই দাদা। ধারে শাল নিলেই এসে যায় তারা।—লাঠি হাতে দুয়ারে এসে হাঁক দেবে, পেসোর সে আতাহু—অমনি ঘরবাড়ি ফেলে দে দৌড় করতে পারে তো বেঁচো গেল সে বছরের মতো বেচারা!

—না হলে!

—না হলেই কলম্বালেবু শুঁড়িয়ে জাতটি খুইয়ে দিয়ে চলে যাবে সে।—তাতেই তো তোমার চাংড়াদিদি কলম্বালেবুর উপর চটা।

—চাংড়াদিদির কথা ছেড়ে দাও, তারপর কি হল বল?

—বলি ভাই। এক শকুনের মামলায় ভুচুরের পিসি মাসি—এ হল চানাচুরওয়ালী ও বনলো বোষ্টমী। আর এক কলম্বালেবুর মামলায় আর এক উৎপাত বাধল ও তোমার চাংড়াদিদির দিদিমার দিদিমা তার দিদিমারও দিদিমার বিয়েতে।

—রায়দীঘির ছোটো রায়কে রায়গিন্নি ডেকে বল্লেন, ওগো, ছোট্ ঠাকুরঝির বিয়ে দেবার কি করছ! বয়েসটা যে পেরিয়ে যায়! ছোটরায় সুখরায় নিজের টাকমাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, কি করি বল—নিরুপায়।

রতনমালার বিয়ে হওয়া দায়!—কলম্বা-লেবুর গন্ধের জ্বালায় দুইভাই দেশ ছাড়া হয়েছে, রতনমালাটাও বুঝি যায়! পীরের সিন্নি দিলে যদি রক্ষা পায় এ যাত্রা।

গিন্নিঠাকরুণ বল্লেন, ওমা সে কি কথা গো!

—কেন গোটাকতক সিকির ওয়াস্তা—এসে যাবে ছেলে—এত ভাবো কেন!

—মলেও সে হবে না আমার দ্বারায়—তাতে বিয়ে হোক্ আর নাই হোক্!

বুঝছো না গো, বুঝছো না—তোমার মেয়েটাও যে বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠল।

—পরের কথা পরে ভাবা যাবে বলে রায়-গিন্নি পান গালে ফেলে চলে যান চানে, রায়-মশায় পীরের মানত করেন মনে মনে।

এমনি চলছে, এমন সময় এক সন্ধ্যেকালে কেয়াতলার কালীবাড়ির আরতি চুকে নিশুতি হয় হয়, ঠিক সেইকালে রায়মশায়ের দোরে এক ফুটফুটে ছোকরা এসে হাজির।

—কে হে বাপু তুমি! কোনে হতে আসা হচ্ছে!

—আজ্ঞে আমি পড়ুয়া ব্রাহ্মণের ছেলে। ওগাঁয়ে টোল আছে, পড়তে চলেছি, পথে

জঙ্গলতে হয়ে গেছে রাত, কোথা যাই এখন!

—ভাল কথা, আজ রাতটা এখানেই কাটাও—কাল তখন যাবা টোলে। এই বলে ছোটোরায় ছেলেটিকে বাসায় রেখে গিন্নিকে ডেকে বল্লেন, গিন্নি, পাথরে পাঁচকিল, ছেলে এসে গেছে মনের মতো। তারপর গুজগুজ ফুসফুস চল্লো কর্তাতে গিন্নিতে আধারাত পর্যন্ত। চাকরাণীমহলে রটলো কথাটা—ছেলে কেমন উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখাও হল।

—তারপর কী হল চাইদাদা!

—যা হয়ে থাকে তাই। সে রাত তো কাটলো, তার পরদিন সকালে উঠে ছেলে পড়তে যেতে চায়—ভুগিলহাটে গুরুর টোলে।—দোর খোলা পায় না, একটি কে এসে খিড়কিঘাটে বাসন মাজতে—'হ্যাঁগা খিড়কিদোরটা খুলে দাও আমি যাই!'

—তাও কি হয়গা, হাতমুখ ধোও,



মিষ্টিমুখ কর।—যেমন এলে তেমনি কি যেতে আছে!

মিষ্টিমুখ করতে রয়ে গেল ছেলেটি তো রয়েই গেল—আর যাওয়া হল না—ভুগিল-হাটে টোলের পড়া নিতে। ভুগিলহাটের গুরু-মশাই গুণে দেখেন তাঁর সেই একটি ছাত্র খালি পড়ে রোজই! আর পোড়োদের গুরু শুধান, হ্যাঁরা, মুখুটির পোলা গেল কনে, দেখি না যে টোলে!

মুখুটির সন্ধান করে করে গুরুমশাই হয়রাণ।—ওদিকে বেজে উঠেছে ঢাকঢোল 'রতনমালার বিয়ে'।

'বাস্' বলে গুরুমশাই মাথায় ফেটা বেঁধে হাঁপাতে হাঁপাতে উপস্থিত সুখরায়ের বৈঠকে।

—আসুন, আসুন প্রণাম! মুখ কিছু মলিন দেখচি যে!

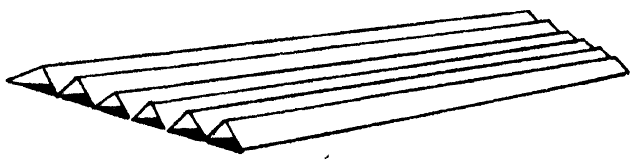
—আর বলেন কেন, অমন ছাত্রটিকে রায় বাঘে নিলে!

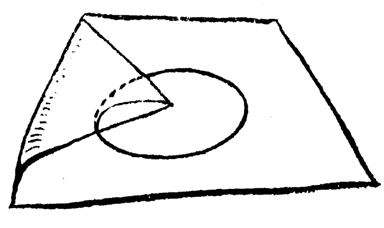
—কী পরিতাপ! রায়মুশার বাঘাগোঁফ—ঢাকা চাপাহাসি গুরুমশাইকে যেন অভয় দিয়ে থাবা বাড়িয়ে একটুকরো কাগজ তাব হাতে গুঁজে দিয়ে জানালেন যে গুরুদক্ষিণা এই পাঁচখাদ জমি।—পরিতাপ করবেন না বালকটির জন্যে!

—সে ছেলের মা-বাপ কি করলে!

—সে জানে তোমার চাংড়াদিদি, আমি ওদের কুলের খবর রাখি না। কাল একটা কলম্বা আনতো আর একটা গল্প বলবো।

মজার কৌশলের সমাধান



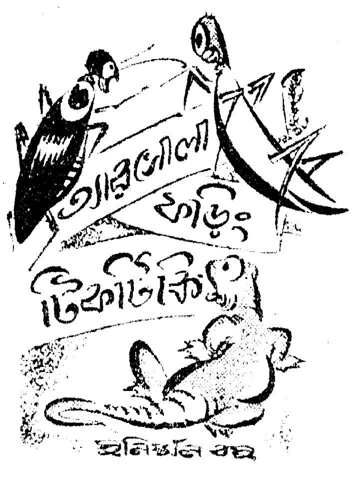


সমাধান

১। ১০″×৬″ কাগজখানি উপরের ছবির মত করে ভাঁজ করে নাও। এবারে গ্লাস দুটির উপর বসিয়ে তার উপর ইচ্ছা করলে তৃতীয় গ্লাসে জলপূর্ণ করে বসিয়ে দিলেও থাকবে।

২। ৬″×৪″ ইঞ্চি কাগজটিকে ঠিক উপরের ছবির মত করে বাঁ-হাতে যে কোনো একটি কোণ মাঝখানে চেপে ধরো। এবারে ঠিক যে কোণটি কাগজের মাঝ পথ স্পর্শ করছে সেই কোণ থেকে সূক্ষ্ম একটি লাইন টানতে সুরু কর। পেন্সিল না তুলে ক্রমশঃ লাইনটি বাঁ দিকে বেঁকিয়ে এনে উপরের চেপে ধরা কাগজ থেকে নীচের কাগজে নামাও। এবারে পেন্সিল না তুলে বাঁহাতে চেপে ধরা কাগজের কোণ ছেড়ে দিয়ে একবারে ধীরে ধীরে চক্রবেষ্টনী রেখাটি এঁকে ফেল। এখন দেখ মাঝখানে বিন্দু আর তার চারপাশে চক্রকার বেষ্টনী রেখা অথচ সেটা কেন্দ্রের বিন্দুকে মোটেই স্পর্শ করেনি। আর একই রেখাপাতে এটি আঁকাও হয়েছে।

৩। মেঝে, টেবিল বা তক্তপোষে রাখা তাসটি থেকে অন্ততঃ ৪।৫ ফুট দূরে মুখ রাখ ঠিক তাসের লেবেলে। এবারে ধীরে ধীরে ফুঁ দিতে থাকো। ক্রমশঃ ফুঁ জোরে দিতে হবে। শেষ মুখে একটু ঝাপটা ফুঁ, দিলেই তাসটি উল্টে চীৎ হয়ে যাবে। কাছে থেকে যে রকমেই ফুঁ দাও না কেন তাস উল্টে যাবে না। শুধু লাফাবে বা সরে যাবে।



আরসোলা

ওরে ফড়িং, তিড়িং তিড়িং লাফাস্ কেন আজ?
হন্দ কুঁড়ে, বদ্ধ পাগল নাইকি কোনো কাজ?
দ্যাখ্না আমি সারাটি দিন খাটি কেমন জোর,
লক্ষ্মী ছাড়া, নাচন ছাড়া, কাজ কি নাহি তোর?

ফড়িং

আরে আরে আরসোলা তুই বক্বকানি রাখ্;
ঘুঁটের গাদায় ঘুরে বেড়াস, বড্ড দেখি জাঁক্!
নোংরা যত আবর্জনা, তাই খুঁটে তুই খাস,
পরের ত্রুটি ধরার আগে নিজের দিকে চাস্।

আরসোলা

ঈস, দেখি তোর বড়ই দেমাক্, লিক্পিকে
তালপাত্,
বেজায় ফাজিল চ্যাংড়া ফড়িং, ভীষণ চালিয়াৎ;
পতঙ্গদের সেরা আমি, রূপে গুণে দু-ই—,
'আরসোলাও পাখী'র' সামিল, জানিস নাকি তুই?

ফড়িং

ন্যাংলা ফ্যাচাং আরসোলাটা পক্ষী যদি হয়,
টিক্টিকিটা কুমীর তবে নিশ্চয় নিশ্চয়।
কে'চো তবে সাপের জ্ঞাতি, হাতীর জ্ঞাতি ব্যাং,
বিদ্যেধরীর আমি জ্ঞাতি, ড্যাং-ড্যাঙা-ড্যাং-ড্যাং।

আরসোলা

থাক্ থাক্ থাক্, ঢের হয়েছে, ভেংচি কাটা রাখ্,
হ্যাংলা ফড়িং, চ্যাংড়ামি তোর শিকেয় তোলা
থাক্।
আমার কথা বুঝবি কি তুই, বুদ্ধি যে টিম্ টিম্,
লিকপিকে সিং গঙ্গাফড়িং, আস্ত ঘোড়ার ডিম।

ফড়িং

গঙ্গাফড়িং মস্ত কুলীন, দেশজোড়া তার নাম,
আরসোলা তুই ন্যাবায় পাওয়া ভ্যাবাগঙ্গারাম।
ফুলে ফুলে বেড়াই আমি, নোংরা ঘাঁটিস তুই,
নাক সি'টকে পালাই যদি হঠাৎ তোরে ছুঁই।

আরসোলা

গৃহস্থদের ঘরে আমার অবাধ অধিকার—
তাদের মাঝেই জীবন কাটাই,
বুঝবি কি তুই তার!
চোরের মত পালিয়ে বেড়াস, উদকো আহাম্মক,—
যেমনি ভীতু, তেমনি বোকা, জানে সকল লোক।

ফড়িং

ভগবানের তৈরি তোরা অপূর্ব এক 'চীজ'—
সারা গায়ে জড়িয়ে রাখিস শক্ত ব্যাধির বীজ।
সেসব ব্যাধি ছড়িয়ে যে দিস, আজব জানোয়ার,
যাদের ঘরে থাকিস তাদের করিস অপকার।

আরসোলা

চুপ করে থাক ফচকে ফড়িং, কচকচানি রাখ,—
একটু জোরে বাতাস এলেই গুমোর হবে ফাঁক;
ছটকে যাবে পলকা মাথা, পটকে যাবি ঠিক—
গোঁত্তা খেয়ে পড়বি ভূ'য়ে, ধিক ধিক ধিক ধিক।

(টিক্টিকির প্রবেশ)

টিক্টিক

টিক টিক টিক, ঠিক ঠিক ঠিক ফড়িং কিছু নয়,
আরসোলাটা অনেক ভালো, পাই যে পরিচয়।
ঘেসো ফড়িং কেঠো ফড়িং, মেঠো ফড়িং আর,
ধরা-ছোঁয়ার বাইরে তারা, কাজের তারা বার।

আরসোলা

কেমন মজা শুনলি ফড়িং টিকটিকি কি কয়!
আরসোলাদের তুলনাতে ফড়িং কিছু নয়।
ধরা-ছোঁয়ার বাইরে তারা কাজের তারা বার,
টিকটিকিটা মোদের গুণের মস্ত সমঝদার।

টিক্টিক (আরসোলার প্রতি)

গুণের আমি ধার ধারিনে শোন ওরে বজ্জাৎ,
এই ধরেছি ঠ্যাংটি চেপে কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ।
সারা সকাল হয়নি খাওয়া জ্বলছে উদর মোর,
এবার পেলাম নাগালটি তোর খ্যাঁট লাগাব জোর।
(টিক্টিকিটা আরসোলাকে গিলতে আরম্ভ
করলো)



আরসোলা

আঃ ছেড়ে দাও টিকটিকি ভাই,
গেল যে মোর প্রাণ,
ফড়িং ধরে খাওনা তুমি আচ্ছা তো বেইমান!

ফড়িং

মুখের কথায় ফড়িং ধরা সহজ তো নয় আর—
ধরা-ছোঁয়ার বাইরে তারা; আচ্ছা নমস্কার।

(টিক্টিকিটা আরসোলাকে উদরসাৎ করলো;
ফড়িং আবার মনের আনন্দে ফুলে ফুলে মধু
খেয়ে বেড়াতে লাগলো)

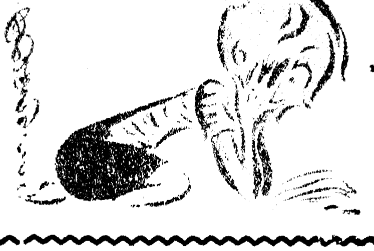


একরকড়ি ঘটকের ছোট ছেলে ফট্কে'
একা ব'সে একমনে পড়ছিলো শট্কে'।

চুপ ক'রে ভাবে সে
খুব ক'রে খাবে সে
ঘন ক্ষীরে চিনি-চি'ড়ে-চাঁপাকলা চট্কে'।
গায়ে ভালো স্যুট প'রে
পায়ে কালো বুট প'রে
তারপরে শুট্ ক'রে পড়বে সে সট্কে'।

মনের কী বিকারে
বনে গেল শিকারে,—
বাগে পেয়ে বাঘে তার দিলে ঘাড় মট্কে'।
ছুঁড়েছিলো গুলী সে,—
শুনে তাই পুলিশে
বে'ধে নিয়ে দিলে তারে ফাঁসিকাঠে লট্কে'।

তখনো সে ঢুলছিলো,—
পাশে ভাঙা টুল ছিলো
তাই নিয়ে পড়ে গিয়ে উঠোনেতে ছট্কে'।
ঘুম ভেঙে কাতরায়,
জলে শুয়ে সাঁতরায়,
ঘড়া ঘড়া জল ঢালে উড়ে' মালী কট্কে'।
ক'সে তারে ধমকালো,—
শেষে পিলে চমকালো—
সামনে বিষম কালো গায়ে-কালো-কোট কে
বড়দা যে! —বাপ্ রে! —
অমনি সে ঘাবড়ে'
চট্ ক'রে সুর-করে শুরু করে শট্কে' ॥



শির দিয়া - সার না দিয়া

শ্রী যামিনীকান্ত সোম

শিখদের শেষ গুরু গোবিন্দসিংহের পিতা গুরু তেগবাহাদুরকে দিল্লীর বাদশাহের কোপে পড়ে নিজের মাথা দিতে হয়েছিল। সে কাহিনী বড়ই করুণ।

তেগবাহাদুর হলেন ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের ছেলে। হরগোবিন্দের পর তেগবাহাদুরেরই গদী পাবার কথা, কারণ তেগবাহাদুরের বড় ভাই আগেই মারা গেছলেন। কিন্তু তা না হয়ে, গদী পেলেন তাঁর বড় ভাইয়ের ছেলে হররায়। এই পৌত্রটিকে গুরু হরগোবিন্দ বড় বেশী ভাল বাসতেন, আর সেই জন্যই এ'কে তিনি গদীতে বসিয়ে গেলেন। তেগবাহাদুর কিছুকালের জন্য কোথায় গেলেন তলিয়ে।

হররায় প্রায় তেত্রিশ বছর ধরে গুরুর আসনে থেকে মারা গেলেন। তারপর গুরুর আসনে বসলেন হররায়ের ছোট ছেলে হরকিষণ। ইনি কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই মারা গেলেন। তখন তেগবাহাদুরের খোঁজ পড়লো। তারপর অনেক কাণ্ডের পর তেগবাহাদুর গুরুর গদীতে বসলেন।

তেগবাহাদুর গরীবদের দুঃখ খুব বুঝতেন। তিনি বলতেন আমি তেজের কাজে বাহাদুর কি না জানি না, তবে আমি নিজেকে 'ডেগ্‌বাহাদুর' বলে পরিচয় দিতে খুব রাজী, অর্থাৎ ডেগ্‌চি ভরে রান্না করে ক্ষুধার্তদের খাওয়ানোর কাজে আমি খুব বাহাদুর। তেগবাহাদুর গদীতে বসে শিখ্‌দের খুব প্রিয় হয়ে উঠলেন। দলে দলে শিখেরা এসে জড়ো হতে লাগলো। গুরুর আসনে বসে তিনি রাজার ঠাটে রইলেন। প্রায় এক হাজার অস্ত্রধারী ঘোড়-সওয়ার তাঁর তাঁবেদারী করবার জন্য মজুদ রইলো। তারপর করতারপুরে তিনি এক বিরাট দুর্গ তৈরী করতে সুরু করলেন। এদিকে এই ভাবে তাঁর ক্ষমতা আর সমৃদ্ধি বেড়ে চলেছে, ওদিকে বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের কানে পৌঁছলো তাঁর দুর্গ তৈরীর কথা, এক হাজার ঘোড়-সওয়ার রাখবার কথা আর সুখসমৃদ্ধির কথা। বাদশাহ ভাবলেন, গুরুকে তো এবার তা হলে দমন করা উচিত। তিনি হুকুম দিলেন, তেগবাহাদুরকে ধরে আনতে। সপরিবারে তাঁকে দিল্লীতে গ্রেপ্তার করে আনা হোল। তেগবাহাদুর বাদশাহকে বললেন যে, তিনি ঈশ্বরের ভজনা নিয়েই থাকেন, তিনি সন্ন্যাসী ফকীর ছাড়া আর কিছুই নন। কিন্তু শুধু মুখে বললেই তো হবে না, কাজেও তা দেখাতে গেল। দিল্লী থেকেই তাঁকে রওয়ানা হতে হোল তীর্থ ভ্রমণে। নানা জায়গা ঘুরে শেষে তিনি পাটনায় গিয়ে রইলেন পাঁচ-ছ' বছর ধরে। কাশীতেও তিনি কিছুদিন ছিলেন। তারপর শেষকালে আবার তিনি নিজের দেশ পাঞ্জাবে ফিরে গেলেন।

এতকাল ধরে নানা তীর্থ ঘুরে আর উদাসীনের মতো যেই দেশে যেই ফিরে এলেন, অমনি তাঁর মনের ভাব বদলে গেল। আবার তিনি দলবল জুটিয়ে এমন সব কাণ্ড করতে লাগলেন যে, বাদশাহকে শেষটায় একদল ফৌজ পাঠাতে হোল তাঁকে ধরে আনবার জন্য।

তেগবাহাদুর বুঝতে পারলেন যে, এবার আর তাঁর পরিত্রাণ নেই। বাদশাহী ফৌজের সঙ্গে দিল্লী রওয়ানা হবার সময় তিনি তাঁর বালক পুত্র গোবিন্দ-সিংহকে কাছে ডেকে তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে, তাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করে বললেন—আমি দিল্লী যাচ্ছি মরতে, আর ফিরবো



না। তুমি পারো তো এর প্রতিশোধ নিও। আমাদের পূর্বপুরুষের এই কৃপাণ তোমায় দিয়ে গেলাম। এই কৃপাণ ও গুরুর আসনের উত্তরাধিকারী এবার তুমিই। বিদায় বৎস।

বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের কাছে হাজির করা হোল তাঁকে। বাদশাহ তাঁকে তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতে ল্যাগলেন। অনেকক্ষণ ধরে অনেক তর্ক হোল। শেষে বাদশাহ তাঁকে বললেন—গুরুজী তুমি যখন এত বড় একজন ফকীর, তখন তোমার অলৌকিক শক্তি কিছু দেখিয়ে দাও। কিন্তু অলৌকিক শক্তি কি দেখাবেন তিনি? বাদশাহকে তিনি কোন রকমেই সন্তুষ্ট করতে পারলেন না, না যুক্তিতর্ক দিয়ে—না অলৌকিক কিছু দেখিয়ে।

বাদশাহ তখন তাঁকে কয়েদখানায় পাঠালেন আর বললেন—তুমি তাহলে ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ কর। কিন্তু গুরুজী কি এতে রাজী হতে পারেন। এরপর তাঁর উপর পীড়ন চললো অমানুষিক রকমে ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করানর জন্য। পীড়নের আর বিরাম নেই। শেষে তাঁর সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। তখন তিনি বাদশাহকে বলে পাঠালেন যে, তিনি বাদশাহের সামনে খাস দরবারে এবার এক অলৌকিক ক্ষমতা দেখাতে চান। এই কথায় তাঁকে বাদশাহের সামনে হাজির করা হোল। বাদশাহ বললেন—দেখাও তোমার ক্ষমতা। তিনি এক টুকরো কাগজে দু'চার কথা কি লিখলেন, লিখে সে কাগজটি মুড়ে নিজের গলায় বেঁধে নিয়ে বললেন—মানুষের নিজের ক্ষমতা আর কতটুকু! কি ক্ষমতাই বা সে দেখাতে পারে! ঈশ্বর-ভজনই হোল আসল কাজ। সে কাজ করে যেতে পারলেই সব সার্থক। তবে বাদশাহ যখন ইচ্ছা করেছেন, তখন কিছু ক্ষমতা আমাকে দেখাতেই হচ্ছে। এই যে মন্ত্র-লেখা কাগজটি গলায় বেঁধে নিয়েছি, এর ক্ষমতা এ রকম যে ধারালো অস্ত্রের কোপ মারলেও আমার গলা কাটবে না।

এই কথাগুলি বলে গুরুজী চুপ করলেন। বাদশাহের তখন ভারি কৌতুহল। তখনই জল্লাদ এসে দাঁড়ালো ধারালো তরোয়াল হাতে। আর আমীর, ওমরাহ থেকে আরম্ভ করে সব রকম লোকের ভিড় লেগে গেল এই অলৌকিক ব্যাপার দেখতে। বাদশাহ হুকুম দিলেন জল্লাদকে সজোরে তরোয়ালের কোপ লাগাতে। সবাই ভেবে নিয়েছিল কিছুই হবে না। কিন্তু এ কি! তরোয়ালের কোপ লাগামাত্রই গুরুজীর কাটামাথা ছিট্‌কে পড়লো মাটিতে। এই রকমটি দেখবার জন্য কেউ-ই প্রস্তুত ছিল না। সবাই হতভম্ব হয়ে গেল। গলায় বাঁধা কাগজটি খুলে দেখা গেল তাতে লেখা আছে—

'শির দিয়া, সার না দিয়া'।

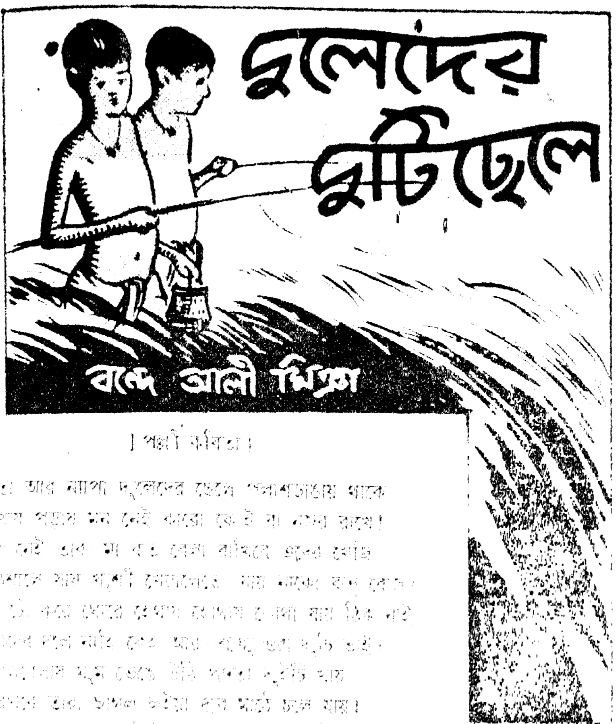
শির দিলাম, তবু সার দিলাম না অর্থাৎ ধর্মত্যাগ করলাম না।

কি হতে কি হয়ে গেল দেখে সবাই দুঃখিত হলেন। বাদশাহ যা দেখতে চেয়েছিলেন, তা দেখতে না পেয়ে বিরক্ত হয়ে উঠে চলে গেলেন। দরবার ভেঙ্গে গেল।

তারপর? তারপরের ঘটনা সামান্যই। সামান্য হলেও আরো করুণ। যে গুরুজীর দেহকে বহু-লোকে পুজো করতো, তাঁর সেই পবিত্র দেহ সহরের রাস্তায় ফেলে দেওয়া হোল, আর তা পড়ে রইলো পথের ধুলায়। তাঁর কয়েকজন শিষ্য বহু কষ্টে কোন রকমে সে দেহ উদ্ধার করে পাঞ্জাবে নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে তাঁকে সমাধিস্থ করে।

দিল্লী সহরের যে জায়গায় দেহটিকে ফেলে রাখা হয়েছিল, শিখেরা সে জায়গায় এক বিরাট সৌধ তৈরী করে রেখেছেন, তার নাম হোল "শীষগঞ্জ"। এই স্থানটি মহা-পবিত্র।





[পল্লী কবিতা]

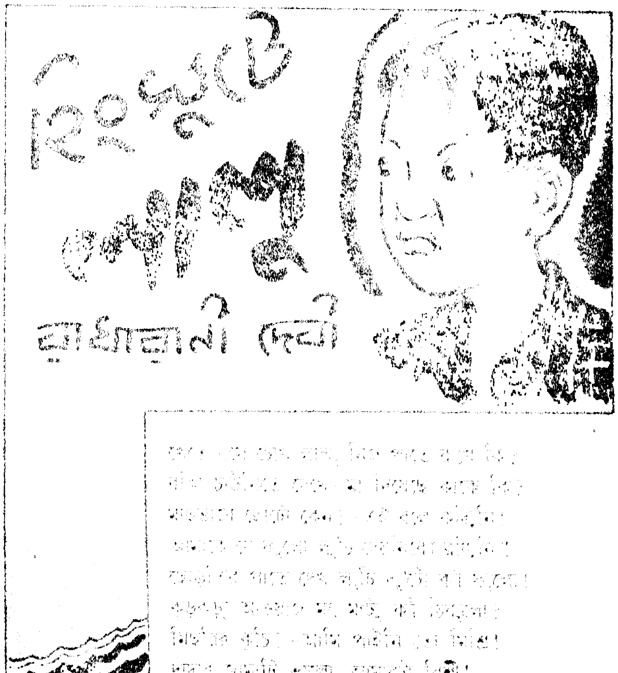
নন্দ আর নাপা দুলেদের ছেলে পলাশডাঙায় থাকে
লেখা পড়ায় মন নেই কারো কেউ না [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible] হাতড়িয়ে ওরা চিংড়ি ও বেলে ধরে।

আল্‌পথ বেয়ে সবুজ মাঠেতে চলে ওরা পাশে আগে
সোনালি ধানেতে মনেতে ওদের স্বপনের ঘোর লাগে;
নীল আকাশেতে সাদা সাদা মেঘ বেড়ায় আলসে ভাসি
হিজল ছায়ায় বাঁশরী বাজায় কাজল কিশোর চাষী।

কাশফুল দোলে মাঠের কিনারে বাতাসে হেলিয়া পড়ে
বক উড়ে যায় দূর পথে কোথা কোন্ বা গাঙের চরে;
দুই ভাই ওরা দেখে চারিদিকে—চলে আল্‌পথ বাহি
ভাসান যাত্রায় শেখা গান যত চলে তাই গাহি গাহি—
শালুকের ফুল পথের কিনারে ফুটেছে ডোবার মাঝে
দুইজনে ওরা লোভ সে ইহার সাম্‌লিতে পারে না যে।
নয়ানজুলিতে ঝলমল করে বরষার ঘলা জল
বুক ভরে তার আলো করে আছে অঢেল সাপলা দল,
গোটা কয় তার আনিবে ইহারা না জানি কেমন করে
পাটখড়ি আর কঞ্চি হলেও টেনে আনা যেত তায়।
নালকোঁচা এঁটে [illegible] জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ি
দুই [illegible] সাপলার ফুল নিয়ে এলো সরাসরি;
ফুল পেয়ে ওরা কী যে খুশী হলো বুঝায়ে বলা না যায়
[illegible] পরিল নিজ গলায়,—
[illegible] পথের 'পরে।
[illegible]
[illegible] নাই।



[illegible]
[illegible] আমি পারিনে যে [illegible]!
দাদার [illegible]!
[illegible]
আমার বেলায় খালি খাঁকিপ্যান্ট শার্ট আর।
দাদা যায় বনভোজনে, আমি কেন যাবো না?
দিদি যায় [illegible], আমি কেন যাবো না?

অভাগা জগু

নরেন্দ্র দেব

যুদ্ধে এবার জগুর হাতে জমতে কিছু টাকা,
ভাবলে জগু যাবেই যাবে গ্রাম ছেড়ে সে ঢাকা।
দু'কুড়ি দশ কাটলো বয়স ছোট্ট একটা গ্রামে
শহর কেমন হয়নি দেখা, শোনাই আছে নামে।

'দুর্গা' বলে জগবন্ধু বেরিয়ে পড়লো আজ,
কাপড় কোরা, গোঞ্জ ধোয়া অদ্ভুত তার সাজ।
'চললে কোথায় মোড়লের পো?' শুধায় সবাই ডেকে,
জগবন্ধু বল্‌লে 'দাদা, ফিরবো শহর দেখে।'

ধানের ক্ষেতে আলের পথে পাক্কা দু'কোশ পথ
ছাড়িয়ে জগু চড়কতলা রায়বাবুদের রথ—
হাজির হ'ল মাঠ পেরিয়ে ইস্টিশানে এসে,
রেলের বাঁশী সেই বেজেচে চমকে ওঠে হেসে।

বাপ্‌রে বাপ! জংশনে আজ একি লোকের ঠ্যালা!
বেজায় দেখি ভীড় জমেচে! আজ কি কোনো মেলা?
অনেক ঘুরে জিগেস করে শেষটা যখন আসে
ধাক্কা খেয়ে ভীড় ঠেলে সে টিকিটঘরের পাশে।

জগুর তখন হাঁফ ধরেছে, ক্ষেপাতে সে কাবু;
বললে—'ঢাকার টিকিট কেটে দ্যান ত' আমায় বাবু!'
হুইস্‌ল্ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে ফ্ল্যাগ নাড়চে গার্ড,
জানতে চাইলে রেলের বাবু—'ইন্টার না থার্ড?'
দুরেছে তখন ফাস্ট ক্লাশে এক কামরাতে দুই স্থান,
খানিক ভেবে জগবন্ধু বললে—'যা হয় দ্যান!'

'কই টাকা দাও—পৌনে তেরো' রেলের বাবু হাঁকে,—
পকেটমারায় টাকাটি জগুর মেরেছে কোন ফাঁকে!
হাতড়ে দেখে—সাবাড় গেঁজে একটিও নেই টাকা—
হায় গো জগুর হ'ল না আর যাওয়া এবার ঢাকা।



চিত্র ও চরিত্র — শিল্পী শ্রীধীরেন বল

কড়াপাকের সন্দেশে খুব দীনু ঘোষের নামটা আছে,
দোকান ছোট, বড় বড় খদ্দের সব তাহার কাছে।
আজকে আছে রথের মেলা, দীনু ত আজ ক'দিন ধরে
ভুগ্‌ছে আবার ম্যালেরিয়ায়—বিকেল হ'লেই বেহুঁস জ্বরে।

মা ডেকে কন—"লালু-ভুলু, সন্দেশের এই দোকান নিয়ে
তোরাই বাছা বিক্রী করে' আয়না রথের মেলায় গিয়ে।"
বাবার অসুখ, কাজেই দু'ভাই মেলায় যেতে সাজ্‌লো ত্বরা,
দুইটি হাঁড়ি সন্দেশ মা দিলেন দু'সের ওজন করা।

"তিন টাকা সের—দুই সেরেতে ছয়টা টাকা হয় হিসেবে,—
দেখে শুনে দামটা দু'ভাই গুণ্‌তি করে' বাজিয়ে নেবে।
আর এই দিলুম দুইটা সিকি—দু'ভাই কিছু মেলায় খেও,
ফির্‌লে ঘরে বখ্‌শিস্‌টা—মনের মতন রইল সে-ও!"



পথেই লালুর ইচ্ছে হ'লো সন্দেশ সে দেখ্‌বে চেখে—
সিকিটা তাই ভুলুর দিয়ে কিন্‌লে দু'টো ভুলুর থেকে।
বুঝিয়ে বলে,—"জানিস্ ভুলু, দাম দিয়েই ত খাচ্ছি কিনে,
এত' নয়কো অম্‌নি খাওয়া—এমন খেতে দোষ দেখিনে।"
ভুলু বলে 'বেশ ত'! আছে আমারো এই একটা সিকি,
এইটা দিয়ে তোমার থেকে আমিও চাখি, দাওনা দিকি।"
খেয়ে-দেয়ে দু'ভাই উঠে' চল্‌লো আবার মেলার পানে,
দুটো করে' সন্দেশে আর নোলায় তাদের জল কি মানে?
আবার পথে বল্‌লে লালু—"পেলুম ত' ফের এই সিকিটে,
আরও দুটো সন্দেশ দে' লাগ্‌ছে এযে বড্ডই মিঠে!"

ভুলুও তাই তার সিকিতে কিন্‌লে আবার লালুর কাছে,
একেবারেই নগদ-নগদ, ধারে বেচার সাধ্যি আছে?
এমনি করেই বল্‌লে লালু, ভুলুর হাঁড়ি আবার পথেই,
ভুলুও ঠিক লালুর হাঁড়ি সাবাড় দিলে হিসেব মতেই।
মা'র তৈরী কড়া-পাকের সন্দেশে বেশ পেট ভরিয়ে
আস্তে ধীরে দু'ভাই এবার পৌঁছুলো ঠিক মেলায় গিয়ে।
ভাব্‌লে—এ বেশ মন্দনা ত'—নইলে ত' ওই সবার মতো
হা-করে' ওই পথের ধারে দোকান খুলে বস্‌তে হ'তো।
জিনিষ বেচার হাঙ্গামা কম?—ওজন করো, দাম বুঝে নাও
এর চেয়ে সেই পথেই তারা বেশ পেয়েছে সুযোগটাও।
রথের মেলা দু'ভাই এবার দেখ্‌লে ঘুরে সকলখানে,
সাঁঝের আগেই স্ফূর্তি করে' চল্‌লো ফিরে ঘরের পানে।

মা কন—'বাছা, সব সন্দেশ বিক্রী হলো—খুসীই শুনে!
হিসেব মতো এবার তোদের ছয়টি টাকা নিচ্ছি গুণে'।"
লালু-ভুলু খুল্‌ল থলে—গুণ্‌লে বলে' জম্‌লো কি কি?
আজব কথা! দুটো থলেয় মাত্র যে গো দুইটি সিকি!

ঃ শুভেচ্ছা ঃ

শারদোৎসব এ বছরে ম্লান? অশন-বসন নাই?
তাতে কি হয়েছে? আছে মনে প্রীতি? আনো আনো আজ ভাই।
আনন্দ আনো মনে তোমাদের—মুখে আনো মধু হাসি
অভাবে দৈন্য ভুলে এক হও— একে আরে ভালবাসি।
সে হাসি ফোটাতে তোমাদের মুখে—আনন্দ দিতে শুধু
আমার সাধ্যে যেটুকু পেরেছি—এনেছি সেটুকু মধু
শারদোৎসবে বন্ধুরা মোর প্রাণের পরশ নিও
প্রীতি ও প্রণতি শুভাশীষ মোর— যেথা যেটি লাগে দিও।

ইতি—

মৌমাছি



সোনার দেশে লোহার মানুষ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর সঙ্গে নারায়ণের সামান্য একটু তর্ক বেধেছিল। নারায়ণ বলছিলেন, তোমার পুজো করে সামান্য লোকেরা, কৈ তেমন বড় কেউ করেছে বলেত শুনিনি। পৃথিবীতে যত বড় সাধক, ভক্ত আছে সবাই আমার জন্যই জপ-তপ করে, তপস্যা করে। এমন কি অসুর রাক্ষস যারা বড় হয়েছে, রাবণই বল আর বৃত্রাসুরই বল, তারাও কেউ তোমার পুজো করে বড় হয়নি—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এঁদের কাছে বর পেয়েই তাদের যা কিছু শক্তি।

লক্ষ্মী বললেন, কেউ হয়নি বলে কি হতে পারে না—এরও কোন মানে নেই! আমি প্রমাণ করে দেব যে শুধু আমার পুজো করেও পৃথিবীতে মানুষ বৃত্র-বলি রাবণের মতই শক্তিশালী হতে পারে!

এই বলে লক্ষ্মী পৃথিবীর দিকে তাকালেন। নীচের দিকে চাইতেই চোখে পড়ল—

সুবর্ণপুরী! সোনার দেশ!

আহা সার্থক নাম! পাহাড় সমুদ্রে ঘেরা সুন্দর দেশ, গাছে তার অমৃত ফল, মাঠে তার সোনার ধান—নদীতে ত জল নয়, যেন ক্ষীরের ধারা বয়ে চলেছে! একই দেশের কোথাও সুমেরুর মত ঠাণ্ডা, কোথাও সাহারার মত মরুভূমি—কোথাও বা স্বর্গের মত চিরবসন্ত বিরাজমান। কোথাও কোন অভাব নেই, কোথাও দুঃখ নেই। মানুষকে সে দেশে শুধু বেঁচে থাকবার জন্য ছুটোছুটি করতে হয়না, খাটতে হয়না। তারা বেশী চায়ও না। ফুলের গন্ধে, পাখীর ডাকের মধ্যে ছোট ছোট কুটীর বেঁধে লেখাপড়া নিয়ে থাকে। ওদের লোভ নেই, বেশী আশা নেই—যা পেয়েছে তাতেই খুশী। অন্যদেশের ঐশ্বর্য নিয়ে তারা মাথা ঘামায়না, তাদের দেশে যারা আসে তাদেরই সাদরে ডেকে স্থান দেয়। বড় শান্ত, মধুর তাদের জীবন।

যেমন দেখা অমনি মন স্থির করা। লক্ষ্মী নেমে এলেন সুবর্ণপুরীতে।

প্রথমেই গেলেন রাজার কাছে। বললেন, 'তুমি আমার পুজো কর, তোমাকে আমি আরও দেব। সমস্ত পৃথিবীর রাজা ক'রে দেব তোমাকে।'

রাজা মাথা নেড়ে হাত জোড় করে বললেন, 'দেখি, ভগবান আমাকে যে দেশটুকু দিয়েছেন শাসন করবার জন্য, সেইটিই যেন ভালভাবে শাসন করতে পারি এই আশীর্বাদ করুন। আমি ক্ষত্রিয়, প্রজাপালন করা, দুর্বলকে রক্ষা করা, আর দুষ্টকে শাসন করা এই আমার কাজ। আর কিছু চাইনা, লোভও নেই। যদি সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দিতে পারি ত হলেই আমার ঢের পুরস্কার পাওয়া হবে।'

লক্ষ্মী সেখান থেকে গেলেন প্রজাদের কাছে।

প্রজারা বললে, 'লোভেতেই লোভ বেড়েই যায়—ঐশ্বর্যে মানুষের তৃপ্তি নেই। তোমাকে আমরা চাই না, তুমি চলে যাও।'

যোগীরা বললে, 'তোমার ও ধনদৌলতে আমাদের কি হবে? রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু—এর হাত থেকে ত তুমি আমাদের বাঁচাতে পারবে না। আমরা চাই অমৃত—অর্থ নয়। তুমি যাও।'

রাগে লক্ষ্মী জ্বলে উঠলেন। সেখান থেকে সোজা চলে গেলেন শ্বেত দ্বীপে। সেখানকার রাজাকে বললেন সেই কথাই—যা সুবর্ণপুরীর রাজাকে বলেছিলেন।

শ্বেতদ্বীপের রাজা বললেন, 'দেবি, আমার বড় লোভ [illegible] ঐ সুবর্ণপুরীর ওপর—ওটি দিতে পারেন?'



লক্ষ্মী বললেন, 'পারি। সমস্ত পৃথিবীর রাজা করে দেব তোমাকে। সুবর্ণপুরীও পাবে তুমি।'

রাজা বললেন, 'কি করে?'

লক্ষ্মী জবাব দিলেন, 'আমার অন্য অস্ত্র নেই। আছে লোভ আর আছে এই—টাকা। এই দিয়েই পৃথিবী জয় করতে পারবে।'

এই বলে তিনি একটি সোনার টাকা রাজার হাতে দিলেন। বললেন, 'টাকা দিলেই সব জিনিষ পাওয়া যায়, এইটে ওদের বুঝিয়ে দাও। ওদের শস্য নিয়ে টাকা দাও, কাপড় নিয়ে টাকা দাও। আর সুন্দর সুন্দর বিলাসের জিনিষ নিয়ে গিয়ে ওদের সামনে ধরো, টাকা দিলেই সেগুলো পাওয়া যাবে বুঝিয়ে দাও। এমনি করে আগে যাও বাণিজ্য করতে, টাকাতে ওদের লোভ বাড়ুক, লোভ বাড়লেই দলাদলি হবে, সেই সুযোগে তুমি ওদের রাজ্য জয় করবে। টাকার চেয়ে বড় অস্ত্র আর কিছু নেই বৎস।'

তাই হ'ল।

শ্বেত দ্বীপের রাজা সুবর্ণপুরীর রাজার কাছে লোক পাঠালেন, 'তোমাদের দেশে ত প্রচুর শস্য হয়, আর আমরা খেতে পাইনে। কিছু কিছু দাও না! অবিশ্যি অমনি নেবো না, তার বদলে অন্য জিনিসও দেব'—

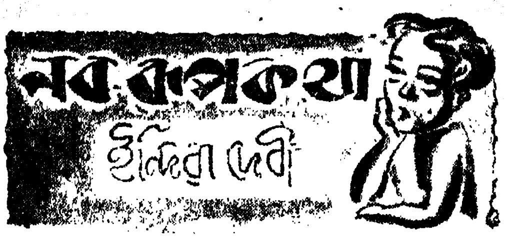
সুবর্ণপুরীর রাজা বললেন, 'বেশ ত!'

এল ওরা। সোনার টাকা দুহাতে ছড়াতে লাগল দেশে। যে জিনিষের কোন অভাব নেই তা দিয়ে যদি এমন চকচকে টাকা পাওয়া যায় মন্দ কি?—সুবর্ণপুরীর লোকেরা এই ভেবে টাকা নিয়ে জমাতে লাগল। এমনি করে দেশে একদল হ'ল গরীব, একদল বড়লোক। যারা বড়লোক হ'ল তাদের লোভ বেড়ে গেল—আরও চাই! ফলে ঝগড়া-ঝাঁটি বেড়ে গেল, মিথ্যা কথা ব'লে, ঠকিয়ে, যেমন ক'রে হোক তাদের আরও চাই।

ঠিক সেই সময়ে সুযোগ বুঝে শ্বেতদ্বীপের রাজা সুবর্ণপুরী আক্রমণ করলেন। সুবর্ণপুরীর রাজা প্রজাদের ডাকলেন যুদ্ধ করতে যাবার জন্য—কেউ এল না। ওদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি বেধে উঠেছে ভীষণ রকমের—আসবে কেন? বরং কেউ কেউ শত্রু পক্ষে যোগ দিলে।

ফলে—একরকম বিনা চেষ্টাতেই সুবর্ণপুরী শ্বেতদ্বীপের অধীন হ'ল। শুধু সুবর্ণপুরী নয়—বলতে গেলে সারা পৃথিবীই ওদের হাতে এসে গেল, টাকা আর লোভ, এই হ'ল ওদের বড় অস্ত্র।

কিন্তু সবচেয়ে দুর্দশা হ'ল সুবর্ণপুরীরই। ভগবান ওদের অনেক দিয়েছিলেন, তাই ওরা এ জীবনের দুঃখকষ্ট কি জানত না—লেখাপড়া নিয়েই থাকত সবাই। সংসারের খারাপ লোকদের সঙ্গে চলতে গেলে যতটা প্যাঁচালো বুদ্ধি থাকা দরকার ততটা কারুরই ছিল না, শ্বেতদ্বীপের লোকেরা ওদের এই সরলতার সুযোগ নিয়ে খুব ঠকাতে লাগল। আর ঐশ্বর্যও ত এদের কম ছিল না। লোভটাও সেই জন্যে সকলের বেশী এই দেশের ওপরই। ফলে অমন সোনার দেশ অভাবে যেন পড়ে গেল। সুবর্ণপুরীর লোকেরা খেতে পায় না, পরণে ওদের কাপড় নেই, লেখাপড়ার কথাও ভুলতে বসল। দেশে অরাজকতা দেখা দিল। রাজার লোকেরা এসেছে ওদের সর্বস্ব নিতে—শাসন করতে, রক্ষা করতে ত আসে নি! দুর্ভিক্ষমড়ক এখন ওদের নিত্যসঙ্গী—পেটে অন্ন নেই বলে স্বাস্থ্যও দিন দিন সকলের খারাপ হয়ে গেল। এত বড় দেশের এতগুলো লোক বেঁচে রইল যেন মুড়ার মত—বুদ্ধি নেই, বল নেই, স্বাস্থ্য নেই, আনন্দ নেই, জ্ঞানচর্চা নেই—শুধু এক বেলা আধপেটা



কথাকে রূপ দিতে পারলে, কথার পর কথা সাজিয়ে যে ছবি আঁকা যায় তাই রূপকথা—তাই নয়?

সেদিন বাবলু আর রাণু দুজনে হাজির, কি ব্যাপার?

—রূপকথা শুনবো!

—আচ্ছা শোনো, এক রাজ-পুত্তুর, এক মন্ত্রী-পুত্তুর আর এক কোটাল-পুত্তুর—

—ওঃ এই গল্প! এ আমরা জানি! নতুন গল্প বলো! মুখ বেঁকিয়ে রাণু বল্লে।

—আচ্ছা শোনো তবে: এক রাজা আর এক রাণী, মস্তো বড় রাজ্য, রাজপুরী গম গম করে লোকে আর লস্করে। কিন্তু রাণীর মনে সুখ নেই, রাজার মুখ ভার।

—কেন কি হলো?

—না রাজার কোনো ছেলে মেয়ে নেই।

—ওঃ এই! এও আমাদের জানা, সেই একদিন সন্ন্যাসী আসবে, একটা শিকড় বেটে দেবে—এই তো? বাবলু বল্লে।

আমি ওদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওদের চোখে মুখে কি আগ্রহ আর প্রতীক্ষা! গল্প শোনবার কি ঐকান্তিক ইচ্ছা!

—কি, কি হলো বলো না তাড়াতাড়ি, রাণুর গলায় তাগিদ।

—পিট পিট করে চেয়ে চেয়ে কি ভাবছো? বাবলু বল্লে।

—ভাবছি নতুন গল্পের কথা, নতুন রূপকথার কথা, আচ্ছা এবার তবে শোনো—

খোকন চোখ চেয়ে দেখলো তার মার চোখে জল! খোকন অবাক হয়ে ভাবে: মা কি তবে কাঁদছে? মা কাঁদছে? খোকন ভাবতেই পারে না। মা কাঁদবে কেন? মাকে সে কখনও কাঁদতে দেখেনি। মাকে সে দেখেছে দিন রাত হাসিমুখে, দিন রাত কাজ করেন, চরকা কাটেন, খোকনের সঙ্গে গল্প করেন। খোকন ঘুমোবার আগে মা তাঁর মাথার কাছে বসে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কত গল্প করেন, কত হাসির আর কত মজার কথা বলেন। কিন্তু তারপর খোকন আর জানে না। খোকন ঘুমিয়ে পড়লে মা যে কি করেন তা খোকন কেমন করে জানবে?

সকালে ঘুম ভেঙেই খোকন তার মার সুন্দর হাসি মুখখানা দেখতে পায়। খোকন পড়তে বসে, মা পড়ান, পড়ার মাঝে মাঝে গল্প চলে। মার সঙ্গে খোকন খেলা করে বাড়ীর সামনের মাঠে। মা ছাড়া তার আর কেউ সঙ্গী নেই! এমনি করে খোকনের দিন যায়, রাত আসে, তারা জাগে, চাঁদ হাসে, পাখী ডাকে, ভোর হয়। আবার সুরু হয় সেই পুরাতন জীবন। কিন্তু খোকনের ভালো লাগে এই জীবনকে, এমনি করে মার আদর খেতে, মার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকতে, গল্প শুনতে, আর গল্প করতে।

কিন্তু খোকন অবাক হয়ে যায়—এমনি আমার সুন্দর মা, তার চোখে জল, কিন্তু কেন? মার এই মূর্তি সে আগে কখনও দেখেনি। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে তাকিয়ে দেখে মা বিছানায় নেই, মা কোথায়? ঘুম ঘুম চোখে সে তাকালো একবার জানালার দিকে। ওকে ওখানে? আমার মা?

বাইরে থেকে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরে, মাকে মনে হয় কোনো ছায়ামূর্তি। ভালো করে তাকিয়ে দেখলো খোকন, হ্যাঁ, এতো তারই মা, কিন্তু এমন কাতর মূর্তি সে আগে কখনও দেখেনি। আজ ভালো করে চুপি চুপি তাকিয়ে দেখলো খোকন, তুমি মা এত রোগা? মার মুখ এত শুকনো? মার পরণে এমন ছেঁড়া কাপড়?

খোকনের চোখে আপনা থেকেই জল এলো, মায়ের এই দুঃখভরা মূর্তি দেখে। খোকনের চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছা করলো। তার মনে হলো বুক থেকে কি যেন ওপর দিকে ঠেলে উঠবার চেষ্টা করছে।

খোকন নেমে এলো খাট থেকে, পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো মায়ের পেছনে। মা কাঁদে কেন? কেন? কেন? খোকনের মনে সেই এক কথা, একটি কথা সে জানতে চায়। তাই নিঃশব্দে উঠে এসে মার পিছনে সে দাঁড়িয়েছে।

মাকে কিছু বলবার আগে মা বাঁ হাতখানা তার দিকে এগিয়ে দিলেন, যেন আদর করে আহ্বান করলেন—আয়! সে যে মার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে মা জানতে পারলে কি করে?

মা তাকে কাছে টেনে নিলেন। কিন্তু তাকে কাছে টেনে নেবার সময় মা যেমন হাসতেন তেমনি হাসি মায়ের মুখে কই? খোকন যত দেখে তত অবাক হয়। এ কি হলো মা'র! খোকন শান্তগলায় জিজ্ঞাসা করলো: আমি যে তোমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছি কি করে তুমি জানলে মা?

—আমি জানি বাবা, তুমি আমার পিছনে এসে দাঁড়াবে। আমার পিছনে এসে দাঁড়াবার সময় তোমার হয়েছে: মার গলাটা কেমন যেন ভিজে ভিজে লাগে খোকনের।

—কাঁদছো মা তুমি?

—হ্যাঁ!

—হ্যাঁ! দুঃখে কাঁদছি!

—রোজ কাঁদো?

—হ্যাঁ বাবা।

—আমি তো কই দেখিনি!

—এতদিন যে তোমার দেখবার সময় হয়নি বাবা! আজ তুমি দেখলে, কারণ দেখবার যোগ্য হয়েছ।

—মা তুমি এত রোগা?

—কবে আর মোটা ছিলাম।

—এমন ছেঁড়া কাপড় তোমার পরণে?

—ভালো কাপড় পরলাম কোথায়?

—এত হাসি তোমার কোথায় গেল মা!

—আমি তো হাসিনি কোনোদিন।

—তবে যে আমি রোজ সকালে তোমার হাসিমুখ দেখতাম!

—ছোট ছিলে কিনা, কান্নাকে মনে করেছ হাসি, দুঃখকে মনে করেছ সুখ। যা নয় তাই এতদিন তুমি দেখে এসেছ!

—কিন্তু আজকে একি হলো মা?

—মার আসল মূর্তি দেখবার সময় তোমার হয়েছে বাবা!

—কিন্তু তুমি রোজ কাঁদো কেন?

—দুঃখে কাঁদি বাবা!

—কি তোমার দুঃখ মা?



—অনেক দুঃখ বাবা! ঘরের চারিপাশে বন, এই বনে আমি বন্দিনী বহুদিন থেকে। এর বাইরে আমার যাবার উপায় নেই, এই দেখ—খোকন দেখলে মার হাতে পায়ে বন্ধনের চিহ্ন।

—চালিফিরি বটে, কিন্তু বড় বাজে, কিন্তু তারচেয়ে বেশী বাজে আমার প্রাণে।

—আজ আমারও বাজছে মা, এই তুমি, এই আমার বন্দিনী মা!

খোকনের চোখ ফেটে জল আসতে লাগলো। আকুল হয়ে বল্লেঃ বল, বল কেমন করে তোমায় মুক্ত করবো? কি করলে তুমি মুক্তি পাবে? কে তোমায় বন্দিনী করে রেখেছে মা?

—বন্দিনী করে রেখেছে এক বিরাট দৈত্য, অনেক দূরে তার দেশ!

—সে দৈত্যকে আমি বধ করবো, তাকে ধ্বংস করবো, লোহার শেকল আর তোমার গায়ে বাজবে না, প্রাণে বাজবে না।

রাগে, দুঃখে অভিমানে খোকনের হাতের মুঠি দুটো শক্ত হয়ে এলো।

—কোথায় সে দৈত্য, তাকে আমি মারবো, কোথায় থাকে সে?

খোকনের কথা শুনে মা হাসলেন, চোখের জলে ভেজা ম্লান হাসি, বল্লেনঃ কোথায় সে দৈত্য থাকে তা আমি জানি না।

জানি সে থাকে অনেক দূরে, আমাদের সব কেড়ে-কুড়ে নিয়েছে, আমাদের রাজ্য থেকে তাড়িয়েছে আমাদের, বন্দিনী করে রেখেছে আমায় এই বনের মধ্যে। বনের চারিধারে কাঁটাবন বসিয়েছে, হাতে পায়ে দিয়েছে শেকল, যাতে পালাতে না পারি, এই কাঁটাবন পার হয়ে সারি সারি বসেছে পাহারা। এই পাহারা এড়িয়ে, মস্ত মাঠ পার হয়ে, নদী, পর্বত, সমুদ্র অতিক্রম করে গেলে পাওয়া যাবে সে দৈত্যের দেশ। সাতটি সমুদ্র পার হয়ে তবে পাওয়া যায় সেই দৈত্যের দেশ। সেই দেশের মধ্যখানে মস্ত বাগান। সেই বাগানের মধ্যে যে লাল গোলাপ আছে সেটা তুলে তিনটি ফুঃ দিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে চোখ বুজিয়ে তিনটি পাপড়ী এমন ভাবে ছিঁড়তে হবে যে গোলাপের কোনো ক্ষতি না হয়। এই করতে পারলেই দৈত্য মরবে। কাঁটাবন ফুলের বাগান হবে, আমার বাঁধন খসে পড়বে।

খোকন চুপ করে শুনলো, তারপর ধীর গলায় বল্লেঃ আমি পারবো! মা হাসলেন।

—মা হাসলেন।

—হাসছো মা?

আমার ছটি ছেলে ঠিক তোমার মত এমনি করেই এই কথা বলেছিল, তারা এমনি মাঝ রাতে জেগে ওঠে আমায় কাঁদতে দেখেছিল, ঠিক তোমার মত পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তোমার মতই সব শুনে বলেছিলঃ আমি দৈত্যকে বধ করবো। আমার ছটি ছেলে একে একে চলে গেছে, বনের পার হতেই তাদের আর দেখা যায়নি, তারা আর ফিরে আসেনি।

—কিন্তু আমি ফিরে আসবো—খোকন বল্লে।

মা শুনে হাসলেন, সেই চোখের জলে ভেজা ম্লান হাসি।

খোকন নিঃশব্দে মাকে প্রণাম করলো। আস্তে আস্তে সে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

মা চাঁদের আলোতে দেখতে পেলেন তাঁর চাঁদের মত ছেলে খোকন চলেছে বন পেরিয়ে, কাঁটাবনের দিকে।

—তারপর?

তারপর কি হলো?

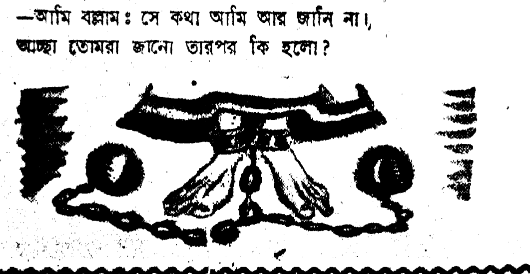
অজস্র প্রশ্ন বাবলুর আর রাণুর।

—খোকন ফিরলো?

—ওর মা মুক্তি পেলো?

—আমি বল্লামঃ সে কথা আমি আর জানি না।

আচ্ছা তোমরা জানো তারপর কি হলো?





ভীষণ রেগেছি—পালাও পালাও—এখুনি মুণ্ডু ফেলবো কেটে
নাহলে হঠাৎ বোমার মতন দুম্ করে আমি পড়বো ফেটে
দেখছো দু-চোখ রাঙা হয়ে গেছে—চুলগুলো সব হয়েছে খাড়া
পালাও নাহলে লাফ দিয়ে প'ড়ে বাঘের মতন করবো তাড়া—
ব্রহ্মতালুতে আগুন জ্বলছে—ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি রাগে
নাকে ঘুঁষি মেরে খুন করে দেবো হঠাৎ কাউকে পেলেই বাগে
মারবো এমন রদ্দা ঘাড়ে যে উল্টে পড়বে ঠিক্‌রে দূরে
মট্ করে যাবে ঘাড়টা মট্‌কে মুণ্ডুটা যাবে পেছনে ঘুরে
গলা টিপে ধরে চিৎ করে ফেলে বুকের ওপরে বসবো চেপে
তাণ্ডব নাচ সুরু করে দেবো—রামগুঁতো পেটে লাগাবো ক্ষেপে
চুলের ঝুঁটিটা মুঠি করে ধরে মুখেতে মারবো এমন ঘুঁষো
দাঁত উড়ে যাবে—ভিরমী লাগবে—জ্বর উঠে যাবে একশ' দু'শো
থান ইট তুলে মাথায় মারবো ছরকুটে দেবো মাথার ঘীলু
হিড়্ হিড়্ করে হ্যাঁচড়াবো ধরে গাইতে গাইতে বারোয়াঁ-পীলু
হাত দুটো বেঁধে ঘোড়ার ছপ্‌টি সপাং সপাং লাগাবো পিঠে
ঘাড় ধরে দেবো মুখটা রগড়ে পথের ধারালো কাঁকর ইটে
আচ্ছারকম মোটা তেলপাকা বাঁশের লাঠিটা দুহাতে তুলে
প্রাণপণ জোরে মারবো মাথায়—বাপ্ বলে পথে পড়বে ঢুলে
হাতে কড়া দিয়ে টেনে ফেলে দেবো যে-পথে ছুটছে মত্ত হাতী
বুকের পাঁজরা ছাতু হয়ে যাবে—গোদাপায়ে যেই মারবে লাথি
মশাল জ্বালিয়ে ছ্যাঁকা দেবো গায়ে দগ্ধে দগ্ধে মরবে পুড়ে
সাঁড়াশীতে করে জিব টেনে ধরে মাঝখানে দেবো পেরেক ফুঁড়ে
চোখে মোটা মোটা শিক বিঁধে দেবো—দু-কাণ টানবো এমন জোরে
চড়াৎ করে তা ছিঁড়ে যাবে তাই—বাঁদর নাচাবো জুল্‌পী ধ'রে
ঠ্যাং দুটো ধরে বাঁই বাঁই করে ঘুরিয়ে চড়ক-চরকী বাজী
ছেড়ে দেবো যেই ছিটকে পড়বে তখন মজাটা বুঝবে পাজী
লোহার ডাণ্ডা লাল করে—মানে—ও-বাবা ওটা কি আসছে তেড়ে?
বাঁচাও বাঁচাও! গেলাম গেলাম! রামছাগলটাকে কে দিল ছেড়ে?
ও মা! মাগো! হায় মেরে ফেললে রে; ও ভজাই আয় শিগ্‌গী ছুটে
পুলিশ! পুলিশ! দারওয়ান কই? গা-ঢাকা দিয়েছে গাছেতে উঠে?
ভাই বেবী তুই রুলটা আন্ না—দরজা আগলে একটু দাঁড়া!
মাগো ছুটে এসো—জিব বার করে মা-কালীর মত ধর না খাঁড়া
শিং বাঁকা করে তেড়ে আসছে যে—দুটো চোখ যেন আগুন ভাঁটা—
হায়রে! বাবারে! মেরে ফেললেরে! ভয়ে সারা গায়ে দিচ্ছে কাঁটা
দুর্গা দুর্গা! মা-কালী মা-কালী! তেত্রিশ কোটি দেবতা-দেবী
এই যাত্রায় ফাঁড়াটা কাটাও—চোখ বুজলাম—বুঝলি বেবী—



গুণধরের গুণ

শ্রীনিশিকান্ত সেন

সুশীলা বলে, তার ছোট্ট ভাইটির নাম কুবোধ না রেখে, কেন যে সুবোধ রাখা হয়েছে, তা সে ভেবেই পায় না। সুবোধের বোধশোধের একটু পরিচয় যদি তোমরা নাও, তা হলে তোমরাও হয়তো একথায় সায় না দিয়ে পারবে না।

একদিন পাড়ায় ছিল ওদের নেমন্তন্ন। সুবোধের তখন পেটের অসুখ। খাবার জিনিস দেখলেই ওর মুখ করে চুলবুল, তাই পেটের রোগ ওকে ছেড়ে থাকে না প্রায় কোনও সময়েই। নেমন্তন্ন খেলে সুবোধের রোগ আরও বেড়ে যাবে মনে করে মা ঠিক করলেন, দুপুর বেলা ওকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তিনি বেরুবেন।



গরমের দিন তখন। মা ছেলেকে বুকের কাছে শুইয়ে রেখে পাখা চালাতে লাগলেন। সুশীলা ছিল কাছেই, কিছুক্ষণ পরে যখন দেখলে ভাই চোখ বুজেছে, হাত-পাও আর নাড়ছে না, তখন এগিয়ে গিয়ে মা'র কানে কানে বললে, মা এইবার চলো তবে—

সুবোধের ঘুম গেল নিমেষে কোথায় ছুটে, তার ঠিকানা নেই, সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললে, কোথায় যাবে তোমরা বলো তো?

মা রেগেমেগে বললেন, যাব যমের বাড়ী, আর কোথায়?

ছেলেও অমনি বলে বসল, আমিও যাব তবে, থাকব না কিছুতেই—

মা চোখ কপালে তুলে বললেন, যাবি তুইও!—বলিস কি রে হতভাগা!

ছেলে দিলে গলা সপ্তমে চড়িয়ে, বাঃ রে! তোমরা পার যেতে আর আমি বুঝি পারি না!

মা'র মুখের কথা গেল মুখে মিলিয়ে, কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে তিনি বললেন, যা তুই তবে যেখানে খুশী, আমি আর যাচ্ছি না কোথাও।

মা'র নেমন্তন্ন খাওয়া যে কি রকম হলো, বুঝতেই পারছ; বাড়ীতেও রান্নার ব্যবস্থা ছিল না, তাজেই এক রকম না খেয়েই তাঁকে কাটাতে হলো সারাটা দিন।

[২]

সুশীলাদের বাগানের একধারে কিছু শাকআলু জন্মে। শীতের শেষভাগে মাঝে মাঝে বড়গুলো তুলে ছোটগুলো রাখা হয় বড় হবার জন্যে। এবার যখন একদিন তোলা হয়, তখনো সুবোধের পেটের অসুখ চলছে। তাই ওকে না দিয়ে আলুগুলো লুকিয়ে রাখা হলো। কিছুক্ষণ পরে সুবোধকে আর দেখতে পাওয়া যায় না বাড়ীর ভেতর। সুশীলা ওকে খুঁজতে থাকে এধার ওধার; হঠাৎ বাগানের ভেতর চীৎকার শুনে ছুটে গিয়ে দ্যাখে, সুবোধ মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। সুশীলার মনে হয়



ও বুঝি আলু খাবার জন্যেই অস্থির হয়ে উঠেছে, তাই সে সান্ত্বনার সুরে বলে, ছিঃ ভাই, তোমার যে পেটের অসুখ, এখন খেতে নেই শাকআলু।

সুবোধ বলে, আরে না-না, কে খেতে চায় ঐ ঘোড়ার ডিম! ও আর আমি খাই কখনো? ঐ খেয়েই তো আমার মুখ গেল, গলা গেল জ্বলে! এই বলে সে ওয়াক তোলে, গলায় আঙুল দেয়।

সুশীলা ধাঁধায় পড়ে, শাকআলুতে কখনো কারো মুখগলা জ্বলে কি? জিজ্ঞেস করে, কোথায় সে আলু? সবটাই খেয়েছিস কি?

সুবোধ বলে, না-না, খেয়েছি শুধু একটুখানি। বাদবাকিটা সে পা দিয়ে দেখিয়ে দেয়—বলে, ঐ যে ঐ দ্যাখো না—আমি ফেলে দিয়েছি ছুঁড়ে।

সুশীলা হাত দিয়ে তুলে দ্যাখে, এতো শাকআলু নয়, এযে কচুর মুখীর খানিকটা। সে চেঁচিয়ে ওঠে, সর্বনাশ! করেছিস কি? শাকআলু বলে তো কচু খেয়ে মরেছিস, মুখপোড়া! এই বলে সে ছুটে চলে যায় বাড়ীর ভেতর। তারপর একডেলা তেঁতুল এনে, তাই খাইয়ে ওকে সুস্থ করে।

এখন ব্যাপার কি হয়েছিল, বলছি শোনো। সুবোধ আলুর খোঁজে চুপি চুপি ঢুকে পড়েছিল বাগানে। কিন্তু আগে ওখানে ছিল মেলাই কচুগাছ। চাষের সময় সেগুলো তুলে ফেলা হ'লেও, মূলের মুখীগুলো উঠে যায় নি সব। সুবোধের কাস্তের খোঁচায় আলু না উঠে, উঠে পড়ে তারই একটি। ছোট শাকআলু আর কচুর মুখী দেখতে অনেকটা একই রকমের নয় কি? দেখেই ও দেয় মুখে পুরে। তারপর ওর যে কি দশা হয়, তা তোমরা শুনেছ আগেই।

সুবোধের অবস্থা দেখে যে সুশীলার কষ্ট হয় নি, তা তোমরা মনে কোরো না, কিন্তু সুবোধ দিদির কথা শোনে না একেবারেই, তাই তো সে ওর ওপর রাগ করে, ওকে মন্দ না বলে পারে না।

[৩]

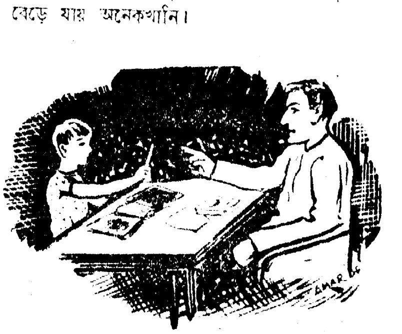
সুশীলার ধারণাই হয়েছে যে যার খাওয়ার ওপর এত ঝোঁক, পেটে এত দুষ্টুমি তার কখনো লেখাপড়া হতে পারে না। তার এ রকম ধারণার যে কারণ নেই, একেবারেই তাও নয় কিন্তু।

মাস দুয়ের ভেতর সামান্য যে যোগ-আঁক, তাও সে পারেনি শিখতে। একদিন মাস্টারমশাই বিরক্ত হয়ে গোঁ ধরে বসলেন ওকে যোগ শেখাবেনই যেমন করে হোক। সেলেটে নিজের হাতে ৮, ৫ আর ৩ ওপর থেকে নীচে এক লাইনে লিখে, একটি কসি টেনে বললেন, এইবার কস তো যোগ ঠিক করে গুণে।

কড় গুণে ওর একবার হয় ১১, একবার ১৭; তিনবারের বার যদিও হলো ১৫, কিন্তু ও ৫ নাবিয়ে হাতের ১ আর নাবায় না। এদিক ওদিক চায়, আর মাথা চুলকায়। মাস্টারমশাই বলেন, কইরে নাবাচ্ছিস নে—হাতে কি?

হাতে?—সুবোধ চট্‌পট্ জবাব দেয়—পেনসিল, মশাই, সেলেট পেনসিল্।

সেলেট পেনসিল্! মাস্টারমশায়ের মুখের হাঁ বেড়ে যায় অনেকখানি।



সুবোধ পেনসিলসুদ্ধু হাতখানি মাস্টারমশায়ের মুখের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে—এই দেখুন না—ভাল ক'রে চেয়ে!

সুশীলা বলে, আর কোনো মাস্টার হলে সুবোর চালাকি তিনি তক্ষুনি বার করে দিতেন, আঁকের সেলেটখানি ওর পিঠের ওপর আছড়ে ভেঙে, কিন্তু ইনি নিতান্ত ভালমানুষ কিনা, তাই তেমন কিছুই করলেন না, খানিকক্ষণ হতভম্বের মতো বসে থেকে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন আস্তে আস্তে; তারপর সেই যে বেরিয়ে গেলেন আমাদের বাড়ী থেকে, আর কখনো হন নি, এমুখো। তিনি নিশ্চয় বুঝেছিলেন, সুবোকে শেখানো তাঁর মতো মাস্টারের কর্ম নয়।

তোমরা যদি ইচ্ছে করো

শ্রীঅখিল নিয়োগী

তোমরা যদি ইচ্ছে করো, খেল্‌তে পারো নতুন খেলা—
শিশুর হাসির মাঝখানে খুল্‌তে পারো নতুন মেলা।
নতুন তরো দখিণ-হাওয়ায় বল্‌তে পারো নতুন বাণী,
সেই হাওয়াতে নতুন-জগৎ করবে কেবল কানাকানি!

তোমরা যদি ইচ্ছে করো, বল্‌তে পারো নতুন ভাষা...
সেই ভাষাতেই গুঞ্জরিবে মোদের সকল মনের আশা!
শিশুর দলের একই ভাষা থাক্‌বে সকল ভুবন ঘিরে...
উঠ্‌বে শুধু কলধ্বনি নানান্ দেশের তীরে তীরে।

তোমরা যদি ইচ্ছে করো, গাইতে পারো নতুন সুরে—
সঞ্জীবনী-মন্ত্র দিতে পারো সবার হৃদয় পুরে।
তোদের মুখের মধুর সুরই সকল সুরে বাঁধবে কাছে,
আধেক-শোনা সেই সে গানে সকল জনার হৃদয় নাচে!

তোমরা যদি ইচ্ছে করো, নাচ্‌তে পারো নতুন তালে
বাঁধতে পারো বিশ্ব-জগৎ তোমার মধুর ইন্দ্রজালে।
ছন্দ-রাগের হিন্দোলেতে স্বর্ণকমল উঠ্‌বে ফুটি...
নৃত্যতালে নতুন ভুবন তোদের পায়েই পড়বে লুটি।

তোমরা যদি ইচ্ছে করো, বল্‌তে পারো সহজ কথা—
সেই কথাতেই ঘুচ্‌তে পারে সকল জনার মনের ব্যথা!
শিশুর মুখের মধুর কথা ভুলায় সকল মনের বেদন
এমন নিঠুর কে-ই বা আছে ইচ্ছে করে ভুল্‌বে সে ধন?

তোমরা যদি ইচ্ছে করো, মিল্‌তে পারো মিলন মেলায়
দলাদলি নেই কো যাতে জুট্‌তে পারো সেই সে খেলায়!
এক ধরণে খেল্‌বে খেলা, এক সুরেতে বাজ্‌বে বাঁশী
সাগরতীরের কিশোর মেলায় ফুট্‌বে একই মধুর হাসি!

তোমরা যদি ইচ্ছে করো, গড়তে পারো নতুন জগৎ...
ধূলি-মলিন এই ধরণী তাতেই হবে অনেক মহৎ।
থাক্‌বে নাকো দুঃখ-আপদ, জাগ্‌বে মধুর-মনের প্রীতি
তিন ভুবনের তীরে-তীরে কল্লোলিবে কিশোর-গীতি!

খোকা পাখী

জসীমউদ্দীন

আমাদের এই খোকাপাখী উড়িয়ে দেব নীল আকাশে,
উড়িয়ে দেব সাঁজ-সকালের হলদে লালের মেঘের রাশে।
ভাসিয়ে দেব তারায়-ভরা নিশুত রাতের চাঁদের নায়ে,
ঝরবে মুখের হাসি কুসুম তুলট মেঘের উতল বায়ে।
আমাদের এই খোকাপাখী,—আমাদের এই খাঁচার পাখী;
মায়ের ভায়ের স্নেহের ছায়ায় কতই তারে জড়িয়ে রাখি।
কতই তারে পরাই জামা কতই তারে খেলনা সাধি,—
পড়ার ছড়ার কতই কথায় চাই যে তারে রাখতে বাঁধি।
তবু সে যে পালাতে চায়, বন্ধ খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে,
কাঁচ দুটি আঙুল দিয়ে আকাশটারে নিত্য ডাকে।
নতুন জামা পরিয়ে দিলে ধূলোয় সে যে গড়িয়ে পড়ে,
এধার ওধার কেঁদে বেড়ায় হোথায় কোথায় কবার তরে।
...ক তারে ঘরের কোণে রাখব না আর এমনি বেঁধে
...খেলার করতে সাথী আকাশটারে আনবো সেধে।
...পাখাটি বাঁকা খুলে দেব তাহার তরে
...ফিরবে হেঁটে সুদূর-নীলের তেপান্তরে।

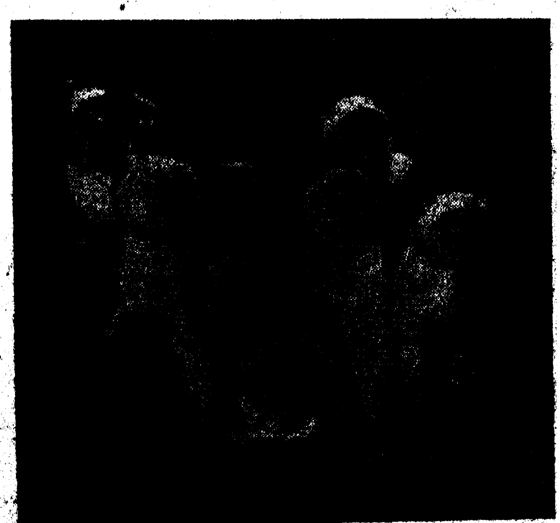


ফটো—নীরোদ রায়

'খুকুমণি অবাক্ কেন?

শ্রীবিমল ঘোষ

খুকুমণি অবাক কেন? পারো কি কেউ বলতে?
ফাটবে বোমা এক্ষুণি কি? জ্বলছে কি তার পলতে!
নয়তো খুকু দেখলো মা'কে—চেঁচিয়ে অ-আ-পড়তে!
কিম্বা দাদু খেলো আছাড় কাঠের ঘোড়ায় চড়তে!
কিম্বা বোধ হয় শুনলো খুকু—গাধাকে গান গাইতে!
চাম্‌চিকে-ছা' হয়তো এলো—বাথ্-টাবেতে নাইতে।
হয়তো খুকু দেখলো দাদার কান ধরে কেউ টান্‌ছে!
কিম্বা কাঠের পুতুলগুলো—ঠ্যাং তুলে খুব নাচ্‌ছে!
একটা কিছু অমনতরোই ঘটতে খুকু দেখ্‌ছে
চোখের পটে ব্যাপারটা তাই 'আজব'! 'আজব' ঠেক্‌ছে!
পারলেনাতো বলতে কেউই—ব্যাপারটা কি ধরতে?
চাইলো খুকুর বন্ধু 'মিনু'—তারেই অবাক করতে।—
ভাবলো—খুকুর বিছানাতে দল বেঁধে সব জুটবে।—
খুকুরাণীর নরম গদীর আরামটুকু লুটবে।
পাতার নীচে দেখলে ছবি—পারবে সবাই বুঝতে
খুকুর অবাক হওয়ার কারণ—আর হবেনা খুঁজতে।



পুজোর ধাঁধার নানান মজা

বলবো কতো তোমার বয়স? মিললে খেতে দিও পায়স।

তোমার বয়স কতো তা তোমাকে না জানালে তুমি সেটা বলে দিতে পার কি? তুমি হয়তো বলবে—'বা রে, তা'কি কখন পারা যায়?' হ্যাঁ—পারা যায়। আমি এখান থেকেই তোমার বয়স কতো তা বলে দিতে পারি। ও কি, হাসছো যে? ভাবছো খুব চাল মারছি,—না? এটা মোটেই চালের কথা নয়, সত্য সত্যই বলে দিতে পারি। তারপর যখন সত্যই বলে দেবো তখন যে তোমার ওই হাসি-মুখ প্যাঁচার মতো করে তুলবে আর সেই ফাঁকে আমার পায়স খাওয়া ফাঁকি দেবে তা কিন্তু চলবে না,—আগে থেকেই সেটা বলে রেখে দিলাম।

নীচে (ক), (খ), (গ), (ঘ), (চ) ও (ছ) চিহ্নিত মিশ্রিত সংখ্যার ছটি লাইন আছে, দেখতে পাচ্ছ তো? এই লাইনগুলোই হলো আমার ছক্,—এই ছক্ থেকেই আমি তোমার বয়স গুণে বলে দেবো, ঠিক যেমন গণৎকাররা খড়ির ছক্ কেটে লোকের অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ গুণে বলে দেয়। তফাৎ এই যে, তারা হলো জ্যোতিষী, আর আমি হলাম 'অঙ্কষী'—অর্থাৎ অঙ্ক কষে যে বলে দেয়।

(ক)	(খ)	(গ)	(ঘ)	(চ)	(ছ)
১	২	৪	৮	১৬	৩২
৩	৩	৫	৯	১৭	৩৩
৫	৬	৬	১০	১৮	৩৪
৭	৭	৭	১১	১৯	৩৫
৯	১০	১২	১২	২০	৩৬
১১	১১	১৩	১৩	২১	৩৭
১৩	১৪	১৪	১৪	২২	৩৮
১৫	১৫	১৫	১৫	২৩	৩৯
১৭	১৮	২০	২৪	২৪	৪০
১৯	১৯	২১	২৫	২৫	৪১
২১	২২	২২	২৬	২৬	৪২
২৩	২৩	২৩	২৭	২৭	৪৩
২৫	২৬	২৮	২৮	২৮	৪৪
২৭	২৭	২৯	২৯	২৯	৪৫
২৯	৩০	৩০	৩০	৩০	৪৬
৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৪৭
৩৩	৩৪	৩৬	৪০	৪৮	৪৮
৩৫	৩৫	৩৭	৪১	৪৯	৪৯
৩৭	৩৮	৩৮	৪২	৫০	৫০
৩৯	৩৯	৩৯	৪৩	৫১	৫১
৪১	৪২	৪৪	৪৪	৫২	৫২
৪৩	৪৩	৪৫	৪৫	৫৩	৫৩
৪৫	৪৬	৪৬	৪৬	৫৪	৫৪
৪৭	৪৭	৪৭	৪৭	৫৫	৫৫
৪৯	৫০	৫২	৫৬	৫৬	৫৬
৫১	৫১	৫৩	৫৭	৫৭	৫৭
৫৩	৫৪	৫৪	৫৮	৫৮	৫৮
৫৫	৫৫	৫৫	৫৯	৫৯	৫৯
৫৭	৫৮	৬০	৬০	৬০	৬০
৫৯	৫৯	৬১	৬১	৬১	৬১
৬১	৬২	৬২	৬২	৬২	৬২
৬৩	৬৩	৬৩	৬৩	৬৩	৬৩

এই বার কাজের কথা হোক্। তোমার বয়স কতো আমি তো তা জানি না, কেমন? সেটা যেন আমাকে কিছুতেই বলো না। আমাকে শুধু এইটুকু বলে পাঠাও যে তোমার বয়সের সংখ্যাটা (ক), (খ), (গ) প্রভৃতি চিহ্নিত ছ'টি লাইনের কোন্ কোন্ লাইনে আছে। আমি তা হলে এখান থেকেই ব'লে দেবো তোমার বয়স কতো। যদি না বুঝে থাকো, তবে আর একটু বুঝিয়ে বলি। তোমার বয়স কতো তা আমাকে না বলে কেবল বলে দাও যে, সেটা অমুক অমুক লাইনে আছে। ব্যস্,—তা হলেই কাজ হয়ে যাবে। কি? ভাবছো বুঝি যে তোমার চিঠি পেয়েই আমি চুপ মেরে যাবো,—অর্থাৎ ঐখানেই আমার বিদ্যা-বুদ্ধি ফাঁক হয়ে যাবে?

আচ্ছা বাপু, ডাক মাশুল খরচ করে আমাকে আর চিঠি লিখে জানাতে হবে না,—চালাকীটা শিখিয়েই দি,—কেমন?

আমি তোমাকে যেমন করে প্রশ্ন করেছি, তুমি তোমার কোন বন্ধুকে ঠিক সেই রকম করে প্রশ্ন করো, অর্থাৎ তার বয়স কতো তা তোমাকে বলতে বারণ করে তাকে কেবল বলতে বলো যে তার বয়সের সংখ্যাটা কোন্ কোন্ লাইনে আছে। ধরে নাও সে বললো যে, সেটা (ক), (গ) ও (চ) এর লাইনে আছে। তারপর আর কি? এই বার তার বয়স কতো বলে দাও।

তুমি নিশ্চয়ই বলছো—'বা রে, তা কি করে বলা যায়? কিন্তু আমি বলছি তা বলা যায়। তোমার বন্ধুর বয়সের সংখ্যাটি যদি (ক), (গ) ও (চ)এর লাইনে থাকে, তবে তার বয়স ২১। এখনও যদি ভাবো যে আমি চাল মারছি, তাহলে খুবই ভুল করবে, মাঝখান থেকে পায়সের পরিমাণটা বেড়ে যাবে। আচ্ছা, এবার খুলেই বলি।

এই বয়স বলার যা কিছু কেরামতি তা আছে এই ছ'টা লাইনের প্রথম সংখ্যাগুলোর মধ্যে। তোমার দাদু, বন্ধু বা অন্য যে কেউই হোক,—১ থেকে ৬৩র মধ্যে তার বয়স যতই হোক না কেন, যে যে লাইনে তার বয়সের সংখ্যাটা আছে সে যদি তা বলে দেয়, তবে সেই সেই লাইনের প্রথম সংখ্যাগুলো যোগ করলেই তার বয়স বেরিয়ে পড়বেই।

আগে তোমার বন্ধুর যে ২১ বছর বয়স বলেছিলাম (সেটা অবশ্য একটা উদাহরণ হিসাবে), সেটা (ক), (গ) ও (চ)এর লাইনে আছে, অর্থাৎ এই তিন লাইনেই ঐ ২১ সংখ্যা আছে, আর অন্য কোন লাইনে নেই। এই তিন লাইনের প্রথম সংখ্যাগুলো হলো ১, ৪ ও ১৬। এখন এই সংখ্যাগুলোকে যোগ করলে হয় ২১।

আচ্ছা, আর একটা উদাহরণ নাও। ধরো একজনের বয়স ৩৯। এই সংখ্যাটা (ক), (খ), (গ) ও (ছ)এর লাইনে আছে। এই চারিটি লাইনের প্রথম সংখ্যা যথাক্রমে ১, ২, ৪ ও ৩২ এবং এগুলির যোগফল ৩৯। কেমন, বলতে পারলাম কি না? ও কি, পালাচ্ছো যে? পায়স খাওয়াবে না? বাঃ—রে—

—শ্রীপরিতোষকুমার

অভিশাপ

কুমার অরীন্দ্রজিৎ কবিতা লিখিয়াছেন। সেই কবিতা লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থ নগরীতে নিদারুণ বিপত্তির সূত্রপাত হইল। কুমার অরীন্দ্রজিৎ, রাজভ্রাতা সহদেবের শ্যালিকার পুত্র। কিন্তু তাঁহার পরিচয়ের পূর্বে আরও একটু পূর্ব-ইতিহাস জানা প্রয়োজন।

অজীর্ণ রোগাক্রান্ত অগ্নির নির্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ-সহায় অর্জুন খাণ্ডব দহন করিয়াছিলেন। বিষম দাবানলে খাণ্ডবস্থ তরুলতা জীবজন্তু সকলই ভস্মসাৎ হইল; যাহারা পলাইয়া প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিল, অর্জুন তাহাদিগকেও তীক্ষ্ণশরে নিহত করিয়া অগ্নিতে সমর্পণ করিলেন। কয়েকটি মাত্র প্রাণী সেই ধ্বংসলীলার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল।

খাণ্ডবের একান্তে দানবরাজ ময় সপরিবারে বাস করিতেন। স্বজন-পরিজন সমস্তই অগ্নিদগ্ধ হইল; একা ময় অর্জুনের শরণাগত হইয়া কোনক্রমে প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন।

ময় ত্রিভুবনে স্থপতিশ্রেষ্ঠ। জীবনলাভের মূল্যস্বরূপ তিনি প্রস্তাব করিলেন, দাবদগ্ধ খাণ্ডবভূমিতে পাণ্ডবগণের জন্য নূতন রাজধানী নির্মাণ করিয়া দিবেন। পাণ্ডবেরা সদ্য হস্তিনাপুরী হইতে বিতাড়িত, তাঁহাদেরও একটি নিজস্ব বাসস্থানের প্রয়োজন ছিল। যুধিষ্ঠির সানন্দে সম্মত হইলেন। অনুজ্ঞা পাইয়া ময় দিগ্বিদিক্ হইতে কর্মকুশল স্থপতি ও কারুশিল্পী সংগ্রহ করিলেন এবং বর্ষকালব্যাপী অক্লান্ত শ্রমে এক অভিনব নগরী নির্মাণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকটে নিবেদন করিলেন। এই নগরী ইতিহাসে ইন্দ্রপ্রস্থ নামে খ্যাত।

নবীনা নগরীর সুশৃঙ্খল গঠননীতি ও স্থাপত্য-কৌশল দেখিয়া যুধিষ্ঠির ও তাঁহার সহচরবর্গ পরম প্রীত হইলেন; এবং এই নগরীতে রাজধানী স্থাপন ব্যপদেশে রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করিলেন।

রাজসূয় যজ্ঞে পৃথিবীর সমস্ত রাজা ও রাজন্যবর্গ একত্রিত হইলেন। যজ্ঞসভায় নানা বিচিত্র ব্যাপার ঘটিল; চেদীরাজ শিশুপাল নিন্দা করিয়া কৃষ্ণের হাতে নিহত হইলেন; নৃপতি দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য ঈর্ষান্বিত ও নগরীর নানাবিধ নয়নরূপসজ্জার পাল্লায় পড়িয়া বারংবার নাজেহালিত হইলেন। স্ফটিকময় চত্বরকে পুষ্করিণী ভাবিয়া তিনি বসন ত্যাগ করিয়া হাস্যাস্পদ হইলেন; জলপূর্ণ চতুর্বৎসিকাকে স্ফটিকবেদী ভাবিয়া তাহার মধ্যে উল্টাইয়া পড়িয়া চুবানি ভক্ষণ করিলেন এবং স্বচ্ছ অলক্ষ্য কাঁচ-প্রাচীরে আহত হইয়া কপাল ফুলাইলেন। দুর্জনেরা বলে, ময় আত্মীয়-বিনাশের প্রতিশোধ লইবার জন্যই এইরূপে দুর্যোধনকে জব্দ করার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞস্থলে নাকাল হইয়া দুর্যোধনের মনে প্রতি-হিংসাবৃত্তি সম্যক উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহার জন্যই তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধাইয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা নিতান্তই দুর্জনের কথা।

সভাস্থলে দুর্যোধন কিরূপ নাকাল হইয়াছিলেন, মহাভারতে ব্যাসদেব তাহার বিশদ বিবরণ লিপিবন্ধ করিয়াছেন। তিনি নিজেও নাকাল হইয়াছিলেন, সে বিবরণ তিনি লেখেন নাই। আমি সেই কাহিনী পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছি।

চরাচরস্থ অপর সকল রাজা-রাজন্য ও মুনিঋষির মত বেদব্যাসও যজ্ঞের নিমন্ত্রণ

"সম্বুক"

পাইয়াছিলেন, যথাকালে তিনি রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যোগবলে শূন্যপথে রাজধানীর বহির্ভাগস্থ তোরণে আসিয়া ব্যাস উত্তীর্ণ হইলেন। নগরীর মধ্যে শূন্যপথে চলাচল করা বিধেয় নহে, অজ্ঞলোকে ভূত ভাবিয়া ভয় পায়। . অতএব বহুদর্শী মহর্ষি শূন্যাসন পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং পদব্রজে তোরণ-পথে প্রবেশ করিলেন।

তোরণে অগণিত লোকের ভিড়, কত লোক আসিতেছে কত লোক যাইতেছে, দেশী-বিদেশী নানাবিধ লোক, নানাবিধ ভাষা। ব্যাসদেব একান্তে দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, কেহ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আসিয়াছে কিনা। কিন্তু সেই অবারিত জনস্রোতের মধ্যে একটিও পরিচিত মুখ তাঁহার চক্ষে পড়িল না। কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, এত লোকসমাগমের মধ্যে প্রত্যেককে ব্যক্তিগত অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে, তাঁহাকে নিজেই পথ চিনিয়া লইতে হইবে।

অপরিচিত স্থান, অজ্ঞাত পথ। নিঃশ্বাস ফেলিয়া পথের উপরে আসিয়া দাঁড়াইতেই একব্যক্তি অভিবাদন করিয়া কহিল, প্রভু চলুন। ব্যাসদেব চাহিয়া দেখিলেন। শীর্ণকায়, খর্বদেহ, মস্তকে উষ্ণীষ, হস্তে চাবুক। বুঝিলেন, সারথি। কহিলেন, রথ আনিয়াছ?

সারথি কহিল, হাঁ প্রভু। এই যে। বলিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেত দেখাইল। অতি ক্ষুদ্র লঘু-গতি রথ, কাষ্ঠের গঠন, উপরে বস্ত্র-নির্মিত ছত্রিকা।

ব্যাস কহিলেন, তোমাকে কে পাঠাইয়াছেন, যুধিষ্ঠির?

সারথি কহিল, প্রভু, অদ্যকার সকল অভ্যাগত অতিথিকে সাদরে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইয়া দিবার ভার আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি কোথায় যাইবেন, আজ্ঞা করিলেই দাস লইয়া যাইবে।

ব্যাস কহিলেন, তোমার কথাবার্তা ভদ্র বটে। তুমি কোন্ বংশজাত, কাহার সন্তান?

সারথি কহিল, দেব! আমি অখ্যাত-কুলজাত, ভাটকগ্রাহী মাত্র। সারথ্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করি, আমার কুলপরিচয় ভবাদৃশ ব্যক্তির স্মরণযোগ্য নহে। আপনি কোথায় যাইবেন?

ব্যাস কহিলেন, চল প্রথমে সভাস্থলেই যাই। পাণ্ডব ভ্রাতৃবর্গ সম্ভবতঃ সেইখানেই আছেন?

সারথি আভূমি অবনত হইয়া বারংবার অভিবাদন করিল। কহিল, চলুন।

ব্যাস পদত্রয় অগ্রসর হইলেন। তারপর কহিলেন, তুমি কত লইবে?

সারথি কহিল, প্রভুর পাদস্পর্শে অদ্য আমার রথ পবিত্র হইবে, ইহার অধিক আর আমার কাম্য কি থাকিতে পারে। আপনার যাহা অভিরুচি দিবেন, আপনাদের সঙ্গে কবে দরদস্তুর করিয়াছি?

বিনয়-বচনে ব্যাস প্রীত হইলেন, আর বাক্য ব্যয় না করিয়া রথে আরোহণ করিলেন। মসৃণ পথ, অশ্বও ক্ষিপ্রগতি, রথ একেবারে উড়িয়া চলিল। ব্যাস কহিলেন, এই প্রকার লঘু রথ পূর্বে কুত্রাপি দেখি নাই। ইহারই কি নাম পুষ্পক?

সারথি কহিল, না প্রভু, ত্বরিত গমন করে বলিয়া ইহার নাম ত্বরঙ্গ; অপভ্রষ্ট প্রাকৃতে ইহাকে ত্বঙ্গা বলা হয়।

রথ চলিল, ব্যাস মুগ্ধনেত্রে চতুর্দিক দেখিতে দেখিতে চলিলেন। নগরীর সজ্জা-সৌকর্য ও নির্মাণ পারিপাট্য দেখিয়া মনে মনে বারংবার কহিলেন, হাঁ, নগরী একখানা বানাইয়াছে বটে!

অতি দীর্ঘ সরল পথ, দূরে দিগন্তে মিশিয়াছে। তাহার গায়ে গায়ে স্থানে স্থানে শাখাপথ বাহির হইয়াছে, প্রত্যেকটি পথই ঋজু ও দীর্ঘপ্রসারী। পথের মধ্যখানে মসৃ

কৃষ্ণবর্ণ আস্তরণ, তাহার উপর দিয়া রথ চলিতেছে, আস্তরণের গুণে রথের চাকায় লেশমাত্র শব্দ হইতেছে না, কেবল টগাবগ্ টগাবগ্ অশ্ব-খুরধ্বনি কাণে আসিতেছে। পথের দুই পার্শ্বে প্রশস্ত শিলাস্তরণ, সেই-খানে পাদচারীগণের যাতায়াত—কোন পাদচারী রথ বা অশ্বের সংঘাতে বিপন্ন হইবে এমত সম্ভাবনা নাই। পথে যাত্রীর চলাচল পর্যন্ত সুশৃঙ্খল বিধিবদ্ধ—প্রত্যেক শকট ও রথ স্ব স্ব বামপার্শ্ব ধরিয়া চলিতেছে, ফলে বিপরীত-গামী রথাদি পরস্পরের সম্মুখীন হইতে পারিতেছে না, অবাধে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছে। পাদচারীরা পর্যন্ত বামপার্শ্বস্থ পাদপথ ধরিয়া চলিতেছে; পথের দুই পার্শ্বের দুই পাদপথে জনস্রোত বিপরীতমুখী।

পাদপথের উপরে পরস্পর হইতে সমান অন্তরালে দেবদারু, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি বৃক্ষ সারিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান; তাহাদের স্খলিত পুষ্পভারে পথের শিলাস্তরণ আচ্ছন্ন। একাধিক পথ যেখানে মিলিত হইয়াছে, সেই সংযোগস্থলে প্রায়শঃই শিলাময় চতুর্বৎসিকা, নির্মল নিস্তরঙ্গ জলে পরিপূর্ণ হইয়া স্ফটিকবেদীর মত শোভা পাইতেছে। পথের দুই পার্শ্বে সারিবদ্ধ দণ্ড-শ্রেণী, তাহাতে প্রদীপ বিলম্বিত—রজনীতে নগরীর অধিবাসীকে চন্দ্রোদয়ের প্রতীক্ষা করিতে হয় না। দেখিয়া ব্যাস চমৎকৃত হইলেন। সর্বাপেক্ষা বিস্মিত হইলেন নগরীর গৃহ-নির্মাণ-কৌশল দেখিয়া—এক একটি পথের দুই পার্শ্বে যতগুলি গৃহ সমস্তই অবিকল এক আকৃতি ও এক আয়তনের; কোন দুইটি গৃহের অবয়বে তিলমাত্র পার্থক্য লক্ষিত হয় না। ব্যাস মনে মনে কহিলেন, এতাদৃশ অবিষম রচনা মানুষের দ্বারা সম্ভবে না, এই গৃহাবলী কি যন্ত্রে নির্মিত?

রথ দ্রুতগতিতে বহু পথ অতিক্রম করিল, অচিরাৎ সভাগৃহের দ্বারে উপনীত হইল। রথ থামাইয়া সারথি কহিল, প্রভু, এই সভাগৃহ, অবতরণ করুন।

ব্যাস সপ্রশংস-নয়নে চাহিয়া দেখিলেন। গোলাকৃতি বিশাল সৌধ, অসংখ্য শ্বেতবর্ণ প্রস্তরস্তম্ভ তাহার অলিন্দ বেষ্টন করিয়া গোলাকারে ঘুরিয়া ক্রমে চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে।

অবতরণের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বিদুর ও নকুল ছুটিয়া আসিলেন, যথাবিধি বন্দনা করিয়া তাঁহাকে রথ হইতে নামাইয়া লইলেন।

ব্যাস কহিলেন, সারথি, তোমাকে কত দিতে হইবে?

সারথি প্রণাম করিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান হইল, কথা কহিল না। নকুল কহিলেন, উহার আর কত প্রাপ্য হইবে, যাহা আপনার অভিরুচি দিয়া দিন।

বিদুর কহিলেন, আপনি ব্যস্ত হইবেন না, আমি দিয়া দিতেছি। বলিয়া একটি রৌপ্য মুদ্রা সারথির হস্তে প্রদান করিলেন; সে আভূমি নত হইয়া প্রণাম করিয়া, রথ লইয়া প্রস্থান করিল।

ব্যাস সভাগৃহে প্রবেশ করিবামাত্র হর্ষ-

ধ্বনি উত্থিত হইল, যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ ও দুর্যোধনাদি কৌরববৃন্দ একত্রে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন, ভীষ্ম, দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি আচার্যগণও সাদরে তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানাইলেন।

প্রাসাদের একান্তে একটি সুরম্য গৃহে তাঁহার আবাস নির্দিষ্ট হইল। কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া বেদব্যাস পথশ্রম দূর করিলেন, তারপর স্নান আহার ও পুনরায় বিশ্রামান্তে সভাস্থলে যুধিষ্ঠিরের সহিত সম্মিলিত হইলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে যোগ্য আসনে বসাইয়া, স্বয়ং নিকটে বসিয়া তাঁহার সহিত নানাবিধ আলোচনায় ব্যাপৃত হইলেন; ভীষ্ম-দ্রোণ প্রভৃতিও একে একে আসিয়া আলাপে যোগ দিলেন।

নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গে ব্যাস কহিলেন, বৎস যুধিষ্ঠির, একটি কৌতূহল আমার মনকে চঞ্চল করিতেছে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আদেশ করুন।

ব্যাস কহিলেন, এই নগরীর সকল স্থান আমার দেখা হয় নাই, পথে আসিতে যেটুকু দেখিলাম তাহাতেই চমৎকৃত হইয়াছি। অপূর্ব ইহার নির্মাণ-পারিপাট্য—এই মনোহর নগরীর পরিকল্পনা যাঁহার, তিনি কোন্ মহাকবি? ইহা কি দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার রচিত?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ, দেব নহে, ইহা দানবের রচিত।

ব্যাস কহিলেন, তাই বল, দানবী মায়া ব্যতীত এরূপ নিখুঁত যন্ত্রাতীত রচনা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু হউক দানবীয়, তথাপি ইহার রুচির প্রশংসা করিতে হয়।

যুধিষ্ঠির ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, ইহা যাঁহার রচনা, তাঁহাকেই আপনার সম্মুখে স্বয়ং উপস্থিত করিয়া দিতেছি। আপনার মুখে এরূপ প্রশংসা শুনিলে তিনি অতিশয় আনন্দিত হইবেন।

যুধিষ্ঠির জনৈক পার্শ্বচরের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন; অচিরে দানবরাজ ময় তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ময় আসন গ্রহণ করিলে ব্যাস কহিলেন, দৈত্যপতি, শুনিলাম এই অভিনব নগরীর নির্মাণ-কৌশল আপনার পরিকল্পিত, ইহার রচনার কৃতিত্ব সমস্তই আপনার। নগরীর যেটুকু আমি দেখিলাম তাহাতে চমৎকৃত হইয়াছি, অভিলাষ আছে ইহার সর্বত্র যেখানে যাহা কিছু দেখিবার আছে, প্রস্থানের পূর্বে সমস্ত আমি দেখিয়া যাইব।

ময় সবিনয়ে কহিলেন, আমার সৌভাগ্য। অনুমতি হইলে আমি স্বয়ং আপনাকে লইয়া যাইব, নগরীর যেখানে যাহা আছে সমস্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইয়া দিব।

ব্যাস কহিলেন, উত্তম প্রস্তাব, তাহাই যাওয়া যাইবে। কিন্তু যেটুকু দেখিয়াছি, তাহা হইতেই একাধিক প্রশ্ন আমার মনে জাগরিত হইয়াছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহার সমাধান করিয়া দিলে আমি বাধিত হই। আমি সন্ন্যাসী, তপস্বী, নগরবাসী নহি। আশা করি অনভিজ্ঞের মত প্রশ্ন করিলে ক্ষুন্ন হইবেন না।

ময় কহিলেন, না না, সে কি কথা। কি প্রশ্ন আপনার আছে, বলুন।

ব্যাস কহিলেন, এই নগরীর নির্মাণ-কৌশল মনোহর। ইহার প্রশস্ত রাজপথ, পথে ও পাদপথে যাতায়াতের সুশৃঙ্খল রীতি, পথের পার্শ্বে আলোক সংস্থান ও বৃক্ষসজ্জা, সমস্তই আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। কিন্তু যতদূর দেখিলাম, এক একটি পথের দুই ধারে যত গৃহ, প্রত্যেকেরই অবিকল এক আকৃতি ও এক আয়তন। ইহার তাৎপর্য কি?

ভীষ্ম কহিলেন, যথার্থ, এই প্রশ্নটি আমারও মনে উদিত হইয়াছে।

কৃপ কহিলেন, আমারও। পল্লীস্থ সমস্ত গৃহের এই আকৃতি-সাদৃশ্য, ইহার উদ্দেশ্য কি শুধুই রূপ-সামঞ্জস্য, না অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে?

ময় কহিলেন, এক পল্লীস্থ সমস্ত গৃহ একাকৃতি হইলেই কি তাহা নয়নের প্রীতিকর হয় না?

ব্যাস কহিলেন, সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা নয়নের প্রীতিকর, সন্দেহ নাই। কিন্তু সামঞ্জস্যের আধিক্য বৈচিত্র্যহীনতা আনয়ন করে, তাহা মনের পক্ষে ক্লান্তিকর। অবশ্য সামঞ্জস্য ও বৈচিত্র্যহীনতা, প্রয়োজন হইলে উভয়কেই স্বীকার করিয়া লইতে হয়। কৃপাচার্য যে প্রশ্ন করিয়াছেন আমারও তাহাই জিজ্ঞাস্য, এই আকৃতি-সাদৃশ্যের উদ্দেশ্য কি শুধুই রূপ-সামঞ্জস্য, না অন্য কোন উদ্দেশ্য ইহার আছে?

ময় ক্ষণকাল নীরব রহিলেন, তারপর কহিলেন, অন্য কি উদ্দেশ্য?

কৃপ কহিলেন, তাহা জানি না। আমার দেখিয়া মনে হইয়াছে, হয়তো এই রূপ-সামঞ্জস্যের অন্তরালে অন্য কোনরূপ আর্থিক বা আঙ্গিক সামঞ্জস্য বিধানেরও চেষ্টা নিহিত আছে—এই মাত্র।

ময় আবার কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিলেন। শেষে কহিলেন, বহুদর্শীর দৃষ্টিকে প্রবঞ্চিত করা কঠিন। আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। কেবল রূপ-সামঞ্জস্য ছাড়াও এই নির্মাণ-পদ্ধতির অন্য গভীরতর উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু তাহার তাৎপর্য বুঝিতে হইলে এই নগরীর স্বরূপ সম্বন্ধেই কিছু তথ্য আপনাদিগকে মনে রাখিতে হইবে।

ব্যাস কহিলেন, বলুন, আমরা শুনিব।

ময় কহিলেন, শ্রবণ করুন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে এই তথ্য আমি পূর্বেই শুনাইয়াছি। এই নবীনা নগরী সাধারণ জনগণাধ্যুষিত নগরী নহে, ইহা একটি নূতন

রাজ্যের রাজধানী, একটি নবীন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাস্থল। এই কথা মনে রাখিয়া আমি বিশুদ্ধ রাজনীতির সূত্রানুসারে এই নগরীর পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছি।

রাজধানী প্রধানত রাজা ও রাজপুরুষগণের বাসভূমি। রাজপুরুষগণ স্বভাবতঃই উচ্চনীচ বহু পদ ও শ্রেণীতে বিভক্ত এবং তাঁহাদের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবহারে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও পদগৌরবের মর্যাদা যত অধিক পরিমাণে রক্ষিত হইবে, রাজ্যের কার্যকলাপও ততই সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুবর্তী হইবে।

কৃপ কহিলেন, ঠিক কথা।

ময় কহিলেন, আমি এই কথা বহুবার ভাবিয়া দেখিয়াছি। উচ্চাবস্থ ও হীনাবস্থ লোক পরস্পর নিকটবর্তী হইলে স্বভাবতই একের মনে অবজ্ঞা ও অপরের মনে ঈর্ষার উদয় হয়। প্রতিবেশীদিগের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্য সৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক; উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ রাজপুরুষ এক পল্লীতে একত্র বাস করিলে তাঁহাদের মধ্যেও সৌহার্দ্য স্থাপিত হইবে।

ব্যাস কহিলেন, তাহাই কি কাম্য নহে?

ময় কহিলেন, সর্বত্র নহে। সৌহার্দ্য কাম্য সন্দেহ নাই, কিন্তু সৌহার্দ্য হইতে সম্প্রীতির জন্ম এবং যেখানে সম্প্রীতির আধিক্য, সেইখানেই মর্যাদাবোধের লোপ ঘটে। ফলে তখন উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ কর্মচারীর মধ্যে পদগৌরবের বোধ রহিত হইয়া যায়, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা শিথিল হইয়া পড়ে; বন্ধুত্ব-বোধ আসিয়া কর্তব্যবোধের অন্তরায় সৃষ্টি করে।

কৃপ কহিলেন, সাধু।

ময় কহিলেন, এই কথা চিন্তা করিয়াই আমি নগরীকে এইভাবে নির্মিত করিয়াছি। এই নগরীর সর্বত্র ভ্রমণ করিলে দেখিতে পাইবেন, ইহার সমস্ত পথ সমান্তরাল, এক পথের অধিবাসীর সহিত অপর পথের অধিবাসীর সংমিশ্রণ বা সংঘাতের সম্ভাবনা নাই। এক-একটি পল্লী ও এক-একটি পথের গৃহগুলি এক-এক আকৃতি ও আয়তনবিশিষ্ট; এক পথের গৃহগুলি যেরূপ একাকৃতি বিভিন্ন পল্লীর গৃহগুলি তেমনই বিভিন্ন রূপের।

কৃপ কহিলেন, গৃহস্বামীরা কি প্রত্যেকেই স্বেচ্ছায় এইরূপ নিয়মে গৃহ-নির্মাণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে?

ময় কহিলেন, এই নগরীতে কোন গৃহ-স্বামীর স্বকীয় গৃহ নাই; ইহার সমস্ত গৃহ রাজকীয় অধিকারে। নগরীর অধিবাসীরা বস্তুত সকলেই কোন-না কোন মর্যাদার রাজপুরুষ; বৃত্তি ও মর্যাদা অনুসারে তাহারা বিশেষ বিশেষ গৃহে বাসের অধিকার পাইয়া থাকে। এক-একরূপ পদ ও মর্যাদার লোকেরা এক-একটি পল্লীতে স্থাপিত হয়; ইহার ফলে উচ্চতন ও অধস্তন কর্মচারীর একত্র সন্নিবিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

ব্যাস কহিলেন, রাজকর্মের নানা বিভাগ। এখানে কি বিভাগভেদে পল্লীভেদ আছে?

ময় কহিলেন, থাকিলে আরও ভাল হইত, কিন্তু অত বহুসংখ্যক পল্লী নির্মাণ করিতে আরও বহু পরিমাণ স্থানের প্রয়োজন হয়। আর বস্তুত, বৃত্তিজীবীদের পদমর্যাদা বিভাগ নামানুসারে ততটা হয় না, যতটা হয় বৃত্তির পরিমাণ অনুসারে। এই নগরীতে আমরা তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছি—বৃত্তির পরিমাণ অনুসারে এক-একদল কর্মচারীকে এক-একটি পল্লীতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি। স্বীয় নির্দিষ্ট পল্লী ও গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র বাস করার অধিকার কাহারও নাই।

ব্যাস কহিলেন, কিন্তু বৃত্তির তো নিশ্চয়ই হ্রাস-বৃদ্ধি আছে?

ময় কহিলেন, আছে। কিন্তু বাসস্থানও কাহারও স্থায়ী নহে। বেতন হ্রাস বা বৃদ্ধির সংগে সংগে পল্লী এবং গৃহও পরিবর্তিত হয়, নবলব্ধ মর্যাদার অনুযায়ী নূতন গৃহে চলিয়া যাইতে কর্মচারীরা সর্বথা বাধ্য থাকেন। উৎসবান্তে আমি স্বয়ং আপনাদিগকে নগরী দেখাইয়া আনিব, দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। যেমন ধরুন এই সভাগৃহ, নগরীর উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত, ইহাই রাজকার্যের স্থল। ইহার উত্তরে নগরীর উত্তর-তোরণ, ভারত-তোরণ নামে খ্যাত।

নগরীর চারিদিকে এইরূপ চারিটি তোরণ আছে। সভাগৃহ হইতে দক্ষিণাভিমুখে যে বৃহৎ রাজবর্ত্ম, তাহা নগরীর কেন্দ্র ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই পথে অগ্রসর হইলে প্রথমে দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ পথের পশ্চিমে যে পল্লী পড়িবে, তাহার নাম সর্কেন্দ্রিকা; মাসিক ত্রিসহস্র মুদ্রা ও তদূর্ধ্বে বৃত্তিভোগী রাজপুরুষদের তথায় বাস। এই পল্লীর দক্ষিণে বৃহৎস্তম্ভ নামে পরিচিত কিঞ্চিৎ স্থান ধনী অ-রাজপুরুষদিগের জন্য রক্ষিত আছে, রাজকর্মে সংশ্লিষ্ট নহেন অথবা বিদেশ হইতে আগত, এমন ধনী ব্যক্তিরা এই পল্লীতে বাসস্থান নির্মাণ করিতে পারেন; কিন্তু ইঁহাদেরও মাসিক আয় অন্যূন ত্রি-সহস্র মুদ্রা হওয়া প্রয়োজন, নতুবা এইস্থানে বাসের অনুমতি পাইবেন না। সর্কেন্দ্রিকার সমরেখায় পথের বাম অর্থাৎ পূর্বপার্শ্বে উচ্চপদস্থ করণিকদের পল্লী, ইঁহাদের মাসিক বৃত্তি চারিশত হইতে ছয় শত মুদ্রা। তাহার দক্ষিণে নিম্নপদস্থ করণিকদের পল্লী, ইহারা সার্ধশত হইতে চারিশত মুদ্রা মাসিক বৃত্তির অধিকারী। নগরীর মধ্যস্থল ব্যবসায় ও বাণিজ্যের কেন্দ্র, তত্রত্য আপণগুলিতে সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে। বাণিজ্য-কেন্দ্রের উত্তরে ও দক্ষিণে দুইটি রঙ্গ-চত্বালয়, ইহার একটি উচ্চপদস্থ ও একটি নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট। বাণিজ্যকেন্দ্র ছাড়িয়া আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইলে, দক্ষিণহস্তে যে পল্লীটি পড়িবে তাহার নাম হরিদ্বর্ত্ম—এইস্থানে রাজসভার সভ্যবৃন্দ বাস করেন; সাধারণত ইঁহাদের মাসিক বৃত্তি সার্ধ-সহস্র হইতে দুই সহস্র মুদ্রা। আরও দক্ষিণে গেলে বামহস্তে যে পল্লীটি তাহার নাম বর্বরবর্ত্ম। ইহার একদিকে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র করণিকদের বাস, ইহারা পঞ্চাশৎ হইতে সার্ধ-শত মুদ্রা বৃত্তিধারী। অপরদিকে দরিদ্র অ-কর্মচারীদের বাস।

কৃপ কহিলেন, বুঝিলাম। কিন্তু ইহাতে এক বিভিন্ন পল্লীর অধিবাসীদের মধ্যে অবজ্ঞা ও দ্বেষের ভাব সৃষ্ট হয় না?

ময় কহিলেন, না। পার্থিব সমৃদ্ধি ও অসমৃদ্ধি কর্মফলসঞ্জাত, তাহার জন্য দ্বেষ-বুদ্ধির বশীভূত হওয়া অনার্য মনোবৃত্তির পরিচায়ক। এই নগরীর সকল অধিবাসীই আর্য, সকলেই সুসভ্য। বরং এইরূপে পল্লী-বিভাগ থাকার ফলেই অত্রত্য প্রত্যেকটি ব্যক্তির পদমর্যাদা সম্যক্ রক্ষিত হয়। এখানে কাহার মর্যাদা কিরূপ, তাহা জানিবার জন্য অসভ্য ও ম্লেচ্ছের মত 'আপনার বেতন কত' জিজ্ঞাসা করিতে হয় না; তিনি কোন্ পল্লীর কতসংখ্যক গৃহের অধিবাসী, এই বিবরণ জানিলেই তাঁহার পদমর্যাদা ও বৃত্তির পরিমাণ সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাত হওয়া যায়। 'বেতন কত' জিজ্ঞাসা করা অভদ্রোচিত, কিন্তু গৃহের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করার মধ্যে অভদ্রতা কিছুই নাই।

কৃপ কহিলেন, গৃহের আবার সংখ্যা কি?

ময় কহিলেন, সকল পল্লী ও পথেই গৃহের ক্রমিক সংখ্যা আছে। ইহাতে সকল গৃহের বহিরাকৃতি এক হইলেও সংখ্যা দেখিয়া প্রত্যেকে নিজের গৃহ স্থির করিয়া লইতে পারে, ভ্রমক্রমে পরগৃহে প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে না।

[পূ]র্বেই তিনি শয্যা ত্যাগ করিলেন; প্রাসাদের [বা]হির হইয়া রাজপথে ইতস্ততঃ বহুক্ষণ ভ্রমণ [ক]রিলেন, ক্রমে কথঞ্চিৎ ক্লান্ত হইয়া একস্থানে [এ]কটি পুষ্পবীথির পার্শ্বে শিলাবেদীতে [উ]পবেশন করিলেন।

সূর্য তখন সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। স্নিগ্ধ [আ]লোকে ও স্নিগ্ধ বায়ুপ্রবাহে চতুর্দিক [মধু]র হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষণকাল [বি]শ্রাম করিয়া আবার উঠিতে যাইবেন, [এম]ন সময়ে পুষ্পবীথির অপর পার্শ্ব হইতে [কা]হার করুণ কোমল কণ্ঠস্বর কাণে আসিল। [উঠা] হইল না, নিঃশব্দে বসিয়া শুনিতে [লা]গিলেন।

দুইজনের কথাবার্তা। কণ্ঠস্বরে বুঝা [গেল], একটি তরুণী নারী, অপর জন যুবা [পু]রুষ।

পুরুষ কহিল, ছিঃ, যাহা হইবার নহে [তা]র স্বপ্ন দেখিয়া কি লাভ!

নারী কহিল, কিন্তু কেনই-বা হইবে না? [কবি]র হৃদয়, তাহাতে কি এতটুকু কোমলতা [নাই]?

পুরুষ কহিল, আছে কি নাই, তাহা [জা]নস না? হৃদয় কবির হইতে পারে, কিন্তু [তাহা]ও ইন্দ্রপ্রস্থ।

নারী ক্ষণকাল নীরব রহিল, তারপর [করু]ণ কণ্ঠে কহিল, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি [আমা]কে বাধা দিও না।

পুরুষ কহিল, কি করিবি?

নারী কহিল, দেবী অরুন্ধতী-পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়ে একটি শিক্ষয়িত্রী প্রয়োজন। আমি সেই পদের প্রার্থিনী হইব।

পুরুষ কহিল, তাহাতে লাভ?

নারী কহিল, তাঁহার বৃত্তি ছয়শত মুদ্রা, তোমার চারিশত, এই তো প্রভেদ? আমি এই কর্ম লইলে আমার দুইশত মুদ্রা বৃত্তি হইবে, তখন আমাদের দুইজনের বৃত্তি একত্রে তাঁহার সমান হইবে।

পুরুষ কহিল, তাহা হইলেই কি সে তোকে গ্রহণ করিবে?

নারী কহিল, গ্রহণ নাই করুন। বাক্যালাপ তো করিবেন, কবির দেখা তো পাইব?

পুরুষ রুক্ষস্বরে কহিল, এমন দেখা নাই-বা পাইলি!

নারী নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। পুরুষ বহুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর করুণা-স্নিগ্ধ কণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিল, আমি তোর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এমন অসম্ভ্রমের কাজ তোকে আমি করিতে দিব কি করিয়া?

নারীর ক্রন্দনবেগ আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

ব্যাসদেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। উঠিয়া পুষ্পবীথি পরিক্রমণ করিয়া ইহাদের নিকটবর্তী হইলেন। যুবক ভূতলে তৃণশয্যায় বসিয়া, অহার ক্রোড়ে মুখ রাখিয়া তরুণী কাঁদিতেছিল। ব্যাস নিকটে গিয়া দাঁড়াইতে, দুইজনেই সচকিত হইয়া উঠিল। ব্যাস কোমল স্বরে কহিলেন, ব্যস্ত হইও না। অজ্ঞাতে অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি, পুষ্পবীথির অপর পার্শ্বে বিশ্রামার্থে বসিয়াছিলাম, অনভিপ্রায় সত্ত্বেও তোমাদের কথাবার্তা আমার কর্ণগোচর হইয়াছে। কি লইয়া তোমাদের মর্মবেদনা, আমাকে বলিতে হানি আছে কি?

যুবক তাঁহার দিকে চাহিয়া, স্তব্ধ হইয়া রহিল।

তরুণী মৃদুস্বরে কহিল, আপনি কে?

ব্যাস কহিলেন, আমি বিদেশী, নগরে বাস করি না। এখানকার রাজকীয় বৃত্তিভোগী নহি। তাহাতে কি বলিতে বাধা হইবে? আমি বৃদ্ধ, দুঃখে সাহায্য করার শক্তি রাখি না। কিন্তু হৃদয় একটা আছে, কি দুঃখ জানিলে হয়তো অন্ততঃ একটু সহানুভূতি দিতে পারিব।

যুবক কহিল, আপনি কে, বলিতে কি আপত্তি আছে?

ব্যাস কহিলেন, কিছু না। আমার নাম ব্যাস, সাধারণে আমাকে বেদব্যাস বলিয়া জানে।

যুবক-যুবতী নীরবে চরণ বন্দনা করিল।

ব্যাস কহিলেন, বয়সে আমি তোমাদের পিতামহের তুল্য, আমার নিকটে সংকোচ করিও না। কি হইয়াছে?

যুবতী একটু ইতস্ততঃ করিল, তারপর সহসা দ্রুতকণ্ঠে কহিল, দেব, কালিকার সভায় আপনি উপস্থিত ছিলেন।

ব্যাস কহিলেন, ছিলাম।

যুবতী কহিল, তবে তো সকলই জানেন।

ব্যাস কহিলেন, বুঝিয়াছি। কালিকার সভায় কাব্যালোচনা শুনিয়াছ, শুনিয়া কবির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছ।

যুবতী কহিল, আপনি কি অন্তর্যামী?

ব্যাস কহিলেন, না, কিন্তু একদা আমারও যৌবন ছিল। কিন্তু ইহা তো যৌবনের স্বাভাবিক ধর্ম, ইহার মধ্যে অসঙ্গতি কোথায়?

যুবক কহিল, অসঙ্গতি আমাদের ঐতিহ্যে। তাঁহার মিত্রবর্গে বাস, আমার বাস গোলাপণের নিকটে। আপনি বিদেশী, ইহার মর্ম সম্যক বুঝিবেন না।

ব্যাস কহিলেন, বোধহয় বুঝিয়াছি। বৎসে, এক কাজ করিবে?

তরুণী জিজ্ঞাসুনেত্রে তাঁহার দিকে তাকাইল।

ব্যাস কহিলেন, তোমার হাতের গ্রন্থখানি আমাকে দান কর।

তরুণীর হাতে অঞ্চলের আবরণে গত দিনে সভায় বিতরিত কাব্যগ্রন্থ একখানি ধরা ছিল। সে উত্তর করিল না, গ্রন্থের উপরে কোমল অঙ্গুলি কয়টি অজ্ঞাতেই দৃঢ় হইয়া চাপিয়া বসিল।

ব্যাস কহিলেন, আমার উপদেশ শোন তোমার ভাল হইবে। আমাকে দাও, দিয়া ইহার কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাও। দাও।

তরুণী সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তীব্রস্বরে কহিল, না না, দিব না। কে তুমি, যাও যাও, চলিয়া যাও—আমি দিব না।

বলিতে বলিতে তাহার দুই চক্ষে অশ্রুর প্লাবন নামিয়া আসিল। তারপর হঠাৎ সে বিদ্যুৎগতিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। গ্রন্থটিকে দুই হস্তে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া দ্রুতপদে অন্তর্হিত হইয়া গেল। যুবকও, ওরে শোন্ শোন—বলিয়া তাহার অনুগমন করিল।

ব্যাস কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তারপর নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে অন্য দিকে চলিলেন।

অন্যমনে কতদূর অতিক্রম করিলেন ঠিক নাই, এক সময়ে দেখিলেন, একটি অতি প্রশস্ত রাজপথ ধরিয়া চলিয়াছেন, দুই পার্শ্বে অতি বৃহৎ হর্ম্যের শ্রেণী। বুঝিলেন ইহা অভিজাত পল্লী।

চলিতে চলিতে গ্রীষ্ম বোধ হইল, মস্তকের উষ্ণীষ খুলিয়া ফেলিলেন। তারপর আর কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন এমন সময়ে অকস্মাৎ তাঁহার গতি রোধ হইল, কি একটি কঠিন বস্তু শূন্য হইতে সবেগে তাঁহার অনাবৃত মস্তকের উপর পড়িয়া, দূরে ছিট্কাইয়া পড়িল। সবিস্ময়ে বস্তুটি হাতে তুলিয়া লইলেন। গত দিনের সেই কাব্যগ্রন্থ একখানি—তালপত্রে সযত্নে হস্তমুদ্রিত, উভয় পার্শ্বে চন্দন কাষ্ঠের ফলক, রক্তবর্ণ রেশম-সূত্রে দ্বারা জড়াইয়া বাঁধা। গ্রন্থটি হাতে লইয়া ঊর্ধ্বে তাকাইলেন, দেখিলেন, একটি প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকা, তাহার দ্বিতলের বাতায়ন উন্মুক্ত। বুঝিলেন, এই বাতায়ন পথেই গ্রন্থটি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে।

দৈবক্রমে পড়িয়া গিয়াছে, যাহার বস্তু তাহাকে প্রত্যর্পণ করিব, এইরূপ মনে করিয়া ব্যাস গৃহের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলেন, গ্রন্থটি দিয়া রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিলেন, কে আছ?

দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া একটি দাসী মুখ বাড়াইল। কহিল, কি চান?

ব্যাস কহিলেন, তোমার প্রভু আছেন?

দাসী কহিল, না। প্রভুপত্নী আছেন, প্রভু-কন্যা আছেন।

ব্যাস কহিলেন, বল, আমি একটু সাক্ষাৎ করিতে চাই।

দাসী কহিল, আসুন।

সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষ, চতুর্দিকে প্রাচীরে মনোরম আলেখ্যপট বিলম্বিত। সুকোমল আসনে ব্যাসকে বসাইয়া দাসী চলিয়া গেল। অচিরাৎ গৃহস্বামীর ভার্যা ও দুহিতা কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মাতার বয়স পঞ্চচত্বারিংশদ্বর্ষ হইবে, ঈষৎ স্থূলাঙ্গী। কন্যা বিংশতিবর্ষ-দেশীয়া, ক্ষীণাঙ্গী। কক্ষে প্রবেশ করিয়া গৃহ-স্বামিনী কহিলেন, কে সাক্ষাৎপ্রার্থী?

ব্যাস উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আশীর্বাদ উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, দেবি, আমি।

গৃহস্বামিনী কহিলেন, কি প্রয়োজন?

ব্যাস কহিলেন, দেবি, আমার প্রয়োজন

কিছুই নহে। এই বস্তুটি সম্ভবতঃ আপনাদের, কোনক্রমে বাতায়ন-পথে বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। আমার মাথায় পড়িয়াছিল, যাঁহার বস্তু, তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছি।

গ্রন্থটি বাড়াইয়া ধরিবামাত্র কুমারী সহর্ষে সস্ফুট চীৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিল, ব্যাকুল হস্তে সেটিকে ব্যাসের হাত হইতে প্রায় কাড়িয়া লইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মাতাও বেগে ছুটিয়া আসিলেন, গ্রন্থের অন্য প্রান্ত চাপিয়া ধরিলেন। গ্রন্থ লইয়া মাতা ও কন্যাতে কিছুক্ষণ প্রাণপণে টানাটানি চলিল। তারপর মাতারই জয় হইল, কন্যাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া তিনি গ্রন্থ ছিনাইয়া লইলেন। গ্রন্থ হস্তগত করিয়া তিনি ব্যাসের দিকে দৃষ্টি ফিরাইবার অবসর পাইলেন, রোষারুণ-নেত্রে কহিলেন, এই গ্রন্থ আমি বাতায়ন-পথে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলাম। সেই আপদ আবার কুড়াইয়া লইয়া আসিয়াছ, কে তুমি?

কন্যা আর্তস্বরে কহিল, আমার গ্রন্থ!

মাতা রুক্ষস্বরে কহিলেন, চুপ করিয়া থাক্। দিনে দিনে যত ইতরজনোচিত বুদ্ধি হইতেছে—।

ব্যাস কহিলেন, দেবি, বুঝি নাই, মনে করিয়াছিলাম ওটি অনবধানে নিক্ষিপ্ত, কুড়াইয়া দিয়া গৃহস্বামীর বুঝি উপকারই করিলাম। তাহা নহে শুনিলাম, ত্রুটি স্বীকার করিতেছি।

বিনম্র বচনে গৃহস্বামিনী কথঞ্চিৎ প্রীত হইলেন, কহিলেন, তুমি কে?

ব্যাস কহিলেন, পরিচয় শুনিয়া চিনিবেন না, আমি বিদেশী। কিন্তু যদি ধৃষ্টতা মার্জনা করেন, একটি প্রশ্ন করিতে কৌতূহল হইতেছে।

গৃহস্বামিনী কহিলেন, কি প্রশ্ন?

ব্যাস কহিলেন, দৈবক্রমে কালিকার সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। জনৈক কবি কাব্য পাঠান্তে সেই কাব্যের বহু প্রতিলিপি সভায় বিতরণ করিয়াছিলেন। এটি কি তাহারই একখানি নহে?

কন্যাটি কহিল, হাঁ। দেখুন না কি অন্যায়, কিছুতেই আমাকে পড়িতে দিবে না।

মাতা সগর্জনে কহিলেন; চুপ কর। বড় হইতেছ আর বুদ্ধি শুদ্ধি গোল্লায় যাইতেছে, যত বাজে লোকের লেখা পড়িয়া পড়িয়া—

ব্যাস কহিলেন, দেবি, অপরাধ লইবেন না। সভায় কি আপনি উপস্থিত ছিলেন?

গৃহস্বামিনী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, আমার কি মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে, যে, আমি ঐ সকল লঘু চাপল্যের অংশ গ্রহণ করিতে যাইব?

ব্যাস কহিলেন, আমি উপস্থিত ছিলাম। কালিকার কাব্য পাঠ সত্যই অতি মনোগ্রাহী হইয়াছিল, উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই উচ্চকণ্ঠে কাব্যের বিষয়বস্তু এবং রচনা-কৌশলের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

গৃহস্বামিনীর ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। কহিলেন, অর্থাৎ?

ব্যাস কহিলেন, অর্থাৎ কাব্যটি সুরচিত। কন্যাকে নিঃসঙ্কোচে পাঠ করিতে দিতে পারেন।

গৃহস্বামিনীর মুখশ্রী মেঘাবৃত হইল। কহিলেন, তুমিও বুঝি ঐ দলের? ব্যাস কহিলেন, ভুল করিতেছেন। আমি কোন দলেরই নহি। কাব্যটি ভাল, নির্ভয়ে পড়া যায়, এই কথা মাত্র বলিতে চাহি।

গৃহস্বামিনী সগর্বে কহিলেন, ওসকল আমি শুনিতে চাহি না। কাব্যের ভালমন্দ কি আমি বুঝি না, বুঝিবার জন্য আমার মাথাব্যথাও নাই। আমি শুধু জানি এই কাব্যের লেখক হীন লোক, মাত্র ছয় শত মুদ্রা বৃত্তিধারী করণিক। তাহার রচনা আমার কন্যাকে আমি পড়িতে দিব না।

ব্যাস কহিলেন, দেবি, কাব্য অপৌরুষেয়। কাব্যের নিজের গুণে তাহার বিচার, রচয়িতার জাতি বা বৃত্তির সহিত পাঠকের সম্পর্ক কি?

গৃহস্বামিনী কহিলেন, তুমি বিদেশী?

ব্যাস কহিলেন, হাঁ।

গৃহস্বামিনী কহিলেন, তাই এমন মূর্খের মত কথা বলিতে পারিতেছ। লেখক যত বড় শক্তিশালীই হউক, নিজেকে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে না; হীনশ্রেণীর মনুষ্যের রচনাতে হীন রুচির পরিচয় থাকিবেই।

ব্যাস কহিলেন, সর্বত্রই?

গৃহস্বামিনী কহিলেন, অত তর্ক তোমার সঙ্গে আমি করিব না। আমাদের একটা আভিজাত্য আছে, এই কাব্য যতই মধুর হউক, কন্যাকে ইহা পড়িতে দিয়া সে আভিজাত্য আমি ক্ষুণ্ণ হইতে দিব না। আমার স্বামী মাসে সার্ধত্রিসহস্র মুদ্রা বৃত্তির অধিকারী, তদ্ব্যতীত অপরিমিত উপর্য্যায় পাইয়া থাকেন। লোকে যখন শুনিবে তাঁহার কন্যা মাত্র ছয়শত মুদ্রা বৃত্তিধারীর রচনাকে প্রাণপণে অধ্যয়ন ও কণ্ঠস্থ করিতেছে, তখন তাঁহার মান কোথায় থাকিবে? এই হীন মনোবৃত্তির জন্য কি আমাদের সমপর্যায়ভুক্ত অভিজাতবর্গ আমাদের নামে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিবে না?

ব্যাস কহিলেন, কিন্তু সে তরুণ বয়স্ক। একদিন তো সেও ত্রিসহস্র মুদ্রা বৃত্তির অধিকারী হইতে পারে।

গৃহস্বামিনী কহিলেন, আগে হউক। তোমার আর কিছু বলিবার আছে?

ব্যাস কহিলেন, আর একটিমাত্র প্রার্থনা—এই গ্রন্থটি আপনি আমাকে দিন, আমি লইয়া যাই।

গৃহস্বামিনী কহিলেন, না, ইহার সংস্পর্শেও এই পল্লীর বায়ু কলুষিত হইতেছে। ইহাকে আমি অগ্নিদগ্ধ করিব।

কন্যা আর্তস্বরে কহিল, না না না।

গৃহস্বামিনী অবিচলিত স্বরে কহিলেন, চুপ।

দ্বারের বাহিরে দাসী দাঁড়াইয়াছিল,

গ্রন্থটি তাহার হস্তে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, অবিলম্বে ইহাতে অগ্নিসংযোগ কর। ফেনিকা ও জল লইয়া আয়, আমি হস্ত প্রক্ষালন করিব। আর এই ব্যক্তিকে গৃহের বাহির করিয়া দে।

দাসী ব্যাসের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, মৃদুস্বরে কহিল, চলুন।

গৃহস্বামিনী গর্জন করিয়া কহিলেন, চলুন নহে, বল্, চল। এতদিন কাজ করিলি, অভিজাত সমাজে থাকিয়া কাহাকে কি বলিতে হয় তাহা এতদিনে শিখিলি না? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এই ব্যক্তি একটা অতীব ভাগ্য-পণ্ড, লোফ্জাতীয় লোক। ইহাকে সম্বর্ধনা করিয়া গৃহে আনিতে কে তোকে বলিয়াছে? আবার যদি এমন হয়, সেইদিন তোকে আমি দেখিয়া লইব।

ব্যাস আর পরিচারিকার আমন্ত্রণের অপেক্ষা করিলেন না। গৃহস্বামিনীর বাক্যবর্ষণ শেষ হইবার পূর্বেই গৃহত্যাগ করিয়া পথে নামিয়া আসিলেন। পথে আসিয়া একবার তাকাইয়া দেখিলেন, কন্যাটি বাতায়নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, জলভরা দুইটি আয়ত চক্ষুর স্থির দৃষ্টি তাঁহার উপর নিবন্ধ।

কিছুক্ষণ অত্যন্ত দ্রুত পাদবিক্ষেপ করিলেন; পথের পার্শ্বের বিরাট সৌধশ্রেণী যেন তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল। অদূরে একটি তুঙ্গ ধীরে ধীরে আসিতেছিল, ব্যাস অঙ্গুলিসঙ্কেতে তাহাকে ডাকিলেন। ইঙ্গিত-মাত্রে তুঙ্গচালক নিকটে আসিল, সবিনয়ে অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান হইল।

ব্যাস দৃষ্টিমাত্রেই তাহাকে চিনিলেন, কহিলেন, তুমিই না সেদিন আমাকে রাজসভায় পেঁছাইয়া দিয়াছিলে?

তুঙ্গচালক পুনরায় প্রণতি জানাইয়া কহিল, অনুগ্রহ করিয়া মনে রাখেন, ইহাই আমার পরম ভাগ্য। কোথায় যাইবেন?

সভ্যতার সমৃদ্ধি অসহ্য লাগিতেছিল, প্রাসাদে ফিরিতে ইচ্ছা হইল না। ব্যাস কহিলেন, বর্বর-বর্ষ্ম।

চক্ষের পলকে তুঙ্গ চালকের ভাবান্তর ঘটিল। মুখে চোখে অপরিসীম অবজ্ঞা ফুটাইয়া তুলিয়া কহিল, পয়সা আছে?

ব্যাস বিস্মিত হইয়া কহিলেন, তাহার অর্থ?

সারথি অঙ্গুলি বিস্তৃত করিয়া কহিল, চারিটি মুদ্রা লাগিবে। দিতে পারিবে?

ব্যাস কহিলেন, চারি মুদ্রা? সেদিন যে অতখানি পথ আসিতে মাত্র একমুদ্রা লইলে?

সারথি অশিষ্টভঙ্গী করিয়া কহিল, বাজে কথা ছাড়িয়া দাও। চারি মুদ্রার কমে হইবে না। সামর্থ্য থাকে তো বাহির কর আমার হাতে দিয়া, রথের পশ্চাৎ-দিকে চড়িয়া বইস। আর না থাকে তো হাঁটিয়া চলিয়া যাও, এক পয়সাও লাগিবে না।

ব্যাসের মাথা ঘুরিয়া উঠিল। একবার ইতস্তত করিলেন, কিন্তু প্রখর রৌদ্রে হাঁটিয়া যাইতে পারিবেন মনে হইল না। আর তর্ক করিতেও প্রবৃত্তি হইল না, চারিটি মুদ্রা বাহির করিয়া সারথির প্রসারিত হস্তে গুঁজিয়া দিয়া, নিঃশব্দে রথে চড়িয়া বসিলেন।

বর্বরবর্ষ্মের ষট্চত্বারিংশৎ সংখ্যক গৃহে বিদুরের বাস। বিদুর গৃহেই ছিলেন, বাহিরে আসিয়া সাশ্চর্যে কহিলেন, একি, এই অসময়ে? আপনাকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাইতেছে, আসুন, বিশ্রাম করিবেন।

বিদুর আসন দিলেন, ব্যজনী আনিয়া স্বয়ং সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে কহিলেন, এইখানেই যাহা হয় দুটি আয়োজন করিয়া দিই, স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া লউন।

ব্যাস সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, না, আমাকে এখনই যাইতে হইবে। বিদুর কহিলেন, তাহাও তো বটে, যুধিষ্ঠির হয়তো আপনার অন্ন লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

ব্যাস অশ্রুরুদ্ধস্বরে কহিলেন, না, নগরীর অন্ন আর খাইব না।

বিদুর সবিস্ময়ে কহিলেন, সে কি, কি হইল?

ব্যাস কহিলেন, কিছু না। বিদুর, আমাকে একটু পেঁছাইয়া দিতে পারিবে তুমি? বড় অবসন্ন লাগিতেছে, একা যাইতে পারিব না।

বিদুর ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, নিশ্চয়ই।

পথে নামিয়া বিদুর কহিলেন, ঐ একটা তুঙ্গ আছে, ঐটাকে ধরিয়া লই।

ব্যাস কহিলেন, না, আর তুঙ্গ নহে, হাঁটিয়া যাইব। তুমি হাঁটিতে পারিবে?

বিদুর কহিলেন, বিলক্ষণ। প্রত্যহই তো হাঁটিয়া যাই।

ব্যাস কহিলেন, প্রত্যহ হাঁটিয়া যাও? কেন?

বিদুর ম্লান হাসিয়া কহিলেন, আর কেন! অত পয়সা কোথায় পাইব?

দীর্ঘ পথ। দুইজনে দীর্ঘকাল ধরিয়া হাঁটিয়া চলিলেন। উভয়েই নিঃশব্দ—ব্যাস দুই একবার বিদুরের মুখের দিকে চাহিলেন, যেন কিছু বলিবেন; আবার না বলিয়া পথ চলিতে লাগিলেন। বিদুরও কোন কথা বলিয়া তাঁহার মৌন ভঙ্গের চেষ্টা করিলেন না। কোথাও একটা বিপর্যয় ঘটিয়াছে তিনি বুঝিয়াছিলেন।

রৌদ্রে পথশ্রমে কাতর হইয়া দুইজনে রাজসভায় আসিয়া পেঁছাইলেন। তখন বেলা দ্বিপ্রহর পার হইয়া গিয়াছে; সভাস্থলে পূর্ব-দিনের অনুবৃত্তিস্বরূপ ক্রীড়াকৌতুক ও রঙ্গালোচনা চলিতেছে। ব্যাস প্রবেশ করিতেই অনুষ্ঠানে বাধা পড়িল। যুধিষ্ঠির ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, মহর্ষি, সকাল হইতে কোথায় গিয়াছিলেন? নকুল শীঘ্র উঁহার বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দাও।

সভার মধ্যে অগ্রসর হইতে হইতে ব্যাস অকস্মাৎ অনুভব করিলেন, বিদুর পার্শ্বে নাই। ফিরিয়া দেখিলেন, সত্যই, বিদুর জন-শ্রেণীর পশ্চাতে একটি নিভৃত কোণে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছেন। বিস্মিত হইয়া কহিলেন, ও কি, ঐদিকে চল?

বিদুর বিনীত হাস্যে ও নীরব ইঙ্গিতে বুঝাইলেন, না, থাক।

ব্যাস কহিলেন, কেন?

নকুল পার্শ্ব হইতে কহিলেন, পিতামহ, আপনার আসন দেওয়া হইয়াছে, এইদিকে আসুন।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আসনের অনতিদূরে, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহারথীদের পার্শ্বে ব্যাসের জন্য আসন নির্দিষ্ট হইয়াছে; ইঙ্গিত-মাত্রে দুইজন পরিচারক আসনের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ব্যজনে রত হইল। ব্যাস আসন গ্রহণ করিয়া নকুলকে কহিলেন, আরও একখানা আসন দাও, বিদুরকে ডাক। সেও অত্যন্ত পরিশ্রান্ত।

নকুল বিব্রত মুখে কহিলেন, আপনি সুস্থ হইয়া বসুন না। তাঁহার ব্যবস্থা হইতেছে।

ব্যাস কহিলেন, না না, তাহাও কি হয়। তুমি আসনের ব্যবস্থা কর, আমি তাহাকে ধরিয়া আনি। বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নকুল বিপন্ন হইয়া—ইঙ্গিতে ভীমসেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ব্যাস উঠিয়া দাঁড়াইতেই যুধিষ্ঠির কহিলেন, কি হইল, পিতামহ?

ব্যাস কহিলেন, বিদুরকে ডাকিয়া আনিতেছি।

ভীম মৃদুস্বরে কহিলেন, সর্বনাশ করিল।

অর্জুন দ্রুতপদে ব্যাসের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন, মৃদুস্বরে কহিলেন, আপনি বসুন, পিতামহ।

ব্যাস কহিলেন, আর বিদুর?

অর্জুন কহিলেন, তিনি এখানে আসিবেন না।

ব্যাস কহিলেন, কেন?

অর্জুন উত্তর দিতে পারিলেন না। ব্যাস যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকাইলেন; যুধিষ্ঠির ওষ্ঠে মৃদুহাসি ফুটাইয়া ও চক্ষু টিপিয়া মাথা নাড়িয়া বুঝাইলেন, তাহা হয় না।

ব্যাস যেন হতবুদ্ধি হইয়া একবার ইহার একবার উহার মুখের প্রতি তাকাইতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা সে দৃষ্টির সম্মুখে চক্ষু আনত করিলেন। কেবল ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যের ব্যথিত দৃষ্টির সহিত তাঁহার দৃষ্টি মিলিত হইল।

তারপর ব্যাসের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল ঃ মহারাজ যুধিষ্ঠির!

সে গম্ভীর স্বরের আঘাতে রাজসভার নেপথ্যবাদ্য অকস্মাৎ থামিয়া গেল। সভার সমস্ত কোলাহল ও গুঞ্জন নিস্তব্ধ হইল। ব্যাস কহিলেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির! বিদুর ও আমি দুইজনেই সমান পরিশ্রান্ত, দুইজনেই রৌদ্রে দীর্ঘ পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। আমার জন্য আসন ও ব্যজনের ব্যবস্থা হইল, বিদুরের জন্য হইল না; কেন, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারি?

যুধিষ্ঠির নীরব।

ব্যাস পুনরায় কহিলেন, কারণ আমি শুনিতে চাহি না। কারণ আমি জানি। বিদুর অল্প বেতনভুক্ কর্মচারী, এই জন্য সে সভার সম্মুখে, আমার সঙ্গে, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্যের সঙ্গে, একত্র আসন পাইবার অধিকারী নহে। এই না?

যুধিষ্ঠির তখনও নীরব।

ব্যাস কহিলেন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, বিদুর না তোমার খুল্লতাত?

এবার যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, মৃদুস্বরে কহিলেন, রাজসভার শৃঙ্খলায় রাজনীতিই প্রামাণ্য।

ধিক্ মূর্খ, ধিক্ তোমার রাজনীতিতে। ব্যাসের কণ্ঠ বজ্রের মত ফাটিয়া পড়িল, সভাগৃহের প্রাচীর ও আচ্ছাদন সে বজ্রধ্বনির আঘাতে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল - যুধিষ্ঠির তুমি না নিজেকে ধর্মরাজ বল? এই তোমার ধর্মজ্ঞান? তুমি মূর্খ, মহামূর্খ!

ভীমসেন ফোঁস করিয়া উঠিলেন, ব্যাস তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাতও না করিয়া কহিলেন, মহামূর্খ তুমি, এই বুদ্ধি লইয়া দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধে জিতিবে, এই বুদ্ধি লইয়া ধর্ম-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবে? ময় দানবী মায়ায় তোমাকে ভুলাইয়াছে—মূর্খ পাইলে কে না তাহাকে ভুলাইয়া স্বার্থোদ্ধার করে? অর্জুন ময়ের বংশনাশ করিয়াছে, সেও তাহারই প্রতিশোধ লইয়াছে, কৌশলে তোমার রাজধানীতে তোমার রাজ্যে এমন এক অপূর্ব ভেদনীতির প্রবর্তন করিয়া দিয়াছে যে, তাহার বিষ কখনও আর দূর হইবে না। তোমার রাজ্যে উচ্চনীচ নাই, আত্মীয় অনাত্মীয় নাই, কে কত বেতন পায় মাত্র তাহাই এখানে মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয়—এটা কোন্ অপবুদ্ধি-সঞ্জাত, কবে কোনকালে মানুষের স্বাভাবিক শুভবুদ্ধি ইহার অনুমোদন করিয়াছে?

ব্যাস ক্ষণকালের জন্য থামিলেন, সভার চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তারপর আবার কহিলেন, ময় বসিয়া আছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর সত্যই কি ভাবিয়া সে তোমাকে এই অদ্ভুত ভেদনীতি শিখাইয়াছে। তোমার রাজ্যে গুরুজনের সম্মান নাই, গুণের আদর নাই, কেবল কাহার কত আয়, কাহার কোথায় নিবাস, ইহা দ্বারাই এখানে মানুষের মূল্য নির্ধারিত হয়—এটা কি সত্যই মানুষের বাস-ভূমি, না গবাদি পশু বিক্রয়ের স্থান?

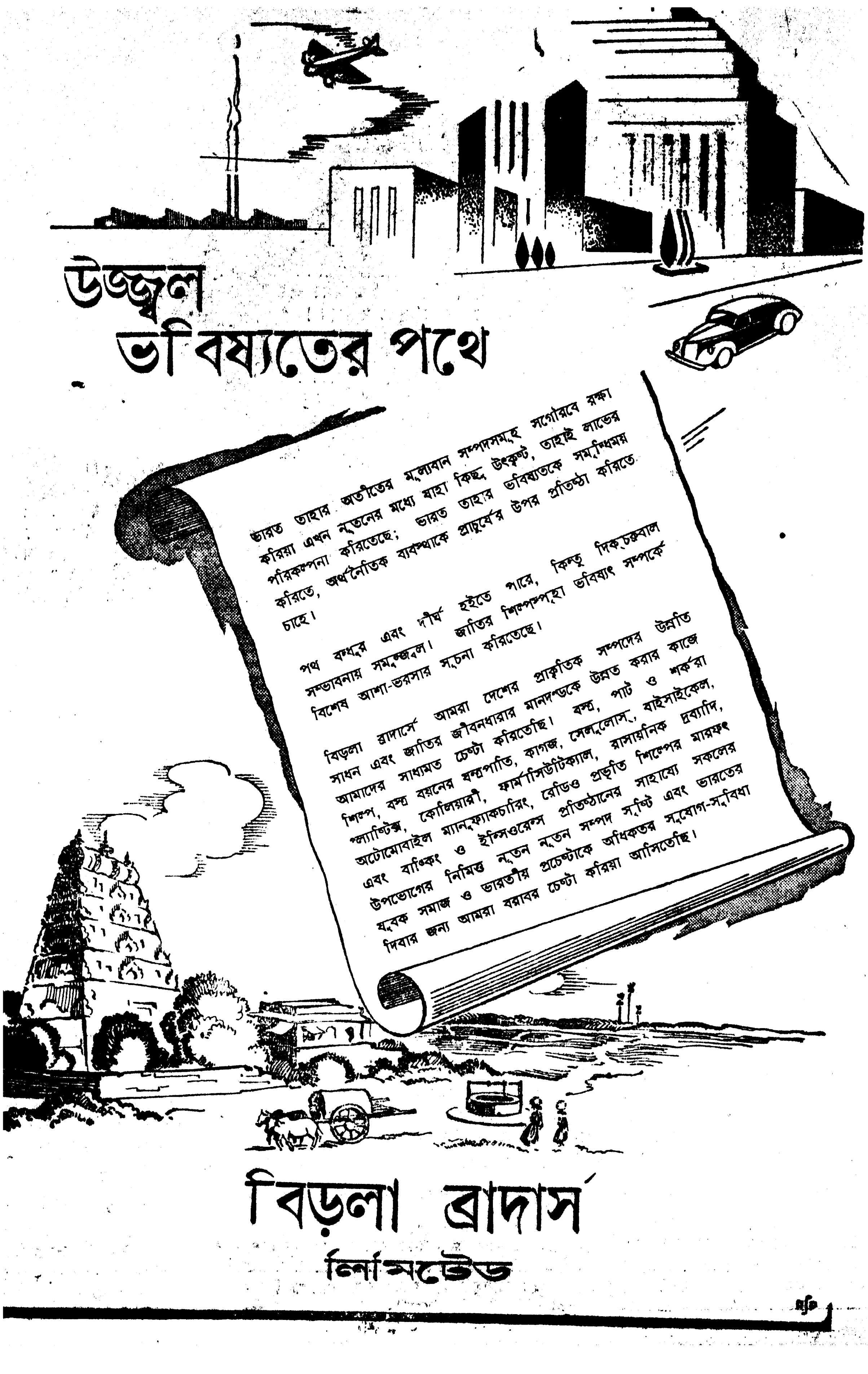
ভীম হঠাৎ লাফাইয়া উঠিলেন: আমার দাদাকে কটু কথা বলিলে আমি তাহাকে—

ব্যাস কহিলেন, গদাঘাত করিয়া কিছুই করিতে পারিবে না ভীম, আমি অমর। আমারও আর বলিবার কিছু নাই, মহারাজ যুধিষ্ঠির। একটিমাত্র কথা মনে রাখিও, আমি যথার্থই তোমাদের শুভানুধ্যায়ী, তোমাদের এই কৌরব বংশ আমারও বংশ, আজিও তাহার সহিত আমার নাড়ীর যোগ আছে, আজিও তাহার ক্ষয়ে তাহার বিপর্যয়ে আমার আঘাত লাগে। সেই শুভানুধ্যানের বলেই বলিতেছি, এখনও অবহিত হও, এখনও এই সর্বনাশা নীতিকে পরিহার কর, ময় দানবীমায়া বিস্তার করিয়া তোমাকে অভিভূত করিয়াছে, তাহার পাশ ছিন্ন কর।

আর এখনও যদি তাহার মোহ পরিত্যাগ করিতে না পার, এখনও যদি করিতে না চাও, তবে বুঝিব তোমাদের হাতে ভারতের মঙ্গল নাই। সেই সর্বনাশ ভাবিয়া, ভারতের হিত-কামী আমি বেদব্যাস এই সভাস্থলে দাঁড়াইয়া অভিসম্পাত করিয়া যাইতেছি—যতদিন এই হতভাগ্য নগরী ভারতের রাজধানী থাকিবে ততদিন ভারতের হিত নাই; যতদিন ভারত সাম্রাজ্যের হৃৎপিণ্ড এই অদ্ভুত ভেদবুদ্ধির বিষে জর্জরিত থাকিবে ততদিন কেহ ভারতকে একতাবন্ধনে বদ্ধ করিতে পারিবে না, সুস্থ সুসংহত জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারিবে না। আমি বেদব্যাস, আমি জীবনে কখনও মিথ্যা বলি নাই, আমি আকাশের চন্দ্রসূর্যকে সাক্ষী রাখিয়া বলিয়া যাইতেছি, এই অভিশপ্ত নগরী ও তাহার এই অভিশপ্ত রাজনীতি যতদিন বর্তমান থাকিবে, ততদিন ভারতের মুক্তি নাই, ততদিন সে প্রতিনিয়ত হীনতা ও ঈর্ষাদ্বেষের বশবর্তী হইয়া শতধা বিভক্ত হইয়া থাকিবে, আত্মকলহে বলহীন হইয়া বিজাতীয় ম্লেচ্ছের পদানত হইয়া থাকিবে। আমি বেদব্যাস, এই অভিশাপবাণী আমার রচিত নয়, আমার মুখে বিধাতার এই অভিশাপ আজ উচ্চারিত হইল। আমি পাণ্ডবের শত্রু নহি, তাহার অহিতে আমার নিরানন্দ। অভিশাপ উচ্চারণ করিয়া আমিও আজ এই নগরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছি, ইহার নীতির পরিবর্তন না হইলে আর আমি এস্থলে পদার্পণ করিব না।

ব্যাসের কণ্ঠ সহসা নীরব হইল। বহুক্ষণ নতমুখে অপেক্ষা করিয়া সভাস্থ জনতা মুখ তুলিয়া চাহিল; চাহিয়া দেখিল, ব্যাসদেব নাই।

সেই অভিশাপের জের আজিও চলিতেছে—নিউ দিল্লীর রাজপথগুলি আজিও সমান্তরাল।


উজ্জ্বল
ভবিষ্যতের পথে
ভারত তাহার অতীতের মূল্যবান সম্পদসমূহ সগৌরবে রক্ষা
করিয়া এখন নূতনের মধ্যে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, তাহাই লাভের
পরিকল্পনা করিতেছে; ভারত তাহার ভবিষ্যতকে সমৃদ্ধিময়
করিতে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রাচুর্যের উপর প্রতিষ্ঠা করিতে
চাহে।
পথ বন্ধুর এবং দীর্ঘ হইতে পারে, কিন্তু দিক্‌চক্রবাল
সম্ভাবনায় সমুজ্জ্বল। জাতির শিল্পস্পৃহা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে
বিশেষ আশা-ভরসার সূচনা করিতেছে।
বিড়লা ব্রাদার্সে আমরা দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নতি
সাধন এবং জাতির জীবনধারার মানদণ্ডকে উন্নত করার কাজে
আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছি। বস্ত্র, পাট ও শর্করা
শিল্প, বস্ত্র বয়নের যন্ত্রপাতি, কাগজ, সেলুলোস্, বাইসাইকেল,
প্ল্যাণ্টিক্স, কোলিয়ারী, ফার্মাসিউটিক্যাল, রাসায়নিক দ্রব্যাদি,
অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং, রেডিও প্রভৃতি শিল্পের মারফৎ
এবং ব্যাঙ্কিং ও ইন্সিওরেন্স প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে সকলের
উপভোগের নিমিত্ত নূতন নূতন সম্পদ সৃষ্টি এবং ভারতের
যুবক সমাজ ও ভারতীয় প্রচেষ্টাকে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা
দিবার জন্য আমরা বরাবর চেষ্টা করিয়া আসিতেছি।
বিড়লা ব্রাদার্স
লিমিটেড



শিবু হঠাৎ এলো গ্রামে কামারের হাতুড়ির ঘায়ে আগুনের ফুলকি যেমন ছিটকে আসে, তেমনি সহর থেকে শিবু ছিটকে গ্রামে এসে দাঁড়ালো। বছর অনেক আগে কবে যেন সে গ্রাম থেকে চ'লে যায় এবং সে এতই নগণ্য সাধারণ যে, চ'লে যাবার পর কেউ তা'র খোঁজ খবরও করেনি। কোনো প্রয়োজনও ছিল না।

শিবুর সঙ্গে এলো জনচারেক সহকর্মী,—তাদের হাঁকডাকে গ্রামের রাস্তাঘাট দেখতে দেখতে মুখর। শিবুর পৈতৃক ভিটে ছিল ...্যাওড়া-জঙ্গলে ভরা, রাতারাতি সেটার ...ংস্কার আরম্ভ হয়ে গেল। সবাই একেবারে অবাক। এ যুদ্ধে লোকের অন্ন বস্ত্র জুটছে ..., মহামারী রোগে চারদিক শ্মশান হয়ে চলেছে —আর তার মাঝখানে এসে সেই সেনগুপ্তদের ...শিবু কিনা বাড়ীঘর তুলছে? তা'র নামে ...িনিসপত্র, মাল মসলা আর লোকজন আসে ...কিনা নৌকাযোগে? গ্রামের লোকেরা অবাক ...য়ে শিবুর দিকে চেয়ে থাকে। এ যুদ্ধে ...বই সম্ভব।

ছেলেরা একদিন শিবুর কাছ থেকে একশো ...কা চাঁদা চেয়ে নিয়ে এলো তাদের ক্লাবের ...ন্য! সেই শিবু, যার ভাত জুটতো না তিন ...ছর আগে, যার লেখাপড়া হোলো না ...ম-ই-ইস্কুলে মাসিক আড়াই টাকা মাইনের ...অভাবে! পরের বাড়ী গতর খাটিয়ে যার ...মা ম'রে গেল [illegible] পাঁচ বছর আগে —সেই শিবু! সমগ্র গ্রামে একটা চাপা আলোচনার ঢেউ উঠলো তাকে কেন্দ্র ক'রে।

গতকাল অপরাহ্নে গ্রামের প্রান্তে ওই সুপারী গাছ ঘেরা দীঘির ধারে এক কাণ্ড ঘ'টে গেল। শিবুর লোকেরা ঘুঘুপাখী শিকার করতে গিয়ে তাদের একজনের বন্দুকের ছররাগুলি গিয়ে লাগে একটি মোরগের গায়ে। মোরগটি মারা যায়। কদু মিঞা এসে তাদের কাছে অনুযোগ জানাতেই শিবু তৎক্ষণাৎ একখানা দশ টাকার নোট তা'র হাতে গুঁজে দিল। কদু মিঞা হাঁ ক'রে রইলো।

বিস্ময়ের কথা, শিবু ধুতি পরে না; মূল্যবান প্যাণ্টের সঙ্গে পরে সিল্কের শার্ট; এবং তার পায়ে আজকালকার ওই কাবুলী ঘুণ্টি-জুতো। সিগারেটের টিন তার হাতে হাতে ফেরে। একটি সিগারেটের প্রায় আধখানা সে খায়, বাকিটা পথের পাশে এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলে,—ঠিক যেন কাউকে ঢিল ছুঁড়ে মারলো। শিবুর মুখ সর্বদাই হাসি হাসি।

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট এই গ্রামেই থাকেন। তাঁর নাম সাদাৎ আলী চৌধুরী। ইতিমধ্যেই শিবুর সঙ্গে তাঁর এমন ঘনিষ্ঠতা দাঁড়িয়ে গেছে যে, এ-দৃশ্যটি বাস্তবিকই অনেকের পক্ষে ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠেছে। শিবুর বাবা ওই সাদাৎ আলীর জন্যই একদিন মামলায় হেরে গিয়ে ফতুর হয়। ভদ্রলোক মারাই গেল বছর খানেকের মধ্যে,—এ গ্রামে বলতে গেলে শিবুদের আর কিছুই রইলো না তখন থেকে। লেখাপড়া দূরের কথা,—শিবুদের অন্ন জোটেনি কতদিন! ঠিক সেই সময়টায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

সাদাৎ আলী চৌধুরীর অধ্যবসায়ে হঠাৎ দেখতে দেখতে ইউনিয়ন বোর্ডের জায়গা জমির ওপর কয়েকখানা পাকা করোগেটের ঘর উঠে দাঁড়ালো; কেবল তাই নয়, চাল ডাল আর কিছু নগদ টাকার জন্য উজ্জ্বনির ইস্কুল ঘরটা এতদিন বন্ধ ছিল,—সেখানে গ্রামের প্রাইমারী শিক্ষকরা কয়েকজন ছেলেমেয়ে ডেকে ক্লাস বসালো। জানা গেল, ছাত্রছাত্রীরা বই শ্লেট আর জামা কাপড় পাবে। তারপর,—অবাক কাণ্ড! একই গ্রামে পাঁচটা টিউব ওয়েল ব'সে গেল রাতারাতি; নতুন চালাঘরে নরহরি ডাক্তার গুছিয়ে বসলো,—এবং ছয়টা কেরোসিন

প্রবোধকুমার সান্যাল

কাঠের বাক্স বোঝাই ঔষধপত্র একদিন নরহরি ডাক্তারের ডিস্‌পেন্‌সারিতে এসে পৌঁছল।

কেউ বললে, নদীর ঘাট থেকে আজুরির হাট পর্যন্ত পাকা রাস্তা হবে, বর্ষায় আর কাদা মাখামাখি করতে হবে না—

কেউ বা বললে, আরে রাখ তোর সাদাৎ আলী...এই যা কিছু সবই শিবুর পয়সা!

একথা সকলেই বিশ্বাস করে। এ যুদ্ধে সবই সম্ভব।

শিবু তা'র লোকজন নিয়ে একদিন হাটতলাটা ঘুরে গেল। তাকে দেখে সবাই আড়ষ্ট। তা'র দামী প্যান্টে কাদার ছিটে, তা'র ভ্রুক্ষেপ নেই। শার্টের ঘরায় মুক্তোবসানো সোনার বোতাম; হাতে চারটে বিচিত্র আংটি; সুগন্ধ সিগারেটে তা'র বাতাসটি মিষ্ট মধুর।

কিন্তু বিনয়ের ভারে অবনত তা'র মুখ। কোথাও তা'র আত্মাভিমান নেই, আত্মপ্রচার নেই, —সদাহাস্যে সে-মুখ বন্ধুবৎসল। সর্বদাই সেই ভঙ্গীটি যেন প্রকাশ করছে, আমি তোমাদের সেবক, অতি নগণ্য আমি!

তারপরদিন থেকে হাটতলায় লোক লাগলো। পাকা শান-পালিশ ফড়েদের বসবার জায়গা; আলাদা আলাদা ছোট বড় ফোকর, জেলেদের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত; মেয়েদের জন্য আব্রু। দেখতে দেখতে গ্রামের এদিক থেকে ওদিকে কী জনরব। আগামী সপ্তাহ থেকে বিনামূল্যে ঔষধ, দুধ, কন্ট্রোলের দামে চাল ডাল আর কাপড়! শিবু যেন গ্রামে হঠাৎ সম্রাট হয়ে বসলো; এবং সাদাৎ আলী তা'র প্রধান মন্ত্রী! এটা হবারই কথা, কেননা এটা শিবুর পৈতৃকভূমি, এখানে সে মানুষ,—এখানকার পথে পথে এই সেদিনও সে না খেয়ে ট্যানা প'রে ঘুরেছে। আজ সেই শিবুর আবির্ভাবে সোনাডাঙ্গা যেন বেঁচে উঠলো, জেগে উঠলো। শিবু কেবল যে এ গ্রামে ঐশ্বর্যই আনলো তাই নয়, সে যেন একটি মিলনের সংবাদও আনলো। এ গ্রামের সেই নগণ্য শিবু।

সেদিন কালীবাড়ীতে ছেলেরা শিবুকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনলো। শিবুর সঙ্গে আলাপ-সম্ভাষণ করার জন্য গ্রামের সবাই সেখানে জড়ো হয়েছে। কিন্তু শিবু একা এলো না, সঙ্গে এলো তা'র দুজন দেহরক্ষী; তা'রা খাকি রংয়ের জামা কাপড় পরা। শিবুর পরণে অতি পরিচ্ছন্ন ধোয়া তাঁতের ধুতি; গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবী, হাতে হীরের আংটি; শিবুর চোখ দুটি সস্নেহ মাদকতায় জড়ানো। তাকে নিরীক্ষণ ক'রে সকলেই স্তব্ধ। সাদাৎ আলী গ্রামের পক্ষ থেকে শিবুকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, আমাদের শিবেন্দ্র, গ্রামের উজ্জ্বল রত্ন...তাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করার ভাষা আমার নেই।

শিবু তা'র ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইটের টিন থেকে সিগারেট বা'র ক'রে সবিনয়ে ধরালো। কেবল মিষ্ট কণ্ঠে বললে, আমি সামান্য, তবে আপনাদের স্নেহেই আমি বড় হ'তে পারি।

তা'র সিগারেট ধরানো দেখে গ্রামের বৃদ্ধ নেতৃস্থানীয় হরেন রায় মশায় নির্বাক হয়ে তা'র দিকে তাকিয়ে ছিলেন। শিবুর বয়স প'চিশ ছাব্বিশের বেশী নয়,—কিন্তু তা'র মাথা এত উঁচুতে ছাপিয়ে উঠলো কেমন ক'রে, এ সংবাদ কারো জানা নেই। মোট কথা, এ যুদ্ধে সবই সম্ভব।

সেই সভাতেই সাদাৎ আলী প্রকাশ করলেন, শিবেন্দ্র শীঘ্রই কলকাতায় ফিরবেন, তবে এই কালীবাড়ীকে নূতনভাবে তৈরী করার জন্য তিনি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে যাবেন। তাঁর খরচেই দাতব্য চিকিৎসালয়, ইস্কুল, অন্ন-সত্র ইত্যাদি চলবে। তা ছাড়া এ গ্রাম থেকে মহামারী, দারিদ্র্য ও অন্নবস্ত্রের অভাব ঘোচাবার জন্য তিনি নাকি বদ্ধপরিকর। কলকাতায় চ'লে গেলেও বছরে তিনি একবার অবশ্যই আসবেন। আমাদের মস্ত সৌভাগ্য যে, তিনি এত কষ্ট ক'রে—ইত্যাদি। শিবু সকলের প্রতি আনত হয়ে নমস্কার ক'রে উঠে দাঁড়ালো। সভায় সকলের মুখেই সাধুবাদ, ছেলেদের মুখে ধন্য ধন্য। সেই শিবু!

শিবুর জন্য গ্রামের সীমানায় একটি তাঁবু খাটানো হয়েছিল। সেটি অস্থায়ী, কারণ শিবুকে শীঘ্রই চ'লে যেতে হবে,—তবু সেই তাঁবুর মধ্যে সাজসরঞ্জামের কোনো ত্রুটি ছিল না। নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা বেশীদিন সে এখানে আছে,—এজন্য কলকাতা থেকে আরো কয়েকজন লোকজন এসে পৌঁছেচে। শিবুর ক্যাম্পের বাইরে আছে ইলেকট্রিক ডায়নামো,—সুতরাং দিনে পাখা ঘোরে, রাত্রে ইলেকট্রিক আলো জ্বলে। আকাশ ভালো থাকলে রান্না-বান্না বাইরেই হয়। মাছ ধ'রে এনে খাকি পোষাকপরা চাকর বাকররা মাছ কুটতে বসে, কিম্বা মাংস রাঁধে, কিম্বা পোলাও বানায়। আর অদূরে আ'লের কাছে গ্রামের ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে তাঁবুর দিকে তাকিয়ে থাকে।

সেদিন ওই আ'লের ধারের রাস্তাটায় কানা-ফটিকের সঙ্গে শিবুর হঠাৎ দেখা। কানা-ফটিক ভুরু উঁচু ক'রে বললে, পেন্নাম হই, শিববাবু।

শিবু হাসিমুখে বললে, বাবু হলুম কবে থেকে, ফটিক?

কানা-ফটিক বললে, কলকাতার বড়লোক ...বাবু বৈ কি।

শিবু একটু আত্মীয়তা ক'রে বললে, কেমন আছ? কী কর আজকাল?

আমাদের আর থাকাথাকি! সেই ঘরামির কাজই করি। তবে কাজ কম...খড় নেই, দড়ি নেই...যুদ্ধে গেল সব। মনে পড়ে, তুমি আমার সঙ্গে ক'দিন বেড়া বাঁধতে?

কানা-ফটিকের কণ্ঠে অন্তরঙ্গতার তাপ লক্ষ্য ক'রে শিবু আর কথাটা বাড়াতে চাইলো না। কেবল বললে, মনে হচ্ছে অনেককালের কথা,—যাকগে। ছোট লাহিড়ীদের খবর কি? জানো কিছু?

কানা-ফটিক বললে, ছোটবাবু মারা গেছেন।

মারা গেছেন? শিবু চমকে উঠলো।

হ্যাঁ, মারা গেছেন আজ বছর দেড়েক। হঠাৎ হেসে ফটিক বললে, বেশ মনে পড়ে, ছোটবাবু তোমাকে দুচক্ষে দেখতে পারতো না।

শিবু চুপ ক'রে রইলো কতক্ষণ। অবশ্য এ সব কথা কানে শোনাও এখন তা'র পক্ষে কিছু মর্যাদা হানিকর। কেবল এক সময় একটু নিশ্বাস ফেলে বললে, খুড়ি মা?

কানা-ফটিক বললে, তিনি আছেন, তবে খুবই কষ্ট। বলতে গেলে দিন চলে না। চোরাবাজারে চাল কেনা...কাপড় কেনা... কোত্থেকে পাবে বলো! বিধবা মানুষ! ছেলেটা নাবালক।

শিবু বললে, আচ্ছা, এসোগে তুমি—

কয়েক পা গিয়ে কানা-ফটিক একবার মুখ ফিরিয়ে শিবুর দিকে চেয়ে হাসলো। বললে, তুমি ওদের ভাত অনেক খেয়েছ, শিববাবু—

শিবু কথা বললে না, ওকথাটা তা'র কানে না ঢোকাই ভালো।

তাঁবুতে ফিরে এসে কানা-ফটিকের কথাটা শিবুর দুই কানে খোঁচাতে লাগলো। ছোট-লাহিড়ী তা'কে দুচক্ষে দেখতে পারতো না,



একটি সিগারেটের আধখানা সে খায়

তবুও শিবু গোপনে গিয়ে ওদের বাড়ীতে ভাত খেয়ে আসতো। ওখানে সে উপকৃত, কৃতজ্ঞ এবং ঋণী—এতে ভুল নেই। কোথায় কোথায় তা'র ঋণ আর কৃতজ্ঞতা—সে সব জানে, তা'র স্মৃতিশক্তি জ্বলজ্বলে। ছোট-লাহিড়ী ম'রে গেল, শিবুর অবস্থার পরিবর্তন দেখে গেল না। বেঁচে থাকলে শিবু তাকে কিনে ফেলতে পারতো,—তা'র ঘর-খামার, আসবাব-সজ্জা সব সুদ্ধ। শিবু উপেক্ষিত অপমানিত ছিল চিরকাল,—এবার তা'র জাগ্রত পৌরুষ সবাইকে জয় ক'রে নেবার জন্য ঠিক যেন অশ্বমেধের ঘোড়া ছোটাতে চায়। সে তা'র দানের অজস্রতায় সকল উপেক্ষা আর অবহেলাকে জয় করবে।

পরদিন সকালে সে ছোট-লাহিড়ীদের উঠোনে এসে দাঁড়ালো। খুড়িমা ছিলেন পুজোর ঘরে, তিনি বেরিয়ে এলেন। বললেন, ওমা, শিবু যে?

শিবু তাঁর পায়ের ধুলো নিল। খুড়িমা বললেন, অনেকদিন এসেছিস শুনছি, এতদিনে বুঝি মনে পড়লো রে?

শিবু হাসিমুখে বললে, নানা ঝঞ্ঝাটে কাটছে,—নিরিবিলি তোমার এখানে আসবো ভেবেছিলুম।

খুড়িমা বললেন, এখানে থাকবি নাকি?

না খুড়িমা, দু একদিনের মধ্যেই যেতে হবে—অনেক কাজ, তোমরা কেমন আছ?

অমনি এক রকম, বাছা। দেখতেই পাচ্ছিস, দিনকাল বড় খারাপ। যুদ্ধ কবে থামবে বলত?

শিবু হাসিমুখে বললে, যুদ্ধ এখন না থামাই ভালো, থামলেই আমাদের লোকসান।

বটে! খুড়িমা বললেন, তোরা না হয় ফেঁপে উঠলি,—আমরা যে তলিয়ে গেলুম রে! আর দিন চলে না

এমন সময় ঘাট থেকে উঠে ভিজা কাপড়ে খুড়িমার মেয়ে লাবণ্য এসে দাঁড়ালো। শিবু মুখ ফিরিয়ে বললে, ভালো ত' লাবণ্য?

লাবণ্য ঘাড় নেড়ে তাড়াতাড়ি ভিতরে চ'লে গেল। শিবু বললে, আমি ভেবেছিলুম লাবণ্যর বিয়ে হয়ে গেছে।

খুড়িমা বললেন, তা আর হোলো কোথায় বাছা। বিয়ের সব ঠিকঠাক,—উনি মারা গেলেন। পাত্তর ভেগে গেল। তারপর এই যুদ্ধের হিড়িক,—জাপানীদের ভয়ে কে কোথায় পালাবে তা'র ঠিক নেই। জিনিষপত্তর পাওয়া যায় না, দেশে দুর্ভিক্ষ আর রোগ। বিয়ের টাকাকড়ি সব খরচ হয়ে গেল! লোকে খেয়ে-প'রে বাঁচবে, না ছেলেমেয়ের বিয়ে দেবে বল্ দেখি?

শিবু বললে, এ তোমাদের অন্যায় খুড়িমা, —অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা উচিত। তোমরা কলকাতা গেলে না কেন? সবাই সেখানে যা হোক দু'পয়সা করছে, তোমরাই শুধু পিছিয়ে রইলে।

খুড়িমা বললেন, ওমা, তুই বলিস কি রে? জানা নেই, শোনা নেই, কলকাতায় গিয়ে দাঁড়াবো কোথায়?

শিবু বললে, বাঃ, আমি বুঝি নেই সেখানে? তোমার কাছে একটা খবর পেলে আমি অন্ততঃ চেষ্টাও করতে পারতুম।

খুড়িমা বললেন, তুই ত' সেই তিন বছর আগে গাঁ থেকে বেরিয়ে কাদের সঙ্গে গেলি কলকাতায়। কে যেন বললে, তুই নাকি আসামে, কেউ বললে চাটগাঁ। তোর এত টাকা হোলো কোত্থেকে বল্ ত?

শিবু নতমুখে বললে, কি যে বলেন খুড়িমা—কী আর সামান্য!

একে তুই সামান্য বলিস? গাঁয়ে এসে তুই নাকি এরই মধ্যে তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা খরচ করেছিস? এত পেলি কোথায়, শিবু?

শিবু বললে, তোমাদের জন্যে যদি কিছু না করতে পারি, তবে আমার টাকা-পয়সার কোনো দামই নেই, খুড়িমা!

এমন সময় হাসিমুখে লাবণ্য বেরিয়ে এলো। এত অভাব আর অনটনের মধ্যেও তা'র স্বাস্থ্যশ্রীর দিকে তাকিয়ে শিবু যেন পলকের জন্য একটু উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে পড়লো। লাবণ্য বললে, অনেক টাকা নাকি তোমার শিবুদা... শুনতে পাচ্ছি। আজ বুঝি বাড়ী বয়ে কিছু দান করতে এলে?

শিবু বললে, এতখানি স্পর্ধা আমার নেই, লাবণ্য। এ-বাড়িতে ভাত খেয়ে আমি মানুষ... এখানে টাকার অহঙ্কার দেখাতে আসিনি! তোমরা ভুল বুঝো না!

খুড়িমা বললে, তুই আমাদের জন্যে কী করতে চাস, বল্?

শিবু বললে, তোমরা আমার সঙ্গে চলো।

কোথায় রে?

কলকাতায়। বলু আর লাবণ্যকেও নিয়ে চলো।

কলকাতায় দাঁড়াবো কোথায়?

শিবু বললে, কেন, আমার কুঁড়ে ঘর কি নেই?

খুড়িমা প্রশ্ন করলেন, তুই বিয়ে করেছিস?

শিবু হেসে ফেললো। বললে, তোমরা বিয়ে ত' দাওনি?

লাবণ্য কটাক্ষ ক'রে বললে, লেখাপড়া ত' শেখোনি একটুও—এবার টাকার জোরে মেয়ে ঘরে আনো?

শিবুর আহত পৌরুষ পলকের জন্য জ্বলে উঠলো, কিন্তু এ-বাড়ীর অন্নে সে মানুষ—কঠিন কথা তার মুখে এলো না। কেবল লাবণ্যর দিকে একবার তাকিয়ে খুড়িমাকে বললে, যদি যেতে রাজি থাকো তাহ'লে আমি—

মাঝপথে তাকে থামিয়ে লাবণ্য বললে, দেনাশোধ করা চাই, কেমন শিবুদা? সেখানে নিয়ে গিয়ে আমাদের ভাত-কাপড় দিয়ে পুষবে, এই ত?

খুড়িমা বললেন, তুই কি সেখানে একা থাকিস?

শিবু বললে, আর কে থাকবে বলো? কেবল কাজকর্ম থাকলে বাইরের লোক আসে-যায়।

লাবণ্য বললে, কিন্তু আমরা গিয়ে তোমার ঘাড়ে চাপতে যাবো কেন বলো ত? বেশ ত, তুমি দয়ালু, এ আমরা জেনে রাখলুম!

শিবু বললে, তা নয়, আমি তামাসা করতে আসিনি লাবণ্য,—সেখানে গেলে তোমরা সকলেই কাজ পাবে, তাই বলছি।

খুড়িমা বললেন, আমরা কী কাজ করবো, শিবু?

শিবু বললে, আজকাল বাড়ীতে ব'সেও অনেক কাজ করা যায়, খুড়িমা। এটা যে যুদ্ধের যুগ। তাছাড়া বলু যত ছেলেমানুষই হোক, ওর একটা কাজ ঠিকই জুটে যাবে, আমি ব'লে রাখছি।

লাবণ্য বক্রোক্তি ক'রে বললে, ভাগ্যি যুদ্ধ বেধেছিল, তাই তুমি মানুষ হ'লে শিবুদা!

শিবু বললে, তুমিও মানুষ হয়ে ওঠো, এই চাচ্ছি।

বাঁকা চোখে চেয়ে লাবণ্য বললে, তোমার আজকাল পয়সা হয়েছে, উপদেশ ছড়াবে বৈকি!—এই ব'লে সে রান্নাঘরের দিকে চ'লে গেল।

খুড়িমা প্রশ্ন করলেন, তুই কবে চ'লে যাবি?

শিবু বললে, ভাবছি কালই যাবো।

কিয়ৎক্ষণ কী যেন চিন্তা ক'রে খুড়িমা বললেন, তুই এত ক'রে বলছিস,—না হয় মাস-খানেকের জন্য কলকাতায় যেতে পারি। কিন্তু বাছা, আমাদের পুঁজি কিছু নেই! নৌকোভাড়া রেলভাড়া—এসব ঘর ঠ্যাঙালেও বেরোবে না। ঘরে চাল নেই, নুন নেই, কাঠ নেই। ইস্কুলের মাইনের অভাবে বলুর পড়া বন্ধ হয়ে গেল। একখানা কাপড়ের জন্যে অত বড় মেয়ে বাইরে বেরোতে পারে না! তা সে যাই হোক, ওই এক মাস,—তারপরেই আমি বাছা ফিরে আসবো। কলকাতায় কত গোলমাল, সেখানে থাকতে আমার ভরসা হয় না, শিবু।

রান্নাঘর থেকে গলা বাড়িয়ে লাবণ্য বললে, শিবুদার বাহাদুরিটা দেখে আসতে তোমার এতই ইচ্ছে মা

খুড়িমা এবার বললেন, তুই ভারি যা-তা বলিস, লাবণ্য!

লাবণ্য হেসে বললে, বড়মানুষিটা না দেখাতে পারলে বড়লোকরা আবার খুশী থাকে না। কি বলো, শিবুদা?

শিবু বললে, তোমাদের বাড়ীতে এসে দাঁড়িয়েছি, যা খুশি তাই বলতে পারো!

লাবণ্য উঠে এলো। বললে, তোমার বাড়ীতে গেলে তুমিও বুঝি আমাদের যা খুশি তাই বলবে? রক্ষে করো, আমি যাবো না।

শিবুর মুখে খুব একটা কঠিন কথা এসেছিল, কিন্তু সে আপন জিহ্বাকে সংযত করতে গিয়ে হেসে ফেললো। বললে, যাঃ কী যে বলো তুমি!—তোমার মেয়ের এখনও জ্ঞানবুদ্ধি হয়নি, খুড়িমা।

লাবণ্য অবাক হয়ে কিয়ৎক্ষণ শিবুর দিকে তাকালো। তারপর বললে, বাঃ—সেই শিবুদা! বাবা বেঁচে থাকলে ভালো হোতো। তা বেশ, তোমার ওখানে গেলে তুমি আমার জ্ঞানবুদ্ধি একটু পাকিয়ে দিয়ো?

শিবু বললে, খুড়িমা, তবে ওই কথাই রইলো। দুপুরবেলা নৌকো ছাড়বো। আমি নিজে এসে তোমাদের নিয়ে যাবো।

খুড়িমা বললেন, আচ্ছা, আমরা তৈরি হয়ে থাকবো।

শিবু চ'লে গেল। কিন্তু বাইরে এসে সে অনুভব করলো, নিস্ফল একটা ক্রূর আক্রোশে তা'র সর্বশরীর কাঁপছে। লাবণ্যর অহঙ্কার অসহ্য! দারিদ্র্য, হতমান, অনটন,—কিন্তু ছোট-লাহিড়ীর সেই মেয়ের কী পর্বতপ্রমাণ আত্মাভিমান! সে যত বড় ধনীই হোক, ওরা তা'কে মানুষ ব'লে মনে করে না,—ওরা শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, ওরা বংশানুক্রমিক অভিজাত। আভিজাত্যের সেই নীলরক্তের গর্ব ওদের চোখে মুখে মেদমজ্জায়। ঘরে অন্ন নেই, পরণে লজ্জানিবারণের বস্ত্র নেই,—কিন্তু আড়ম্বরিতার মেয়েটা অন্ধ। ওর স্বাস্থ্যশ্রীটি পুরুষের পক্ষে লোভনীয়,—কিন্তু শিবু ত কম নয়! শিবুও ত' এতদিন পরে পাত্র হিসাবে কন্যাজগতে লোভনীয় হয়ে উঠেছে!

শিবু টিন বা'র ক'রে সিগারেট ধরালো। পথ দিয়ে সে চলেছে, কত লোক চেয়ে রয়েছে তা'র দিকে। কিন্তু ওই ওরা,—শিবুর কাছে উপকার নিয়ে ওরা যেন শিবুকে কৃতার্থ করবে! পথের লোক তাকে মানে, ঘরের লোক তাকে মানে না। বহু জনসাধারণ তাকে মহিমার আসনে বসায়, কিন্তু বহুপরিচিতরা তাকে আমল দেয় না। আর ওই লাবণ্য! লাবণ্য তা'র ভ্রূভঙ্গিতে যেন শিবুকে জানিয়ে দিল, তুমি এ-বাড়ীর ভাত খেয়ে মানুষ, তুমি এই সেদিনও এ-বাড়ীর আনাচে-কানাচে বয়াটে ছেলের মতন ঘুরে বেড়াতে। টাকা তোমার এ যুদ্ধে যতই হোক, তোমার মর্যাদা কিছু নেই। তুমি লেখা-পড়া শিখে মানুষ হওনি, বিদ্যাবুদ্ধিতে মহৎ হওনি,—তুমি যুদ্ধের জুয়ায় কিছু পয়সাকড়ি করেছ, এইমাত্র। এর বেশী তুমি কিছু নয়।

শিবু যেন কোথায় নিজেকে আহত অপমানিত ও ক্ষুদ্র মনে ক'রতে লাগলো। তা'র চোখ দুটো যেন জ্বালা ক'রে উঠছে কেমন এক-প্রকার আত্মগ্লানিতে। সে যেন লাবণ্যদের ওখানে নিজের মস্ত কিছু একটা দেখাতে গিয়েছিল, কিন্তু লাবণ্য যেন তা'র কান মলে দিয়ে তাকে যথানির্দিষ্ট পথ দেখিয়ে তাড়িয়ে দিল।

সমস্ত দিনটা শিবু অন্যমনস্ক হয়ে রইল। কত লোক এলো কত কাজে। কত লোকের কত আবেদন, কত কর্মপন্থার নির্দেশ। বারোয়ারি-তলা, ক্লাব, ইস্কুল, কালীবাড়ী, হাটতলা, ইউনিয়ন বোর্ড,—কত বিষয়ের কত আলোচনা দীর্ঘ রাত্রিব্যাপী চললো। কিন্তু সব কাজকর্ম ও আলাপ-আলোচনার মধ্যে শিবু যেন নগণ্য, ক্ষুদ্র ও হতমান হয়ে বিড়ম্বিতের মতো ব'সে রইলো।

* * * *

সমস্ত পথটা লাবণ্য এবং তা'র মা অনেকটা যেন বিমূঢ়ের মতো বসেছিল। ট্রেণের ফার্স্ট ক্লাস কামরায় তাদের এই প্রথম এবং এই যাত্রার আনুষঙ্গিক যা-কিছু থাকা দরকার, সমস্তই রাশি রাশি। সঙ্গে চাকরবাকর, তকমাপরা দারোয়ান, সহকর্মী জনতিনেক। শিবু যেন হঠাৎ ফেঁপে উঠেছে, উপচিয়ে পড়ছে তা'র টাকাপয়সা, কেবল খরচের উপলক্ষ্যটা পাওয়া,—ব্যস্, টাকাকড়ি জলস্রোতের মতন বেরিয়ে পড়ে। মা ও মেয়ে অভিভূত, হতচকিত।

গাড়ী কলকাতায় পৌঁছলে দেখা গেল, শিবুর জন্য সবাই রয়েছে অপেক্ষা ক'রে। দু'খানা চকচকে মস্ত মস্ত মোটর এসেছে তাকে নিয়ে যাবার জন্য। শিবুর কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কেউ সেলাম জানালে সে সেলাম নেয় না, নমস্কার জানালে প্রত্যুত্তর নেই, আগ্রহ প্রকাশ করলে তা'র ভ্রূক্ষেপ নেই। শিবু সবাইকে এড়িয়ে খুড়িমা ও লাবণ্যর সঙ্গে গাড়ীতে গিয়ে উঠলো।

লেক্-রোডে এক প্রকাণ্ড ফটকওয়ালা বাড়ীতে এসে তারা মোটর থেকে নামলো। ফটকের একটি স্তম্ভে এক কাঁচের বাক্সের মধ্যে শিবুর নাম ইংরেজি সংক্ষিপ্ত হরপে লেখা,—এস এন সেনগুপ্ত। গাড়ী এসে থামতেই বুড়ি আয়া এসে দাঁড়ালো, তার সঙ্গে এলো ঘরকন্নার আলাদা ঝি-চাকর। বোঝা গেল, খুড়িমা ও লাবণ্যর আসার খবর আগেই এসে পৌঁছেচে। এতক্ষণে লাবণ্যর মুখখানা ক্লান্ত দেখা যায়। লাবণ্যর সমস্ত পরিহাসবুদ্ধি একেবারে অসাড় হয়ে গেছে।

নীচের সামনের অংশে মস্ত আপিস ঘর। লাবণ্য প্রশ্ন করলো, এটা কিসের আপিস, শিবুদা?

ওটা হিসেবের দপ্তর, এসো তোমরা।—শিবু তাদের নিয়ে অগ্রসর হোলো।

মার্বেল পাথরের দালান আর সিঁড়ি, অসংখ্য আয়না আর ছবি, অজস্র আসবাবপত্র, ঝাড়লণ্ঠন, কত রকমের টেবল্ ও কুশন্,—কত বিচিত্র ঘড়ি ও তাদের টুংটাং আওয়াজ। একটি

ঘরে ঢুকবার আগে খুড়িমা প্রশ্ন করলেন, ঘরে ঢুকবো, ভিতরে কে যেন কথাবার্তা বলছে, শিবু?

শিবু বললে, কেউ নয় খুড়িমা, ওটা রেডিয়ো। এইটিই আপনাদের ঘর। এটায় শোওয়া চলতে পারে,—এরই মধ্যে স্নানের ঘর রয়েছে। পাশে আপনাদের বসবার ঘর। আয় বলু, আমার সঙ্গে।

বছর তেরো বয়সের অর্বাচীন ছেলেটি বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে শিবুর সঙ্গে এগিয়ে গেল। কোথায় যেন তখন টেলিফোন বাজছে।

খুড়িমা চেয়ে থাকেন লাবণ্যর দিকে, লাবণ্য সলজ্জভাবে তাকায় মায়ের প্রতি। তাদের হাত-পা আসে না। কলকাতার শ্রেষ্ঠ অভিজাত-পল্লীতে এই প্রাসাদ হয়েছে শিবুর,—শিবু এই সম্পত্তির মালিক। তিন বছর আগের সেই শিবু, যার একবেলা ভাত জুটতো না! মাত্র এই তিন বছর! এ যুদ্ধে কী না সম্ভব?

কিন্তু কিছু তলিয়ে দেখার মতো অবস্থা খুড়িমার ছিল না। তাঁরা বসবেন, কি দাঁড়াবেন, কিম্বা বাইরে আসবেন, অথবা স্নানের আয়োজন করবেন,—কিছুই বুঝতে না পেরে যখন অভি-ভূতের মতো আড়ষ্ট হয়ে রয়েছেন,—সেই সময় এ-বাড়ীর প্রধান পরিচারক এসে দাঁড়ালো। তা'র হাতে একরাশি তসর ও রেশমের জামা-কাপড়। ব্রাহ্মণ পাচক তা'র পিছু পিছু এসে বললে, মা, আপনি ভাঁড়ার ঘরে আসুন—এই নিন চাবির গোছা, বাবু পাঠালেন।

এমন সময় বলু এসে দাঁড়ালো যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাহেববাচ্চার মতো। ইতি-মধ্যেই সে সমস্ত বাড়ীটা ঘুরে দেখে এসেছে। তা'র দিকে তাকিয়ে লাবণ্য সহসা ঝড়ের মতন খলখিল ক'রে হেসে উঠলো।

বিকালের দিকে এক সময় খুড়িমা শিবুকে দেখতে পেয়ে বললেন, তোর এখানে তেমন হিন্দুয়ানী নেই বাছা!

শিবু হেসে বললে, তবেই হয়েছে, এটা যে কলকাতা খুড়িমা! ওসব এদিকে নেই!

ওমা, সে কি রে?

শিবু বললে, তোমরা সেকেলে লোক,—ও রকম কুসংস্কার তোমরা আঁকড়ে ধরে থাকো, এ যুগে ওসব চলে না খুড়িমা—

বাইরে মোটরের হর্ণ বাজলো। শিবু নরায় বললে, তোমাদের গাড়ী এসেছে। কই, লাবণ্য কোথায়?

খুড়িমা বললেন, গাড়ী! গাড়ী কেন রে?

বেড়াতে যাবে না তোমরা? একটু হাওয়া খেয়ে এসো মাঠের দিকে। ওতে মন ভালো হয়।

কার সঙ্গে যাবো বাছা?

শিবু হেসেই খুন। বললে, কোনো দরকার নেই, আমার সোফার আর দারোয়ান সঙ্গে যাবে। সিনেমায় যাবে খুড়িমা?

না বাছা—

লাবণ্যকে নিয়ে খুড়িমা যখন শিবুর সঙ্গে সঙ্গে বাইরে আসবেন, সেই সময় দুজন হোমরা চোমরা ব্যক্তি ফটকে ঢুকছে। শিবুকে দেখে তারা যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে কাছে এলো। লাবণ্য ও খুড়িমা আড়ষ্ট হয়ে কুঁকড়ে সরে যাবার চেষ্টা করতেই শিবু বললে, এই যে আমার বন্ধুদের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই—

কি যেন একটা কাণ্ড ঘটে গেল এক মিনিটে। ভুল-ইংরাজি ভাষায় শিবু ঝর-ঝর করে কতকগুলো কথা বলে গেল,—লাবণ্য ও খুড়িমা গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেলেন। বলু গিয়ে আগেই গাড়ীতে বসলো।

গাড়ীর কাছে এসে শিবু বললে, সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে হয়, এটা কলকাতা! আগেকার সেসব আব্রু আজকাল আর নেই।

লাবণ্য শিবুর দিকে তাকিয়ে সহাস্যে বললে, লজ্জামান খোয়াতে আর কেউ লজ্জা পায় না, এই বলছ ত?

মোটর ছেড়ে দিল। শিবু সেখানে দাঁড়িয়ে মোটরের দিকে তাকিয়ে রইল চুপ করে। লাহিড়ীরা যত বড় অভিজাতই হোক, কোনো-কালে মোটর কেনেনি, এটা শিবু জানে। এ বাড়িখানা তৈরী করতে যত টাকা লেগেছে, লাহিড়ীগোষ্ঠি অত টাকার গল্পও শোনেনি কখনও! লাবণ্যর দম্ভ, লাবণ্যর তেজ! কিন্তু লাবণ্য জানে না, গোটাকয়েক টাকা ফেললে এই কলকাতা সহরের লাখ লাখ লাবণ্যর যে-কোনো লাবণ্য আজই রাত্রে পায়ের তলায় এসে পড়ে। এই ত লাবণ্যর এত অহঙ্কার,—কিন্তু রেশমী শাড়ী আর জামা হাতে পেতে নেবার সময় তার আত্মসম্মানে একটু বাধেনি! কোথায় গেল লাহিড়ী বংশের পর্বতপ্রমাণ গর্ব, কোথায় রইলো নিষ্ফল আভিজাত্যবোধ? একথা ওদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, যারা যোগ্য—এ যুগে তারাই বাঁচবার অধিকার পায়; অযোগ্যের জায়গা কোথাও নেই!

সেদিন রাত্রে খুড়িমা শিবুকে ধরে বসলেন, তোর অবস্থা কেমন করে ফিরলো, এবার আমাকে বলতে হবে শিবু—

শিবু বললে, খুব সোজা! মিলিটারী কণ্ট্রাক্ট জোগাড় করেছিলুম একটু কষ্ট করে। ঝুড়ি, ঝাঁটা, বুরুশ—এইসব চালান দিই। মুরগী আর পাঁঠা জোগাড় করি। এ ছাড়া কম্বল, চামড়া—এমন কি আলু-পটলও সাপ্লাই করেছি খুড়িমা?

খুড়িমা বললেন, তাইতে এত, শিবু?

না—শিবু বললে, আমি গিয়েছিলুম আসাম আর চাটগাঁয়ে। উড়ো জাহাজ নামবার মাঠ তৈরী হবে—কুলীরা পালাচ্ছে জাপানী বোমার ভয়ে,—আমি এদেশ-ওদেশ ঘুরে দু'চার হাজার কুলী জোগাড় করে এনে দিতুম। তাতে অনেক টাকা! এমন বহুবার জোগাড় করে দিয়েছি।

খুড়িমা তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন শিবু বললে, পাহাড় আর জঙ্গল কেটে রাস্তা বানাতে গেলে লেখা-পড়ার খুব বেশী দরকার হয় না, খুড়িমা—। আমি কাজ করতে জানতুম।

খুড়িমা কতক্ষণ পর্যন্ত অবাক হয়ে রইলেন। শিবু বলতে লাগলো, টাকা কেমন করে আসে জানতে পারিনে...কোথা থেকে কেমন করে আসে হঠাৎ হাজার হাজার টাকা! পরিশ্রমের টাকা নয় খুড়িমা, সমস্তটাই যেন জুয়া, জুয়ার টাকা, এতবড় যুদ্ধটা একটা জুয়া ছাড়া আর কিছু নয়! যাদের টাকা নেই, তারা মনে করবে আজগুবি কথা বলছি, কিন্তু টাকা যাদের আছে তারা জানে টাকা আসা কত সহজ!

খুড়িমার মুখে আর একটিও কথা সরলো না। তিনি অলক্ষ্যে অভিনিবেশ সহকারে শিবুকে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

চার পাঁচদিন পরে একদিন সন্ধ্যার পর শিবু ভিতর মহলে এলো খুড়িমাদের খবর নিতে। উপরের খোলা বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়েছিল লাবণ্য। বললে, মা গেছেন রান্না বাড়ীতে—

শিবু এ সংবাদে তখনই উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বললে, রান্না-বাড়ীতে? কেন, দু'দুজন বামুন রয়েছে, তারা করে কি? এক একজন বামুন কত মাইনে নেয়, জানো লাবণ্য? চল্লিশ টাকা! আমার বাড়ীতে ঝি-চাকরের মাইনে, চুরি আর খাওয়া-পরায় মাসে হাজার টাকা লাগে!

লাবণ্য সহাস্যে চোখ কপালে তুলে বললে, হাজার টাকা!

হ্যাঁ, হাজার টাকা! ওরা যদি কাজ করতে না চায়, তোমরা জুতিয়ে কাজ আদায় করে নেবে! দাঁড়াও—দেখছি আমি—

লাবণ্য বললে, তুমি ব্যস্ত হয়ো না—মা তোমাকে আজ নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াবেন, তাই গেছেন রান্নাবাড়ীতে—

এমন সময় একজন চাপরাশি একখানা ট্রে-তে এক টিন সিগারেট আর দেশলাই এনে দাঁড়ালো। শিবু সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে বললে, খুড়িমা আমাকে খাওয়াবে, আমার কী ভাগ্যি!

লাবণ্য মুখ ফিরিয়ে বললে, মা গঙ্গা-জলেই গঙ্গাপুজো করতে গেছেন! আচ্ছা শিবুদা, আমাদের থাকার জন্যও ত' তোমার অনেক খরচ পড়ছে। হাজার টাকা হয়ত দেড় হাজারে গিয়ে দাঁড়াবে,—তার চেয়ে আমাদের দেশে পাঠিয়েই দাও—

শিবু একমুখ হেসে বললে, কী আর খরচ! বোঝার ওপর শাকের আঁটি। এর জন্যে তোমরা ব্যস্ত হোয়ো না!

বাড়ীর এদিকের অংশটা নির্জন। এদিক-ওদিক চেয়ে শিবু বললে, তোমার জন্যে একটা জিনিস এনেছি, লাবণ্য।

কি?

একগাছা জড়োয়া নেকলেস পকেট থেকে বের করে শিবু বললে, তোমাকে এটা উপহার দিতে চাই।

নেকলেসটি দেখে লাবণ্য সোজা শিবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কেন?

শিবু বললে, এমনি...দিতে ইচ্ছে হোলো।

কত টাকা দাম?

ন'শো টাকা!

লাবণ্য বললে, ন'শো টাকার উপহার আমাকে দিয়ে কেন তুমি টাকা নষ্ট করবে?

শিবু বললে, এটা নষ্ট হবে জানলে দিতুম না। তুমি গলায় পরলে মানাবে, তাই এনেছি।

কলকাতায় অনেক মেয়ে আছে! আমার গলায় নেকলেস ঝুলিয়ে তোমার লাভ কি বলো ত?

কঠিন শীতল লাবণ্যের কণ্ঠস্বর! তার চাহনি এত পরিষ্কার যে, মুখ তুলে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। শিবু অত্যন্ত ছোট হয়ে গিয়ে বললে, তুমি নেবে না?

লাবণ্য বললে, মাকে জিজ্ঞেস না করে নিতে পারবো না।

শিবু বললে, তবে যাক্, খুড়িমাকে বলবার দরকার নেই!—এই বলে হার ছড়াটা সে পকেটে পুরে রাখলো।

লাবণ্য বললে, তুমি এখানে বিশ্রাম করো শিবুদা, আমি মাকে একবারটি দেখে আসি।—এই বলে সে চলে গেল।

কেমন একটা কঠিন উত্তেজনা শিবুর দুই চোখে কাঁপতে লাগলো। ওদের বাড়ীতে সে ভাত খেয়ে মানুষ, ওদের চোখে সে অশ্রদ্ধেয়, ওদের সমাজে সে নগণ্য,—এই অপমানজনক ইঙ্গিতটি যেন লাবণ্যর ওই প্রতি-পদক্ষেপে সুস্পষ্ট। এ বাড়ীতে এসে ওরা যেন শিবুকে কৃতার্থ করেছে, ওরা শিবুর অন্নগ্রহণ করে শিবুকে যেন গৌরবমণ্ডিত করেছে।

শিবু কেবল ভাবতে লাগলো কত টাকা খরচ করলে ওদের চিত্তের প্রসন্নতা জয় করা যায়! লাবণ্যর দাম কত টাকা!

* * * *

এ বাড়ীতে শিবু একা- এ বাড়ী তার নিজস্ব। আপনার লোক বলতে তার কেউ নেই; বিবাহের জন্যও সে ব্যস্ত নয়। বাড়ীর একটা অংশ শুধু বাইরের লোকে পরিপূর্ণ। সাহেবেরা এসে চা খায়, ঠোঁটে রং মাখানো মেয়েছেলে মাঝে মাঝে আসে, খাকি পোষাক-পরা মেজর ও লেফটেন্যাণ্টকেও দেখা যায়। এ ছাড়া বন্ধু-বান্ধব,—কিন্তু তারা বহু রকমের। কেউ ঘোড়-দৌড়ের মাঠের জুয়াড়ী, কেউ দালাল, কেউ সাব-কণ্ট্রাক্টর, কেউ মাড়োয়াড়ী-ভাটিয়া। শিবু কিন্তু একা—একা থাকে মরুভূমিতে। তবু তার টাকা যখন আছে, সে সম্রাট। রুই-কাৎলা এখানে যারা আসে, শিবু তাদের দিকে চেয়ে থাকে। তারা আসে টাকার গন্ধে; ভালোবাসার জন্য নয়! শিবু সবাইকে টাকায় শাসন করে।

লাবণ্য এসেছে বটে তার বাড়ীতে। কিন্তু শিবুর কোনো উদ্বেগ নেই সেজন্য। লাবণ্যর প্রতি সে অনুরক্ত,—এ নিয়ে চিন্তাবিলাস করার সময় তার নেই। লাবণ্য সুশ্রী, লাবণ্য স্বাস্থ্যবতী,—তার জন্য শিবুর রাতজাগা দুশ্চিন্তা নেই। লাবণ্যকে সে যদি না পায়, কিছু যায় আসে না; যদি পায়, এমন কিছু বড় পাওয়া তার হবে না। পেলে মন্দ নয়, না পেলে দুঃখ নেই। মেয়েদেরকে ভালোবাসার এবং তাদের কাছ থেকে ভালোবাসা পাবার জন্য একটি শোভন স্বভাবের প্রয়োজন,—সেখানে তার দারিদ্র্য স্বীকার করতেই হবে। ভালো-বাসার জন্য সংস্কৃতি ও মহৎ শিক্ষার দরকার—সেটা কোথায় তার? সে তার জীবনে জানে দুটি জিনিষ—অনটন ও সচ্ছলতা। সে চরম দারিদ্র্য দেখে এসেছে এতকাল, এবার দেখছে পরম সৌভাগ্যসম্পদ। এর মধ্যে আর কোথাও কিছু নেই। কাকে বলে সৌজন্যবোধ আর সমাজ-বুদ্ধি, কাকে বলে বিদ্যা অথবা মহৎ জ্ঞান, কাকে বলে প্রেমের করুণ মধুর সাধনা,—ওসব বড় বড় কথা, ওসব পথে সে কোনো কালেই হাঁটেনি! ওসব তলিয়ে ভাববার সময়ও তার নেই।

খুড়িমা সেদিন বললেন, এই ত কতদিন হয়ে গেল, বেশ বেড়িয়ে নিলুম তোমার কলকাতায়, মটোরে চড়ে হাওয়া খেলুম, সিনেমা দেখে এলুম,—বেশ কাটলো। এবার কবে আমরা যাবো শিবু, বল্ ত বাছা?

শিবু হেসে বললে, যাবেন কেমন করে? বলু যে চাকরি করছে?

খুড়িমা বললে, আমার চোখে ধুলো দিসনে শিবু,—ওইটুকু ছেলে, কোনো কাজই জানেনা, তুই ওকে বসিয়ে বসিয়ে টাকা দেবার ফন্দি এঁটেছিস,—সত্যি কিনা বল্ ত?

শিবু বললে, সত্যিই কি যেতে চান্ খুড়িমা?

ওমা, ছেলের কথা শোনো। ঘর-দোর সব ফেলে রেখে এসেছি, তাড়াতাড়ি না গেলে যে দরজা-জানলাগুলো খুলে নিয়ে যাবে রে!

আমি যদি আপনাদের কলকাতায় থাকার সব ব্যবস্থা করে দিই?

তোর এখানে?

শিবু বললে, না, অন্য বাড়ীতে।

খুড়িমা বললেন, তোর এত আগ্রহ কেন শিবু?

শিবু থতমত খেয়ে কোনো জবাব সহসা খুঁজে পেলো না। একটু সামলে বললে, তোমাদের জন্যেই বলছি খুড়িমা। সেখানে তোমরা যেভাবে থাকো, তাতে ভাবনার কারণ আছে। তা ছাড়া আজকাল পাড়াগাঁয়ের যা অবস্থা! কিছুতেই ভালোভাবে থাকা যায় না।

খুড়িমা তখনকার মতো চুপ করে গেলেন।

শিবু ফিরে আসছিল, বারান্দার সঙ্কীর্ণ একটা পথে লাবণ্যর সঙ্গে দেখা। লাবণ্য হাসিমুখে বললে, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, ওসব কী আনিয়েছ আমার জন্যে?

শিবু হাসিমুখে বললে, ওসব আজকাল সবাই ব্যবহার করে।

লাবণ্য বললে, তাই বলে আমাকেও ঠোঁটে গালে রং মাখতে হবে, মুখখানায় পাউডার ঘষতে হবে—কেমন? এত শিখলে কোথায় শুনি? আমি কিন্তু ওসব মেখে তোমার সঙ্গে বেরোতে পারবো না, তা বলে দিচ্ছি।

শিবু বললে, তোমার বয়স কম হলে মল গড়িয়ে দিতুম।

লাবণ্য বললে, এখন বুঝি পায়ে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখতে চাও?

শিবু হেসে বললে, চলো, এরপর টিকিট পাওয়া যাবে না—গাড়ী অপেক্ষা করছে।

চলো, আমি তৈরী।—বলে লাবণ্য প্রস্তুত হোলো।

শিবু বললে, না, তা হবে না,—তোমার জন্যে কুড়ি টাকা দিয়ে রেশমী শিল্পার আনিয়েছি, ওটা পায়ে দিয়ে যেতেই হবে।

লাবণ্য কি যেন কতক্ষণ ভাবলো, তারপর বললে, আচ্ছা, তাই হবে—চলো।

শিবু আজ তার ছোট মোটরটি নিজেই হাঁকিয়ে চললো। পাশে বসেছে লাবণ্য। শেষ পর্যন্ত লাবণ্য তার মাকে লুকিয়ে একটুখানি টয়লেট্ করে এসেছে। অবিশ্যি এটা এমন কিছু অপরাধ নয়। একটা কথা লাবণ্য বুঝতে পেরেছে, শিবুকে অকারণ আহত করাটা তার পক্ষে সঙ্গত নয়। বাস্তবিক, শিবু ত অনেক করছে তাদের জন্যে। নিঃস্বার্থ এবং নিঃস্পৃহ ভাবেই করছে,—তার বিরুদ্ধে কোনো নালিশ করবার কিছু নেই। আর যাই হোক, শিবুর প্রতি অবিচার করায় কোনো আত্মগৌরব নেই।

এক সময়ে লাবণ্য বললে, তোমার নেকলেসটা আমি নিতে পারিনি, তুমি খুব দুঃখ পেয়েছিলে, না শিবুদা?

শিবু বললে, কই না, সেটা আমি ব্ল্যাক মার্কেটে বেচে তিনশো টাকা লাভ পেয়েছি! তুমি আর একটা চাও?

টয়লেট্ করা লাবণ্যর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে এলো অপমানে। শুধু বললে, আর তুমি কিছু আমাকে দিয়ো না।

শিবুর কোনো দুঃখ নেই, কারণ তার হৃদয় নেই। লাবণ্য যদি মনে করে থাকে, শিবু তার প্রতি আসক্ত,—লাবণ্য ভুল করেছে। শিবুর মনে কোনো সুদূর অনুরাগও নেই,—প্রণয়মাধুর্যরসে কেউ আনন্দ ও স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে, এ বস্তু তার কল্পনার অতীত। নারীর

সঙ্গে তার জীবনে কোনোদিনই বোঝাপড়া নেই। ওটা তার আসে না।

সিনেমায় ঢুকে অন্ধকারে খুঁজে তারা পাশাপাশি দুটো সীটে এসে বসলো। কি ছবি, তা শিবু জানে না, দরকারও নেই। সিনেমায় এসেছে, এই যথেষ্ট। দুজনে বসলো পাশাপাশি,—কিন্তু মাঝখানে কী দুস্তর ব্যবধান। দুজনে গায়ে গায়ে, পায়ে পায়ে,—কিন্তু দুই-খণ্ড ঠাণ্ডা পাথর! লাবণ্য জানে এটা ক্ষণস্থায়ী; শিবু জানে এটা খেয়াল। শিবুর টাকা আছে, দামী সীট কিনেছে, মোটর আছে সঙ্গে, তার সঙ্গে একটি সুসজ্জিতা তরুণী হোলো মানানসই। এই তরুণীটি যদি লাবণ্য না হয়ে মিস্ মলি রায় কিম্বা লীনা ষ্ট্যানহোপ হোতো—কিছুমাত্র মনোবৈকল্য হোতো না। ওরা যে-কেউ হোলো প্রয়োজনের সামগ্রী; টাকা, মোটর, টেলিফোন আর স্বাধীন প্রাসাদ হলেই ওরা আসে; সময়মতো আবার ওরা চলে যায়। শিবু কখনও ভুল করেনি।

অন্ধকারে একখানা হাত উঠে এলো লাবণ্যর ঘাড়ের কাছে। ঘামে তার গ্রীবা সিক্ত এবং শীতল। লাবণ্য চমকে উঠলো, তারপর আস্তে আস্তে হাত তুলে শিবুর হাতখানা অতি ধীরে সরিয়ে দিল। পুরুষ জানিয়ে দেয়, এই হাতখানা কাঁধে তুলে দেবার তাৎপর্য কি; নারীও জন্ম থেকে জানে ওই হাতখানার ভাষা! অন্ধকারে আড়ষ্ট হয়ে লাবণ্য নিঃশব্দে ছবি দেখতে লাগলো।

সেদিন ওই পর্যন্ত। কিন্তু সিনেমা ভাঙার পর বাইরে আসতেই দুইজন বন্ধুর সঙ্গে শিবুর দেখা। তাদের সঙ্গে একটি মেয়ে। ওদের দেখে শিবুর চেহারা গেল বদলে। অত্যন্ত উৎসাহে সে লাবণ্যর সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিল। লাবণ্য যেন বাঁচলো এবার।

সবাই গেল নিউ মার্কেটে। সকলের পকেটেই তাড়া তাড়া নোট। পছন্দসই সামগ্রী জড়ো হোলো অজস্র। ওদের সকলেই টাকার মানুষ, টাকা খরচ করতে ওরা জানে। তিনটি ছেলে, আর দুটি মেয়ে তাদের সঙ্গে। অতঃপর ঘণ্টা তিনেক ধরে তাদের সঙ্গে নিয়ে শিবু কলকাতার পথে পথে টাকা ছড়িয়ে বেড়াতে লাগলো।

ফিরবার পথে আবার সেই মোটরে দুজন নিঃসঙ্গ। কলকাতার পথে তখন আলোক-নিয়ন্ত্রণ-বিধি বলবৎ রয়েছে। এক অন্ধকার থেকে অন্য অন্ধকারে তাদের মোটর চলেছে। লাবণ্য বসে রয়েছে চুপ করে শিবুর পাশে। শিবু সহজ, তার মনে প্রণয়ের ধোঁয়া নেই, রস-কল্পনার প্রলাপ নেই। ছোট লাহিড়ীর এই মেয়েটার স্বাস্থ্যটা সে চায়—এই নধর হৃষ্ট-পুষ্ট স্বাস্থ্যটা। লাবণ্য সহজ নয়, তার গ্রীবায় শিবুর সেই হাতের স্পর্শ এখনও ফোস্কার মতো জ্বালা করছে। ওই হাতখানার বক্তব্য কিছু সে বুঝেছে, কিছু বোঝেনি। যে-অংশটা বুঝতে পারেনি, সেইটির জন্য সে উৎসুক। এক সময়ে সে ডাকলো, শিবুদা?

লাবণ্যর অহঙ্কার অনেকটা কমে এসেছে; তার আভিজাত্যবোধের উগ্রতা—তাও কোমল হয়ে এসেছে। এটা শিবুর কাছে নতুন নয়, সে এসব জানে—এমনিই হয়। মেয়েদের প্রাথমিক উগ্র অহঙ্কার আর রুদ্ধ প্রতিরোধ এক সময় কমে আসে,—তাদেরকে আত্মসমর্পণ করার সময় দিতে হয়। লাবণ্য ন'শো টাকার নেকলেস গ্রহণ করেনি, এর পর নয় টাকার সেফ্‌টিপিন পেলে আহ্লাদে আটখানা হবে। এটা শিবুর ব্যক্তিগত নারীদর্শন, এখানে সে ভুল করে না। সে স্পষ্ট কণ্ঠে উত্তর দিল, কেন, কি বলছ?

লাবণ্য বললে, না, কিছু না—বাড়ী আর কতদূরে?

এই যে—বলে শিবু ক্যাঁচ করে মোটরের গতি কমিয়ে তার বাড়ীর ফটকের মধ্যে গাড়ী ঢুকিয়ে এক জায়গায় দাঁড় করালো।

দুজনে নামলো, তারপর শিবু ইচ্ছা-পূর্বক লাবণ্যর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে জড়িয়ে ভিতরে চললো।

রাত এগারোটা বেজে গেছে। লাবণ্য ভুলে গিয়েছিল পল্লীজননীর উদ্বেগের চেহারাটা। সহসা অন্ধকার বারান্দাপথের একপ্রান্ত থেকে খুড়িমা বলে উঠলেন, এ কি, শিবু, লাবণ্য—এর মানে?

চকিতে দুজনের হাত ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। লাবণ্য নতমুখে বললে, ফিরতে একটু দেরী হোলো, মা।

হুঁ—খুড়িমা বললেন, শিবু, এই কি তোমার মতলব ছিল?

শিবু স্পষ্ট উত্তর দিল, কেন, খুড়িমা?

কেন? খুড়িমা তীব্র রুক্ষ কণ্ঠে বললেন, তোমার ভয়-ডর নেই, আমার মেয়ের গায়ে তুমি হাত দাও?

কোনো দোষ করিনি, খুড়িমা!

খুড়িমা রাগে ও উত্তেজনায় কাঁপছিলেন। চেঁচিয়ে বললেন, তোমাকে বিশ্বাস করে তোমার বাড়ীতে এসেছিলুম,—মান খোয়াতে আসিনি! খবরদার শিবু,—আমি সাবধান করে দিচ্ছি,—খবরদার—কাল আমরা চলে যাবো তোমার বাড়ী থেকে, কিন্তু যাবার আগে তুমি আমাদের ত্রিসীমায় আসবে না—

লাবণ্য ঘরে গিয়ে ঢুকে ঠক-ঠক করে কাঁপছিল, এবার তার মা দ্রুতপদে ভিতরে এলেন।

শিবু দাঁড়িয়েছিল অন্ধকারে হাসিমুখে। কোনো চাঞ্চল্য তার মুখে-চোখে ছিল না। সে কেবল ভাবতে লাগলো, খুড়িমার অসন্তোষের গভীরতা কতখানি এবং কতগুলি টাকা খরচ করলে সেই অসন্তোষটুকুর ওপর প্রলেপ দেওয়া যায়। এটা তার একটুখানি সাধারণ অভিজ্ঞতা মাত্র, তার কৌশল-বুদ্ধির সামান্য ত্রুটি—আর কিছু নয়। এটাকে অর্থব্যয়ে অতিক্রম করা দরকার, কেননা লাবণ্যর সঙ্গে তার বোঝাপড়া এখনও শেষ হয়নি।

সে রাত্রে শিবুর একটুও ঘুমের ব্যাঘাত হোলো না।

*   *   *   *   *

পরদিন খুড়িমা চলে যাবেন বটে, কিন্তু দেশে রওনা হবার খরচপত্র ছিলনা। সারাদিন তিনি শিবুর অনুগ্রহের জন্য অপেক্ষা করে রইলেন, তারপর সন্ধ্যার দিকে বলুকে বাইরের দিকে খবর আনতে পাঠালেন। বলু ফিরে এসে সংবাদ দিল, শিবুদা এইমাত্র ফিরেছে, কিন্তু তার মোটর-দুর্ঘটনা হয়েছে, আপিস-বাড়ীর ঘরে তিনি শুয়ে রয়েছেন।

বাঙালী মাতৃহৃদয় একটুখানি কেঁপে উঠলো। তিনি ভাবলেন, তবে কি তাঁর অভিশাপ লাগলো শিবুর? অনুশোচনায় খুড়িমার গলার আওয়াজ প্রসন্ন হয়ে এলো। বললেন, ওমা, জলজ্যান্ত ছেলে,—খুব লাগেনি ত?

বলু বললে, সেখানে অনেক লোক ঘিরে রয়েছে।

লাবণ্য উৎকণ্ঠিত হয়ে এক সময় বললে, বলু, তুই মার কাছে থাক, আমি স্নান করে আসি।—এই বলে সে বেরিয়ে গেল।

ঝি দাঁড়িয়ে থাকে বাথরুমের কাছে ফরমাস খাটার জন্য। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঝি বললে, দিদিমণি, বাবু আপনাকে একবার ডেকে পাঠালেন। দু'মিনিটের জন্যে।

লাবণ্যর সর্বশরীর রোমাঞ্চ হয়ে উঠলো। সেও এদিক-ওদিক লক্ষ্য করে বললে, চলো।

শিবুর ঘরে যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা লাবণ্যকে আসতে দেখে বেরিয়ে চলে গেল। লাবণ্য এসে ঢুকলো শিবুর ঘরে। বিছানায় শুয়ে শিবু হাসিমুখে চুপি চুপি বললে, আমার কিছু হয়নি লাবণ্য, শুধু খুড়িমাকে যেতে দেবো না!

লাবণ্য স্তম্ভিত হয়ে বললে, কেন শিবুদা!

শুধু তোমার জন্যে। বসো এইখানে।

লাবণ্য বললে, কিন্তু মাকে লুকিয়ে আমি এসেছি।

শিবু বললে, তা আমি জানি,—লুকিয়ে তোমাকে আসতেই হবে। সবাই লুকিয়েই আসে।

লাবণ্য তার পাশে বসলো মোহাবিষ্টের মতো। শিবু হাত বাড়িয়ে লাবণ্যের একখানা হাত টেনে নিয়ে বললে, তুমিও যেতে চাও?

লাবণ্য বললে, হ্যাঁ, মা গেলে আমাকেও যেতে হবে। ওকি, হাত ছাড়ো, কেউ এসে পড়বে।

শিবু বললে, কেউ আসবে না তুমি এখানে থাকতে।

লাবণ্য বললে, আমি যে স্নানের নাম করে এসেছি।

শিবু বললে, খুড়িমাকে আমি জানিয়ে দেবো, আমি শয্যাগত। তুমিও চেষ্টা করো আর কয়েকদিন থাকতে—কেমন?

লাবণ্য বললে, আমাদের বেঁধে রাখতে চাও কেন তুমি?

শিবু হাসিমুখে তাকালো লাবণ্যর দিকে। বললে, বরফটা এখনও সম্পূর্ণ গলেনি, তাই জন্যে। তোমার যাবার সময় এখনও হয়নি, লাবণ্য।

লাবণ্য চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ালো। শিবু শেষবারের মতো তার হাতখানা টেনে একটু চাপ দিল। পরমুহূর্তে হাতখানা ছাড়িয়ে লাবণ্য ঘর থেকে বেরিয়ে হন হন করে চলে গেল।

দিন দুই কেটে গেল। খুড়িমা এখনও শিবুর মুখ দর্শন করেননি। কিন্তু তাঁর কানে উঠলো, শিবু খুব অসুস্থ, শয্যাগত—তার বুকে আঘাত লেগেছে, হৃদস্পন্দনের গণ্ডগোল ঘটছে। ডাক্তার আনাগোনা করে।

দিনচারেক পরে খুড়িমা শিবুর ঘরে এসে ডাকলেন, শিবু?

শিবু চোখ মেলে তাকালো, তার চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন। বললে, আমার যাই হোক খুড়িমা—কিন্তু তোমাদের মানসম্ভ্রম, তোমাদের ইজ্জত,—আমার এই বাড়িখানার চেয়ে অনেক উঁচু। আর লাবণ্য! লাবণ্য যে বংশের মেয়ে, আমি তার পায়ের তলায় থাকারও যোগ্য নয়। লাবণ্য কোন অন্যায় করে নি, করতে পারে না, খুড়িমা। আমি তোমার ভাতে মানুষ, তোমার পায়ের ধুলো—কিন্তু লাবণ্য যেন তোমার চোখে ছোট না হয়।

খুড়িমা বললেন, তুই কেমন আছিস বাবা?

বুকে ভারি ব্যথা, ডাক্তার ভয় পাচ্ছিলেন—তবে—

খুড়িমার মনের মেঘ অনেকটা কেটে গেছে। কাটবে, একথা শিবু জানতো। তিনি এক সময় প্রসন্ন মনে বিদায় নিলেন। তার পিছনদিকে তাকিয়ে শিবু বক্র তীক্ষ্ণ হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে এবার পাশ ফিরে শুলো।

আরও দুচার দিন পরে বলু সেদিন মায়ের কাছে এসে একরাশি টাকা নামিয়ে দিল। খুড়িমা বললেন, কিসের টাকা রে?


আর এক অন্ধকারে তাদের মোটর চলেছে

বলু বললে, বাঃ আমি যে আজ মাইনে পেলুম?

মাইনে! এত টাকা? এত টাকা মাইনে পেলি তুই?

খুড়িমা অভিভূত আবিষ্ট হয়ে রইলেন। সেদিন সামান্য কয়টা টাকার জন্য তিনি এ বাড়ী থেকে চলে যেতে পারেননি, কিন্তু আজ বলুর উপার্জন হাতে নিয়ে তাঁকে ভাবতে হোলো, দেশে ফিরে গেলে এ টাকা তাঁর বন্ধ হবে। সেখানে তিনি আত্মসম্মান, আভিজাত্য-বোধ এবং নিজের গর্ব নিয়ে অবশ্যই থাকতে পারবেন,—কিন্তু উপবাস করে থাকতে হবে। সেখানে কাপড় নেই, নুন নেই, চাল নেই, ওষুধ নেই,—পল্লীজীবনটা এখন কেবল একটা বিরাট শূন্য! সেটা অন্ধকার পল্লীগ্রাম, সেখানকার যুদ্ধ ইউরোপ ও এশিয়ার যুদ্ধের চেয়ে অনেক বড়, অনেক বিরাট,—কারণ সেটা দৈনন্দিন অস্তিত্বরক্ষার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম। তার আদি অন্ত নেই।

এমন সময় একজন চাকর এসে শিবুর হাতের লেখা দু-লাইন চিঠি দিয়ে গেল। শিবু লিখেছে, বলু আমার ছোটভাইয়ের মতন, কিন্তু তার জন্য আমি গর্ববোধ করছি। আমি জানি সে বুদ্ধিমান, সে উন্নতি করবে। আপনি কি যাবার দিন স্থির করেছেন, খুড়িমা? কিছুতেই কি আর থাকা সম্ভব নয়?

খুড়িমা স্তব্ধ হয়ে ব'সে ভাবতে লাগলেন, কোনো জবাব দিলেন না।

লাবণ্য ডাকলো, মা?

মা বললেন, কেন?

লাবণ্য বললে, দেশে যাওয়া মানে ত' সেই না খেয়ে মরা!

ছোট-লাহিড়ীর স্ত্রীর আভিজাত্য বোধ ফণা উঁচিয়ে উঠলো। বললেন, তুই কি এখানে থেকে মানসম্ভ্রম সব খোয়াতে চাস? ধর্ম নেই, ইজ্জৎ নেই? বংশের নাম নেই?

লাবণ্য শান্তভাবে বললে, সেখানে গিয়ে না খেয়ে মরলে মান বাঁচবে তোমার? একখানা ছেঁড়া কাপড়ও যদি না পাও, ধর্ম বাঁচবে? ভিক্ষেও যদি না জোটে, বংশের নাম রাখতে পারবে?

খুড়িমা লাবণ্যর দিকে একবার তাকালেন। লাবণ্যর পরণে একখানা ক্রেপ-বেনারসী শাড়ী, গায়ে ব্রোকেডের ব্লাউস, পায়ে রেশমী চটি, দুই কানে পোকরাজের দুল দুলছে; কিন্তু যাবার সময় শিবুর দেওয়া এ সমস্ত আভরণ আর পরিচ্ছদ ছেড়ে রেখে যেতে হবে। তিনি বললেন, তুই কি বলতে চাস, লাবণ্য?

লাবণ্য মায়ের দিকে তাকালো। মায়ের পরণে গরদের থান, আর গরদের জামা। মা ব'সে রয়েছেন একটি কুশনে, মাথার উপরে ঘুরছে ইলেকট্রিক পাখা। এক মাসে মায়ের স্বাস্থ্য ফিরে গেছে। লাবণ্য পলকের জন্য



সবাই লুকিয়েই আসে

আত্মসম্বরণ ক'রে বললে, ধরো যদি আমি কলকাতায় কোনো একটা কাজ পাই,—তবে ভাই-বোনে চালাতে পারবো না?

মা বললেন, লাহিড়ী বংশের মেয়ে চাকরি ক'রে পেট চালাবে?

পেটের দায়ে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে চাকরি করা ভালো। ভিক্ষের চেয়ে ভালো, চুরির চেয়ে ভালো।

তুই কি এই বাড়ীতে থাকার কথা বলছিস?

না, আমরা ঘর ভাড়া করবো। নিজের মান নিজে রাখতে জানলে খোয়া যায় না, মা!

মা বললেন, কিন্তু দেশে সব প'ড়ে থাকবে?

কী আছে সেখানে? লাবণ্য বললে, ভাঙা দুটো বাক্স, মাটির হাঁড়ি কলসী, ছেঁড়া কাপড় এক আধখানা, ময়লা দুর্গন্ধ বিছানা। আর বাড়ী? দুখানা খড়ের চালা,—বৃষ্টি নামলে সমস্ত রাত দাঁড়িয়ে ভিজতে হয়! বাড়ীর দিকে তাকালে চোরেরাও মুখ বেঁকিয়ে চ'লে যায়।

শিবু সেরে উঠলো, কেননা ঠিক সময় তাকে সেরে উঠতেই হবে। আর শুয়ে থাকলে তা'র চলবে না। সে মোটর নিয়ে বেরিয়ে গেল, তা'র অনেক কাজ। সন্ধ্যার দিকে ফিরে সে গিয়ে খুড়িমার কাছে দাঁড়ালো। বললে, লাবণ্যর জন্যে একটা কাজ সন্ধান করেছি, খুড়িমা—

খুড়িমা প্রশ্ন করলেন, সেটা কি তোমার আপিসেই?

না, সেটা সরকারী কাজ। তবে আমাকে সুপারিশ ক'রে দিতে হবে। কাল সকালে লাবণ্য সাহেবের সঙ্গে দেখা করবে।

কিন্তু লাবণ্য ইংরেজি জানে না!

শিবু বললে, যেটুকু জানে তাতেই চলবে, আমি ব'লে দেবো।

খুড়িমা বললেন, অত বড় মেয়ে রোজ যাবে চাকরি করতে! সেখানকার সাহেবরা কেমন লোক, শিবু?

শিবু হাসিমুখে বললে, অন্তত আমার চেয়ে ভালো, খুড়িমা।

যদি লাবণ্যর চাকরি হয়, তবে আমরা গিয়ে অন্য জায়গায় থাকবো, এ তোমাকে জানিয়ে রাখলাম, শিবু।

শিবু জানিয়ে দিল, আপনি যা স্থির করবেন, তাই হবে খুড়িমা।

খুড়িমা স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন। শিবু আস্তে আস্তে চ'লে গেল।

পরদিন শিবুর মোটরেই লাবণ্য বেরিয়ে পড়লো। কী একটা ক্রুর উল্লাস শিবুর মুখে চোখে। লাবণ্যর সেই আত্মাভিমান আর আভিজাত্য বোধ কোথায় গেল? শিবুকে সে আর আঘাত করতে চায় না, শিবুর শিক্ষা-হীনতা নিয়ে কঠোর বিদ্রূপ করে না। টাকার কাছে সে আত্মসমর্পণ করেছে, মিলিটারী কণ্ট্রাক্টরের কাছে সে নারীর আত্মমর্যাদাকে আনত করেছে। শিবুর কী উল্লাস! ছোট-লাহিড়ীর ভাত খেয়ে সে মানুষ,—কী জঘন্য সেই আত্মগ্লানি! যারা তাকে হীন অবজ্ঞাত মনে করতো, তাদের কাছে আত্মপ্রতিষ্ঠা করায় কী আনন্দ! অনুগ্রহ প্রকাশ করায় কী গৌরব! দান গ্রহণ করানোয় কী নিবিড় পরিতৃপ্তি!

গাড়ী চলছে। লাবণ্য বললে, কোথায় তোমার সাহেবের আপিস?

শিবু হেসে বললে, আমাকে তুমি এখনও বিশ্বাস করো লাবণ্য?

লাবণ্য তা'র দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললে, মানে?

শিবু বললে, লোকে চাকরি করে কেন, বলতে পারো?

লাবণ্য বললে, টাকার জন্যে!

কিন্তু টাকার অভাব যদি তোমার না হয়?

তুমি দান করবে?

দান না ক'রে যদি তোমার দাবী মেটাই?

লাবণ্য প্রশ্ন করলো, তোমার কাছে কিসের দাবী আমার?

শিবু বললে, কোন্ দাবীতে তুমি পাঁচশো টাকার দুল্ পরেছ কানে, আড়াইশো টাকার জামা কাপড় পরেছ?

লাবণ্য বললে, তুমি দিয়েছ তাই—

আমি দিইনি, তুমি পেয়েছ। পাবার অধিকার আছে তোমার, এখনও অনেক পাবে। আমার বাড়ীখানার দাম দেড় লক্ষ টাকা, আমার ব্যাঙ্কে আছে বারো লক্ষ, আমার কারবার চলছে দশ লক্ষ টাকার। শিবু একে একে সব ব'লে ফেললো।।

অধীর উত্তেজনায় লাবণ্য কাঁপছে। শিবু যেন চারিদিক থেকে সহস্র বাহু দিয়ে তাকে নিপীড়িত ক'রে বাঁধতে চাইছে। সে যেন ছুটে পালাতে না পারে, যেন আর্তনাদ না করে। লাবণ্যর গলা শুকিয়ে উঠলো। বললে, তুমি আমাকে এত দিতে চাও কেন?

শিবু হঠাৎ হা-হা-হা ক'রে হেসে উঠলো। লাবণ্য কেঁপে উঠলো।

গাড়ীখানা এসে ঢুকলো এক বাগান বাড়ীতে। তখন মধ্যাহ্নকাল।

শিবু বললে, ভয় পেয়ো না, এ বাগানটা সেদিন আমি কিনেছি সত্তর হাজার টাকায়।

লাবণ্য বললে, কে আছে এখানে?

কেউ নেই। কেবল মালী থাকে ওই আমতলার ওদিকের ঘরে।

আমাকে এখানে আনলে কেন?

শিবু বললে, ওপরতলাটা কেমন সাজিয়েছি তোমায় দেখাবো। নেমে এসো।

দুজনে নেমে বাগান পেরিয়ে দোতলায় উঠে গেল। অদূরে নিম-গাছের ডগায় একটা ডাহুক তখন উচ্চ দীর্ঘকণ্ঠে যেন প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

প্রচুর অর্থব্যয়ের চিহ্ন চারিদিকে থরে থরে সাজানো। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় দেখা গেল, দুই পাশে অসংখ্য মূল্যবান ছবি। বিশ্বামিত্র ও উর্বশী, অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার অরণ্য প্রণয়, শ্রীকৃষ্ণ ও গোপিনী দল,—ইত্যাদি। দোতলার প্রকাণ্ড হলে ইতালীর চিত্রাবলী, এডমণ্ড ডুলাকের নামজাদা ছবি-গুলো, রাণী ইউজিনির সভাচিত্র, ক্লোরেন্সের

মেয়েরা, মধ্যযুগের নাইট এরাণ্ট, দান্তে ও বিয়াত্রিচে! বিভিন্ন প্রকার রোমাঞ্চকর ছবি ঝুলিয়ে যেন সমস্ত দোতলাটায় নরনারীর প্রাণের একটি বিশেষ বক্তব্যকে প্রকাশ করা হচ্ছে।

লাবণ্য আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। শিবু বললে, কেমন লাগছে?

লাবণ্য ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

সন্ধ্যার সময় দুজনে গাড়ী নিয়ে ফিরে এলো। লাবণ্য অজস্র কথা বলতে বলতে এসেছে সমস্ত পথটায়—অধ্যবসায়ে আর উৎসাহে। ওর মধ্যেই শিবুকে সে উপদেশ দিয়েছে কত রকমের। শিবু যেন অত পরিশ্রম না করে, শিবুর স্বাস্থ্য যেন ভালো থাকে। শিবুর পাশে ব'সে লাবণ্য কত প্রলাপোক্তি করলো, কতবার তা'র পিঠে আর ঘাড়ের কাছে লাবণ্য নিজের হাতখানা রাখলো। শিবু মনে মনে হেসেছে। ছোট-লাহিড়ীর সেই আত্মগর্বী মেয়েটা অনেক নীচে এবার নেমে এসে তা'র পা দুখানা যেন লেহন করছে। শিবুর আর কোনো বক্তব্য নেই।

এবার সাবধানে অনেকখানি দূরত্ব মাঝখানে রেখে শিবু আর লাবণ্য ছোট-লাহিড়ীর আভিজাত্যাভিমানী পরিবারের কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে, খুড়িমা, লাবণ্যর এ চাকরিটা হোলো না।

খুড়িমা বললেন, হোলো না?

না, চাকরি পাওয়া লাবণ্যর পক্ষে সম্ভব নয়!

তা'র গলার আওয়াজ শুনে লাবণ্য একটু চমকে' ফিরে তাকালো। শিবু বললে, আমি ভেবে ঠিক করেছি, আসছে কাল আপনাদের দেশেই ফিরে যেতে হবে; এদিকের ব্যবস্থা আমি সব ক'রে দেবো।

খুড়িমা বললেন, তুমি বলছ তোমার এ-বাড়ীতে আমাদের আর থাকা চলবে না?

লাবণ্য সহসা অধীর উত্তেজনায় কাঁপছে। কটাক্ষে তা'র দিকে একবার তাকিয়ে শিবু বললে, আপনি থাকবেন এ আমার সৌভাগ্য, কিন্তু শুনতে পাচ্ছি আপনাদের থাকা নিয়ে নানা কথা উঠেছে।

লাবণ্য আর্তনাদ ক'রে উঠলো, তোমার একথার মানে কি, শিবুদা?

শিবু শান্তকণ্ঠে বললে, বলুও আমার এখানে সুবিধে করতে পাচ্ছে না,—ছেলেমানুষ ত বটে! ও আর কতটুকু কাজ জানে!

খুড়িমা বললেন, সে ত' বটেই। তা হ'লে আমাদের যাওয়াই স্থির হোলো?

শিবু হাসিমুখে বললে, আপনিও যাবো যাবো করছিলেন ক'দিন,—সেই ভালো। তা ছাড়া দেশের বাড়ী খালি প'ড়ে রয়েছে,—আপনার শ্বশুরের ভিটেয় সন্ধ্যের আলো জ্বলবে না, সেটাও আপনার পক্ষে দুঃখের কথা খুড়িমা।

লাবণ্য দুই চোখে আগুন ঠিকরিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, থাক, অনেক হয়েছে। চোরের মুখে ধর্মের কাহিনী শুনতে চাইনে। তুমি মিথ্যেবাদী, জোচ্চোর, প্রতারক! কিন্তু একথাও তোমাকে ব'লে রাখি, কলকাতাটা তোমার একার নয়।

খুড়িমা বললেন, চেঁচাস কেন লাবণ্য? যা বলে শোননা মন দিয়ে?

না, না—তুমি জানো না, মা—একটা অতি সাংঘাতিক বিষক্রিয়ায় লাবণ্যর সর্বাঙ্গটা যেন মুচড়ে দুমড়ে উঠছিল!

শিবু অচঞ্চল কণ্ঠে বললে, তা ছাড়া আর একটা কথা। আপনি অত বড় মেয়ে নিয়ে কলকাতার অজানা কোন্ গলিঘুঁজিতে থাকবেন, সেটা ভালো দেখা যাবে না!

তুমি ঠিক বলেছ, শিবু। আমার দেশে ফিরে যাওয়াই উচিত।

জড়িত অস্পষ্ট স্বরে ও-পাশ থেকে লাবণ্য বললে, বিশ্বাসঘাতক!

খুড়িমা এবার রাগ ক'রে বললেন, লাবণ্য, ছেলেটাকে কেন তুই মিছেমিছি গাল দিস্?

মিছেমিছি? তুমি ঠিক জানো? বেই-মানকে তুমি বিশ্বাস করো, মা?

শিবু হেসে বললে, মেয়ের চেহারা দেখছেন, খুড়িমা? ওর দোষ নেই। এ যুগের হাওয়া, কলকাতার জল! যাক্‌গে, আমি আপনাদের যাবার খরচ একশো টাকা দেবো। আর যদি অনুমতি করেন তবে একটি অনুরোধ—

খুড়িমা বললেন, কি শিবু?

শিবু বললে, লাবণ্যর বিয়ের খরচ স্বরূপ আমি আপনার পায়ের কাছে হাজার পাঁচেক টাকা প্রণামী দিতে চাই!

কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে খুড়িমা বললেন, তুমি যথেষ্টই দিলে বাবা, আর কিছু চাইবার রাখলে না।

এমন সময় একজন চাকর এসে জানালো, আপনাকে ফোনে ডাকছে! শিবু মুখ ফিরিয়ে বললে, কে ডাকছে? কোত্থেকে? চাকরটা বললে, নীলিমা রায়—বালীগঞ্জ থেকে—

শিবু বললে, তবে ওই কথাই রইলো, খুড়িমা। কাল আপনাদের এখান থেকে যাওয়া, বেলা দুটোর গাড়ী। সকালেই আমি সব টাকা পাঠিয়ে দেবো। তারপর আমাকে যেতে হবে একবার কলকাতার বাইরে।

খুড়িমার পায়ের ধুলো নিয়ে আর কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না ক'রে শিবু চ'লে গেল। ওপাশে তখন লাবণ্য পাথরের মতো ব'সে আত্মগ্লানিতে, অনুশোচনায়, ক্রোধান্ধতায় যেন একটা আদি অন্তহীন নরককুণ্ডের মধ্যে প'ড়ে অন্ধের মতো আঁকুপাঁকু করছে!



নিখিল-ভারত রবীন্দ্র-স্মৃতি-সমিতি

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের পর চারি বৎসরেরও অধিক কাল অতিবাহিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যেই একথা আমরা নিবিড় করিয়া উপলব্ধি করিয়াছি যে, এই সময়ের ব্যবধান সেই কবিপ্রতিভার প্রেরণা ও জাতির হৃদয়ের মধ্যে তিলমাত্র বিচ্ছেদ রচনা করিতে পারে নাই। কালের যাত্রায় প্রত্যেক দুঃখ পরীক্ষা সংকট ও সফলতার মধ্যে আমরা সেই লোকোত্তর কবিসত্তার সান্নিধ্য অনুভব করিয়া চলিয়াছি।

তিনি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির সকল ঐতিহ্যের আধারস্বরূপ ছিলেন। আমাদের জাতীয় চেতনা তাঁহারই মধ্যে পূর্ণতম প্রকাশলাভ করিয়াছে। সেই ঐতিহ্য ধারণ বহন ও রক্ষা করিবার দায়িত্ব আমাদের। কবির জীবিতকালে তাঁহার সাধনার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ লাভ করিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। তাঁহার মধ্যে সাধকোচিত ধ্যানী মন, মহাকবিসুলভ ভাব ও কল্পনা এবং কর্মযোগীর সেবা ও নিষ্ঠার এক অপূর্ব সমন্বয় আমরা দেখিয়াছিলাম। কাব্য সংগীত চারুকলা শিক্ষা ও লোকসেবা, জাতীয় সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের জন্য সর্বক্ষেত্রে তিনি তাঁহার শ্রম শক্তি ও প্রতিভাকে উৎসর্গ করিয়া নব নব সম্পদে ভরিয়া দিয়াছেন। দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের নিপীড়িত জীবনকে সকল বন্ধন ও গ্লানি হইতে উদ্ধার করিবার স্বপ্ন তিনি দেখিতেন। তাঁহার কাছে আমরা কতভাবে ঋণী সেকথা যেন কদাপি বিস্মৃত না হই।

রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে যে অমূল্য সম্পদের উত্তরাধিকার আমরা লাভ করিয়াছি, তাহারই কৃতজ্ঞতার স্মারক ব্রতটুকু পালন করার জন্যই আমরা দেশবাসীকে একটি পুণ্য আয়োজনে আহ্বান করিতেছি। এই উদ্দেশ্যকে সফল করিবার জন্য 'নিখিল-ভারত রবীন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা সমিতি' দেশবাসীর নিকট আবেদন জানাইয়া অর্থ-সংগ্রহ করিতে তৎপর হইয়াছেন।

উক্ত সমিতি এক কোটি টাকা সংগ্রহ করিয়া কবির স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থায় জন্য ব্যয় করিবেনঃ

(১) বিশ্বভারতীর আর্থিক সংগতি পুষ্ট করিতে হইবে।

যে বিশ্ব-সংস্কৃতির আদর্শ কবির ধ্যানস্বরূপ ছিল, বিশ্বভারতী তাহারই প্রতীক। বিশ্বভারতীকে অর্থাভাব হইতে মুক্ত করিয়া বিশ্বভারতীর সাধনাকে নিম্নোক্ত কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রসারিত করিতে পারিলে আমরা কবির আরব্ধ ব্রতকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতে পারিব বলিয়া মনে করি। (ক) পল্লী-উন্নয়ন ও পুনর্গঠন, (খ) নারীশিক্ষা ও শিশুশিক্ষার বিস্তার, (গ) কারুশিল্প এবং কৃষি সম্বন্ধে গবেষণামূলক কার্য।

(২) জোড়াসাঁকোতে অবস্থিত কবির জন্ম-মৃত্যুর স্থান এবং পৈতৃক বাসভবনকে একটি সংস্কৃতি অনুশীলনের কেন্দ্ররূপে পরিণত করিতে হইবে।

বাংলা তথা ভারতের নূতন সাংস্কৃতিক জাগরণের তিন পুরুষব্যাপী সাধনার ইতিহাস জোড়াসাঁকো ভবন ও ঠাকুর পরিবারের জীবনে গ্রথিত রহিয়াছে। এই ভবনগুলিকে জাতীয় স্মৃতিসম্পদরূপে পরিণত ও রক্ষা করিবার জন্য উক্ত স্থানে নিম্নলিখিত কয়েকটি সাংস্কৃতিক পরিষদ স্থাপিত করিতে হইবেঃ (ক) জাতীয় প্রত্নশালা, (খ) জাতীয় চিত্রশালা, (গ) জাতীয় নাট্যশালা, (ঘ) জাতীয় সংগঠন ও উন্নয়নের পরিকল্পনার জন্য বিবিধ বিষয়ক একটি গবেষণাগার, (ঙ) আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি ও সৌহার্দ্যের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত একটি বিশ্বভারতী সভাভবন ও জনসেবা প্রতিষ্ঠান।

(৩) যেকোন ভারতীয় ভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা অথবা মৌলিক গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট সময়ান্তরে পুরস্কার দিবার যথাযোগ্য ব্যবস্থা।

আমরা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি, জাতির শ্রেষ্ঠ কবির ভাবসম্পদ ও সাধনার ঐতিহ্যে গৌরবান্বিত তাঁহারই দেশবাসী এই স্মৃতিরক্ষার আয়োজনে মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করিবেন।

তেজবাহাদুর সপ্রু,
সভাপতি।

সুরেশচন্দ্র মজুমদার,
সাধারণ সম্পাদক।

রবীন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা ভাণ্ডারের জন্য সকল সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণীয়ঃ সম্পাদক, নিখিল-ভারত রবীন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা সমিতি, ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা। অথবা, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

শিক্ষা সংস্কারের গোড়ার কথা

যুদ্ধ তো শেষ হইল। আশা করি এইবার শিক্ষা সংস্কারের যে প্রস্তাবের কথা আমরা কিছুদিন ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছি তাহা কার্যে পরিণত করা হইবে। অর্থের অভাবের অজুহাতে এদেশে অনেক সংস্কার প্রস্তাবই ইতিপূর্বে বাতিল হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভরসা না হইবারই কথা। তবে শোনা যাইতেছে এবার নাকি অর্থের অভাব হইবে না, কারণ, যুদ্ধের কল্যাণে আমরা নাকি অধমর্ণ হইতে একেবারে উত্তমর্ণ জাতিতে পরিণত হইয়াছি।

এবারকার শিক্ষা সংস্কারের পরিকল্পনার একটু বিশেষত্ব আছে। প্রথমত এরূপ সর্বাঙ্গীন পরিকল্পনা ইতিপূর্বে আমরা পাই নাই। ইহাতেই প্রথম জাতির সকল স্তরের লোকের উপযোগী সকল প্রকারের শিক্ষার আয়োজন করিবার কথা বলা হইয়াছে। নূতন ও সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থায় একদিকে যেমন শিশুদের নার্শারি বিদ্যালয়ের আয়োজন থাকিবে, অন্যদিকে তেমনই তাহাতে বয়স্ক যে জনসাধারণ ইতিপূর্বে শিক্ষার সুযোগ পায় নাই তাহাদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। তাহাতে নূতন ধরণের মাধ্যমিক শিক্ষার আয়োজন থাকিবে, নানা রকমের যন্ত্র ও বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে, যাহাতে ছাত্রছাত্রীদের যাহার যেরূপ শিক্ষার দরকার সে সেরূপ শিক্ষা হইতে বঞ্চিত না হয়। তাহা ছাড়া এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য, অবসর-বিনোদন, শিক্ষান্তে বৃত্তি নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারেও দৃষ্টি দেওয়া হইবে। এই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিকেও বাদ দেওয়া হইবে না। সেগুলিরও সংস্কার করা হইবে। এক কথায় একটা সভ্য দেশে যেরকম শিক্ষা ব্যবস্থা থাকে ও থাকা উচিত আমাদের দেশেও সেইরকম একটা শিক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হইবে। ইহাই সার্জেণ্ট পরিকল্পনা নামে পরিচিত শিক্ষা পরিকল্পনার মোটামুটি কথা।

বস্তুত এতদিন ধরিয়া আমাদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে তাহাকে 'ব্যবস্থা' না বলিয়া 'অব্যবস্থা' বলাই সঙ্গত। কারণ অব্যবস্থাই তাহার প্রধান লক্ষণ। এই এক দেশে শিক্ষার সৌধ ভিত্তি হইতে না গড়িয়া গড়া হইয়াছিল মাঝখান হইতে। একথা এত সুপরিচিত এবং আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি এত সর্বজন-বিদিত যে, এসম্বন্ধে আর বিস্তারিত আলোচনার দরকার হয় না। বোধ হয় এইজন্যই বর্তমান পরিকল্পনার রচয়িতারা বলিয়াছেন ইহার বেশীর ভাগই বাতিল করিয়া দিতে হইবে এবং আবার গোড়া হইতে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। অর্থাৎ বহু বৎসর ধরিয়া বহুকোটি টাকা ব্যয় করিয়া আমরা যে শিক্ষাসৌধ গড়িয়া তুলিয়াছি তাহা একেবারেই বৃথা হইয়াছে, তাহাকে আগাগোড়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে; পুরাতনের আবর্জনার স্তূপ না সরাইয়া নূতনভাবে গড়া চলিবে না। এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, যাঁহারা ইহার ভিতরটা ভালভাবে জানেন, তাঁহারা সকলেই এ কথায় সর্বান্তঃকরণে সায় দিবেন।

কিন্তু এতদিন ধরিয়া যে শিক্ষা ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে সেটা হঠাৎ হয় নাই; তাহার পিছনে একটা কারণ ছিল, কয়েকটা যুক্তি ছিল। সেই যুক্তি বা চিন্তাধারার মূলে ছিল একটি বিশেষ রকমের জীবনদর্শন। আমরা সমাজজীবন ও জাতীয় জীবনকে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিতাম। সেই ভঙ্গীই শিক্ষাদর্শনে অভিব্যক্ত হইয়া একটি বিশেষ প্রকারের শিক্ষা ব্যবস্থার আকারে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার মধ্যে আকস্মিক কিছুই ছিল না।

কথাটা খুলিয়া বলা যাক। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল ইহার একমাত্র কারণ ছিল যে, আমাদের তৎকালিক সমাজব্যবস্থা শ্রেণীবৈষম্যের ভিত্তিতে তথাকথিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। আমাদের বর্তমান সমাজদর্শনের ভিত্তি এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। সুতরাং আমাদের শিক্ষাদর্শনের ভিত্তিও মধ্যবিত্তের শিক্ষা।

একথা সত্য যে, ইদানীংকালে পৃথিবীর সকল দেশেই শিক্ষা ব্যবস্থা সুরু হয় এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কেই লইয়া। কিন্তু অন্য দেশে যেমন সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্রমবিকাশের ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি প্রশস্ততর হইয়াছে, জনসাধারণের শিক্ষার উপর ক্রমে ক্রমে বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে এবং জনশিক্ষার বিস্তৃত ভিত্তির উপরে উচ্চতর শিক্ষার সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে এদেশে তাহা হয় নাই। এদেশে জনসাধারণের শিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণ-ভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে। ইহার কারণ সুস্পষ্ট। আমাদের জীবনদর্শনে সুতরাং সমাজ ও শিক্ষা-দর্শনে জনসাধারণের স্থান নাই। অন্য দেশে যে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে আমাদের তাহা ঘটে নাই। অতএব আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় যেটুকু না হইলে নয় তাহার চেয়ে বেশী জনশিক্ষার আয়োজন নাই। এইজন্যই আজও পর্যন্ত এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করা হয় নাই এবং এই কারণেই আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যত খরচ করা হয় তাহার অনেক বেশী করা হয় অন্য স্তরের শিক্ষার জন্য, মধ্য ও উচ্চ শিক্ষার জন্য।

বিভিন্ন দেশের শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করিলে একটা ব্যাপার চোখে পড়ে। যেদেশে যে পরিমাণে শ্রেণীবৈষম্যকে দূর করার চেষ্টা হইয়াছে অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যবর্তী বিভেদ-গুলি ঘুচাইয়া সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হইয়াছে সেদেশে সেই পরিমাণে সকলপ্রকার শিক্ষার দ্বার দেশের সকলের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেখানে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জন্য একই স্তরে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব কম করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া সেখানে সামাজিক শ্রেণীর বিচারে বা অর্থের অভাবের জন্য কোন ছাত্রের কোন বিদ্যালয়ে প্রবেশ নিষেধ করা হয় না। একটা উদাহরণ দিলে বক্তব্য স্পষ্ট হইবে। সকলেই জানেন ইংলণ্ডে ধনিক শ্রেণীর সন্তানগণের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা এক নহে। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সাধারণ ঘরের ছেলে-মেয়েরা যায় সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে; সেখানে লেখাপড়া শিখিতে কোন খরচ লাগে না। কিন্তু যে পিতার অবস্থা ভাল তিনি এই প্রাথমিক শিক্ষারই জন্য ছেলেমেয়েদের পাঠান প্রেপারেটরি স্কুলে। তাঁহার ছেলে সেখান হইতে যায় পাবলিক স্কুলে এবং সেখান হইতে ইচ্ছা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই প্রেপারেটরি স্কুল বা পাবলিক স্কুলের কোনটা অবৈতনিক তো নয়ই, বরং সেখানে লেখাপড়ার খরচ অত্যন্ত বেশী। গরীবের ছেলেমেয়েকে সাধারণত প্রাথমিক বিদ্যালয়েই লেখাপড়া শেষ করিতে হয়। তবে যদি সে বিশেষ ভাগ্যবান ও প্রতিপত্তিশালী হয়, যদি সে এগার বৎসর বয়সে স্কলারশিপ পরীক্ষায় ভাল করিয়া পাশ করিতে পারে তবেই সে বোর্ড সেকেণ্ডারী স্কুলে অর্থাৎ সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থান পায়। ইংলণ্ডের শিক্ষা ব্যবস্থায় এইখানে একটা গোঁজামিল আছে। সেখানে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা আবশ্যিক (সম্প্রতি বয়সটা বাড়াইয়া ১৫ করা হইয়াছে) এগার বৎসর বয়সে সেখানে ছেলেমেয়েদের একটা পরীক্ষা করা হয় ও বাছা হয়। এই পরীক্ষার ফলে বিশেষ ভাগ্যবান মুষ্টিমেয় কতকগুলি ছেলেমেয়ে যায় সত্যিকারের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অর্থাৎ যেখানে লেখাপড়া শেষ করিয়া ছেলেমেয়েরা ইচ্ছা করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতে পারে; আর একদল যায় আর এক ধরণের বিদ্যালয়ে (সেগুলিকে এককালে সেণ্ট্রাল স্কুল বলা হইত) যেখানে খানিকটা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার সঙ্গে খানিকটা ব্যবহারিক শিক্ষা মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আর বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েই প্রাথমিক বিদ্যালয়েই থাকিয়া যায়। উচ্চ বিভাগ সেগুলি সিনিয়র স্কুল নামে পরিচিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই জন্য ছেলেমেয়েদের স্কুল পর্যন্ত বদ-লাইতে হয় না; নিম্ন বিভাগ হইতে উচ্চ বিভাগে

অধ্যাপক শ্রী অনাথ নাথ বসু



হয়, তাহা হইলে সে শিক্ষার সার্থকতা কি? যেনাস্য পিতরো যাতাঃ যেন যাতাঃ পিতামহাঃ আমাদের জীবন সেই অভ্যস্ত পথে চলিবে আর আমরা দেশে যন্ত্রশিক্ষার স্কুল খুলিব, সেখানে যন্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ শ্রমিক তৈয়ারি করিব, বিদেশী ধনিক আসিয়া এককালে যেমন সওদাগরি 'হৌস' খুলিয়াছিল এখন তাহার বদলে তাহারা কারখানা খুলিবে, আর আমাদের ছেলেমেয়েরা সেখানে যান্ত্রিকের কাজ করিবে, যদি ইহাই এই ব্যবস্থার লক্ষ্য হয়, তবে তাহাতে কি লাভ? যদি এদেশে যন্ত্রযুগ প্রবর্তন করিতে হয়, তবে আমাদের জীবন-ধারার পরিবর্তন করিতে হইবে, আমাদের জাতীয় ও রাষ্ট্রিক দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইয়া দিতে হইবে, দেশে এমন জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, যাঁহারা এই নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত। সেই জাতীয় গবর্ণমেণ্ট এই নূতন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করিবেন, তবেই শিক্ষাসংস্কার সত্য হইবে।

আমাদের ভাবী শিক্ষাব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গী এইভাবে স্থির করিয়া তাহার পর ইহার কাঠামোর দিকে নজর দিতে হইবে। এই কাঠামোটাও বিশেষ দরকারী, ইহাকে বাদ দেওয়া চলে না। বর্তমান কাঠামো কিভাবে আমাদের দেশে শ্রেণীবৈষম্য বাড়াইয়া চলিয়াছে, কিভাবে ইহা নূতন শ্রেণী সৃষ্টি করিতেছে এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী হইয়াছে, তাহা একটু চিন্তা করিলেই চোখে পড়িবে। নূতন যে শিক্ষা পরিকল্পনা আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহার ফলে যে কাঠামো তৈয়ারি হইবে সেটা যেন এই ত্রুটিগুলি ঘটিতে না দেয়। তাহার ভিতরেও যেন শ্রেণী-বিরোধের নূতন বীজ লুক্কায়িত না থাকে, তাহার ফলে যেন শ্রেণীবৈষম্য ঘুচিয়া গিয়া জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রস্তাবিত কাঠামোর একটা ত্রুটি এখানে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে পারা যায়। দেখিতেছি এখানেও ইংরাজী শিক্ষাব্যবস্থার অনুকরণে এগার বৎসর বয়সে প্রকৃত মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া উচ্চ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ভেদ সৃষ্টি করা হইবে। মনোবিদরা বলিতেছেন এগার বৎসর বয়সে যোগ্যতা নির্বাচন করা অন্যায়, তের চৌদ্দ বৎসর বয়সের আগে ছেলেমেয়েদের মানসিক বৃত্তিগুলি পরিস্ফুট হয় না। সুতরাং যতদূর সম্ভব তের চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত সকল ছেলেমেয়েকে একই বিদ্যালয়ে রাখা উচিত। এইজন্যই ইংলণ্ডে ইদানীং সেখানকার বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখা দিয়াছে। মনোবিদদের এই মত অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং আমাদের দেশে নূতন শিক্ষা ব্যবস্থায় এভাবে এগার বৎসর বয়সে যোগ্যতা নির্বাচন করিবার চেষ্টা উচিত হইবে না। আবশ্যক মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ পর্যন্ত আবশ্যিক শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্তর্গত করা আমাদের পক্ষে আজ সম্ভব হইবে না, কিন্তু তাই বলিয়া যে বয়সে ছেলেমেয়ে-দের মধ্যে সামাজিক চেতনা সবে বিকশিত হইতেছে ঠিক সেই সময়টাতেই তাহাদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ করিলে সেটা সামাজিক ঐক্যবোধ সৃষ্টি করার বাধা হইবে। সুতরাং জাতীয় কল্যাণের জন্যই সেটা করা অন্যায় হইবে।

প্রস্তাবিত শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে এই রকমের কিছু কিছু ত্রুটি আছে। সে ত্রুটিগুলি সহজেই দূর করা যাইবে; কিন্তু আসল কথা তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, তাহার অন্তরালে যে শিক্ষাদর্শন আছে সেটাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে, বুঝিতে হইবে ও দেখিতে হইবে। শিক্ষা সংস্কারের ব্যাপারে সেই শিক্ষাদর্শনই আমাদের মনে অনুপ্রেরণা জোগাইবে। প্রশ্ন এই, সেই শিক্ষা-দর্শন তথা সমাজদর্শন কোথায়?

ইমারত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শিব প্রতিষ্ঠা করছেন শ্যামাদাসবাবু। লোকের কাছে পরম বিস্ময়ের কথা। কৃপণ লোক; কার্পণ্যের তপস্যায় তাঁর পিতামাতাও নাকি মুক্তি প্রাপ্ত হয়েছেন,—লোকে বলে এক এক পয়সা মা-বাপ শ্যামাদাসবাবুর। তাঁর টাকাও গল্পের টাকা। গল্পের বস্তু অল্প হয় না—কেউ বলে লাখ—কেউ বলে দু লাখ—কেউ বলে লোকটা যত বড়—টাকার স্তূপটিও তত বড়। তাঁর সিন্দুকের সর্বশেষ স্তরের যে টাকাগুলি সেগুলি ওজনে ঠিক থাকলেও আকারে ঠিক নাই, উপরের টাকার রাশির ভারের চাপে চেপ্টে বড় হয়ে গিয়েছে এবং চেহারাতেও কালো হয়ে গিয়েছে, ছাতা ধরেছে। অনেকে বলে—সেগুলি অচল; কেন না—সরকার নোটিশ দিয়ে ঘোষণা করেছেন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রথম আমলের টাকা—যেগুলিতে মুকুটহীন রাণীর মূর্তি মুদ্রিত—সেগুলি অচলিত হয়ে গেল। একটা সময়ও তাঁরা দিয়েছিলেন, এই টাকা স্থানীয় রাজকোষে দিয়ে তার পরিবর্তে নতুন টাকা বদল নেবার জন্য। কিন্তু শ্যামাদাসবাবুর স্বভাবই অন্য রকমের; সিন্দুকে যা তিনি রাখেন তা আর বা'র করেন না। লোকে বলে—শ্যামাদাসবাবুর ধারণা—বা'র করলেই বাইরের বাতাসে সে উড়ে যাবে। শ্যামাদাসের তৃপ্তি—সঞ্চয়ের তৃপ্তি—সেখানে অচল হ'লেও ক্ষতি নাই—যেহেতু না চালাবার প্রশ্নই নাই সেখানে। সেই লোক শিবপ্রতিষ্ঠা করবে এতে লোকের বিস্মিত হবারই কথা।

বিস্ময়ের প্রধান কারণ এবং মূল রসটা আকস্মিকতার মধ্যেই নিহিত থাকে। এবং তার বৈচিত্র্য ও মহার্ঘতা অল্পক্ষণ স্থায়িত্বের মধ্যেই আবদ্ধ—ফ্রেমে ঘেরা ছবির মত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তারও ব্যতিক্রম হল।

মন্দিরের উপকরণ যখন এল তখন পাকা ইট দেখে লোকের মনে হল—তাদের কল্পনাকে এটা ছাড়িয়ে গেল। বললে ইট পাকা হ'লেও—কাদা দিয়ে গাঁথবে।

কয়েকদিন পর দেখা গেল—চুন এসেছে, মজুরে সুরকী ভাঙছে। লোকে থমকে দাঁড়াল। গাঁথনী পাকাই হবে তা হ'লে! ছোটখাটো পাকা মন্দির একটি।

বিস্ময় আবার একদফা উৎপাদিত হল—জনাব সেখ রাজমিস্ত্রীকে দেখে। এ অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ পাকা কারিকর। এবং তার হাতে কাজ অল্প খরচে হয় না।

মাঝখানে চেরা সিঁথিটি তার ওলংয়ের সুতোয় পাকানো সরু দড়িটির মত সাদা এবং সোজা, বাবরী কাটা সাদা চুলগুলি পরিপাটি ক'রে আঁচড়ানো কর্ণি দিয়ে মাজা পঙ্কের পলেস্তারার মত চকচক করছে; ঘাড়ের চুলগুলির প্রান্তভাগ সযত্নে কেটে নিচে থেকে ঘাড়টা কামিয়ে ফেলেছে, গোল থামের মাথায় বেড় দেওয়া কার্নিশের বিটের মত—সব চেয়ে পাতলা কর্ণি দিয়ে দড়ি ধরে কাটা হয়েছে যেন। গোঁফ এবং গাল কামিয়ে চিবুকের নিচে নূর দাড়ীটিও ঠিক এমনি সযত্নে কাটা। ধপধপে পরিচ্ছন্ন দাঁতগুলির ফাঁকে কালো মিশির দাগ—পয়েন্টিং করা আলসের মত। চকচকে ছোট একটি হুঁকোতে ইঞ্চি চারেক লম্বা একটি বাঁশের নল লাগিয়ে—ভাল তামাকের মিষ্টি গন্ধে চারিদিকে বেশ একটা নেশার আমেজ ছড়িয়ে জনাব তামাক টানছে আর দীর্ঘ হাতখানির সরু আঙুল দেখিয়ে নির্দেশ দিয়ে—কাজ করাচ্ছে। গলায় দু'হালি কালো কারে বেড় দিয়ে বাঁধা একটি পাকা সোনার চৌকা তক্তি। গায়ে চেক কাটা পরিচ্ছন্ন ফতুয়া, কাঁধে বাহারে রঙের ডোরাকাটা সযত্নে পাট করা একখানি গামছা। পরনে ময়ূরকণ্ঠী রঙের লুঙ্গি। পায়ের চটি জোড়াটা এককালে সৌখীন ছিল—এখন কিন্তু পুরানো হয়েছে।

ইটের থাক দেওয়া হচ্ছে। মজুরেরা ইটের উপর ইট সাজিয়ে থাকবন্দী করে রাখছে; যাতে ইট তুলতে সুবিধে হয়—বরবাদ না যায়—এমন কি দুখানা ইট সরলেই ধরা যায়।

জনাব বলছিল—ই ক'রে রাখ বাবা, হুঁস ক'রে—হুঁস করে রাখ। সু—জু—সমা—ন ক'রে একটির উপর একটি রেখে যা বাপ। গাঁথনী করা ইমারতের নতুন বাহার দিবে। বেটাল হয়ে টলে পড়ে যাবে না।—এই দেখ। সর। দেখে লে।

সে তাকে সরিয়ে নিজেই ইটের উপর ইট সাজিয়ে রাখতে লাগল—দুঠিঁলুন হাতে অবলীলাক্রমে—হাঁ। হুঁস আর হিসাব। কাম করবার সময় মনে মনে বলিস মা—বাবা রে! মন যখুন বলবে—বাবারে—তখুন একবার তামুক খেয়ে লিবি। লে—টেনে লে একটান—খুসবই ওয়ালা তামাক।—কাঁধের গামছাখানি দিয়ে হাত দুখানি থেকে ইটের ধুলো ঝেড়ে নিয়ে—কল্কেটি সে মজুরটির হাতে দিলে।

বিস্মিত রামপ্রসাদ জনাবের পিছনের দিকে থমকে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। এবার জনাব এ দিকে ফিরতেই প্রশ্ন করলে—তুমি এখানে জনাব? ব্যাপার কি বল তো?

কপালে হাত ঠেকিয়ে অভিবাদন করলে জনাব—সেলাম গো বাবু। শ্যামাদাস বাবুজীর মন্দিল—হবে। আমি গাঁথছি।

—তা তো দেখছি। কিন্তু শ্যামাদাসবাবুকে তুমি মেরে ফেলবে নাকি?

জনাব একটু হাসলে। বললে—আজ্ঞে না, অল্প খরচে সেরে দিব—সে বুলেছি আমি বাবুকে।

—তোমার হাতে অল্প খরচে হবে তো?

জনাব হা-হা করে হেসে উঠল। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলে উঠল—আঃ হায়—হায়—হায় গো। বলি—উ-কি ইটা ভাঙচিস গো তু? এ্যা! নোড়ার মতুন—মোটা—মোটা! এ্যা।

সে এগিয়ে গেল লম্বা পা ফেলে।

এদিকে এক জায়গায় জমায়েৎ হয়ে বসে—বেশ যেন মজলিস করার ভঙ্গিতে মজুরনীর দল ছোট হাতুড়ী দিয়ে ইট ভেঙে খোয়া তৈরী করছিল।

বাছাই করা মজুরনী সব জনাবের। জনাবের নিজের মজুরীও বেশী, ওর মজুরনীদের মজুরীও চড়া। পরিচ্ছন্ন কাপড় আঁট ক'রে বেড় দিয়ে—সর্বশেষ উদ্বৃত্ত অংশটুকু কোমরে ফেরতা দিয়ে জড়িয়ে পরেছে, হাতে এক হাত ক'রে কাচের চুড়ি, স্বাস্থ্যবতী তরুণী নিয়ে জনাবের মজুরনীর দল। আরও একটা বিশেষত্ব আছে, সাধারণে না জানলেও মজুরনীরা জানে, তরুণী হলেও যদি কেউ বেঁটে আর মোটা হয় তবে তাকে তারাই বারণ করে দেয়—তু বুন যাস না। লেবে না। বুড়ো বলে—ঢ্যাপসা মেয়ে কাম করতে পারে না। লড়ে বসতেই উদের ছ মাস। তরুণী মেয়েদের মধ্যে আবার যাদের চোখ ডাগর, চুল বেশী—তারাই থাকে জনাবের পাশে; জনাবের হাতে ইট জুগিয়ে দেয়, মসলা ঢেলে দেয় গাঁথনীর উপর, ওলং এগিয়ে দেয়, জলের মগ-পাটা দেয় হাতে হাতে, রাজ মিস্ত্রীর হুঁকো কল্কে তামাক টিকে রাখে সযত্নে, বরাত মত সেজে দেয়। মধ্যে মধ্যে জনাব ভরা দুপুরের রোদের সময় বলে—লাতবউ একটা গায়েন কর না ভাই। বেশ মিহি গলায়। তু গাইবি—আমি আর জাতিন শুনব। হ্যাঁ।

মিহি কাজের সময় মধ্যে মধ্যে জনাব বলে

ক'রে ঘাড়টা একটু পিছনের দিকে হেলিয়ে দেখতে বলে—দেখ তো ভাই লাজ্জী লাতবউ তুদের ডাগর চোখে—দেখতে এক লজর। বল দেখিনি কুথা কি খারাপ লাগছে?

অন্য সব মজুরনীরা সব দিদি। বড়দিদি—মেজদিদি থেকে ছোটদিদি পর্যন্ত।

আগেকার কালে যারা পাশে থাকত তাদের কেউ ছিল ঠাকুর ঝি, কেউ ছিল ভাবী। দু. চারজনকে বউ বলেও ডাকত। তাদের দুজন প্রৌঢ়া এখনও আছে জনাবের দলে। তারা সর্দারনী। দেখাশুনা করে মজুরনীদের কাজ। নিজেরাও করে টুকিটাকি এটা ওটা। এরাই আড়কাটির মত সংগ্রহ ক'রে আনে নতুন মজুরনী। আনলে জনাব খুসী হয়; সংগ্রহকারিনী প্রৌঢ়া দিন কয়েকের জন্য জনাবের কাছে পুরানো কালের সমাদরের খানিকটা যেন ফিরে পায়।

জনাব এগিয়ে গেল মজুরনীদের খোয়া ভাঙার যায়গায়। নতুন একটি মজুরনী খোয়া ভাঙছে—খোয়াগুলি ঠিক ভাঙা হচ্ছে না, অনভ্যস্ত হাতের হাতুড়ির আঘাতে কতক হচ্ছে বড় বড় বাকী খানিকটা ভেঙে গুড়ো হয়ে যাচ্ছে, কতক হচ্ছে নেহাৎ ছোট যা দিয়ে কোন কাজ হবে না।

জনাব তার হাত থেকে হাতুড়ি নিয়ে ভাঙার কৌশলটা দেখিয়ে দিলে—এই দেখ—এই দেখ, চোখ দুটি তো বড় বড় লজর করে দেখ। বেশী মোটাও হবে না—বিচি-বিচি ছুটুও হবে না; বেশী জোরে হাতুড়ি মারবি না, আবার আস্তে ঠুকুস ঠুকুস করে মারলেও হবে না। এক তালে ঘা; হ্যাঁ—এই দেখ—এই দেখ!

শ্যামাদাসবাবু এসে দাঁড়ালেন। খাটো মানুষটি, গৌরবর্ণ রঙ, পাকা চুল, চঞ্চল প্রকৃতি ছেলের মত অস্থির লোক। বারকয়েক এ দিক থেকে ওদিক ঘুরে বেড়ালেন—তারপর এসে দাঁড়ালেন মজুরনীদের খোয়া ভাঙার জায়গায়—জনাবের কাছে। দাঁড়িয়েও তিনি স্থির থাকতে পারেন না—অনবরত দোলেন। হাতের আঙুলগুলি অহরহ সক্রিয়, অঙ্গুষ্ঠের নখ দিয়ে মধ্যমার নখটা অবিরাম খুঁটে চলেছেন। লোকে বলে টাকা বাজিয়ে ঐ অভ্যাসটা তাঁর হয়েছে। শ্যামাদাসবাবু বললেন—জনাব! একে বলে—এই ছুঁড়িগুলোকে লাগালে কেন হে?

জনাব হাসলে—বললে—জোয়ানী বয়েস না হ'লে কাজ হবে কেনে হুজুর? খাটবে কে? তা ছাড়া পাতলা হাত ওদের এখুন—হাল্কা পা—হাল্কা শরীল, হাঁটিবে বন বন ক'রে, ভারায় উঠবে খর খর ক'রে।

শ্যামাদাস বললেন—না—না—না, হারামজাদীরা ভারী পাজী। ক্রমাগত ফ্যাক ফ্যাক করে হাসবে। মজুরগুলো কাজ করবে না ফষ্টি নষ্টি করবে। ভাগাও—ওগুলোকে তাড়িয়ে দাও।

জনাব বললে—আপুনি যান ইথান থেকে হুজুর। আমি রইলাম—আপনার কাম রইল। বরবাদ হয় আমাকে ফজিয়ৎ করবেন। আমি জবাবদিহি করব।

একটু চুপ ক'রে থেকে শ্যামাদাস বললেন—এই মাঝারী একটি মন্দির হবে। বেশী ছোটও না হয়—বেশী বড়ও না হয়। বুঝেছ তো? আবারও একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি বললেন—লোকে বলছে তুমি লাগলে আর থাম না।

জনাব হাসলে—বললে—ইমারত আপনার। আমার লয়—আমার বাবার লয়। আপুনি যেমন হুকুম করবেন—তেমনি হবে। পাঁচ হাত বলেন পাঁচ হাত। দশ হাত বলেন দশ হাত। আবার বুলেন একশো হাত দেড়শো ফুট তাই হবে। তবে একটা হিসাব তো আছে। যেমন ভিত করবেন তেমনি মন্দির হবে। আবার মাঝখানে বুলেন থেমে যাও জনাব, তাই হবে। কর্ণি পাটা নিয়ে চলে যাব বাড়ী।

শ্যামাদাস উত্তর খুঁজে পেলেন না এর। নিরুত্তর হয়ে চঞ্চলভাবেই চলে গেলেন সেখান থেকে।

* * *

মন্দির উঠছে।

লোকে যেতে যেতে দেখে পথে দাঁড়ায় সবিস্ময়ে। মন্দির তো ছোট হবে না!

ভারা বাঁধা হয়েছে, একখানা বাঁশের দৈর্ঘ্য ছাড়িয়েছে—প্রথম বাঁশের মাথায় আবার নতুন বাঁশ বাঁধা হয়েছে, তারও দুটো থাক ছাড়িয়ে তৃতীয় থাকে তক্তা পেতে জনাব কাজ ক'রে যাচ্ছে। পাশে দুটি তরুণী কাহারদের বউ মতিবালা—আর হাড়িদের মেয়ে দাসী। জনাবের বিপরীত দিকে আর একটা ভারায় দুজন রাজ কাজ করছে। আব্দুল। আর রসিদ।

শ্যামাদাসবাবু নিচে এসে কখন দাঁড়িয়েছেন। লোকের কথাই সত্য। জনাব সহজে থামবে না। এখনও চারখানা দেওয়াল সোজা উঠে যাচ্ছে। কাটান দিয়ে এখনও একখানা ইটও গাঁথা হয় নাই। সুতরাং কত উঁচুতে গিয়ে যে মন্দিরের চূড়া গিয়ে ঠেকবে সে বুঝতে পারা যাচ্ছে না। তার উপর কাজ অগ্রসর হচ্ছে যেন শামুক চলছে। জনাবকে দোষ দেওয়া যায় না, সে কাজ করে যায় ঠিক, কিন্তু ওই যে দুটো রাজ মিস্ত্রী ওরা ক্রমাগত বিড়ি খাচ্ছে। বিশেষ করে সবচেয়ে অল্পবয়সীটা। শুধু বিড়ি খাওয়াই নয়—অল্পবয়সী মজুরনীগুলোর সঙ্গে হাসাহাসির আর বিরাম নাই। তিনি ডাকলেন—জনাব!

জনাব নিচে তাকিয়ে বললে—আজ কাটান দিব হুজুর।

—তা বেশ। কিন্তু একে বলে—ঐ ছোকরা রাজমিস্ত্রীটাকে কাজ করতে বল।

জনাব ছোকরার দিকে দৃষ্টি ফেরালে। জনাবের মনে আছে আজ ও কোনখান থেকে ইট গাঁথতে সুরু করেছে। কত ফুট গেঁথেছে সে-ও সে মাপ না ক'রে একবার নজর দিলেই বুঝতে পারে। তার ভুরু কুঁচকে উঠল। সত্যিই ছোকরার কাজ মোটেই এগোয় নাই।

সে বললে—কি রে? তু কি ভেবেছিস বুলত? মতলব কি রে তুর?

ছোকরা ব্যস্তভাবে কাজ করতে আরম্ভ করলে—কোন উত্তর দিলে না।

জনাব বললে—দেখ—একটি বাত তুকে বুলি শুনে রাখ। এই টাঁকা বড় খারাপ চিজ। চাঁদি লয় পারা। পারাকে পুড়ায়ে ভসম লিয়ে খা—সি তখুন ওষুদ। কাঁচা খা—গায়ে ফুটে নিকলে যাবে।

একখানা ইট হাতে নিয়ে তার উপর কর্ণির ঘা দিতে দিতে আবার বললে—পরের ষোল আনি টাকা, যখুন ষোল আনি কাম করে লিবি, তখুন সি হ'ল পারা ভসম্ (ভস্ম)। তাতে যা খাবি সে দিবে তুকে তাগদ। আর ফাঁকি দিয়ে লিবি—তো সি টাকা লয়, সি পারা। তাতে যা খাবি—সে হবে বদহজমী।

রাগ হলে জনাবের হাতের কাজের গতি বেড়ে যায়। বাঁ হাত বাড়িয়ে সে বললে ইটা। লাত বউ! হাঁ। মসলা—জল। লাতিন। আচ্ছা—বাস করো।

খং—খং—খং—খং, ইটার উপর কর্ণির আঘাত কামার শালায় লোহার উপর হাতুড়ির আঘাতের শব্দের মত বাজতে লাগল।

জনাব বললে শ্যামাদাসবাবুকে—আপুনি যান বাবু। আজ থেকে আমি ফিতা মেপে হিসাব ক'রে কাম লিব। এই—এই রসিদ! এই হারামজাদী 'শুষনি'! এই!

জনাবের হাঁকে ডাকে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল, সচকিত হয়ে উঠল সকলে। চালাও চালাও। কাম চালাও। হাঁ।

খস খস শব্দে কর্ণি চলতে লাগল জল সপ সপে চুন সুরকী মেশানো মসলার উপর। গাঁথনির ইটের গায়ে পাটা বসিয়ে তার গায়ে হাতুড়ির আঘাত পড়তে লাগল—ঠক—ঠক—ঠক—ঠক!

জনাব আবার কিছুক্ষণের মধ্যে খুসী হয়ে উঠল। হ্যাঁ। এই ত! তারপর সে কাহারদের বউ মতিবালাকে বললে—নে তো ভাই লাত বউ, দুপুরের আমেজে ধরতো একখানা মিহি গলায়। ধরতো! লাতিন তু ভাই একবার তামাক সাজবি।

মতির বড় বড় চোখ—মাথায় এক রাশ রুক্ষ চুলে মস্ত বড় খোপা। জনাবের ভারী প্রিয় সে। এরই মধ্যে জনাব তার লজ্জার সঙ্কোচকে অনেকখানি সহজ ক'রে এনেছে। গান গাইতে বললে সে আর সলজ্জভাবে মুখ নামিয়ে মৃদু হেসে নিরুত্তরভাবে ঘাড় নেড়ে অস্বীকৃতি জানায় না। দিব্য গান গেয়ে যায়। এদের লজ্জা সঙ্কোচকে জয় করবার শক্তি এবং দক্ষতা জনাবের অদ্ভুত।

দাসী তামাক সাজতে বসল—মতি মৃদুস্বরে গান ধরলে—

"বাবুদের চি-লে কো-ঠার ছাদে চিল
কাঁদিছে গেম ভরা দুপুরে—
বিউল পালায় কোথা বাসা বেঁধেছে কোন
তাসপুকুরে।"

জনাব বললে—উঃ কতকালকার গান! ছেরবস্কাল [illegible]জোরা গায়।

দাসী হুঁকো কল্কে এগিয়ে দিলে। জনাব কল্কে খসিয়ে মতির হাতে দিয়ে বললে—লে পেসাদ করে দে ভাই। তু খেয়েছিস তো ভাই লাতিন? তারপর আবার বললে—দে উয়াদিকে এক ছিলম ভাল তামাক দে। লে রে ভাই—খা

খুসবয়ওয়ালা তামুক এক টান খেয়ে—লে জমিয়ে কাম কর।

আবার বললে—সান্ত্বনার সুরে—দেখ তুদের ভালর তরেই বুলি। ষোল বছর বয়সে বাবা কাণ হাতে দিয়েছিল, আর ওই কথাটি বুলেছিল আমাকে। বুলেছিল বাপ্ এই কথাটি মনে রাখিয়ো। আগে ষোল আনি কাম দিবে তার বাদে ষোল আনি টাকাটি লিবে।

কর্ণির আঘাতে একখানা ইট ভেঙে আধ-খানা নিচে পড়ে গেল। জনাব একবার দেখে নিলে নিচেটা। তারপর বললে,—জোয়ানী কাল হ'ল খাটবার আর কাম শিখবার কাল। যে শিখবে আখেরে ভাল হবে। নইলে আখের তার ঝরঝরে। ওই তিনকড়ে আর আমি এক সাথে কাম সুরু করেছিলাম। তা দেখ কেনে—তিনকড়েকে কেউ ডাকে? গারার (কাদার) গাঁথুনি গে'থেই দুনিয়ার বিল্‌তি কাবার হয়ে গেল।

মতি হেসে বললে,—তিনকড়ি মিস্ত্রির ওপর তোমার ভারি রাগ, লয়?

হা—হা করে হেসে উঠল জনাব। তুকে কে বুললে গো লাত বউ?

মতি সলজ্জ কৌতুকে বললে—রঙ্গুকে নিয়ে ঝগড়া আমরা জানি না বুঝি? হাড়িদের মেয়ে রঙ্গু!

উত্তরে জনাব মতির ডাগর চোখের সলজ্জ দৃষ্টি নিয়ে রসিকতা ক'রে বসল। মতি মুখে কাপড় দিয়ে বললে, মরণ!

জনাব বললে—ঠিক তুর মত চোখ আর চুল ছিল রঙ্গুর। তবে তুর চেয়ে অনেক কালো ছিল। তেমন কালই আর চোখে পড়ল না।

জনাব হঠাৎ ভারার উপর উঠে দাঁড়াল।

বর্ধিষ্ণু গ্রাম। তবে পাকা গাঁথুনীর ঘরের সংখ্যা কম। দক্ষিণে হরিশবাবুর দোতলা দুমহলা দালান, মধ্যে শ্যামাদাসবাবুর এবং শ্যামাদাসের ভাইয়ের পাকা বাড়ী। তারপর মাধববাবুর প্রকাণ্ড বাড়ী। তার মধ্যে একখানা তিনতলা। তারই ওধারে রামবাবুদের একতলা দালান। মধ্যে মধ্যে মন্দির। রামবাবুদের পাঁচটা শিবমন্দির পাশাপাশি। ও পাড়ায় দুটো খুব প্রাচীনকালের মন্দির। ওই উত্তর দিকে একটা মন্দির। উত্তর পশ্চিম কোণে জনাবের পাড়ার মসজিদ। মিনার দুটো সোজা উঠে গিয়েছে।

জনাব বললে—ওই দেখ লাতবউ। ওই রামবাবুর একতলা দালান। ওই দালানে আমার হাতে খড়ি। তিনকড়িরও হাতে খড়ি ওই হোথাকেই। রঙ্গু এল খাটতে। আমাদের থেকে রঙ্গু বয়সে বড়। এই তুর মতুন চোখ দাসীর মতন চুল, আর সে কি কাল রঙ! দেখে আমি মাতাল হয়ে গেলাম। ইটা দিতে এল রঙ্গু। লিতে গিয়ে ঝুড়ির কিনারাটা হাত থেকে খসে পড়ে গেল। রঙ্গু মুচকি হেসে বললে—ফেললে তো! দেখো নিজে পড়ে যেয়ো না।

দাসী হেসে বললে—তা বাদে তুমিতো রঙ্গুকে নিয়ে ভাগ্‌লে। তিনকড়ির ভয়ে।

—ভাগলাম? জনাব ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল। সে বললে—তিনকড়ির ভয়ে ভাগি নাই।

* * *

জনাবের বয়স এখন ষাটের কাছাকাছি। আঠারো বৎসর বয়সে' হাড়িদের মেয়ে রঙ্গুকে নিয়ে সে একদিন এখান থেকে পালিয়েছিল। লোকে বলে—তিনকড়ি রাজমিস্ত্রীর প্রতি-দ্বন্দ্বিতা থেকে রঙ্গুকে ছিনিয়ে নিয়ে আত্ম-রক্ষার জন্যই জনাব পালিয়েছিল। জনাবের আত্মসম্মান এতে যেন আহত হয়। সে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। তিনকড়ি? আরে—সরম কি বাত, লজ্জার কথা! মর্কটের মত চেহারা, উল্লুকের মত তরিবৎ, তার সঙ্গে পিয়ারীর দিল নিয়ে লড়াইয়ে না কি জনাবকে পালিয়ে যেতে হয়। সেকালের জনাবের চেহারা এরা দেখে নাই। তাই এমন কথা বলে।

পালিয়েছিল সে অন্য কারণে। রঙ্গু যদি যেতে রাজী না হ'ত তবু সে পালাত। বাপের সঙ্গে গিয়েছিল সে পাথর চাপড়ীর মেলা। বড় জাগ্রত পীরসাহেব সেখানে। দশ বিশ হাজার লোক জমায়েৎ হয় পীরের অর্চনার জন্য। তার অসুখের জন্যই তার বাপ পীর সাহেবের কাছে মান্নত করেছিল। মান্নতের টাকা ধান মোমবাতী তেল নিয়ে সপরিবারে তার বাপ পাথর চাপড়ী গিয়েছিল। পথে কিছু দূরে পড়ে রাজনগর। এককালে নবাব ছিলেন এখানে। সেকালের অনেক ইমারত আছে। পাথর চাপড়ীর ফেরৎ রাজনগর দেখতে গিয়েছিল তারা।

জনাব অবাক হয়ে গেল। জঙ্গলের মধ্যে প্রকাণ্ড এক তিনখিলানি ফটক। আশপাশ সব ভেঙে গিয়েছে—কিন্তু তিনখিলান দাঁড়িয়ে আছে জমাটবন্দী পাথরের মত। কি তার বাহার, কি সব নক্সা! রাজমিস্ত্রির ছেলে সে—নিজে রাজমিস্ত্রির কাজ শিখছে কিন্তু এ জিনিষ সে কল্পনাও করতে পারে নাই কখনও: মনে মনে হাজারো বার, লাখো বার সেলাম জানালে—এই ইমারতের ওস্তাদ কারিগরকে। সবিস্ময়ে সে বারবার উচ্চারণ করলে—'শোভান আল্লাহ!'

ছেলের বিস্ময় দেখে বাপের কৌতুক হল। সে ফিরবার পথে জেলার সদরের ইমারতগুলো দেখিয়ে নিয়ে এল। হিন্দুদের এক পুরানো মন্দির আছে। সে দেখেও তার তাজ্জব মনে হল।

জনাব চোখে যেন যাদুর সুরমা পরে ঘরে ফিরল। হাজার সেজের ঝাড় লণ্ঠনের হাজার বাতির আলোর জলসা থেকে ফিরে কাঠের পিলসুজের উপর মাটির প্রদীপ দেখে যেমন মেজাজ খারাপ হয়ে যায় তেমনি তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। একমাত্র সান্ত্বনাস্থল ছিল রঙ্গু। গ্রামের বাইরে বিশ পঁচিশটা ঝুরি-ওয়ালা বটতলায় রাত্রে কেউ যায় না। বলে ভূত আছে ওখানে। জনাবের ওই জায়গাটা খুব ভাল লাগে। বুড়া গাছটার ঘন ছায়ার তলায় কোন গাছ এমন কি ঘাস পর্যন্ত জন্মায় না,—পাকা মেঝের মত তকতক করে, মাথার উপরে ডালে পাতায় ছাউনীটি সুডৌল গোল, যেন ছাদের মত—গম্বুজের মত মনে হয়। মূল কাণ্ডটাকে চারদিকে ঘিরে বিশ বাইশটা মোটা ঝুরি নেমে মাটির বুক ফুঁড়ে চলে গিয়েছে—বিশ বাইশটা থামের মত। ছেলে বেলা থেকেই জনাবের এই গাছতলাটিকে বড় ভাল লাগত। এখন শুধু ভালই লাগে না, এখন তার মনে হয় খোদাতায়লার এ এক বাহারের ইমারত। ছেলেবেলায় এসে গাছটার কাছে বসে থাকত দিনের বেলা। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহস বাড়ল—তখন বিকেলের দিকে এসে গাছটার তলায় গিয়ে বসত, ঘুরে ফিরে দেখত। রঙ্গুর সঙ্গে পরিচয় যখন প্রেমে পরিণত হ'ল তখন সেই প্রেমে তার সাহস হয়ে উঠল দুঃসাহস। সন্ধ্যার পর সে এসে এই গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকত একটা মোটা ঝুরিতে ঠেস দিয়ে। ঝুরিটাতে এবং জনাবে যেন এক হয়ে যেত। গাছটার ঝুলে-পড়া ডালে ঝুলিয়ে দিত তার সাদা গামছাখানা। দূর থেকে অন্য লোকে ভয় পেত, ভাবত সাদা কাপড় পরে কেউ গাছের ডালে বসে দোল খাচ্ছে; রঙ্গু দূর থেকে বুঝতে পারত' জনাবের নিশানা। সে নির্ভয়ে চলে আসত। রঙ্গুর সঙ্গে যতক্ষণ থাকত ততক্ষণ ছিল তার আনন্দ।

রঙ্গুর কাছে সে গল্প করত রাজনগরের তিনখিলানি ফটকের, সদরের চূড়ার, মন্দিরের। সদরের বড় বড় ইমারতের। এর ওর কাছ থেকে শোনা শহর মুরশিদাবাদের নবাবী আমলের ইমারতের। শহর কলকাত্তায় এক মিনার আছে—নাম বলে মনুমেণ্ট, তলাতে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকালে মাথার পাগড়ী টুপী খসে মাটিতে পড়ে যায়।

রঙ্গুর শুনতে ভাল লাগে—কিন্তু অবসর হয় না। তারও ঘরদুয়ার আছে—মা-বাপ-ভাই আছে—স্বামী আছে। রাজমিস্ত্রির সঙ্গে যারা মজুরনী খাটে তাদের সঙ্গে রাজ-মিস্ত্রিদের অপবাদ রটে, অভিভাবকেরা জানে—অপবাদের মূলে সত্যও আছে—তবুও নিয়ম হল সব দিক মানিয়ে চলার। সেইটাই ভাল। রাজমিস্ত্রিদেরও এ বিষয়ে একটা নিয়ম আছে, সেটা তারাও মেনে চলে; গোপন প্রেম যতই প্রবল হোক তারা প্রণয়িনীদের ঘরছাড়া করে নিজের ঘরে আনে না। এতে বদনামী হয় তাদের। ব্যবসার ক্ষতি হয়। লোকে কাজ দিতে চায় না, মজুরনীদের কাজ করতে পাঠাতে চায় না তার কাছে।

অকস্মাৎ একদিন জনাব তাকে বললে—আমার সঙ্গে যাবি?

—কোথা? কোলকাতা না মুরশিদেবাদ, না ডিল্লী না লাহোর? তুমি তো নিয়ে যেছো আমাকে—কত জায়গা! হাসলে রঙ্গু।

রঙ্গুর হাত চেপে ধরলে জনাব, বললে—না। ইবার আমি পালাব। খোদার কসম। একটু চুপ ক'রে থেকে জনাব বললে—বাপজীকে এত করে বুললাম তা সি যেতে দিবে না। বুলে মা-মরা ছেলে আমার তু তুকে ছেড়ে থাকতে লারব আমি। আর গাঁয়ে মায়ে সমান কথারে বাবা, ইখানেই কাল কেটে যাবে, খেয়ে পরে কোন রকমে—উ সব খেপামী করিস না।

—তা তো হ'ল। কিন্তু কাজ কোথা? জায়গাটা শুনি?

—সাহেবডাঙ্গার কুঠী জানিস?

—হ্যাঁ। রেশম কুঠী আছে সাহেবদের।

—সেখানকে।

—রেশম কুঠীতে কি করবা?

—সিখানে নতুন করে সব ইমারত হবে। পুরানো সব ভেঙে নয়া-নয়া কারখানা করছে সাহেবানেরা। মোটা মজুরী। যাবি?

রঙ্গু এই অল্প বয়সের মধ্যে বহু জনের প্রলোভনে পড়েছে, অর্থ সামগ্রীও সে অনেক পেয়েছে, কিন্তু তাদের কেউ জনাবের মত নিজেকে দেয় নাই এমনভাবে। ফলে—সব দিক মানিয়ে ঘর সংসার এবং জনাব—এই দুইকেই বজায় রেখে মানিয়ে চলা তার পক্ষে কণ্টকর হয়ে উঠেছে। সে প্রকাশ্যভাবে জনাবকে তার নিজের বলে এবং নিজেকে একান্তই জনাবের বলে ঘোষণা করে দাঁড়াতে চায়। সে বললে—চল—তাই—চল।

পরদিন সন্ধ্যায় আর তারা মিলিত হ'ল না। রাত্রি একটু গভীর হলে জনাব এসে দাঁড়াল গাছতলায় একটি পুঁটলি নিয়ে। ছোট বড় পাটা দুখানা হাতে নিয়েছিল। রঙ্গুও এল একটি পুঁটলি নিয়ে। দুজনে তারা বেরিয়ে পড়ল।

নদীর ধারে সাহেবডাঙ্গার রেশম কুঠী। একেবারে কিনারার উপর। সাহেবানদের কীর্তি দেখে জনাব বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। শোভান-আল্লা! ক্রোশ ভর কিনারা একদম নিচে থেকে উপর পর্যন্ত বাঁধিয়ে ফেলেছে। বাঘিনীর মুখের মধ্যে লোহার দস্তানা পরা হাত পুরে দিলে যেমন হয় দরিয়ার হাল হয়েছে ঠিক তেমনি। কষের দাঁত দিয়ে বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে চিবুতে চেষ্টা করছে সে। বাঁধানো সীমানা বরাবর নদী এখানে ধনুকের মত বাঁক ঘুরেতে বাধ্য হয়েছে।

বাঁধানো কিনারার উপর উঠেছে কুঠী। পাঁচীল চলে গিয়েছে তীরের মত সোজা। তার ভিতরে দেখা যাচ্ছে গোল থামওয়ালা দোতলা বাড়ী। সব চেয়ে বিস্ময়কর চৌপলা মিনারের মত উঠে গিয়েছে ইটের তৈরী চিমনী।

ঘাটে উঠবার সময় জনাব পোস্তার গাঁথনীটা বেশ ক'রে হাত দিয়ে নেড়ে দেখলে। এ্যায় বাপরে বাপ! জল একদম পাথর বনে গিয়েছে। ইটের উপরে ইট—তার উপরে ইট. মাঝখানের মসলা, কোথায়—কতটুকু, ধরতে পারা দূরে থাক আন্দাজও করা যায় না।

সাহেবের সামনে গিয়ে সেলাম করে সে দাঁড়াল। কুঠীর তখন অনেক কাজ, নতুন বয়লার বসবে, চিমনী তৈরী হবে; নতুন করে পাঁচশো 'খাই' তৈরী হবে, তার শেড চাই। নতুন গুদাম হবে, কোয়ার্টার হবে আণ্টাঘর হবে। অনেক কাজ, অনেক মিস্ত্রী চাই, অনেক লোক চাই। কাজ পেয়ে গেল জনাব। কুঠীর দারোয়ান তাকে সঙ্গে করে জিম্মা করে দিলে বড় মিস্ত্রীর। সেখ খুরসেদ আলি।

ঘাড় কামানো বাবরী চুল—চেরাসিঁথী, মাথায় মলমলের টুপী, গায়ে পাঞ্জাবী আস্তিন—পরনে চেকদার লুঙ্গি—পায়ে ফুলদার চকচকে জুতা—নাম পামশু। দোষে গুণে বেশ মানুষ ছিল—খুরসেদ। বয়স তখন তার চল্লিশ-প'য়তাল্লিশ। জনাবকে একনজর দেখলে—জনাবকে দেখতে গিয়ে পিছনে রঙ্গুকে দেখে সে বললে—ও? ও কে?

জনাব বললে—আমার লোক। তারপরই নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে বললে—আমার বিবি।

খুরসেদ হেসে বললে—ঝুট।

তারপর আবার হেসে বললে—তাতেও কোন হরজা নেই। তুম রাজমিস্ত্রী হ্যায়—উ তুমারা রেজা হ্যায়। লেগে যাও কাজে। পিঠের দিকে জামার গলায় ঝুলানো ছিল—ভাঁজ করা ইঞ্চি মাপের স্কেলটা—সেটা সে টেনে নিয়ে মাপতে বসল গাঁথনীটা। অবাক হয়ে গেল জনাব। সেও লাগল কাজে পরের দিন থেকে।

নদীর ধারের পলি মাটির তৈরী ইট—পগমিলে মাটি তৈরী হয়েছে, বাক্স ফর্মায় ছ'খানি পিঠ একেবারে যেন র‍্যাঁদা করা কাঠের মত সমান; একখানির উপর আর একখানি রাখলে বেমালুম বসে যাবে—কেতাবের ভিতরের সমান মাপে কাটা কাগজের উপর কাগজের মত। পাতলা গ'দের আঠার মত এক আস্তরণ মসলা। কর্ণি চালিয়ে টেনে দিয়ে একখানার পর একখানা ইট বসিয়ে যাচ্ছে। সোহাগার পান দিয়ে জোড়া সোনার দানা দানার সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে। খিলান হচ্ছে—সাহেব লোকের আণ্টাঘর—গান হবে, বাজনা হবে, সাহেব মেম লোক নাচবে—জোড়াবেঁধে; গোটা ঘর জোড়া এক খিলান, দুই ধারে দুই থাম। বিশ ফুট চওড়া হল—বিশ ফুট চওড়া খিলান। মোটা শালের রোলা দিয়ে মাচা বেঁধে খিলানের ঠেকা বাঁধা হয়েছে, তার উপর ইট গাঁথা হচ্ছে। খিলানের ইট সোজা বসছে না, বসছে আড়াআড়ি। মসলা নিজে দাঁড়িয়ে তৈরী করিয়েছে বড় মিস্ত্রী। 'বিলাইতী মাটি' আর কাশীর চিনির মত মিহি বালি মিশিয়ে শুকনা অবস্থায় বারবার তাকে ঘেঁটে ঘেঁটে মিশিয়ে জল ঢেলে ক্ষীরের মত পাতলা করে তৈরী সে মসলা। সেই মসলা ঢেলে দিচ্ছে ফাঁকে ফাঁকে, কর্ণি দিয়ে মেজে ঘষে জোড় মিলিয়ে দিচ্ছে। বিলাইতী মাটি ওই এক তাজ্জবের মসলা। বালিতে আর 'বিলাইতী মাটিতে' মিশিয়ে তাল পাকিয়ে রেখে দাও ঠাণ্ডায় একটু শুকালে ফেলে রাখ পানিতে; একদিন পর তুলে নাও—বাস—পাথরের গুলী হয়ে যাবে।

আণ্টাঘরের গাঁথনী শেষ হল। আরম্ভ হল পলেস্তারা। সাহেব বলেছিল বিলাতী মাটিতে আর বালি মিশিয়ে পলেস্তারা কর। খুরসেদ বললে—হুজুর পঙ্কের কাম হোক—

নিচে থেকে ডাকলেন শ্যামাদাসবাবু—জনাব!

—এই যাই আজ্ঞা। আজ দেখেন কাজ। মেপে দেখেন।

—কাটান দিলে?

—কাল দিব। ভেবে দেখলম—আজ দিলে —জেরা সে খুঁত থাকত।

শ্যামাদাস চঞ্চল হয়ে নখ খুঁটতে আরম্ভ করলেন—শোন ত' তুমি। শোন ত। একে বলে—তোমার মতলবটা কি একবার খুলে বলত শুনি।

জনাব বললে—পেটে এখনও দানা-পানি পড়ে নাই বাবু। এখুন লয়। আসব সনজের সময়। এখুন হয়তো খারাপ বাত বেরিয়ে যাবে। সনজেতে আসব।

*　　*　　*　　*

সন্ধ্যার সময় সে এল। এখন তার গায়ে ফতুয়ার বদলে জামা। পরনে কাপড় বহরে বড়। কোঁচাটি উল্টে গুঁজে প্রৌঢ়ত্বের সঙ্গে মানান সই করে নিয়েছে।

শ্যামাদাসবাবু বললেন—লোকে যা বলে সে মিছে নয়। লাগলে একে বলে—থামতে চাও না।

জনাব হেসে বললে—এ আপুনি কি বুলছেন হুজুর? কাম শেষ না হলে থামব কি করে গো। সবেরই একটা সময় আছে, থামবার একটা সময় আছে। একি বাজীকরের হুকার জল—হুই বসায়ে দিলে—দিয়ে বুললে পড় জল পড়তে লাগল—বুললে থাম বাস থেমে গেল।

শ্যামাদাসবাবু বললেন—আজ কাটান মারবার কথা—তুমি নিজে—

—হাঁ বুলেছিলাম। তা দেখলাম আজ যদি এইখানে কাটান মারি তবে জেরা সে খুঁত হয়, খারাপ হয়ে যায় মন্দিল। ধরেন সবেরই একটা হিসাব আছে। ফিতা ধরে মাপ—ফুট ইঞ্চির হিসাব।

কিন্তু এরই মধ্যে কত উঁচু হয়েছে দেখেছ? জনাব ভুরু কুঁচকে হাসলে—উচু হয়েছে! উই কি উচু? আর উচাই যদি না হবে, তবে মন্দিল করছেন কেনে হুজুর? একখানা সাত ফুট বাই আট ফুট গারার গাঁথনী ঘর করলেই তো হত। মাথার উপর একটা তেকোনা পেরাপেট গেঁথে একটা ত্রিশূল বসায়ে দিলেই হয়ে যেত। তা বলেন না কেনে—এখুনও হবে। তাই করে দিছি আপনার। গাঁথুনী বন্ধ থাক, কড়ির অডার পাঠায়ে দিন, টালি আনিয়ে নি—

বাধা দিয়ে শ্যামাদাস বললেন—আঃ তুমি বড় একে বলে বাজে বক জনাব। তা' কে বলেছে হে বাপু? চঞ্চল হয়ে তিনি চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন—ঘুরতে লাগলেন ঘরময়, আঙুল দিয়ে নখ খোঁটার মাত্রা বেড়ে গেল।

জনাব বললে—তবে আপনি বুলছেন কি? মন্দিল হবে আপনার। আমার লয়। আমি লিয়ে যাব না ঘরে। লোকে বুলবে না জনাব সেখের মন্দিল, বুলবে অমুক বাবুর মন্দিল। হুজুরে মন্দিল লোকে করে কেনে? ঘর করলেই তো হয়। হুই মাথা লম্বা করে আকাশের গায়ে মার দিয়ে মন্দিল করে কেনে? তার উপর দেয় আপনার কলস, তার উপর ত্রিশূল—কেউ দেয় চক্র। কেউ বা দেয় পিতলের—কেউ দেয় সোণার। কেনে দেয় হুজুর? উচার জন্যেই মন্দিল। আপনার দেবতা—আপুনার ঠাকুর যে ইমারতে থাকবেন, সে নীচু হবে মানুষের ঘরের 'থনি'? আপুনি থাকবেন দোতালা ঘরে, তার চিলেকোঠা হুই উচা আর ঠাকুরের মন্দিল এই লিচু হবে? মন্দিল হবে দেবতার মন্দিল, আকাশের গায়ে মার দিয়ে মাথা উচা করে খাড়া থাকবে, সুরযের আলো প'ড়ে সোণার কলস ঝলবে। গাঁয়ের লোকের ঘুম ভাঙবে সকালে, আল্লাকে—ভগবানকে প্রণাম করতে মুখ তুলবে, আপনার মন্দিলের চুড়া চোখে পড়বে। তারা প্রণাম করবে আপনার ঠাকুরকে। বলবে—হ্যাঁ অমুক বাবু একটা আদমীর মতন আদমী ছিল, ভকত ছিল বটে, মন্দিল করে গিয়েছে বটে। বেহেস্তে থেকেও শুনবেন সে কথা আপনি। মন্দিলের চুড়া ক্রোশ বরাবর দূর থেকে দেখা যাবে। তবে সে মন্দিল। গাঁয়ের চার পাশে গাছপালা, জঙ্গল মনে হয় দূর থেকে সেই জঙ্গলের মাঝ-খানে গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে আশ্বিনের টুকরাভর মেঘের মত মন্দিলের মাথা দেখা যাবে। লোকের প্রথমে মনে হবে মেঘই বটে। তা'পর মনে হবে—না—মেঘ তো লয়; মন্দিল—এ মন্দিল। তারিফ করবে লোকে। বলবে—হ্যাঁ ইমানদার লোকের কীর্তি বটে। দেশদেশান্তরের লোক কেউ আসছে ই' গায়ে। পথে রাহীকে শুধালে অমুক কত দূর ভাই? লোকে বুলবে আর খানিকটা এগিয়ে গেলেই নজরে আসবে, পহেলেই দেখতে পাবে—এক মন্দিলের চুড়া। ওই চুড়াতে চোখ রেখে চলে যাও। কার মন্দিল ভাই? অমুক বাবুর মন্দিল। হাঁ!

শ্যামাদাসবাবু কথার মাঝখানেই পায়চারী ছেড়ে এসে চেয়ারে বসেছিলেন। স্তব্ধ হয়ে তিনি বসেছিলেন। নখ খুঁটছিলেন অত্যন্ত মৃদুভাবে। জনাব তার কল্কের স্তিমিত আগুনে ফু দিতে দিতে বাইরে গিয়ে বসল। সেখানে আড়ালে বসে তামাক খেতে বসল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, বাবু।

—উঁ।

—বুলেন, কথাটা আমি ঠিক বুলেছি কি না?

শ্যামাদাসবাবু বললেন, হুঁ! কথা তো ভালই বটে। একে বলে শুনতেও ভাল লাগছে। কিন্তু—

—উয়াতে আর কিন্তু নাই হুজুর। সায়েব-ডাঙ্গার কুটি 'থনে' গেলাম বর্ধমান। শুনলাম রাজবাড়ীতে ইমারত হবে নতুন। বুঝলেন? পথে পেরথম চোখে পড়ল সারি সারি মন্দিল—একশো আট শিবমন্দিল। দুধের মতন সাদা মন্দিলের সারি: আঃ মাঠের মধ্যেখানে—দু কোশ দূর থেকে নজরে পড়ছে, আর মাঝে মাঝে গাঁয়ের আড়াল পড়ছে। তারপর কাছে এলাম: হুজুর সেখান থেকেই এক শো আট সেলাম দিলাম রাজাকে—আর এক শো আট সেলাম দিলাম কারিগরকে। তা বাদে আপনার রাজ-বাড়ীর ইমারত সে কথা বাদই দেন। রাজা বাদশা নবাবদের কীর্তিই আলাদা। কিন্তু আপনিও তো আমীর লোক—আমীরের মতন কীর্তি তো আপনাকে করতে হবে। রাজার বাড়ীর থাম নিচে তলা থেকে উঠে গিয়েছে তিন তলার ছাদ পর্যন্ত। পঙ্কের কাজ করা গোল থাম। সে সব কথা না হয় বাদই দিলাম। রাজবাড়ীর কাম হয়ে গেল, শুনলাম কাম হবে কাছেই এক জমিদার বাড়ীর—মন্দিল হবে। নটা চুড়া হবে মন্দিলের, দাওয়া হবে মানুষের গলা ভর উচা কলকাতার ইঞ্জিনীয়ার নক্সা করেছেন।

শ্যামাদাসবাবু বেরিয়ে চলে গেলেন।

জনাব অপেক্ষা করে বসে রইল। কিছুক্ষণ পর সেও উঠল। কি করবে সে বসে থেকে। ঝকমারীর কাম করেছে সে—এই বাবুটির কাজ হাতে নিয়ে। দিলদার লোকের কাম করেও সুখ আছে। তাতে মজুরী কম হয় সেও আচ্ছা। দিলদার লোক ছিল বর্ধমানের সেই জমিদার। ঘুর ঘুর করে বাবুসাহেব—মন্দিরের চারি পাশে ঘুরছেই। —হাঁ, ওখানটা কেমন যেন বেঁকে গেল মিস্ত্রি?

—না হুজুর—ঠিক আছে নিচে থনে উচাতে এমন দেখায়।

—মিস্ত্রী দেখ, আমার ভারি ইচ্ছে—

বলুন হুজুর, বলুন কি ইচ্ছে?

—ইঞ্জিনীয়ার করেছেন বটে, মাঝখানের চূড়াটি এই রকম, কিন্তু আমার ইচ্ছে, বর্ধমানের সর্বমঙ্গলার মন্দির তুমি দেখেছ তো? সেই রকম হয়।

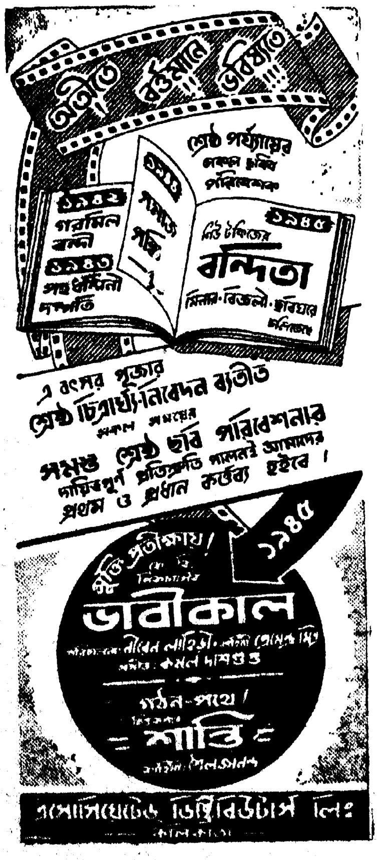
—হবে—সেই রকমই হবে।

—আর দেখ, ভেবেছিলাম মন্দিরের সামনে যে খিলানের বারান্দা ওইখানেই শুধু মার্বেল দেব। তা না সামনের যে খোলা বারান্দা ভিজে রোয়াক ওটাতেও মার্বেল দেব। কি বল?

—হাঁ হুজুর। খুব ভাল হবে।

বর্ধমানের ওই গাঁয়েই হামিদন মরেছিল। বিশ্রী ঘা হয়ে মরেছিল হামিদন। হামিদনের দোষ নাই। সে ঘা তাকে ধরিয়েছিল জনাব। জনাবকে ধরিয়েছিল বর্ধমানের কামিন সৈরভী। ছিপ-ছিপে পাতলা চেহারা, কোঁকড়ানো চুল, ঢুল ঢুলে চোখ; ঠোঁট দুটো একটু উঁচু ছিল সৈরভীর; হাসলে দাঁতের সঙ্গে মাড়ি বেরিয়ে পড়ত। নেশা লাগত তাকে দেখে। কিন্তু বিষ ছিল তার মধ্যে। সেই জনাবের জীবনে প্রথম বিষ। জনাব নিজের চিকিৎসা করিয়েছিল। হামিদন লুকিয়েছিল প্রথমটা। তারপর যখন প্রকাশ করতে বাধ্য হল, তখন সে বর্ধমান ছেড়েছে। দূর পাড়া গাঁ থেকে চিকিৎসা ভাল হল না। মরে গেল হামিদন।

নসীব—নসীব জনাবের। হামিদন মরে গেল—মন খারাপ হয়ে গেল জনাবের। জমিদার বাড়ীর কাজ শেষ হতেই সে ফিরে এল এ গাঁয়ে। বাপজানও সেই সময় অসুখে পড়েছিল। বাপজান বললে, আর বিদেশে যাস না বাপ। যে কটা দিন আমি বাঁচি ইখানেই থাক। মাধববাবু বড়লোক হয়েছে। ইমারত করবে



অতীতে বর্ত্তমানে ভবিষ্যতে !!!
শ্রেষ্ঠ পর্য্যায়ের
১৯৪৪
সমাজে
১৯৪২
গরমিল
১৯৪৩
দম্পতি
১৯৪৫
নিউ টকিজের
বন্দিতা
মিনার·বিজলী·ছবিঘরে
এ বৎসর পূজার
শ্রেষ্ঠ চিত্রার্ঘ্য-নিবেদন ব্যতীত
সমস্ত শ্রেষ্ঠ ছবি পরিবেশনার
দায়িত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি পালনই আমাদের
প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হইবে।
মুক্তি প্রতীক্ষায়!
১৯৪৫
ভাবীকাল
গঠন-পথে!
শান্তি
এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ

অনেক। থাক এই খানেই। কাজকাম কর। সাদী নিকা কর।

জনাব থেকে গেল। নসীব জনাবের।

জনাব বেরিয়ে আসছিল শ্যামাদাসবাবুর ওখান থেকে। থমকে সে দাঁড়াল শ্যামাদাসবাবুর বৈঠকখানা থেকে বেরিয়েই পতিত জায়গাটায়—মন্দিরের সামনে।

মন্দিরের পিছনে পুকুর। পুকুরের ওপারে বোধ হয় চাঁদ উঠছে।

ওঃ—মন্দির যখন শেষ হবে, তখন এমন সময় কি বাহার দেবে?!

কে? কে উখানে? মন্দিরের সামনে উপরের দিকে মুখ করে কে দাঁড়িয়ে আছে? জনাব এগিয়ে গেল। সে বিস্মিত হয়ে গেল। শ্যামাদাসবাবু উপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। জনাবের বুঝতে দেরী হল না—বাবু অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মনে মনে মন্দিরটাকে ছকে দেখে নিচ্ছেন।

—হুজুর?

শ্যামাদাস চমকে উঠলেন।

—আজ্ঞে আমি জনাব। সেলাম। তা হলে যাই আমি।

—একে বলে, কাল থেকে জোর দিয়ে কাজ আরম্ভ কর। একে বলে—বড় হোক ছোট হোক তাড়াতাড়ি শেষ কর।

—যো হুকুম হুজুর।

জনাবও একবার আকাশের দিকে তাকালে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল গোটা মন্দিরটা।

* * *

মন্দিরের কাজ জোর চলছে। খাঁজে খাঁজে অল্প অল্প ভেঙে চারখানি দেওয়াল পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসছে, সঙ্গে সঙ্গে উপরের দিকে উঠে চলেছে। মন্দিরের চূড়ার মাঝখান ছাড়িয়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে। জনাব ভারার উপর দাঁড়িয়ে দেখে। হুই দেখা যাচ্ছে—তাদের পাড়ার মসজিদের মিনার। ও মিনারের আধখানা জনাবের হাতের গড়া। যে বৎসর সে ফিরল—সে সালটা পুরানো লোকের সবার মনে আছে। বড় ভূমিকম্প হয়েছিল। দু তিন বাঁশের উপরে বাঁধা ভারা যখন ঝড়ে দোলে, তখনই জনাবের সে দিনকার কথা মনে পড়ে। দুনিয়াটা দুলে গেল ঝড়বাজা ভারার মত। বড় বড় দালান ভেঙে পড়ল। ছাদে ফাট ধরল। সে ভূমিকম্পে ভেঙে গেল মসজিদের দক্ষিণ তরফের মিনার। এ গাঁয়ে তখন দালান কোথা? হরিশবাবুর দালান, এই শ্যামাদাসবাবুর দালান হয়েছে সবে। রামবাবুদের একতালা দালানটাকে সে ইমারতই বলে না। ইটার পাঁজা। পলেস্তারা নাই, পয়েন্টিং পর্যন্ত না। আরে, আসল মানুষের গাঁথনীটা তো হাড়ের: গাছের ভিতরটা তো কাঠ: হাড়ের কাঠামোর উপর মাংস লাগিয়ে পঙ্কের কামের পলেস্তারার মত চামড়া দিলে তবে না সে মানুষ, গাছের গায়ে বাকল না হলে কি সে গাছ? মোনা ধরেছে এর মধ্যে।

মিনারটির মাপ তার মনে আছে। তার ইচ্ছা ছিল মিনারটাকে আরও খানিকটা উঁচু করে সে তৈরী করে—কিন্তু তাহলে উত্তর তরফের মিনারটার সঙ্গে বেমানান হত। অনেক ভেবে তার মনে হয়েছিল, তাতেই বা ক্ষতি কি? এ দিকেরটা হোক না বড়। পাশাপাশি ছোট বড় তালগাছ দাঁড়িয়ে থাকে—সে কি খারাপ লাগে দেখতে। গড়তে পারলে বেমানানের মধ্যে এমন বাহার আনা যায়, সে একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারা যায়। ট্যারা কামিন টুনীর দিকে সব মাতালের মত চেয়ে থাকে অথচ ওটা কেউ ধরতে পারে না। মুস্কিল তো ওই, সমঝদার লোক মেলে না। বড় বড় ইঞ্জিনীয়ার হলে বুঝতে পারে। এখনকার লোকে বুঝতে পারে নাই তার কথা। সেই পুরানো মাপে উত্তরের মিনারের সঙ্গে জুড়ি মিলিয়েই গড়তে হয়েছিল তাকে। হায় আল্লা—নিজের বাড়ীর দিকে কেউ খেয়াল করে চেয়ে দেখে না? আপনার বাচ্চাদের বড় থেকে ছোট তক পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেখ দেখি!

আঃ। একটা ছোট্ট ইটের টুকরো লেগেছে জনাবের হাঁটুতে। কে? হুঁ! রসিদটা ছুঁড়েছে মতির গায়ে। দুটোতে চুলবুল করছে। গম্ভীরভাবে জনাব বললে—কাম কর রসিদ। কাম করে যা।

মসজিদের মিনারের চেয়ে মন্দির উঁচু হবে অনেক।

মাধববাবুর তিন তলা নয়া দালানটাই এখনকার সবচেয়ে উঁচু বাড়ী। তিন তলার ছাদের সিঁড়ির মাথাটা অনেক দূর থেকে দেখা যায়। ওইটাই এখানকার সবচেয়ে ভাল বাড়ী। কলকাতার মিস্ত্রী এসে ওর চারিপাশে নক্সা কেটে গিয়েছে, থামের মাথায় কার্ণিসে কারিগরি করে গিয়েছে। হাঁ সে লোকটা মিস্ত্রি একটা। বিলাইতী মাটি আর বালিতে কার্ণিসের মাথা জমিয়ে কেটে কেটে বার করত নক্সা। দুই হাতে সাদা ফুল। ঠোঁটে গালে সাদা ফুল—খাটো মানুষটা পাজামা পরত, মাথায় দিত মখমলের কালো টুপি, গায়ে রঙীন কামিজ। নক্সায় মিস্ত্রি ভাল। কিন্ত ছাদ খিলানের কিছু জানে না। সে ছাদ খিলানে এই জনাব আলী সেখ!

এখানকার ওই পুরানো কয়টা মন্দির—মসজিদের গম্বুজ খিলান ছাড়া তামাম ছাদে জনাবের কর্ণির দাগ আছে। ভূমিকম্পে সব ছাদে ফাট ধরেছিল, জনাব কতক তার তুলে ফেলে নতুন তৈরী করেছে। কতক—যে সব ফাট অল্প স্বল্প—সে সব বহুৎ হুঁসিয়ারির সঙ্গে মেরামত করে জোড় মিলিয়ে দিয়েছে। বেমালুম জমে ফের এক হয়ে গিয়েছে। বড় বড় সার্জন ডাক্তার ভাঙ্গা হাড় কাটা অঙ্গ জুড়ে দেয়—এমন জুড়ে দেয় যে একটু দাগ ছাড়া কিছু বুঝতে পারা যায় না, তাও কাটা চামড়া সেলাই করলে, তবে দাগটা থাকে, নইলে বেমালুম জুড়ে যায়, শুধু জুড়েই যায় না—ঠিক সহজ শরীরের মত জোরালো হয়। জনাবের ছাদ জোড়ার কেরামতিও ঠিক তেমনি। এক ফোঁটা জল পড়ে না আজও।

শ্যামাদাসবাবু ডাকলেন নিচে থেকে—জনাব।

—বাবু!

—ঝিনুক তা হলে কিনতে আরম্ভ করি। এনেছে আজ ক'জন।

—হাঁ হুজুর। উয়াতে আর কথা কি।

পঙ্ক চূণ তৈরী হবে। মন্দিরের একদম মাথার অংশটা পঙ্ক চূণে পলেস্তারা হবে—মাজাই হবে। নেশা ধরেছে শ্যামাদাসবাবুর।

চার দেওয়ালের উপর 'পারা লেবেল' বসিয়ে দেখলে জনাব, মাঝখানে চার কোণায়—বসিয়ে দেখে নিলে, ঠিক আছে, ঠিক মাঝখানটিতে মুক্তার দানার মত টল টল করছে পারা।

—ঠিক হ্যায়, চালাও, হাত চালাও, হুঁস করে রসিদ—হুঁসিয়ারি করে কাম করবি।

ইটের উপর কর্ণির ঘা পড়ছে খন-খন-খন-খন। চূড়ার কাটান যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে, সেখানে লোহার কড়ি বেরিয়ে নিচের দাওয়ার কিনারায় গোল থামের মাথায় বসেছে। বরগা পড়েছে, তার উপর হচ্ছে ছাদ। কামিনের দল তালে তালে কোপা পিটছে, বাজনা বাজছে যেন। জনাব ভারা বেয়ে নেমে গেল ছাদে। মাটির বড় জালায় মসলা ভিজানো জল রয়েছে, জনাব নিজ হাতে মগে ভরে সেই জল ঢেলে দেয়। চালা দিদিরা—হাঁ। সমান জোরে। এক ঘা বেশী জোরে একঘা কম জোরে যেন না হয়। আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা!

যে দিকে, বারান্দার ছাদ পিটাচ্ছিল কামিনরা—তার বিপরীত দিকে গিয়ে জনাব দাঁড়াল। ডাকলে—ঠাকুরঝি ইদিকে ভাই শুন ত' একবার।

ঠাকুরঝি এখন প্রৌঢ়া—এককালে সে জনাবের পাশে থাকত, মতির এবং দাসীর মত। প্রৌঢ়া এসে দাঁড়ালো।

নিম্নস্বরে জনাব বললে—মতিটার সঙ্গে রসিদটার কান্ডটা কি রকম বল দেখি?

ঠাকুরঝি একটু বিরক্তি ভরেই বললে—মরণ—ওই আবার শুধাতে হয় না কি?

—হুঁ। জনাব উঠে চলে গেল।

ঠাকুরঝি আপন মনে বললে মরণ, বুড়ো বয়সে উদিকে চোখ কেনে?

জনাব কাজে লাগল। হঠাৎ বললে—উঁহু—ই হচ্ছে না। মতি তু নিচে ছাদের কাজে যা গো। এত উপরে ভারায় তু লারবি। হেই রাণী—তু উপরে উঠে আয় গো।

রাণী মধ্য বয়সী মেয়ে। সে সদ্য এ পথ থেকে খারিজ হয়েছিল।

মন্দিরের গাঁথনী শেষ করে জনাব দাঁড়াল মাথায় কলস বসাবার শিকটা ধরে।

শ্যামাদাসবাবু নিচে দাঁড়িয়ে দেখলেন—জনাবকে দেখাচ্ছে ঠিক তাঁর মত খাটো মাথার মানুষ। খুসী হয়ে উঠল তাঁর মন। তবু মনটা খুঁত খুঁত করে। অনেক টাকা বেশী খরচ হয়ে গেল। অনেক টাকা!

জনাব দেখছিল—গ্রামের ঘরবাড়ী গাছপালার মাথার উপর দিয়ে তার নজর চলেছে—ওই নয়াগাঁ—ওই বামনপাড়া—ওই দেবীপুর—ওই মাঠে চৌধুরী দীঘি—ওই নয়ানঝিলের মাঠ—ওই নদী কিনারের আঁকাবাঁকা জঙ্গল—ওই সরকারী পাকা সড়ক লাল ফিতার মত

চলে গিয়েছে—পুতুলের মত লোক চলছে—গাড়ী চলছে। বাহবা, বাহবা! বুড়ো বয়সের ছাতিও তার ফুলে উঠল।

এইবার পলেস্তারা, নক্সা, কার্ণিস, বিট, পাতলা ছুরির মত ধারালো মিহি কার্ণির কাজ। কাগজে পেন্সিল দিয়ে ছকে নিতে হবে নক্সা। দাদীর কনেকে যেমন টিপ দিয়ে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে সাজায়—তেমনি ক'রে সাজাবার পালা।

ভারা থেকে সে নেমে এল। শ্যামাদাসবাবুকে সেলাম করে বললে—সেলাম হুজুর—দেখে লেন কাম। ইঞ্জিনীয়ার নিয়ে এসে কাম দেখে লেন।

ঠাকুরঝিকে ডেকে বললে—শুন ইদিকে।

পকেট থেকে নীল কাগজে মোড়া দুটি সোনার কানের টাপ তাঁর হাতে দিয়ে বললে—মতিকে দিস। আর এই লে ভাই তুর। একটি টাকাও তার হাতে দিলে।

—মতিকে?

—হ্যাঁ। মন্দিল শেষ হ'ল। বকশিশ দিলাম নাতবউকে।

—কি বলব?

—আমি কিছু বলব না। সি তার যা খুসী হয় করবে।

ঠাকুরঝি যেতে-যেতে বললে—মরণ।

আজ মাসখানেক পরে জনাব সন্ধ্যায় হুকায় তামাক খেতে খেতে ভুতুড়ে বটগাছ তলায় গিয়ে বসে। এখান থেকে মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে, মসজিদের মিনার দেখা যাচ্ছে, বাবুদের চিলে-কোঠা দেখা যাচ্ছে। মাধববাবুর তে-তলার ঘরের সারি দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যে গাঢ় হয়ে এল। ইমারতগুলো আর দেখা যায় না। অন্ধকারের মধ্যে সাদা কিছু যেন নড়ছে জমীনের উপর। এগিয়ে আসছে।

* * * *

পলেস্তারা চলছে। হঠাৎ সেদিন জনাব এল না। শ্যামাদাসবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—কি হ'ল?

রসিদ হেসে বললে—ভীমরথি হয়েছে বুড়ার হুজুর। খারাপ ব্যামো হয়েছে।

—খারাপ ব্যামো? কি বিপদ! কি ব্যামো?

—ওই সব কামিনগুলোকে নিয়ে মাতামাতি করে হুজুর এই বুড়া বয়সে—। হাসলে রসিদ।

—রাম রাম রাম!

—কিছু ভাববেন না বাবু, আমরা কাম ঠিক বাজিয়ে দোব আপনার।

এই ব্যাধি জনাবের ছিল—প্রথম হয়েছিল বর্ধমানে। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ দেখা দেয়। আবার নতুন করেও হয়। জনাব যায় ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তার বলেন—কি জনাব? একটু হাসেনও সঙ্গে সঙ্গে।

জনাব সকলের সামনেই বলে—রোগের নাম। বলে—কাজকাম হাতে রয়েছে—জলদী সারিয়ে দিতে হবে। টাকা ধরে দেয় ডাক্তারের টেবিলের উপর।

আগে ইনজেকসন ছিল না। এখন ইনজেকসন উঠেছে। জনাব সব হাল হদিশ জানে। সকাল থেকে কোন কিছু না-খেয়ে খালি পেটেই এসেছে। সে তার মোটা মোটা শিরাওয়ালা হাত একখানা বাড়িয়ে দেয়; কনুয়ের ভাঁজের জায়গাটায় তাকিয়ে দেখে। ওইখানটার শিরাতেই ডাক্তার সুচ ফুটিয়ে দেবে। বহুত তারিফের হাত ডাক্তারবাবুর। পুট করে সুচটি ফুটিয়ে চালিয়ে দেবে শিরার মধ্যে। বহুৎ পাতলা হাত।

ইনজেকসন নিয়ে একটু বসে সে চলে যায় বাড়ী।

অদ্ভুত বাড়ী জনাবের। ভাঙা মাটির দেওয়ালের ঘর। সামনে এক পাকা বারান্দা। গোল থাম, পাকা ছাদ, পাকা মেঝে। সেই বারান্দার উপর বিছানা পেতে সে শুয়ে পড়ে। ইনজেকসনের পর জ্বর আসবে। বাড়ীতে কেউ নাই। হামিদনের মৃত্যুর পর সে আর নিকা ক'র নাই। ইচ্ছাই হয় নাই। কি করবে সে নিকা ক'রে? রঙ্গু, সৈরভী, হায়তন, রোশনী, টগরী বউ, সত্য ঠাকুরঝি, জুবেদা, রাণী সই, মতি নাতবউ, দাসী নাতনী—এদের নিয়ে দিন কাটছে তার, কি করবে সে নিকা করে? এক হামিদন এসেছিল তার জীবনে—সেও জানটাকে দিয়ে গেল গোনাহগারির মাশুল। আবার নিকা? নিকা করে সে মানুষটাকে কষ্ট দিয়ে কাজ কি? ওদের তো সে ছাড়তে পারবে না! সে জানে। অহরহ কাজ-কামের সময় যারা পাশে থাকে, হাতে হাত লাগে, চোখ চোখ রাখতে হয়, পায়ে ইট পড়লে আহা বলে, যাদের মাথার চুল মুখে এসে প'ড় ঝুঁকে ইট মসলা দেবার সময়, ভারার উপর কড়া রোদে মাথা ঘুরে গেলে যারা বাতাস দেয় আঁচল দিয়ে তাদের উপর দিল না পড়ে উপায় কি? এমন কোন রাজমিস্ত্রী সে তো দেখল না—যে এদের দিল না দিয়ে পারলে! তবে তারা বিয়ে করে। করুক—জনাব করে নাই।

সে জানে খোদাতায়লার দরবারে এটা তার 'গোনাহ'। তার এই পাপ—'জেনার' জন্য গোনাহের গোনাগারী তাকে দিতে হবে। দুনিয়ার মানুষ'ক সে দেখছে। ভালমানুষ আছে বইকি। এই দুনিয়ায় পয়গম্বর আসন—ইমানদার মানুষ আছেন—তাইতো দুনিয়া আজও আছে। নইলে দুনিয়া ফেটে চৌচির হয়ে যেত মানুষের পাপে। ও'রা বাদে বিলকুল মানুষ সুদ খাচ্ছে—ঘুষ নিচ্ছে, চুরি করছে—জেনা ব্যভিচার করছে। সে সুদ খায় না; ঘুষ নেয় না; চুরি করে না। দস্তুরী অবশ্য নিয়ে থাকে—সে মালিকে জানে—ঘুষ আর চুরি জানিয়ে করা হয় না। দস্তুরী দস্তুরী—সে তার পাওনা। সেও তার গোনাহ নয়। এক গোনাহ এই। সেই পাপের ভার আর বিয়ে করে সে বাড়াতে চায় না। স্ত্রী বর্তমানে এই অন্যায় আরও গোনাহ।

সে বলে—আল্লাহ তায়লা—খোদা তায়লা—মহম্মদ রসুল আল্লাহ! আমার এই গোনাহ-টুকু মাফ কিয়া যায় হুজুর!

অনেকক্ষণ পর সে আবার বলে—যদি গোনাহগার দিতে হয়—মাফ যদি নাই কর—সাজা দিয়ো তুমি।

জ্বরের ঘোর কমে আসে; জনাব উঠে বসে। দুটো ইনজেকসনেই জনাব তাজা হয়ে ওঠে। বাইরে থেকে রোগের লক্ষণ আর কিছু নাই। বাবরী চুল আঁচড়ে গামছায় মুখ মুছে ফতুয়া গায়ে দিয়ে চটী পায়ে সে এসে দাঁড়ালো মন্দিরের কাছে।

বুড়ো হয়েছে জনাব। রাগ যেন চট করে হয়ে যায়। রসিদকে সে সজোরে এক চড় মেরে বসল। বেইমান কোথাকার! সয়তান কোথাকার!

রসিদ হতভম্ভ হয়ে গেল। তারপর সে রুখে উঠল।

জনাব গর্জে উঠল—চিল্লাস না—ইখানে চিল্লাস না। গর্দানা ধরে নিকাল দিব। ইখানে চিল্লাস না। তুর বাপ সুদি কারবার করে—আমি টাকা ধারি না, তুর বাপের অনেক জমীন আছে—আমি কৃষাণ নই। তু ওই মতির সর্বনাশ করেছিস—নিজের বেমার উকে দিছিস। তুর নিজের জোয়ানী বয়েস, বেমার ধরিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছিস না। তোবা, তোবা। হারামী হারামী তুই। নিকাল হামারা হিয়াসে!

রসিদ তার যন্ত্রপাতি নিয়ে চলে গেল।

জনাব মতির কাছে এসে দাঁড়ালো। মতি ভয়ে কাঁপছিল। জনাব একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বললে—যা তুকে আর কিছু বুলব না। তুদের জাতটাই এমনি।

ছুটির সময় বললে—ডাক্তারকে আমি বুলে রেখেছি। যাস। ডাক্তার ফুঁড়ে ওষুদ দিয়ে দেবে। জ্বর আসবে—ইখানে শুয়ে থাকবি। ছুটি হলে বাড়ী যাবি। এই কাঁচা বয়েসে—এখন থেকে ঘুন ধরাস না শরীলে।

আব্দুল বললে যাবার সময়—রসিদকে মেরে ভাল কর নাই ওস্তাদ। ওর বাপ—।

জনাব হা-হা করে হাসলে। —কি করবে আমার?

রসিদ এবং রসিদের বাপ কিছু করতে পারত কি না ঠিক পরখ হল না। মাস দুয়েকের মধ্যে মন্দির শেষ হ'তেই জনাব চলে গেল এখান থেকে।

এ জেলার পাশেই জেলা সাঁওতাল পরগণা। সেখানে সাহেবান পাদরী বাবালোক—বড় আড্ডা করেছে। সাঁওতালদের কেরেস্তান ধর্ম দিয়েছে; লেংটীর বদলে পাতলুন পরিয়েছে, মেয়েরা ঘাঘরা পরে, বাবুলোকের মেয়েদের মত ভাল ভাল শাড়ী পরে জামা পরে, জুতা পরে, খোপা বাঁধে, লেখাপড়া শেখে। সেখানে এক বড় ভারী গির্জা হবে। বড় বড় খিলান—বহুৎ উঁচু চূড়া হবে, চাঁপার কলির মত গড়নের গোল চূড়া ক্রমশ সরু হয়ে উঠে মিলে যাবে সুচালো হয়ে। খিলান—গোল খিলান নয়—ঠিক ইস্কাপনের মাথার মত না হলেও—ঐ ধরণের মাথাটা হবে—একটি বাহারের কোণ তৈরী করে মিলবে।

জনাবকে খবর দিয়েছে তারাই এক জানা

ঠিকাদার। জনাবের খিলানের পাকা হাত সে জানে।

মতিবালা খবরটা শুনে কাঁদলে।

জনাব বললে—যাবি আমার সঙ্গে?

মতি চুপ ক'রে রইল। যেতে সে পারবে না।

জনাব নিজেই বললে—নাঃ। যেয়ে কাজ নাই তোর। ঘর থেকে পা বার করতে তোরা আর থামবি না। ভাগবি আমাকে ফেলে কারুর সঙ্গে। তা ছাড়া—মরেই যদি যাই আমি তো—তোর কি হবে?

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললে—আমি রসিদকে বলে যাব। ওই তোকে দেখবে। বুঝলি। হেসে আবারও বললে—আমি জানি তুর মনের আসল টানটা রসিদের উপর।

রসিদকে ডেকে বললে—গোসা রাখিস না ভাই। আমি চল্লাম। দেখিস—তু মতিকে দেখিস মেয়েটা ভাল।

গ্রাম থেকে বেরিয়ে একবার সে দাঁড়াল। পিছন ফিরে দেখলে। ওই মন্দির—মন্দিরের উপরের পঙ্কের পালিস বকের পালকের মত ঝলমল করছে—মাথার উপর পিতলের কলস ঝকমক করছে। ওই মসজিদের দক্ষিণ দিকের মিনার।

আবার সে ফিরল। সাঁওতাল পরগণায় লালমাটির টিলা, সেই টিলার উপর সাহেবান্দের গির্জা হবে। চাঁপার কলির মত গোল ক্রমশ সরু সুচালো হয়ে উঠবে গির্জার চূড়া।

* * *

শ্যামাদাসবাবুর মন্দির এবং জনাব নিয়ে গল্প শেষ হয়েছে। কিন্তু জনাবের কথা শেষ হয় নাই। সামান্য কয়েকটা কথা।

তিন বৎসর পর। জনাবের শেষ দশা। হয়তো আট দশটা দিন কি দু একটা মাস—কিম্বা মাত্র কয়েক ঘণ্টাও হতে পারে। সাঁওতাল পরগণা থেকে দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়ে সে ফিরে এসেছে। অনেক ব্যাধি—তার মধ্যে—পেটের অসুখটাই প্রধান। জীর্ণ শরীর, দেখলে চেনা যায় না, বাবরী চুল আছে কিন্তু তার অধিকাংশই উঠে গিয়েছে। নাকের হাড়টা খাঁড়ার মত উঁচু হয়ে উঠেছে; মোটা হাড়গুলি সার হয়েছে, হাতের আঙুল ঠক ঠক করে কাঁপে। জনাব—তবু সেই জনাব। ফিরে এল—সঙ্গে এক ওখানকার সাঁওতাল মেয়ে। বোধ হয় কেরেস্তান। ঘাঘরা না পরলেও—বেশ কায়দা ক'রে কাপড় পরে, চুল বাঁধে চমৎকার ছাঁদে। সাধারণ সাঁওতাল মেয়ের মত নয়। পুরানো লোকে বললে—তাজ্জব। একেবারে সেই রুগ্নুর মত্তো দেখতে।

মাসখানেক পর সে দিন—জনাব বসেছিল—সেই বুড়ো বটতলায়।

তার বাড়ী তিন বৎসর না ছাওয়ানোতে ভেঙে পড়ারই কথা। কিন্তু ভেঙে একেবারে সেখানে নতুন ঘর হয়েছে। জমিদারের বাকী খাজনার নালিশের নীলামে রসিদ আলির বাপ সেটা কিনে পুরানো ঘর ভেঙে নতুন ঘর তুলছে। রসিদ এখন ঠিকাদারী সুরু করেছে, তার চূণ, সিমেণ্ট আরও মালপত্র সেখানে থাকে। মতিবালা সেখানে বাঁধা কামিন এখন।

জনাব প্রথম দুটো দিন আব্দুলের বাড়ীর দাওয়াতে ছিল। দ্বিতীয় দিন রাত্রে দাওয়ার আশেপাশে লোক ঘুরতে দেখলে জনাব। সাঁওতাল মেয়েটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। জনাব তাকে আগলে জেগে বসে রইল। সকালে উঠে বাজারের ভিতর গিয়ে একটা ঘর ভাড়া করলে। হাজার হলেও বাজার, এখান থেকে একটা মানুষকে জোর করে তুলে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। জোরের কিন্তু দরকার হ'ল না, দিন বিশেক পরে মেয়েটাই চলে গেল—রসিদের আড়তে নয়—তার বাড়ীতে—রসিদ তাকে কলমা পরিয়ে নিকা করবে।

জনাব আব্দুলকে বললে—দুটো ক'রে রান্না ভাত আমাকে দিবি? পয়সা আমি দোব।

আব্দুল বললে—তুমি ওস্তাদ। তুমার কাছে কাম শিখেছি। এ আমার ভাগ্য। তুমি এইখানেই থাক। তবে পয়সা আমি লিব না।

খুসী হ'ল জনাব। আল্লাহতয়লার দুনিয়া। রসুলে আল্লা-হজরত মহম্মদ এসে দিয়ে গেলেন কোরাণ সরিফ, এ সব কি বরদাস্ত হতে পারে? ইমানদার মানুষ আছে বৈকি। সে বললে—বেশ তবে আমি মরে গেলে নিবি। আমাকে ওই বটতলায় একটা ছোট ঘর—চালা ঘর বানিয়ে দে। ওখানেই আমি থাকব।

—সে কি?

—হাঁ। চোখের উপর আমি দেখতে পারব না আব্দুল। তার চেয়ে নিরালায় বেশ থাকব আমি।

সে কিছুতেই তার গোঁ ছাড়লে না।

একটা চালাঘর।

সামনে কতকগুলো ইট। জনাব বসে মেঝেটা বাঁধিয়ে নেব। তারই কতকগুলো সে বিছিয়ে নিয়েছে বটতলায়, সেইখানে বসে থাকে।

আষাঢ় মাস। ঘনঘটায় মেঘ করে এসেছে, আকাশ যেন ভেঙে পড়বে। বৃষ্টি আসবে। জনাব উঠতে চেষ্টা করলে—পারলে না। আবার সে বসল। ওই চালা ঘরে গিয়েই বা কি হবে? এ জল আটকাবে না। জোর হাওয়া দিলে হয়তো ভেঙে চাপাই দেবে। আব্দুলের দাওয়াতে গেলেই বা কি হ'ত? আধখানা ভিজতে হ'ত। নিজের ঘর থাকলেও—ভাঙা চাল—দেওয়ালের ফাটলের ভিতর দিয়ে জল আসত। এ নয় তার চেয়ে কিছু বেশী।

ঘন কালো মেঘ। কাল রং মিশানো সিমেণ্ট করা মেঝের মত বাহার খুলেছে। বাহবা! বাহবা! ও কি মন্দিরটা নয়? কালো আকাশের গায়ে সোণার বরণ কলস—কয়েকটা দানাবাঁধা বিজলীর মত ঝকমক করছে, তার নিচে পঙ্কের পলেস্তারা করা দুধবরণ মন্দিরের মাথা! আহা-হা-হা! চোখ ফেরালে সে। আকাশ জোড়া কাল মেঘের পালিশের গায়ে হলুদবরণ ঘরে মাধববাবুর তেতলার ঘরের সারি। সোণার বরণ বহুড়ীরা জানালা ধরে দাঁড়িয়ে মেঘ দেখছে। নিচের তলায় বৈঠকখানা ঘরে বাবুরা মজলিশ করে বসে গরম চা খাচ্ছে। বাচ্চারা সব বারান্দায় ছুটাছুটি করছে। তার হাতে গড়া—তার হাতে গড়া ছাদ। কোন ডর নাই, যত জোরে আসুক বৃষ্টি এক ফোঁটা গলে পড়বে না। আনন্দ রহো, আরাম করো। আরও একটু দৃষ্টি ফিরিয়েই—ওই আর এক টুকরো দালান—কার চিলে কোঠা—কালো মেঘের গায়ে ভাসা বাড়ীর মত মনে হচ্ছে। কবুতরেরা কাকেরা পেঁচারা আলসের নিচের খোপে খোপে গিয়ে ঢুকেছে; গলা ফুলিয়ে চুপ করে সব বসে আছে। এ খোপ রাজ মিস্ত্রিরাই রাখে। থাকুন সুখে আরামে মৌজ করে মালিকরা ঘরের অন্দরে, পাখীরা থাকবে খোপরে-খোপরে। থাক তোরা আরামসে থাক। খোদাতয়লার কাছে কলকল করে বলিস—জনাব আলির জেনার গোনাহ যেন মাফ করেন! আর কোন গোনাহ তার নাই। আবার দৃষ্টি ফেরালে সে, এদিকে কোন কিছু দেখা যায় না। শুধু মেঘ—শুধু মেঘ। বাহারে! চমৎকার মেঘ তো এ দিকটার। সাদায় কালোয় যেন ভাঙা গড়া চলছে লহমায় লহমায়। ওই দিকটা দিয়েই সে সাঁওতাল পরগণা গিয়েছিল। বাঃ সাদা মেঘ ঠিক যেন গির্জার চূড়া হয়ে উঠেছে। চাঁপার কলির মত গোল মিনার ক্রমশঃ সরু সুচালো হয়ে মিশে গিয়েছে। দুনিয়ার সব দুঃখ সে ভুলে গেল। দৃষ্টি ফেরালে সে আবার।

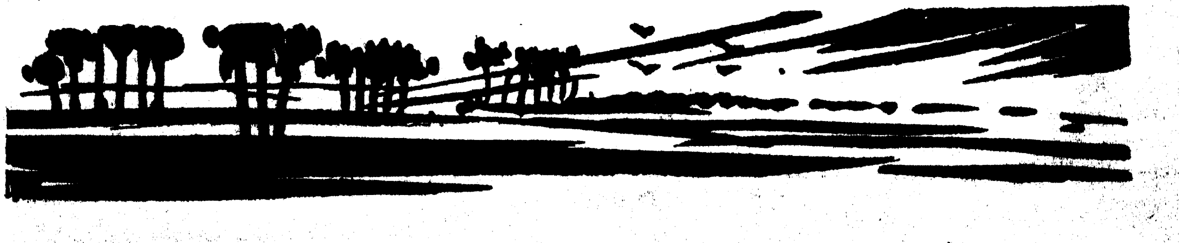
আঃ—ওই যে মসজিদ—ওই যে তার হাতে গড়া মিনার!

ঝপ ঝপ করে বৃষ্টি নেমে আসছে।

আসুক।

জনাব তাকলে মাথার উপরে—বুড়া বট-গাছের পাতায় পাতায় ঢাকা গেল গম্বুজের মত মাথার দিকে। খোদতায়লার নিজের হাতে গড়া ইমারৎ।

সব ঝাপসা হয়ে গিয়েছে—এইটুকু ছাড়া।





অধ্যাপক চারু চন্দ্র ভট্টাচার্য

আণবিক বোমার শক্তি

গত চৈত্র মাসে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে এই কথাগুলি ছিলঃ—

প্রকৃতির রাজ্যে আকাশে বিদ্যুতের শক্তি, সূর্যতাপের শক্তি দেখিয়া প্রাচীন মানব বিস্মিত হইয়াছিল। বর্তমান যুগে সে তড়িৎশক্তি সৃষ্টি করিল, বিবিধ রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে নব নব শক্তি আহরণ করিল, তাহার সৃষ্ট শক্তিকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া উহাকে নানা কাজে লাগাইল। কিন্তু এসব শক্তি ব্যতীত মানব তাহার হাতের মুঠার মধ্যে এমন শক্তির সন্ধান পাইয়াছে, যাহার প্রচণ্ডতা হয়ত একদিন পূর্বেকার সকল রকম শক্তিকে পরাভূত করিবে। এখানে হাতের মুঠার মধ্যে কথাটা রূপক ভাবে ব্যবহৃত হয় নাই; মুঠার মধ্যে যে অল্প একটু বাতাস রহিয়াছে, তাহারই মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি অন্তর্নিহিত আছে। বাতাসের প্রতি অণুর মধ্যে এই শক্তি লুক্কায়িত, পৃথিবীর প্রতি পদার্থের প্রতি পরমাণুর মধ্যে এই শক্তি অবরুদ্ধ। বিজ্ঞানী এ শক্তির সন্ধান পাইয়াছে, পরিচয় পাইয়াছে, তাহার পরিমাণ নিরূপণ করিয়াছে, তাহাকে মুক্ত করার সাফল্যে আনন্দলাভ করিয়াছে, কিন্তু কাজের দিক দিয়া সে এখনও একটুও অগ্রসর হইতে পারে নাই।

চৈত্র মাসের পর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়—এই তিন মাস গিয়াছে; ইহারই মধ্যে কাজের দিক দিয়া বিজ্ঞানী কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা শ্রাবণে প্রকাশিত এই কয়টি সংবাদ হইতে প্রতীয়মান হইবেঃ—

হিরোসিমাতে আণবিক বোমাবর্ষণে মুহূর্তের মধ্যে প্রায় ২ লক্ষ লোক নিহত হইয়াছে। চারিদিকে ১ মাইল দূর অবধি প্রত্যেক বাড়িটি ভূমিসাৎ হইয়াছে।

অন্যান্য সংবাদ এইরূপঃ—

নিউইয়র্ক, ১০ই আগস্ট—বিজ্ঞানীরা আণবিক বোমাবর্ষণের ফল সম্বন্ধে অদ্য বলিয়াছেন যে, আণবিক বোমা ফাটিলে সম্ভবতঃ দুই লক্ষ কোটি ডিগ্রি (সেন্টিগ্রেড) তাপের সৃষ্টি হয়। প্রাণীর রক্তমাংস ও অস্থির উপাদান কোটি কোটি পরমাণু বিস্ফোরিত হইয়া এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে দেহ ধ্বংস করে।

—ইউ, পি, এ

(আনন্দবাজার পত্রিকা—২৭ শ্রাবণ)

ম্যানিলা, ৯ই আগস্ট—হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ ডোনাল্ড লীট—যিনি আণবিক বোমা উদ্ভাবনে সাহায্য করিয়াছেন, তিনি অদ্য বলিয়াছেন যে, নিউমেক্সিকোতে আণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের সময়ে তীব্র আলোকচ্ছটায় ছয় মাইল দূরে এক ব্যক্তি অন্ধ হইয়াছে। তাহাকে বিস্ফোরণের সময়ে চাহিয়া থাকিতে নিষেধ করা হইয়াছিল; কিন্তু সে ঐ উপদেশ অনুসরণ করে নাই। ডাঃ লীট্ আরও বলেন, "বোমা বিস্ফোরণের সময়ে আমি ৫০ মাইল দূরে ছিলাম। বিস্ফোরণের ফলে সমগ্র চক্রবালরেখায় অগ্নিশিখা ব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং ৫০ মাইল দূরবর্তী হোটেল ভূমিকম্পের সময়ের ন্যায় কাঁপিয়াছিল।"

—রয়টার

(আনন্দবাজার পত্রিকা—২৭ শ্রাবণ)

"সায়েন্স-ফিক্সন" নামক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে—মিত্রপক্ষের আণবিক বোমা বিস্ফোরণে জাপানের সহস্রসমূহে পরমাণু হইতে নির্গত রশ্মির প্রভাবে আগামী পুরুষের জাপানীরা অদ্ভুত "অতিমানব" হইতে পারে। আণবিক বোমা বিস্ফোরিত হইলে উহা হইতে গামা-রশ্মি নির্গত হইয়া মানুষের জননেন্দ্রিয়ের কোষগুলির পরিবর্তন ঘটায়। ইহার ফলে তিন-চক্ষুবিশিষ্ট কিম্বা চক্ষুহীন, বাহুহীন কিম্বা বারটি বাহুবিশিষ্ট মানুষের এবং অন্যান্য প্রকার কিম্ভূতকিমাকার মানুষের উদ্ভব হইতে পারে; এমন কি দুই হৃৎপিণ্ডবিশিষ্ট মানুষেরও উদ্ভব হইতে পারে। —ইউ, পি, আমেরিকা।

(আনন্দবাজার পত্রিকা—২৭ শ্রাবণ)

"সায়েন্স-ফিক্সনে" প্রকাশিত এই সংবাদটি আপাততঃ 'ফিক্সন' পর্যায়ভুক্ত করিয়া রাখা যাক্। 'আপাততঃ' শব্দটি বলিয়া রাখা ভাল, কি জানি ভবিষ্যতে হয়ত দেখা যাইবে এক্ষেত্রেও Truth is stranger than fiction.

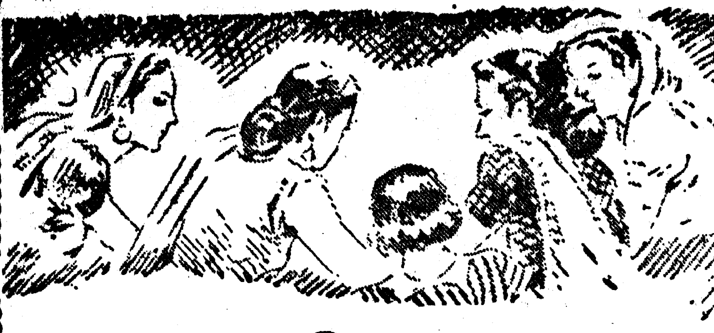
আণবিক বোমা নির্মাণের মূলে আছে দুইটি ব্যাপার,—প্রথম, পরমাণুর আভ্যন্তরিক শক্তি আবিষ্কার; আর দ্বিতীয়, সেই শক্তিকে কাজে লাগান। একটা কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন,—'আণবিক'-এর 'অণু' শব্দটি পরমাণুর অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে।

পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তির আলোচনা একটু গোড়া হইতে আরম্ভ করা যাক।

পদার্থের উপাদান

এই পৃথিবী এবং তাহার যাবতীয় পদার্থ, ঐ সূর্যগ্রহতারকা, ব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু ভৌতিক পদার্থ আছে, সবই পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। বিভিন্ন রকম মৌলিক পদার্থের সংখ্যা ৯২; এই ব্রহ্মাণ্ড ঐ ৯২টি রকমের পরমাণু লইয়া গঠিত। পরমাণুর মধ্যে হাইড্রোজেন সর্বাপেক্ষা হাল্কা, ইউরেনিয়ম সর্বাপেক্ষা ভারী। হিসাবে বাহির হইল একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন— ·000000, 000000, 000000, 000000 ১৭ গ্রাম।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ অবধি বিজ্ঞানীর নিকট বিভিন্ন রকমের পরমাণু





বিশ্বের মূল উপাদান বলিয়া পরিগণিত রহিল। তাহার পর বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নূতন যুগ দেখা দিল।

জে জে টম্‌সনের পরীক্ষায় এমন কিছু পাওয়া গেল, যাহা একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রায় দুই হাজার ভাগের এক ভাগ, যাহা সকল পরমাণু ভাঙিয়া পাওয়া যায় এবং যে পরমাণু হইতে পাওয়া যাক না কেন, যাহারা হুবহু সমান। ইহাদের নাম দেওয়া হইল ইলেকট্রন। একটি ইলেকট্রন নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত এবং উহার ভর (mass) একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের—প্রায় ১৮৪৬ ভাগের এক ভাগ মাত্র। এখন কথা হইল, একটি পরমাণু যখন তড়িৎশূন্য এবং পরমাণুর মধ্যে যখন বাস করে—ইলেকট্রন যাহা নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত, তখন পরমাণুর অপর একটি অংশ থাকা চাই যাহা পজিটিভ তড়িৎমণ্ডিত। রেডিয়ম বা ঐ জাতীয় তেজস্ক্রিয় (radio-active) পদার্থ হইতে যে আল্‌ফা-রশ্মি বাহির হয়, তাহা পজিটিভ তড়িৎযুক্ত হিলিয়ম পরমাণু; তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে যখন বাহির হয়, তখন ইহার বেগ সেকেণ্ডে ২০ হাজার মাইল বা ঐ ধরনের। রাদারফোর্ড পদার্থের মধ্য দিয়া আল্‌ফা-রশ্মির ছট্‌রা পাঠাইলেন এবং পরমাণুর ভিতর দিয়া যাইয়া যখন বাহির হইয়া আসে, তখন তাহাদের গতিপথ নির্ধারণ করিলেন। এই সব পরীক্ষা হইতে রাদারফোর্ড একটি পরমাণুর যে চিত্র আঁকিলেন তাহা এইরূপ। পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে পজিটিভ তড়িৎ অবস্থিত: পরমাণুর গঠন এইরূপ। এই পরমাণুর বাহিরে আছে একটিমাত্র ইলেকট্রন, আর বাকি সবটাই কেন্দ্র অবস্থিত; কেন্দ্রস্থ বস্তু পজিটিভ তড়িৎযুক্ত এবং এই তড়িতের পরিমাণ একটি ইলেকট্রনের তড়িতের সমান। এই কেন্দ্রক (nucleus)-এর নাম দেওয়া হইল প্রোটন। সুতরাং কল্পনায় দাঁড়াইল যে, একটি হাইড্রোজেন পরমাণু একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রনের সমষ্টিমাত্র, আর কিছু ইহাতে নাই। অপেক্ষাকৃত ভারী পরমাণুতে ইলেকট্রনের ও প্রোটনের সংখ্যা বাড়িয়া চলে, এই মাত্র। কিভাবে বাড়িয়া চলে পরে দেখা যাইতেছে।

বিশ্বের মূল বস্তু হইল ৯২ রকমের বিভিন্ন পরমাণু—বিজ্ঞানীর এ ধারণা এখন ধূলিসাৎ হইল। এখন দাঁড়াইল এই যে, আমাদের দৃষ্টির গোচর এবং অগোচর সকল বস্তুর মূলে, এই পৃথিবীর মূলে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মূলে আছে মাত্র দুইটি বস্তু—এক নেগেটিভ-তড়িৎযুক্ত ইলেকট্রন এবং আর এক পজিটিভ-তড়িৎযুক্ত প্রোটন—মাত্র এই দুইটি, আর কিছু নয়।

বিজ্ঞানীর পরীক্ষা চলিতে লাগিল। বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল হিসাবে শেষঅবধি আরও কয়েকটি মূল বস্তু আসিতে লাগিল যাহাদের কথা পূর্বে কেহ কোন দিন কল্পনাতেও আনিতে পারে নাই, কিন্তু যাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রহিল না। ইহাদিগকেও বিশ্বের মূল উপাদান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইল।

১৯৩২ সালের প্রথম ভাগে স্যাড্‌উইক বলিলেন যে, পরীক্ষায় তিনি এমন একটি পদার্থের অস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়াছেন যাহার ভর প্রোটনের মতই, কিন্তু যাহা আদৌ তড়িৎযুক্ত নয়। ইহার নাম দেওয়া হইল নিউট্রন। আণবিক বোমা সম্পর্কে বিশ্বের এই নবাবিষ্কৃত উপাদান নিউট্রন ও তাহার গুণাবলীর কথা বিশেষভাবে স্মরণে রাখিতে হইবে। একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রনের সমাবেশে একটি নিউট্রন গঠিত, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইল। কিন্তু একটি হাইড্রোজেন-পরমাণু তো এইরূপই। ঠিক বটে, তবে একটা পার্থক্য এই হইল যে, নিউট্রনে প্রোটন ও ইলেকট্রন খুব বেশী নিকটবর্তী হইয়া আছে—হাইড্রোজেন পরমাণুতে উহাদের মধ্যে যে ব্যবধান, এখানে ব্যবধান তাহার লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র। একটি পরমাণুর আকারের অনুপাতে নিউট্রন অতি ক্ষুদ্র হওয়ায় ইহা স্বচ্ছন্দে পরমাণুর মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতে পারে। এই কারণে কোন আধারের মধ্যে,—তা সে আধার ইস্পাতের হোক বা সোনার হোক—উহাকে ধরিয়া রাখা যায় না। দেখা গেল,—যেখানে একটি নির্দিষ্ট বেগের প্রোটন বায়ুর মধ্যে চলিয়া মাত্র এক ফুট যাইয়া থামিয়া পড়িবে, এই নিউট্রন সেখানে কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তবে তাহার বেগ হারাইবে।

পজিট্রন ও মিসোট্রন (বা মিসন) নামক আরও দুইটি মূল পদার্থের সন্ধান মিলিল, কিন্তু উহাদের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

পরমাণুর গঠন

প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে মোস্‌লে নামে এক তরুণ বিজ্ঞানী বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যে এক শৃঙ্খলা লক্ষ্য করেন। মৌলিক পদার্থগুলিকে আণবিক ওজন অনুসারে সাজানো হইল। অক্সিজেনের আণবিক ওজন ১৬, এই অনুপাতে হাইড্রোজেনের আণবিক ওজন ১·০০৮, হিলিয়মের ৪, লিথিয়মের ৬·৯৪, বেরিলিয়মের ৯·১, এই রকম বরাবর গিয়া ২৩৮·২ আণবিক ওজনযুক্ত ইউরেনিয়মে শেষ হইল। দেখা গেল যে, পরপর মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে আণবিক ওজনের ব্যবধানের কোন স্থিরতা নাই, কোথাও ইহা একেরও কম, কোথাও চারেরও বেশী। মোস্‌লে বিভিন্ন পরমাণুগুলিকে আণবিক ওজন অনুসারে সাজাইলেন, সাজাইয়া তাহাদিগকে ক্রমিক সংখ্যা দিলেন। হাইড্রোজেনের সংখ্যা হইল ১, হিলিয়ম ২, লিথিয়ম ৩, বেরিলিয়ম ৪, বরাবর যাইয়া ইউরেনিয়মের সংখ্যা পড়িল ৯২। মোস্‌লের বিভিন্ন পরীক্ষা হইতে একটা কথা আসিল যে, আণবিক ওজনের পার্থক্যের তারতম্য থাকিলেও আণবিক গুরুত্ব অনুসারে সাজানো পরমাণুর অভ্যন্তরে এমন কিছু আছে যাহা ধাপে ধাপে সর্বত্র সমান হারে বাড়িয়া চলিতেছে। কিন্তু কি সে, যাহা সমানভাবে বাড়িয়া যাইতেছে? অভ্যন্তরস্থ তড়িৎ কি?

এই সময় রাদারফোর্ডের পরীক্ষা চলিতেছিল। কেন্দ্রে অবস্থিত পজিটিভ-তড়িৎযুক্ত প্রোটনের সন্ধান মিলিল। তখন বিভিন্ন আণবিক সংখ্যার পরমাণুর গঠনপ্রণালী কল্পিত হইল। নিউট্রন আবিষ্কারের পর কেন্দ্রকের গঠন সম্বন্ধে এই কল্পনার কিছু পরিবর্তন করিতে হইল। সাধারণভাবে, একটি পরমাণুর কেন্দ্রে আছে প্রোটন ও নিউট্রন আর বাহিরে আছে ইলেকট্রন—পরমাণুর আণবিক সংখ্যা যত, বাহিরের এই ইলেকট্রনের সংখ্যা তত। হাইড্রোজেনের বাহিরে আছে একটি ইলেকট্রন, ইহার কেন্দ্রে আছে একটি প্রোটন, এখানে কোন নিউট্রন নাই। ২ আণবিক সংখ্যক হিলিয়মের বাহিরে আছে ২টি ইলেকট্রন, আর কেন্দ্রে আছে ২টি নিউট্রন ও ২টি প্রোটন। এইরূপ বরাবর চলিয়া গিয়াছে। কোন পরমাণুর ভর নির্ভর করে কেন্দ্রে কত নিউট্রন-প্রোটন আছে তাহার উপর এবং উহার রাসায়নিক ধর্ম নির্ভর করে বাহিরে কত ইলেকট্রন এবং কেন্দ্রে কত প্রোটন আছে তাহার উপর।

আইসোটোপ

তখন ইলেকট্রন আবিষ্কৃত হয় নাই, প্রায় বায়ুশূন্য নলের মধ্যে তড়িৎমোক্ষণ পাঠাইয়া এবং ক্যাথোড একটি সরু ছিদ্র করিয়া ১৮৮৬ সালে গোল্ড্‌স্টীন দেখিলেন যে, যেদিকে ক্যাথোড রশ্মি ছুটিয়া চলে তাহার বিপরীত দিকে কিছুদূর অবধি আলোকিত হইতেছে। ইলেকট্রন আবিষ্কৃত হইবার পর ইহার সঠিক কারণ জানা গেল। অভ্যন্তরস্থ গ্যাসের পরমাণু হইতে ইলেকট্রন বিচ্যুত হইল: ইলেকট্রন নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত, সুতরাং ইলেকট্রন বাহির হইবার পর পরমাণুটি পজিটিভ তড়িৎযুক্ত হইল, ইহাও ছুটিতে লাগিল, কিন্তু বিপরীত তড়িৎযুক্ত বলিয়া ইলেকট্রনেরা যেদিকে ছুটে ইহারা তাহার বিপরীত দিকে ছুটিল। নিয়ন গ্যাস লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে জে, জে, টমসন দেখিলেন যে ফটোগ্রাফি কাঁচে দুইটি রেখা পড়িয়াছে; নিয়ন গ্যাসের আণবিক ওজন ২০ হইলে যেখানে রেখা পড়া উচিত একটা সেখানে, আর একটা এমন স্থানে যাহা হইতে হিসবে আসে নিয়নের আণবিক ওজন ২২।

জে, জে, টমসন নির্মিত যন্ত্রের ত্রুটি ছিল এই যে, রেখাচিত্র খুব স্পষ্ট ছিল না, সূক্ষ্ম মাপজোক সম্ভব হইত না। ১৯১৯ সালে অ্যাসটন এই যন্ত্রের সম্যক উন্নতিসাধন করিলেন। বিভিন্ন পদার্থ লইয়া পরীক্ষা

চলিল এবং সেই সব পরীক্ষার ফলাফল বিজ্ঞানীদের বিস্মিত করিল। একটি মৌলিক পদার্থের সব পরমাণুগুলি হুবহু সমান, ড্যালটনের এ উক্তি শতবর্ষ ধরিয়া বিজ্ঞানী মানিয়া আসিতেছিলেন; সে সিদ্ধান্ত ধূলিসাৎ হইল। দেখা গেল, নিয়ন গ্যাস দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন আণবিক ওজনের পরমাণুর সমষ্টি—একটির আণবিক ওজন ২০, আর একটির ২২। বহু মৌলিক পদার্থ লইয়া পরীক্ষা চলিতে লাগিল; অনেক স্থলেই দেখা গেল, এক আণবিক সংখ্যার পরমাণু দুই বা ততোধিক বিভিন্ন আণবিক ওজনের পরমাণুর মিশ্রণ। ইহাদের নাম দেওয়া হইল আইসোটোপ। পরীক্ষা চলিতে লাগিল। বিশ্বে ৯২টি মৌলিক পদার্থ আছে, কিন্তু ইহাদের অন্যূন ৩৮০ আইসোটোপের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

১৯৩২ সালে বর্ণালীতে প্রথম ধরা পড়িল যে, ১ আণবিক ওজন হাইড্রোজেনের এক জুড়িদার—এক আইসোটোপ আছে, তাহার আণবিক ওজন ২। অ্যাসটনের যন্ত্র তখন অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছে; তাহাতেও ইহা সমর্থিত হইল। এখন ১ আণবিক ওজনের হাইড্রোজেনের পরিবর্তে যদি ২ আণবিক ওজনের হাইড্রোজেন লওয়া হয়, তবে অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া যে 'ভারিজল' হইবে তাহার গুণাবলী নিশ্চয়ই সাধারণ জলের গুণাবলী হইতে পৃথক হইবে। আমেরিকার বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত বেশী শক্তির, প্রায় ৪।৫ শত অ্যাম্পিয়ারের, তড়িৎস্রোত জলের মধ্যে পাঠাইয়া 'ভারি জল'কে সাধারণ জল হইতে পৃথক করিলেন। ১ আণবিক ওজন হাইড্রোজেনের কেন্দ্রস্থ ভরকে প্রোটন বলা হইয়াছিল; ২ আণবিক ওজনের হাইড্রোজেনের কেন্দ্রস্থ ভরকে ডয়টেরন বলা হইল। ভবিষ্যতে বিজ্ঞানী ইহাকে পরমাণু ভাঙিবার এক শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিলেন।

ইউরেনিয়মের আণবিক ওজন ২৩৮, কিন্তু ইহার সহিত মিশ্রিত ২৩৫ আণবিক ওজনের ইউরেনিয়মের সন্ধান মিলিল। পরিমাণে ইহা খুবই অল্প, সমস্ত ইউরেনিয়মের ১৪০ ভাগের এক ভাগ মাত্র। আণবিক বোমা নির্মাণে ইউরেনিয়মের এই আইসোটোপের কথা মনে রাখিতে হইবে।

পদার্থ ও শক্তি

পদার্থ অবিনশ্বর, ইহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই; বহুপূর্বে হইতে বিজ্ঞান এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিল এবং ইহার উপর সে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। আইনষ্টাইন বলিলেন, কথাটার একটু পরিবর্তন আবশ্যক। তিনি বলিলেন যে, পদার্থকে শক্তিকে রূপান্তরিত করা যায়; কতটুকু পদার্থের বিলোপে কতটা পরিমাণ শক্তির উদ্ভব হইবে, আইনষ্টাইন তাহারও একটা হিসাব দিলেন।

এক পরমাণুকে অন্য পরমাণুতে পরিবর্তিত করিলে কিছু পরিমাণ পদার্থের লোপ হয়—শক্তির উদ্ভব হয়। প্রচণ্ড এ শক্তি! এডিংটন হিসাবে দেখাইয়াছেন যে, সূর্যের অভ্যন্তরস্থ হাইড্রোজেনের শতকরা দশ ভাগ যদি হিলিয়মে রূপান্তরিত হয়, তবে তজ্জনিত ভরের বিলোপসাধনে যে শক্তির উদ্ভব হইবে, তাহা সূর্যের বর্তমান তেজকে প্রায় দশ কোটি বৎসর বজায় রাখিতে পারিবে।

পরমাণুকে রূপান্তরিত করা কাজটি অসাধ্য বলিয়া মনে করা হইত। এই পরিবর্তনের জন্য পরমাণুর কেন্দ্রক ভাঙিতে হইবে, আর কেন্দ্রক ভাঙা সহজ নয়। যদি সহজ হইত তবে সোনা চিরদিনই সোনা এবং লোহা চিরদিনই লোহা থাকিত না।

কিন্তু বিজ্ঞানী নিশ্চেষ্ট রহিলেন না; পরমাণুর কেন্দ্রক ভাঙিয়া উহাকে রূপান্তরিত করার কাজে অগ্রসর হইলেন।

পদার্থের রূপান্তর

বিজ্ঞানী অতিশয় ক্ষুদ্র অথচ প্রভূত বলশালী পদার্থকে কেন্দ্রকের অভিমুখে পাঠাইবার কল্পনা করিলেন। তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে নির্গত আলফা-রশ্মি এইরূপ একটি ছট্‌রা; ইহা ছোট, হিলিয়মের কেন্দ্রস্থ বস্তু, এবং রেডিয়ম-C হইতে বহির্গত আলফা-রশ্মির বেগ প্রচণ্ড। তবে অসুবিধা এই, অনেকগুলি ছট্‌রা ছাড়িলে একটি হয়ত কেন্দ্রককে আঘাত করিবে। ১৯১৯ সালে এইরূপ পরীক্ষায় রাদারফোর্ড নাইট্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রক ভাঙিলেন। বাহির হইতে শক্তি প্রয়োগ করিয়া এই প্রথম পরমাণু ভাঙা হইল। নাইট্রোজেন ছাড়া অন্য পরমাণুও ভাঙা চলিল।

এ সবই ভাঙা হইল রেডিয়ম হইতে নির্গত আলফা-রশ্মির সাহায্যে। কিন্তু কথাটা হইল এই, পৃথিবীতে রেডিয়ম আছে কতটুকু, আর উহা হইতে আলফা-রশ্মি বাহির হইতেছে—কত-ই না অল্প পরিমাণে! ১৯৩২ সালে এপ্রিল মাসে ক্যাভেণ্ডিশ পরীক্ষাগারে কক্‌ক্রফ্‌ট ও ওয়ালটন প্রোটনকে প্রায় ৮ লক্ষ বিভব (potential)-এ তড়িৎ দ্বারা বেগযুক্ত করিলেন। ঐ প্রোটন লিথিয়ম পরমাণুর কেন্দ্রে গিয়া প্রচণ্ডভাবে আঘাত করিল। একটি লিথিয়ম পরমাণু দুইটি হিলিয়ম পরমাণুতে রূপান্তরিত হইল। এই পরীক্ষার আর একটি ব্যাপারে বিজ্ঞানী অতিমাত্রায় চমৎকৃত হইলেন। লিথিয়মের উপর যখন প্রোটন আসিল তখন সমবেত ভর হইল ৮·০২৬১; উহারা দুইটি হিলিয়ম পরমাণুতে পরিবর্তিত হইল; এই দুইটি হিলিয়ম পরমাণুর ভর ৮·০০৭৮। ·০১৮৯ ভর গেল কোথায়? লোপ পাইল, শক্তি উদ্ভূত হইল! আইনষ্টাইনের হিসাবে দাঁড়ায় ১৬৪০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ মাত্রা শক্তি। পরীক্ষায় দেখা গেল হিলিয়ম পরমাণু দুইটি জন্মগ্রহণ করিয়া ঠিক ঐ পরিমাণ শক্তি লইয়া দুই দিকে ছুটিল।

কক্‌ক্রফ্‌ট ও ওয়ালটনের পরীক্ষায় প্রোটন ব্যবহৃত হইয়াছিল, কিন্তু যখন দেখা গেল যে, ডয়টেরনের ভর প্রোটনের দ্বিগুণ তখন ডয়টেরনও ব্যবহৃত হইতে লাগিল। নিউট্রন আবিষ্কারের পর উহাও ছোঁড়া হইল। শেষ অবধি পরমাণু ধ্বংসের জন্য ছট্‌রা হিসাবে চারিটি পদার্থ ব্যবহৃত হইল—আলফা-রশ্মি, প্রোটন, ডয়টেরন ও নিউট্রন। ইহাদের মধ্যে প্রোটন ও ডয়টেরনকে বেগযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিতে হইবে। বেগযুক্ত করিবার জন্য যে সকল ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইল তাহাদের মধ্যে লরেন্সের সাইক্লোট্রোন শীর্ষস্থান অধিকার করিল। আলফা-রশ্মি ও নিউট্রনকে যন্ত্র সাহায্যে বেগবান করিবার প্রয়োজন নাই, ইহারা স্বতঃই প্রচণ্ডবেগে বাহির হইয়া আসে। যাহা হোক, এই সময়ের মধ্যে যে কোন ছট্‌রা কোন পরমাণু কেন্দ্রকে আঘাত করিলে সেই পরমাণুর যে রূপান্তর ঘটিবে তজ্জন্য প্রচুর শক্তি জন্মিবে। কিন্তু ব্যাপারটা সেরূপ সহজ হইয়া দাঁড়াইল না। এলোপাতাড়ি অনেক ছট্‌রা ছাড়িতে হইবে; তাহার জন্য বিপুল অর্থব্যয় আছে। এই সকল ছটরার দুই একটি মাত্র কেন্দ্রককে আঘাত করিবে, অবশিষ্ট শক্তির সম্পূর্ণ লোকসান। এপর্যন্ত দেখা গেল যে, এইসব প্রক্রিয়ায় খরচ বেশী জমা কম। কখনও খরচকে ছাড়াইয়া জমার অঙ্ক ভারি হইবে কিনা বিজ্ঞানী সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে সন্দিহান রহিলেন।

তবে বিজ্ঞানী তাহার কল্পনাস্রোত ছাড়িয়া দিলেন। পদার্থের বিলোপসাধনে মানব কি পরিমাণ শক্তির অধিকারী হইবে মানসচক্ষে তিনি তাহা দেখিলেন। চৈত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করা যাইতেছে। বিজ্ঞানী দেখিলেন, এই শক্তির অধিকারী হইলে মানব অর্ধ পৃথিবীব্যাপী রাত্রিকে দিন করিতে পারিবে, শৈত্যপ্রধান দেশসমূহকে উষ্ণ করিতে পারিবে, বৃহৎ ভূমিখণ্ডকে অত্যধিক উষ্ণ করিয়া কৃত্রিম ঝড়ের সৃষ্টি করিতে পারিবে। বৃহত্তম এবং সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ষ্টীমার 'কুইনমেরী' ১৯৩৬ সালে তাহার প্রথম যাত্রা আরম্ভ করে; তাহাকে চালাইবার জন্য চারিটি এঞ্জিন ছিল, প্রত্যেকটি ৫০ হাজার ঘোটক শক্তির; যাত্রার সময় সে ৭৫ হাজার গ্যালন তেল লইয়াছিল। বিজ্ঞানী হিসাবে দেখিলেন যে, অত কিছু না করিয়া মাত্র ২ আউন্স পদার্থের ধ্বংসে পৃথিবীর ঐ বৃহত্তম ষ্টীমারকে এক বৎসর ধরিয়া ঐ বেগে চালনা করিতে পারা যাইবে।

বিজ্ঞানীর তখন যেটা স্বপ্ন ছিল, সাধারণ লোক তখন সেটাকে কি ভাবে লইয়াছিল,

তাহা এই কয়েকখানি চিঠিপত্র হইতে প্রতীয়মান হইবে। এক খ্যাতনামা বিজ্ঞানীকে পত্রগুলি লেখা হইয়াছিল—

প্রথম পত্র

প্রিয় মহাশয়,

অনুগ্রহ করিয়া পরমাণু ভাঙিবেন না। আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। দোহাই আপনার, সব যেমন আছে তেমনি থাকুক।

ভীত এক ব্যক্তি

দ্বিতীয় পত্র

শুনিলাম আপনি স্থির করিয়াছেন যে, আগামী বুধবার পৃথিবী উড়াইয়া দিবেন। অনুগ্রহ করিয়া ওটা বুধবার না করিয়া পরের রবিবার করিবেন, কারণ তাহার মধ্যে আমরা আট দিনের ছুটি এবং সেপ্টেম্বর মাসের মাহিনা পাইব। আশা করি আমার এ প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন।

তৃতীয় পত্র

শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম যে, আপনি আপনার পরীক্ষা করিতে কৃতসংকল্প। আপনি যে মনুষ্যজাতির ধ্বংসে উদ্যত হইয়াছেন, জিজ্ঞাসা করি, আপনার কি স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নাই? কিন্তু যাহাদের আছে, তাহাদের প্রতি আপনি কি নিষ্ঠুর! ভগবান আপনার উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করুন।

এইসব পত্র পড়িয়া সেদিন বিজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই হাসিয়াছিলেন। কিন্তু আজ হয়ত পত্রলেখকেরা বলিতেছে—দেখা যাক, শেষ অবধি কে হাসে! প্রত্যুত্তরে বিজ্ঞানীরা বলিতে পারে—বাপু হে, সেদিন যদি আসে, তবে হাসবার সময়টুকু যে পাবে না!

আণবিক বোমার গঠন ও ক্রিয়া

আল্‌ফা-রশ্মি, প্রোটন, ডয়টেরন বা নিউট্রন সাহায্যে পরমাণুর কেন্দ্রক ভাঙা যায়। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, এইরূপ ভাঙনের ফলে যে পরমাণু জন্মগ্রহণ করে তাহার আণবিক ওজন আঘাতপ্রাপ্ত পরমাণুর ওজন হইতে সামান্য একটু পৃথক হয়। কল্পনা করা হয় যে, কেন্দ্রকের বাহিরের গাত্রে অবস্থিত কোন ক্ষুদ্র কণিকা কতকটা শক্তিলাভ করিয়া ছুটিয়া বাহির হয়। কিন্তু একটি জলবিন্দুর কথা ধরা যাক। বাহিরের শক্তি পাইয়া ঐ জল-বিন্দুর গাত্রের একটি অণু ছুটিয়া বাহির হইতে পারে, ও আবার এমনও হয় যে জলবিন্দুটি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল-বিন্দুতে পরিণত হইল। কেন্দ্রক যখন আঘাত পায় তখন শুধু প্রথমটির ন্যায় ক্রিয়া কল্পিত হইতেছিল। দেখা গেল, দ্বিতীয়েরও অনুরূপ ব্যাপার ঘটিল, কেন্দ্রকটি দুই ভাগে বিভক্ত হইল। ইহা প্রধানতঃ ঘটিল যখন ইউরেনিয়মের ন্যায় ভারি অথচ কম মজবুত বস্তুকে নিউট্রন আঘাত করিল।

ইউরেনিয়ম সর্বাপেক্ষা ভারি পরমাণু, ইহার আণবিক সংখ্যা ৯২ এবং আণবিক ওজন ২৩৮। ইহা অপেক্ষা উচ্চ আণবিক সংখ্যক এবং বেশী ভারি পরমাণু পরীক্ষাগারে সৃষ্টি করা যায় কিনা ইটালী দেশের বিজ্ঞানী ফার্মি সে সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইউরেনিয়মকে নিউট্রন আঘাত করিল, ২৩৯ আণবিক ওজনের ইউরেনিয়ম-আইসোটোপ জন্মিল। উভয়ের আণবিক সংখ্যা ৯২। কিন্তু ইউরেনিয়মের এই আইসোটোপ হইতে ইলেকট্রন ক্ষরণ হইতে লাগিল, ফলে আণবিক ওজন ২৩৯ থাকিলেও উহার আণবিক সংখ্যা ১ বাড়িয়া ৯৩তে দাঁড়াইল, ৯২টি মৌলিক পদার্থের উপর যেন আর একটি নূতন মৌলিক পদার্থ সৃষ্ট হইল বলিয়া মনে হইল।

১৯৩৯ সালে বার্লিনের হান এবং স্ট্র্যাসম্যান বলিলেন যে, ফার্মির সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। তাঁহারা দেখিলেন, নিউট্রন ইউরেনিয়ম পরমাণুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাকে দুই টুকরায় ভাঙিয়া ফেলিল, একটি জলবিন্দু যেমন বিভক্ত হয়। একটুকরা হইল ৫৬ আণবিক সংখ্যক বেরিয়ম; অবশিষ্ট যাহা রহিল, তাহার আণবিক সংখ্যা দাঁড়াইল ৩৬, অর্থাৎ ক্রিপ্টন এবং উহা ভাঙিয়া প্রথম রুবিডিয়ম পরে ষ্ট্রনসিয়মে পরিণত হইল। আরও যে কয়েকজন বিজ্ঞানী এসম্বন্ধে পরীক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মেইটনার ও ইরীণ কুরির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুরির গবেষণা ইউরেনিয়ম-কেন্দ্রকের বিস্ফোরণ আবিষ্কারের শেষ ধাপ পর্যন্ত আসিয়া অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া যায়, নতুবা সম্ভবতঃ হান-এর পরিবর্তে তিনিই জয়মাল্যের অধিকারিনী হইতেন।

বিজ্ঞানী বোটে অঙ্ক কষিয়া দেখাইলেন যে, একটি ইউরেনিয়ম পরমাণু যখন দ্বিখণ্ডিত হইয়া বাহির হইয়া আসে, তখন খণ্ডিত বস্তু দুইটি ১৮ কোটি ভোল্ট শক্তি লইয়া পৃথক হয়। সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করিলে ব্যাপারটা এই দাঁড়ায় যে, আধ পাউণ্ড ইউরেনিয়ম হইতে যে শক্তি পাওয়া যায়, তাহা ৫০০ টন কয়লা পোড়ান শক্তির সমান।

জার্মাণীবাসী ইহুদী মহিলা বিজ্ঞানী মেইটনার এবিষয়ে অনেক গবেষণা করিলেন। মেইটনার তাঁহার নিজের ও হানের আবিষ্কারের কথা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফ্রিস্ককে জানান। ফ্রিস্ক কোপেনহেগেনে বোরের পরীক্ষাগারে এসম্বন্ধে অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন। মেইটনার ও ফ্রিস্ক শক্তি-মুক্ত হইবার যথার্থ কারণ নির্ধারণ করেন। বোরের পরীক্ষাগারে জাপানী বিজ্ঞানী নিশিনাও কাজ করেন। এইসব পরীক্ষা হইতে আর একটা বিষয় নিঃসংশয়ে জানা গেল যে, প্রতি ইউরেনিয়ম পরমাণু দ্বিখণ্ডিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিন চারিটি করিয়া নিউট্রন বাহির হয়।

বোর দেখাইলেন, ভাঙন ক্রিয়াটা হাজার গুণ সহজ হইয়া আসে যদি ২৩৫ আণবিক ওজনের ইউরেনিয়ম-আইসোটোপ ব্যবহার করা যায়। সেই ব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা চলিল।

মোটের উপর আণবিক বোমা বিস্ফোরণ প্রক্রিয়াটি কিরূপ দাঁড়াইল আর একবার দেখা যাক। বাহির হইতে নিউট্রন আসিল, কিন্তু একবার মাত্র; আসিয়া ২৩৫ ইউরেনিয়মের গায়ে আঘাত করিল; ইউরেনিয়ম পরমাণু ভাঙিল, ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে নূতন করিয়া নিউট্রন জন্মাইল, এই নিউট্রন অন্য ইউরেনিয়ম পরমাণু ভাঙিল, পুনরায় নিউট্রন পরমাণু জন্মিল, এইরূপে ইউরেনিয়মের সকল পরমাণু ফাটিল এবং মুহূর্ত মধ্যে এই ধ্বংসক্রিয়া সংসাধিত হইল। এ যেন কড়ায় অল্প একটু তেল দিয়া ইলিশ মাছ ছাড়িয়া দেওয়া হইল, তারপর মাছের তেলেই মাছ ভাজা চলিতে লাগিল।

বিস্ফোরণ ব্যাপারের 'সময়' একটি প্রয়োজনীয় কথা। একটি উদাহরণ হইতে ইহা বুঝা যাইবে। মনে করা যাক, একটি বড় পাত্রে প্রচুর কাঠকয়লা আছে; একখানি কয়লা ধরান হইল, ধিকিধিকি আগুন বিস্তৃতি লাভ করিল এবং হয়ত ৩।৪ ঘণ্টায় সমস্ত কয়লা পুড়িয়া ছাই হইল। পরিমাণে অনেক তাপ পাওয়া গেল, কিন্তু বহুক্ষণ ব্যাপিয়া সেই তাপ আসায় ঐ শক্তিকে বিশেষ কাজে লাগাইতে পারা গেল না। একটি বড় বোমা ফাটিলে হয়ত সেই পরিমাণই শক্তি পাওয়া যায়, কিন্তু এই বিস্ফোরণে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে, তাহা একটি সেকেণ্ডের ১০০০ ভাগের এক ভাগ মাত্র সময়ে শেষ হওয়া অসম্ভব নয়; উষ্ণতা প্রচণ্ড হয় এবং বোমার টুকরাগুলি সেকেণ্ডে ১০০।১৫০ মাইল বেগেও ছুটিয়া যাইতে পারে। আণবিক বোমারও যে পরিবর্তন হয়, তাহা সেকেণ্ডের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ বা আরও কম সময়ে ঘটিয়া থাকে, সুতরাং উদ্ভূত শক্তির প্রচণ্ডতা আরও ভীষণ। অভ্যন্তরস্থ গ্যাস বাহির হয় সেকেণ্ডে দশ হাজার মাইল এইরূপ বেগে, আর উষ্ণতা নক্ষত্রের উষ্ণতার সমান হওয়া আশ্চর্য নয়, অর্থাৎ বহু কোটি ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড।

শেষ অবধি একটি আণবিক বোমা নির্মাণে আমাদের চাই কি কি? চাই ইউরেনিয়ম; সাধারণ ইউরেনিয়ম নয়—২৩৫ আণবিক ওজনের যে ইউরেনিয়ম-আইসোটোপ সেই ইউরেনিয়ম। আর আরম্ভ করিবার জন্য প্রয়োজন কতকগুলি নিউট্রন। ব্যস্, আর কিছু নয়, তাহার পর নিউট্রন আপনি জন্মিতে থাকিবে এবং উহারাই কাজ করিয়া চলিবে। ব্যাপারটা তো খুবই সহজ বলিয়া

মনে হইতেছে, করিয়া ফেলিলেই তো হয়। কিন্তু এইটুকুর মধ্যেই কতগুলি গুরুতর সমস্যা আছে।

পিচ্‌ব্লেণ্ড নামক একটি খনিজ পদার্থ আছে। যতদূর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, পৃথিবীতে এই পিচ-ব্লেণ্ডের পরিমাণ খুব বেশী নয়। প্রথমে— উহাকে পাওয়া যায় জেকোশ্লোভাকিয়ায় জোয়াকিমস্থাল নামক প্রদেশে, পরে রাশিয়ায় উহা পাওয়া যায়, ইংলণ্ডেও কিছু কিছু মিলে এবং ভারতবর্ষে হাজারিবাগ, সিংভূম ও গয়া জিলাতে এবং দক্ষিণ ভারতে নেলোর ও ত্রিভাংকুরে উহার সন্ধান মিলিয়াছে। এখন পিচ-ব্লেণ্ডের উপর বহু রাসায়নিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করিলে সুবৃহৎ একখণ্ড পিচ্‌ব্লেণ্ড হইতে অল্প একটু ইউরেনিয়ম মিলিবে। কিন্তু এই ইউরেনিয়ম হইতে উহার ২৩৫ আণবিক ওজনের আইসোটোপকে পৃথক করিয়া ফেলিতে হইবে, উহাই কাজে লাগিবে। ইহার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিত হইবে? কোন পরমাণুর বিভিন্ন আইসোটোপকে পৃথক করা কার্যটি অতীব দুরূহ। কোনও রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলিবে না, কারণ কোন পরমাণুর বিভিন্ন আইসোটোপদের রাসায়নিক ধর্ম হুবহু এক। সাধারণভাবে কোন পরমাণুর আইসোটোপকে কি প্রণালীতে পৃথক করা যায়? অ্যাসটনের যন্ত্রে উহারা আলাদা হইয়া পড়ে, বিজ্ঞানী অন্যান্য পরিকল্পনাও করিয়াছিলেন। একটি এইরূপ। উত্তপ্ত হইলে পরমাণুগুলি ছুটাছুটি করে; ২৩৮ ইউরেনিয়ম যে বেগে ছুটিবে ২৩৫ ইউরেনিয়মের বেগ তদপেক্ষা বেশী হবে, সুতরাং এইবার সচ্ছিদ্র কোন কিছুর মধ্য দিয়া উভয়কে চালনা করিলে উহারা কিছু পরিমাণে পৃথক হইয়া যাইবে। তথ্যের দিক দিয়া সব প্রস্তাবই উত্তম; কিন্তু সুদীর্ঘকাল ব্যাপী কষ্টসাধ্য পরীক্ষার পরও যে অত্যল্প পরিমাণ পদার্থ পৃথক হইয়া আসে তাহাকে বিশেষ কোন কাজে লাগান যায় না। ১৯৪০ সালেও খবর এই যে, আমেরিকার বিজ্ঞানীরা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও এক পাউণ্ড ইউরেনিয়ম হইতে উহার দশ কোটি ভাগের এক ভাগের বেশী ২৩৫ ইউরেনিয়ম পৃথক করিতে পারে নাই। ১৯৪৫ সালে নিশ্চয়ই পারিয়াছেন, তবে কি উপায়ে জানা নাই।

এইবার এই ২৩৫ ইউরেনিয়মকে ধাক্কা খাওয়াইতে হইবে নিউট্রন দিয়া। নিউট্রনের কথা তো বারে বারেই বলা হইয়াছে, কিন্তু এই নিউট্রন প্রস্তুত করা যায় কিরূপে আর তৈয়ারি করিয়া ইহাকে রাখা যায়ই বা কোথায়? যে পাত্রেই রাখ না কেন, নিউট্রন ফুড়ুৎ করিয়া বাহির হইয়া যাইবে। সুতরাং ইউরেনিয়মকে ফাটাইতে যে নিউট্রন ছাড়িতে হইবে সে নিউট্রনকে সদ্য প্রস্তুত করিতে হইবে। নিউট্রনের প্রস্তুত প্রণালী কি?

রেডিয়ম হইতে নির্গত আল্‌ফা-রশ্মি যখন বেরিলিয়মের উপর পড়ে তখন নিউট্রনের সৃষ্টি হয়। এইভাবেই প্রথম নিউট্রন আবিষ্কৃত হয়। পরে অন্য উপায়ে নিউট্রন পাইবার প্রণালী উদ্ভাবিত হয়। 'ভারি জল'কে ডয়টেরন দিয়া আঘাত করিলেও নিউট্রনের সৃষ্টি হয়। আণবিক বোমা ফাটাইতে কোন্ উপায় অবলম্বিত হইয়াছে তাহাও জানা নাই। কিন্তু যে উপায়েই হোক, এটা বোধহয় ঠিক যে নিউট্রনের প্রভূত বর্ষণ দ্বারা ক্রিয়া-আরম্ভ করিতে হইবে; তজ্জন্য বেশী পরিমাণে নিউট্রন সৃষ্টির প্রয়োজন। এ ব্যাপারটাও বিশেষ সহজসাধ্য নয়।

এখন ইস্পাত বা ঐরকম কিছু দিয়া তৈয়ারী একটা ছোট খোল লওয়া হইল, আকারে হাঁসের ডিমের খোলের মত হইলেই চলিবে। ইহার মধ্যে রহিল ২৩৫ ইউরেনিয়ম। এদিকে দূরে রহিল বেরিলিয়ম, প্যারাফিন দিয়া মোড়া এবং তাহার কাছে অনেকটা রেডিয়ম ইমানেশন। উহা হইতে প্রভূত আল্‌ফা-রশ্মি নির্গত হইতেছে। বেরিলিয়ম ও রেডিয়ম ইমানেশনের মধ্যে এক খণ্ড মোটা সীসার চাদর আছে, যাহাতে করিয়া গোড়া হইতেই রেডিয়ম ইমানেশন হইতে বহির্গত আল্‌ফা-রশ্মি বেরিলিয়মে আসিয়া পৌঁছিতে না পারে। নিউট্রন প্রস্তুতের অংশটি ইউরেনিয়ম হইতে দূরে থাকিলেও চলিবে, কারণ নিউট্রন বহুদূর অবধি অবাধে চলে। এইবার সীসার চাদরটি সরাইয়া লওয়া হইল। আল্‌ফা-রশ্মি বেরিলিয়মের উপর পড়িল, নিউট্রনের উৎপত্তি হইল; নিউট্রন ছুটিল, ছুটিয়া খোলের ভিতরকার ২৩৫-ইউরেনিয়মকে ধাক্কা দিল; ইউরেনিয়ম পরমাণু ভাঙিল এবং মুহূর্ত মধ্যে এই ভাঙন ক্রিয়া সমস্ত ইউরেনিয়মে ব্যাপ্ত হইল।

লণ্ডন, ২০শে আগস্টের সংবাদে একজন 'বিশেষজ্ঞ'—নাম প্রকাশ নাই—আণবিক বোমার গঠন সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব এক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার হিসাব অনুসারে দাঁড়ায় যে, ইউরেনিয়মকে ধাক্কা দেয় নিউট্রন নয়, ডয়টেরন, 'ভারিজলের' কেন্দ্রক। তাঁহার বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, একটি ডায়নামো হইতে আগত তড়িৎস্রোত একটি ফিলামেণ্টকে উত্তপ্ত করে, ইলেকট্রন ছুটিয়া বাহির হয়। একটি নলে 'ভারি-জল' আছে, গতিমান ইলেকট্রন উহাকে আঘাত করে, 'ভারি-জল' ভাঙিয়া যায়; ইহার কেন্দ্রক ডয়টেরন বাহির হয় এবং একটি প্রচণ্ড শক্তি তড়িৎ-চুম্বকের সাহায্যে একটি কাচের নলের মধ্যে উহা ঘুরিতে থাকে। যত ঘুরে, বেগ ততই বাড়িয়া চলে, শেষে ঐ ডয়টেরন গুচ্ছাকারে কাচের নল হইতে বাহির হইয়া আসে। এই সময় ইহার বেগ খুব বেশী হয়। সেকেণ্ডে প্রায় ৬০ হাজার মাইল অবধি উঠে; উহারাই এখন ইউরেনিয়মকে ধাক্কা দিয়া ভাঙিবে। অসম্ভব নয়! তবে এখনও ঠিক কিছু জানিবার উপায় নাই।

কাগজে-কলমে আমাদের আণবিক বোমা নির্মিত হইল। কিন্তু শুনা যায় বাস্তব ক্ষেত্রে ইহার পিছনে ৭০ হাজার লোক কাজ করে এবং চার্চিলের হিসাবে ইহার জন্য ৬৭০ কোটি টাকা খরচ হয়। একটা প্রবাদ আছে, গরজই প্রতি আবিষ্কারের মূলে আছে। এখানে গরজ ছিল দুইটি ক্ষমতাশালী জাতির, আর গরজের মত গরজ; তাই অনেক দেশের মনীষীর বুদ্ধিবল এবং আমেরিকার বিরাট পরীক্ষাগার ও বিপুল অর্থবল মিলিত হইল, জগতে এক প্রলয়ঙ্কর আবিষ্কার সংঘটিত হইল।

আণবিক বোমা ও মানবের ভবিষ্যৎ

একটিমাত্র আণবিক বোমা এক মুহূর্তে একটি শহরের প্রায় দুই লক্ষ লোকের প্রাণ সংহার করিল। শুনিয়া চার্চিল বলিলেন— ভগবানের অশেষ করুণা যে বৃটেনের ও আমেরিকার বিজ্ঞানীরা জার্মানদের পূর্বে এই আবিষ্কারটা করিয়া ফেলিয়াছে। বেচারা ভগবান! রাজনীতিজ্ঞরা বলিতেছেন যে, এই আবিষ্কারের কথা রাশিয়ার জানা না থাকায়, ক্ষমতার যে-ভার রাশিয়ার দিকে ঝুঁকিয়া যাইতেছিল, সেটা এখন বৃটেন-আমেরিকার দিকে ফিরিল। ত্রিশক্তির মধ্যে সখ্য-বন্ধন কি সুদৃঢ়!

অন্যদিকে স্টুয়ার্ট গেলডার বলিতেছেন—

Britain and America who took upon themselves the awful responsibility of using this weapon have brought nearer the end of the war with Japan. They have also brought nearer the end of the world itself.

তিনি আরও বলিতেছেন—

There is not so much horror at the thought of the destruction it has caused—we have become used to violent death—but at the thought that human beings have dared to use knowledge to this end now.

রবীন্দ্রনাথ একদিন বলিয়াছিলেন—

আত্মশত্রু আত্মঘাতী মানুষ ধ্বংস-বন্যার স্রোতে গা-ভাসান দিয়েছে। মানুষের আরম্ভ আদিম বর্বরতায়, তারও প্রেরণা ছিল লোভ, মানুষের চরম অধ্যায় সর্বনেশে বর্বরতায়, সেখানেও লোভ মেলেছে আপন করাল কবল। জ্বলে উঠেছে প্রকাণ্ড একটা চিতা—সেখানে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সহমরণে চলেছে তার ন্যায়-নীতি, তার বিদ্যাসম্পদ, তার ললিত-কলা।

এখন মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে বিজ্ঞানীর উপর। এই নব-উদ্ভাবিত অপরিমেয় শক্তিকে নানাদিকে চালিত করিয়া সে মানবের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বহুল পরিমাণে বাড়াইয়া দিতে পারে, অথবা রাজনীতিজ্ঞদের ক্রীড়নক হইয়া পৃথিবীর ধ্বংসকার্যে তাহাদের সহায়ক হইতে পারে,

বিষয়ের যেমন হইল। এ ব্যাপারে কোন কোন বিজ্ঞানীর মনে যে একটু-আধটু সংকোচ দেখা দেয় নাই তাহা নয়। নাইল বোরের পুত্র বলিতেছেন—

My father did not work on a bomb. He has been busy for years on atomic studies to benefit mankind. However, we cannot be sure that the bomb would have been developed without my father's help.

জ্ঞান ঘোষ আশা করিতেছেন যে, মানুষ এককালে এই মারাত্মক বোমার কথা ভুলিয়া যাইবে এবং শিল্প ও যানবাহনের ক্ষেত্রে ইহার নিয়োগের পরমাশ্চর্য ফলের কথাই শুধু স্মরণে রাখিবে। তাঁহার এই আশা আমরাও পোষণ করিয়া রাখিলাম।

ভবিষ্যতের আণবিক বোমা

আণবিক বোমার নির্মাণ-জ্ঞান আজ শুধু বৃটেন ও আমেরিকাবাসী কয়েকজন বিজ্ঞানীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু বেশীদিন এইরূপ থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। বৃটিশ বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন এই আবিষ্কারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; তিনি বলেন যে, বিভিন্ন দেশ এ সম্পর্কে পরীক্ষা চালাইতেছিল এবং প্রায় সকলেই সাফল্যের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। সুতরাং আমেরি বলিয়াছেন, পাঁচ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর সকল দেশ আণবিক বোমার নির্মাণ-কৌশল অবগত হইবে, সে কথাটা বোধ হয় ঠিক।

ইহার পরের ধাপটা কি? পৃথিবীতে ইউরেনিয়ম বোধ হয় খুব বেশি পরিমাণে নাই; সুতরাং আণবিক বোমা নির্মাণ যদি কেবলমাত্র ২৩৫-ইউরেনিয়মে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে পৃথিবীতে ঝুড়ি ঝুড়ি আণবিক বোমা নির্মিত হইবে না, যতগুলি হইবে, তাহাতে সমস্ত পৃথিবী সাবাড় না হইয়া কিছু বাকি থাকিয়াও যাইতে পারে। তবে ধরা যাক, উহা মানবের কল্যাণে ব্যবহৃত হইল। এখন প্রশ্ন এই ইউরেনিয়ম ব্যতীত নূতন নূতন পরমাণু ভাঙিয়া শক্তি-আহরণ করা চলিবে কি না. আণবিক শক্তি তো একা ইউরেনিয়মের নাই। পদার্থ যখন শক্তির রূপান্তরিত অবস্থা, তখন প্রতিপদার্থ হইতে শক্তি আহরণ করা যাইতে পারে। কিন্তু বর্তমানে যত পরীক্ষা সব ইউরেনিয়মের উপর করা হয় কেন? কারণ নির্ণয় করিতে হইলে পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে আর একবার চিন্তা করিতে হয়। ১ হইতে ৯২ আণবিক সংখ্যার পরমাণুর মধ্যে শেষের কয়েকটি তেজস্ক্রিয়, অর্থাৎ নিয়তই নির্দিষ্ট হারে ঐ সকল পরমাণু হইতে বিভিন্ন রশ্মি বহির্গত হইতেছে; পরমাণুর কেন্দ্রক ধীরে ধীরে ভাঙিতেছে, তাহারই ফলে ঐ সকল রশ্মির নির্গম। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, লোহা, তামা, সোনা হইতে স্বতঃই কোন রশ্মি নির্গত হয় না। ইহা হইতে ধরিয়া লওয়া হয় যে, এই তামা সোণার কেন্দ্রক খুবই দৃঢ়। তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণু-কেন্দ্রক অপেক্ষাকৃত কম মজবুত হওয়ায় উহা-দিগকে বাহির হইতে অপেক্ষাকৃত কম শক্তির সাহায্যে ভাঙা যাইতে পারে। ঐ তেজস্ক্রিয় পদার্থের মধ্যে আবার ইউরেনিয়ম বাকি কয়টি অপেক্ষা সুলভ এবং ওজনেও ইহা সর্বাপেক্ষা বেশী ভারী। সেই কারণে ইউরেনিয়মের উপরই পরীক্ষা চলিল। তেজস্ক্রিয় নয় এইরূপ পদার্থের পরমাণু ভাঙিতে হইলে বাহির হইতে আরও অধিক শক্তিশালী গোলাবর্ষণ করিতে হইবে এবং সবগুলি যাহাতে যথাস্থানে পড়ে, কোনটি ব্যর্থ না হয়, সে উপায়ও উদ্ভাবন করিতে হইবে; এবং ২৩৫-ইউরেনিয়মের মত কাজটা একবার আরম্ভ করিয়া দিলে বরাবর চলিতে থাকিলে ব্যাপারটা অনেক সহজ হইয়া আসে।

তবে পথ খুলিয়া গিয়াছে। সেদিন হয়ত খুব বেশী দূরে নয়, যখন অক্সিজেন নাইট্রোজেন তামা সোনার কেন্দ্রক ভাঙিয়া বিজ্ঞানী আরও প্রচণ্ড শক্তি আহরণ করিবে। তবে সেদিনের একটা সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া রাখিতে হয় যে-কথা আজ উঠে নাই। ২৩৫ ইউরেনিয়ম কেন্দ্রক ধাক্কা খাইল, সমস্ত ইউরেনিয়মটি মুহূর্তে মধ্যে রূপান্তরিত হইল, উষ্ণতা, নক্ষত্রের উষ্ণতার ন্যায়, বহু কোটি ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডে উঠিল। মানুষের সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্যও বলা যাইতে পারে যে, ইউরেনিয়ম খুব অল্প অল্প পরিমাণে সমস্ত পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। কল্পনায় মনে কর যাক, যেমন বাতাসে অক্সিজেন-নাইট্রোজেন মাটিতে সিলিকন রহিয়াছে, তেমনি সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া ২৩৫-ইউরেনিয়ম বিদ্যমান ছিল। তাহা হইলে জাপানে আণবিক বোমা পড়িবার পূর্বেই আমেরিকার পরীক্ষাগারে যে পরীক্ষা চলিতেছিল, তাহাতেই এই মলয়জ-শীতলা শস্য-শ্যামলা বসুন্ধরা মুহূর্তে মধ্যে একটি জ্বলন্ত পিণ্ডে পরিণত হইত। বিজ্ঞানী যদি অক্সিজেন-নাইট্রোজেন প্রভৃতি ভাঙিতে চেষ্টা করেন, তবে এ সম্ভাবনাও রহিয়া গেল যে, আজ সূর্য যেমন জ্বলিতেছে, সেদিন পৃথিবীর কোন একটি পরীক্ষাগারে পরীক্ষার সাফল্যে সমগ্র পৃথিবী জ্বলিতে থাকিবে এবং ব্রহ্মাণ্ডে নক্ষত্রের সংখ্যা আর একটি বাড়িয়া যাইবে, অবশ্য গণনাটা করিবে, অন্য গ্রহবাসী কোন প্রাণী।

ভ্রম সংশোধন

এই পুস্তকে ২৯২ পৃষ্ঠায় 'দি ষ্টার আয়রণ ওয়ার্কস' এর বিজ্ঞাপনে 'বাবুলাল সিংহ এণ্ড কোং' এর ঠিকানা মুদ্রিত হয় নাই। উহাদের ঠিকানা—৫৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাকাললতার কাহিনী

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই বর্ষায় আমাদের গ্রামের নানা বনে ঝোপে মাকাললতার নিভৃত বিতান রচিত হয়েছে। আমি মাকাললতা বড় ভালবাসি। যেদিন প্রথম আমার চোখে পড়লো মাকাললতার বিচিত্র রচনা, তখন মন আনন্দে ভরে উঠলো।

তারপর সেই সুন্দর দিনটি এল, যেদিনে দেখলুম মাকাললতার ঝোপে ঝোপে কাঁচা সবুজ ফল ধরেচে। সবুজ, মসৃণ, চিক্কণ গা পুষ্ট ফলগুলির। আমি রোজ বেড়াতে যাই, নাইতে যাই, ঝোপে মাকালফলের শ্যামল রূপ দেখি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে।

ঘন বর্ষার দিনে নদীর তীরে, নিভৃত, মৌন বনবিতানে নীল আকাশের তলায় ঝোপে ঝাপে সবুজ আপেলের মত ফলগুলি একদৃষ্টে কতক্ষণ ধরে চেয়ে থাকি। প্রজাপতি ওড়ে, পাখী গান গায়।

এ বছর বর্ষা তেমন হয় নি আজও, তবুও নদীর ধারে দুটি বনের ঝোপে মাকাললতা যথেষ্ট বেড়ে সারা ঝোপটির মাথা ঢেকে ফেলেচে। আর একটি মাকাললতার সুন্দর ঝোপ গজিয়ে সৌন্দর্যসৃষ্টি করেচে গোপাল নগর বাজার ছাড়িয়ে পুরনো ডাকঘরটার সামনের বটতলায়।

ডাকঘরের এ ঝোপের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, মটরলতার মটরফলের গুচ্ছ ও মাকালফল পাশাপাশি দুলচে। মনে হবে পারস্য দেশের সূর্যতপ্ত কোনো উদ্যানে আপেল ও দ্রাক্ষাগুচ্ছ একসঙ্গে ফলেচে—বাঙলাদেশের ঘরোয়া জঙ্গল এ নয়। তারপর হঠাৎ একদিন দেখি মাকাললতার ফলগুলির কোনো কোনোটাতে রং ধরেচে। ক্রমে সেগুলোতে একটু করে রং চড়লো সূর্যতাপে, রাঙা টুকটুকে গোলা ফলের রং, ঘন সবুজ ঝোপের সবুজপত্রসম্ভারের মধ্যে রূপসী নববধূর মুখের মত উঁকি মারচে রাঙা টুকটুকে সুঠাম সুগোল ফলগুলি। এই দুটি মাকাল ঝোপ আমার কাছে কি অপূর্বই লাগে! নদীর ধারেরটি ও এই বটতলার।

নদীতীরের ঝোপ সৃষ্টি হয়েছে এক নিবিড় লতাবিতানের নিভৃত ছায়াগহন আশ্রয়ে। একটা সাঁই বাবলা গাছের মাথায় মাকাললতা উঠে জড়িয়ে জড়িয়ে এই ঝোপ তৈরী করেচে। সাঁই বাবলা গাছ এমন সুন্দর, যেখানে থাকে সেখানে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে না দেখে থাকা যায় না। সরু সরু লম্বা লম্বা পাতা, আঁকা বাঁকা শাখা প্রশাখা, ভাদ্রমাসে সাদা মঞ্জরীর মত ফুল হয়ে একসঙ্গে বহু, আর ওদের মুখ থাকে নীল আকাশের পানে উঁচু হয়ে। তারই ওপরে সেই মাকাললতার ঝোপ—আর মাথা থেকে ঝুলে ঝুলে পড়েচে এদিকে ওদিকে মাকাললতার দীর্ঘ ডালাগুলি, আর তার প্রতি গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে লতাগ্রভাগে, সবুজ পত্রান্তরালে চিক্কণশ্যাম অথবা লালটুকটুকে মাকাল ফল।

এর অদ্ভুত সৌন্দর্যের জন্যে পটভূমি রচনা করেচে পাশে বড় গোয়ালে লতার আর একটি বড় ঝোপ—একদিকে একটা আম্রবৃক্ষের নত শাখা, দশ বর্গফুট আন্দাজ সুনীল আকাশ তার গাছের তলায় শেওড়া, বৈঁচি, ভাঁট, বনকচু, বনআদা, সন্ধ্যামণির নিবিড় জঙ্গল। প্রভাতের অপূর্ব রৌদ্র পরিস্রুত হয়ে আসে বড় গোয়ালে লতার বড় বড় পানের মত পাতার মধ্যে দিয়ে, ওই পাতার উল্টো পিঠগুলো যেন স্বচ্ছ দেখতে সূর্যকিরণে, একটি সজল ছায়া বিস্তৃত হয়ে আছে বনতলে, মেঘনগরীর ঊর্ধ্বের নীলাকাশ তার বাণী পাঠিয়েচে তার ওই দশ বর্গফুট বয়সের প্রতিনিধির হাতে, শালিক, ছাতারে, ঘুঘু, দোয়েল, নীলকণ্ঠ, শ্যামা, দুর্গা টুনটুনি প্রভৃতি পক্ষীকুলের সম্মিলিত প্রভাত-কাকলীতে মুখর হয়ে উঠেচে বনবাণী।

এরই মধ্যে সুদীর্ঘ নম্রমুখ লতা যেখানে মাটি ছুঁয়ে দুলছে, সেখানে লতার প্রতি গ্রন্থিতে দুলচে রাঙা টুকটুকে মাকালফল। ভাদ্রমাসে বেশির ভাল মাকালফলই পেকেচে, ক্কচিৎ দু-চারটে কাঁচা আছে।

এই মাকালঝোপ কি যাদু জানে। বোধ হয় কোন ঐন্দ্রজালিক লুকিয়ে থাকে ওর শ্যাম বনানীর অন্তরালে, মানুষের মনকে মোহগ্রস্ত করে ফেলে এক মুহূর্তে—যে মুহূর্তে বনতলে ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ানো যায় সেই মুহূর্তেই। কোন অসাধারণ ঐন্দ্রজালিক আর তার ইন্দ্রজাল এ!

এই ক্ষুদ্র মাকাললতার ঝোপে আমার মন কেন মোহাবিষ্ট করে তার কারণ আমি জানিনে বল্লে কবিজনোচিত ধোঁয়াটে বর্ণনা দ্বারা জিনিষটাকে ঘোরালো করা যেতো। কিন্তু এর কারণ আমি জানি।

কি জানি?

তাই কি বিশ্লেষণ করে বলার কথা?

ঝোপের পাশে দাঁড়ালুম সেদিন প্রভাতবেলায়। কাঁধে গামছা, হাতে সাবানের বাক্স, ইছামতীতে বনসীমতলার ঘাটে স্নান করতে যাচ্ছিলুম। ইচ্ছে করেই ঘুর পথ দিয়ে গেলাম শুধু এই মাকালফলদোলানো ঝোপটি দেখবো বলেই।

রোজই দেখি। দেখবার সুযোগ একদিনও ছাড়িনে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ঊর্ধ্বে একটি অকলুষ, উদার, দিব্য জগতের অকথিত বাণী এই মাকাললতার ঝোপের পথে আমার মনে প্রবেশ করে। সারা নাক্ষত্রিক বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে এই অদ্ভুত সুন্দর রাঙা ফলগুলি! রং-এর কি তীক্ষ্ম contrast! চিক্কণশ্যাম লতাবীথির শ্যামল পত্রপুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে টুকটুকে রাঙা ফলগুলি...আপেল ফলের মত গড়ন অবিকল, তবে পাকা আপেল হয় হলদে-লালে মেশানো—এর একেবারে সিঁদুরের মত রং।

এর মধ্যেই বিশ্ব। এই মাকালঝোপের নীচেই। এই যে মাকাললতাগুলো এদিক-ওদিক অদ্ভুতভাবে ঝুলচে গাছ থেকে পড়ে, তার গাঁটে গাঁটে পাকা ফল—এই যে রহস্যময় সুন্দর দৃশ্য যার দিক থেকে চোখ ফেরানো যায় না, অবাক হয়ে, বিমুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকতে হয়—এই সৃষ্টির আইডিয়ারূপী বীজ কার মধ্যে ছিল? কোন্ দেবতা তিনি? কত বড় শিল্পী তিনি?

"কল্পনাসৃষ্টিবীজঞ্চ"

কার মহতী কল্পনার মধ্যে এ সুন্দর মাকাললতার দুলুনি, এর শ্যামপত্রগুচ্ছ, এর টুকটুকে রাঙা, সুডৌল, সুঠাম ফলগুলো ছিল বীজরূপে অধিষ্ঠিত? যিনি বাষ্পাগ্নি-প্রোজ্জ্বল শত শত সহস্র সহস্র লক্ষ কোটি নীহারিকা সৃষ্টি করেচেন, সেই মহারুদ্রের ভয়াল করাল রূপ কোথায় মহাশূন্যের দূর প্রান্তে, আর কোথায় এই ক্ষুদ্র পৃথিবীগ্রহের এক কোণে সুনিভৃত, নির্জন, লতাবিতান, সূর্যের সে বিরাট বাষ্পতেজ বহু মাইলব্যাপী বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে, সজল বর্ষার হাওয়ার মধ্যে দিয়ে, বসন্তদিনের জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে, বনবিহঙ্গকাকলীর মধ্যে দিয়ে, বনকুসুমের সুবাসের মধ্যে দিয়ে পরিস্রুত হয়ে মোলায়েম হয়ে প্রভাতের রৌদ্ররূপে যে লতাবিতানকে আলো করেচে, আর তারই মধ্যে এই সুন্দর চিক্কণ, সুপুষ্ট, রাঙা মাকালফল লতাগ্রভাগে দোদুল্যমান!

যিনি অগ্নিতে, যিনি জলেতে......

যিনি মহারুদ্র, তিনিই চিরপ্রাচীন অথচ চিরতরুণ পুষ্পধন্বা দেবতা......সৃষ্টি বজায় রাখতে কামদেবের আবির্ভাবের প্রয়োজনে

হয়তো মুখে মুখে এক কবিতা রচনা করলুম সেই অজানা শিল্পী দেবতার উদ্দেশে......

হেথা নীল আকাশতলে
প্রজাপতি ওড়ে ফুলে ফুলে
হোথা কোথা কত দূরে
'ওমিক্রন্ সেটি' ঘোরে
সংগে তার সুশুভ্র বামন।*

কবিতা হিসেবে লোকে হাসবে হয়তো। কিন্তু লোকেদের জন্যে এ রচিত নয়—যাঁর উদ্দেশে সেই প্রভাতের কনকদ্যুতিমণ্ডিত বনবীথিতলে এ কবিতা মুখে মুখে রচিত, তিনি কৃপা ও প্রশ্রয়ের স্মিতহাস্যে দক্ষিণপাণি প্রসারিত করে গ্রহণের করেচেন অক্ষমের সে স্তুতি। ওমিক্রন্ সেটির অগ্নিলীলার মধ্যে এই গোল গোল রাঙা মাকালফলের স্বপ্ন লুকানো আছে। ওমিক্রন্ সেটির চারিপাশে ঘূর্ণ্যমান গ্রহরাজি যদি থাকে, যদি সেখানে অনন্তযৌবনা দেবকন্যারা সে দেশের বনবীথির অন্তরালে, সেখানকার অজ্ঞাত বসন্তদিনে অলস শয়নে শুয়ে দিনপাত করেন, কে জানে সেই বনবীথি মাঝে এমন মাকাললতা, এমন দোদুল্যমান ফলগুচ্ছ, ঘনসবুজ ঝোপের অন্তরালে এমন টুকটুকে রাঙা ফল হয়তো আছে।

মাকাল ফলের আয়ুষ্কাল বেশী দিন নয়, একমাস দেড়মাস। সুপক্ক অবস্থায়ও দিন-পনেরো গাছে দোলে, তারপর একদিন ঝরে পড়ে যায়। তাই রোজ দুবেলা যেতাম মাকাল ঝোপের তলায়—একমাস দেড়মাস ধরে কত-রূপে একে দেখেছি—এই লতাবিতানকে। প্রভাতের আলোতে, ঘনবর্ষার মেঘমেদুর সন্ধ্যায়, নির্জন ভাদ্রদ্বিপ্রহরে নিস্তব্ধ প্রশান্তির মধ্যে উদার নীলাকাশের তলে, ঘুঘু-ডাকা উদাস বনানীর পটভূমিতে, সুন্দর জ্যোৎস্নারাতের প্রথম প্রহরের জ্যোৎস্নায়। বাবলার হলুদে দুল আর সাঁইবাবলার ফুলের শিস্ তার মধ্যে দুলে দুলে হলদেডানা, শাদাডানা প্রজাপতির মেলা, তার মধ্যে দোদুল্যমান মাকাললতার নিবিড় ছায়াগহন আশ্রয়, তপোবনের ন্যায় স্নিগ্ধ, পবিত্র। খানিকটা সেখানে দাঁড়ালেই সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে পড়ি, কেমন যেন সারাদেহ শিউরে ওঠে, মন অপূর্ব ভাবে ও স্বপ্নে বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে—এ আমি এই গত এক মাসের মধ্যে অন্ততঃ ছ' সাত দিন দেখেছি। সে স্বপ্ন কিসের কি করে বলবো, আম্রশাখা ও সাঁইবাবলার ফুলে ভরা শাখার পিছনকার নীল আকাশের স্বপ্ন, কোনো মহাশিল্পী মহাদেবতার প্রত্যক্ষ আবির্ভাবের স্বপ্ন, সবুজ ঝোপের মাথায় ফলন্ত রাঙা মাকালফলগুলির স্বপ্ন—গভীর সৌন্দর্যের স্বপ্ন। পাগল করে দেয় ওই স্বপ্ন।

আমি জানি, বছরে তেমন ভাব ও অনুভূতি সারা বছরে একদিন এলেও জীবন ধন্য হয়ে যায়—তাই এই মাকাললতার season-এ এল মাসে সাতদিন।

এ মাকাললতার ঝোপ যেন পবিত্র দেবায়তন, অতি পবিত্র, অতি সুন্দর। সৌন্দর্যের পূজারী যে, এই দেবায়তনে দেবতার আবির্ভাব সে দর্শন করবে। এখানে জাগ্রত ও প্রত্যক্ষ দেবতাকে নিত্য প্রণাম কর।

জয় হোক মাকালফলের! জয় হোক ওমিক্রন্ সেটির! কত বড় ও কত ছোট। কিন্তু উভয়ের মধ্যেই আর্টিষ্টের আবির্ভাব অতি প্রত্যক্ষ, অতি বিচিত্র। যার মন খারাপ হয়েচে সে অমৃতের সাগরে এসে তীর্থজল আহরণ করুক। প্রত্যক্ষ করুক ঋগ্বেদের শিবরুদ্রীয় স্তোত্রের অমর বাণী। বৃক্ষের পত্রেও তুমি, পত্রের পতনেও তুমি।

আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি মাকালফল ঝরে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে, মাকাললতার শ্যাম শোভা অন্তর্হিত হবে, বনভূমি আগামী বৎসরের শ্রাবণ দিনের প্রতীক্ষায় থাকবে সুপক্ক মাকালফলের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায়। ঝরঝর বাদল দিনের অপরাহ্নে *আবার এদের দল আসবে ঘুরে, যেমন এরা আসে প্রতি বর্ষা-ঋতুতে, কত বৎসর, কত শতাব্দী, কত যুগ ধরে...অনন্তের সসীম প্রতিনিধির মতো...কেউ খবর রাখে, কেউ রাখে না।

* ওমিক্রন্ সেটির সহকারী নক্ষত্র, ইংরেজীতে "হোয়াইট ডোয়ার্ফ" শ্রেণীর।

কবিতা

আনন্দ লোক

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

জ্যোৎস্না যামিনী, ঝুরঝুরে' মিঠে বায়,
পদ্মার বুকে তরীখানি ভেসে যায়।
পূর্ণিমা চাঁদ বিছায় মোহন মায়া—
তীরে-নীরে মেশা একাকার কায়া-ছায়া!
যেধারেই চাই,—যতদূর যায় দিঠি,
খোলা দেখি যেন প্রিয়ার প্রথম চিঠি,—
আনন্দ আর বিস্ময়রসে ভরা;
স্বর্গের সুখ হাতে দেয় যেন ধরা!

নিবিড় শান্তি, নাহিক শব্দলেশ,
স্তব্ধ প্রকৃতি মুগ্ধ নির্নিমেষ!
ঊর্ধ্বে আকাশ নিম্নে জলস্থল,
উদার অপার, অসীম অচঞ্চল!
মাথার উপরে জ্বলে অগণ্য তারা,
সৈকতভূমে বালুকা সংখ্যাহারা;
সাধ্য নাহিক পরিমাণ করে কেহ,
চোখ চেয়ে চেয়ে ঝিম্‌ঝিম্‌ করে দেহ!

যতদূরে আর যেদিকেই ফিরে' চাই,
কোনোখানে কোনো দ্বিধা-বাধা যেন নাই;
অপলক আঁখি হেরে সে অনর্গল
তন্দ্রামধুর সুন্দর ধরাতল!
তুচ্ছতা যেন পায়না সেথায় স্থান,
ক্ষুদ্রতা ভুলে' খণ্ডিত পরিমাণ,
চেয়ে দেখে শুধু মহাবিস্ময় ভরে
রূপে ও অরূপে মিলেছে পরস্পরে!

এ দেহের লাগি' কেন-বা ভাবনা-ভয়?
ক্ষণিক অভাব, ক্ষণেকেই যার ক্ষয়।
অরণ্যজাত যৎসামান্য ফলে,
সহজলভ্য স্রোতস্বিনীর জলে,
প্রয়োজন ছাড়া, লোভ যদি নাহি থাকে,
সহজে তৃপ্ত করে এই মনটাকে।
অল্পের বাধা, স্বল্প আয়াসে লয়,
আনন্দ-পথে কে তারে বিঘ্ন কয়?

কিসের অভাব, কি এমন উঁচু-নীচু?
কোথা ছোট-বড়, কে-বা কার আগু-পিছু!
দুঃখের দাহ, চিন্তার নিশ্বাস
পারে না মুছাতে চিত্তের মহাকাশ।
এক-এক-এক বলে' উঠে যেন মন—
সত্য এ চোখ, সার্থক দরশন!

নাগরিক রূপকথা

গোপাল ভৌমিক

পায়রার খোঁপে-আঁটা
দিনগুলো আসে আর যায়
ছায়া-ঘেরা বিকালের
বেদনায় বিষণ্ণ মধুর ঃ
হে আকাশ, হে সমুদ্র
কোথায় সে সুর!
মাথা খুঁড়ি পাষাণে পাষাণে,
মরা দিন প্রেতছায়া আনে!
ছোট ছোট খোঁপ
আর ভাগে ভাগে বিভক্ত জীবন ঃ
টেবিল চেয়ার ফ্যান্‌
স্তূপীকৃত ফাইল আর ফোন্‌,
সন্তান সন্ততি-ঘেরা নির্বিকার
নিরাসক্ত মন—
ছোট ঘরে বাঁধা পড়ে
আকাশ-স্বপন।
রৌদ্রের ঝিলিক্‌
আর এক ফালি কেটে-ফেলা চাঁদ
কারখানার ধোঁয়ায় মলিন—
শুধে যায় পৃথিবীর ঋণ,
গতি নেই, প্রাণ নেই—
একঘেয়ে একান্ত মসৃণ।
চোখে আকাশের স্বপ্ন
বুকে নিয়ে সমুদ্রের ডাক—
এ কেমন দৈবদুর্বিপাক!
ছোট খোঁপে আঁটা দিন
কবে মুক্তি পাবে—
আকাশের বিপুল বিস্তারে?
দেয়ালের বেড়া ভেঙে
বিষণ্ণ বিকাল—
গোলাপী আভায় হবে লাল
অকস্মাৎ অতি অকস্মাৎ—
খোঁপে খোঁপে সূর্য-ব্যোম্‌-সমুদ্র-প্রপাত?

এই স্থল-জল-অন্তরীক্ষাকাশ,
মনে হয়, যেন অখণ্ড পরকাশ
একটি বিরাট অমৃত-বিশ্বফল—
রূপে আর রসে করিতেছে ঢলঢল!
বিস্ময়ালোকে আগাগোড়া তার ধোওয়া
হাতটি বাড়ালে পাওয়া যায় যেন ছোঁওয়া।
অশান্ত মন, আনন্দ যদি চাস্‌,—
এই তো তাহার পুণ্য পরশ পাস্‌।

নকল সূর্য্য

হরপ্রসাদ মিত্র

রাঙা আকাশের সন্ধ্যা বাতিল।
জুঁই-চামেলির গন্ধ বাতিল।
এখানে কাজের দীপ্তি বৈদ্যুতিক।
ভুলবো না আর নতুন বিদ্যে ভুলবো না।
পুরাণো দিনের কোনো কথা টেনে তুলবো না।
মল্লিকে!—
এখানে নতুন আয়ুর্বেদের অভ্যাস দেখো
প্রজ্জ্বলন্ত চুল্লিতে।

'ভালো কি বাসতে?'
—'বাসতুম'।
'স্বপ্ন দেখেছো?'
—'দেখতুম।'
'ঈশ্বর কোথা?'
—'হিমঋতু এলে জবাব মিলবে যদিচ,
এখন কিন্তু ওষুধ-পথ্য আসল স্বর্ণ-ঘটিত।'
'রাত্রি কি চাও?
—আলো নেবাও।'
'দিন কি ভালো?
—তাহ'লে জ্বালো।'

দিনকে রেখেছি পৃথক, রাতকে স্বতন্ত্র।
সংগম নয় সাধ্য,—পাইনি সে মন্ত্র।
আলো-ছায়া মিলে সন্ধ্যা হবে না,
সারা দিনরাত এখানে বৈদ্যুতিক।
কার্তিকে হলো আকাশ-প্রদীপ মিথ্যে,
নদীর প্রদীপ নিমজ্জনেই পূর্ণ।
অন্য কালের বাতাস লাগলে চিত্তে
লোকনিন্দায় উঁচু নাক হবে চূর্ণ।

নিটোল শরীর, চোখে শ্রাবণের বিদ্যুৎ।
দেহরেখা হলো আদিম সূত্র জৈব।
তুমিও ঘোমটা রেখো না, আমিও
সহজে সে কথা কইবো।

ছায়া ঘনিও না ঈষৎ ছোঁয়ায়
তারার চুমকি ফুটবে না।
শালবনে চাঁদ উঠবে না।
দূর গ্রামপথে টানবে না কোনো
কাঁকন অথবা সন্তান।
ঘরে ফিরবে না গোধূলি-আলোয় পাখী।
নকল সূর্য,—তোমাকে নমস্কার,
হে আশ্চর্য [illegible]

কবিতাগুচ্ছ

উদ্বোধন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কোথায় প্রেমের ধর্ম? কোথা বল অহিংসার জয়?
বৃথা বুদ্ধ, খৃষ্ট এলো হল নাকো বুদ্ধির উদয়।
শাস্ত্র পুঁথি যত বাড়ে, অস্ত্র তার বাড়ে চতুর্গুণ,
মানুষ সকল যুগে আসিছে মানুষ করি খুন।
সৃষ্টির মালিক যারা বরণ করিছে তারা লয়,
পুণ্যের পূজারী দেয় প্রাণপণে পাপেরে আশ্রয়।
হতজ্ঞান বিজ্ঞানের বর হলো বড় অভিশাপ,
রহিল লেজের বহ্নি—নিভিল না একি পরিতাপ।
মৃত্তিকা রঞ্জিত হ'ল—রক্তস্রোতে রাঙা হ'ল জল,
অর্ধযুগব্যাপী বলি মানবের কলঙ্ক কেবল।
কোটি কোটি গৃহ হতে উঠিছে আকুল আর্তনাদ,
জীবন হয়েছে শুষ্ক, রিক্ত, তিক্ত অসহ্য বিস্বাদ।
দিকে দিকে প্রসারিত সত্যান্বেষী মানবের মন—
পাষাণ প্রাচীরে রুদ্ধ—বন্ধনের উপরে বন্ধন।
এই নিরানন্দ পুরে আনো হরি আনন্দ আবার
খোলো অমৃতের সত্র, পাতো প্রভু আনন্দবাজার।
স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে মৃত্যুর কি লীলা ভয়ঙ্কর!
গিরেন্দ্রের অস্থিমাল্যে শুভ্রীকৃত গভীর গহ্বর।
ডুবে ম'ল লক্ষ প্রাণী, লক্ষ লক্ষ উড়ে আর পুড়ে,
তাদের অতৃপ্ত আত্মা অমৃতের তরে ফিরে ঘুরে।
শান্ত হোক তৃপ্ত হোক সেই সব পিষ্ট দগ্ধ হিয়া,
সর্বমানবের মুক্তি—নব-গঙ্গা দাও বহাইয়া।
সার্থক হউক ত্যাগ—দেবগ্রাহ্য তাহাদের দান
দাও স্বাধীনতা দাও, জগতের জীবের কল্যাণ।
অনশনে অর্ধাশনে তিলে তিলে মরিয়াছে যারা,
সরমে ও অবজ্ঞায় লুপ্ত যত জীবনের ধারা,
তাদের ভস্মেতে কর নব-জীবনের উদ্বোধন,
অস্থিতে হউক বজ্র—হোক হিংস্র বৃত্রের পতন।
গড়াও নূতন পৃথ্বী—তুমি বিনা হেন সাধ্য কার?
দেব ও নরের মধ্যে ব্যবধান কমাও এবার।
তুমি সর্ব-দর্পহারী—তুমি সর্ব-বিপদভঞ্জন,
নূতন ধাতুতে গড় অনাগত মানবের মন।
স্বার্থ হোক শীর্ণতম, পঙ্গু হোক অন্ধ অহঙ্কার,
মানবের বক্ষ হোক পুণ্যভূমি মহাপ্রাণতার।
আসুক মানব-গৃহে ফিরে পুনঃ স্বরগের দান
বিশুদ্ধ বিবেক আর সত্যব্রত ন্যায়নিষ্ঠ প্রাণ।
হোক উত্তরাধিকারী ভক্তিরাজ্যে মনুষ্য-সমাজ
অসুরের বৃত্তি লতে মানে যেন শঙ্কা ঘৃণা-লাজ।
সব হোক সমুন্নত, সবে মুক্ত, সকলে স্বাধীন
মানব মানবে যেন রাখিতে পারে না করি হীন।
উঠুক ভুবন ভরি সে আনন্দ উৎসবের রব।
চূর্ণ হোক ভেদবুদ্ধি 'ব্যাবেলে'র বৃহৎ মণ্ডপ।
প্রতিভার উদ্ভাসিত হোক, লক্ষ জ্ঞানের দেউল
সর্বভূত হিতে রত মানব দেবের সমতুল।
মহামন্বন্তর শেষে হাত ধরে আরও কাছে নাও,
মানব জাতিরে তুমি অমৃতের অধিকার দাও।
দিব্যদৃষ্টি দাও নরে—এ ভোগ ভোগে না যেন আর
খোলো অমৃতের সত্র—পাতো তুমি আনন্দবাজার।

আত্মচমুর

দিনেশ দাস

বিজয়ী বীর
হাঁকে বিহার সুগম্ভীর
অতীত দিনের এ যোদ্ধায়
অস্তি-চিমুর চিরবিদায়!

বন্ধ্যা এ-মাটি মাটির পিণ্ড অনুর্বর
কী বর্বর
বারেবারে বলে, "তাজা প্রাণগুলি কোথা উধাও—
অস্তি-চিমুর অস্থি দাও!"

রাত্রি ঘনাল সায়াহ্নেই
মৃত্যুঞ্জয়ী মহামানবের মৃত্যু নেই
বিপ্লবী প্রাণ ছড়ায় বহ্নি অনন্তে,
চেয়ে আছি তাই লাঞ্ছিত কোন্ দিগন্তে
সূর্যোদয়
স্বাধীন দিন অভ্যুদয়।

ঘুমায় কে আজ স্বস্তিতে
ক্লীব মৃত্তিকা বিপ্লবী হবে কোন্ দধীচির অস্থিতে
হাঁকে বিহার সুগম্ভীর
ডাকে দ্রাবিড়
মন্দ্রিত হল মারাঠা বাঙলা অযোধ্যায়
অস্তি-চিমুর চিরবিদায়!

জিজ্ঞাসা

শ্রীপরেশনাথ সান্যাল

জীবনের বাঁকা পথে অনেক সূর্যের আলো আসে—
অনেক কুয়াসা ছিঁড়ে যায়।
ভিজে মাঠ—।
শিশিরের ছোঁয়া লাগে ঘাসে।
মাটির আত্মীয় যারা,—নির্বিবাদে কবরে ঘুমায়।
গুটি কয় ফুল শুধু জেগে থাকে কবরের পাশে।

ওখানে আকাশ কতটুক?
যেখানে বনের রেখা—
সেখানেই শেষ বুঝি তার?
জীবনের পরিধিতে যত চেনা মুখ,—
কোনদিন এ আকাশ হয়েছে কি পার?
অথবা গিয়েছে তারা চলে—
পৃথিবীর বহু দূরে—
অন্য কোন গভীর আকাশে?
যেখানে সূর্যের আলো জ্বলে
পৃথিবীর মাঠগুলো ভরে যায় সোনার ফসলে—
মানুষের গান আর পাখীদের সুরে?

আজ বসে ভাবি সেই কথা—
ছায়াচ্ছন্ন আজ এই প্রসন্ন বিকালে
অশান্ত জনতা।
রাজপথ বেয়ে যারা আসে,
তারা কি সেদিনও ছিল—
তেরশ পঞ্চাশে?